হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পাদিত

মজলুম জননেতা

মওলানা ভাসানী

মজলুম জননেতা
মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম
সম্পাদিত

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ১৫১৩
ই. ফা. লাইব্রেরী ঃ ৯২৩'২৫৪৯২

প্রকাশকাল
৫ মাঘ ১৩৯৪, ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪০৮, ২০ জানুয়ারী ১৯৮৮

প্রকাশক
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
এ. কে. এম. মাহতাব

মুদ্রণ ও বাঁধাই
শেখ আবদুর রহীম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রিন্টিং প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

দাম ঃ ১৬৫'০০ টাকা মাত্র
১০ মার্কিন ডলার

MAZLUM JANANETA MOULANA BHASHANI : The Great Leader Of the Oppressed Moulana Bhashani, a compilation in Bengali, edited by Prof. Hasan Abdul Quayyum and published by Prof. Abdul Ghafur, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. January 1988.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সারা দুনিয়ার মজলুম জনতার
উদ্দেশে

www.pathagar.com

বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ, দুনিয়ার মজলুম মানুষ, দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষকে তোমরা মুক্ত করো—আমরা মুক্ত করবোই করবো।

—মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

আমাদের কথা

আমাদের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁকে অনেকে জানতেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে। কিন্তু দেশের অন্যান্য হাজারো রাজনীতিবিদের চাইতে তাঁর রাজনীতি ছিল পৃথক, স্বতন্ত্র ধাঁচের। তাঁকে অনেকে জানতেন একজন বামপন্থী হিসেবে, কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যে সাধারণত যেমনটি দেখা যায় ধর্মবিরোধী মনোভাব, ভাসানীর জীবন ও চিন্তায় তার কোন অবকাশ ছিল না। বরং তাঁর বামপন্থী রাজনীতিরও ভিত্তি ছিল তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আজকের দিনের বহু বামপন্থীর মত তিনি রাজনৈতিক উচ্চারণে বামপন্থী আর ব্যক্তি জীবনে পুঁজিবাদের পূজারী ছিলেন না। তিনি রাজনীতি করতেন মানুষের মুক্তির জন্য, তাই রাজনীতির মাধ্যমে তিনি কখনই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেন নি। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যেই তিনি খিলাফত আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও তিনিই সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত না হলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন তাদের "আস্-সালামো আলায়কুম" জানাতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন এবং ১৯৭০ সালেই পূর্ব পাকিস্তানের 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করেছিলেন। এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেও একাত্তর-পরবর্তীকালে যখন আধিপত্যবাদী চক্রান্ত আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি গর্জে উঠেছিলেন তার বিরুদ্ধে।

জীবনের এক বিরাট অংশ তিনি বামপন্থীদের সাহচর্যে কাটালেও তিনি আজীবন ছিলেন ধর্মীয় জীবনবোধে গভীর বিশ্বাসী এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রয়োজনও অনুভব করেছেন। বাংলা ও আসামে তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদের কথা সবারই জানা। আসামে এদেশ থেকে যাওয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী কৃষকের একদা তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। লাইন প্রথার কল্যাণে এই সব বাঙ্গালী কৃষকের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তিনি

www.pathagar.com

নিজের গোটা সংগ্রামী অস্তিত্ব দিয়ে তাদের আগলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধে এবং একাত্তর-পরবর্তীকালে ভারতীয় অধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলে তিনি এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় এক বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন।

কিন্তু মওলানা ভাসানী শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, ধর্ম শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারিত হবার দাবীদার বরং বলা চলে, তিনি রাজনীতি না করলেও শিক্ষা, সমাজসেবা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল অবদানের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকতেন।

মোটের উপর যে দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক, মওলানা ভাসানী ছিলেন এক বিশাল মহাসাগরের ন্যায়, যেখানে এসে মিলিত হয়েছিল অসংখ্য নদ-নদী, শাখা-নদী ও স্রোতোধারা। এহেন বিশাল ব্যক্তিত্বের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন প্রকৃতই এক দুরূহ কাজ। এই দুরূহ কাজটি সম্পাদনা করে অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম জাতির প্রতি আমাদের এক বিরাট দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছেন। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন মত ও পথের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের বিচিত্র ধর্মী সব রচনা স্থান পেয়েছে। মরহুম মওলানার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরতে এর প্রয়োজন ছিল। একজন অনন্য নেতা ছাড়াও ব্যক্তি ভাসানীও কোনক্রমে কম আকর্ষণীয় ছিলেন না। এই একই কারণে মরহুমের উপর নিবেদিত দেশের খ্যাতনামা কবিদের বহু কবিতাও স্বাভাবিক-ভাবেই স্থান পেয়েছে। মোটের উপর বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গীতে মরহুম মওলানা সম্বন্ধে তাঁদের যেসব বক্তব্য, ধারণা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তা এ গ্রন্থে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

এত সবের পরেও আমরা বলব, এ গ্রন্থ মওলানা ভাসনীর উপর প্রয়োজনীয় গবেষণাকর্মের স্থান গ্রহণ করতে পারবে না। তবে মওলানা ভাসানীর উপর গবেষণাকর্ম চালানোর জন্য এ গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস এবং কিছুটা বিলম্বে হলেও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত এ গ্রন্থখানি দিনের আলো দেখতে পাচ্ছে দেখে আমরা রহমানুর রহীমের দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ — আবদুল গফুর
১২. ১. ৮৮ — প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা সতের

অবয়ব একত্রিশ

ব্যক্তি ভাসানী

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ঃ হাজী মোহাম্মদ দানেশ ১
মওলানা ভাসানী ও আসামের লাইন-প্রথা ঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৫
ভাসানী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ঃ মোহাম্মদ আজরফ ২২
বিচিত্র ভাসানী ঃ মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্ ৩৮
মওলানা আমাদের ঐতিহ্য ঃ মশিয়ুর রহমান ৪৬
আমার স্মৃতিতে মওলানা ভাসানীর হজ্জ ঃ বজলুছ ছাত্তার ৬০
সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা মওলানা ভাসানী ঃ ফয়েজ আহমদ ৬৬
অতৃপ্ত জননায়ক ঃ গোলাম সাক্‌লায়েন ৭৫
মওলানা ভাসানী ও আমি ঃ আবদুস্ সাত্তার ৮০
একটি আশ্রয় ঃ গাজীউল হক ৮৮
মজলুম জননেতার সাথে আড়াই ঘন্টা ঃ আলহাজ্জ শামস-উল হুদা ৯২
মহামিছিলের মহানায়ক ঃ জহিরুল হক ৯৬
স্মৃতির মিনারে মওলানা ভাসানী ঃ রফিকুল ইসলাম ১০১
স্মৃতির অলিন্দে মওলানা ভাসানী ঃ বেদূঈন সামাদ ১১০
মওলানা ভাসানীর ঈদ ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ১১৯
একজন খাঁটি বাঙালীর প্রতিবিম্ব ঃ ফয়জুর রহমান ১২৩
বিতর্কিত চরিত্র মওলানা ভাসানী ঃ কামাল লোহানী ১২৬
পুরুষোত্তম মওলানা ভাসানী ঃ ফজল-এ খোদা ১৩৮
ভাসানীকে যেমন দেখেছি ঃ রাজিয়া মজিদ ১৬১
মওলানাকে যেমন দেখেছি ঃ মওলানা আবদুল মতীন ১৬৫

www.pathagar.com

একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর : শরফউদ্দিন আহমদ ১৬৮
স্মৃতিতে মওলানা ভাসানী : মুহম্মদ কোরবান আলী ১৭৪
মওলানা ভাসানীকে যতটুকু মনে পড়ে : আবদুর রহমান ১৯৩
স্মৃতির পাতা খুলে : মাহমুদ আলী ১৯৭
মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে : শাহেদ আলী ২০২
আমাদের স্বাধীনতা : মওলানা ভাসানীর
কিছু টুকরো স্মৃতি : আবু সালেহ ২২১
গৃহবন্দী মওলানা তখন আট কোটি মানুষের হৃদয়ে : সৈয়দ জাফর ২৩৪
মওলানা ভাসানীকে যেমন দেখেছি : অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান ২৩৭
পাকিস্তানে মওলানা ভাসানীর শেষ সফর : সৈয়দ ইরফানুল বারী ২৪৮
অন্তিম শয্যায় মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎকার : ডা. নুরুল ইসলাম ২৭২
মওলানা ভাসানীর সংসার : মোহাম্মদ হোসেন ২৮০
ব্যক্তি ভাসানী : মুজিবর রহমান ২৮৬
স্মৃতিপটে মওলানা ভাসানী : আবু নছরত রহমতউল্লাহ ২৯২
মওলানা ভাসানী-সান্নিধ্যে একদিন : আবুল খায়ের আহমদ আলী ২৯৬
নির্ভীক নিঃস্বার্থ ভাসানী : কিছু স্মৃতি : লুৎফর রহমান জুলফিকার ৩০১
শতাব্দীর দর্পণ : ফকীর আলমগীর ৩০৪
মওলানা ভাসানী : আমার দাদু হুজুর : আবদুল খালেক সিদ্দিকী ৩১৩
মেহনতি মানুষের নেতা মওলানা ভাসানীর সাথে
একটি সাক্ষাৎকার : মুহম্মদ আবদুল খালেক ৩৩১
এক কিশোরের চোখে মওলানা ভাসানী : আহমাদ উল্লাহ ৩৩৭

নেতা ভাসানী

আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কাণ্ডারী
মওলানা ভাসানী : খোন্দকার আবদুল হামিদ ৩৩৩
মওলানা আবদুল হামিদ খানের
জীবন-দর্শন : অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৩৪৯
সমকালীন রাজনীতির অভিভাবক
মওলানা ভাসানী : আলহাজ্জ বজলুছ সাত্তার ৩৫৩
বাংলা-আসামের জননেতা : মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ৩৫৭
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী : এ. জেড. এম. শামসুল আলম ৩৬৫

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর নাম ঃ সংগ্রাম ঃ আখতার-উল আলম ৪৩৩
মওলানা ভাসানী এক মহান বিপ্লবী নেতা ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর ৪৪২
মওলানা ভাসানী ঃ কবর থেকে যিনি নেতৃত্ব দেবেন ঃ সানাউল্লাহ্ নূরী ৪৫৮
মওলানা ভাসানী ঃ মুহম্মদ আবু তালিব ৪৬৬
মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক
ভূমিকা ঃ ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৪৭৩
সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিক
মওলানা ভাসানী ঃ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মসউদ খান ৪৮১
অপরাজেয় মওলানা ভাসানী ঃ মওলানা আবদুল মতীন ৪৮৯
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঃ
শতাব্দীর নায়ক ঃ ফজলুর রহমান খাঁ ৪৯৫
মওলানা ভাসানী ঃ হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদ ঃ এস. মুজিবউল্লাহ্ ৫২৪
জীবিত ভাসানীর চেয়ে মৃত ভাসানী
অনেক শক্তিশালী ঃ আজাদ সুলতান ৫৩১
মওলানা ভাসানী ও শাহপুর কৃষক সম্মেলন ঃ আলাউদ্দিন আহমদ ৫৪৫
শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঃ সঈফ-উদ-দাহার ৫৫৭
মওলানা ভাসানী ও ছাত্র আন্দোলন ঃ রাশেদ খান মেনন ৫৬৬
কৃষক সংগঠন ও মওলানা ভাসানী ঃ সৈয়দ জাফর ৫৭২
মুকুটবিহীন সম্রাট মওলানা ভাসানী ঃ ফিরোজ আল-মুজাহিদ ৫৮১
মওলানা ভাসানীর রচনাবলী প্রসঙ্গে ঃ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ৫৯৪
বাঙালীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও
মওলানা ভাসানী ঃ মাহবুব আলমগীর ৬০৪
মওলানা ভাসানী ঃ একটি মূল্যায়ন ঃ মেসবাহ্ কামাল ৬১১
মওলানা ভাসানীর জীবন-দর্শন ঃ আবদুস শহীদ ৬১৭
শিক্ষা দর্শনে মওলানা ভাসানী ঃ মোহাম্মদ হোসেন ৬৬২
ভাসানীর ঐতিহাসিক 'আস্‌সালামু
আলাইকুম' ঃ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম ৬৩৭
মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম ঃ শাহরিয়ার কবির ৬৪১
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রসঙ্গে ঃ আবদুল মতিন ৬৪৬

www.pathagar.com

ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা
মওলানা ভাসানী ঃ নূরুল ইসলাম উয়ায়সী ৬৫৫
হুকুমাতে রাব্বানিয়ার স্বাপ্নিক ঃ মওলানা ভাসানী ঃ নূরুল আলম রইসী ৬৬০
হুকুমাতে রব্বানী ও মওলানা ভাসানী ঃ নজরুল হক ৬৬৪
রাজনীতিবিদ-ধর্ম প্রচারক-শিক্ষাবিদ-সংবাদপত্রসেবী
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঃ বদি-উজ-জামান ৬৭১
মওলানা ভাসানী ও উপমহাদেশের
আজাদী আন্দোলন ঃ শেখ আবদুল মতিন ৬৭৫
আমাদের জাতীয় চেতনা উন্মেষে
মওলানা ভাসানী ঃ এস. এম. আবদুল জব্বার ৬৮৭
ভাসানী-রাজনীতির পটভূমি ঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী ৬৯৩
নিপীড়িত মানবতার মুক্তি সংগ্রামে
মওলানা ভাসানী ঃ মুহাম্মদ মুসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার ৬৯৯
মানবতাবাদী মওলানা ভাসানী ঃ মুহম্মদ আয়েশ ইউসুফ ৭০৯
নিপীড়িত মানবতার মুক্তিদূত
মওলানা ভাসানী ঃ অধ্যক্ষা বেগম মাজেদা আলী ৭১৫
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ও
মওলানা ভাসানী ঃ মওলানা খালেদ সায়ফুল্লাহ্ ৭২০
জাতির চৈতন্যে অমর মহানায়ক ঃ শেখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ৭৩৬
রূপকথার রাজপুত্র মওলানা ভাসানী ঃ শরীফুল ইসলাম আলমাজী ৭৪০
মওলানা ভাসানী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এম. এন. সালামত উল্লাহ ৭৪৪
মওলানা ভাসানী ঃ হাফিজা বেগম ৭৪৮
মওলানা ভাসানী (র.) ঃ আফিয়া আক্তার খানম ৭৫৬
মওলানা ভাসানী ও ইমাম হাসানুল
বান্না ঃ মুফতী সৈয়দ মোস্তফা কামাল এশিয়া ৭৬০
মওলানা ভাসানী ঃ একটি ইন্সটিটিউশন ঃ খালেদুর রহমান টিটো ৭৬৩
মওলানা ভাসানীর জীবনের শেষে
পাঁচ বছর ঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ৭৬৫
মওলানা ভাসানীর স্বপ্ন ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মুকুল চৌধুরী ৮০০

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলার প্রথম রূপকার—
মওলানা ভাসানী ঃ মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান ৮১৩
ক্ষণজন্মা প্রবাদপুরুষ মওলানা ভাসানী ঃ উলফত রানা ৮১৮
ভাসানী-চরিত্রে নবী জীবনের
প্রভাব ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ৮২৫
আলোর সন্ধানে মওলানা ভাসানী ঃ ডা. (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত ৮৩৩
স্বাধীনতার স্থপতি ও আপোষহীন বিপ্লবী
মওলানা ভাসানী ঃ হাজী মোহাম্মদ রশিদুল আলম ৮৪৬
শতাব্দীর সূর্য-সৈনিক
মওলানা ভাসানী ঃ এস. এম. শাহজাহান তালুকদার ৮৫২

মওলানা ভাসানীর উদ্দেশে নিবেদিত

কবিতা ও গান

দেশবন্ধু ভাসানীর নামে ঃ আশরাফ সিদ্দিকী ৮৬৩
মওলানা ভাসানী ঃ আবদুস সাত্তার ৮৬৪
সফেদ পাঞ্জাবী ঃ শামসুর রাহমান ৮৬৪
ভাসানী ঃ হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি ঃ আল মাহমুদ ৮৬৫
মওলানা ভাসানী ঃ ফজল শাহাবুদ্দীন ৮৬৬
আমাদের মিলিত সংগ্রাম ঃ
মৌলানা ভাসানীর নাম ঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী ৮৬৭
বার বার মরে মরে বাঁচি ঃ জাহানারা আরজু ৮৭০
মওলানা ভাসানী ঃ স্মৃতি বহমান ঃ দিলওয়ার ৮৭১
আর একজন মওলানা চাই ঃ ফারুক মাহমুদ ৮৭২
মৌলানা ভাসানী ঃ ফজল-এ খোদা ৮৭৪
আরেক গিফারী তুমি ঃ আফজাল চৌধুরী ৮৭৪
মওলানা ভাসানী ঃ শামসুল ইসলাম ৮৭৮
অনল পুষ্পঝরা ঃ সৈয়দ শামসুল হুদা ৮৭৮
ভাসানীর হুঁশিয়ারি সংকেত ঃ কে জি মোস্তফা ৮৭৯
ভাসানী এক জীবন্ত নাম ঃ আবুল হোসেন মিয়া ৮৮০
ছড়া ঃ আবু সালেহ ৮৮১

www.pathagar.com

নিদ্রিত বিসুভিয়স ঃ শেখ ফজলুর রহমান	৮৮১
একজন মানুষ ছিলেন ঃ হাসান আবদুল কাইয়ূম	৮৮৪
ভাসানী ঃ মুশাররাফ করিম	৮৮৫
কোথায় ভাসানী ঃ মুহম্মদ রূহুল আমীন খান	৮৮৭
শতাব্দীর ছুটন্ত অশ্বারোহী ঃ রশীদ খান গজনবী	৮৮৮
যেমন দেখেছি তাঁকে ঃ ফজলুল কাদির	৮৮৯
প্রথম পারাবত ঃ মসউদ-উশ-শহীদ	৮৯০
মৃত্তিকার ঋণ ঃ হাসান হাফিজ	৮৯১
মওলানা ভাসানী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ঃ শাহাদাত বুলবুল	৮৯২
চর ভাসানের মওলানা নেই ঃ বুলবুল খান মাহবুব	৮৯৩
একজন ভাসানী ঃ শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ	৮৯৫
বিনম্র শ্রদ্ধায় সেই নাম ঃ কাজী সালাহউদ্দীন	৮৯৬
অতিক্রম ঃ জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ	৮৯৭
এক. 'ওরা কেউ আসেনি'	৮৯৭
দুই. মওলানা ভাসানীর সাথে সারারাত ঃ মুকুল চৌধুরী	৮৯৮
কে সেই মানুষ ঃ রেজাউদ্দীন স্টালিন	৮৯৯
ভাসানীর জন্যে এক গুচ্ছ ছড়া ঃ খালেক বিন জয়েনউদ্দীন	৯০০
প্রেমের মুয়ায্‌যিন ঃ গাজী রফিক	৯০১
বয়েসী তরুণ ঃ লুৎফর রহমান রিটন	৯০২
সূর্যোদয় যখন আযান ঃ তাহ্‌মীদুল ইসলাম	৯০৩
ভাসানীকে নিবেদিত এক গুচ্ছ ছড়া ঃ শামসুল হক দিশারী	৯০৪
বীর ভাসানী ঃ ফারুক নওয়াজ	৯০৫
মওলানার জন্যে ঃ মোস্তফা কামাল	৯০৫
ভাসানীর কণ্ঠস্বর ঃ জহীর হায়দার	৯০৭
মওলানা ভাসানী ঃ সৈয়দ আজিজুল হক	৯০৭
মওলানা ভাসানী ঃ আহামদ জসীম উদ্দীন	৯০৯
হে মহান মওলানা—তুমিহীন ঃ ইয়াসির ইয়ামীন	৯০৯
মুখোমুখি ঃ শাকিল কালাম	৯১২
শুভ্র আস্তিনের দোলা ঃ আহমেদ ফারুক হাসান	৯১২
সচিত্র সংগ্রাম ঃ ফজল মোবারক	৯১৩
নাম হলো তাঁর ভাসানী ঃ নেছারউদ্দীন আহমদ	৯১৫

www.pathagar.com

ভাসানী ঃ গোলাম সারওয়ার	৯১৫
মওলানার খোঁজে ঃ পাবলো সাহী	৯১৬
একটি নাম ঃ সবিতা নূর বেলী	৯১৭
মওলানা ভাসানী ঃ এনায়েত রসুল	৯১৮
সাক্ষী সারা বাংলাদেশ ঃ খৈয়াম ওমর	৯১৮
এক জ্বলন্ত ইতিহাস ঃ শাহজাহান তালুকদার	৯২১
দৃশ্যান্তরের ইতিহাস ঃ মোশাররফ হোসেন খান	৯২১
ফকীর আলমগীরের গান	৯২৩
মওলানা ভাসানীর অভিভাষণ	৯২৭
লেখক পরিচিতি	৯৫৭

www.pathagar.com

আমি মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি, আদর্শবোধ-বর্জিত শ্লোগানধর্মী ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে না। গভীর আদর্শবোধসম্পন্ন দৃঢ় চরিত্রবান এবং আপোষহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ সুগম করিতে পারেন। চরিত্র গড়িয়া উঠে আদর্শ চেতনা ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে। একমাত্র আদর্শ-ভিত্তিক সংগঠন ও কর্মসূচীর মাধ্যমেই চরিত্রবান নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি হইতে পারে। মুহূর্তের উত্তেজনায় মানুষ চরম আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে হয়ত, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, ধনদৌলত হাতের মুঠায় পাইয়া তাহারাই শুধু ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার পথে অটল থাকিতে পারিবে যাহারা সঠিক আদর্শবোধ ও উহার দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যম মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারিয়াছে।

—মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

এক.

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মজলুম জননেতা নামেই সমধিক পরিচিত। মওলানা ভাসানীর উপর এ পর্যন্ত প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং হতেই থাকবে। তাঁর জীবন ও কর্মের উপর ছোট-বড় বেশ ক'টি বই ইতোমধ্যে বের হয়েছে। তাঁর জীবিতকালেও কয়েকটি বই বের হয়। প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মওলানা ভাসানীর জীবন-ইতিহাস এতো দীর্ঘ, এতো কর্মবহুল এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র এতো বিস্তীর্ণ ও বিশাল যে, তাঁর উপর যতোই লেখা হবে, তিনি যতোই আলোচিত হবেন, ততই তিনি হয়ে উঠবেন এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব, হয়ে উঠবেন এক অতুলনীয় রহস্যপুরুষ। তাঁকে পাওয়া যাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের একান্ত নিকটে, সর্বহারা মজলুম জনতার কাতারে, অধিকার আদায়ের মিছিলের পুরোভাগে।

মওলানা ভাসানী এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব যে, তাঁর জীবন-ইতিহাস দশ ভলিয়্যুম গ্রন্থে এবং প্রতি ভলিয়্যুম এক হাজার পৃষ্ঠা রাখলেও তাঁর কথা ফুরোবে না, মনে হবে 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। এই বিশাল চরিত্রের মানুষকে নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থনা ও সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত করার জন্য শুরুতেই আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় আমাদের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক, আমার শ্রদ্ধেয় 'গফুর ভাই',—ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুরকে।

দুই.

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহল থেকে তাৎক্ষণিক-ভাবে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, বিতর্কের বান ছুটেছে। কিন্তু সময়ের গতি পরিবর্তনে তিনি হয়ে উঠেছেন সমালোচনার উর্ধ্বে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, হয়ে উঠেছেন জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। মূলত মওলানা ভাসানী ছিলেন উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রবহমানতায় এক ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষ সত্তা। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উৎস ছিলো বঞ্চিত জনগণ, খেটে খাওয়া মানুষ আর সর্বহারার দল।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক বনেদি খাঁ পরিবারে। হাজী শরাফত আলী খানের চার সন্তানের অন্যতম সন্তান আবদুল হামিদ খান ওরফে চেগা মিয়া। শৈশবেই পিতৃমাতৃহারা ইয়াতীম বালক আবদুল হামিদ

www.pathagar.com

জীবনকে অবলোকন করেছিলেন দারিদ্র্যের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে অতি নিকট থেকে। সাধারণ মানুষের কাতারে মিশে তিনি অনুভব করেছিলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের করুণ হাল। উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতের ক্রন্দনরোল তাঁকে বিহ্বল করে দিয়েছিল। সমাজের মুক্তির পথ নিয়ে হয়তো তখন তাঁর ভাববার বয়স হয় নি, তবুও হয়তো আলো-আঁধারি এ সমাজের অবক্ষয়জনিত অবয়ব তাঁর সেই কচি অন্তরে শেকড় গেড়ে বসেছিল। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁকে যেতে দেখা যায় পীরের দরবারে। তিনি চলে আসেন মোমেনশাহীর কল্লা গ্রামে পীর সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বাগদাদীর খানকায়। এখান থেকেই তাঁর জীবন সফর শুরু হয় বেগবান ঝড়ের মতো দুর্বার গতিতে। সময়ের ধরাবাঁধা নিয়ম তাঁকে আটকাতে পারে না। 'ইলমে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক বিদ্যায় একটি অনুশীলন অধ্যায় রয়েছে যাকে বলা হয় ইত্তেহাদী ফয়েজ। এ ফয়েজ যদি কোনো শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনি হন এক অপূর্ব শক্তির অধিকারী। জানি না মওলানা ভাসানী সেই ফয়েজ লাভ করেছিলেন কি না। তবে এটা লক্ষণীয় যে, তাঁর সুদীর্ঘ জীবন এক লৌহমানবের জীবন-ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে রাজনীতির ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এ দেশের আলেম সমাজের একটি অংশ আপন পরিমণ্ডলের আওতায় রাজনীতির অংগনে যে একটি বৈপ্লবিক ধারার সৃষ্টি করেছিলেন তারই আধুনিক সংস্করণ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বৃটিশ-ভারতে ইংরেজ খেদা আন্দোলন, লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলন, আযাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, ২১ দফা তথা স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন, ফারাক্কা মিছিল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাংলা খুতবা ও হক কথা প্রকাশ, খোদায়ী খিদমতগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আন্দোলনমুখর পর্যায়গুলো নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যাবে মওলানা ভাসানী ছিলেন তাঁর পূর্বসূরী আলেম সমাজের যোগ্যতম উত্তরসূরী। তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল রাজনৈতিক সম্মেলনের পাশাপাশি ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করা, জাতির এক দুঃসহ দিনে 'সাপ্তাহিক হক কথা' প্রকাশ করে জাতীয় চেতনাকে গতিবান রাখা।

এক সময় ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন তিনি। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের আযাদী আন্দোলন বা সিপাহী বিপ্লবের সাথে জড়িত ছিলেন এমন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আলেমের প্রচেষ্টায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনাকে উজ্জীবিত এবং সাম্রাজ্য-বাদ, উপনিবেশবাদ ও অনৈসলামী মতাদর্শের বিরুদ্ধে জাতিকে সুসংহত করার সুমহান উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত দেওবন্দ শহরে। এই মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র ছিলেন মাহমুদুল হাসান, যিনি পরবর্তীকালে শায়খুল হিন্দ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহাসিক 'রেশমী রুমাল' আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে মওলানা ভাসানী যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলেন তার প্রতিফলন আমরা তাঁর সারা জীবনের রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে দেখি।

www.pathagar.com

[উনিশ]

পুরো যৌবনে তিনি দেখেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছত্রছায়ায় এ দেশের জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও নিপীড়ন। দেখেছেন বৃটিশের উপনিবেশবাদী চেহারা। এ সবের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। এক সময় যোগ দিলেন অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে। তাঁর নেতৃত্বে মোমেনশাহী ও পাবনা এলাকায় জমিদার ও মহাজনবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বৃটিশ সরকারের দমননীতির শিকার হলেন। বাধ্য হয়ে চলে গেলেন আসামের ঘাগমারী জংগলে। তাঁর অনুসারীরা দলে দলে যেয়ে এই জংগল পরিষ্কার করে গড়ে তুললো সেখানে এক নতুন জনপদ। তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা প্রভৃতি। তিনি ধুবরী এলাকার ভাসান চরেও প্রতিষ্ঠিত করলেন মাদ্রাসা।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকাকালে মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মুহম্মদ আলী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ওলামায়ে কেরামের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে মওলানা আজাদ সোবহানীর কাছে তিনি রব্বানী দর্শনে দীক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ্‌তা'আলার রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করে যাবেন—এ ওয়াদাও তিনি একদিন করেন মওলানা আজাদ সোবহানীর হাতে হাত রেখে। এ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন ঃ

> সে ১৯৪৬ সালের কথা। রাত তখন বারোটা। বিপ্লবী দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানী ধুবরীর একটি ঘরে বসিয়া...। আল্লামা বলিলেন, তবে আজ ওয়াদা কর তুমি রাজনৈতিক জীবনে যত কলা-কৌশলই নাও না কেন, মূলত হুকুমতে রাব্বানিয়া কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম করিয়া যাইবা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল ১৯৩৫ সালে আমরুহাতে ১৭ জন রাজনীতিবিদের সিদ্ধান্তের কথা। মনে পড়িল মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি প্রমুখের সাথে আমার যোগাযোগ ও ওয়াদার কথা। আমার মনে পড়িল খিলাফত আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ও মওলানা মুহম্মদ আলীর সাহচর্যের কথা। আমি দেখিলাম যৌবনের উচ্ছ্বাস শেষে যে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম আজ প্রৌঢ় জীবনে সেই দাওয়াতই আসিয়াছে। মওলানা আজাদ সোবহানীর হাতের উপর আমার হাত ছিল। আমি বলিলাম, হাঁ, ওয়াদা করিলাম, রাজনীতিতে যা কিছু করি হুকুমতে রব্বানিয়া হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইব না।
>
> দীর্ঘ ২৭টি বছর কাটিয়া গিয়াছে। আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে চাই না কিভাবে আমি ধাপে ধাপে হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের পথে চলিয়া আসিয়াছি। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ভাষ্যকার যদি আবিষ্কার করিতে পারেন তবে দেখিবেন ১৯২১ সাল হইতে আমি এই পথ ধরিয়াছি। কখনো কোথাও আমি কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি। আজ আমি পরিষ্কার ভঙ্গিমায় শুরু করিয়াছি হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের প্রস্তুতি। ...হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) বলিয়াছেন, যদি কোথাও আজান দ্বারা মানুষকে নামাজের দিকে না আনা যায় তবে ঢোলসহরতই বাজাও।...শ্রেণীহীন সমাজের কথা ভাবিতে গিয়া মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও হিংস্র হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস একমাত্র রবুবিয়তের দর্শনই জাতি-ধর্ম-মতবাদ নির্বিশেষে শান্তি দিতে পারে। সবারই লক্ষ্য যদি স্রষ্টা হয়

www.pathagar.com

> সকল সমস্যা সমাধানকল্পে যদি স্রষ্টার নিয়ম প্রবর্তিত হয় তবে হানাহানির অবকাশ কোথায়? স্রষ্টার নিকট তো সবাই সমান। তিনি একই বিধানে সকলের নিকট দাতা, দয়াময়, প্রেরণা দানকারী—এক কথায় সকল চেতনার উৎস।...
>
> হুকুমতে রব্বানিয়ার মূল কথা—আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন।...

তাই মওলানা ভাসানীর প্রায় ৭৫ বছর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাবো তিনি মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত রবুবিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। রব্বানি সমাজ গঠনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। রবুবিয়তের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে মওলানা ভাসানী বলেছেন ঃ

> আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন, আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ ইহা জানে না। (সূরা দুখান)।
>
> পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'আলা সৃষ্টির যথার্থতা সম্পর্কে বলিয়াছেন কোন কিছুই তামাশা কিংবা খামখেয়ালীর বশে সৃষ্টি করা হয় নাই। তাই কোন কিছুর সৃষ্টিই অহেতুক নহে। সকল সৃষ্টির অন্তরালে সামগ্রিক এবং বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট অর্থ রহিয়াছে। এই আল্লাহ্‌র 'রব' গুণে গুণান্বিত হইয়া শুধু সৃষ্টিই করিয়া যাইতেছেন না, সব কিছুকেই বিশেষ উদ্দেশ্যে লালন-পালন করিতেছেন। স্রষ্টার এই পালনবাদের আদর্শই হইল রবুবিয়ত।
>
> —(দ্র. ফিরোজ আল-মুজাহিদ, মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন)।

রবুবিয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলত তাঁর আন্দোলন বিভিন্নমুখী রূপ গ্রহণ করেছে। গতির নানা বৈচিত্র্যে তাঁর আন্দোলনগুলোতে এসেছে সত্যিকার প্রাণের জোয়ার। যে জোয়ারে সমাজ মানসে তিনি হয়ে উঠেছেন আন্দোলনের মহান নেতা, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের মনের মানুষ। তাঁর মুখে শ্লোগান উঠেছে ঃ কেউ খাবে আর কেউ খাবে না—তা হবে না, তা হবে না। তাঁর কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে ওঠে ঃ আমি শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তুলবো। কৃষক, মজুর, জেলে, জোলা, কামার, কুমার, মেহনতি মানুষ নিয়ে আমি শ্রেণী-সংগ্রাম শুরু করবো, প্রত্যক্ষ বিপ্লবের মাধ্যমে আমি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবো।

আর এই কারণেই তাঁকে রাজনৈতিক দীর্ঘ জীবনের এক পর্যায় এসে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও নির্বাচনের রাজনীতির বিরোধিতা করতে দেখা যায়। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজের অবক্ষয়জনিত অবস্থার মূল কারণ হলো সমাজে শিক্ষার অভাব। তাই তিনি সন্তোষে গড়ে তোলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বাস্তবমুখী বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্‌র জমীনে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব কায়েম করার আন্দোলনে আত্মনিবেদিত কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে।

www.pathagar.com

তিনি চেয়েছিলেন এই শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা হবে সত্যিকার বিপ্লবী। তিনি 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক নিবন্ধে বলেছেন ঃ

> ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি কাজ হবে। একটি পড়াশুনা আর একটি শিক্ষা-দীক্ষা। ...পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা দুনিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিছে পড়িয়া থাকিবে না। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় পড়াশুনার সুযোগ থাকিবে। তবে বিশেষ করিয়া ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্বের পাঠ্য বিষয় বাছাইয়ের ব্যাপারে এমন একটি মাপকাঠি ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকিবে যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা মানবতার কল্যাণকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, এইসবে এমন উপাদান রহিয়াছে যাহা প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে বিপ্লবী তৎসঙ্গে সহনশীল, ন্যায়-পরায়ণ, সত্যবাদী, দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী করিয়া তুলিতে পারে।...

ইন্তিকালের ৪ দিন পূর্বে ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর শনিবার তিনি সন্তোষে তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন ঃ

> অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার শোষণ জুলুমের সহায়ক। অজ্ঞতাই বিভেদ মানসিকতার জন্ম দেয়। জ্ঞানের অভাবই মানুষে মানুষে বৈরিতা ও হিংসার উৎস। দিকে দিকে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। চিন্তা ও কর্মে উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। 'সেবাই পরম ধর্ম'—এই নীতিবাক্য অনুশীলন করিয়া দেখাইতে হইবে। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পালনবাদী মনোবিপ্লব। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে পালনবাদী জীবন দর্শনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সুশিক্ষিত চরিত্রবান ও জেহাদী চেতনাসম্পন্ন কর্মী তৈয়ার করার লক্ষ্যেই আমি এই ইতিহাসবিশ্রুত খোশনদপুরে (সন্তোষ) হযরত পীর শাহজামান কাশ্মীরী (র.)-র মিশনের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়াছি। ...রবুবিয়তের পথই অর্থাৎ সার্বজনীন মানবাধিকার ও সামগ্রিক কল্যাণের পথই সাফল্য ও শান্তির পথ।

জীবনের শেষ ভাষণে তিনি আরও বলেছিলেন ঃ

> ...আল্লাহর সৃষ্টি সকলেই পরস্পর ভাই ভাই। এই ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি করতে পারলেই দুনিয়াতে শান্তি আসবে। শুধু গল্পগুজবের ভিতর দিয়া জাতিসংঘে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া শান্তি আনা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী, কুরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা অনুযায়ী সারাবিশ্বের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব স্থায়ীভাবে গঠন করাই হবে শান্তি আনয়নের একমাত্র উপায়।

আজীবন মহান সংগ্রামী নেতা মওলানা ভাসানী যেমন আন্দোলনের মহান নায়ক ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী মানুষ। আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি গড়ে তুলেছেন অনেকগুলো আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসাম, টাঙ্গাইল, পাঁচবিবিসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি স্থানে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ছিলেন একটি সুখী সুন্দর বৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের জন্য নিঃস্বার্থ প্রাণ এক মহৎ ব্যক্তিত্ব। সমাজের গভীরে প্রজ্বলিত দারিদ্র্য আর ক্ষুধার আগুন দিয়ে তিনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন শোষণের সকল উৎস ও কর্মকাণ্ডকে। জনতার কাতারে তাই তিনি ছিলেন এক মুকুটবিহীন সম্রাট।

মওলানা ভাসানী ইসলামের সেই বিপ্লবী ধারায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন, যে ধারায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন খুলাফায়ে রাশিদীন এবং পরবর্তী যামানায় হক্কানী আলেম ও পীর-দরবেশগণ। ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.), হযরত খাজা গরীবে নওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.), হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.), হযরত শাহ জালাল মুজাররদ (র.), শহীদ তিতুমীর (র.), হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.), মুজাদ্দিদ-ই যামান হযরত মওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-সহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের আত্মিক প্রেরণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে এবং শোষকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। তিনি মনে করতেন ধর্ম হচ্ছে মানুষের ইহলৌকিক, পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি ইসলামকে একটি সার্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বমানব কল্যাণে ইসলামকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হিসেবে মনে করতেন।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পীর নাসিরুদ্দীনের কাছ থেকে তিনি যে 'ইলমে তাসাওউফের পাঠ নিয়েছিলেন, ইত্তেহাদী ফয়েজে বলীয়ান হয়েছিলেন, দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে যে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এবং মওলানা আজাদ সোবহানীর হাতে রব্বানী দর্শনের দীক্ষা নিয়েছিলেন—তারই ফলশ্রুতিতে তিনি এক অসাধারণ বিপ্লবী নেতায় পরিণত হন। প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবু যর গিফারী (রা.) কর্তৃক ব্যাখ্যাত ইসলামের শাশ্বত অর্থনৈতিক দর্শন তাঁকে শোষণহীন সমাজ, সাম্যের সমাজ এবং কলুষমুক্ত সুখের সমাজ গড়ে তোলার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর কর্মবহুল ৯৬ বছর স্থায়ী জীবনের সূচনা হয়েছিলো গৃহত্যাগ করা থেকে আর তার সমাপ্তি ঘটে খোদআয়ী খিদমতগার বা স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের মাধ্যমে। 'হক্কুল্লাহ্' ও 'হক্কুল ইবাদ'—ইসলামের এই দু'টি মহান অনুশাসন তিনি ব্যক্তি জীবনে নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তাঁর আন্দোলনে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের এমন নিবিড় সমন্বয় ঘটেছিলো যে, ধর্মপ্রাণ মুসল-মানরা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন হক্কানী পীর হিসেবে, কম্যুনিস্টরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ড. সানিয়েৎ সেনকে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন মজলুম জননেতা এবং প্রিয় হুযুর, বিদেশী সাংবাদিকের কাছে 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স', 'রেড মওলানা অব দ্য ইস্ট'। কবিকণ্ঠে 'আমাদের মিলিত সংগ্রাম' আর প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর কাছে তিনি মূর্ত হয়ে ওঠেন এভাবেঃ ভাসানীর মওলানা সাহেবের কাজ-কর্ম দেখে মনে হয়েছে লোকটি বাংলার কালবৈশাখী। প্রচণ্ড তাঁর শক্তি ততোধিক তাঁর বেগ। যে দিকে চলেন তাঁর দাপটে আধমরা ডাল ভাঙে, জরাজীর্ণ গাছ উপড়ে যায়, বাসি পাতা খসে হাওয়ায় ওড়ে, বুতো ঘর ভূমিসাৎ হয়। তারপর কালবৈশাখী কোথাও চলে যায়। নতুন ঘর তোলার দায়িত্ব অন্য লোকের, নতুন চারা লাগানোর ভার অন্য মালীর, নতুন পাতা পল্লব জাগিয়ে তোলার কর্তব্য নব বসন্তের।

www.pathagar.com

তিন.

মূলত ১৯৪৭-উত্তর আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি হচ্ছেন মওলানা ভাসানী। আমরা জানি, পাকিস্তান নামক দেশটির একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান উপনিবেশে পরিণত হয়ে যায়। তার প্রথম লক্ষণই দৃষ্ট হয় ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ১৯৪৮ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এই ঘোষণায় এ দেশের মানুষ বুঝে ফেলে পাকিস্তানের মতলব। ইতোপূর্বে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার ১৬ দিন পর ঢাকার প্রগতিশীল মুসলিম তরুণরা গড়ে তোলেন তমুদ্দুন মজলিস। এই মজলিস বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রথম দাবি তুলতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার ফলে এ দেশের মানুষ নবতর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ খুঁজতে থাকে। মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এনে দেন। ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। শহীদের খুনে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শহীদানের রক্ত সামনে রেখে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দলের ভরাডুবি হলেও কৌশলের আবর্তে ফেলে ৯২ (ক) ধারার মাধ্যমে তা বানচাল করা হয়। অতঃপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আসে ১৯৫৭-এর কাগমারী সম্মেলন। সম্মেলনের আয়োজন করেন মওলানা ভাসানী। ১৯৫৭ সালের ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ শরীক হন। মওলানার বিশেষ প্রয়াসে ইতোমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। তিনিও এসেছেন। মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনের বিরাট সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি তোলেন। মওলানা ভাসানী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ এমন এক সময় আসতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা না হলে পূর্ব পাকিস্তানিগণ 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলতে বাধ্য হবে।

মওলানা ভাসানীর এই উচ্চারণ সেদিন উপস্থিত সকলের অন্তরে নবতর জীবনী শক্তির সঞ্চার করেছিলো। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও বোধ করি বুঝেছিলেন মওলানা 'আস্‌সালামু আলায়-কুম' উচ্চারণের মাধ্যমে পূর্বে পাকিস্তানের স্বাধীনতাই বুঝাতে চেয়েছেন। আর বুঝেছিলেন বলেই তিনি মওলানার বক্তব্যের বিরুদ্ধে সেই মঞ্চেই তাঁর ভাষণে বলেছিলেনঃ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা সুস্পষ্ট। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন শতকরা ৯৮ ভাগই শাসনতন্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী সেদিন মওলানা ভাসানীর 'আসসালামু আলায়কুম' ঘোষণার তীব্র নিন্দাও করেছিলেন। (দ্র. দৈনিক আজাদ, শুক্রবার ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)। কিন্তু মওলানা ভাসানী তাঁর কথার হেরফের করেন নি। স্বাধীনতার অগ্রদূত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপোষ

www.pathagar.com

করেন নি সেদিন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকায় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের এক সম্মেলনে তিনি গঠন করলেন ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)।

মওলানা ভাসানী এগিয়ে চলেন এমনিভাবে স্বাধীনতার বীজ বুনতে বুনতে। বাধা অনেক। কিন্তু মওলানা নির্ভীক। বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই ; সে লড়াইয়ে জিততে হবে—এই চেতনার বীজ তিনি প্রগতিশীল ছাত্র-যুবকদের অন্তরে প্রোথিত করেন। সারা ৬০ দশক ধরে সেই চেতনা ক্রমান্বয়ে মহীরুহে পরিণত হতে থাকে। মওলানার অনুসারী ছাত্র-যুবকদের কণ্ঠে জোরদার হয়ে ওঠে ঃ কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, পূর্ববাংলা স্বাধীন কর। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর। এমনিভাবে আসে উনসত্তরের মহাগণঅভ্যুত্থান। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের শোষণ, বঞ্চনা এবং হত্যার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী এক বিপ্লবী মোর্চার সৃষ্টি করেন। ১৯৬৮ সালে ৮ ডিসেম্বর বায়তুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে গায়েবানা জানাযার মাধ্যমে তিনি '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করলেন। জেগে উঠলো বাংলা। 'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো' শ্লোগান নিয়ে জেগে উঠলো বাংলা। সেই আন্দোলনের তোড়ে আইয়ুব খানের অবসান ঘটলো। এলেন আরেক স্বৈরাচারী, নাম তাঁর ইয়াহিয়া খান। দিলেন নির্বাচন '৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখে। মওলানা ভাসানী বুঝলেন এর ভেতরে ওঁদের কুমতলব আছে। ইতোমধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন ১৯৭০-এর ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূল এলাকার মারাত্মক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন লক্ষ লক্ষ মৃত লাশের উপর দিয়ে যেন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। মওলানাই দৌড়িয়ে গেলেন অসুস্থ শরীরে উপদ্রুত এলাকায় দুঃস্থ মানুষের পাশে। ফিরে এলেন। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দুর্জেয় সিংহের কণ্ঠে "ওরা কেউ আসে নি।" নির্বাচন করলেন বর্জন। ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার তিনি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বললেন ঃ এটা সাত কোটি বাঙালীর হায়াত-মউতের লড়াই। ১৪ লক্ষ লোক ঝড়ে মরেছে। দরকার হয় আরও ১৪ লক্ষ মরবো, তবু আল্লাহ্‌কে হাজির নাজির জেনে বলছি, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবো, স্বাধীন করবো।

মাথায় লাল পট্টি বাঁধা হাজার হাজার তরুণদের স্বাধীন 'পূর্ব বাংলা কায়েম কর, কায়েম কর' শ্লোগানে সারা পল্টন মুখরিত হয়ে ওঠে। মওলানা ঘোষণা করেন ঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান অর্জিত হলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এটা পাকিস্তান প্রস্তাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন ঃ পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে।

তিনি আরো বলেন ঃ পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার দাবি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়—এ দাবির পিছনে আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকা তথা বিশ্বের তিন শত কোটি মানুষের সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন ঃ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আমাদের দাবি বানচাল করা যাবে না। (দ্র. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০)।

মওলানা ভাসানীর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর পরই সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবুও দেখা যায় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী নয় পাকিস্তান

www.pathagar.com

সরকার। চলতে থাকে তালবাহানা, দর কষাকষি। এদিকে স্বাধীনতার স্থপতি মওলানা তাঁর স্বাধীনতার বাণী নিয়ে সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে জনসভা করে এ দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারী শনিবার সন্তোষের আসাদনগরে নির্মীয়মান ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরবার হলে সর্বদলীয় জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মওলানা ভাসানী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ যে পদ্ধতিতে পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, এই দেশ থেকে বৃটিশ বণিকরা বিতাড়িত হয়েছে, জমিদারের উৎখাত সাধিত হয়েছে, সেই পদ্ধতিতেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কায়েম হবে।

১৯৭১ সালের ৯ মার্চ তিনি পল্টনের এক বিশাল জনসভায় বললেনঃ আজ হতে ১৩ বছর পূর্বে কাগমারী সম্মেলনে আমি বাংলার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আস্সালামু আলায়কুম' জানিয়েছিলাম। আজ ১৩ বছর পর বাংলার মানুষ আমার কথা কবুল করেছে তাদের আমি মুবারকবাদ জানাই। আমি গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নই। ইসলাম আমাকে সেই শিক্ষা দেয়নি। আঘাত আসলে তার সমুচিত পাল্টা আঘাত হানতে হবে।

তিনি তাঁর ভাষণে বাংলার স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্য-বদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সাত কোটি বাঙালীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। এই সঙ্গে তিনি জাতিকে চরিত্রবান ও ঈমানদার হতে পরামর্শ দেন।

এর .পরও মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন সংগ্রামী আহ্বান জানাতে থাকেন। আসে ২৫ মার্চের কালো রাত। বাংলার মুক্তি সংগ্রামের আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। মওলানাও এক পর্যায়ে ভারত চলে যান। সেখানেও তিনি হন সর্বদলীয় মুক্তি যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি। সে আর এক ইতিহাস। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা সূর্য সমুজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মওলানা ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর ২২ তারিখে। ২৩ তারিখে হানাদার বাহিনী কর্তৃক আগুনে পুড়িয়ে দেয়া তাঁর কুঁড়ে ঘরটির ভিটের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ান।

পোড়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে হয়তো তিনি ভাবছিলেন এখানে নতুন ঘর তুলতে হবে। আবাসযোগ্য করতে হবে এই দেশ এই মাটিকে। নতুন উদ্যমে আবার মওলানা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেনঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়। এ স্বাধীনতা এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অর্জিত স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্বও এ দেশের মানুষেরই।

১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল রবিবার পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা কারো গোলামী স্বীকার করবো না।' এটিই ছিলো তাঁর স্বাধীনতাউত্তর প্রথম জনসভা। তারপর বহু জনসভা করেছেন। স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন, ফারাক্কার ঐতিহাসিক মিছিল করেছেন। এমনিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে বীজ তিনি একদিন বপন করেছিলেন ১৯৭১-এর ৯ মাস যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আসে, সেই স্বাধীনতা বৃক্ষটিকে যথাযথ পরিচর্যার জন্যও তিনি সংঘবদ্ধ

www.pathagar.com

আন্দোলনের জোয়ার এনে দেন। তারপর একদিন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। চিরনিদ্রার কোলে শায়িত হন। সেদিন ছিলো নভেম্বর ১৭ তারিখ ১৯৭৬ সাল।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শুয়ে আছেন সন্তোষে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিটি আন্দোলনে মওলানা ভাসানী জীবনের ওপার থেকে যেনো নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। জীবন চেতনার ঔজ্জ্বল্যে তাঁর নেতৃত্ব আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনে বার বার অনুভূত হচ্ছে, হতে থাকবে। আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

চার.

এই সংকলন গ্রন্থকে আমরা অবয়ব, ব্যক্তি, নেতা, নিবেদিত কবিতা ও গান, অভিভাষণ এবং লেখক পরিচিতি—এই ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করেছি। অবয়ব অধ্যায়ে গ্রথিত হয়েছে মওলানা ভাসানীর অনেকগুলো আলোকচিত্র। এই চিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সহজেই মওলানা ভাসানীর অতি কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। চিত্রগুলো কালের স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর আন্দোলনমুখর ঘটনাবহুল জীবন কাহিনীর নিখর স্বাক্ষর পাওয়া যাবে। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সংগে এই চিত্রগুলোর মূল আলোকচিত্র শিল্পিগণকে মুবারকবাদ জানাই। যাঁরা আমাদেরকে চিত্রগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাঁদেরকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ অবজারভার-এর চীফ ফটোগ্রাফার জনাব মোজাম্মিল হোসেন আমাদের এই সংকলনের জন্য অধিকাংশ চিত্র দিয়েছেন—যেগুলোর মধ্যে তাঁর নিজের তোলা ছবিতো আছেই এবং আরো কয়েকটি ছবি রয়েছে জনাব মোয়াজ্জম হোসেন ও জনাব মুকাদ্দস আলীর তোলা। আমরা মোজাম্মিল ভাইকে তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য হৃদয় উজাড় করে মুবারকবাদ জানাই। এছাড়া যশোরের বিশিষ্ট আলোকচিত্র শিল্পী সফী ভাই, রেডিও বাংলাদেশের ফটোগ্রাফার জনাব লুৎফর রহমান তাঁদের তোলা আলোক-চিত্রগুলো আমাদের কাছে সরবরাহ করেছেন। অত্যন্ত আগ্রহের সংগে কিছু ছবি সংগ্রহ করে দিয়েছেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর এবং অংকনশিল্পী মুরাদুজ্জামান মুরাদ প্রমুখ। কিছু ছবি আমরা সংগ্রহ করেছি পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক থেকে। আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সংকলনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিন্যস্ত করা হয়েছে 'ব্যক্তি ভাসানী' নামে। মওলানা ভাসানীকে কাছ থেকে যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা মওলানা ভাসানীর একান্ত সান্নিধ্যে গিয়েছেন, যাঁরা তাঁর নেতৃত্বে কাজ করেন, তাঁর কথা শুনেছেন, হৃদয়ের অনুভবে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, ভালো-বেসেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—এমন সব ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিকথা নিয়ে সাজানো হয়েছে 'ব্যক্তি ভাসানী'। আমরা স্মৃতির নিগড়ে আবদ্ধ মওলানা ভাসানীকে উপস্থাপনা করার চেষ্টা পেয়েছি এ অধ্যায়ে।

সংকলনের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছি 'নেতা ভাসানী'। এই অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর সুবিশাল জীবন, কর্মকাণ্ড, নেতৃত্ব প্রভৃতির মূল্যায়নমূলক লেখার সমাহার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম, তাঁর রাজনীতি, রাজনৈতিক দর্শন, তাঁর আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, তাঁর জীবন-দর্শন, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ,

www.pathagar.com

সম্প্রসারণবাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান, শিক্ষাক্ষেত্রে, কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, আমাদের জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়েও মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ জীবনের নানা স্তরের বিভিন্ন সহকর্মীদের রচনা আমরা সমন্বিত করেছি, সংকলিত করেছি।

'নেতা ভাসানী'তে মওলানা ভাসানী আপন বৈভবে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা মওলানা ভাসানীর রাজনীতির বিশালতা, গভীরতা, বেগবানতা এবং কালজয়ী প্রভাব সম্পর্কে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো।

আমরা এই সংকলনের কিছু লেখা সরাসরি সংশ্লিষ্ট লেখার লেখকের মারফতই পেয়েছি, কিছু লেখা বিভিন্ন সময় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে নিয়েছি। কিছু লেখা এতে রয়েছে যা বিভিন্ন সংকলন বই থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা সে সব পত্র-পত্রিকা ও সংকলন বই-এর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, বিশেষ করে শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম', আরেফিন বাদল সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানী', সৈয়দ ইরফানুল বারী সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানীর ভূমিকা', সচিত্র স্বদেশ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, প্রাচ্যবার্তা, যশোর থেকে প্রকাশিত মাতৃভূমি, সাপ্তাহিক দিশা প্রভৃতি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাকে আমরা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা চেষ্টা করেছি মওলানা ভাসানীকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার। মওলানার আন্দোলনের জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল আসামে। তাঁর আসাম-জীবন সম্পর্কে আমরা বিক্ষিপ্ত-ভাবে বিভিন্ন লেখায় দেখতে পাবো। সেগুলোকে এক জায়গায় এনে পাঠ করলে অবশ্য ভাসানীর আসাম জীবনের সামগ্রিক দৃশ্য পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

আমরা জানি মওলানা ভাসানী একজন কামিল পীর ছিলেন। তাঁর অসংখ্য মুরীদান ছিলেন। তিনি নিয়মিত যিকির-আযকার করতেন, মুরীদগণের তালীম দিতেন। আমরা তাঁর অংগুলী হেলনে, 'খামুশ' উচ্চারণে লক্ষ্য করেছি তিনি যেনো এক বলিষ্ঠ রূহানী শক্তির অধি-কারী ছিলেন। এই সংকলনের কয়েকটি লেখায় তাঁর সেই রূহানী শক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু সূফী তরীকার যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করতেন সে সম্পর্কে কোনো পূর্ণাংগ লেখা অনেক চেষ্টা করেও আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। যতদূর জানা যায়, মওলানা ভাসানী কাদেরিয়া তরীকা ও চিশ্‌তীয়া তরিকার পীর ছিলেন। তাঁর পীর হযরত নাসিরুদ্দীন বাগদাদী (র.) উঁচুদরের আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। মওলানা ভাসানী তাঁর কাছ থেকেই সম্ভবত খিলাফত পেয়েছিলেন। আমরা মওলানা ভাসানীর আসাম জীবন ও সূফী জীবন সম্পর্কে কোনো লেখা পেলে পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন করবো।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে 'মওলানা ভাসানীর উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা ও গান'। মওলানার উপর এতো কবিতা ও ছড়া ছাপা হয়েছে যে, তা অবাক করে দেয়। এ সংকলনের অধিকাংশ কবিতা ও ছড়া এই সংকলনের জন্যই লিখে সংশ্লিষ্ট কবি আমাদের কাছে সরবরাহ করেছেন। তবে কিছু কিছু কবিতা আমরা সংগ্রহ করেছি। যেগুলোর মধ্যে কবি শামসুর

www.pathagar.com

রাহমানের 'সফেদ পাঞ্জাবী' এবং কবি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমাদের মিলিত সংগ্রাম'। এই দু'টি কবিতা বার বার উচ্চারিত এবং বহুল প্রকাশিত। সংকলনের নিবেদিত কবিতা অধ্যায়ে এ দেশের বিপ্লবী চেতনার মূল সুর অনুরণিত হয়ে উঠেছে; জীবন চেতনার সাথে মওলানা ভাসানীর বিপ্লবী কণ্ঠস্বর বিম্বিত হয়েছে ঋজুতার সংকল্পে এবং নিবেদিত কবিতাগুলো শব্দের বিন্যাসে, ছন্দের দোলায়, সুরের ব্যঞ্জনায় মওলানা ভাসানীর বিপ্লবী আহ্বান হৃদয় গভীরে উজ্জীবিত করে দেয়; মহৎ ভাসানীকে তুলে ধরে সবার সামনে। ফকীর আলমগীরের গানগুলোও তিনি নিজেই আমাদের নিকট সরবরাহ করেছেন।

এই সংকলনের পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে মওলানা ভাসানীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, বিশেষ করে ১৯৫৭ খৃস্টাব্দের ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনের সভায় মওলানা ভাসানী যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার একাংশ এখানে পত্রস্থ করেছি। ভাষণটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ পরদিন দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। আমরা দৈনিক সংবাদকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পাঁচ.

মওলানা ভাসানী আমাদের দেশের জাতীয় গর্ব। তাঁর উপর একটি সংকলন সম্পাদনা করার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত, উৎফুল্ল। সংকলন বের করা, লেখা সংগ্রহ করা, একটি লেখার জন্য বার বার লেখককে তাকিদ দেয়া, উপর্যুপরি সবারই লেখা ছাপতে না পারা—এসব মিলিয়ে এ এক দুঃসহ কাজ। এই সংকলনে কিছু লেখা আছে যা সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো। যেমন, শাহরিয়ার কবিরের 'মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম'। এ লেখাটি আসলে শাহরিয়ার কবিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম' গ্রন্থের সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ। খোন্দকার আবদুল হামিদের "আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কাণ্ডারী" শীর্ষক প্রবন্ধটি মূলত দৈনিক আজাদে মওলানা ভাসানীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় মর্দে মুমিনের কলামে। এছাড়া আমরা একই লেখকের একাধিক লেখার সমন্বয় সাধন করে একটি লেখা হিসাবেও এখানে দিয়েছি যেমন, অধ্যাপক আবদুল গফুরের "মওলানা ভাসানী এক মহান বিপ্লবী নেতা" শীর্ষক লেখাটি।

আমরা কয়েকজন লেখকের একাধিক প্রবন্ধ এখানে সংকলন করেছি। বিষয়ের গুরুত্বের কারণেই তা করতে হয়েছে। আর মওলানা ভাসানীর একান্ত সহচরদের ক্ষেত্রেই আমরা এটা করেছি। তাই দেখা যাবে একই লেখক ব্যক্তি অধ্যায়ে লিখেছেন, নেতা অধ্যায়ে লিখেছেন কিম্বা কবিতা অধ্যায়েও লিখেছেন। এতে সংকলনের পরিপূর্ণতা এসেছে।

আমরা স্থান সংকুলান না হওয়ায় লেখক পরিচিতি অংশে কবি-পরিচিতি দিতে পারি নি। এজন্য আমরা দুঃখিত।

ছয়.

এই সংকলন গ্রথিত করতে আমাকে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আখতার-উল আলম, আমার ছোট ভাই বিশিষ্ট

www.pathagar.com

সাংবাদিক ও ছড়াকার আবু সালেহ, বিশিষ্ট কৃষক নেতা এক কালে মওলানা ভাসানীর একান্ত সহচর জনাব আজাদ সুলতান, ছড়াকার খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, বন্ধুবর সৈয়দ শামসুল হুদা, বিশিষ্ট সংস্কৃতি সংগঠক জনাব ফজলুর রহমান খাঁ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর জনাব এম. এ. রশীদ উল্লেখযোগ্য। যাঁর একান্ত সহযোগিতা আমাকে এ কাজ এগিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে তিনি হলেন আমার স্ত্রী মাহমুদা খাতুন মায়া।

এই গ্রন্থ সংকলনের কাজে প্রাথমিক সদয় পরামর্শ দান করেছেন শ্রদ্ধেয় গফুর ভাই—অধ্যাপক আবদুল গফুর। এছাড়াও অনেকেই আমাকে নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের অনেকের নাম এখন মনে নেই। তাঁদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

এ গ্রন্থ মুদ্রণে এস. এম. শাহজাহান তালুকদারের অক্লান্ত পরিশ্রম আমি চিরদিন স্মরণ রাখবো। আমি হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁর জন্য দোয়া করছি। তাঁর তত্ত্বাবধানেই বইটির মুদ্রণ কার্য ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব আজিজুল ইসলাম এবং গবেষণা কর্মকর্তা এম. রুহুল আমীন-এর সহযোগিতার কথাও ভুলবার নয়।

প্রকাশনা বিভাগের উপ-পরিচালক মওলানা আবুল খায়ের আহমদ আলী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেসের ব্যবস্থাপক শেখ আবদুর রহীম—এঁদের সহযোগিতার কথাও আমি এই মুহূর্তে স্মরণ করছি।

সবার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে মওলানা ভাসানী যে আদর্শের আলোকে শোষণহীন সমাজ, সুখী-সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন এই সংকলন পাঠ করে পাঠক-পাঠিকা যদি তাঁর সাথে সামান্যতম পরিচিত হতে পারেন, যদি সেই জীবন পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা লাভ করতে পারেন তবেই আমরা আমাদের এই কর্মপ্রয়াসকে সার্থক বলে মনে করবো।
আল্লাহ্ হাফেজ।

২৭ সিদ্ধেশ্বরী রোড
ঢাকা
১৭ নভেম্বর, ১৯৮৭।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

www.pathagar.com

অবয়ব

www.pathagar.com

ভারতের কৃষকের দুঃখ, ইরানের কৃষকের দুঃখ,
বার্মার কৃষকের দুঃখ, নেপালের কৃষকের দুঃখ,
ভুটানের কৃষকের দুঃখ, কাবুলের কৃষকের দুঃখ,
বাংলাদেশের কৃষকের দুঃখ—এক দুঃখ।

... ...

অন্যায়ের প্রতিবাদ করো। জুলুমকে রুখিয়া দাঁড়াও,
যদি কাহাকেও শাসাইতে হয় তাহার সম্মুখে
বীরের মত বল। ভীরু কাপুরুষের মত
অজ্ঞাতে কিছু বলিও না।

—মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অবয়ব

www.pathagar.com

মাটির মানুষ

www.pathagar.com

২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে   মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের মহানায়ক শহীদ মিনারে ভাষণদানরত

www.pathagar.com

প্রভাত ফেরী

www.pathagar.com

১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনকালে সন্তোষে পাকিস্তানের
প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

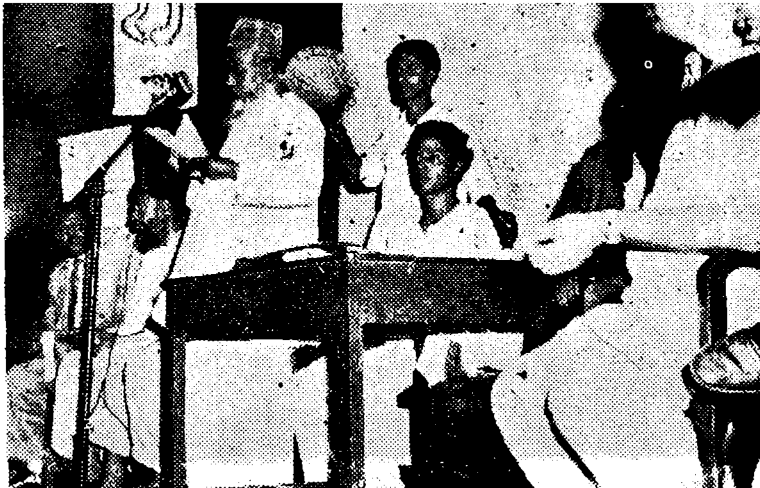

গণতান্ত্রিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণদানরত মওলানা ভাসানী
অন্যারা হচ্ছেন ঃ অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন ও সর্বদক্ষিণে
জনাব ওসমানী। এই সম্মেলনে ন্যাপ গঠিত হয়।
তারিখ ঃ ২৫ জুলাই, ১৯৫৭

মওলানা ভাসানী ও সীমান্ত গান্ধীখ্যাত আবদুল গাফফার খান

www.pathagar.com

মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের সঙ্গে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

ভাসানী যখন চীনে

www.pathagar.com

চীন সফরকালে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

৬ আগস্ট ১৯৬৩ সালে আলোকচিত্রী মোজাম্মেল হোসেনের ক্যামেরায়
বন্দী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

www.pathagar.com

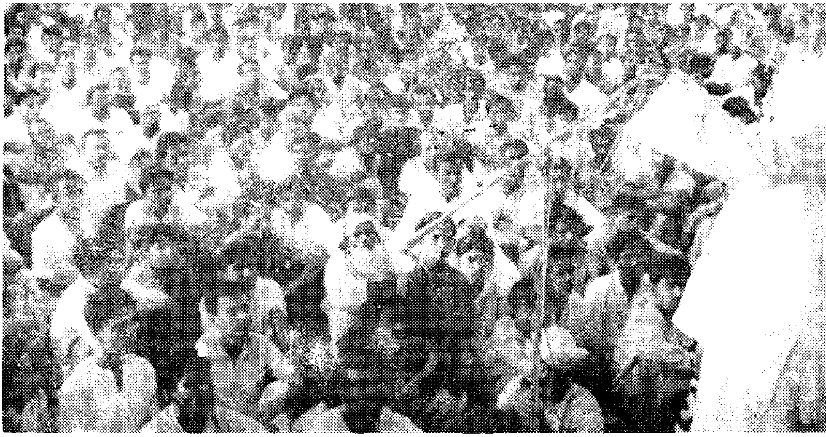

১৯৬৮ সালে ২০ মার্চ ভিয়েতনাম দিবসে পল্টনের জনসভায়
ভাষণদানরত মওলানা ভাসানী

লালটুপী সম্মেলনে ভাষণদানরত জননেতা ভাসানী

www.pathagar.com

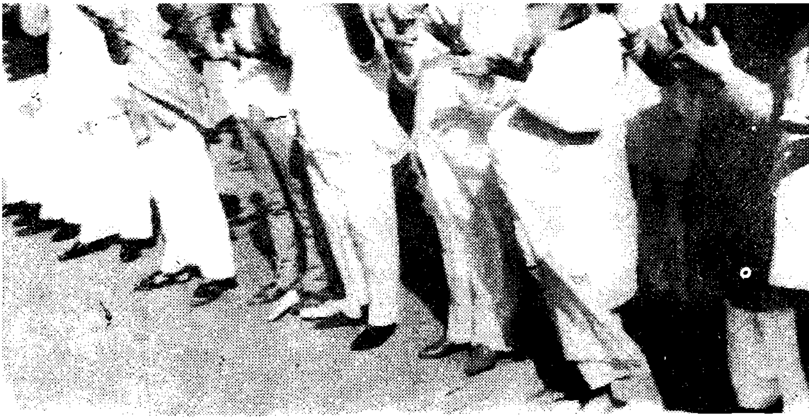

'৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সূচনায় '৬৮ সালের ৮ ডিসেম্বর বায়তুল মুকাররমে গায়েবানা জানাযায় মওলানা ভাসানী

গায়েবানা জানাযা শেষে পুলিশের মুখোমুখি ঃ বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই

www.pathagar.com

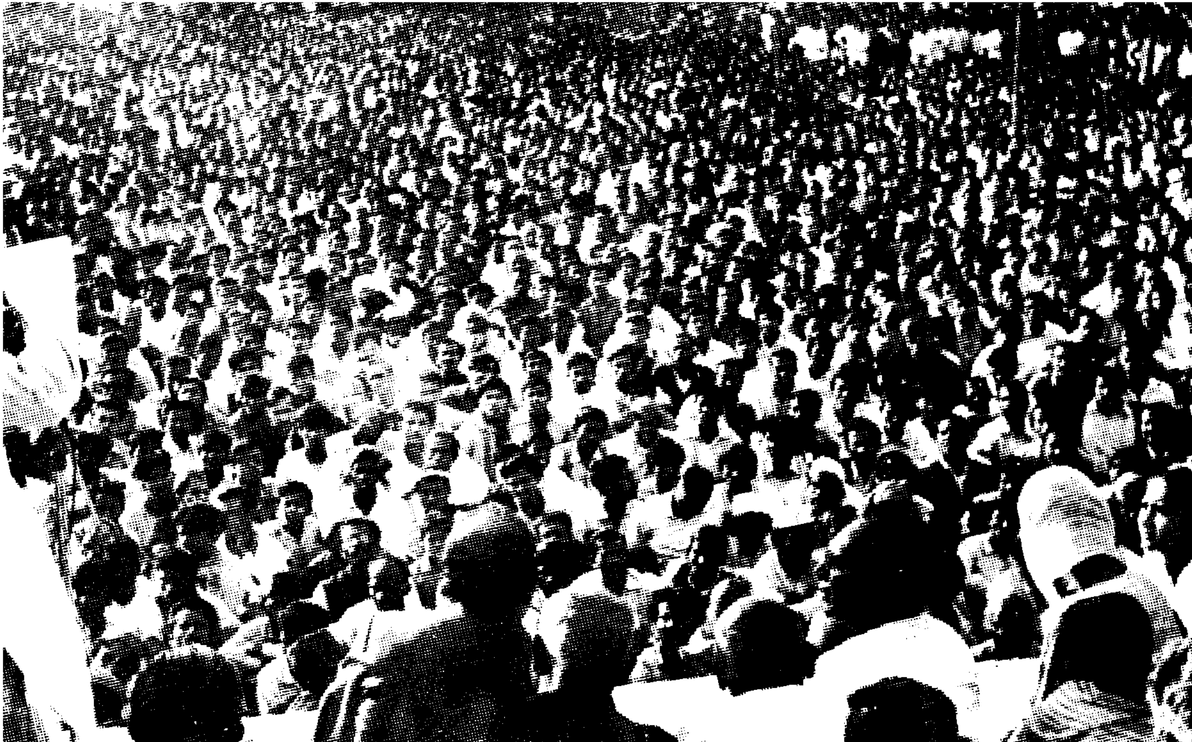

ওরা কেউ আসেনি ঃ ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে
১৯৭০ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—পল্টন ময়দানে

www.pathagar.com

'ভোটের আগে ভাত চাই' মিছিলের পুরোভাগে মওলানা ভাসানী ঃ ১৯৭০ সাল

১৯৭০ সালে যশোরের কর্মীদের সঙ্গে মওলানা ভাসানী
যশোরের আলোকচিত্রী মোঃ সফি সাহেবের ক্যামেরায়

www.pathagar.com

ভোটের আগে ভাত চাই

মাওলানা ভাসানী

প্রকাশক :

আজাদ সুলতান

গনতান্ত্রিক কর্মী শিবির

মওলানা ভাসানী রচিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলনে ভাষণদানরত মওলানা ভাসানী। বসে আছেন: ড. নজমুল করীম, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাশিম ও অধ্যাপক শাহেদ আলী

www.pathagar.com

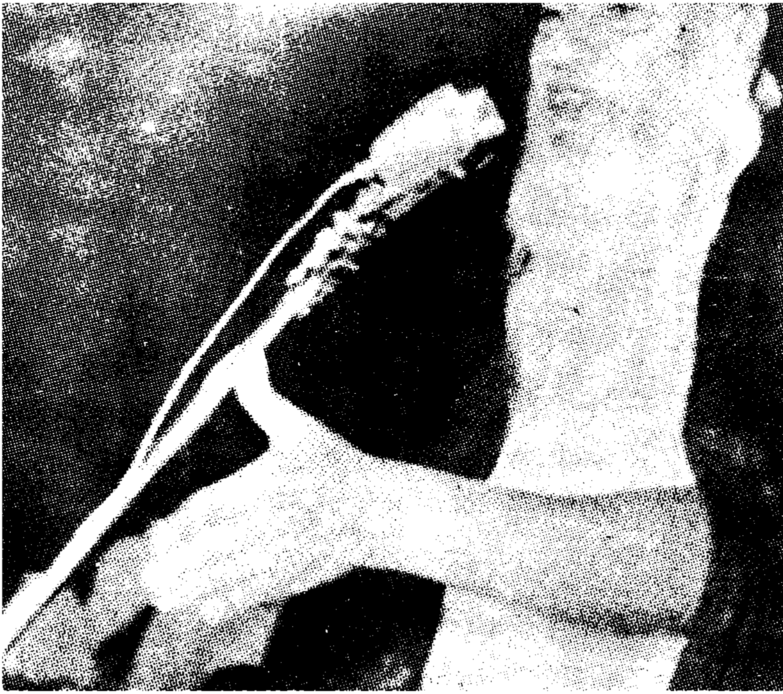

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্মেলনে ভাষণদানরত জননেতা ভাসানী

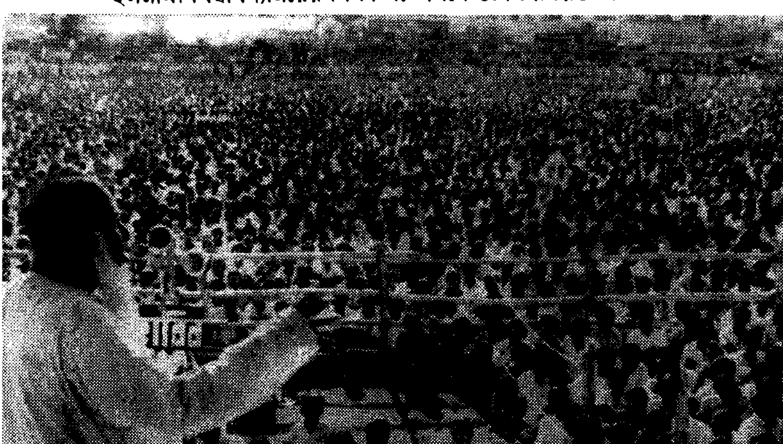

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে—৯ মার্চ ১৯৭১ সাল

www.pathagar.com

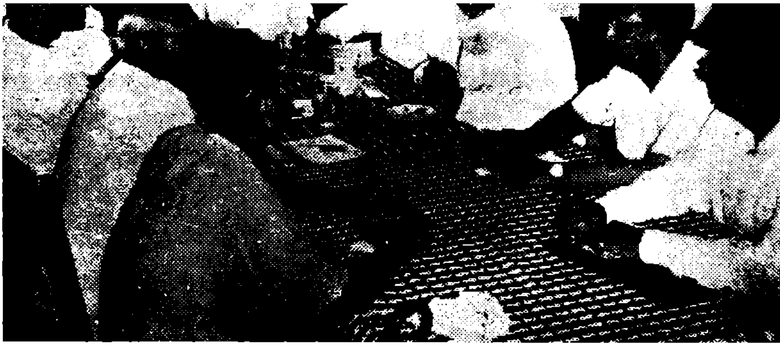

ভারতে মুক্তিযুদ্ধের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতিরূপে মওলানা ভাসানী

২৩ জানুয়ারী '৭২ ভারতফেরত টাঙ্গাইলে সাংবাদিক সম্মেলনে মজলুম জননেতা

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক

হক-কথা

(WEEKLY THE HAQ-KATHA)

প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

...থম সংখ্যা শুক্রবার ১২ই ফাল্গুণ ১৩৭৮ ; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ ; ৯ই মহরম, ১৩৯২ ; প্রতি সংখ্যা : পনর পয়সা স...

গণবিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েমের নজীর নেই, তবে...

— মও...

www.pathagar.com

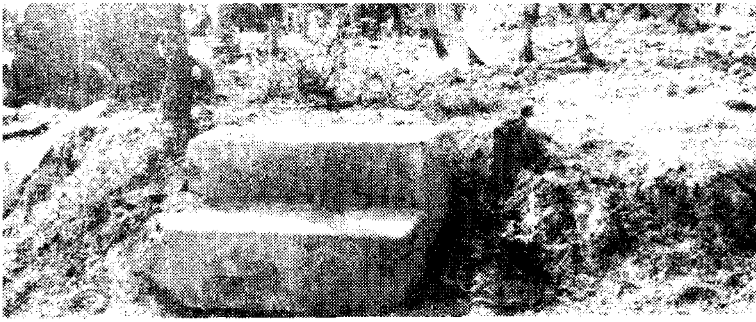

হানাদার বাহিনী কর্তৃক পুড়িয়ে দেয়া মওলানার ভিটে-বাড়ি।
২৩ জানুয়ারী '৭২ সালে মোজাম্মেল হোসেনের তোলা ছবি

স্বাধীনতা-উত্তর পল্টনে প্রথম জনসভায় ভাষণদানরত : ২ এপ্রিল '৭২

www.pathagar.com

২৩ এপ্রিল '৭২ পল্টন ময়দানে ঐক্যফ্রন্টের জনসভায় সভাপতির ভাষণদানরত

www.pathagar.com

বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আইন অমান্য আন্দোলন : ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে '৭৪ সালের জুন মাসে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জননেতা। অন্যরা হচ্ছেন : মশিয়ূর রহমান, ফজলে লোহানী, নাসের খান ভাসানী ও আমেনা বেগম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গৃহবন্দী মওলানা ভাসানী নিজের কুঁড়েঘরের সামনে

'৭৪ সালে গৃহবন্দী মওলানা ঈদের দিনে পাহারারত পুলিশদের মধ্যে

www.pathagar.com

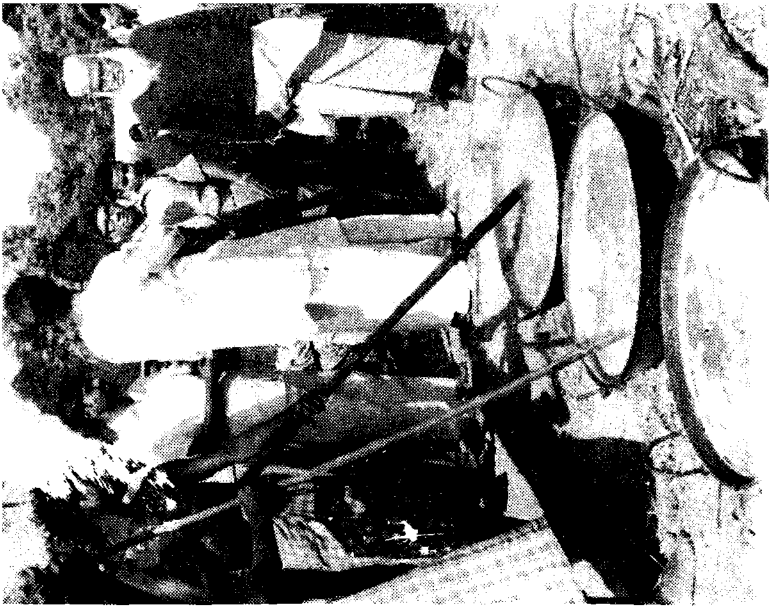

১৯৭৫ সালে ৭ ডিসেম্বর সন্তোষে এক সম্মেলনের শিল্পি রায়

১৯৭৬ সালের ১৬ মে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মহামিছিল প্রাক্কালে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণদানরত মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

ফারাক্কা মহামিছিলের পুরোভাগে মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

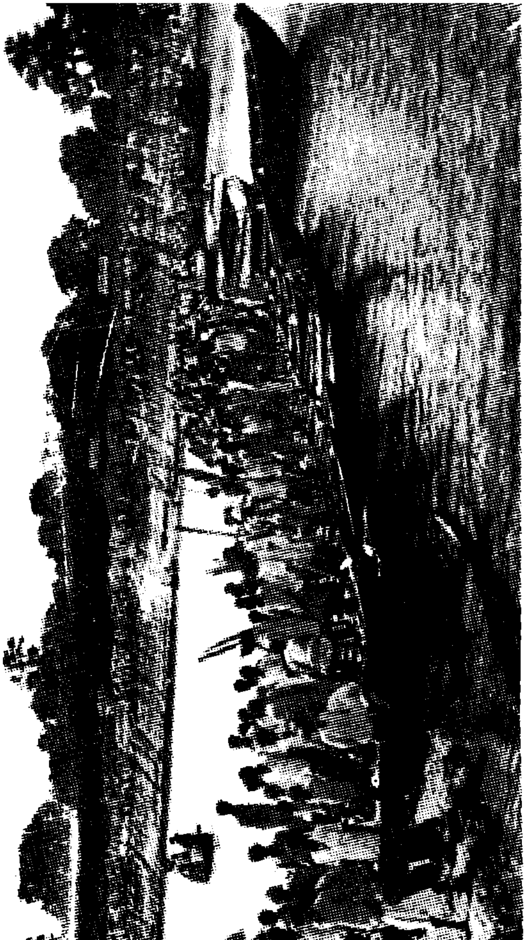

মহানন্দা নদী ঃ নৌকানির্মিত সেতুর উপর দিয়ে পার হচ্ছে ফারাক্কা মহামিছিল

www.pathagar.com

পিজি হাসপাতালে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বজলুহ ছাত্তার
মওলানা ভাসানী ডিক্টেশন দিচ্ছেন

www.pathagar.com

লণ্ডনে ২৯ দিন চিকিৎসা শেষে ১২ সেপ্টেম্বর '৭৬ দেশে ফিরে ঢাকা এয়ারপোর্টের
ভি. আই. পি. লাউঞ্জে সাংবাদিক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন

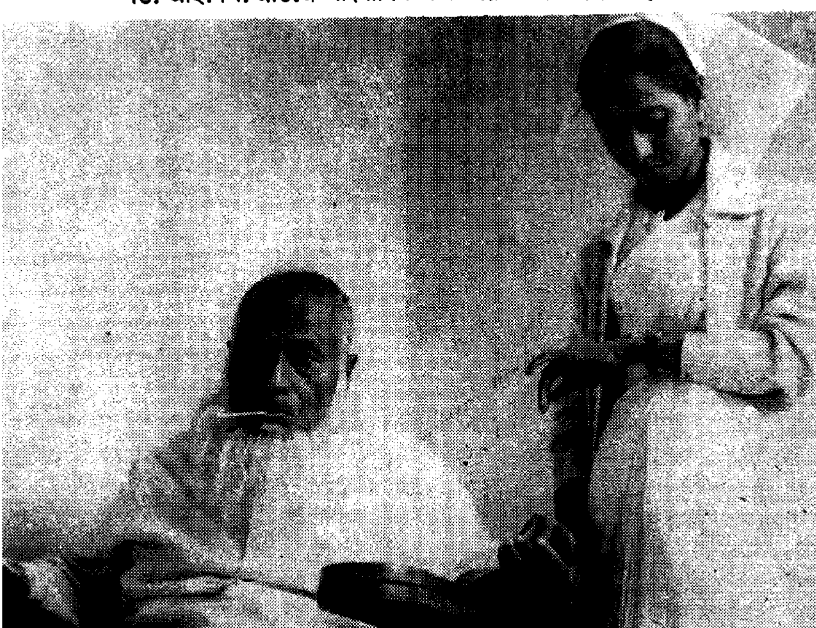

হাসপাতালে মওলানা ভাসানীর পাশে সেবিকা সেবায়রত

www.pathagar.com

লণ্ডন থেকে চিকিৎসা শেষে ফিরে এলেন ঢাকা বিমান বন্দরে

www.pathagar.com

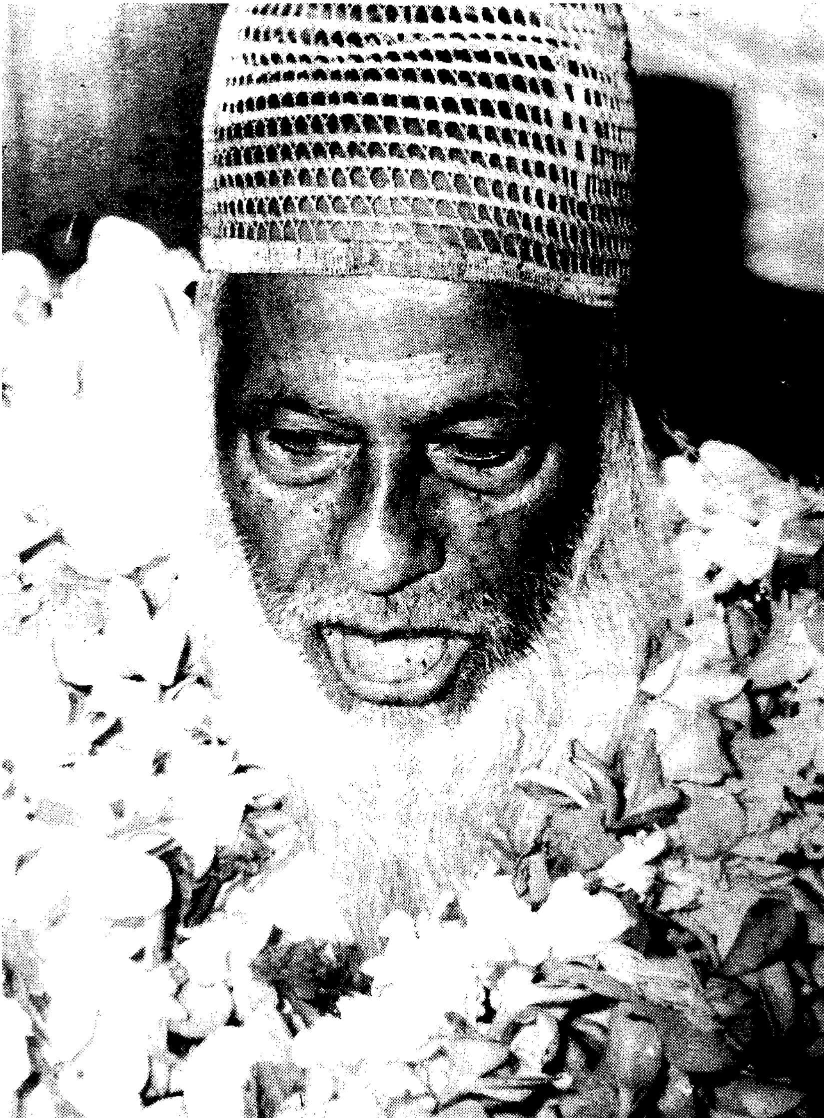

মওলানা ভাসানীর শেষ ভাষণ ঃ সন্তোষের দরবার হলে ১৩ নভেম্বর '৭৬

www.pathagar.com

রোগশয্যায় মওলানা ভাসানী ঃ   পাশে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-জামাতা

www.pathagar.com

হাসপাতালে চিরনিদ্রায় মজলুম জননেতা

ঢাকা থেকে সন্তোষের পথে কফিন

www.pathagar.com

জাতীয় মর্যাদায় কবরে নামানো হচ্ছে মওলানা ভাসানীর কফিন

www.pathagar.com

নিরাপোষ নেতা—শ্রমিক-কৃষকের বন্ধু মওলানা ভাসানী

www.pathagar.com

ব্যক্তি ভাসানী

www.pathagar.com

বাংলার মুখ : আমরা ভুলিনি তোমায় হে মহান/ভুলবো না কোনদিন
তুমি ছিলে আকাশে শতাব্দীর সূর্য-তরুণ

www.pathagar.com

হাজী মোহাম্মদ দানেশ

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন

১৯৫০ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এরপর থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পর্ক আমাদের ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। গত ২৬ বছর সময়ে মওলানা সাহেবকে খুব কাছে থেকে দেখার এবং জানার সৌভাগ্য ঘটেছে। দেখেছি মওলানা সাহেবের ক্রমউত্তরণের পক্ষ।

১৯৫০ সালে আমি এবং মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় কারাগারে একই দালানে থাকতাম। মওলানা ভাসানী থাকতেন দোতলায়। আর আমি নীচের তলায়। প্রায়ই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা চলত। তিনি তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। জেলে এসেছেন ১৪৪ ধারা ব্রেক করার দায়ে। অন্যদিকে আমি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ওপরে ওপরে গণতন্ত্রী দলের নেতা। ১৯৪৯ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সে কংগ্রেসে পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্লোগান গ্রহণ করে। এই কংগ্রেসেই পি. সি. যোশীর বদলে বি. টি. রনদিভে পার্টির সম্পাদক হন। কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সশস্ত্র কার্যকলাপের। এরই ভিত্তিতে কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে আমরা অ্যাকশন শুরু করি এবং আমি প্রকাশ্য গণসংগঠন করতাম বলে ধরা পড়ে যাই। এই সময়েই তৎকালীন স্বাধীনতা বিরোধী শ্লোগান "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়" চালু হয়। পাবলিক সিকিউরিটি এ্যাক্টের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাকেই ধরা হয়। আমিও ছিলাম এঁদের একজন। আর এ-সূত্রেই পরিচয় ঘটে মওলানা সাহেবের সঙ্গে।

জেলের প্রাথমিক পরিচয় কিছুদিনের মধ্যেই অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, মওলানা সাহেব আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান

www.pathagar.com

হলেও আমাদের কমিউনিস্টদের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্রমেই তাঁর সঙ্গে কিভাবে এদেশের দরিদ্র ভূমিহীনদের মুক্তি সম্ভব তা নিয়ে আলোচনায় দু'জনের মত বিনিময় চলত।

এর আগে মওলানা সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। কিন্তু লোকটির সংস্পর্শে আসতে পারিনি। এবারেই প্রথম। জানতে পারলাম, এদেশের দরিদ্রদের মুক্তির জন্য তাঁর ঔৎসুক্য। মওলানার এ ঔৎসুক্য ছিল তাঁর স্বভাবজাত। এ ব্যাপারেও একটু আলোচনা প্রয়োজন।

মওলানা জন্মেছিলেন এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে। আর এজন্যেই শৈশব থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন জমিদার-মহাজনদের শোষণ কাকে বলে? অন্য দশজনের চেয়ে মওলানা সাহেবের তফাৎ এখানেই। তিনি প্রথা-সিদ্ধ রাজনীতির পাঠ না নিয়েও প্রকৃতির কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় রাজনীতির তাকিদ অনুভব করেছিলেন। আর এজন্যেই তাঁকে দেখেছি তিনি কখনও টাঙ্গাইলে, কখনও পাবনায়, কখনও বগুড়া অথবা রংপুরে আবার কখনও বা আসামে। বিভাগ-পূর্ব সময়ে আসাম এবং বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। সংগঠিত করেছেন বিভিন্ন সময়ে কৃষক সম্মেলনের।

মওলানা সাহেবের রাজনীতিতে সব সময়েই একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, তা হচ্ছে তাঁর বিরোধী মানস। বিভাগ-পূর্বকালে তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি এবং আসাম আইনসভার সদস্য। আসামে তখন মুসলিম লীগেরই সরকার। প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ। অথচ 'লাইন প্রথা' বিলে তিনি মুসলিম লীগের আনীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন কংগ্রেসের সপক্ষে। কংগ্রেসের সপক্ষের ব্যাপারটাও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। আসামের বিরাট জঙ্গল ভেঙে তিনি বসত গেড়েছিলেন বাংলার মুসলিম ভূমিহীনদের নিয়ে। বিরোধ ছিল এখানেই।

টাঙ্গাইলের সন্তোষে তিনি প্রথমদিকে এসেছিলেন মক্তবের শিক্ষক হিসেবে। সেখানকার (কাগমারীর) পীর শাহানশার মাজারের সম্পত্তি নিয়ে সন্তোষের জমিদার-মহাজনদের মধ্যে একটি গণ্ডগোল ছিল। তিনি এরই সূত্র ধরে প্রজাদের নিয়ে জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। পরে স্থানীয় অন্যান্য হিন্দু-মুসলিম জমিদার এবং সরকারী আমলাদের যোগসাজসে নেয়া পদক্ষেপে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলার এলাকা থেকে বহিষ্কৃত হন। শুরু হয় সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে সচেতনতা।

www.pathagar.com

এর পরে পাবনা ও বগুড়ায় আস্তানা গাড়েন। সংগঠিত করেন বিরাট বিরাট কৃষক সম্মেলনের। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে নতুন সাড়া তোলেন। এর ফলে জমিদার-মহাজন প্রভৃতি শ্রেণী ভীত হয়ে পুনরায় সরকারী আমলাদের শরণাপন্ন হয়। বিতাড়িত হন মওলানা সাহেব। যাত্রা করেন আসামে। আসামে তিনি মুসলিম লীগ সংগঠন গড়ে তোলা এবং বাঙ্গালীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পাকিস্তান হাসিলের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আসামেই ছিলেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম লীগকে তিনি একটি শক্তিশালী সংগঠনেও পরিণত করেছিলেন। সে সময়ে আসামে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। তবুও তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ফিরে আসেন পূর্ব বাংলায়। কারণ ছিল সাদুল্লাহর বিরোধিতা। সাদুল্লাহ্ এবং মওলানা ভাসানী—এ দু'য়ের মধ্যকার শ্রেণীগত সচেতনতাই ছিল এর মূল কারণ।

প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদের পতনের পর নতুন পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় তাঁর আগমন তাঁকে নতুন বোধে উদ্বেলিত করে। কিন্তু মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ পুনরায় প্রকট আকার ধারণ করে। পাকিস্তান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য অধিকাংশ দরিদ্র প্রজা মুসলমানদের মুক্তি। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। নেতৃবৃন্দের ভূস্বামী ও সামন্তবাদী মনোভাবই এর জন্য দায়ী।

নতুন করে সংগঠন গড়ার তাকিদ অনুভব করেন তিনি। সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে গঠন করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। এই আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে তিনি কারান্তরিত হন। এ সময়েই '৫০ সালে আমার সঙ্গে মওলানা ভাসানীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

দীর্ঘদিনের তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চরিত্র তাঁকে নতুনতর অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। জেলে একথা তিনি বার বার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন। গরীব কৃষকদের মুক্তিই ছিল তাঁর রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্যেই জেলে বার বার আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, গরীবের মুক্তি কেমন করে আসবে ? কোন্ পথে এ মুক্তি সম্ভব ? আমিও আমার কথা বলতাম। সাংবিধানিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা চালাতাম।

www.pathagar.com

আলোচনার দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ করে মওলানা সাহেব বললেন, হাজী সাহেব, বাইরে গেলে এক সঙ্গে রাজনীতি করব। আমি বললাম, মওলানা সাহেব, আমাদের সঙ্গে তো আপনার মিলবে না। কারণ আমরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করি। তিনি বললেন, যদি আমরা শ্রমিক এবং দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠাই? আমি বললাম, ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সে মঁসিয়ে ব্লা'র নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দলের সরকার হয়। কিন্তু শিল্প মালিকদের লাগাতার কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়ে সে সরকারের পতন অনিবার্য করে তোলে। কাজেই আপনি শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠিয়ে আইন পাশ করালেন। কিন্তু তা এক্সিকিউট করবে কে? সব আমলাই তো এক ধরনের! কাজেই তা সম্ভব নয়। কথাটি তিনি মেনে নেন। এমন কি জেলে বসে শেখ মুজিবের সঙ্গে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের বুদ্ধিও গ্রহণ করেন। মধুপুরের জঙ্গলকে সদর দফতর করার সিদ্ধান্তও তিনি নিয়েছিলেন।

'৫০ সালে জেলে থাকাকালেই মওলানা সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারি কমিউনিস্টদের সম্পর্কে মওলানা সাহেবের একটা ঔৎসুক্য ছিল। এ সময়ে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও কুওমিনটাং বাহিনীর সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। কুওমিনটাং বাহিনীর বড় ধরনের একটি পরাজয় ঘটে। মওলানা সাহেব সংবাদটি জেনেই আমাকে দোতলায় ডেকে পাঠান। খুব খুশীর সঙ্গেই বলে ফেললেন, হাজী সাহেব, কমিউনিজম তো এসে গেল! আমি একটু রসিকতা করেই বললাম, তা হলে তো আপনার দাড়ি কামাতে হবে! তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, কামাতে হোক তাতে কি? মানুষতো খেয়ে-পরে বাঁচবে? হাজী সাহেব, আমার ইসলাম যদি সত্য হয় তবে হাজারটা কমিউনিস্টও ইসলামকে ঠেকাতে পারবে না।

একই সময়ে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এক পৈচাশিক কাণ্ড ঘটে। এর মাত্র ৮ দিন আগেই আমি রাজশাহী জেল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছি। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দীদের উপর হাতে-পায়ে বেড়ি অবস্থায় গুলী চলে। এতে বেশ কিছু হতাহত হয়। খবরটি মওলানা সাহেব জানতে পারেন জেলের এক শুভানুধ্যায়ী কেরানীর কাছ থেকে। যাঁরা মারা যান এবং আহত হন সবাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির লোক। খবরটি শুনেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। তাঁকে তখন খুবই

www.pathagar.com

বিমর্ষ ও বিচলিত দেখাচ্ছিল। তিনি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বলে আমাকে বললেন, হাজী সাহেব, এই অন্যায়-অত্যাচার কবে শেষ হবে? একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন তিনি কোন খাবারও গ্রহণ করেন নি।

মওলানা সাহেবের প্রতি অনেকেই অপবাদ দেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক। কিন্তু একথা কোন প্রকারেই সত্য নয়। কারণ '৫০ সালের সেই পরিচয় থেকে আমার ঘনিষ্ঠতায় আমি দেখেছি মওলানা সাহেবের মত অসাম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তি নেই। '৫০ সালে জেলে থাকা অবস্থাতেই বাইরে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। নির্যাতন চলছে সংখ্যালঘুদের উপর। হিন্দুদের অনেককেই সিকিউরিটি প্রিজনার করে শুধু শুধু জেলে আনা হয়েছে। তিনি দুঃখ করে বললেন, বাইরে থাকলে এটা বন্ধ করতে চেষ্টা করতে পারতাম। দেখুন তো কেমন ইসলাম প্রচার চলছে। হিন্দু মারলে বেহেশতে যাবে। এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দিকটি। পরবর্তী-কালে অনেক ঘটনাই একথার প্রমাণ দেয়। তিনি ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলতেন। তাকে অনেকেই সাম্প্রদায়িক বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। আসলে তিনি ভারতের সাধারণ মানুষকে বন্ধুই মনে করতেন। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্যবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী মনোভাবেরই বিরোধিতা করেছেন। এছাড়া বিভাগ-পূর্বকালে পূর্ববাংলার জমিদার মহা-জনই ছিল হিন্দু। আর প্রজা ছিল মুসলমান। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে গিয়ে তিনি এ অপবাদের শিকার হয়েছেন কখনো কখনো। তবে এ ধরনের অপবাদ তাঁকে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল মহল। তাঁর অসাম্প্র-দায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনেও। '৫০ সালেই আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে দিনাজপুর জেলে বদলী করা হয় এবং মুক্তি লাভ করি এখান থেকেই।

'৫১ সালের দিকে মওলানা ভাসানীও বাইরে ও আমিও বাইরে। জেলের কারণেই আমি ঢাকা এলেই কারকুন বাড়ী লেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে দেখা করতাম। আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেবার জন্যেও আমাকে বলেন। কিন্তু পার্টির মতামতের বাইরে আমার যোগদান সম্ভব নয় একথা তাঁকে আমি জানিয়ে দেই।

ঢাকায় তখন মওলানা সাহেব থাকতেন ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাসায়। '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের আগে পুনরায় কারকুন বাড়ী

www.pathagar.com

লেনে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী মুসলিম লীগের মত পার্টিগুলোতে অনুপ্রবেশ নীতি গ্রহণ করেছে। বেশ কিছু কমিউনিস্ট আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ প্রধান। কমিউনিস্টদের কাজের ধরন এবং সততা মওলানাকে মুগ্ধ করে। একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেন। যুক্তফ্রন্টের টিকেট লাভের ব্যাপারেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের টিকেট প্রদান নিয়ে হক-সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতান্ত্রিক দল এবং নেজামে ইসলাম। নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিউনিস্ট সদস্যদের টিকেট প্রদানের ব্যাপারে হক-সোহরাওয়ার্দী উভয়েই বিরোধিতা করেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী ছিলেন এদের টিকেট প্রদানের পক্ষে। এই নিয়ে বিরোধও কম হয়নি। '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্য লাভ ঘটে। প্রায় ৯০% সীট নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হয়। হক-সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত লিপ্সার জন্যেই শেষ পর্যন্ত এতে ফাটল ধরে। তবে তৎকালীন ছাত্র সমাজের চাপে তাঁদেরকে অনেক কিছুই মানতে হয়।

'৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মওলানা সাহেব কমিউনিস্টদের নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন। সম্পর্কের ভিতও শক্ত হয়। বিভাগ-পরবর্তীকালে আসাম থেকে পূর্ব-বাংলায় ফিরে এসে তিনি মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ক্ষমতার লোভ দেখেই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে মনোনিবেশ করেছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কালে তাঁকে মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়েছিল। পূর্ব-বাংলার প্রতিটি জেলায়-মহকুমায় এমন কি কোথাও কোথাও থানা পর্যায়ে তিনি মিটিং করে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভিত্ পাকা করেছিলেন। কিন্তু '৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগেও তাঁর বিরোধিতা তিনি দেখতে পান। মওলানা ভাসানী মূলত সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা সংগঠন গড়ে তোলার জন্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়েছিলেন। '৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঘোষিত কর্মসূচীতেও একথা বলা হয়েছিল। নির্বাচনের পরে এ নীতির বিরোধিতাও তিনি লক্ষ্য করেন।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী তাঁর এই সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে।

'৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। মওলানা ভাসানী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মন্ত্রিসভায় যোগদান কোনটাই করেন নি। আসলে তাঁর নীতি ছিল পার্টির কর্তৃত্বে সরকার পরিচালনা করা। এজন্যে তিনি প্রায়ই বলতেন, চাবুকটা আমার হাতে থাকবে। যাই হোক, এভাবে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে কেন্দ্রে ততদিনে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রও শুরু হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতা তখন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আদমজী এবং চন্দ্রঘোনায় বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটায় কেন্দ্রীয় সরকার। উদ্দেশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সরকার উৎখাত করা। এ উদ্দেশ্যও সফল হয়।

মওলানা ভাসানী তখন স্টকহম শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছেন। আদমজী এবং চন্দ্রঘোনার দাঙ্গাকে ঘিরে কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নর শাসন জারি করে। এদিকে হক-সোহরাওয়ার্দী মনোমালিন্যের জন্যে যুক্তফ্রন্টও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। গভর্নরের আইন [৯২ ধারা] জারি করার মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এর পতনও ঘটল। ইসকান্দার মীর্জা গভর্নর হয়ে এলেন ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে। মওলানা ভাসানীকে গুলী করে মারার ভয় দেখালেন। অন্যান্য প্রগতিশীল, কমিউনিস্ট ও আওয়ামী মুসলিম লীগ সদস্যকে আটক করলেন। মওলানা আটকা পড়লেন কোলকাতায়। এ সময় মুসলিম লীগ তাঁকে ভারতের দালাল বলেও আখ্যায়িত করে।

পাকিস্তান হাসিলের পর মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী এঁরা যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তার নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ। তৎকালীন জনগণের মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখেই 'মুসলিম' কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালে এর কার্যাবলীর মূল সুর ছিল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করা। এজন্যেই বেশ কিছু সংখ্যক বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট সদস্য এতে যোগ দিয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মওলানা ভাসানী যে এঁদের কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার, দ্বিতীয়ত, দেশের প্রথম সংবিধান ঘোষণা। '৫৬ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গের জয়পুরে। আওয়ামী লীগের প্রগতিবাদী অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহারের কথাটি উত্থাপন করেন। কিন্তু দলের একাংশ তখনও জনমতের দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম শব্দটি বাদ যায়।

১৯৫৬ সালেই সর্বপ্রথম গণপরিষদে সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। নয়া সংবিধানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ধুয়া তোলা হয়। এ ব্যবস্থায় মুসলমান এবং অন্য সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনের এ দাবীর তীব্র বিরোধিতা করেন মওলানা ভাসানী। তিনি পরিষদের সদস্য না হয়েও দেশের সর্বত্র এর বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন এবং জনমত গঠন করেন। এই সময়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে মওলানার বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজেও পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। তবে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিরোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে, বিশেষ করে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেই এ বিরোধ বেশী করে জমে ওঠে। একদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মার্কিনপন্থী মনোভাব এবং অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর মার্কিনবিরোধী মনোভাবই ছিল এ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ। এ সময়েই সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বিখ্যাত "জেরো+জেরো=জেরো" মতবাদেরও প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

এ প্রেক্ষিতেই মওলানা ভাসানী পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে সম্মেলন ডেকে বসেন। সম্মেলনে উপস্থিত এবং আমন্ত্রিত সুধীবৃন্দ ও তোরণগুলো থেকেই মাওলানার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ধরা পড়ে। মওলানা সাহেব এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্র নীতির দেওলিয়াপনা এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা প্রশ্নে তীব্র কষাঘাত চালান। একই সঙ্গে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক তথা শোষকদেরকেও 'আস্‌সালামু আলায়কুম' জানিয়ে দেন।

www.pathagar.com

এই সম্মেলনের পর আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদিকে মওলানা সাহেব সম্মেলন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন তাঁদের নামে যে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করেছিলেন তা নিয়ে আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী অংশ তুমুল প্রচারণা চালাতে থাকেন। তাঁরা মওলানা সাহেবকে পাকিস্তান-বিরোধী ও ভারতের দালাল এমন কি দেশের শত্রু বলতেও কুন্ঠিত হন নি। এর পরে মওলানা পুনরায় নিজস্ব মতানুসারে নতুন দল গঠনে উদ্যোগী হন।

বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের কার্যপ্রণালী, মতবাদ মওলানাকে যে আকৃষ্ট করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। নতুন দল গঠনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সারা পাকিস্তানব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করা। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল অংশ যে তাঁর সহায় হবে এটাও তিনি জানতেন। ১৯৫৭ সালে এ উদ্দেশ্যেই ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে নিখিল পাকিস্তানের প্রগতিশীলদের এক সম্মেলনে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাল কুর্তা নেতা খান আবদুল গফফার খান, বেলুচিস্তানের আচফজাই, সিন্ধের জি. এম. সৈয়দ, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতেখার প্রমুখ প্রগতিশীল নেতা যোগ দেন। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বামপন্থী ও কমিউনিস্ট মহল একে পূর্ণ সমর্থন দেন। রূপমহলের এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সংক্ষেপে যার নাম ন্যাপ। এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী স্বয়ং এবং সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী। দলের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় দেশকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের হাত থেকে মুক্ত করা। এর পর ন্যাপকে মওলানা ভাসানী তাঁর উদ্দিষ্ট নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি এ ন্যাপকে নিয়ে বার বার সোচ্চার হয়েছেন।

রাজনৈতিক দল ছাড়াও মওলানা ভাসানী কখনও শ্রমিক সংগঠন এবং সারা জীবন কৃষক সংগঠনের কাজ করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন কৃষক সমিতির। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষকরাই এদেশের সব কিছুর মূলে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা মওলানা নিজের উপলব্ধি থেকেই বুঝেছিলেন। এজন্যেই পাকিস্তান সৃষ্টির পর ব্যাপক অত্যাচার ও ধর-পাকড়ের মধ্য দিয়ে যে কৃষক সংগঠনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তার পুনরুত্থানে মনোনিবেশ করেন ১৯৫৬ সালে।

www.pathagar.com

কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে কৃষক সমিতি আগে থেকেই ছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্টদের উপর দমনীতির কারণে কৃষক সমিতিও ভেঙে দেয়া হয়। কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অভাবের কারণে কৃষক সমিতির প্রকাশ্য কাজও দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও পূর্বে বিভিন্ন কৃষক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এবং নিয়মতান্ত্রিক কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, বিশেষ করে টাঙ্গাইল-পাবনার চরাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ ও আসামের কৃষকদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অসম্ভব রকমের। তিনি জানতেন কি করে কৃষকদের সংগঠিত করতে হয়। এই প্রেক্ষিতেই মওলানা ভাসানী তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতিরও পুনরাবির্ভাব ঘটান।

এখানে একটা কথা স্মরণীয়, '৫৬ সালেই আওয়ামী লীগে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই '৫৬ সালেই ফুলছড়িতে মওলানা ভাসানী এক কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হন এর সভাপতি এবং হাতেম আলী খান হন এর সেক্রেটারী। এ সম্মেলনে প্রায় লক্ষ কৃষকের সমাবেশ ঘটে। সকল প্রগতিবাদী রাজনৈতিক কর্মী এতে যোগ দেন।

কিন্তু কৃষক সমিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগেও কিছু কথা আছে। কৃষক সমিতি চালু করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের অমত থাকলেও পার্টির কর্মী মহলে এর দাবী ছিল। নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল কৃষক সমিতি নিয়ে মুক্ত রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলে পুনরায় কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত হবার অবকাশ থাকবে। আমি নিজেও সে সময়ে কৃষক সমিতি নিয়ে প্রকাশ হবার বিরোধী ছিলাম। তবে পার্টির কর্মী মহলের তরুণ নেতৃত্ব মওলানা ভাসানীকে প্রভাবিত করে। তিনি নিজেও পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, এদেশের জনগণের শতকরা ৮৫ জনই কৃষক। তাদেরকে সংগঠিত করতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার এদেশীয় দালাল সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামেই জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ ধারণা থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী মহলের প্রস্তাবে রাজী হয়ে কৃষক সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন।

'৫৬ সালে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। '৫৭ সালে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে সকল প্রগতিবাদীর সমাবেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল

www.pathagar.com

আওয়ামী পার্টি [ন্যাপ]। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আর '৫৭ সাল থেকেই নতুন প্রতিষ্ঠিত দু'টি সংগঠনের সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার জন্য মওলানা ভাসানী পুনরায় পূর্ব-বাংলার গ্রামে গ্রামে সফর ও সভা শুরু করেন। মওলানা সাহেব প্রতিটি জেলায় গিয়ে ন্যাপের প্রত্যেক কর্মীকে কৃষক সমিতি করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময়ে তিনি প্রায় সকল জেলাতেই কৃষক সম্মেলন অথবা সমাবেশ করেন। মওলানা ভাসানীর অসাধারণ তৎপরতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের নিষ্ঠার ফলেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছাড়া সকল জেলাতেই কৃষক সমিতি গঠিত হয়। এমন কি অধিকাংশ মহকুমা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কৃষক সমিতির অফিস খোলা হয়।

এই কৃষক সমিতি গঠনের জন্যে মওলানা ভাসানী শুধু যে সভা, সমাবেশ এবং সফর করতেন তা নয়, মওলানা সাহেবের অপর একটি দিকও ছিল। তাঁর ছিল অসংখ্য মুরিদান। এসব মুরিদানকে বয়েত করার সময়ও তাদের থেকে কৃষক সমিতি করার লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করতেন। তাঁদেরকে বুঝাতেন কেন কৃষক সমিতি করতে হবে। এ সময়ে মওলানা সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠদের একজন হিসেবে দেখেছি প্রতিটি সভা-সমাবেশেই এমন কি সাধারণ আলোচনার সময়ও কৃষক-রাজ—শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিতেন। উদ্বুদ্ধ করতেন সাধারণ মানুষদের। কৃষকদের শত্রু যে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশের জোতদার মহাজন শ্রেণী, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী, গ্রাম-টাউট এবং ঘুষখোর সরকারী আমলা-শ্রেণী তা তিনি সব সময়ই কৃষকদেরকে বুঝাতেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন মূলত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। কৃষকদের মনে তাদের নিজস্ব দুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনার কারণকে তুলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সৃষ্টি করায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কৃষক সমিতি গঠনের পর ষাটের দশকে তিনি পর পর মহীপুর, পাকশী, ঢাকা, সন্তোষ প্রভৃতি স্থানে বিশাল বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। প্রতিটি সমাবেশের মধ্য দিয়েই কৃষকদের মধ্যে জাগরণের নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, ক্ষোভ সৃষ্টিতে মওলানার জুড়ি ছিল না। মওলানা সাহেব তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ব্যর্থতা আমাদের। কারণ আমাদের সংগঠন করার

www.pathagar.com

দায়িত্ব, আন্দোলনের জোয়ারকে ধরে রাখার দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারিনি।

১৯৬৯ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে মওলানা জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে দুর্নীতিবাজ আমলাদের বিরুদ্ধে এদেশের প্রথম সফল ঘেরাও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। এই সময়ে কৃষক সমাবেশে তিনি লাল টুপি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। প্রতিটি সম্মেলনে এ লাল টুপির সমাবেশ ঘটনোর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের রেডগার্ডদের দৃষ্টান্ত দেখাতেন। লাল টুপির প্রচার ছিল মওলানা সাহেবের সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাধারার ফসল। পাকশী, মহীপুর, সন্তোষ, শিবপুর এমন কি খোদ ঢাকায়ও লাল টুপির সমাবেশ ঘটান।

ফলশ্রুতিতে কৃষকদের মধ্যে সাংঘাতিক ধরনের জঙ্গী মনোভাব গড়ে ওঠে। এখানে স্মরণীয়, প্রতিটি সমাবেশই সংগঠিত হয়েছিল সামরিক আইনকে উপেক্ষা করে। এর মধ্যে একমাত্র শিবপুরের সমাবেশটি স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষকদের এই জঙ্গী মনোভাবকে সামগ্রিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। নেতৃত্ব বার বার পিছিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে যদিও আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমদ, অহিদুর রহমান, টিপু বিশ্বাস প্রমুখ কৃষক নেতাদেরকে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন. তবু এর ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। এর জন্য দায়ী ছিল নেতাদের দোদুল্যচিত্ততা।

কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন নেতা এ সময়ে মওলানা ভাসানীকে বিপ্লবের ডাক দেবার আহ্বান জানালেও নিজেরা উদ্যোগী হননি। মওলানা সাহেব নিজে এর কখনও বিরোধিতা করেন নি। তবে তিনি বলতেন, "আমি ত' মোল্লা এবং বৃদ্ধ! অস্ত্র ধরা ত' আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা যারা শক্ত সমর্থ রয়েছ তারা কর না কেন?" এদেশের কৃষক আন্দোলনে মওলানা ভাসানী অবশ্যই একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখে গেছেন।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের জাগরণের জন্যেও মওলানা ভাসানীর অবদান খাটো নয়। তিনি পাঞ্জাবের টোবাটেক সিং নামক স্থানে ১৯৬৯ সালে ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষকদের উপর জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণ ছিল আরো প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপক। ১৯৬৯ সালের সে সমাবেশে মওলানার সঙ্গে

www.pathagar.com

আমারও যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের উপর নিষ্পেষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার।

সামন্ত প্রভুত্ব ১৯৬৯ সালেও দেখেছি কৃষকদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। কোন কৃষক অবাধ্য হলে তার ঘরও জ্বালিয়ে দেয়া হতো। ভোট দেয়ার স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না। কৃষক সমিতির কর্মীদেরকে হত্যা করতেও জমিদার-মহাজনরা কুন্ঠিত হত না। মোটকথা, পাঞ্জাবের কৃষকরা মধ্যযুগের সার্ফদের চেয়ে কোন অংশে ভাল অবস্থায় ছিল না। সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে গিয়ে আমরা কৃষকদের পোড়া ঘর-বাড়িও দেখেছি। মওলানা ভাসানী আহূত টোবাটেক সিং-এর সে সমাবেশে প্রায় এক লাখের মত কৃষক একত্র হয়েছিলেন। এঁরা এসেছিলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অঞ্চল থেকে। দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটেও কৃষকরা এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী বক্তৃতা মঞ্চে দৃপ্ত কণ্ঠে এসব কৃষককে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি কৃষকদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে জমিদাররা অবশ্যই নতি স্বীকারে বাধ্য হবে। মওলানা সাহেবের এ আহ্বানের কিছুটা সফলতাও এসেছিল। কৃষকরা সচেতন প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

মওলানা সাহেবকে বার বার 'ভারতের দালাল', 'পাকিস্তানের দালাল' প্রভৃতি দুর্নামের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্যে সব সময়েই অনড় ছিলেন। তাই ত' দেখা যায়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে তিনিই প্রথম এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানীই ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে এবং আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় শতাব্দী প্রবীণ একজন বৃদ্ধ পুনরায় তাঁর সাংগঠনিক শক্তির অভূতপূর্ব প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানী স্বপ্ন দেখতেন। তাকে রূপ দেয়ার জন্যে সাংগঠনিক কাঠামোও গড়তেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সে সংগঠনের বিরুদ্ধেও যেতেন, গড়তেন নতুন সংগঠন। এখানেই মওলানা ছিলেন সীমিত। কিন্তু চিন্তা, চেতনা এবং লক্ষ্য ছিল সঠিক। কৃষকদেরকে কিভাবে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া যায় সে ব্যাপারে তাঁর প্রক্রিয়া ছিল সঠিক। স্থায়ীভাবে আংশিক সংগ্রাম, সমাবেশের মত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কৃষকদের মাঝে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার এবং বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ভিয়েতনামের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ প্রক্রিয়া সঠিক ছিল। এভাবেই কৃষকদেরকে বিপ্লবের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এখানেই মওলানা ভাসানীর সার্থকতা। ব্যর্থতা এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির।

মওলানা ভাসানী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও কৃষকদের মুক্তির কথা ভাবতেন। কারণ অনেক সহকর্মীকেই কৃষক ফ্রন্ট চালু এবং তাকে জোরদার করার কথা বলে গেছেন। কৃষকরাই যে মূল শক্তি এ কথাও তিনি বার বার জোর দিয়ে বলে গেছেন। কৃষক সংগঠনের ওপর ভিত্তি করেই এদেশের ভবিষ্যত আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও তিনি বার বার উল্লেখ করে গেছেন। একটি সংগঠিত পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ না করা পর্যন্ত এদেশে মুক্তি সম্ভব নয়—সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্য-বাদের কবল থেকেও সঠিক মুক্তি সম্ভব নয়—একথা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনী থেকে স্পষ্ট। এ পথই তাঁর নির্দেশিত পথ।

www.pathagar.com

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

মওলানা ভাসানী ও আসামের লাইন-প্রথা

১৯৩৮ সালের কোন এক সময়ে আসামে লাইন-প্রথা নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ আন্দোলন চলেছিল প্রায় দীর্ঘ দশ বছর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

তিনি মোমেনশাহী জেলার টাঙ্গাইল এলাকার বাসিন্দা। তিনি হলেন কৃষক দরদী সত্যিকার একজন কর্মীপুরুষ। টাঙ্গাইলে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মীরূপে হয় তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা কৃষক জনসাধারণের অন্তরে এতটা সাড়া জাগিয়েছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে তাঁর দলে লক্ষ লক্ষ কৃষককর্মীর যোগদানের ফলে। কিছুদিনের মধ্যেই টাঙ্গাইলের অত্যাচারী জমিদারগণ প্রমাদ গুণতে থাকেন। কিছুতেই তাঁকে নত করতে না পেরে জমিদাররা অবশেষে তাঁকে দেশছাড়া করার জন্য ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করেন। আমলাতন্ত্রের আনুকূল্যে তাঁদের ষড়যন্ত্র সফল হয় এবং মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল ত্যাগ করে আসামে চলে যেতে বাধ্য হন।

আসামে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, আসামের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বাঙালীদের প্রতি অমানুষিক সরকারী জুলুম চলছে। বাঙলার বিভিন্ন স্থান থেকে, বহু সর্বহারা মুসলমান কৃষক প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব থেকে আসামের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে নওগাঁ, তেজপুর জেলায় বসতি স্থাপন করে আসছিল। তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে আসামের ঐসব অঞ্চলের হিংস্র জন্তুর আবাসপূর্ণ বনজঙ্গল পরিষ্কৃত হয়ে মানুষের আবাসপূর্ণ হয়ে উঠে। প্রথমদিকে এসব হিজরতকারীকে সাগ্রহে গ্রহণ করা হত। কারণ তাদের পরিশ্রমে আসামের বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে আসামের রাজস্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৎসর বৎসর

www.pathagar.com

তাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকায় আসামের কায়েমীস্বার্থ শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠল এবং আসামের সরকারকে এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি শুরু করল। আসাম সরকারও সম্ভবত তাই চাইছিলেন। তারই ফলে প্রবর্তিত হল লাইন-প্রথা। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এইসব বসতি স্থাপন-কারীর অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হল বটে, কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পরে যারা এসে আসামে বসতি স্থাপন করেছে তাদের উৎখাত করার নির্দেশ প্রচারিত হল। কিন্তু এই পরবর্তী সময়ে বাঙলার বহু সর্বহারাই আসামে হিজরত করে নানা স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল, বিশেষ করে তেজপুর জেলার মঙ্গলদই অঞ্চলের এক বিরাট এলাকার ঝাড়-জঙ্গল সাফ করে তারা বাড়ী-ঘর করে আস্তানা গেড়ে বসেছিল। এই বিশাল অঞ্চলে আগে বাঘ-ভালুক হিংস্র জন্তরাই বিচরণ করত। হিজরতকারীরাই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বহু লোক ক্ষয়ের বিনিময়ে এই অঞ্চলকে আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত করেছিল। এতদিনকার এই নো-ম্যানস ল্যাণ্ড আবাদ-যোগ্য জমিতে পরিণত হওয়ায় আসামের এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থীর লোভের আগুনে ইন্ধন যুক্ত হল। আসাম সরকার তাদের খুশি করতে সম্ভবত ১৯৪৫ সালে হতভাগ্যদেরকে উৎখাত করার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মওলানা ভাসানী এই সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর তীব্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আসাম সরকারের পুলিশ বাহিনী মঙ্গলদইর উপরোক্ত এলাকায় যে নির্মম ও বর্বর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, জুলুমের ইতিহাসে তার নজির খুবই কম মিলবে। হাতি দিয়ে সে সমস্ত এলাকা বিধ্বস্ত করেই তারা ক্ষান্ত হয় নাই, প্রতিটি গৃহে অগ্নি-সংযোগ করে তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়—এমন কি, গৃহের সামগ্রী সরাবার অবসরও তারা কাউকে দেয় নাই। ফলে এই হতভাগ্যের দল একেবারে সর্বাত্মকভাবে সর্বহারা হয়ে পড়ে।

মওলানা ভাসানী এই সরকারী জুলুমের প্রতিবাদকল্পে এক প্রাদেশিক কৃষক-সম্মেলন আহ্বান করলেন মঙ্গলদই-এ। তিনি আমাকে চিঠি লিখলেন, এই সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। তাঁরই এক সাগরেদ ছিলেন তখন আজাদ অফিসে—তাঁর নাম মোসলেমউদ্দিন। আজাদের প্রুফ বিভাগে তিনি তখন কর্মরত ছিলেন। ভাসানী সাহেব এরই উপর দিলেন আমাকে মঙ্গলদই নিয়ে যাওয়ার ভার। মোসলেমউদ্দিন সাহেব তাগাদায় তাগাদায় আমাকে অস্থির করে তুললেন। কাজেই যথা-

www.pathagar.com

সময়ে আসাম মেলে চড়ে বসা ছাড়া আমার উপায়ান্তর রইল না। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর আহবানে সাড়া না দেয়া তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ তখন যদিও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 'বিগ-থ্রি'র (হক-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী) অন্যতম তিনি হয়ে উঠেন নাই, তবুও আন্তরিক ধর্মনিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তায় তিনি দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন। কলকাতায় এলেই তিনি ঘন ঘন 'আজাদ' অফিসে যাতায়াত করতেন এবং আমাদের সাথে মন খুলে তাঁর দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতার প্রকাশ করতেন। কৃষকদের জন্য তাঁর দরদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের লেশমাত্র কারোর মনে স্থান পেত না। তাঁর আহবানে লাখে লাখে কৃষিকর্মীর জামায়েত হওয়ার সংবাদ তখন সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে। কত প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের কতবার জানিয়ে গেছেন তাঁর আহবানে লাখ লাখ কৃষক-সমাবেশের অশ্রুতপূর্ব বারতা। ইতিপূর্বে অন্য কোন নেতার আহবানে কৃষকদের মধ্যে এমন অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টির কথা আমরা শুনিই নাই। তিনি প্রায়ই আমাদের বলতেন: 'আপনারা চিন্তাবিদ, আপনারা শুধু পথ বাতলিয়ে দিন, কাজের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন। দেখুন, আমি কি করতে পারি।' এসব কথায় মওলানার যে আন্তরিকতা ও দৃঢ়সংকল্পের সুর ফুটত তাতে মুগ্ধ ও আস্থাশীল না হয়ে উপায় ছিলো না। কাজেই মওলানার আহবান যখন এলো, তখন তা আমার প্রতি তাঁর নির্দেশের মতই মনে হলো, যে নির্দেশ পালন না করে আমার গত্যন্তর ছিলো না।

যেতেই যখন হবে, তখন সেজন্য আমাকে প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হলো। আমি একটি ছোট ভাষণ লিখে ফেললাম। এবং ছোট্ট পুস্তিকাকারে তা কয়েক হাজার ছাপিয়েও ফেললাম, সেগুলি মোসলেমউদ্দিনকে বুঝিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসাম মেলে চেপে বসলাম। প্রায় দু'দিন অবিশ্রান্ত ট্রেন জার্নির পর আমাদের গন্তব্যস্থল তেজপুর স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। স্টেশনে নেমেই দেখলাম, হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে জনাব মাহমুদ আলী সাহেব এগিয়ে আসছেন। তাঁর সাথে ছিলেন কয়েকজন স্থানীয় কৃষককর্মী। শুনলাম, 'হনোজ দিল্লী দূরাস্ত' গন্তব্যস্থল এখনো বহুদূরে। মঙ্গলদই পৌঁছতে এখনো আমাদের বিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। দীর্ঘ দুইদিনের অবিরাম ট্রেন জার্নিতে পরিশ্রান্ত আমার কানে এ সংবাদ সুমধুর হয়ে বাজলো না। যখন ঢালা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকার একান্ত কামনায় মন উন্মুখ তেমন অবস্থায় এ সংবাদ কি করেই বা

www.pathagar.com

মধুর হতে পারে। যাক এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার প্রশ্নে জানতে পারলাম, এজন্য হাতীর ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে, তবে মোটরগাড়ীর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। আমি সত্রাসে বলে ফেললাম, হাতীতে কাজ নাই, মোটরগাড়ীর ব্যবস্থাই করা যেতে পারে কিনা তাই দেখুন। শেষ পর্যন্ত মোটরগাড়ীর ব্যবস্থাই করা হলো, তবে সেজন্য রওনা হতে একটুখানি দেরী হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে স্টেশনের কাছে বাড়ীতে আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করা হলো। মিষ্টিমুখ ও চা পান করে অনেকটা চাঙ্গা বোধ করলাম। রওয়ানা হতে রাত প্রায় আটটা বেজে গেলো।

মঙ্গলদই-র নির্দিষ্ট বাড়ীতে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। স্বয়ং মওলানা সাহেবই সর্বপ্রথম আমাদের এগিয়ে নিতে এলেন। তাঁর সাথে কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক। এক আসামী মুসলমান ভদ্রলোকের সাথে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এরই বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে কর-মর্দন করলেন। তাঁর ভাষা শুনেই বুঝতে পারলাম, তিনি আসামের লোক—বাঙালী নন। ভদ্রলোকের নামটা ভুলে গেছি। তিনি সমাদরে আমাদের তাঁর ঠিকানায় নিয়ে গেলেন। দেখলাম সেখানে কয়েকটি শ্বেতশুভ্র বিছানা পাতা রয়েছে। কয়েকটি চেয়ারও ইতস্ততঃ ছড়ানো। আমরা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। পরে হাত-মুখ ধুয়ে একেবারে বিছানায় উঠে বসলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খানা দেয়া হলো। ক্ষুধা পেয়েছিল প্রচুর। কাজেই গো'গ্রাসে গিলতে ইতস্ততার সঙ্কোচ ছিল না। খানার প্রকৃতির কথা এতদিনে ভুলে গেছি। আসামী রান্না যে আমাদের রান্নার চাইতে কিছুটা পৃথক ছিল তা মনে আছে। আবছা মনে পড়ে ঃ পোলাও-গোশ্‌ত সম্ভবতঃ সেদিন খেয়ে ছিলাম। কিন্তু তাতে প্রচুর ঝাল ছিল। তবে ঝাল সত্ত্বেও প্রচুর খেয়েছিলাম, একথা মনে আছে। পরদিন ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এসে যেদিকে তাকিয়েছি, সেদিকেই দেখেছি কেবল মানুষের মাথা আর মাথা। সকালে নাস্তা খাওয়ার পর মওলানা ভাসানী আমাকে নিয়ে ঘরের বাইরে এক প্রকাণ্ড হাতীর উপর সোয়ার হলেন। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রম করে আমরা এই জন-সমুদ্রের পরিমাপ করতে চেষ্টা করতে চেষ্টা করলাম। যেখান দিয়ে গিয়েছি, সেখানকার জন-সমুদ্রই মাথার উপর লাঠি উত্তোলন করে আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়েছে এবং শ্লোগান 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' (আসামে

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে পাকিস্থান উচ্চারণ করা হয়) আউড়িয়েছে। মনে হলো জনতার সংখ্যা দু'লাখের কম তো ছিলোই না, বরং এর বেশীই ছিল। জন-সমুদ্র দেখে কৃষক সমাজে মওলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তার পরিমাপ করতে চেষ্টা করলাম।

রাস্তা পরিক্রমণ শেষ করে আমরা আবার আমাদের আরামস্থলে ফিরে এলাম। মওলানা ভাসানী আস্তানা নিয়েছিলেন অন্যস্থানে—তিনি সেখানে চলে গেলেন। বলে গেলেন, ৪টায় সভা শুরু হবে, ঠিক সময়ে যেনো আমরা সেখানে উপস্থিত হই। এরপর গোসল ও আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেলো। ৪ টার কিছু আগেই আমরা সভা হলের দিকে রওয়ানা হলাম। সে স্থান বেশী দূরে ছিলো না। দেখলাম, বিরাট এক মাঠে সভার স্থান করা হয়েছে। কয়েকটি চৌকি পেতে সভামঞ্চ কিছুটা উঁচু করা হয়েছে। যেদিকে চাই, সেদিকেই দেখেছি কেবল মাথা। বিরাট মাঠের কোথায়ও তিল ধারণের স্থান ছিল না। মুহুর্মূহু নানা শ্লোগান ও 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনি লক্ষকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল। সভামঞ্চ থেকে বেশ কিছু-দূরে কিছু সংখ্যক সাদা পোশাকপরা লোক দাঁড়িয়েছিল। ওরা আসাম সরকারের নিমকহালাল পুলিশ তা জানতে আমাদের বিলম্ব হলো না।

যাহোক, যথারীতি কুরআন পাঠের পর সভার কাজ শুরু হলো। একজন আমাকে সভাপতি নির্বাচনে প্রস্তাব করলেন এবং আরেকজন সে প্রস্তাব সমর্থন করে কিছু বললেন। পরে মওলানা সাহেব সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করলেন এবং আমাকে ভাষণ দিতে অনুরোধ জানালেন। আমি আমার ক্ষুদ্র ভাষণটি পাঠ করলাম। ইতিপূর্বেই সে ভাষণের ছাপা পুস্তিকাগুলো উপস্থিত জনতার প্রথম কয়েক সারিতে বিতরিত হয়েছিল। কিন্তু জনতা যেখানে কয়েক লাখ, সেখানে বিতরিত পুস্তিকাগুলো সাগরে বিন্দুবৎ মনে হলো। যাহোক, আমার ভাষণে যেহেতু লাইন-প্রথার এবং আসাম সরকারের নির্মম জুলুমের তীব্র নিন্দা ছিল, এ কারণে ভাষণ পাঠ শেষ হলে জনতার মধ্য থেকে বিপুল করতালি ধ্বনি উত্থিত হলো। এরপর মওলানা ভাসানী জনতার বিপুল করতাল ধ্বনির মধ্যে প্রায় দীর্ঘ দু'ঘন্টা ধরে অত্যন্ত দরাজ গলায় যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে ছিল আসাম সরকারের কঠোর সমালোচনা এবং পুলিশের বর্বর আচরণের তীব্র নিন্দা। তিনি উপস্থিত পুলিশদের লক্ষ্য করেও কয়েকটি কথা বললেন। মনে হলো,

www.pathagar.com

তার বাক্যবাণে পুলিশও তেমন স্বস্তি বোধ করতে পারছিল না। পরে কয়েকটি জরুরী প্রস্তাবে পাস করে সভার কাজ শেষ হয়।

পরদিন সকালে নাশ্‌তা খাওয়ার পর আবার মঙ্গলদই বিধ্বস্ত এলাকা দেখতে গেলাম। সেখাকার কয়েকজন কৃষক কর্মীসহ মোসলেমউদ্দিন এবং সম্ভবতঃ মাহমুদ আলী সাহেবও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মোসলেম-উদ্দিনের সাথে ক্যামেরা ছিল। কাজেই বিধ্বস্ত এলাকার ফটোগ্রাফ তুলতে অসুবিধার কারণ ছিল না। এক বৃহৎ এলাকা জুড়ে ছিল এই বিধ্বস্ত পল্লী। সেখানে একখানা বাড়ীও অক্ষত ছিল না। অধিকাংশ বাড়ীই অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় একেবারে মাটিতে মিশে গেছে। শোনা গেল, নানাশ্রেণীর শস্য-ক্ষেত্রগুলো হাতী দিয়ে দলে-পিষে দেয়া হয়েছে—তাতে শস্যাদির বিন্দুমাত্রও ছিল না। এই বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ইতি-মধ্যে মোসলেমউদ্দিন তাঁর ক্যামেরা দিয়ে এই বিধ্বস্ত পল্লীর অনেকগুলো ছবি তুলে ফেললেন। পরে এইসব ছবিসহ মঙ্গলদই'র এই অগ্নিদগ্ধ অঞ্চলের একটি সচিত্র বিবরণ আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুপুরে খাওয়ার পর আমরা আমাদের মেজবানের নিকট বিদায় গ্রহণ করলাম। সেদিনই আমাদের মঙ্গলদই থেকে বিদায় নিতে হবে। মওলানা ভাসানী সাহেব আমাদের কলকাতা যাবেন বলে খবর পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে আমাদের যেতে বলেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মওলানা সাহেব তৈরী হয়ে বসে আছেন এবং আমাদের জন্য একরাশ নানাশ্রেণীর সু-স্বাদু ফল কেটে সাজিয়ে রেখেছেন। আমরা সে-সবের সদ্ব্যবহারে লেগে গেলাম। এমন মিষ্টি ও সু-স্বাদু আনারস আর কোথাও খেয়েছি বলে মনে পড়ল না। আসামের এই মিষ্টি আনারস প্রায় ডজন খানেক করে আমাদের সঙ্গে দেয়ার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আর একটি ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখলাম, সেখান-কার এক ঘরের মেঝেতে অনেক চাউল স্তূপীকৃত হয়ে আছে। তাছাড়া কতগুলো তাজা গরু ও খাসী প্রাঙ্গণে বাঁধা রয়েছে। সেখানকার একজন জানালেন, সভার বিরাট জনতা সংগে করে নিজেদের খাবার-সামগ্রীও নিয়ে এসেছিল। দু'দিন ধরে খাবার-দাবার পর এগুলো উদ্বৃত্ত হয়েছে শুনে আমরা স্তম্ভিত হলাম। আমাদের বিস্মিত হতে দেখে সেখাকার কেউ কেউ আমাদের জানালেন, এতে আমাদের বিস্মিত হবার কিছু নেই। মওলানা ভাসানীর প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের সময়েই এ রকম ব্যাপার হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

যাহোক, যথাসময়ে আমরা মোটরযোগে তেজপুর স্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। তেজপুরে যখন ট্রেনে উঠে বসলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আহার্য-সামগ্রী আমাদের সঙ্গে দেয়া হয়েছিল। পরদিন সকালে যখন আমরা আহারে মনোযোগী হলাম, মওলানা সাহেব আমাদের সঙ্গী হলেন না। কারণ, শুনলাম তিনি রোযা রেখেছেন। শুনে স্তম্ভিত হলাম যে, আসাম সরকারের জুলুম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন রোযা রেখেই চলবেন। যাহোক, সেদিন সন্ধ্যার দিকে আমরা কলকাতায় পৌঁছলাম। আনারসগুলো দেখে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আজরফ

ভাসানী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

ভাসানীর জীবনে মানব জীবনের এতগুলো দিক এমন পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল যে, তার এক দিকের আলোচনা করলে অপর দিক সম্বন্ধেও কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জীবনের গোড়া থেকে তিনি বোধহয় হাসান-ই-কামিলের আদর্শকে রূপায়িত করার সাধনা করেছিলেন এজন্য নানা বিষয়ে তাঁর কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। যেহেতু মানব জীবন এক ও অবিচ্ছেদ্য এজন্য তাঁর এক দিকের সঙ্গে অপর দিকের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্তমান। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গেলে তাঁর রাজনৈতিক বা উদারনৈতিক জীবনের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে তৎকালীন আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগের পুনর্গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসানী তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তখন মুসলিম লীগের আদর্শে তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। নওয়াব সলিমউল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরে যে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়েছিল তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, ভারতের বুকে পুনরায় মুসলিম-দের প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরে যে জাতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল, এ বংশদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতীফ, জাস্‌টিস্‌ আমির আলী প্রমুখ নেতাগণ আজীবন সাধনা করেছিলেন, তারই মাধ্যমের বাস্তবরূপ ছিল ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ। তবে তখনও মুসলিম মানস থেকে সামন্ত সর্দারদের ভূমিকার চিত্র সম্পূর্ণ অন্তহিত হয়নি। নওয়াব সলিমউল্লাহ্‌র মানস থেকেও সে সামন্ত-বাদের প্রভাব বিদূরিত হয়নি। তিনি মুসলিমদের যে শ্রেণীকে আবার এ উপমহাদেশের বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন—তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। এদেশীয় মুসলিম জনসাধারণের তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে হিন্দু জমিদার ও মহাজনের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে একটা শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টিতে ছিলেন অভিনিবিষ্ট। এজন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নওয়াব, নাইট ও লক্ষপতি জমিদারদের দ্বারা গঠিত মুসলিম লীগের প্রাথমিক পর্যায়ে তাই এদেশীয় মুসলিম সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টিই ছিল মূল লক্ষ্য।

পরবর্তীকালে শের-ই-বাঙলা এ. কে. ফজলুল হক মুসমিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও, তাতে সর্বসাধারণ মুসলিমদের জীবনের মুক্তি কামনা মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয়ে দেখা হয়নি। আজীবন দরিদ্র নিঃসহায় কৃষক প্রজার দুঃখে কাতর হলেও এবং পরবর্তীকালে কৃষক শ্রমিক নামক রাজনৈতিক পার্টি গঠন করলেও দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের প্রাণের ব্যথা পুনর্গঠনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ মহলে বিশেষভাবে আলোচিত হয়নি। মুসলিম লীগ জনসাধারণের মুসলিম লীগ হয়ে দেখা দিয়েছিল—মওলানা ভাসানীর তাতে যোগ দেওয়ার কালে। তার কারণ স্বরূপ বলা যায়—মুসলিম লীগের এ নতুন আদর্শিক পরিবর্তনের সূচনায় তখনকার দিনের কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা জওয়াহের লাল নেহেরুও তখন কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে mans contact movement বা জন-সংযোগ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। ভাসানীর পক্ষে দরিদ্র ও নিঃসহায় জনসাধারণের সঙ্গে আসামের মাটিতে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল বলে, তাঁর পক্ষে মুসলিম লীগের মধ্যে এ অভিনব অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক বিন্যাস করা সম্ভবপর হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ভাসানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পূর্বেই ভাসানীর জীবনে দেখা দিয়েছিল সমাজ সম্বন্ধে এক বৈপ্লবিক চেতনা।

১৯৩৭ সাল। আমি তখন সবেমাত্র বাড়ীতে যেয়ে আমাদের ছোট-খাটো জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। কোন রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করে, তার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যও লালায়িত হইনি—এমনি সময় সিলেট জিলার সর্বত্র এক মহা শোরগোল উঠে ঃ ভাসানী আসছেন এবং একটা বিশেষ তারিখে সারদা মেমোরিয়াল হলে বক্তৃতা করবেন। সে তারিখে সিলেটে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল বলে, আমি সে বিশেষ তারিখের ২/১ দিন আগে সিলেটে উপস্থিত হয়ে তার আগমনের অপেক্ষা করতে থাকি। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ ইং ২০শে সেপ্টেম্বর আমরা কয়েকজন সাহিত্যামোদী বন্ধু একত্রিত হয়ে সিলেটে "মুসলিম সাহিত্য সংসদ" বলে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। তার মধ্যে মরহুম সর-ই-কউম এ. জেড. আবদুল্লাহ, মৌলবী নূরুল হক,

www.pathagar.com

মরহুম শেখ সিকান্দর আলী, মরহুম দেওয়ান অহিদুর রেজা প্রমুখ আরও অনেকেই ছিলেন। গঠনকালে মৌলবী নূরুল হক তার নিজস্ব প্রেরণায় প্রকাশিত আল্-ইসলাহ নামক একখানা অতিশয় ক্ষুদ্র আকারের মাসিক পত্রকে সে প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসাবে দান করেন। তাতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে মৌলবী নূরুল হক এখনও তাকে আঁকড়ে ধরে টিকে রয়েছেন। এ সূত্রে উপরোক্ত উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাগণের সঙ্গে আমার প্রীতি ও সখ্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত গাঢ় হয়ে ওঠে। সে নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে ভাসানী আসবেন—এ বার্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে, সর-ই-কউম এ. জেড. আবদুল্লাহ, মৌলবী নূরুল হকের সঙ্গে ভাসানীর মওলানাকে দেখবার উদ্দেশ্যে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত সারদা মেমোরিয়াল হলে উপস্থিত হলাম।

ভাসানী তখন আসাম প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম লীগ—নির্বাচিত সদস্য। তিনি তখন মরহুম আবদুল মতীন চৌধুরী, মরহুম দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব ও সিলেট শহরের অনেকগুলো মুসলিম লীগ কর্মীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। প্রথম দর্শনে তাঁর প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব দেখা দেয়নি। ছোট-খাটো মানুষ, খদ্দরের পাজামা ও পিরহান পরিহিত। মাথায় সে তালের আঁশের টুপি। দেখতে নিতান্ত সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়। তবে যখন মঞ্চে আরোহণ করে আসামবাসী বহিরাগতদের নির্যাতনের কাহিনী অনর্গল ভাষায় বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন, তখন কেবল মুসলিম লীগপন্থী মানুষই নয়, সমবেত জনতার চোখই অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। গভীর বেদনাপ্লুত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সেদিন সুরমার জলতরঙ্গেও গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। ইতিপূর্বে মওলানা-মৌলভী সমাজের কোন লোকের মুখে এরূপ সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার নমুনা দেখিনি। তারপরের দিনই আবার সিলেট-শিলঙ মোটর রোড ধরে প্রথমে শিলঙ, তারপর গৌহাটী হয়ে ভাসানী চলে গেলেন। তবে বহুদিন পর্যন্ত তাঁর স্মৃতি সিলেটের বুকে জীবন্ত রইলো।

তারপরে বহুদিন গত হলো—ভাসানীর সঙ্গে আমার দেখা নেই। আমি নিজেও মুসলিম লীগের কোন সদস্যপদ গ্রহণ করিনি। আমার মানসে কোন রাজনৈতিক মতবাদই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তবে ১৯৩৭ সালে ভারতের কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হওয়ার পরে, কংগ্রেসের মুখোশ পরে হিন্দু মহাসভার লোকেরা যেভাবে মুসলিম সমাজের উপরে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে, তার ফলে ক্রমেই কংগ্রেসের

www.pathagar.com

প্রতি আর শ্রদ্ধার ভাব থাকেনি। রাজনীতিতে যোগদান না করলেও সাহিত্যের অঙ্গনে তখন থেকেই রীতিমত কসরত শুরু করেছি। নানাবিধ বিষয়ে গল্প ও প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছি। মানবতা যেখানে লাঞ্ছিত ও অপমানিত তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার তখনকার দিনের কাজকর্ম ছিল সম্পূর্ণভাবে আমার পেশার বিরোধী। কারণ তখন আমার পেশা ছিল জমিদাররূপে শাসন পরিচালনা। অথচ আমার জীবনে মানুষের উপরে মানুষের শাসন অথবা শোষণ ছিল নিতান্ত গর্হিত কাজ।

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন আসাম ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হয়েছে। সিলেটের ছোট বড় সকল শ্রেণীর জমিদারগণ অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের মনে আশংকা দেখা দিয়েছে, তারপরে না জানি আরও কোন ঘোরতর কোপ তাদের ঘাড়ে পড়বে। তবে আমাদের পরিবারের প্রায় সকলেই একযোগে আইন প্রবর্তনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে ভাসানী তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিযোগিতা করেননি। তিনি তখন থেকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে প্রদেশের সর্বত্র মুসলিম লীগের বাণী প্রচার করছেন এবং আসামের তথা-কথিত বহিরাগতদের জীবনে সম্পূর্ণভাবে মারাত্মক লাইন-প্রথা রহিত করার জন্য আন্দোলন করার জন্য আহ্বান করছেন। ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে আসাম ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হয়। হবিগঞ্জ মহকুমার নবীগঞ্জ থানা এবং সমগ্র সুনামগঞ্জ মহকুমা নিয়ে যে নির্বাচনচক্র ছিল তাতে পূর্ববর্তী নির্বাচিত সদস্য ছিলেন ভাটি পাড়ার জমিদার খান বাহাদুর গোলাম মোস্তফা চৌধুরী। তাঁর সদস্যপদের ম্যাদ অতীত হওয়ায় তিনিও মুসলিম লীগ থেকে সদস্যপদ প্রার্থী হন, এবং অপর প্রার্থীরূপে দেখা দেন সেলবর্ষের জমিদার আবদুল ছাগ্রান চৌধুরী। তাঁরা উভয়েই পূর্বে মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। আমি যদিও তারও পূর্বে মুসলিম লীগের প্রতি খুব ঝুঁকে পড়ি—তবুও তখনও মুসলিম লীগের টিকেট গ্রহণ করিনি। ইতিপূর্বে যদিও মরহুম মুনাওর আলী সাহেবের নির্বাচন কেন্দ্র হরিনা পাটিতে তাঁরই এজেন্ট রূপে কাজ করেছি, তবুও আমার মনের দ্বন্দ্বের তখনও সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি। আমি বুঝতে পারিনি, মুসলিম লীগের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভবপর। যদি মুসলিম লীগ এদেশের নিপীড়িত

www.pathagar.com

মানুষের জীবনে শোষণের অবসান চায়, তাহলে তা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দ্বারা হতে পারে। দেশ-বিভাগের কি প্রয়োজন? অপর দিকে যদি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েম রেখে ইংরেজ-শাসন থেকে মুসলিম লীগ মুসলিমদের মুক্তি চায়, তা'হলে তা তো কংগ্রেসের দ্বারাই হতে পারে। মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতি বলে স্বীকার করে, তাদের জন্য একটা পৃথক আবাসভূমি সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন? দীর্ঘকালের চিন্তার ফলে বুঝতে পারলাম, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা কেবল মুসলিমদের পক্ষেই মুক্তিলাভের উপায় নয়, সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজের পক্ষেও তা অবশ্য গ্রহণীয়। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এদেশের তথা জগতের মানব জাতির মুক্তি সম্ভবপর।

এজন্য আমি তাড়াতাড়ি মুসলিম লীগের টিকেট নিয়ে সে নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হই।

ইতিপূর্বে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক পালিয়ামেন্টারী বোর্ডও গঠিত হয়েছে। সে বোর্ডের মেম্বার যেমন রয়েছেন সুরমা উপত্যকার তেমনি রয়েছেন আসাম উপত্যকারও। জানতে পারলাম, সিলেটের সারকিট বাংলায় সে বোর্ডের সভা হবে। আসাম থেকে আগমন করবেন আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বহিরাগত মুসলিমদের প্রতিনিধি আজিজুর রহমান বলে একজন উকিল।

পূর্বেই বলেছি, বাড়ীতে বাস করে গ্রাম্যজীবন যাপন করলেও, আমি রীতিমত 'আল্-ইসলাহ্' পত্রিকায় লিখতাম। এ পত্রিকার প্রত্যেক কপিই ভাসানীর মওলানার নিকট পাঠানো হতো। তিনি যে আমার লেখা এসব প্রবন্ধ ও গল্প পড়ে আমার প্রতি স্নেহপরবশ হয়েছেন, তা মোটেই শুনতে পাইনি। তিনি এ বোর্ডের কোন কোন সদস্যের কাছে আমার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করায়, সর্ববাদীসম্মত ভোট পেয়ে আমি মুসলিম লীগের নমিনেশন পেয়ে গেলাম। ইতিপূর্বে তিনজনের কাছ থেকেই নমিনেশন লেটার দাখিল করা হয়েছিল। আমি মুসলিম লীগের নমিনেশন পাওয়া সত্ত্বেও, প্রবীণ মুসলিম লীগপন্থী খান বাহাদুর গোলাম মোস্তফা তাঁর নমিনেশান পেপার প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন না। তিনি তাঁর উকিলের মারফতে ভোটার লিস্টে আমার নাম আজরফের স্থলে আয়রফ লেখা রয়েছে বলে আপত্তি তুললেন। তবে খাঁটি মুসলিম লীগপন্থী মরহুম মঈন-উদ্-দীন

www.pathagar.com

চৌধুরী প্রমুখ উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী মধ্যস্থদের অনুরোধে তিনি তাঁর নমিনেশন পেপার প্রত্যাহার করায়, আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে গেলাম।

তখন পর্যন্ত ভাসানীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন পরিচয় হয়নি। তবে মুসলিম লীগ নেতা মরহুম জনাব মুনাওর আলীর বাচনিক জানতে পারলাম, তিনি আমার এ নির্বাচনে খুবই খুশী হয়েছেন। তার একটু পরেই মৌলভী বাজারে মুসলিম লীগের এক কনফারেন্স আহ্বান করা হলো এবং অন্যান্য কাউন্সিল সদস্যদের সঙ্গে আমিও দাওয়াত পেয়ে গেলাম।

মৌলভী বাজার শহরের পশ্চিম দিকে বিরাট মাঠে এ সভা আহ্বান করা হয়েছে। উপস্থিত হয়ে তাতে দেখতে পেলাম যে, সভায় ভাসানী তাঁর অভ্যাসজাত সুরে অনর্গল ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল—অনর্থক বহিরাগত (Immigrant) বলে অপবাদ দিয়ে, আসামের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা ১৮,০০০ (আঠার হাজার) লোককে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। আসাম পুলিশ ও রাইফেল্স আসাম সরকারের পোষা হাতী দিয়ে সেসব নিরপরাধ লোকদের ঘর-বাড়ী মিস্মার করে দিয়েছে। এমন কি নারীগণের ইজ্জত ও আব্রুর প্রতিও তাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। গর্ভবতী মেয়ে-ছেলে হাতীর পায়ের তলা থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় খোলামাঠে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং সে খোলা মাঠেই তার সন্তান প্রসব হয়েছে। এসব কাহিনী শোনার পর উত্তেজিত জনতা বার বার কেবল 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ' ধ্বনিও উত্থিত হয়। ভাসানীর বক্তৃতার পর সালেহ নামক চাটগাঁবাসী এক যুবকের ডাক পড়ে। তিনিও অত্যন্ত মর্মন্তুদ ভাষায় আসাম সরকারের সে নিষ্ঠুরতার কাহিনী বর্ণনা করেন। তার পরেই ডাক পড়লো আমার। আমি বক্তৃতার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তবুও বাধ্য হয়েই সে নিদারুণ কাহিনীর বিবরণ পেশ করতে হলো। বক্তৃতা শেষে আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে নীচের ঢালাও করা সতরঞ্চিতে বসতে চাইলে ভাসানী আমায় নামতে দেননি। তাঁরই পাশে মঞ্চে বসিয়ে দিয়ে আমার বক্তৃতার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করতে থাকেন।

সেদিনই সন্ধ্যার পরে মরহুম মঈনুদ্দীন চৌধুরীর বাড়িতে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নির্বাহী কমিটির সভা ছিল। পূবর্তন সেক্রেটারী

www.pathagar.com

দেওয়ান আবদুল বাসিতকে সরিয়ে তখন সুবিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদ আলীকে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়েছে। রক্ষণশীল দলের কাছে এ ব্যাপারটি মোটেই মনঃপূত হয়নি। তাঁরা দেওয়ান আবদুল বাসিতকেই স্থায়ী সেক্রেটারী হিসাবে চেয়েছিলেন। সভা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনাব মাহমুদ আলীর বিরুদ্ধে একদল লোক নানা শ্লোগান তুলে মৌলভী বাজার শহরে ঘোরাফিরা করতে থাকে। এ ব্যাপার ভাসানীর কর্ণগোচর হলে তিনি তাতে মোটেই বিচলিত না হয়ে শুধুমাত্র বলেন, ওদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমাদের ঘাবড়াবার মত কিছুই নেই।

অতঃপর সভার আরম্ভেই তিনি আমাকে নির্বাচত কমিটির সদস্য-পদের নমিনেশন দেন। আমার ভয় হচ্ছিল, হয়ত বা প্রতিপক্ষীয় দল থেকে কোন প্রতিবাদমূলক শ্লোগান উত্থিত হয়। তবে তা হয়নি।

ভাসানী আমাকে লক্ষ্য করে বলেন—সকল দেওয়ানেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আরও চিরস্থায়ী করতে চান---আপনি চান চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তকে ভাঙতে। অতএব আপনি হচ্ছেন সেসব দেওয়ানদের বাবা—বাবা দেওয়ান।

মৌলভী বাজার থেকে ফিরে আমরা সিলেট শহরকে কেন্দ্র করে নানা সভা-সমিতির আয়োজন করে মুসলিম লীগের মূল বক্তব্য সর্বসাধারণের গোচরীভূত করবার চেষ্টা করি। কেবল সিলেটে নয়---আসামের সর্বত্রই আগুন জ্বলে ওঠে। ভাসানী আসামে ফিরে গিয়ে কামরূপ, দরঙ্গ, নওগাঁও, গোয়ালপাড়া জিলায় মুসলিম লীগ কর্মীদের সংঘবদ্ধ করে, অদূর ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। তার পরে শিলঙে মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেন। সে এক এলাহি কাণ্ড। লাবানের ময়দানে তাঁবু খাঁটিয়ে তাতে সভার আহ্বান করা হয়েছে। ভাসানী স্বয়ং সে তাঁবুর একপাশে ঠাঁই নিয়ে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকভতি করে গরু (বাঁজা গাই), চাউল, মরিচ, পিঁয়াজ, হলুদ, আদা, ডাল প্রভৃতি রোজই আসাম থেকে আসছে। রোজই হাজারখানেক মানুষ গরুর গোশ্‌ত ও ডালের সঙ্গে আসামের মিষ্টি গন্ধযুক্ত চাউলের ভাত—তৃপ্তির সঙ্গে আহার করছে। যাবার বেলা মুসলিম লীগ ফাণ্ডে যথাসাধ্য টাকাও দিয়ে যাচ্ছে।

একদিন নয়, প্রায় সপ্তাহখানেক এভাবে শিলঙের মত দুর্গম স্থানে, জিনিস-পত্রের মহার্ঘ মূল্য এড়িয়ে স্বচ্ছন্দে পানাহার করছে। সে আহ্বানে

www.pathagar.com

যারা সাড়া দিয়েছে—তারা মুসলিম লীগ কর্মী তো বটেই, তবে তারা তাদের প্রিয় জননেতা ভাসানীর শাগরিদও। মাঝে মাঝে মুসলিম লীগের নির্বাহী কমিটির সভায় অতিশয় আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটে। ভাসানী মুসলিম লীগের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় একজন আসাম-বাসী বাঙ্গালী এসে বললো—"হুজুর, আজ তিনদিন যাবৎ আপনার বউয়ের প্রসব বেদনা দেখা দিয়েছে—তবে কোন সন্তান হয়নি। লেডি ডাক্তারকে দেখালাম, সে ঔষধ দিলে, ইনজেকশন দিলে,—কোন ফল হয়নি। আপনি কোন তাবিজ দিন, না হয় একটু পানি পড়ে দিন।"

ভাসানী জিজ্ঞেস করেন—তার সঙ্গে কোন খুলশী আছে কি-না। সে সঙ্গে সঙ্গে সবুজ রঙ্গের এক গাছি খুলশী বের করে দিলে, ভাসানী কুরআনুল করীমের এক আয়াত পড়ে তাতে এগারটা গিট বেঁধে তার হাতে দিয়ে বলেন—"যাও, এখনই তার কোমরে বেঁধে দাও।" সে যে গিট বাঁধা খুলশী নিয়ে দৌড়ালো। মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বললে, "হুজুর আপনার একটা গোলাম হয়েছে—নাম রেখে দিন।"

ভাসানী বলেন—"নাম তো রাখবোই—আমার মুসলিম লীগে চাঁদা দাও।"

বলা মাত্র সে দশ টাকার একখানা কড়কড়ে নোট তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে কদমবুচি করে আবার দৌড়ালো।

এখানেই ছিল ভাসানীর ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা। তিনি ছিলেন জনসাধারণের রাজনৈতিক গুরু, ধর্মগুরু। উপরের তলা থেকে আদেশ-নির্দেশ দিয়েই তিনি তাঁর ইতিকর্তব্যের শেষ করতেন না। জনগণের সঙ্গে একাসনে বসে, একই থালায় আহার করে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের দাবী পেশ করতেন।

এসব কনফারেন্সের পরবর্তী সময়ে আসামের রাজনীতিতে ভীষণ আগুন জ্বলে ওঠে। আসাম উপত্যকায় কংগ্রেস সরকার বহিরাগতদের উপর যতই জুলুম করতে থাকে, ততই সর্বত্র সে সরকারের বিরুদ্ধে সুরমা উপত্যকায় নানাবিধ সভা-সমিতি ও মিছিল বের হতে থাকে। এভাবে ৪৬ ইংরেজি কোনমতে পার হতে না হতে ৪৭ ইংরেজি থেকে আসামের অবস্থা আরও ভীষণ আকার ধারণ করে।

www.pathagar.com

সিলেট কাছাড়ের সর্বত্র কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, আসাম প্রদেশবাসী মুসলিম জনসাধারণ কংগ্রেস সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

খুব সম্ভব ৪৭ ইংরেজির মার্চ মাসে ভাসানী আসামের জোড়হাটে মুসলিম লীগ নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করেন। সুনামগঞ্জ ও সিলেট মুসলিম লীগের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি সে অধিবেশনে যোগদান করতে পারিনি। তবে খুব শীঘ্রই সংবাদ পেলাম ভাসানীকে জোড়হাটে গ্রেপ্তার করে, তেজপুর জেলে নিয়ে গেছে। ভাসানীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আবার সিলেট কাছাড়ের সর্বত্র আগুন জ্বলে ওঠে। নানাস্থানে প্রতিবাদ সভা হয়।

অতঃপর এপ্রিল মাসে সিলেট শহরে যে সভা হয়, তাতে স্থির হয়—সমগ্র আসাম উপত্যকাকে ভাগ করে দু'জন করে নেতা সেসব অঞ্চলে বহিরাগতদের সমবেত করে, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তাদের সংঘবদ্ধ করবে। সে প্রস্তাব গৃহীত হলে গোয়ালপাড়ার জেলার ভার পড়ে—মরহুম আজমাল আলী ও মাহমুদ আলীর উপর, কামরূপ জিলার ভার পড়ে দেওয়ান আবদুল বাসিত ও আমার উপর এবং সিলেটের ভার পড়ে মরহুম মঈন-উদ্-দীন চৌধুরী ও সালার-ই-সুবে আসাম সৈয়দ আবুল কাসিম বদরুল হোসেনের উপর। সে নির্দেশ অনুসারে আমি ও দেওয়ান আবদুল বাসিত মঙ্গলদৈ, বড়পেটা, খাড়ুপাটিয়া গোলাঘিধ প্রভৃতি স্থানে আসামের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেও, না জানি কোন্ যাদুর দওলতে গ্রেফতার হওয়ার মত মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেলুম; তবে গোয়ালপাড়াতে যেয়ে মরহুম আজমাল আলী, মরহুম দেওয়ান অহিদুর রেজা ও মাহমুদ আলী অতিসত্বরই গ্রেফতার হয়ে গেলেন। নিরাশ হয়ে আমি ও দেওয়ান আবদুল বাসিত ফিরে এল্লাম গৌহাটিতে। সেখানেও প্রতিবাদ সভার আয়োজন হলে, এবং স্যার সা'আদ উল্লাহ, দেওয়ান আবদুল বাসিত, আসাম পরিষদের সদস্য আবদুল হাই ও আমি আক্রমণাত্মক বক্তৃতা করেও গ্রেফতার হলাম না। পরের দিন সা'আদ উল্লাহ তাঁর গাড়ীতে করে আমাদের দু'জনকে শিলঙে নিয়ে গেলেন এবং সেখানেও আমরা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা সম্বন্ধে চিন্তা করছি, এমন সময় সংবাদ এলো সিলেটের অবস্থা নিতান্ত মারাত্মক। কারণ সেখানে ডেপুটি কমিশনার অফিসে মুসলিম লীগের পতাকা

www.pathagar.com

উত্তোলন করার সময় আসাম রাইফেলস্-এর এক গুর্খা সেনা আলকাসকে গুলী করে হত্যা করেছে।

অতঃপর আমাদের কর্মসূচী পরিবর্তন করে আমরা সকলেই সিলেটে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। পরের দিন বাস স্টেশনে আসি, দেওয়ান আবদুল বাসিত, মঈন-উদ-দীন চৌধুরী ও সৈয়দ আবুল কাসিম সবেমাত্র সিলেট যাত্রীবাসে আরোহণ করতে যাচ্ছে—এমন সময় মঈন-উদ-দীন চৌধুরীর গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে এক দারোগা হাযির। তাই শুধু আমাকেই ওরা সিলেটে যেতে দিলেন। দেওয়ান আবদুল বাসিত ও সৈয়দ আবুল কাসিম মঈন-উদ-দীন চৌধুরীকে সহি-সালামতে জেলে পাঠিয়ে তারপরে সিলেট যাবেন বলে স্থির হলো।

সিলেট পেঁৗছে দেখতে পেলাম বিরাট মিছিল একেবারে মারমুখো হয়ে জেল গেটের দিকে চলেছে। তারা আমায় পেয়ে নেতা হিসাবে সকলের আগে দিলেন। দেওয়ান তয়মুর রেজাও ছিলেন। তাঁকেও নেতা হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে জেলের উপরে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করার উদ্দেশ্যে। জেলগেটে পেঁৗছার পর জেলার মাহমুদ আলী করজোড়ে তা থেকে নিষ্কৃতি চাইলে আমি তাতে সায় দিলাম। তবে তার প্রতিফলস্বরূপ আবদুল বারী মরহুম (প্রকাশিত বারী) এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়ে স্বয়ং জেলগেট উত্তরণ করতে অগ্রসর হল তাতেও সফল না হয়ে আমাদের সকলকে গালি-গালাজ করে সকলকে নিয়ে ফিরে চললো।

তার কিছুদিন পরেই আবার সুরমা নদীর অপর পারে মুসলিম লীগ অফিসে সভার আয়োজন হলো এবং সাব্যস্ত হলো—পরের দিন ভূতপূর্ব মন্ত্রী আবদুল হামিদ, মরহুম আবদুল বারী চৌধুরী, দেওয়ান আবদুল বাসিত, আমি আসামের পরিষদ সদস্য আবদুল হাই, মরহুম সৈয়দ আবুল কাসিম করিম-গঞ্জে যেয়ে মুসলিম লীগ আহূত সভায় বক্তৃতা করব এবং পরে সকলেই শিলঙ যেয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, আসামের কংগ্রেস সরকারকে কুপোকাত করবো।

একটু দেরীতে করিমগঞ্জে পেঁৗছে বক্তৃতার পালা শেষ করে, যখন আমরা জানতে চাইলাম কে কে শিলঙয়ে যেতে প্রস্তুত, তখন দেখা গেল তারমধ্যে মরহুম আবদুল বারী, আমি ও আবদুল হাইই প্রস্তুত। অপর সকলেই ইতিমধ্যে সিলেটের বাসে তাদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

www.pathagar.com

তাই লীগের সম্মান নষ্ট হওয়ার আশংকায় আমরা তিনজনই পরের দিন শিলঙয়ের দিকে রওয়ানা দিয়ে তথায় পৌঁছে গেলাম।

শিলঙয়ের অধিকাংশ পুলিশই ছিল আমাদের সিলেটের লোক। আমরা সার্কিট বাংলাতে প্রবেশ করে হাত-মুখ ধু'তে যাচ্ছি, অমনি একজন পুলিশ ইনস্পেকটার আমাদের কাছে এসে করজোড়ে নিবেদন করেন; আপনারা এখান থেকে সরে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই করুন, তবে এখানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে আমাদের মত সিলেটের পুলিশ অফিসারকেই আপনাদের গ্রেফতার করতে হবে। আমাদের পক্ষে এর চাইতে লজ্জাজনক কাজ আর কি হতে পারে। আমরা তখন মরিয়া হয়ে আইন অমান্য করতে প্রস্তুত হয়েছি। অতএব মৃতব্যক্তিদের কাছে এসব ধর্মের কাহিনী বলার কোন অর্থ নেই।

তার একটু পরেই মঈন-উল হক চৌধুরী এসে আমাদের তিনজনকে মধুরবন্দ পাড়ায় তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খুব আচ্ছা তরেসে খানা-পিনা করে আমরা শুয়ে পড়লাম। পরের দিন ফাটক বাজারে মুসলিম লীগের সভার আয়োজন করে, আবদুল বারী সাহেবকে সভাপতি করে আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার মি. পেইন এবং পুলিশ সুপার বিন্‌টেন ভেও মি. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় শতাধিক আসাম রাইফেলসের লোক ও এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে এ বিরাট জনতার উপর মারমুখী হামলা চালান। তার ফলে প্রায় তিন হাজার লোকের এ বিরাট জনতার মধ্যে কোন ব্যক্তিই অক্ষত অবস্থায় থাকেনি। আমাদের সিলেটের সদাশয় পুলিশ ইনস্পেকটার ফরীদ খান তার প্রাণের বিনিময়ে আমার মাথা সামলিয়ে না ধরলে—তা আর টিকে থাকতো না, হয়ত শিলচরের ফাটক বাজারেই থেকে যেতো। যাহোক, আমাদের প্রথমে পুলিশ অফিসে, পরে শিলচর জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনদিন পর আবার আমাদের বিচার হলো। তাতে প্রত্যেকের দশ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলো। জেলে ছিলাম প্রথম শ্রেণীর কয়েদী এবং পড়াশুনার খুবই সুবিধা ছিলো। অতঃপর মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুযায়ী দেশ বিভাগ হয়ে গেলে এবং সিলেটের ভাগ নির্ধারণের জন্য গণভোটের তারিখ ঘোষিত হলে, আমরা মুক্তি পেলাম।

জেল থেকে বের হয়ে দেখি, সিলেটে চলেছে এক অগ্নি-সংগ্রাম। ভাসানী জেল থেকে বের হয়েই সিলেটে এসে মুক্তিকামী মানুষদের বুকে এক অপূর্ব

www.pathagar.com

সাহসের সঞ্চার করেছেন। তিনি আসাম মুসলিম লীগেরই কাছে গোয়ালপাড়ায় ফিরে গেছেন, তবে সিলেটে রয়েছেন নওয়াব হাবিবউল্লাহ ও তারই মিতা হাবিউল্লাহ বাহার।

সিলেটের এ গণভোটের সময় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করেছেন কংগ্রেসী হিন্দু মহাসভাপন্থী, কম্যুনিস্ট, জমিয়তে উলামাই হিন্দের লোকেরা। এতগুলো দলের বিরুদ্ধে এককভাবে সংগ্রামে মুসলিম লীগ জয়ী হয়েছে, কেবলমাত্র আসামের বুকে মুসলিম জনসাধারণের উপর বিশেষ করে বহিরাগতদের উপর অত্যাচার করার অভিশাপের দরুন। তখন সিলেটের ঘরে ঘরে গাওয়া হতো ঃ

আসামের জুলুমের কথা
আসামের জুলুমের কথা
জীবন থাকতে ভুলব না
আমরা তো আসামে থাকবো না।

সিলেটের পাকিস্তান ভুক্তি হওয়ার পরে আবার আমায় যেতে হলো কোলকাতায় আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষে সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়ে, তেরখানা স্মারকলিপি দাখিল করার জন্য। তখন কোলকাতাতে মুসলিমদের জীবন অত্যন্ত বিপন্ন। গান্ধীজি কোলকাতা ও তার আশেপাশে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। তা সত্ত্বেও প্রতিদিনই একজন না একজন মুসলিমকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এহেন সময়ে প্রাণ হাতে নিয়ে দীর্ঘ এক মাস কোলকাতায় বাস করে, মরহুম শের-ই-বাংলা ও জনাব হামিদ-উল-হক চৌধুরীকে নিয়ে সে স্মারকলিপিগুলোর বক্তব্য বেলভেডিয়ারে বিচারপতিদের সামনে পেশ করে—কোনমতে সিলেটে ফিরলাম।

সিলেটের বন্ধু-বান্ধবেরা ও বিশেষ করে মাহমুদ আলী চেপে ধরেন সিলেট থেকে একখানা বৈপ্লবিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। সেমতে ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সিলেট থেকে আমরা 'নও বেলাল' পত্রিকা প্রকাশ করি। তবে কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরেই পত্রিকার লক্ষ্য নিয়ে মাহমুদ আলীর সঙ্গে আমার মতভেদ হওয়ায় আমি এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যাই। অতঃপর সুনামগঞ্জের তদানীন্তন মহকুমা হাকিম জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব জোর করে

www.pathagar.com

আমায় সুনামগঞ্জে নিয়ে কলেজটি রক্ষা করার দায়িত্ব প্রদান করেন। দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু অধ্যাপকগণ প্রায় সকলেই ভারতে চলে যান। তাই আমাকে ইংরেজী, বাংলা ও তর্কশাস্ত্র এ তিনটে বিষয়ই পড়াতে হতো। তদবধি আমি শিক্ষা বিভাগেই কাজ করতে থাকি এবং এখনও করছি।

দেশ-বিভাগের পরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কোন সুবিধা হয়নি। সুনামগঞ্জ কলেজে কাজ করার সময়ই অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে আমি পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের সভাপতি নির্বাচিত হই। সে সময় তমদ্দুন মজলিশের দ্বারা আয়োজিত সভায় যোগদানের জন্য আমাকে মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতে হতো। তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাচনিক জানতে পারতাম—এ মজলিসের প্রতি মওলানা ভাসানীর আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে। তবে ভাসানী সে সময় প্রথমে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আওয়ামী লীগ গঠন করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছেন।

১৯৫৫ সালে ভাসানীরই উদ্যোগে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতে ভাসানী মাত্র একদিন উপস্থিত ছিলেন। তারপরে তিনি এসব সাহিত্যিকদের কাগমারীতে আহ্বান করেন। কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের নরেন্দ্র দেব ও তার স্ত্রী-রাধারাণী দেবী, মনোজ বসু, কাজী আবদুল অদুদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। তবে চেষ্টা করেও আমি সন্তোষে যেতে পারিনি বা ঢাকায় ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি।

১৯৫৭ সালে আমি নরসিংদি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে আসি। ইতিপূর্বে ১৯৫১ সালে আমি 'সত্যের সৈনিক আবুজর' বলে একখানা জীবনী লিখি—সে পুস্তিকাখানা পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ ছাপিয়েছিল। এ পুস্তিকা প্রকাশের পরে তা ভাসানীর হস্তগত হলে তিনি আমার খোঁজ করেছিলেন। তবে নানা কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে আমি কাগমারীতে যেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। ১৯৬৫ সালে নরসিংদির অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে আমি মতলব কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করি। ১৯৬৭ সালে মতলব কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে জনাব এ. জেড. এম.

www.pathagar.com

শামসুল আলম সাহেবের আহ্বানে ঢাকার বুকে আবুজর গিফারী কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করি। তখন থেকে ভাসানীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। খুব সম্ভব হযরত আবুজর গিফারী (রা) সম্বন্ধে জানার আগ্রহে তিনি তৎকালীন ইসলামিক একেডেমির ডাইরেকটর জনাব আবুল হাশিমের সঙ্গে যোগযোগ করে, হযরত আবুজর গিফারী (রা) সম্বন্ধে ইসলামিক একেডেমিতে একটা সেমিনারের আয়োজন করেন। এ সেমিনারে যাতে আমি সভাপতির পদে মনোনীত হই, তার ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি জনাব আবুল হাশিমকে অনুরোধ করেন। তখন তিনি ন্যাপ নামক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্ণধার। সে সভায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ন্যাপের বর্তমান নেতা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদও। সভায় হযরত আবুজর গিফারী(রা)-এর জীবনের নানাদিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। সভার শেষে তিনি আমাকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলেন, "আবুজর গিফারীর জীবনী লিখে আপনি এক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তবে তাঁর এ জীবনীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আপনাকে আরও একটা কাজ করতে হবে।" আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলে, তিনি বলেন, "হযরত আবুজর গিফারীর মতবাদের যারা প্রতিবাদ করে এবং আমাদের রাষ্ট্রের অমঙ্গল করতে যারা সতত প্রস্তুত, এরূপ একজন লোককে আপনি হত্যা করে ফেলুন।" তার উত্তরে আমি বললাম, "তাহলে যে আমারও ফাঁসি হয়ে যাবে!" ভাসানী হেসে বললেন—"তা হতে পারে, তবে বইখানার খুব কাটতি হবে।" আবুজর গিফারী কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে পরে খুব ঘন ঘন আমাকে তাঁর নিকট যেতে হতো। কারণ পাকিস্তান সরকার মোটেই এ কলেজের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। তা তার আমলা-দের ব্যবহার থেকেই বুঝাতে পারা যেতো। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা সদর সাউথের এস. ডি. ও. ছিলেন এ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর কাছে কলেজের কোন কাজে গেলে প্রথমে বলতেন, 'একটু, বসুন।' তার পরে কোন কিছু না বলে বের হয়ে যেতেন। তার পিছু পিছু গেলে বিরক্তির সুরে বলতেন, "এখানে তো অফিস নয়।" এ বিপদের দিনে ভাসানীর কাছে গেলে—তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বলে কলেজের নানাবিধ হিত সাধন করেছেন।

এ সময় তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে মনে হয়েছে, তিনি মানুষ হিসাবে রাজনীতিবিদ থেকে অনেক বড়। কারণ তিনি মুসলিম লীগে

www.pathagar.com

যোগদান করেও অন্য সম্প্রদায়ের দুঃস্থ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা মোটেই ভুলেন নি। তাঁর ভক্ত আসামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লোক রয়েছে। বহিরাগত সমাজের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিভৃতে তাঁর কাছে এসে নানাভাবে তাদের আত্মরক্ষার মন্ত্র গ্রহণ করতো। তেমনি সন্তোষের রাজবাড়িতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেও তিনি কোন কোন দুঃস্থ হিন্দু পরিবারকে সে পরিবেশে বাস করার অনুমতি দিয়েছেন।

অর্থাৎ সোজা কথায়ই ইসলামের আদর্শে ছিল তাঁর মানস গঠিত। যেখানে অত্যাচার, অনাচার, অবিচার দেখা দিয়েছে, সেখানেই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এজন্য রাজনীতিতে আজীবন লিপ্ত থাকলেও তিনি ইসলামের সে মানবতাবাদে ছিলেন দৃঢ়-প্রত্যয়শীল। তিনি এজন্য রাজনীতিকে মানবতাবাদ থেকে পৃথক করে দেখেন নি। একই বৈঠকে যেমন রাজনীতির আলোচনা করেছেন, তেমনি এদেশের মানুষের কিভাবে কল্যাণ হয় তার জন্যও নানাবিধ পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন।

আশ্চর্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব! দুই তিন হাজার লোকের খানার আয়োজন করতে হবে। এজন্য তাঁর দলের লোকদের আহ্বান করে তার বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। কয়েকখানা নৌকা এনে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। এতে যে দুই তিন হাজার লোকের আহারের পরিমাণ ভাত রাখা হবে! সেজন্য বড় বড় ডেগের মধ্যে প্রচুর পানিও ঢালা হয়েছে, অথচ একটা চাউলও তাঁর কাছে নেই। তেমনি মরিচ, পিঁয়াজ, হলুদ বা গোশ্তেরও কোন দর্শন নেই। পাচকগণ গালে হাত দিয়ে প্রমাদ গুণছে; তিনি মোটেই বিচলিত নন। তারপর কোথা থেকে বন্যার স্রোতের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড়, তিন/চার মণ চাউল, তদ্ পরিমাণ পিঁয়াজ, মরিচ ও লবণ নিয়ে দলে দলে লোক হাজির। ঘন্টা দেড়েক ব্যয় হলো এগুলোকে রান্নার উপযুক্ত করতে—তারপরে আরও ঘন্টা খানেকের মধ্যে সুস্বাদু চর্ব আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। সকলেই অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে তাঁর উপদেশ মস্তকে ধারণ করে বিদায় নিল।

এ কেবল ভাসানীর দ্বারাই সম্ভবপর ছিল! বাংলাদেশের তো নয়, এ দুনিয়ার অন্য কোন দেশের কোন নেতার দ্বারা এভাবে শূন্যের উপর নির্ভর করে এতগুলো লোককে দাওয়াত দিয়ে খানা পরিবেশন করা সম্ভবপর

www.pathagar.com

ছিল না। এটা ভাসানীর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল এজন্য যে, তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতা, সমাজ সংস্কারক, এদেশের ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের অগ্রপথিক, মস্ত বড় একদল লোকের পীর-মুর্শিদ এবং সর্বোপরি মানবতাবাদী বলে। এ জীবনে যারা গৃহহারা, সমাজ-হারা, বিত্তহারা, নির্যাতিত ও নিপীড়িত তাদের জন্য সর্বদাই তাঁর অন্তরে ছিল এক অপূর্ব সমবেদনা। যে সমবেদনা তাঁর চেতনায়---শুধুমাত্র অনুভূতি-রূপেই স্তব্ধ হয়ে থাকে নি, তা প্রকাশ পেয়েছে---তাদের মুক্তির, তাদের উন্নতির, তাদের স্বস্তির জন্য সতত সংগ্রাম করার প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতির মধ্যে। এজন্য তাঁর জীবনে কত বঞ্চনা, কত লাঞ্ছনা, কত অপমান ও অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মানুষকে তিনি প্রাণপ্রিয়রূপে গ্রহণ করে তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একীভূত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নয়---দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক হিসাবেই চিরকাল জীবন্ত থাকবে।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্

বিচিত্র ভাসানী

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে ইউনিয়নের সংগঠন কার্যে কলিকাতা আসাম লাইনের একটি জাহাজে করিয়া গোয়ালন্দ হইতে আমি ডিব্রুগড় যাইতে-ছিলাম। সেই সময় খারুপাটিয়া ঘাট হইতে অনুমান চার-পাঁচ মাইল উজান দিকে অগ্রসর হওয়ার পর জাহাজখানি ডুবো বালির চরে ঠেকিয়া যায়। অনেক চেষ্টা-চরিতের পরও উহাকে অধিক পানিতে আনিতে না পারিয়া জাহাজের মাস্টার জানাইলেন, আপনাআপনি নদীতে পানি বৃদ্ধির যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন অপর কোন জাহাজের সাহায্য ব্যতিরেকে উহাকে পুনরায় চালু করা যাইবে না। কাজেই কয়েক ঘন্টা তো নিশ্চয়ই, এমন কি পর দিবস বেলা দশটা পর্যন্ত সাহায্যকারী জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইতে পারে। কুয়াশার জন্য প্রাতের দিকে জাহাজ চলাচল প্রায়ই বন্ধ রাখিতে হইত।

এই সময় সূর্য পশ্চিম আকাশে বেশ খানিকটা হেলিয়া পড়িয়াছিল। পাহাড়ের শীতল বাতাস উজ্জ্বল সূর্য কিরণে উত্তপ্ত হইয়া মনে হইতেছিল যেন কৃত্রিম বসন্ত ঋতুর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। জাহাজের পাটাতনের উপর একটি ক্যাম্পখাটে শুইয়া আমি এপাশ-ওপাশ করিতেছিলাম। প্রায় এক মাইল দূরে নদীর তীর সংলগ্ন একটি মাঠে দলে দলে লোক একত্র হইতেছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পার হইতেও নৌকাযোগে বিস্তর লোকজন মাঠের দিকে যাইতেছিল। কাহাকেও কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই নিশ্চিতভাবে ধরিয়া লইলাম, উহা একটি ওয়াজ মহফিল। আরও লক্ষ্য করিলাম, মাঠের একই দিক এবং তাহাও নদীর দিক হইতে ক্রমবর্ধমানে ধোঁয়া উঠিতেছে। উনুনেরই ধোঁয়া, সুতরাং গ্রামদেশে ওয়াজ মাহফিলের অপরিহার্য অঙ্গ সিন্নি ছাড়া এই অবেলায় আর কি রান্না হইতে পারে? আমাদের গ্রাম অঞ্চলেও জনসাধারণের উদ্যোগে খোলা মাঠে আয়োজিত বৃহদাকারের ওয়াজ মাহফিলে চাঁদার টাকায় সিন্নি রান্না হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

সিন্নির লোভেও নহে, ওয়াজ শুনার উদ্দেশ্যেও নহে, সময় কাটাইবার জন্যই জাহাজের কয়েকজন লোককে সঙ্গে লইয়া জালিবোটের সাহায্যে তীরে অবতরণপূর্বক হাঁটু বালি অগ্রাহ্য করিয়া মাঠে পৌঁছিলাম। একটি বিষয় বাদে আমার অনুমানই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। উহা ছিল ওয়াজমুক্ত জনসভা। মাহফিল নহে এবং উনুনে যাহা রান্না হইতেছিল, তাহাও সিন্নি নহে—খিচুড়ি। সভাস্থলে তখন এক হাজারেরও বেশী লোক ছিল। ইহাদের অধিকাংশ দূরদূরান্ত হইতে আসিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় আমাদেরই দেশের ন্যায় তাহারাও দলবদ্ধভাবে আসিয়াছিল। বিরাট সামিয়ানার নীচে রাত্রি যাপন করিতে হইবে চিন্তা করিয়া অতিরিক্ত দুই একটা জামা কাপড় আনিয়াছিল। বেশীর ভাগ লোকের হাতে একটি লাঠি ও একটি বোতল ছিল—প্রথমটি ছিল হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষা এবং দ্বিতীয়টি ছিল দোয়া গ্রহণের জন্য। আহার্য দ্রব্য হিসাবে যে যাহা আনিয়াছিল, দলগতভাবে তাহাই এক-জায়গায় তাহারা একত্রে রান্না করিতেছিল, যেন গভীর রাতে সভাভঙ্গের পরক্ষণই খাইয়া ঘুমাইতে পারে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, সভার একমাত্র বক্তা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবেন। আমাদের পৌঁছার আধ ঘন্টার মধ্যে সভাস্থলে প্রায় তিন হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে।

মাঝে মাঝে যেই একজন বলিয়া উঠে—ঐ মওলানা সাহেব আসিতেছেন, অমনি সব লোক দাঁড়াইয়া যায় এবং কেহ কেহ হস্তস্থিত মাটির তৈরী লোটা বা বোতল লইয়া তাঁহার আগমন পথের দিকে ব্যস্ততার সহিত ছুটাছুটি শুরু করিয়া দেয়। অবশেষে সত্যই দেখা গেল অগ্রপশ্চাৎ বহুলোক পরি-বেষ্টিত হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মওলানা ভাসানী অত্যন্ত ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছেন।

সভাস্থল হইতে অনুমান দুই শত গজ দূরে মওলানা ভাসানী ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান লোকজনের হস্তস্থিত পাত্র ও বোতলে ফুঁক দিতে দিতে সামিয়ানার নীচে সংরক্ষিত নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিলেন। মওলানা ভাসানীর নামটি আমার পূর্ব হইতে জানা ছিল। কলি-কাতার সান্ধ্য ইংরেজী দৈনিক 'স্টার অব ইণ্ডিয়া'র সহ-সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালে আমার হাত হইয়া তাঁহার বহু সংবাদ কাগজে ছাপা হইয়াছে। লোকজনের সমাগম ও তাড়াহুড়া হইতে মনে করিয়াছিলাম, তিনি

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই বিরাট পাগড়ী ও চাপকান চোগাধারী লোক হইবেন। কিন্তু উহার কিছুই না দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা জামা এবং মাথায় সাদা টুপি। সভার কাজ আরম্ভ করিলেন মওলানা সাহেব স্বয়ং। সভাপতিত্বের জন্য কেহ কাহারো নাম পর্যন্ত প্রস্তাব করিল না, যেন মওলানা সাহেব দৈব সনদবলে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াই রহিয়াছেন। ইহার পরও আসামে বহুবার সভাপতিবিহীন বহু সভা আমি দেখিয়াছি, প্রধান বক্তা সেই একই ব্যক্তি। কাহার ঘাড়ে দুইটি মাথা, মওলানা ভাসানীকে বাদ দিয়া আসামের জনসভায় সভাপতিত্ব করিবেন?

বক্তৃতার ভূমিকা হইতে আমার ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না যে, 'সলো ননস্টপ' বক্তৃতা চলিবে শ্রোতাদের চোখ দুইটি নিদ্রা ভারাক্রান্ত হইয়া না পড়া পর্যন্ত। অনুমান পঁচিশ মিনিট বক্তৃতা শ্রবণের পর সাথীদের পীড়াপীড়িতে আমি সভাস্থল ত্যাগ করি। আমরা জাহাজে পৌঁছার অনেক পরে, সম্ভবতঃ রাত্রি নয়টার পর সভা ভঙ্গ হয়।

মওলানা ভাসানীকে স্বচক্ষে দেখার পর আমার মনে হইতেছিল, তাঁহাকে আমি কলিকাতায় কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু কোন্ স্থানে এবং কোন্ উপলক্ষে তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছিলাম না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর মনে পড়ে বৎসর খানিক পূর্বে আজাদ অফিসে, জনাব নজীর আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে।

বড়পেটা সম্মেলন

আমি মনে করিতে পারিতেছি না, ইহার কতদিন পূর্বে বা পরে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নিকট হইতে একখানি আবেদন এবং এক-খানি ব্যক্তিগত চিঠি পাই। আবেদনখানি তিনি পাঠাইয়াছিলেন, ওরিয়েন্ট প্রেসের মারফত সারাদেশে সংবাদের আকারে প্রচারের জন্য। চিঠিতে তিনি আসন্ন বড়পেটা সম্মেলনের যোগদানের জন্য বলিয়াছিলেন। ইহার কয়েক দিন পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। বাংলার নেতৃ-বর্গকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় অনেকের সংগে দেখা করিলেন। কিন্তু কোন না কোন অজুহাতে তাঁহারা অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় মওলানা ভাসানী ক্ষুণ্ণ হন। তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইতেই তিনি আমাকে বড়পেটা যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায়ের পূর্বে রেহাই দিলেন না। স্থিরীকৃত হয় জনাব হবীবুল্লাহ বাহার, নও-মুসলিম লীগপন্থী জনাব চৌধুরী

www.pathagar.com

মোয়াজ্জম হোসেন এবং আমি কলিকাতা হইতে কোয়েটার জনাব কাজী মোহাম্মদ ইসা এবং মামদোতের নওয়াব ইফতেখার হোসেন খানকে লইয়া এমনভাবে বড়পেটা রওয়ানা হইব যাহাতে লালমনিরহাটে সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি জনাব চৌধুরী আলিকুজ্জামানের সহিত একত্র হইয়া আমরা একই ট্রেনে বড়পেটা পেঁছি। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং আসামের মুখ্য মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ একে অন্যের বিরুদ্ধে নিখিল ভারত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন উহা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি জনাব কাজী মোহাম্মদ ইসা এবং মামদোতের নওয়াবকে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।

মওলানা ভাসানীর আদি বাসস্থান সিরাজগঞ্জের নিকটে এক গ্রামে। মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর তিনি ময়মনসিংহ জেলার কাগমারী নামক স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। যিনি একদিন বাঙলা ও আসামের কোটি কোটি লোককে নেতৃত্ব দান করিবেন, কাগমারীর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তাঁহাকে অধিক দিন ধরিয়া রাখিতে পারিল না। দেশের ও ধর্মের ডাকে মওলানা ভাসানী যোগ দিলেন অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে। সেই সময় তিনি উপলব্ধি করেন, জমিদার এবং মহাজনদের অত্যাচার ও নিপীড়ন হইতে বাঙলার দরিদ্র জনসাধারণের উদ্ধার সাধন করিতে না পারিলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হইবে না। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবতীর্ণ হন এক নতুন সংগ্রামে। প্রতিপক্ষ জমিদার ও মহাজনরা ছিল সরকার সাহায্যপুষ্ট। আইনের বেড়জালে তাঁহাকে করা হইল পরিবেষ্টিত। আত্মরক্ষার জন্য মাওলানা ভাসানী জন্মভূমি ছাড়িয়া আশ্রয় লইলেন আসামের জঙ্গলে। ইহা ছিল তাঁহার জন্য পশ্চাদপসরণ—সংগ্রাম হইতে পলায়ন নয়।

আবাদযোগ্য কিন্তু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পতিত ঘাগমারী মওলানাকে জানাইল সাদর সম্ভাষণ। ঘাগমারী আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমার সদরের অদূরে অবস্থিত। দরিদ্র শরণার্থীরা ঢাকা রেল লাইনের পার্শ্বে আজও যে ধরনের কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিতে চেষ্টা করে, মওলানা ভাসানীও তাই করিলেন। ময়মনসিংহ এবং পাবনায় জমিদার বিরোধী সংগ্রামে যে সকল দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক ছিল মওলানার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কেহ কেহ সপরিবারে

www.pathagar.com

হাজির হইল ঘাগমারীতে। কিছুদিন পূর্বেও যে এলাকাটি ছিল হিংস্র জীব-জন্তুর আবাসস্থল. সেখানে ভরিয়া উঠিল একটি বর্ধিষ্ণু লোকালয়। পুরাতন ঘাগমারীকে যখন চিনিবার কোন সহজ উপায় রহিল না, তখন বহিরাগতরা তাহাদের নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নাম অনুসারে উহার নতুন নামকরণ করিলেন হামিদাবাদ। পরবর্তীকালে এই স্থানে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত করেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারপর একটি হাই স্কুল, তারপর একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, চিকিৎসালয় ও মুসাফিরখানা। এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। মওলানা ভাসানী আমাকে বলিয়াছেন, ইহার সবটাই আসিয়াছিল আসামের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে। দেশ-বিভাগের বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে মওলানা সাহেব তাঁহার হামিদাবাদস্থ বিষয়-সম্পত্তি ইহাদের পরিচালনার জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন।

ধুবড়ীর অদূরে ভাসানীর চর নামে একটি স্থান আছে। এখানে ছিল মওলানা ভাসানীর দ্বিতীয় আস্তানা। দেশ-বিভাগের পূর্বে তিনি একদিন আমায় এক প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন, এদিক সেদিক যাতায়াতের সুবিধার জন্যই তিনি এই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত-অনুরক্তরাই তাঁহাকে ভাসানীর মওলানা নাম দেন। এই স্থানেও মওলানা সাহেব একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া উহার পরিচালনার জন্য কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন। আর একদিন তিনি আমাকে বলেন, ১৯২৮ সালে আসাম গমনের পর দীর্ঘ সাত বৎসর তাঁহাকে বহু ঝড়ঝঞ্ঝার সহিত লড়াই করিতে হইয়াছে। এই লড়াই ছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এবং আসাম সরকারের বিরুদ্ধে। সম্ভবতঃ ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

বড়পেটার পথে লালমনিরহাটে আমাদের সাক্ষাৎ পাইয়া জনাব চৌধুরী খালিকুজ্জামান অত্যন্ত আনন্দিত হন। লালমনির হাট হইতে বড়পেটা পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্টেশনে বৃটিশ, মার্কিন এবং ক্যানাডীয় সৈন্যদের সহিত আমাদের দেখা হইতে থাকে। বদাই কিংবা উহার নিকট কোন একটি স্টেশনে এক বালক আমাদের কামরার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলে, 'স্যার, ডিম নেবেন? আপনাদের জন্য একটার দাম বারো পয়সা। সৈন্যদের কাছ থেকে আদায় করি বারো আনা।' সত্যই তাহারা বিদেশী সৈন্যদের নিকট হইতে এই দাম আদায় করিত। নেতৃবর্গের সম্বর্ধনার জন্য মওলানা ভাসানী, স্যার

www.pathagar.com

সা'দুল্লাহ, জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী এবং এক বিরাট জনতা স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

গাড়ী হইতে সর্বপ্রথম অবতরণ করিলেন নির্বাচিত সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জামান। তারপর আরম্ভ হইল, 'আপ পহেলে নেহী ছাহাব, আপ পহেলে।' মিনিট খানেক এই মহড়ার পর নামেন মামদোতের নওয়াব, তারপর কাজী মোহাম্মদ ইসা। এই সময় একবার মাত্র বংশী ধ্বনি করিয়া ট্রেন ছাড়িয়া দেয়। বাহার নামিতে যাইয়া হাতে ব্যথা পাইলেন। লাল মিয়াকে অগ্রাধিকার দিতে যাইয়া আমি আর নামিতে পারিলাম না। কারণ ট্রেনের গতি ততক্ষণে অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পাছে সাধারণ যাত্রীরা এলার্ম চেন টানিয়া সহযাত্রী সৈন্যদের যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছার পক্ষে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া শত্রুপক্ষের সহায়তা করে, এইজন্য জাপানের যুদ্ধে যোগদানের পর আসাম এবং আরও কোন কোন এলাকার ট্রেনের এলার্ম চেন তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। ফলে একচোটে আমি সতের মাইল দূরে একটি স্টেশনে নীত হই। খর্বাকৃতির তবে বেশ স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ স্টেশন মাস্টার অন্যমনস্কভাবে সেই সময় প্লাটফরমে পায়চারী করিতেছিলেন। আমার 'ওভার ক্যারেড' হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি কতকটা বিরক্তি সহকারে মন্তব্য করেন, 'তাতে এমন কি আর হয়েছে? যান! ঐ ছোকড়ার কাছে। সেই আসল, আমি নকল এস. এম. (স্টেশন মাস্টার)।'

বড়পেটা স্টেশনে মওলানা ভাসানী শুধু যে আমার জন্য এক ডজনের বেশী স্বেচ্ছাসেবক রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই নয়, উপরন্তু সম্মেলনের অধিবেশনও বেশ বিলম্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণের পর মামদোতের নওয়াব এবং জনাব কাজী ইসা কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহাদের বক্তৃতা শেষ করেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হন মওলানা ভাসানী। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর যেভাবে একটির পর একটি অপরাধ বর্ণনা করিয়া থাকে, তিনিও ঠিক প্রধান মন্ত্রী স্যার সা'দুল্লাহর লাইন-প্রথা সমর্থনসূচক কার্যাবলীর উল্লেখ করিয়া চলিলেন। আসাম উপত্যকার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রোতা দশ পনের মিনিট পর পর হর্ষ ও করধ্বনি দিয়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রতি তাহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিতে থাকেন। মওলানা সাহেব যখন বুঝিতে পারিলেন, সম্মেলনে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির তিনজন সদস্য ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, লাইন-প্রথার

www.pathagar.com

ব্যাপারে স্যার সা'দুল্লাহর পশ্চাতে গণ-সমর্থন নাই, তখন তিনি স্যার সা'দুল্লাহকে অভিযোগের উত্তর দানের সুযোগ দেন।

স্যার সা'দুল্লাহ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু চূড়ান্ত রায় ছিল শ্রোতাদের হাতে এবং তাহাদের শতকরা নব্বইজন ছিল মওলানার সমর্থক। কাজেই প্রথম রাউণ্ডে তাঁহার হইল পরাজয়। সন্ধ্যায় ডাকবাংলাতে আমরা আগন্তুক দুইজন একত্র হইয়া মওলানা ভাসানী এবং স্যার সা'দুল্লাহর মধ্যে আপোষের একটি সূত্র উদ্ভাবন করি। ইহা লইয়া উভয় পক্ষের সহিত যখন আমাদের আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় স্যার সা'দুল্লাহ আসামের গভর্নরের নিকট হইতে একটি বিশেষ জরুরী বার্তা পান। তিনি আমাদিগকে জানান, জাপান বোমারু বিমান হইতে কোহিমা এবং ডিব্রুগড়ে বোমা বর্ষিত হইয়াছে এবং গভর্নর মন্ত্রীসভার সকলকে শিলঙয়ে এক জরুরী সভায় একত্র হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। আলোচনা অসমাপ্ত এবং আমাদের দেখাশুনার জন্য মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে জনাব আবদুল মতিন চৌধুরীকে রাখিয়া স্যার সা'দুল্লাহ্ অন্যান্য মুসলমান মন্ত্রীসহ তৎক্ষণাৎ বড়পেটা ত্যাগ করেন।

ডাক-বাংলাতে নৈশ আহারের পর হইতে রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আলোচনা চলে। অতঃপর মওলানা ভাসানী, জনাব মতিন চৌধুরী এবং আমি অন্য একটি বাড়ীতে যাইয়া সারা রাত্রি নানা আলাপ-আল্যেচনায় অতিবাহিত করি। পরদিন একত্রে আর একদফা আলোচনার পর আমরা কলিকাতার উদ্দেশ্যে বড়পেটা ত্যাগ করি। জনাব খালিকুজ্জামান লালমনিরহাটে ভিন্ন হইয়া পড়েন। কলিকাতায় অবস্থানকালে জনাব কাজী ইসা এবং মামদোতের নওয়াব আসাম পরিস্থিতির উপর যে রিপোর্ট রচনা করেন উহাতে আমারও দান ছিল।

খাদ্যের দিক দিয়া স্বয়ংভর, বসতি বিরল, আবাদযোগ্য হাজার হাজার বর্গমাইল পরিমিত উর্বর পতিত জমিসমৃদ্ধ আসাম উপত্যকায় বহিরাগত-দের বিশেষ করিয়া ভূমি বুভুক্ষু বাঙালী মুসলমানদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ-করণের উদ্দেশ্যে এই কুখ্যাত লাইন-প্রথাটি চালু করা হইয়াছিল সম্ভবতঃ বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। এই প্রথা প্রবর্তনের একমাত্র এবং অন্ত-র্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল আসামে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথ রোধ। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে বলা হইল, অনুন্নত অহমীয়দের স্বার্থরক্ষার

www.pathagar.com

জন্যই ইহার প্রবর্তন জরুরী বিবেচিত হইয়াছে। এই ধুয়া তুলিয়া আসাম সরকার, আসাম উপত্যকার এক বিরাট অংশে বহিরাগতদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু এই নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকা অচিহ্নিত রাখা হইত বলিয়া ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত চাষী ও মজুর শ্রেণীর লোক আশ্রয় এবং চাষাবাদের জন্য দলে দলে আসাম উপত্যকায় যাইতে থাকে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর এবং হিংস্র জীব অধ্যুষিত যে সকল জঙ্গলে সাধারণত আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেখানে শাসন ছিল আসাম সরকারের নয় বরঞ্চ বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার ও নানা জাতীয় সরীসৃপের। ইহাদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া যখন কোন রকমে মাথা গুঁজিবার মত একটা ব্যবস্থা ইহারা করিয়া লইত তখন আবির্ভূত হইত আসাম সরকারের লোক-লস্কর, জানাইয়া দিত ইহা লাইন-প্রথার অন্তর্ভুক্ত এলাকা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইত জুলুম, যথা—গৃহদাহ, লুণ্ঠন, মারধর এবং গ্রেফতার।

আবার সর্বস্বান্ত হইয়া ইহারা আশ্রয়ের সন্ধানে প্রবেশ করিত দূরে কোন ঝাড়-জঙ্গলে। পাঁচসাত বৎসর পর আবার তাহাদিগকে শিকার হইতে হইত আসাম সরকারের বর্ণনাতীত জবরদস্তি ও জুলুমের। বহিরাগতদের নেতা হিসাবে মওলানা ভাসানী এই অবস্থারই প্রতিকারের জন্য বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

মশিয়ুর রহমান

মওলানা আমাদের ঐতিহ্য

এক বছর দু'বছর নয়। তিরিশটি বছর ধরে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক। দিন গেছে। মাস গেছে। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে। রাজনীতির উঁচু-নীচু পথের উপর দিয়ে অসংখ্য ঘটনার ধারা বয়ে গেছে। তবু তাঁর সাথে আমার সংযোগ রয়েছে অটুট। আজ এখানে আমি কি বলব? এত কথা, এত দেখা, এত শোনা—চোখের সামনে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে একাকার। সেই সাথে মনের ভেতরে চেপে বসছে দুঃসহ বেদনার ভার। 'মশিয়ুর তোমাকে কি কব আমি, সারাটা দেশ লুটে-পুটে ওরা ছারখার করে দিল।' মওলানা—আমার শিক্ষক, আমার পথ-প্রদর্শক, আমার জন্মদাতা পিতার কোল-ছাড়া শিশুর পিতা, তাঁর সেই ডাক, সেই সম্ভাষণ আর কখনো শুনবো না। চোখ আমার ঝাপসা হয়ে আসছে। কথা উথলে উঠছে শোকে।

সেই কবে ১৯৪৬ সাল। তখন ছাত্রত্ব মাত্র শেষ করেছি। মুসলিম লীগের কর্মীজীবন শুরু হয়েছে। তিনি এলেন রংপুরের গাইবান্ধায়। লীগ প্রার্থীদের সঙ্গে ইলেকশনে। গাইবান্ধায় তখন আবু হোসেন সরকারের প্রবল প্রতাপ। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রার্থী সিরাজউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীকালে যুক্ত বাংলার ডেপুটি স্পীকার)। সারা জেলার প্রথম সারির প্রায় সব কর্মী জড়ো হয়েছে গাইবান্ধায়। সিরাজ সাহেবের ছোট্ট টিনের ঘরখানিতে উঠেছেন মওলানা। কর্মীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আমিও গেলাম রংপুর থেকে। সকাল নটা দশটা হবে। বাইরের খোলা বারান্দায় বসে আছেন তিনি। সাদা টুপি, সাদা-কালো দাড়ি এক বৃদ্ধ—তাঁর চোখ প্রখর, চেকলুঙ্গিতে সাদা গেঞ্জিতে আর ঝকঝকে রৌদ্রালোক মিলিয়ে কেমন যেন একটা পরিবেশ। আমি দেখলাম। বেশ ভালো করেই দেখেছিলাম মনে আছে। ভক্তি হল। শ্রদ্ধার ভাব জন্ম নিল। তাঁর সম্পর্কে শুনেছি, খবরের কাগজের ছবিতে মাঝে মাঝে দেখেছি, তাঁকে কাছাকাছি দেখলাম।

www.pathagar.com

কয়েকটি জনসভা করলেন তিনি সারা রংপুরে। সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম—বিভিন্ন সভায় আমি দেখলাম অনর্গল তিনি বক্তৃতা করছেন। আর গ্রামাঞ্চলের মানুষ যাঁরা তাঁর শ্রোতা তাঁরাও যেন তাঁর কথার সাথে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। যে কৃষক-শ্রমিক পার্টির এত প্রভাব, সে পার্টি একেবারে গুঁড়িয়ে গেল। নির্বাচনে মুসলিম লীগ জিতল সবকটি আসনে। একজন নেতা এসে একটি এলাকার হাওয়া এ রকম বদলে দিতে পারেন, বক্তৃতার উত্তেজনায় এবং আবেগে মানুষকে তাঁর কাছে টেনে নিতে পারেন, আমি তা নিজের চোখে দেখলাম এবং অনুভব করলাম।

'৪৬-এর সেদিনগুলোর সাথে মিলিয়ে মওলানার পরবর্তীকালের রাজনৈতিক জীবন এবং কার্যক্রম আমি যতই দেখেছি ততই ভেবেছি, মওলানা নেতৃত্বের এত উঁচুতে উঠলেন কেমন করে?

পদ্মার এক চরে আট আনা মাসিক বেতনে মওলানা ছোট্ট একটি মসজিদে নামায পড়াতেন আর সকাল বেলায় মক্তবে বসতেন ছেলেদের নিয়ে। অন্ধকার গ্রাম্য জীবন, গ্রামের লোকদের নানা কুসংস্কার, জমিদারদের শোষণ এবং অত্যাচার এই ছিল তাঁর তখনকার পরিবেশ। এখানে থেকেই তাঁর শুরু। সিরাজগঞ্জ, সন্তোষ, বগুড়া, আসাম, ভুরুঙ্গামারী বিভিন্ন এলাকায় তিনি কাটিয়েছেন। কৃষকদের জীবন দেখেছেন। তাদেরকে নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আর দীর্ঘদিনের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই এক অচেনা মৌলভী রূপান্তরিত হয়েছেন মওলানা ভাসানী নামক খ্যাতিবান এক বিরাট ব্যক্তিত্বে। সর্বভারতীয় পরিসরে আর কোন নেতার নাম আমার মনে আসে না যাঁর ইতিহাস এভাবে দিনের পর দিন সাধারণ কৃষকজনতার মাঝখানে গড়ে উঠেছে। এখানেই সম্ভবত তাঁর নেতৃত্বের রহস্য যা এ অঞ্চলের আর কারো পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব হয় নি।

'৪৬-এর পর ১৯৫৬ সাল। মাঝখানে দশটি বছর কেটে গেছে। পাকিস্তানী রাজনীতিতে ওলটপালট ঘটে গেছে। এখানেও সূত্রপাত ঘটানোর সাহসী কাজটি করেছেন মওলানা। আমি নিজে অবশ্য তখন মুসলিম লীগে। কিন্তু '৫৫ সালে মুসলিম লীগের ভেতরে নেতৃত্বের সাথে আমার বিরোধ বাধলো। আমি তখন রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিরও সদস্য। '৫৪-এর নির্বাচনে সারা পূর্ববঙ্গে

www.pathagar.com

যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। এ অবস্থায় কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকার থাকার মানে জোর করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আমি প্রস্তাব তুললাম, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব প্রধান মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে অপজিশানে বসুন তাহলে দেশে গণতন্ত্র রক্ষা পাবে। আবদুর রব নিশতার এবং তমিজউদ্দিন সাহেব সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। আমিও মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করলাম। এর অল্প কিছু-দিন পরেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রী হন এবং পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন। তিনি এলেন রংপুর। তাঁর সাথে শেখ মুজিব এবং খয়রাত হোসেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে বললেন। এমন কি গণপরিষদের একটি শূন্য আসনও আমাকে দেওয়ার প্রস্তাব রাখলেন। এই আসনেই নির্বচিত হয়েছিলেন বরিশালের জনাব আজিজউদ্দীন। আমার তখন বার বার মনে হচ্ছে, এতদিন ত থাকলাম সরকারী দলে, এখনো আবার সেই সরকারী দলেই যোগ দেব, লোকে কি ভাববে! এদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বয়সে আমার অনেক বড়। রাজ-নীতিতেও প্রবীণ। নামও তাঁর প্রচুর। সর্বোপরি তিনি প্রধান মন্ত্রী। তবু আমি তাঁকে বললাম, আমি পার্টি দেখব, নেতা দেখব, তারপর আসছে যোগদানের প্রশ্ন—আর এ ব্যাপারেও আমার কথা হলো। আমি এখন আর কোন সরকারী দলে যাব না, করলে বিরোধী দল করব।

তখন খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল নিজেকে। মওলানার কথা মনে হলো। তিনি তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কিছু কিছু কাজে বিরক্তি প্রকাশ করছেন বলে শুনছি। তবু আমি ভাবলাম, তিনি আমাকে কিভাবে নেবেন। তারপর একদিন একজনকে সাথে নিয়ে পাঁচবিবি থেকে হেঁটে বীরনগর গেলাম মওলানার সাথে দেখা করতে। সকাল তখন দশটা এগারোটা। তারিখটা হবে সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সাল। তাঁর বাড়ী দেখে আমি অবাক হলাম। মাটির ঘর, শনের চাল। অতি সাধারণ জীবন যাপন। একটা আকর্ষণ বোধ করলাম। আরো অবাক হলাম, নিজের হাতে তিনি আমাদের জন্যে হাত-মুখ ধোওয়ার পানি এনে দিলেন। গরম ভাত দিয়ে রাতের তরকারি দিলেন। সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া খুব গভীর বা বিরাট কিছুই তিনি বললেন না। বাড়ীর একটা খাসী জবাই করলেন। সেই গোশ্‌ত দিয়ে বিকালে আবার খেলাম এবং সন্ধ্যায় ফিরলাম। কিন্তু দেখে এলাম একজন আদর্শ ধার্মিক পুরুষ যাঁর প্রভাব আমার অন্তর স্পর্শ করল।

www.pathagar.com

তারপর '৫৭ সাল থেকে শুরু হল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জীবন। ক্রমেই হুজুরের অর্থাৎ মওলানার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। হুজুরের নির্দেশে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ছোট ভাই সরদার বাহাদুর খানকে পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত করলাম আর আমি হলাম ডেপুটি লীডার। মওলানা আমাকে বলেছিলেন, 'একনায়ক আইয়ুবের বিরুদ্ধে পরিষদে যদি কিছু করতে বা বলতে চাও তাহলে পরিষদের ভেতরেই একটা শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করতে হবে।' এজন্যই তিনি সরদার বাহাদুরের নাম বলেছিলেন।

পরিষদের বাইরে মওলানা তখন পাক-মাকিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন তুলেছেন। আইয়ুব নাজুক অবস্থায় পড়ে একমাত্র হেড কোয়ার্টার ছাড়া সেনাবাহিনীর বাকি সব স্তর থেকে মাকিন উপদেষ্টাদের সরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। এদিকে ইচ্ছা থাকা সত্বেও আইয়ুব ভুট্টোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করতে পারছেন না। কারণ মাকিনীরা চটবে যেহেতু ভুট্টো সোভিয়েতের সাথে তেল অনুসন্ধান চুক্তি করেছেন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর অবশ্য ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন এবং আমারই পরামর্শ-ক্রমে চীন সফরে গেলেন। ইতিমধ্যে মোনেম খানের বিরুদ্ধে রংপুরে তুমুল বিক্ষোভ চলছিল এবং আমি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়ায় বিক্ষোভের উত্তেজনা আরো বাড়ল। প্রায় প্রতিদিনই মিছিল-মিটিং হচ্ছে আর আমাকেও সেগুলোতে থাকতে হচ্ছে। হঠাৎ একদিন দেখি বেলা দশটার সময় ট্রেন থেকে নেমে একটি রিকশায় করে মওলানা ভাসানী সোজা আমার বাড়ী এসে হাজির! তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে আমি বললাম, 'হুজুর, শহরে ছাত্রদের উপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে আমি মিছিলে যাচ্ছি। আপনি বিশ্রাম নিন।' আমি যখন ফিরলাম তখন দুপুর দুইটা। সারা শহর বিক্ষোভে আগুন। বিকাল গড়িয়ে রাত হল। পাশাপাশি করে আমি এবং মওলানা সাহেব ঘুমাচ্ছি। রাত দুটায় হঠাৎ পুলিশ এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর পুলিশের ডাক শুনেই মওলানা সাহেব তাঁর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ফেললেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়ে গ্রেফতার হওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল, পুলিশ এসেছে তাঁকে নয়—আমাকে গ্রেফতার করতে। আমিও ব্যাপার দেখে হতচকিত হয়ে পড়লাম। আমাকে গ্রেফতারের পর মওলানা সাহেব নিজে সেখানে থেকে আমার পরিবারকে সান্ত্বনা দেন এবং পরবর্তী আন্দোলনের জন্যে সেখাকার কর্মীদেরকে নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

এদিকে ভুট্টোর চীন সফর আশানুরূপ সফল হল না। দেড় মাস পর আমি মুক্তি পেলাম। সরকারের পক্ষ থেকে তখন মওলানা সাহেবকে চীনে পাঠানোর জোর চেষ্টা শুরু হল। ঠিক হল মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের একটি দল গণচীনে শুভেচ্ছা সফরে যাবে। তখন '৬৩ সাল। কিন্তু মওলানা বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, 'আমি যার মেহমান, তারই দায়িত্ব আমাকে নিয়ে যাওয়ার। আমি উপযাচক হয়ে যেতে চাই না।' তিনি সোজা বলে দিলেন, 'পাকিস্তান সরকারের অর্থে তিনি বাইরে যাবেন না।' পরে সত্যিই তাঁর জন্যে রুট বদল করা হল। আমরা প্রতিনিধিদলের বাকিরা গেলাম হংকং হয়ে আর হুজুরকে রেঙ্গুন থেকে চীনা বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হল। এ রকমই ছিল তাঁর আত্মসম্মানবোধ।

ইসলামাবাদে আইয়ুব-ভাসানী সাক্ষাৎকারের কথাও হয়তো অনেকেরই মনে আছে। আমি শুধু সেই সাক্ষাতের একটি কথাই এখানে তুলে ধরব। হোটেল থেকে আসরের নামায পড়ে হুজুর এবং আমি প্রেসিডেন্ট ভবনে গেলাম নির্ধারিত সময়ের ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে। আইয়ুবের সহকারীরা আমাদের বলল, 'আপনারা বসুন, প্রেসিডেন্ট আসছেন।' হঠাৎ দেখলাম, মওলানা জায়নামায চেয়ে বসলেন এবং নামাযে বসেও পড়লেন। ঠিক এ সময়েই আইয়ুব এলেন আমরা যেখানে অপেক্ষা করছি সে ঘরে। কিন্তু হুজুর তখন নামাযে। বেশ কয়েক মিনিট পর হুজুর মুখ তুললেন। বাধ্য হয়ে আইয়ুবকে মাথা নীচু করে তাঁকে সালাম জানাতে হল। পরে আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি তো নামায পড়েই বেরিয়েছেন, তারপর আবার নামায পড়তে বসলেন কেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি নফল পড়ছিলাম। কারণ আইয়ুবের উচিত ছিল আমাদেরকে মেহমান হিসেবে অভ্যর্থনা করা। কিন্তু সে আসবে আর আমরা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করব, এটা মেহমানদারীর নিয়ম নয়। তাই আমাকে নামাযে বসতে হল।'

মওলানা এমনভাবে স্মৃতিতে জড়িয়ে রয়েছেন যে, কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা বলব তা-ই আমি ঠিক করতে পারছি না। '৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়কার একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিরোধী দলগুলোর প্রায় সবাই তখন আজম খানকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর পক্ষে। মওলানা এ বক্তব্যের ঘোর বিরোধী। তাঁর কথা হল, সেনাবাহিনীর শাসনের বিরুদ্ধেই যেখানে লড়াই সেখানে তাদের একজনকে সরিয়ে আর

www.pathagar.com

একজনকে বসানোর কোন অর্থ হয় না। তাই তিনিই প্রথম ফাতেমা জিন্নাহর নাম করলেন এবং মালিক গোলাম জিলানীসহ আমাকে মিস জিন্নাহর কাছে পাঠালেন তাঁকে রাজী করানোর জন্যে। এ ব্যাপারেও তাঁর লক্ষ্য ছিল, ফাতেমা জিন্নাহর সারা পাকিস্তানী ইমেজকে সামনে রেখে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। আজ সবাই জানেন, নির্বাচনের হৈ চৈ আর হট্টগোলে মওলানার সেই মূল লক্ষ্যটি কিভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

পাক-ভারত যুদ্ধ, ন্যাপের ১৪ দফা কর্মসূচী, ন্যাপের ভাঙ্গন, '৬৮-৬৯-এর আন্দোলন, ন্যাপের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং ন্যাপকে পথচ্যুত করা, তারপর '৭১-এর যুদ্ধের সময়কার নানা নেপথ্য ঘটনা এবং তার পরবর্তী এই বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহ—এসবের মধ্যে আমি নিজেই অনেক কিছুর একেবারে প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেসব আজ বলতে গেলে কাহিনী। কিন্তু তবু তা ইতিহাসের অঙ্গ, যে ইতিহাসের সর্বাধিনায়ক মওলানা।

১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধের আগে অথবা যুদ্ধ চলাকালীন কিংবা তার পরের ঘটনাবলী নিশ্চয়ই সবার জানা আছে। মওলানা ভাসানী তখন ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আক্রমণের নিন্দায় মুখর। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান—দুই অঞ্চলেরই তিনি সীমান্তে ঘুরেছেন, জনসভা করেছেন, জওয়ান এবং অফিসারদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এটা তিনি তখনকার শাসকের প্রয়োজনে করেন নি, করেছেন শাসিত জনগণের স্বার্থে। যেমন '৭৬-এর ১৬।১৭ মে'র ফারাক্কা মিছিলকেও অনেকে বলেছেন, শাসকের স্বার্থে করা হয়েছে, অনেকে বলেছেন, বহিঃশক্তির ইঙ্গিতে করা হয়েছে। সমকালীন ঘটনাধারা যদি এত প্রশ্নের, সব সন্দেহের নিরসন এখনো ঘটিয়ে না থাকে তাহলে ভবিষ্যতকেই বিচারক মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের নেই। ঠিক '৬৫-৬৬ সালেও মওলানাকে এমনি সন্দেহ, প্রশ্ন এবং কটূক্তির বাণ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সময়ের এবং ঘটনার বিকাশ তাঁরই অনুকূলে আবর্তিত হয়েছে।

'৬৫ সালের যুদ্ধের পর যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ফলাফল হিসেবে রাজনৈতিক-ভাবে এ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে দাঁড়াল। প্রশ্নটা এর আগেও ছিল। কিন্তু প্রধান হয়ে উঠে নি কখনো। এবার যেমন হল: '৫৭ সালের আওয়ামী প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন? তারপর ৬৫-র যুদ্ধের পর সেই আওয়ামী লীগই আবার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের

www.pathagar.com

দাবী তুলল। এটাই ইতিহাসের পরিহাস! কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতির অঙ্গনে স্বায়ত্তশাসন—এই কথাটা আমি সম্ভবত সর্বপ্রথম শুনি মওলানা ভাসানীর মুখে। সেই মওলানাকেই আওয়ামী লীগাররা '৫৭-র শেষে এবং ৫৮-র প্রথমদিকে ভারতের চর আখ্যা দিয়েছিল। তখনকার দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাগজগুলো দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। অথচ মওলানার অপরাধ কিছুই ছিল না। তিনি শুধু এইটুকুই বলেছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী একথা বলে পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত মানুষকে উপহাস করেছেন। যাক, সেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নই আবার হয়ে উঠল প্রধান আলোচনার বিষয়। যুদ্ধের বিষময় ফল হিসেবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ক্রমেই জটিল এবং ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকল। আন্তর্জাতিক সুযোগসন্ধানী চক্রও বোধ হয় এটাই চেয়েছিল। এলো ৬ দফা। মওলানা ৬ দফার কাঠামোগত বিন্যাসের বিরোধিতা করলেন।

এ সময়ও ন্যাপ এক এবং ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো ন্যাপের মধ্যে। '৬৬-র শেষদিকে ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপ কমিটি আলতাব আলীকে বহিষ্কার করল। কেন্দ্র থেকে মহিউদ্দিন (বর্তমানে আওয়ামী লীগ) সাহেবসহ আরো কয়েকজন গেলেন তদন্ত করতে। তাঁরা সেখানে গিয়ে সবাইকে বহিষ্কৃত করলেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করলেন; কেন্দ্রীয় কমিটি ময়মনসিংহের জেলা কমিটির সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে তার পক্ষে রায় দিল। তারপরেই ওরা রিকুইজিশন কাউন্সিল ডাকার তোড়জোড় শুরু করে দিল। মওলানাকে যা-তা বলে আক্রমণ শুরু করল। মওলানা ওদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে কাউন্সিল ডাকলেন রংপুরে। পার্টি নিশ্চিত বিভক্তির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। এটা '৬৭ সাল। আমি কিন্তু তখন পার্টি ভাঙ্গার ঘোর বিরোধী। কারণ আমি দেখছিলাম, পার্টির মধ্যে পোলারাইজেশন এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় নি। যা ঘটছে তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট লাইনের দ্বন্দ্ব এবং বিতণ্ডার প্রতিফলন। আমি ভাবলাম, ন্যাপ তো কম্যুনিস্ট পার্টি নয়, সুতরাং ন্যাপ কেন ভাঙ্গবে। তাই আমি একটা সমঝোতা আনতে চাইলাম। কাউন্সিলের জন্য রংপুর যেতেও দেরী করলাম। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি রিকুইজিশন যাঁরা ডেকেছেন তাঁদেরও রংপুরে যেতে বললাম। পীর হাবিবুর রহমান, রায়পুরার নূরুর রহমান সাহেব এবং আরো একজন যাঁর নামটা মনে আসছে না, এঁরা গেলেন সেখানে। কিন্তু মওলানা

www.pathagar.com

তখন আর পেছনে তাকাচ্ছেন না। রংপুরে কাউন্সিলররা জড়ো হচ্ছে। তিনি কাউন্সিলের উদ্যোগ, আয়োজন, প্রস্তুতি এসব শেষ করে চূড়ান্ত পর্বের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। কাউন্সিলের একদিন আগে আমি রংপুর গিয়ে পৌঁছলাম। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সুবিধা নিয়ে আমি রংপুর জেলে ব্যক্তিগতভাবে মনিকৃষ্ণ সেন, আমজাদ হোসেন এবং শিবেন মুখার্জীর সাথে কথা বলে তাদের বললাম, 'তোমরা অন্তত ওদের বল যে, ওরা যেন পার্টি না ভাঙ্গে।' সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমি তাঁদের পার্টিতে থাকতে বললাম ; কিন্তু পীর হাবিবুর রহমানরা থাকেন নি। তখনকার একটা বিষয় আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। এসব ভাঙ্গাভাঙ্গি, বিতণ্ডা ইত্যাদি দেখে মনে মনে একটা ক্ষোভ নিয়ে আমি আমার বাসায় এসে শুয়ে রয়েছি। তখন কাউন্সিলের আগের দিনের সন্ধ্যা। মওলানা এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় আধ ঘন্টার মত কিছু কথা বললেন। তাঁর কথা ছিল, 'সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগো না। আপোষহীন হও। যারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, পার্টির নীতি-নিয়ম লংঘন করছে, ব্যক্তিগত নিন্দা এবং কুৎসা ছড়াচ্ছে, তাদের সাথে কিসের আপোষ? কিসের সমঝোতা?' তিনি তখন ভীষণ কড়াভাবে আমাকে বললেন, 'এই ধরনের দোদুল্যমানতা বাদ দাও, সিদ্ধান্ত নাও এবং সিদ্ধান্ত যখন নেবে তখন তাকে বাস্তবায়নের জন্যে এগিয়ে যাবে, কোনদিকে তাকাবে না।' এসব কথার পর আমি আর শুয়ে থাকতে পারি নি---অনুসরণ করলাম হুজুরকে। পরের দিন সকাল থেকে রংপুর কাউন্সিল হয়ে উঠল নব উদ্দীপনার এক তীর্থক্ষেত্র।

এলো '৬৮-৬৯-এর সাড়া জাগানো আন্দোলনের কাল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, বরফের উপর আঘাত করছিলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি, তাঁর নাম মওলানা। ঢাকায় '৬৮-র ৭ই ডিসেম্বরের হরতাল এবং ২৯শে ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম-অঞ্চলের হাট-বাজারে হরতাল হলো মওলানার দিগন্তপ্লাবী আহ্বানে। তারপরই ছাত্ররা দিলেন ১১ দফা। ন্যাপ তার নিজস্ব ১৭ দফা বাদ দিয়ে ১১ দফাকেই পতাকা হিসেবে গ্রহণ করল। '৬৯-এর জানুয়ারী মাসেই খুলনায় প্রাদেশিক কাউন্সিল বসল আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে। মওলানা সেখানে বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ আস্তে করে আমাকে বললেন, 'মানবে তো?' আমি বললাম, 'মানবো।' তখন সাথে সাথে তিনি মাইকে ঘোষণা করে দিলেন, 'জাতীয় পরিষদে যারা আমার পার্টি

www.pathagar.com

থেকে নির্বাচিত সদস্য রয়েছ, তারা পদত্যাগ কর।' এবং তারপরই তিনি আহ্বান জানালেন, 'বি. ডি. সদস্যরাও পদত্যাগ কর।' আমি, আরিফ ইফতেখার এবং মুজিবর রহমান চৌধুরী বিবৃতি দিয়ে পরিষদ থেকে পদ-ত্যাগ করলাম। সদস্যের পরিচয়পত্র হুজুরের কাছে সমর্পণ করলাম এবং পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম স্পীকারের কাছে। কিন্তু আওয়ামী লীগাররা কেউই স্পীকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন না।

'৬৯-এর আন্দোলন থেমে গেল। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এলেন। ন্যাপ আরেকটি দুর্যোগের মুখোমুখি হলো। চারু মজুমদারের নকশালবাড়ী লাইনের প্রভাব বিস্তৃত হল এদেশে। মতিনরা প্রথমেই সেই লাইন গ্রহণ করল। শাহপুর কৃষক সম্মেলনে হক সাহেবও বলে বসলেন, 'এবার জোতদারের গোলায় আর ধান থাকবে না।' আমি তখন লায়ালপুর জেলে। বীরনগর কৃষক সম্মেলনে তোয়াহা সাহেব ন্যাপকে বুর্জোয়া এবং প্রতি-ক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে তার সম্পাদক পদে ইস্তফা দিলেন। সম্ভবত '৭০-এর ১৮ই জানুয়ারী যখন সন্তোষে কৃষক সম্মেলন হচ্ছে তখন পদত্যাগ করলেন হক ভাই। তাঁরা সন্তোষে গেলেনও না। ২০শে জানুয়ারী ঢাকায় তাঁরা আসাদ দিবস পালন করলেন। দ্বিমুখী-ত্রিমুখী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং কারো কারো অযৌক্তিক আক্রমণ এবং বাড়াবাড়ির ফলে ন্যাপের ভিত্তি একেবারে টলে উঠল। পার্টি ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়াল। এ সময় মওলানা যে জ্বালাও পোড়াও এসব খুব বেশী করে বলতেন, তার কারণ সম্ভবত তরুণদেরকে ধরে রাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে পার্টি মধ্যবিত্তের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এক কথায় সমগ্র পার্টি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ভেতরেই ঘাতপ্রতিঘাত সইতে লাগল এবং ফলশ্রুতিতে পার্টি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ল। সারা পার্টির ভেতরে বিরাজ করতে থাকল একটা নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি। কোন রাজনৈতিক বিতর্ক নেই, পার্টির অস্তিত্ব, এর বিশেষ অবস্থানকে মেনে নিয়ে পোলারাইজেশন ঘটানো এবং একে আরো শক্তিশালী করার কোন প্রচেষ্টা নেই, শুধু মওলানার উপর এবং আমরা যারা কম্যুনিস্ট ছিলাম না তাদের উপর একতরফা আক্রমণ চালাতে থাকল। আর সেই সাথে 'নকশালবাড়ী—নকশালবাড়ী' কথাটা বলতে থাকল পাল্লা দিয়ে। এখানেও শেষ নয়। এসব গ্রুপ নিজেদের পরস্পরের উপরও আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকল। সে সময়কার 'গণশক্তি' পত্রিকা খুললেও দেখা যাবে, আসলে কি হচ্ছিল

www.pathagar.com

তখন। অথচ আজো আমি এটা দৃঢ়ভাবে মনে করি, এ সময় ন্যাপ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত, যদি সবাই ন্যাপে থাকতেন, তাহলে আজ এক পরিবর্তিত ইতিহাস দেখতে পেতাম আমরা সবাই।

'৭০ সালে আমরা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতাম এবং নির্বাচন করতাম তবে ২৫টা আসন অন্তত নিশ্চয়ই পেতাম। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের চারজন ভুট্টোর সাথে যোগ দিয়ে জিতেছিল, এটা অনেকেই হয়তো জানেন। সেদিন নির্বাচন বিরোধিতার ডামাডোলের সময় কিন্তু এমন কয়েকজন ছিলেন---আনোয়ার জাহিদ, নূরুল হুদা, কাদের বখশ, মোহাম্মদ সুলতান এবং শ্রদ্ধেয় হাজী দানেশ---যাঁরা ন্যাপের নির্বাচন করার স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ আমি মনে করি, যদি প্রথম থেকেই নির্বাচনের ব্যাপারে পার্টি পজিটিভ হত এবং ২৫টা আসন নিতে পারত, তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামোর ভেতরই আঞ্চলিক প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে আমরা কার্যকরী পদক্ষেপ এবং ভূমিকা রাখতে পারতাম। অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভারত পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে পারত না, কারণ আমরা থাকতাম বাধা।

এখানে কিছু পূর্বকথা বলে রাখা প্রয়োজন। '৬৯-এর মাঝামাঝির দিকে ইন্টেলিজেন্সের এক অফিসার মেজর কমল (বর্তমানের মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান) দেখা করেছিলেন মওলানার সাথে। তখন ইন্টেলিজেন্সের চীফ ছিলেন জেনারেল আকবর। মেজর কমল মওলানার সাথে স্বাধীনতার প্রশ্নে আলোচনা করেছিলেন। পূর্বাপর বিচার করে মওলানা ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এ সময় আমার সাথে তাঁর বহু আলাপ হয় যা আমার জন্যে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। আমাদের নিজেদের পার্টি তখন ক্ষত-বিক্ষত। সাধারণ নেতা এবং কর্মীরা বিভ্রান্ত। বামপন্থী বন্ধুরা নৈরাজ্যের ঘোরে আচ্ছন্ন প্রায় সবাই। এমনি এক অবস্থায় রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচ বেড়ে চলল নেপথ্যে। এ সময় ঘোষিত হলো, ইয়াহিয়া চীন যাচ্ছেন সেপ্টেম্বর মাসে। মওলানা আমাকে বললেন, 'প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতি বাঁচাতে হলে ইলেকশন বন্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ ইলেকশন হলেই ৬ দফার আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে রূপ নেবে। সুতরাং ইলেকশন আপাতত স্থগিত রাখার জন্যে যদি কিছু করা যায় তো তাই কর।' তিনি বললেন, 'আগে শাসনতান্ত্রিক এবং কাঠামোগত প্রশ্নগুলো

www.pathagar.com

মীমাংসা করে তারপর নির্বাচন হোক। যেমন ইয়াহিয়া যখন পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়েছে তখন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোও ঘোষণা করুক। তারপর যদি নির্বাচন হয় তাহলেই কেবল অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো সামনে আসবে, না হলে আঞ্চলিক ভিত্তিতেই নির্বাচন চলে যাবে। অতএব আমি বলছি, তুমি নির্বাচন মুলতবী করার জন্যে কাজ কর।' এ যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার অমর বাণী।

আমি পাকিস্তানে চীনা রাষ্ট্রদূত যিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে পিকিং যাচ্ছিলেন তাঁকে বললাম, 'আপনি প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে আমার এই ছোট্ট চিরকুটটি পৌঁছে দেবেন।' চীন থেকে ফিরে এলেন ইয়াহিয়া। সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউজে আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁর সাথে হুজুরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন, 'প্রধান মন্ত্রী চৌ—সেই জ্ঞানী বৃদ্ধও এমনি আশংকার কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি, বেশী খারাপ অবস্থা দেখলে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করব না।' তাঁকে আমি বুঝাতেই পারলাম না যে, কোন্ পথে এর সমাধান নিহিত। তিনিও বুঝতে চাইলেন না, সেতুর কোন্ পারে সংকট থেকে মুক্তি।

এলো '৭১। মার্চের শেষদিকে মওলানা সাহেব খবর পাঠালেন টাঙ্গাইল থেকে। শামসুল হকের বাড়ী রৌমারী থানার কোদাল কাটা চরে আমাকে পাবে। আমি ঢাকা থেকে রওনা হলাম ৩রা এপ্রিল। আমি আমার ছেলে-মেয়েদের সবাইকে বললাম, তোমরা যে কোন একজন আমার সাথে থাক—বাঁচি কি মরি, আল্লাহ্ জানেন। আমার মেয়ে রীটা আমার সাথে থাকল আর সাথে চলল আমার ভাগ্নে তফিজ্জুল ইসলাম খোকা। বহু লুকিয়ে ছাপিয়ে আরিচা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো সিরাজুল হক মন্টু, শামসুল হক এরা। নৌকায় পার হলাম যমুনা। নগর বাড়ী, পাবনা, বগুড়া, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, ফুলবাড়ী প্রতিটি জায়গায় কর্মী-বৈঠক করলাম এবং আট তারিখে হিলি বর্ডার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। এখন দেখা দিলো এক অজানা শংকা। প্রায় উনত্রিশ বছর আগে কি হলো, এবার কি হতে যাচ্ছে, অতীত এবং বর্তমানের নানা ঘটনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। মনে একটা ভাব জমা হলো। ওদিকে কোদাল কাটার চরেও যেতে পারি নি পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থান থাকায়।

www.pathagar.com

সেই আটই এপ্রিল রাত্রেই আমি আমাদের বহু পুরানো পরিচিত হোটেল টাওয়ার লজে উঠে শুনলাম, আমার মেজ ছেলে আনোয়ারুল গনি পিটু ও আমার ভাইপো ওবায়দুর রহমান আমাকে কলকাতায় খুঁজতে এসেছে। রংপুরের বাড়ী লুট এবং ধ্বংস, আর পরিবারের সকলের গ্রামের বাড়ী ডিমলায় আশ্রয় নেয়ার খবর শুনলাম হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। সি. পি. এম. কেন্দ্রীয় কমিটির অনেকের সাথে বিশেষ করে সুন্দরায়া, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরে কৃষ্ণ কোঙার, জ্যোতির্ময় বসু—এঁদের সঙ্গে দেখা হলো। আলোচনা করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম মওলাকে খুঁজে বের করব এবং সমস্ত বামপন্থীকে নিয়ে একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করব। ইতিমধ্যে দেবেন শিকদারের সাথে দেখা হলো। শুনলাম, তিনি জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন। দেবেন শিকদারসহ আরো অনেকের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলাম, ডিমলায় ২৬শে এপ্রিল বৈঠক বসবে। সে কথামত আমার ওপর মওলানাকে খোঁজার ভার পড়ল। লোক গেল সেই কোদাল কাটার চরে। কিন্তু তারা গিয়ে শুনল, মওলানা তখন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী (আসাম)-র কাছে আছেন। তাঁর কাছে লেখা আমার চিঠিটাও গিয়ে পড়ল মাইনকার চরের বি. এস. এফ. ক্যাপ্টেনের হাতে। অতএব ভারত সরকার তাঁকে আটকে দিলো।

আমরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ তারিখে ডিমলায় এবং পরে জলপাইগুড়িতে বসলাম। একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হলো ৭-দফা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। কাগজ-পত্র লেখা হলো। ডাঃ মারুফ হোসেনের হাতে লেখা সে কাগজে সবাই স্বাক্ষর করলেন। আমি লিখলাম পুরো নাম। আর বাকিরা লিখলেন টেক। দুর্ভাগ্য, ভারত সরকারের হাতে সে কাগজও গিয়ে পৌঁছল। তখন মওলানার সাথে দেখা করাতো দূরে থাক, আমার বিরুদ্ধে সেখানে জারি হলো ওয়ারেন্ট। আমার উপর লেলিয়ে দেয়া হল পুলিশ, সি. আর. পি. এবং সেনাবাহিনীর লোকদের। তখন অবশ্য বিজয় সিং নাহার (পশ্চিম বঙ্গের তখনকার স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী), তাঁর সাথে আমার পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে আমাকে মইনুল হক চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। কিন্তু তবু দেখা হয়নি হুজুরের সাথে। তারপর এদেশে এসে আমি গ্রেফতার হলাম। ডিমলা থেকে সৈয়দপুর ক্যান্টমেন্ট, তারপর রংপুর, তারপর ঢাকায় নিয়ে এল। তখন চীনা দূতাবাস কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করলে জেনারেল নিয়াজি আমাকে শুধু রংপুর শহরেই থাকবার জন্যে

www.pathagar.com

অনুমতি দেন। এর মধ্যে অবশ্য মওলানার সাথে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আমি তাঁর খবরাখবর পেতাম এবং তিনিও আমার খোঁজ নিতেন। এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, মুজিব ঢাকা আসার পরেই কিন্তু মওলানাকে ঢাকা পৌঁছানো হয়। বোঝা যায়, মওলানাকে নিয়ে ভারত সরকারের মধ্যে আগাগোড়া একটা ভীতি কাজ করছে।

তারপর এই বাংলাদেশ। ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকল। কোলাবরেটর চার্জে গ্রেফতার হলাম। জেলে থেকে নির্বাচন করলাম এবং হেরে গেলাম। নীলফামারী কোর্টে কেস উঠল। হাজার হাজার লোক জমা হলো, আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। পুলিশ বাধা দিতে পারছে না। সেখান থেকে কেস স্থানান্তরিত হলো রাজশাহীতে।

রাজশাহী কোর্টে ট্রায়াল। মওলানা জনসভা করে হুঁশিয়ার করলেন: খবরদার, যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে তো শাস্তি দাও। কোন বাইরের প্রভাবে যদি কিছু হয় তো সারা বাংলাদেশে আমি আর একবার আগুন জ্বালিয়ে দেব। রাজশাহী কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, সর্বত্র মীর্জা গোলাম হাফিজ মুভ করলেন আমার পক্ষে। শেষ পর্যন্ত আমি মুক্তি পেলাম ১৫ই অক্টোবর '৭৩-এ। হুজুর বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় দীর্ঘ দুটি বছর পর আবার দেখা হলো। অনেক কথা হলো। '৭৪-এর ফেব্রুয়ারীতে কাউন্সিল হলো। আমাদের মাঝখানে যাঁরা বাধার দেয়াল তুলেছিলেন সে দেয়াল ভেঙে পড়ল। আর যাঁরা তা তুলেছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে নিজেরাই পার্টি খাড়া করলেন।

থাক সেসব কথা। এবার শুধু তাঁর শেষ জীবনের দু'একটি কথা বলেই শেষ করব। '৭৬-এর ১২ই নভেম্বর তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। রাত ১০ টায় হাসপাতালে আমি তাঁর কাছে গেলাম। হজ্জে যাওয়ার কথা তিনি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। আমি যেতেই তিনি আমাকে কথায় কথায় বললেন, 'জানি না আর বাঁচব কিনা, তোমরা আমার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখো, পার্টির ঐক্য রক্ষা করো।' চিকিৎসার জন্য লণ্ডন যাওয়ার আগে খালেদ-বিন ওয়ালিদের নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপনের কথা বলেছিলেন, তা আবার মনে করিয়ে দিলেন। অনেক কথা বললেন, দোয়া করলেন আর বার বার অতীতের দিকে ফিরে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমি কেঁদে ফেললাম। ১৪ই নভেম্বর দুপুর বারোটায় তাঁকে হাসপাতাল থেকে দেখে এলাম। তিনি বললেন, 'ভালো আছি।' ডাক্তাররাও আশ্বাস

www.pathagar.com

দিলেন। ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি, আমাদেরকে অসহায় করে দিয়ে তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু তাই হলো। নিয়তির এমনি নিষ্ঠুরতা!

যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ। আজ আমি নিজেই পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করে ফেলেছি। রংপুরে যখন তাঁকে আমি দেখি, তখন তাঁর বয়স বোধ হয় ষাটের উপরে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাঁর পরিচিতি। অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অর্জন করেছেন অর্থাৎ আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখনই রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সফল পুরুষ। কিন্তু তার পরে অথবা যতদূর শুনেছি আগেও তিনি কখনো শুধু ক্ষমতার সন্ধান করেন নি। বরং মানুষের এবং দেশের কষ্টের খোঁজ নিতেই দেখেছি তাঁকে বেশী। আজ আমি তাঁরই উত্তরাধিকার বহন করছি। কিন্তু আমি জানি, সেই মহামানবের তুলনায় আমি কোথায়! তবু মনীষী কার্ল মার্কসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চাই ঃ The tradition of all the dead generations weighs like an incubus upon the brain of the living.

মওলানাই আমাদের সে ঐতিহ্য। আর আমরা তাঁর অক্ষম বাহক।

www.pathagar.com

বজলুছ ছাত্তার

আমার স্মৃতিতে মওলানা ভাসানীর হজ্জ

১৯৩৯ সন ডিসেম্বর মাস। জামে-আজহারে ফিকাহ্ শাস্ত্রের বাঙ্গালী অধ্যাপক নোয়াখালী নিবাসী জনাব মমতাজউদ্দীনের সাথে আমিও ব্যাংক মিশরে দিনের বেলায় কাজ করি, সন্ধ্যায় ইসলামী সংস্কৃতির ক্লাশ করি। তখনকার দিনে জামে-আজহারের চারপাশে বস্তি এলাকা ছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বস্তির অনেকেই ঘরবাড়ীতে তালা দিয়ে হজ্জের জন্য রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলত, "আল-হাজ্জুল আকবার' যেয়া হজ্জ।" অর্থাৎ অত্যন্ত বড় হজ্জ, এক হজ্জে এক শত হজ্জের সওয়াব হয়। সেবার ছিল শুক্রবারে হজ্জ। শুক্রবার ইয়াত্তমুল জুম্-আ বা জুম্-আর দিন মুসলিম মিল্লাতের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াজিদ-পূর্ববর্তীকালে এই দিনে প্রথম খুতবার মাধ্যমে বিগত সপ্তাহের ঘটনাবলীর রিপোর্ট পেশ করা হত ও আগামী সপ্তাহের জন্যে একটি কার্যক্রমের উপস্থাপনা করা হত। প্রথম খুতবার শেষে ছিল প্রশ্নোত্তরের পালা, এই শুক্রবারে মহানবী (স.) আরা-ফাতের ময়দানে আনুমানিক দেড় লক্ষ হাজীদের সমাবেশে তাঁর জীবনের শেষ খুতবা দিয়েছিলেন এবং চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বের এই খুতবায় তিনি মানব জাতির যে মুক্তিসনদ রেখে গেছেন, সভ্যতাগর্বী দুনিয়া আজ অবধি তা কার্যকর করতে পারে নি।

আমিও হজ্জের নিয়াতে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে মিশরী জাহাজে জেদ্দা রওয়ানা হলাম। জেদ্দায় পৌঁছে জেটি থেকে নেমে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল একজন এহরাম পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত হাজীর কোমরে রশি বেঁধে একজন সউদী পুলিশ টেনে নিয়ে চলেছে। পাঁচ বৎসর ইউরোপে থাকাকালীন এরূপ দৃশ্য চোখে পড়েনি। ইউরোপে আসামীর হাতের সাথে পুলিশের হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরান থাকে, যেন দৃশ্যত তাকে অপরাধী মনে না করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আসামী নির্দোষ, ইসলামী আইনের এই

www.pathagar.com

বিধান, ইউরোপীয়রা ক্রুসেডের সময় মুসলমানদের কাছ থেকে শিখে আজ অবধি মানে। কিন্তু ব্যতিক্রম উপনিবেশগুলোতে ও মুসলিম দেশে। পবিত্র ভূমি হেজাজে একজন হাজীর (হজ্জের নিয়তে হেজাজের মাটিতে পা দিলেই হাজী বলা হয়) এই দশা দেখে মনটা বেকারার হয়ে উঠল। আল কুর-আনের আয়াতসমূহে যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেন, হজ্জের সময় দূর-দূরান্ত হতে মানুষ আসবে, কেউ পায়ে হেঁটে, আবার কেউবা দূর পথ চলার দরুন, পিপাসিত, ক্লিষ্ট—উটে চড়ে আসবে। এরা সবাই আল্লাহ্র মেহমান, এদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও দয়া প্রদর্শন করবে।' এতদসত্ত্বেও কেন এরূপ ব্যবহার? এগিয়ে গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ট্যাক্স না দেওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লোকটি সিন্ধি হিন্দুস্থানী। ঐ বৎসর সউদী সরকার প্রথমবারের মত ষাট রিয়াল বা ষাট টাকা (রিয়াল ও টাকার মূল্য সমান ছিল) ট্যাক্স প্রবর্তন করেছেন। আসামীকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ট্যাক্স দেয়নি। উত্তরে বলল, বাবা, এই ছোট্ট পুঁটলিটা ছাড়া আমার কাছে কোন পয়সা-কড়ি নেই। ভিক্ষা করে করাচী পৌঁছে জাহাজের সারেংয়ের সৌজন্যে জেদ্দা পৌঁছেছি। পুলিশকে বললাম, এই লোকের ট্যাক্স দেওয়ার শক্তি নাই, তবুও তাকে কেন গ্রেফতার করা হল? পুলিশ বলল, এর উত্তর আপনি আমার অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি সামনের তাঁবুতে বসেন। তাদের সঙ্গে অফিসারের তাঁবুতে গেলাম। অফিসার অদূরে আর একটি বড় তাঁবুতে যেতে বললেন, ওখানে বাদশাহ্ স্বয়ং উপস্থিত আছেন। ট্যাক্স না দেওয়া অনেক লোকের ওখানে বিচার চলছে। আসামীকেও ওখানে পাঠানো হলো। বড় তাঁবুতে পৌঁছেই দেখলাম, শ' তিনেক লোক কাঠগড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে, তাদের পক্ষে মওলানা ভাসানী সউদ বিন্ আবদুল আজিজের সাথে সওয়াল-জওয়াব করছেন। মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল ঃ

১. হাজীগণ আল্লাহ্র মেহমান বিধায় হেরেম শরীফের যিয়ারতকারী হিসাবে আপনার সহৃদয় ব্যবহার তাদের প্রাপ্য।

২. আল্লাহ্তা'আলা 'তৈল' প্রাপ্তির মাধ্যমে আপনাদের অগাধ সম্পদ দান করেছেন, অতএব সামান্য ট্যাক্সের টাকা মাফ করে এদের রেহাই দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

৩. সাড়ে তের শত বৎসর পরে এবার প্রথম ট্যাক্স প্রবর্তিত হলো। শহরবাসীরা পত্রিকার বিজ্ঞাপন মারফত খবর পাওয়ায় আমরা সবাই ট্যাক্স

www.pathagar.com

আদায় করেছি, কিন্তু এই গ্রামবাসীদের কাছে খবর পৌঁছায় নাই বিধায় এরা ট্যাক্স আদায়ে অপারগ।

৪. এরা সবাই নিঃস্ব, হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, (আসাম-বাংলা হতে পায়ে হেঁটে বোম্বে পৌঁছে ওখান হতে জাহাজের খালাসীদের সহায়তায় বিনা ভাড়ায় জেদ্দা পর্যন্ত যেতে) এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত।

৫. এদের বন্দী করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালে আপনার কোন লাভ নেই।

বাদশাহের পক্ষ থেকে বলা হলোঃ ১. হজ্জ বিত্তবানদের জন্যে ফরয। বিত্তহীনদের হজ্জে আসার কোন যৌক্তিকতা নেই। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক লোক ভারত হতে হজ্জের সময়ে আসে। তারা আর ফিরে যায় না। যেহেতু এরা সকলেই প্রায় বয়োবৃদ্ধ, এদের দ্বারা কোন কাজও করান যায় না, তারা সমাজে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এই ট্যাক্স। উল্লেখ্য, ১৯৩৪ সনে আবদুল আজিজ বিন্ সউদ মক্কা ও মদীনা অধিকার করেন। ইতিপূর্বে হজ্জে যাওয়ার উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল না।

২. আপনারা আপনাদের দেশবাসীকে শরীয়ত অনুযায়ী হজ্জের আহ্কাম সম্বন্ধে অবহিত করেন না কেন? কেন হজ্জের মৌসুমে আমাদের ও আপনাদের দিনের পর দিন দেন-দরবার করতে হয়?

এরপর বাদশাহ তাঁবুর অভ্যন্তরে খাস কামরায় গিয়ে পরামর্শের পর ফরমান পাঠালেন সবাইকে এবারের মত ছেড়ে দেওয়া হল।

তারপর সবাই নিজ নিজ কাফেলার সাথে মক্কা শরীফ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

জেদ্দা হতে মক্কার মধ্যে রাস্তা তখন ছিল না। সে বৎসর দু'খানা মোটর গাড়ী মরুভূমির মধ্য দিয়ে বালির রেখা পথে যাতায়াত শুরু করেছিল। তাও চল্লিশ মাইলের মধ্যে দু'চার বার বিকল হয়ে যেত। উটের সওয়ারী ছিল সস্তা ও নির্ভরযোগ্য। জেদ্দা হতে মক্কা পৌঁছতে দু'দিন দু'রাত লাগত। আমি উটে চড়ে গিয়েছিলাম। উট চালকের আতিথেয়তার কথা মনে পড়ে। ছয় মাইলের এক মনজিল পার হওয়ার পর খাওয়ার তাকিদ অনুভব করলে

www.pathagar.com

কোঁচড় থেকে একটা ছোট সোরাহী ও ছোট তিন চারখানা রুটি ও তিন চারটা খেজুর বের করে দু'জন যাত্রীকে দু'টি রুটি ও দুটা খেজুর না খাওয়ান পর্যন্ত তার মুখে রুটির টুকরা যেত না। এই আতিথেয়তা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

মক্কা শরীফে ওমরা ও তাওয়াফ করার পর মিনায় মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করি। তিনি মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীসহ একই তাঁবুতে ছিলেন। আমি মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসার জন্যে অনুপ্রেরণা অনুভব করি। মওলানা ভাসানীর নিকট প্রস্তাব করলাম, হজ্জ বিশ্বমানবের সমাবেশ। আল-কুরআনের ভাষায় রাজনৈতিক কারণে অন্যদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও হজ্জ বিশ্বমুসলিমের সমাবেশ ত বটেই। অতঃপর এ সমাবেশে আমাদের জাতীয়. আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর আলোচনা করা হবে না কেন? মওলানা ভাসানী আমাকে মওলানা মাদানীর কাছে নিয়ে গেলেন। মওলানা মাদানী সাহেব ১৯৩৫ সনে জমিয়াতুল ওলামা হিন্দের পক্ষে মওলানা শওকত আলী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মওলানা হযরত মোহানী মুসলিম বিশ্বে খিলাফত সমাজ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সউদী বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের ঘটনা ব্যক্ত করে দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি খিলাফত কায়েম হত তাহলে হজ্জের এই সমাবেশ বিশ্ববাসীর জন্য অশেষ কল্যাণের উৎস হতে পারত। উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সনে জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দের তরফ হতে সউদী বাদশাহ্‌কে ইসলামী দুনিয়ার খলীফা হিসাবে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বায়'আত (আনুগত্য) নেওয়ার ও পরবর্তিতে জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের বায়'আত সংগ্রহের মাধ্যমে খিলাফত কায়েম করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বাদশাহ চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তিন মাস সময় নেন। কিন্ত ঐ সময়ের মধ্যেই (Kingdom of Saudi Arabia) সউদী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা মাদানী সাহেব বললেন, 'সমাবেশ যদি করা যায় খুবই ভাল হবে, তবে বাধা আসার আশংকা প্রচুর। চেষ্টা করতে আপত্তি নাই।' আমি ও সিরিয়াবাসী তরুণ ডাক্তার আবদুল হাফীজ বিভিন্ন তাঁবুতে ঘুরে যোগাযোগ করে, সেদিন বাদ এশা প্রাথমিক বৈঠকের ব্যবস্থা করলাম। বাদ মাগরেব আমাকে ভারত সরকারের এজেন্ট (ভারত সরকারের পক্ষে যে অফিসার হজ্জের তদারকীতে থাকতেন তাকে এজেন্ট (Agent) বলা হত) লাল শাহ বোখারী আই. সি. এস. তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমরা এখানে

www.pathagar.com

রাজনীতি করছ। যদি তোমরা বৈঠক কর তাহলে আজ রাতেই তোমাদেরকে বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হবে। মওলানা ভাসানী, মওলানা মাদানীকে একথা জানালে, তাঁরা বৈঠক বাতিল করার পরামর্শ দেন। বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বৈঠক স্থগিতের খবর জানালাম।

১০ই যিলহজ্জ রাতে বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গকে সৌদী বাদশাহ্‌র তরফ থেকে দাওয়াত করা হয়েছিল, আমিও দাওয়াত পেয়েছিলাম ভারতীয় হাজীদের নেতৃস্থানীয় হিসাবে। যাওয়ার পর ধন্যবাদের পালা। মুরুব্বীগণ আমাকেই ধন্যবাদ দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। আমি ইংরেজীতে প্রয়োজনাতিরিক্ত আতিথেয়তার (প্রতি দু'জনের জন্যে একটি দুম্বার রোস্ট যার বেশীর ভাগই ছিল অভুক্ত ও টেবিল পরিষ্কার করার সময় ফেলে দেওয়া হয়) জন্যে কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং হজ্জের সময় যে লক্ষ লক্ষ দুম্বা-বকরী জবেহ করা হয় তার অতি সামান্য অংশ ব্যবহৃত হয়--বাকী মাটিচাপা দেওয়া হয়। এই মূল্যবান খাদ্য-সামগ্রী টিনজাত করে (হিমায়িত করার পদ্ধতি তখনও উদ্ভাবিত হয়নি) ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে পাঠালে প্রভূত উপকার হয় বলে উল্লেখ করলাম।

১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী দ্বিতীয়বার হজ্জে যান। সেবারও তিনি এ বিষয়ে সউদী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

১৯৫৬ সনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মন্ত্রীত্বকালে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হতে কুরবানীর বাড়তি গোশ্‌ত মুসলমান প্রকৌশলী দ্বারা হিমায়িত করার প্রস্তাব, অত্যন্ত ছোটখাট ব্যাপার বলে সউদী সরকার মনযোগ দেন নি। ১৯৭৬ সনে সউদী আরবের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর হজ্জের সময়ে "রাবেতায়ে আলমে ইসলামী"র তরফ থেকে খুতবা দেওয়ার জন্যে মওলানা ভাসানীকে দাওয়াত দেওয়া হয়। সফর শুরু করার তিনদিন আগে ১৭ই নভেম্বর মওলানা ভাসানী ইন্তেকাল করেন। ২৮শে নভেম্বর, আমি মওলানা ভাসানীর খুত্‌বা ৩০শে ডিসেম্বর রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সম্মেলনে বিতরণ করি। সে সম্মেলনে মওলানার রূহের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করা হয়। ফিলিপাইনের মুসলিম মুক্তি আন্দোলনের নেতা নূর মিসওয়ারী ও প্রফেসর আবদুল বারী

www.pathagar.com

জানান, তাঁরা মওলানা ভাসানীকে ফিলিপাইন সরকারের—মার্কোস সরকারের সাথে একটি মীমাংসায় পৌঁছুতে সাহায্য করার অনুরোধ করতে চেয়েছিলেন। সেবারেও আমি দু' একজন সউদী কর্মকর্তার সাথে কুরবানীর গোশ্‌তের অপচয় সম্পর্কে আলাপ করি। তাঁরা অন্য বড় বড় ব্যাপারে তাঁদের ব্যস্ততার কথা বলেন।

১৯৮৩ সনে হজ্জে গিয়ে দেখি মিনায় এক চতুর্থাংশ কুরবানীর গোশ্‌ত হিমায়িত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের মাত্র অর্ধেক অংশ কার্যকর করা হয়েছে অর্থাৎ শতকরা দশভাগের মত গোশ্‌ত হিমায়িত হবে। ঐ বৎসর প্রথমবারের মত কয়েক টিন হিমায়িত কুরবানীর গোশ্‌ত ভারত ও বাংলাদেশে বিলি করা হয়।

১৯৮৩-তে ছিল এই শতাব্দীর সবচাইতে বড় হজ্জের সমাবেশ। শুক্রবারের হজ্জ ও যাতায়াতের উন্নতির কারণে প্রায় এক কোটির কাছাকাছি হাজীদের এক রিয়াল দামের এক কিলো বরফ দশ রিয়ালে কিন্‌তে হয়। সউদী সরকার দাম বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও কুরবানীর জন্য ছাগল, দুম্বা দ্বিগুণ তিনগুণ দামে কিনতে হয়। ঐ বৎসরের অব্যবহৃত গোশ্‌ত, হাড়, শিং, চামড়া, লোম, খুর, রক্ত ইত্যাদির মূল্য অনেকের মতে এক হাজার কোটি টাকা হবে। যবেহ করা জন্তুর রক্ত হতে সিরাম বা লাল রং, রক্তের অর্ধেক চর্বি থেকে টেলো, সিরাম ও টেলো আহরণের পর যা থাকে, তা দিয়ে অতি উৎকৃষ্ট পশুপক্ষীর খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারে লাগছে হাড়, চামড়া শিং, খুর ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ফয়েজ আহমদ

সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা মওলানা ভাসানী

এদেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তার ব্যর্থতা ও সাফল্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনীতির সার্বিক মূল্যায়ন একান্ত বান্ছনীয়। কিন্তু এ যাবৎ প্রকৃতপক্ষে জনগণনন্দিত এই নেতার কর্মবহুল জীবনধারা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন মূল্যায়ন করা হয় নি। বিভিন্ন বক্তা ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-দাতাগণ কোন কোন সময়ে মওলানা ভাসানী ও তাঁর রাজনীতির খণ্ডিত ব্যাখ্যা প্রদানই শুধু করেছেন। আমরা এই নেতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ, নেতৃত্ব দানের অসাধারণ দক্ষতা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে আজীবন সংগ্রামের কাহিনী যদি পর্যালোচনার পর লিপিবদ্ধ না করি তবে এ দেশের মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে উপেক্ষা করা হবে। এই অসাধারণ দেশপ্রেমিক নেতার কর্মবহুল জীবনের কাহিনী বাঙালীর জীবন-সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাস।

বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পর্যায়ে দ্বি-খণ্ডিত উপমহাদেশের সাম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরে আমরা অনেকেই এই ঐতিহাসিক জননেতার সংস্পর্শে আসি—কেউ সরাসরি রাজনৈতিক কর্মস্রোতে, কেউ সাংবাদিকতা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায়, কেউ বা উভয়বিধ কারণে। কিন্তু এ এক বেদনার কথা যে, আমাদের মধ্যে কেউই এই মহান নেতার সদা কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনধারার ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে রচনার চেষ্টা করেন নি। শুধু এ ক্ষেত্রে নয়, বিপ্লবী বা বুর্জোয়া কোন শ্রেণীর নেতারই রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মময় জীবনের নিরপেক্ষ মূল্যায়নের কথা চিন্তা করা হয় নি। আমাদের দেশ ও জাতির আত্মচেতনা এবং জনগণের মানস গঠনের অগ্রগতির ইতিহাসে এঁদের অবদান মূল্যবান সংযোজনরূপে গণ্য হবে না কেন?

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর জীবনের বহু ঘটনার সাথে আমাদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিকভাবে জড়িত। কিন্তু আটচল্লিশ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রধানত রাজনৈতিক কারণে একাধারে কোন একক ব্যক্তিত্বই তাঁর সাথে ছিলেন না বললেই চলে। আজকের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মী মওলানা ভাসানীর রাজনীতির সাথেও কোন না কোন পর্যায়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠা এবং ২৪ বৎসরব্যাপী পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও জীবিতকাল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে মওলানা ভাসানীর ভূমিকার পটভূমিতে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উক্ত অনেক নেতাকেই তাঁর পাশে দেখা যাবে।

মওলানা ভাসানীর পঞ্চাশ বছরব্যাপী সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে যে দ্বন্দ্ব ও আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধিতা ছিল না তা নয়। কৌশলগত কারণে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর রাজনীতিতে কোন কোন সময়ে অমিল দেখা গেছে এবং এর ফলে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, মওলানা ভাসানী কোনদিনই কমিউনিস্ট ছিলেন না; এমন কি জীবনেও এক পর্যায়ে তাঁকে বিশেষ ধরনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতেও দেখা গেছে। কিন্তু তাঁর সারা জীবনের রাজনীতির সর্ব পর্যায়েই কোন না কোন কমিউনিস্ট গ্রুপের সাথে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন অথবা এ কথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে, বিশেষ বিশেষ রাজনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টগণ তাঁকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছেন (পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের অধিকাংশ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল)। বাংলাদেশে বা তৎপূর্বকালীন এই অঞ্চলের রাজনীতির চড়াই-উৎরাইতে যে জটিলতা ছিল, তাতে প্রগতিশীল বিপ্লবী বা কমিউনিস্টদের সাথে প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক মওলানা ভাসানীর সম্পর্ক থাকাটাই ছিল বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক। এই রাজনৈতিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকেই 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকা এক সময় মওলানা ভাসানীকে 'রেড মওলানা' এবং 'ফায়ার ইটিং মওলানা' নামে উল্লেখ করতেন। যেমন তারা এককালে সেন্টার বেরীর আর্চবিশপকে 'রেড ডীন অব কেন্টারবেরী' বলতেন। মওলানার কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিতে এই নামকরণ ছিল বাঞ্ছিত।

www.pathagar.com

পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রগতিশীল চিন্তার বাহক মওলানা ভাসানীর অসাম্প্রদায়িকতা ছিল রাজনীতির মূল স্তম্ভ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শন ও পদক্ষেপের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা তাঁকে একজন আধুনিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিল। এ দেশের সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক ও জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে মওলানা ভাসানী নিজেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই দরিদ্র জনগণ থেকে আগত একজন মুক্তিদূত। আমাদের দেশে বুর্জোয়া,উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে যে নেতৃত্ব সর্বদা এসেছে এবং আসছে তার ব্যতিক্রম মওলানা ভাসানী। গরীব সাধারণ কৃষকের ঘর থেকে আগত মওলানা ভাসানী সারা জীবনই দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত মানুষের সাথে জীবন যাপন করেছেন বলেই তাঁর পক্ষে দরিদ্র জনসাধারণের সুখ-দুঃখ ও বেদনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

এমন এক অসাধারণ রাজনৈতিক নেতা যাঁর সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন সময়ে আমরা অনেকেই রাজনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছি; তাঁর সাথে বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে আমাদের অনেকের দ্বিমতও ঘটেছে। তবুও এই পূর্ব-পাক্ষিক প্রগতিশীল নেতাকে আমরা আমাদের বর্তমান প্রগতিশীল ও গণ-তান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

তাই এই প্রতিক্রিয়াবিরোধী প্রগতিশীল মানুষটিকে স্মরণ ও তাঁর ইতিহাস বিনির্ণয় করতে গিয়ে আমরা জনগণের সংগ্রামের কাহিনীর উন্মোচন করি এবং তাঁর জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে অনেক খণ্ডিত ঘটনাও ইতি-হাসের মূল্যবান অংশরূপে দেখতে পাই। ১৯৫৪ সালের শেষাংশ ও পঞ্চান্নর শুরু পর্যন্ত তিনি ছিলেন লণ্ডনের অবাঞ্ছিত প্রবাসী; সে সময় পূর্ব বাংলায় মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার স্বৈরাচারী শাসন চলছিল। এককালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৃটিশের প্রমাণিত বিশ্বস্ত এজেন্টরূপে এই ইস্কান্দার মীর্জা স্বাধীনতাকামী উপজাতীয়দের উপর নির্দয় অত্যাচারই শুধু করেন নি, তিনি তাদের জীর্গার নেতাদের উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে অসৎ ও বৃটিশপন্থী করে তুলেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার চুয়ান্ন সালের উনিশে মে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল এবং প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী শেরে

www.pathagar.com

বাংলা ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে গৃহবন্দী করে এই মীর্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন—প্রদেশে জারি করা হয়েছিল নিরানব্বই (ক) ধারা ; কেন্দ্রীয় লীগ শাসনের লৌহপুরুষ বলে প্রচারিত এই শাসক প্রদেশের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং বহু শত রাজনৈতিক কর্মী, নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি, মওলানা ভাসানীকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিলেন। তিনি একবার করাচী থেকে ঢাকা বিমান বন্দরে আগমনের পর সাংবাদিকগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মওলানা ভাসানী দেশে ফিরলে তাঁকে আপনি কিভাবে গ্রহণ করবেন ? গভর্নর মীর্জা সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন ঃ ‘মওলানা এ দেশে ফেরত এলে তাকে গুলী করে হত্যা করার জন্যে আমি আমার শ্রেষ্ঠ হাবিলদারকে বিমান বন্দরে পাঠাবো।’ মীর জাফর আলী খাঁ’র বংশধর বলে দাবিদার সেনাপতি মীর্জার পক্ষেই তখন এমন প্রকাশ্য হত্যার হুমকি প্রদান করা সম্ভব ছিল।

মওলানা সায়েব তখন লণ্ডনের সাউথ কেনজিংটনে উনত্রিশ নম্বর সেন্ট মেরী এ্যবট টেরাসে সিলেটের মান্নান সায়েবের বাড়িতে বাস করতেন। প্রদেশে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর (১৯৫৪) মওলানা সায়েবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল স্টকহল্‌মে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে। স্টকহল্‌ম থেকে তিনি কয়েকজন প্রতিনিধিসহ লণ্ডনে ফিরে নির্বাসিত জীবন যাপন শুরু করতে বাধ্য হন। কারণ গভর্নরের শাসন হাতে নিয়েই জেনারেল মীর্জা যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলেন, সেই তালিকায় প্রথম নামটি ছিল মওলানা ভাসানীর। আমিও শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি দলভুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমি ও আরো কয়েকজন প্রতিনিধি পাসপোর্ট না পাওয়ার ফলে সম্মেলনে যেতে পারিনি। পরবর্তীকালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব যুব সম্মেলনে আত্মগোপনকারী যুবলীগের পক্ষ থেকে আমাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। আমি এক গুপ্তপথে বিনা পাসপোর্টে ডিসেম্বর মাসে ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদান করি। সম্মেলন থেকে লণ্ডনে ফিরে মওলানা সায়েবের সেই বাড়ীতে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়। ইতিমধ্যে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, তৎকালীন প্রাদেশিক শান্তি কমিটি সেক্রেটারী খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও আমার নামে দেশে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে।

সাউথ কেনজিংটনের সেই বাড়ীতে অসহায় রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী-রূপে আমরা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বসবাস শুরু করি। এক সময়

www.pathagar.com

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি ও এককালের 'সংবাদ'-এর রিপোর্টার জনাব তাসাদ্দুক আহমদ একই বাড়ীর বাসিন্দা। মওলানা সায়েবের নেতৃত্বে এই বাড়ীতে আমরা বাস করার সময় বিলম্বে প্রাপ্ত ঢাকার ইত্তেফাক পত্রিকার একটি কপি আমাদের হস্তগত হয়। আমরা সতর্কতার সাথে এই কপিটি মওলানা সাহেবের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটিতেই ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক মওলানা সায়েবকে হত্যার হুমকি-সম্বলিত সংবাদটি ছিল। এই খবর পাঠের পর মওলানা সায়েবের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম, এই সংক্রান্ত বি. বি. সি.র খবরও তাঁকে বলা হয়নি। কিন্তু তিনি স্থানীয় এক সাংবাদিকের (ডঃ তারাপদ বসু, ভারতীয় একটি পত্রিকার) নিকট থেকে ইস্কান্দার মীর্জার হুমকির খবর জানতে পারেন এবং তিনি স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

মওলানা সায়েব আমাদের সবাইকে ডেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তাসাদ্দুক, আমি দেশে ফিরব আমার টিকেটের ব্যবস্থা কর। সিকান্দার মীর্জা (তিনি ইস্কান্দারকে সিকান্দার বলতেন।) আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে, আমি আমার জনগণের কাছে দেশে ফিরতে চাই।'

আমরা ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম। সেই সময়কার শাসনটা এক ধরনের সামরিক শাসনের মতোই ছিল। সবাই মিলে তাঁকে বললাম ঃ পরিস্থিতিটা আমাদের সঠিক জানা নেই। সেক্ষেত্রে আপনার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন বাঞ্ছনীয় হবে কি?

জানুয়ারীর (১৯৫৫) প্রচণ্ড শীত ও বরফে ঢাকা লণ্ডন শহরের উক্ত বাড়ীর একটি কক্ষে ফায়ার প্লেসের সম্মুখে উপবিষ্ট মওলানা পুনরায় দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'যে দেশের মানুষ আমি, সে দেশের জনগণের অধিকারের জন্যে সেই মাতৃভূমিতেই আমি উপস্থিত হতে চাই।'

একজন দেশপ্রেমিক সৎ জননেতার পক্ষে এই উচ্চারণ স্বাভাবিক। আমাদের কোন যুক্তিই তিনি মেনে নিতে চাননি, ক'দিন পরে দেশের পথে তাঁকে প্লেনে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি জানতেন ঢাকায় ফিরছেন।

এদিকে পূর্ববর্তী বছরের ২০ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের আশ্বাসে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁরই এককালের জুনিয়ার সহকর্মী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। পাঞ্জাবের দৌলতানা, প্রাক্তন ঝানু

www.pathagar.com

সিভিল সার্ভিস (একাউন্টস) অফিসার চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও গোলাম মোহাম্মদ জুরিখে অবসর যাপনরত জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ডেকে ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী করার আশ্বাস প্রদানের ফলেই তিনি এই অসম্মানজনক মন্ত্রীত্ব গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। অপর দিকে সংযুক্ত যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ কে. এস. পি.'র নেতা জনাব ফজলুল হককে আশ্বাস দেন যে, তাঁর মনোনীত নেতা আবু হোসেন সরকারকে প্রাদেশিক মুখ্য মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হবে। ফলে যুক্তফ্রন্টের চূড়ান্ত ভাঙ্গন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র ছিল জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দিয়ে সংখ্যা সাম্যের নীতি গ্রহণ করিয়ে নেয়া এবং একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মতাবলম্বী দলগুলোর ঐক্য সাধন করে এক পশ্চিম পাকিস্তান গঠন করা। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্যে যে নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তা ছিল সংখ্যা সাম্যের নীতি অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হরণ। ফলে একজন নেতা তাঁর নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের সংখ্যাভিত্তিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে ঘাতকের ভূমিকা পালন করতে চললেন, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতাকে দিয়েই শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ জনসংখ্যার প্রদেশের ভোট হরণ করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রধান সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সভাপতি মওলানা ভাসানী তখনও বিদেশে। তাঁর মতামত না নিয়ে সে সময় আওয়ামী লীগের পক্ষে গুরুত্ব-পূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন স্বীকার করে নেয়া সম্ভব ছিল না। অথচ সোহ্‌রাওয়ার্দী সায়েব ব্যক্তিগতভাবে এই নীতি মেনে নিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল পূর্ব বাংলার প্রাপ্য পূর্ণ অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার লাভের এটাই ছিল তখন প্রধান পথ এবং কেন্দ্রের সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রকৃত পন্থা।

সে কারণে মওলানা ভাসানীর ঢাকায় উপস্থিতি বিশেষভাবে জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির পর থেকে মওলানা সায়েব নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। লণ্ডন থেকে ঢাকার পথে রওয়ানা হলেও তাঁকে টিকেট দেয়া হয় কোলকাতার। তিনি প্রথমে ভাবতেই পারেন নি যে, কোলকাতায় নামছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে দমদম বিমান বন্দরে অবতরণের পর তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে শহরে নিয়ে

www.pathagar.com

যান। শহরে তাঁকে বালিগঞ্জের একটি বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ভারতীয় রাজনীতির এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কিন্তু মওলানা সাহেব উক্ত বাড়ীতে অবস্থান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বসেন এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহারের জন্যে ডাঃ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি এখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুরম্য স্থানে বাস করতে পারি না।' সাথে সাথে তিনি উক্ত সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

কিন্তু অপর দিকে বিধান সরকারের দায়িত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ অতিথি মওলানা ভাসানীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। মওলানার ইচ্ছে অনুযায়ী প্রকাশ্য পুলিশ প্রহরা উঠিয়ে নেয়া হলো এবং শিয়ালদহ্'র নিকটস্থ অতি সাধারণ 'টাওয়ার হোটেলে' তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। (পাকিস্তান আন্দোলনের কাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এই হোটেলটি পূর্ব বাংলার নেতাকর্মীদের অবস্থানের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি এককালে সবুর সায়েবের প্রিয় হোটেল ছিল।) এখানে মওলানা সায়েবের সাথে খিদিরপুর ডকের পূর্ব বাংলার শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এসে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কোলকাতা অবস্থানের সমস্ত খরচ বহনের প্রতিশ্রুতি দেন। হোটেলের পাশে কোন পুলিশ প্রহরা না দেখে মওলানা সায়েব উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, স্থানীয় সরকার নিজেদের দায়িত্ববোধে সাদা পোশাকে পুলিশ দিয়ে উক্ত হোটেল ঘেরাও করে রেখেছিলেন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও আমি সে সময় উক্ত হোটেলে মওলানা সায়েবের সহচর। এই হোটেলে থেকে আমরা পূর্ব বাংলার রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে পেরেছিলাম। এবং প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন খবর ঢাকা থেকে এসে পৌঁছাত। চুয়ান্ন সালে নির্বাচনের পর থেকে পরাজিত মুসলিম লীগ তাদের মুখপত্র "সংবাদ" পত্রিকাটির প্রতি অবহেলা প্রকাশ শুরু করেন এবং এর প্রচার সংখ্যাও সর্বনিম্নে এসে দাঁড়ায়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার যখন উপক্রম, তখন মুসলিম লীগের হাত থেকে উদ্ধার করে একটি পরিচালনা বোর্ডের অধীনে স্বাধীন নীতি নিয়ে চলার আয়োজন করা হয়, বিভাগ-পূর্বকালের ছাত্রনেতা জনাব আনোয়ার হোসেন ছিলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তখন। একদিন মওলানা সায়েব "সংবাদ"-এর নিউজ এডিটর সৈয়দ নূরুদ্দীনের একটি পত্র পান। উক্ত পত্রে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মওলানা সায়েবের সমর্থন ও বাণী প্রার্থনা করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। ভবিষ্যতে রাজনীতির কথা বিবেচনা করে মওলানা সায়েব সমর্থনসূচক বক্তব্য পাঠাতে চাইলেন ; কিন্তু কি সেই বক্তব্য হবে ? "সংবাদ"-এর নতুন বিশ্বে উত্তরণের পথে কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় ?

একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'একুশ দফার বস্তবায়নের পথ দুরূহ। সেইজন্যেই আজকের রাজনীতিতে আরো বেশী করে একুশ দফা সংক্রান্ত প্রচার আবশ্যক। এবার সংবাদে আমি বাণী পাঠাবো না। তুমি প্রতিটি দফার ব্যাখ্যা লিখে ফেল। সেটাই পাঠাবো। (ভবিষ্যতে 'সংবাদ' কি ভূমিকা পালন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা নিলেন।) তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কলমের অভাবে পেন্সিল দিয়ে একুশটি প্যারায় একুশ দফার ব্যাখ্যা লিখলাম ; তিনি সেটি পাঠ ও সংশোধনের পর 'সংবাদে' পাঠিয়ে দিলেন। ক'দিন পরেই মওলানার আশীর্বাদের কথা উল্লেখ করে সেই ব্যাখ্যা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার হেড লাইনে একুশ দফার ব্যাখ্যা সংবাদে প্রকাশ পেল। একুশ দফার ঘোর বিরোধী পত্রিকাটি রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন করে একুশ দফার প্রকাশ্য সমর্থকে পরিণত হলো। সেই থেকে প্রায় দশ বছর নানা উত্থান পতনের মধ্যে 'সংবাদ' মওলানা সায়েবকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল। সমসাময়িককালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগকে সংখ্যা সাম্য নীতি সমর্থনের জন্যে চাপ দিতে থাকেন। আওয়ামী লীগ এই প্রশ্নে প্রথমে দ্বিধা-বিভক্ত ছিল। এই নীতির সমালোচকগণ বললেন, সংখ্যা সাম্য নীতি গ্রহণ করলে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাভিত্তিক অধিকার অস্বীকার করা হবে এবং সেজন্যে আওয়ামী লীগকেই জনগণের কাছে ভবিষ্যতে দায়ী থাকতে হবে। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানকে পাঠানো হয় কোলকাতায়। প্রথম দিকে শেখ সায়েবও সংখ্যা সাম্য নীতির বিরোধী ছিলেন। মওলানা সায়েবও বোধগম্য কারণে এই নীতি অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর মওলানা সায়েব পরে ঢাকায় আসতে রাজী হন, তবে তখনো তাঁর নামে 'ওয়ারেন্ট' ছিল। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী লাট ভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা আহ্‌বানের ব্যবস্থা করলেন—সংখ্যা সাম্য নীতির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে। এই প্রথম একটি রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ কর্ম পরিষদের সভা লাট ভবনে আহ্‌বান করা হলো, সম্ভবত

www.pathagar.com

সাধারণ কর্মীদের কোন বিক্ষোভ যেন সভার কাজ ব্যাহত না করে, সেজন্যে। মওলানার দেশে আসার সম্মতির কথা জানতে পেরে সোহ্‌রাওয়ার্দী সায়েব তাঁর গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করলেন। মওলানা সায়েব ঢাকায় ফিরলেন। (কেউ তাঁকে হত্যা করতে গেল না। বরং মূল্যবান সেই নেতা সম্বর্ধনা পেলেন।) কিন্তু তিনি আহূত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করে সংখ্যা সাম্য নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। তাঁর দ্বিমতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন পাওয়া গেল না। রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ সংখ্যা সাম্য নীতি গ্রহণ করল এবং মওলানা এই সিদ্ধান্ত তখন মেনে নেন। সেই থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

সেই সময় অধ্যাপক মোজাফফর ও আমি কোলকাতার সেই "টাওয়ার হোটেল"-এ বসে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের আশায় দেশে ফেরার দিন গুণছিলাম।

www.pathagar.com

গোলাম সাক্‌লায়েন

অতৃপ্ত জননায়ক

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর পোশাকী জীবন—এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। দূর থেকে সাধারণ মানুষ মহামানবদের কিভাবে দেখে থাকে? অনেকক্ষেত্রে একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে তাঁর পোশাকী জীবনের তারতম্য আন্দাজ করতে যাওয়া মুস্কিল হয়; তবে তারতম্য যে আছে সেটা নিরূপণ করতে পারেন তাঁরা, যাঁরা ঐ বিশেষ ব্যক্তিটির নিবিড় সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। বাংলায় মুসলমান সমাজে এ-রকমের দু'একজন মহামানবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছিল। যেমন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনি একেবারে মিশে গিয়েছিলেন সাধারণ সাদামাটা লোক-জনের সাথে; আর সেজন্যে তিনি সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছিলেন জনপ্রিয় 'হক সাহেব' এই নামে। বাংলার শহর-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে এমন কি ঢাকা-কলকতা—সর্বত্র 'হক সাহেব' নামে সবাই তাঁকে চিনতো। তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন, বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বা জননায়ক ছিলেন। এক কথায় তিনি কি ছিলেন আর কি ছিলেন না বলা শক্ত।

শেরে বাংলার পিঠে পিঠে আর একজনের নাম সহজেই মনে আসে যিনি সারা জীবনে কখনোই ক্ষমতাসীন হয়ে দায়িত্ব পালন করেন নি অথচ তিনি ছিলেন জননায়ক। আমি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের কথা বলছি। আমরা যদি ভারতের মহাত্মা গান্ধীর নাম উচ্চারণ করি তাহলে তৎক্ষণাৎ এমন একটি মানুষের ছবি আমাদের দু'চোখের সামনে ভেসে উঠবে যিনি ছিলেন এক কথায় গণ-নেতা এবং রাজনীতিবিদ। পোশাক-পরিচ্ছদে এমনই সাধারণ একজন মানুষ তিনি যিনি সুদূর ইংল্যাণ্ডেও ঐ দীনবেশে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সাহেবের একই টেবিলে বসে রাজনীতির কথা বলেছেন। তাঁর মতো পোশাকে অত সাধারণ না হলেও

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী সত্যিকার অর্থে চাল-চলনে, কথাবার্তা—বক্তৃতায় নিতান্ত সাধারণ ছিলেন। তবে তাঁর মন ছিল অনেক বড়। সারা জীবন তিনি মানুষের কথা, মানবতার কথা ভেবেছেন।

ব্যক্তি-ভাসানীর সাথে আমার পরিচয় ছিল। এবং সেই সুবাদে তাঁকে অতি কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের কথা। আমি তখন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লেক্চারার। পাবনা থাকাকালে তাঁর কন্যা-জামাতা পাবনা জজ-কোর্টের এডভোকেট জনাব আবদুস সবুর সাহেবের সাথে আমার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সবুর সাহেবের বাড়ীতে আমি মাঝে-মধ্যে যেতাম। তাঁর শ্বশুর শ্রদ্ধেয় জননেতা মওলানা সাহেব সম্পর্কে খুব কম কথাবার্তা হতো। উনি নিজে ইচ্ছে করে মওলানা সাহেব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না, পাছে আমরা কিছু ভেবে বসি।

তখন সময়টা এমন ছিল যে, ভাল চাকরি-বাকরি সহজে মিলত না। আর জীবনের শুরুতে কোন একটা ভাল কাজে না ঢুকতে পারলে ক্যারিয়ার ভাল হতে পারে না। আমাকে আমার জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিল ঃ দেখুন, আপনার সাথে এডভোকেট সাহেবের আলাপ আছে। তাঁর মাধ্যমে একবার চেষ্টা করে দেখুন না কেন। এই তো সন্তোষ, একবার যেয়ে দেখুন না কেন?

প্রথমদিকে তাঁর কথায় গুরুত্ব আরোপ করি নি। পরে ভেবে সাব্যস্ত করলাম যে, হিতৈষী বন্ধুর কথার মধ্যে বস্তু আছে। অতএব একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? তবে জনাব সবুর সাহেবকে এ বিষয় কিছু বলা সমীচীন মনে করি নি পাছে উনি কিছু ভেবে বসেন। একদিন সত্যি সত্যি মওলানা সাহেবের সন্তোষের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

প্রথমে ট্রেনে, তারপর ট্রেন থেকে নদীপথে যাত্রা—লক্ষ্য সন্তোষ।

দুরু দুরু বক্ষে রওয়ানা হয়েছিলাম। ভাবনাও ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে তাঁর জনসভায়। সেই বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সন্তোষে গিয়ে যথারীতি উপস্থিত হলাম। মওলানা সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন।

সন্তোষের জমিদার বাড়ী। চতুর্দিকে প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘর। কোনো কোনোটা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। এককালে জায়গাটার বেশ শানশ ওকাত ছিল

www.pathagar.com

দেখলেই বোঝা যায়। মওলানা সাহেবের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। উনি আমার থাকার জন্যে স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। জায়গাটা মওলানার বাসগৃহের কাছেই। ৩/৪ মিনিটের পথ। জননায়ক মওলানার বাসগৃহ সাদামাটা গোছের, একজন সাধারণ বাঙালী যেমন কাঁচা টিনের ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত সেটাও ছিল অনেকটা সে ধরনের বাড়ী। মওলানার বাসার কিছু দূরে বাগান, বাগানে নানা জাতীয় গাছ ও তরি-তরকারীর চারা লাগানো হয়েছে। সকাল বেলা নামায-কালাম পড়ে তিনি তস্‌বি হাতে বাগান পরিদর্শন করতেন।

আমি যেদিন সন্তোষে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তার পরদিন সকালে তিনি ঐ বাগানের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন স্বভাবতই তিনি শান্ত ও সমাহিত। আল্লাহ্‌র যেকের আযকার করার সময়। আমি সুযোগ বুঝে তাঁর সঙ্গী হলাম। দু'চারটি কথা হলো। কি কি কথা হয়েছিল সেসব আজ পুরোপুরি স্মরণে আনতে পারছি না। তাঁর একটা কথা আজো আমার কানে বাজে। উনি বললেন ঃ

"প্রফেসর সাহেব, সন্তোষ রাজা-মহারাজার জায়গা। জায়গাটা ভালো। যে অংশটা আমি নিয়েছি সেটা কাজের জন্যে ব্যবহার করা হবে। এবং কাজটা আমার ব্যক্তিগত কাজ নয়—জনসাধারণের জন্যে। এখানে একটা ইসলামিক ইউনিভারসিটি তৈরি করা আমার সাধনা ; জানি না কদ্দূর করতে পারবো।"

লক্ষ্য করলাম যে, কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তিনি হাতের একখানি বেত দিয়ে দু' একটি চারা গাছ পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

মওলানা সাহেব তখন সকাল বেলা খোলা বাতাসে ভ্রমণ করতেন। আমি দুই দিন সন্তোষে অবস্থান করেছিলাম। এর মধ্যে একদিন মওকা পেয়ে আমি আমার কথা তাঁর কাছে নিবেদন করি। শুনেছিলাম যে, উনি অনেকেরই অনেক উপকার করেছেন ; তবে মানুষের ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির উপকারের দিকেই তাঁর লক্ষ্য বেশি।

মওলানা আমার সন্তোষ আগমনের হেতু শুনে প্রথমদিকে খুব বেশি উৎসাহ দেখালেন না। তাঁর এই নিস্পৃহতায় আমি দমে গেলাম। ভাবলাম, এতদূর এলাম! এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। পরম শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী আজীবন পরহিত ব্রতে উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর মজলুম জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধ ছিল অতুলনীয়। তাঁর চোখে ছিল সুদূরের স্বপ্ন। বাঙালীর মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল তাঁর আজীবনের আকাঙ্ক্ষা। কাজেই তাঁর কোন কাজকেই খাটো করে দেখার উপায় ছিল না। আর আমার ব্যক্তিগত কাজটি নিয়ে তিনি চেষ্টা-তদ্বির করবেন কিনা সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার কিছু ছিল না আমার। যদি না-ই করেন তাহলে আমারই বা করার কি আছে?

যাই হোক উনি আমাকে বলেছিলেন কাজটা করে দেবেন। আমি নির্দ্বিধায় ফিরে গিয়েছিলাম পাবনায়। অতঃপর মওলানা সাহেব দেশের রাজনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তাঁকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। সংবাদপত্রে দেখেছিলাম সে সংবাদ। মওলানা ভাসানীর সন্তোষের বাড়ী-ঘর, জমিজমা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার খবর ভালভাবে জানলাম সন্তোষে গিয়ে; তার আগে এসব ব্যাপারে ভালো করে শোনার ও জানার কোন সুযোগ আমার ছিল না যদিও জনাব আবদুস সবুর আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। কয়েক বছর পর আমি পাবনা ছেড়ে চলে যাই; তবে এডভোকেট সাহেব আজো পাবনায় বাস করছেন।

সন্তোষে যে দু'দিন ছিলাম লক্ষ্য করেছিলাম যে, মওলানা সাহেবের মতা-মত ও উপদেশাদি শোনার ও নেবার জন্যে অনেক নেতা, উপনেতা ও পাতি-নেতার সমাবেশ হতো। তবে বেশিক্ষণ কেউ তাঁকে বিরক্ত করতো না।

সন্তোষে যে অতিথিশালায় আমি ছিলাম তার কোল ঘেঁষে ছিল একটি সুবিস্তৃত জলাশয়, চারধার ঘিরে নানান জাতের লতাগুল্মের ছড়াছড়ি। আর সে সবের নানা রকমের রঙ পরিবেশকে মনোরম করে তুলেছিল।

একদিন খেয়াল করলাম, মওলানা সাহেব জলাশয়টির চারধার ঘুরে ঘুরে দেখছেন। গায়ে কোর্তা জাতীয় লম্বা জামা, পরনে লুঙ্গি, মাথায় তালের টুপি, হাতে একটুকরা বেতের ছড়ি। আমি বাইরে বের হয়ে তাঁর দিকে যেইমাত্র তাকিয়েছি অমনি তিনি বলে উঠলেন, "এই যে প্রফেসর সাহেব, কেমন লাগছে জায়গাটা? আমার মতে আইডিয়াল; এখানে দেশের ছেলেরা আসবে, পড়াশোনা করবে। এবং এর মধ্যে আমি বেঁচে থাকবো। আমি মেহনতি মানুষের জন্যে করি রাজনীতি, তাদের আর্থ-

www.pathagar.com

সামাজিক বনেদ তৈরী করে না দিতে পারলে গোটা দেশ তথা জাতিই তো পঙ্গু হয়ে পড়বে !" আমি নীরবে তাঁর কথা শুনে যাই।

এক পা এক পা করে কিছুদূর এগিয়ে যাই। তাঁর সহকারী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, তাঁকে এখনই গোসল করতে হবে। গোসলের সময় হয়ে গেছে।

আমি আমার 'ইন্'-য়ে ফিরে আসি।

পরে বাংলার মজলুম নেতা, জনদরদী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনধারা ও কর্ম-পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করেছি। তিনি ছিলেন আসলেই এক অতৃপ্ত জননায়ক। অতৃপ্ত এ কারণে যে, সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনায় সব সময় তিনি এতো বেশি চিন্তাক্লিষ্ট থাকতেন যে, সেখানে একজন পরিতৃপ্ত সমাজসেবী হিসেবে তাঁকে আমি বিবেচনা করতে পারি নি।

দেশ যখন স্বৈরাচার সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো তখন পরিতৃপ্ত জননায়ক না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কাজেই যুগ-পুরুষ, জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা ভাসানী যে একজন অতৃপ্ত রাজনীতিবিদ হবেন সেটাই আমার মনে হয়েছিল।

যথাসময়ে আমি সন্তোষ ছেড়ে চলে আসি। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়ে ফিরি তা আমার জীবনের মূল্যবান সঞ্চয়।

www.pathagar.com

আবদুস্ সাত্তার

মওলানা ভাসানী ও আমি

আমরা তখন ছোট। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নাম শুধু আমাদের টাঙ্গাইলের ঘরে ঘরে প্রচারিত নয়—সুদূর আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন কিছু কিছু জনশ্রুতি আমাদের কিশোর মন নাড়া দিয়েছিল। গ্রাম অঞ্চলে প্রবাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কচুর পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মওলানা ভাসানীর ছবি দেখা যায় এবং এই ছবি যার নজরে পড়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভ লক্ষণ। আরও গুজব রটেছিল যে, পবিত্র কুরআনের পাতার আড়ালে মওলানা ভাসানীর দাড়ি লুক্কায়িত আছে। পবিত্র কুরআন পড়তে পড়তে যে এই দাড়ির সন্ধান পাবে তার জন্যও রয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল। এই আজগুবি এবং সংস্কারের পেছনে আর যা-ই থাক, গ্রামবাসী লাভবান হয়েছিল কুচুর আবাদ করে। কারণ কচু তখন ছিল ভীষণ অর্থকরী ফসল; দুর্ভিক্ষের মধ্যে কচু-ঘেচু খেয়ে গ্রাম্য জনসাধারণ প্রাণ বাঁচাতো। উল্লেখ্য, তখন ১৯৫০-এর দুর্ভিক্ষের পাঁয়তারা চলছে। দ্বিতীয়ত মওলানা সাহেবের দাড়ির সন্ধানে অনেকেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মেতে থাকতেন। দাড়ি পাওয়া যদি বা না যায় পবিত্র কুরআন পাঠ করা যে মহাপুণ্যের কাজ এতে তো কোন সন্দেহ নেই!

গুজব-সংস্কার যা-ই বলি না কেন—এসব যাঁদের কেন্দ্র করে বিস্তৃতি লাভ করে নিশ্চয়ই অলৌকিক গুণের অধিকারী না হলে এমনটা কারও সম্পর্কে শোনা যায় না। মওলানা ভাসানী সত্য-সাধনায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তখন তাঁর সম্পর্কে গ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণ সংস্কারবদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে তাঁকে এসব জনশ্রুতির নায়ক করে তুলেছিল। আর তিনি তো ছিলেন নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণেরই সবচেয়ে আপন, কাছের মানুষ!

মওলানা সাহেবকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪৬ সালে এবং কাগমারীর এক সম্মেলনে। সম্মেলনটা ছিল অনেকটা 'উরুস' ধরনের। দেশের বিভিন্ন

www.pathagar.com

জেলা থেকে লোকের সমাগম হলো। লোকে লোকারণ্য। তখন আমাদের গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল এক সমিতি ঃ 'দি গোলরা ইয়ংগ মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন'। বৃটিশ আমল তো, কাজেই সমিতির নামটা ইংরেজীতেই ছিল। আমাদের গ্রাম থেকে 'দি গোলরা ইয়ংগ মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন'-এর ব্যাজ পরে শ'খানেক ছাত্র-যুবক গিয়েছিলাম সেই 'উরসে' স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে।

মওলানা সাহেবকে দেখেছি লুঙ্গি পরে মাথায় বেতের টুপী দিয়ে সব ঘুরে-ফিরে দেখছেন। লোকদের জন্য খাওয়ার আয়োজন ছিল খিচুড়ীর। খিচুড়ীর রান্নার আগে মওলানা সাহেব জানতে পারলেন যে, কাঁচা-মরিচের ব্যবস্থা নেই। কাঁচা-মরিচ না দিলে খিচুড়ী মজা হবে কি করে? শুকনো মরিচ হলে তো বেটে নেওয়া বা গুঁড়ো করার প্রশ্ন আছে। যেই মাত্র মওলানা সাহেব উচ্চারণ করেছেন, 'কাঁচা-মরিচের ব্যবস্থা কি?' তেলেসমাতি কার-বার! কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল কাঁচা-মরিচ ভর্তি এক নৌকা কাগমারী সংলগ্ন নদীর ধারে এসে ভিড়েছে। আর অমনি ভক্তের দল হাতের অঁাজলা, লুঙ্গির 'টোনা' ইত্যাদি উপায়ে কাঁচা-মরিচ নিয়ে আসছে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মরিচের স্তূপ খড়ের পালার মতো উঁচু হয়ে গেল। আমরা তো অবাক! এমন অবস্থায় কেউ যদি বলেন যে, মওলানা সাহেবের তাবেদার ছিল কিছু জ্বিন, তাতে কি অন্যায় কিছু হবে? নাকি অবিশ্বাস করার মতো কিছু আছে? অবশ্যি লোকের ধারণা ছিল মওলানা সাহেব জ্বিন পালেন।

আসলে ওটা জ্বিনের ব্যাপার নয়। মওলানা সাহেব ছিলেন সব মানুষের বন্ধু। বন্ধুরা কি বন্ধুর সাহায্যে এগিয়ে না এসে পারে? উরসের সময় কি কি জিনিসের প্রয়োজন এতো সকলেরই জানা। সব জিনিস আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। মরিচ আসলো একটু পরে। আর সব আয়োজন ভক্তদের।

তাই বলে কিন্তু মওলানা সাহেব পীর ব্যবসায় করতেন না। গরীব-দুস্থদের জন্য তাঁর ছিল নাড়ির টান। কাজেই ভক্তের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। গরীব-দুঃস্থদের জন্য, দেশের জন্য তিনি জেল-জুলুম কি কম খেটেছেন? অথচ তিনি তাঁর নীতি থেকে একটুও দমেন নি।

কাগমারীর সম্মেলনে আমাদের কাজে তিনি ভীষণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমাদের দলের নেতা সৈয়দ নূরুল ইসলাম ওরফে মন্টু মিঞা সেদিন

www.pathagar.com

মওলানা সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মওলানা সাহেবের পূর্ব-পরিচিত। মওলানা সাহেব সেদিন আমাদের বলেছিলেন, 'সমাজ গঠনে তোমাদের মতো ইয়ংদের দরকার আছে।'

আগেই বলেছি, আমাদের গ্রামের সমিতির নাম ছিল 'দি গোলরা ইয়ংগ মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন'। সেই থেকে তিনি আমাকে 'ইয়ংগ মুসলিম' বলে ডাকতেন।

১৯৪৭ সাল। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আমরা তখন কলেজে পড়ি —-করটিয়া সাদত কলেজে। কিছুদিন জায়গীরে ছিলাম। করটিয়ার পাশেই খাগজানা গ্রামে। একদিন আমার লজিং মাস্টার মুন্‌শী নাসির উদ্দিন বললেন, 'সাত্তার মিঞা, আজ বিকেলে পাশের গ্রাম কৈজুরীর জমিদার বাড়িতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসবেন। চলো দেখে আসি।'

তখন কৈজুরীর জমিদার গোপেশ্বর সাহা রায় চৌধুরীর খুব নাম-ডাক। অবশ্যি ভালো মানুষ, প্রজাবৎসল এবং সমাজকর্মী হিসেবে। তাঁর বাড়ীতেই মওলানা সাহেব আসবেন।

আমি মুন্‌শী সাহেবের সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখি জমিদার বাবুর সৌখিন দালানের নীচের তলায় মওলানা সাহেব আলাপ করছেন এবং তাঁকে ঘিরে আছেন স্থানীয় নামকরা ব্যক্তিবর্গ। এমন কি টাঙ্গাইলের গণ্যমান্য উকিল-মোক্তার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সেখানে উপস্থিত।

মুন্‌শী সাহেব মওলানা সাহেবকে আগে থেকেই চিনতেন এবং তিনিও এলাকার অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই বৈঠকে তাঁরও আমন্ত্রণ ছিল। তিনি সরাসরি ভিতরে চলে গেলেন।

আমি মুরুব্বীদের সামনে কি করে যাই বলে ইতস্ততঃ করছিলাম। এমন সময় মুন্‌শী সাহেব আমাকে ইশারায় ডাকলেন। আমি ঢুকতে সাহস পেতাম না যদি আমার মতো তরুণ দু'একজন না থাকতো।

মওলানা সাহেবের ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি। আমি সালাম জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি গোলরার সেই ইয়ংগ মুসলিম না?'

আমি 'জ্বী' বলে মাথা নীচু করলাম।

www.pathagar.com

সেদিন কৈজুরী জমিদার বাড়ীতে কোনো ধর্মসভা ছিল না এবং ছিল না কোনো রাজনৈতিক সভা। গরীব-দুঃখীর সাহায্যে এবং একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি এসেছিলেন জমিদার বাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। আসলে গোপেশ্বর বাবুও ছিলেন খ্যাতিমান সমাজকর্মী।

মাগরিবের নামাযের সময় হলো। মওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, 'নামাযটা সেরে আসি। তারপর আবার কিছুক্ষণের জন্য বসবো। আলোচনা শেষ হয় নি।'

গোপেশ্বর বাবু হেসে বললেন, 'হিন্দু বাড়ীতে নামায হবে মওলানা সাহেব ?'

মওলানা সাহেবও হেসে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ যদি সর্বত্রই বর্তমান, তবে কি তিনি হিন্দু বাড়ীতে নেই?'

গোপেশ্বর বাবু থ' বনে গেলেন। তিনি শুধু উচ্চারণ করলেন, 'হুজুর, আপনার মতো উদার মনোভাব যদি সবার থাকতো তবে কি কেউ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলতো!'

পরবর্তীকালে মওলানা সাহেবকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে এবং এই সুযোগের সময়সীমা ছিল ১৯৪৬ সাল থেকে পি. জি. হাসপাতালে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত। কিছুদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও ছিলাম। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত 'হক কথা' এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক'-এ মাঝে মধ্যে কবিতা লেখা ছাড়াও লোভনীয় ব্যাপার ছিল মওলানা সাহেবের উপদেশ গ্রহণ। তাঁর বক্তব্য ছিলঃ 'আদর্শপ্রণোদিত না হলে সে রচনা কোনোদিন টিকবে না এবং সে আদর্শের মধ্যে থাকা চাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ সমর্থিত মানবতাবাদ। গোঁড়ামীর সংকীর্ণতা যেন কাউকে স্পর্শ না করে।'

মওলানা ভাসানীর মতো নিরহঙ্কার, সৎ, আত্মসচেতন, নির্লোভ, স্পষ্টবাদী এবং জনদরদী মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রশ্রয় তিনি কখনো দেন নি। আসলেই তিনি ছিলেন গরীবের বন্ধু এবং এজন্যই তিনি চর এলাকার গরীব বাসিন্দাঘেরা কাগমারীতে আস্তানা পেতেছিলেন—সুরম্য প্রাসাদময় শহর থেকে দূরে। সেখানে বসে তিনি গরীব-দুঃখীর মুখে হাসির তৃপ্তি দেখতে ব্যস্ত ছিলেন।

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হুজুর, আপনার ওই বেতের টুপীর মাজেজা কি ?'

www.pathagar.com

তিনি শেখ সাদীর 'জরবে ওস্তাদ জেহ্‌রে মেহ্‌রে পেদার', পিতার স্নেহের চেয়ে ওস্তাদের মা'র ঢের ভালো---এই বয়াতটি উচ্চারণ করে বললেন, 'শিক্ষক ছাত্রদের শায়েস্তা করেন বেত মেরে। সমাজকেও শায়েস্তা করার জন্য বেতের প্রয়োজন।'

আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন সমাজের শিক্ষক।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনের বহু ঘটনা এবং নসিহত স্মরণে এলে এখনও অভিভূত হই। সময়টা খুব সম্ভব ১৯৭৩। তখনকার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের নির্দেশে হুজুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জনৈক অধ্যাপক ডাক্তার পাঠানো হয়েছিল কাগমারীতে। আমরা তাঁর কয়েকজন ভক্ত তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম এবং তাঁর মুখ নিঃসৃত নসিহত গলাধঃকরণ করছিলাম। এমন সময় ডাক্তার সাহেবের উপস্থিতি আমাদের নসিহত শোনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। তবে সেই নসিহতের জের বর্তালো গিয়ে ডাক্তার সাহেবের উপর এবং তখন আমাদের কান খাড়া করলাম সেদিকে।

মওলানা সাহেব অনেকটা রেগে-মেগে বলা শুরু করলেন, 'আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষার আগে আমার 'বাগুন টালের' স্বাস্থ্যের কথাই বলছি। সবগুলো বেগুনে পোকা ধরেছে। পোকা নিধন করার জন্য কর্তৃপক্ষ সমীপে খবর পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা বস্তা বস্তা ওষুধ পাঠিয়েছেন। কিন্তু অষুধগুলো স্প্রে করার কোনো যন্ত্র পাঠান নি। যন্ত্র নাকি বিদেশ থেকে এসে পৌঁছুলে তবে পাঠাবেন। ততদিনে আমার 'বাগুন টালের' একটা বেগুনও অক্ষত থাকবে না। আমি কি পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে পারি? সমস্ত চর অঞ্চলে খবর পাঠালাম, চরের বাসিন্দারা যেন বাসি হুকোর পানি ফেলে না দিয়ে আমার জন্য পাঠায়। পরের দিন সকালে বালতি বালতি বাসি হুকোর পানি এলো। সেই পানি 'বাগুন টালে' ছিটিয়ে দেওয়ায় পোকা খতম এবং সব বেগুন প্রাণ পেয়ে সতেজ তরতাজা হয়ে উঠেছে।'

এতোসব বলেই মওলানা সাহেব একটু দম নিলেন এবং সব কিছুতেই পরনির্ভরশীলতার প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপন করে আবার নসিহত শুরু করলেন। আমরা থ' হয়ে শুনছিলাম আর অনুধাবন করছিলাম।

এবার তিনি ডাক্তার সাহেবকে বিদেশী ওষুধের উপর নির্ভর না করে ওষুধ আবিষ্কার এবং স্বদেশী গাছ-গাছড়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে

www.pathagar.com

অনুরোধ জানালেন। কারণ প্রত্যেকটি রোগের ওষুধ রয়েছে আমাদের দেশজ গাছ-গাছড়ার মধ্যে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যখন আবিষ্কৃত হয় নি তখন আমাদের দেশের লোক কিসের উপর নির্ভর করতো?

তদুপরি রয়েছে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার-হেকিম ইবনে সীনা, আজমল খান প্রমুখ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ভেষজ চিকিৎসার পাশাপাশি চালাতেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। তাঁরা কেবল ডাক্তার-হেকিম মাত্র ছিলেন না—ছিলেন এক একজন অলিয়ে কামেল। জটিল রোগী নিয়ে তাঁরা মোরাকাবা—মোশাহেদা করতেন এবং মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্দেশ পেতেন রোগের নিরাময় সম্পর্কে। মৃত্যু যেখানে অবধারিত সে ব্যাপার আলাদা। কারণ আরবীতে একটা কথা আছে ঃ 'লে কুল্লে দায়েন ছাওয়া ইল্লাল মাউত'—প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিখ্যাত হেকিম আজমল খান একবার বাংলাদেশে বেড়াতে এসে মেহমান হয়েছিলেন গ্রাম-বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। গ্রামে সাধা-রণত প্রস্রাবখানা-পায়খানা বাড়ী থেকে সামান্য দূরে তৈরী করা হয়। হেকিম সাহেব সকাল বেলা প্রকৃতির ডাকে বাইরে যাবেন। হাতে তাঁর পানিভর্তি বদনা। তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে দুর্বাঘাস, বিচিত্র গাছ-গাছড়া ইত্যাদি দেখে দেখে বেমালুম ভুলে গেলেন তাঁর প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনের কথা। তিনি চলছেন তো চলছেনই। কয়েক মাইল এভাবে যাওয়ার পর তাঁর হাত ভারি বোধ হতে থাকলো। তখন খেয়াল হলো, আরে তাইতো! তিনি তো বের হয়েছেন প্রকৃতির ডাকে প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদন করতে। হাতে তাঁর পানিভর্তি বদনা!

হেকিম আজমল খানের মন্তব্য ছিল ঃ 'হ্যাঁ, এদেশ সোনার বাংলাই বটে! ওষুধের সোনা ছড়িয়ে আছে এদেশের মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, সর্বত্র। এগুলোর সদ্ব্যবহার যদি হতো তবে এদেশে ওষুধের অভাব বলে কিছু থাকতো না—পরমুখাপেক্ষীও হতে হতো না।' মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ইচ্ছাও ছিল তাই।

হ্যাঁ, বলছিলাম আধ্যাত্মিক চিকিৎসার কথা। মওলানা ভাসানী ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম হোতা এবং এ কারণে আধ্যাত্মিক চিকিৎসায়ও তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর তাবিজকবজ, পানি-পড়া,

www.pathagar.com

তেল-পড়া ব্যবহার করে যে গ্রামের আপামর জনসাধারণ কত উপকৃত হয়েছে তার বহু নজির রয়েছে। একবার পানি-পড়া দিতে দিতে যে কুয়োর পানি শুকিয়ে গিয়েছিল এ কথা প্রবাদের মতো ছড়িয়ে আছে টাঙ্গাইলের ঘরে ঘরে।

সাধনার বলে যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা তথা আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু হওয়া যায় তবে কি মহান আল্লাহ্‌ তার কথা না শুনে পারেন? সে ক্ষেত্রে সেই প্রিয় বান্দা বা বন্ধু যা করেন মহান আল্লাহ্‌র তাতে সায় থাকে এবং সেই কাজে সফলতা অনিবার্য।

শুধু কি গ্রাম্য জনসাধারণ তাঁর আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় তেলেসমাতির মতো ফল পেয়েছে? গ্রাম্য জনসাধারণের ডাকে তিনি ছুটে গিয়েছেন তাদের পাশে। সুদূর আসাম থেকে নৌকাভর্তি করে ধান-চাউল এনে তিনি বিতরণ করেছেন গরীব-দুঃখীদের মধ্যে, বিশেষ করে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের সময়। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের সময় দেখেছি টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে মওলানা ভাসানী পরিচালিত লঙ্গরখানা। তিনি নিজে অনেক সময় তদারক করতেন সেই সব লঙ্গরখানা।

আরও মজার ব্যাপার ছিল। আসাম থেকে যখন নৌকা-ভর্তি করে ধান-চাউল আনতেন গরীবদের মধ্যে বিলি করার জন্য তখন কিন্তু নদী-পথে মওলানা ভাসানীর নৌকায় কোনোদিন ডাকাতি হতো না। ডাকাতরাও মওলানা সাহেবের নাম শুনলে শ্রদ্ধায় আনত হতো। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের চর অঞ্চলের উপমহাদেশ-খ্যাত ডাকাত কছিম উদ্দিন দেওয়ান ওরফে কইছা ডাকাতের নাম অনেকেরই জানা। বৃটিশ-ভারতে এই কছিম উদ্দিন বিস্তৃত চর এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় আড়াই মাস বৃটিশের সঙ্গে লড়ে তার এলাকা স্বাধীন রাখতে পেরেছিল। জানা যায়, সে এই সময়ে নিজস্ব মুদ্রাও চালু করেছিল। তবে তার ডাকাতির ধর্ম ছিল কোনো গরীবের মাল ডাকাতি না করা। এবং তার ডাকাতির সীমানা ছিল টাঙ্গাইল থেকে সুদূর আসাম পর্যন্ত। দুর্ধর্ষ কইছা ডাকাতও মওলানা ভাসানীর নাম শুনলে মুহূর্তের জন্য হলেও ডাকাতিবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ভালো মানুষ হয়ে যেতো। শিষ্যদের প্রতি কইছা ডাকাতের নির্দেশ ছিল, মওলানা ভাসানীর নৌকা যেন কেউ স্পর্শ না করে এবং ভালোভাবে যাতে সেই নৌকা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সে ব্যাপারে যেন তারা সাহায্য করে। এবং তারা করেছেও তাই।

www.pathagar.com

সৎগুণ দিয়ে যে ডাকাতও বশ করা যায় এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আসল মানুষ হতে পারলে ডাকাত তো দূরের কথা বনের হিংস্র জন্তুরাও তাকে সমীহ করে চলে। এমন নজির বহু আছে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কেবল রাজনীতিবিদ তথা মজলুম নেতা, সমাজসেবী, ধর্মপ্রচারক এবং গরীবের বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম হোতা—এ কথা আগেও বলেছি। তবে তাঁর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অবিমিশ্রভাবে জড়িত ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। ফলে তিনি এমন আলোকপিণ্ডে পরিণত হয়েছিলেন যে, সেই আলোকপিণ্ডের দিকে ধাবমান ছিল অগণিত মানব-পতঙ্গ, এমন কি তাঁর অন্তর্ধানের পরেও এই ধাবমান রীতি অব্যাহত রয়েছে তাঁর মাযার যিয়ারতে।

www.pathagar.com

গাজীউল হক

একটি আশ্রয়

দু'পাশে দুটো লাইন। নির্বাক মানুষগুলো । তার মাঝে আমিও একজন। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি সবাই। বিপন্ন, বিচলিত কারো মুখে কথা নেই। শেষ দেখা দেখে নেবো । শ্রদ্ধার শেষ অর্ঘ্যটুকু দিয়ে যাবো।

মনের পর্দায় ভেসে উঠছে অনেকগুলো বছর, অনেকগুলো দিন। একটি, একক নিঃসঙ্গ মানুষ। অথচ কী প্রচণ্ড শক্তিধর! পাঁচবিবি, সন্তোষের কুঁড়ে ঘরে বসে যিনি আড়াই যুগ ধরে পাকিস্তান, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছেন, আলোড়ন তুলেছেন, রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। মওলানা ভাসানী একটি নাম, কী প্রচণ্ড শক্তির উৎস!

এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই টি. এস. সি.'র দিকে। ১৮ই নভেম্বরে সূর্য উঠছে, কিন্তু বাংলার সূর্য অস্তাচলে। তাঁর মরদেহ বিচ্ছুরিত শেষ প্রভার কণিকাটুকুর স্পর্শের জন্যে সবাই ছুটছে টি. এস. সি.'র দিকে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিরাট লাইন দুটো—লাইন দুটোর যেন শেষ নেই।

পিঠে কার হাতের স্পর্শ? পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বন্ধু বাকার, তার পাশে কামরুল ভাই। চির হাস্যোজ্জ্বল 'বাকার' বিষণ্ণ।

আপনি? জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ, আমিও না এসে থাকতে পারলাম না। বেদনার্ত দুটো চোখ তুলে তাকালেন বাকার। এই একটি লোক, চিরদিন যাঁর সমালোচনা করেছি, কখনো গাল দিয়েছি, আবার ভালোও বেসেছি। কিন্তু তাঁর প্রতি ভালোবাসা যে কত গভীর ছিল তা জানতে পেরেছি গত রাত থেকে সংবাদটি জানার পর। বাকারের কথায় বাধা দিলাম না। চুপ করে শুনে যেতে লাগলাম। তাঁর কণ্ঠে আবেগ ঝরে পড়ছে।

'বুঝেছেন, গাজী সাহেব। আমি এককালে মুসলিম লীগ করেছি। মনেপ্রাণে মুসলিম লীগের লোক। মওলানা সাহেব মুসলিম লীগকে আঘাত

www.pathagar.com

করেছেন। সে আঘাতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা মুসলিম লীগের লোকেরা যখনি কোন বিপদে পড়েছি, যখনি কোন অন্যায় অবিচারের শিকার হয়েছি, তখনি দেখেছি মওলানা এসে আগলিয়ে দাঁড়িয়েছেন আমাদের। একটি নির্ভরশীল আশ্রয়।'

আমরাও এ আশ্রয় হারিয়েছি—মৃদু স্বরে বললাম।

'জানেন গাজী সাহেব' বাকার বলতে লাগলেন, "৭২ সালের সেই দুর্যোগময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মুসলিম লীগে ছিলাম একদিন। এটুকুই মাত্র অপরাধ। কারা যন্ত্রণা, মৃত্যু-যন্ত্রণায় আতঙ্ক সব সময়ে। আমরা সবাই দিশেহারা। কিন্তু কাউকে বলতে হলো না, অনুরোধ করতে হলো না, মওলানা ভাসানী এসে দাঁড়ালেন সামনে। নিজের পিঠ বাড়িয়ে দিলেন, আমাদের সব আঘাত থেকে রক্ষার জন্যে। তাঁরই জন্যে সেদিন আমাদের অসংখ্য লোক মিথ্যে নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো, একথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।' বাকারের গলার স্বর বুজে এসেছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি তাঁর দুটো চোখ ছলছল করছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে টি. এস. সি'র গেইট পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বাকারের কথাগুলো কানে বাজছে। মনে পড়ছে সেদিনের কথা।

১৯৭২ সালের ২রা এপ্রিল। সেদিনও ছুটেছিলাম উর্ধ্বশ্বাসে। চারটায় সভা শুরু হবে। অন্তত এক ঘন্টা আগে না পৌঁছুতে পারলে মঞ্চের কাছা-কাছি জায়গা পাবো না। সময়মতই পল্টনে পৌঁছেছিলাম। জনতার মাঝখান দিয়ে পথ করে মঞ্চের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। মওলানা ভাসানী তখনো এসে পৌঁছেন নি। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। সভার উদ্যোক্তারা বার বার ঘড়ির কাঁটার দিকে দেখছেন আর আকাশের দিক তাকাচ্ছেন। আকাশে ঘনকালো মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ শিখা আকাশের বুকখানি চিরে ফালি ফালি করে দিচ্ছে। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঝড় আসতে পারে, দুরন্ত বোশেখী ঝড়।

কে একজন বললো, মওলানা সাহেব এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। কয়েকদিন আগে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। হতাশ হয়ে পড়ে-ছিলাম। তিনি কি আসতে পারবেন আদৌ? হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আকাশ

www.pathagar.com

গর্জে উঠলো। কোথাও বোধ হয় বাজ পড়লো! সভার লোক উঠে দাঁড়ালো। অযুত অযুত লোক। নিরাশ হলাম। কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে। হঠাৎ যেনো কী এক যাদুর খেলা হয়ে গেলো! যারা উঠে দাঁড়িয়েছিলো তারা সবাই ঝুপ করে বসে পড়লো। ঐতিহাসিক পল্টনের জনসমুদ্র গর্জে উঠলো, 'মওলানা ভাসানী-জিন্দাবাদ', বাংলাদেশের নয়নমনি মওলানা ভাসানী।'

মওলানা এসে পড়েছেন। পল্টনের জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে মওলানা আসছেন। মাথায় তালের টুপি, সাদা লুঙ্গি, সাদা পায়জামা, আজন্ম বিদ্রোহী নিঃসঙ্গ হৃদয় মওলানা ভাসানী। মওলানা মঞ্চে উঠে সরাসরি এসে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে, রোগপাণ্ডুর মুখ।

তখন ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টির ছাট গায়ে এসে লাগছে। বাতাসে মওলানা ভাসানীর পাঞ্জাবীর প্রান্ত উড়ছে। মাইকে মওলানার কণ্ঠস্বর ঃ

"বহু রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা এসেছে! কোন ব্যক্তিবিশেষ, কোন বিশেষ দল দেশ স্বাধীন করে নি! এই দেশের কামার, কুমার, শ্রমিক, চাষী, জেলে, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুবক বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাকে স্বাধীন করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতাকে কোন বিশেষ দল কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত করা যাবে না!" একটু দম নিলেন। "হুঁশিয়ার"—গর্জে উঠলেন মওলানা ভাসানী, "গণতন্ত্রের নাম নিয়ে গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরা চলবে না। অপরাধী যারা তাদের বিচার করে শাস্তি দাও। কিন্তু দালালির নামে বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখা যাবে না! কোন প্রকার জুলুমকে বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না। তোমরা যদি ক্ষমতার অহংকারে বাংলার মজলুম মানুষের দাবীকে অস্বীকার করতে চাও, তবে মনে রেখো ঝড় আসছে। যে ঝড় আসছে সে ঝড় বিপ্লবের ঝড়। এই দুর্যোগ বিপ্লবের নমুনা, 'এই দুর্যোগ আল্লাহ্‌র রহমত', এখানে মওলানা তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন, তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ততম বক্তৃতা।

বাহাত্তরের সেই দুর্যোগময় দিনগুলোতে মওলানা ভাসানীই সেইদিন অন্যায় আর জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন অগণিত নিরীহ মানুষকে তাঁর বিস্তৃত ডানার নীচে। শুধুই কি তাই?

www.pathagar.com

কে অমন করে বলতে পারতো ঃ নির্বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা করা চলবে না ? নক্শাল কথাটি কারো গায়ে লেখা আছে ?

পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছি ছোট খাটটির পাশে, যার ওপর মওলানা ভাসানী অন্তিম শয়ানে শায়িত। চোখের জল কোন বাধাই মানছে না। এক বিরাট মহীরুহ ! এর ডালে দুর্যোগের দিনে আশ্রয় পেয়েছে নানা জাতের নানা রঙের পাখী। ঝড়ের ঝাপটা সয়েছেন তিনি। কিন্তু পাখীরা আশ্রয়-শূন্য হয় নি কোনদিন। কিন্তু আজ তারা সে আশ্রয়টুকু হারালো চিরদিনের জন্যে !

www.pathagar.com

আলহাজ্জ শামস-উল হুদা

মজলুম জননেতার সাথে আড়াই ঘণ্টা

১৯৭৬ সালের প্রথম দিকের কথা, তখন আমি কিছুদিন তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য দপ্তরে সরকারী পদে সমাসীন। অফিসের পরে প্রায়ই মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। একদিন রাতে বাসায় ফিরে শুনি পিজি হাসপাতাল থেকে মওলানা ভাসানী সাহেব টেলিফোন করেছেন। তড়িঘড়ি টেলিফোনে পিজি হাসপাতালে মওলানা সাহেবের কামরায় যোগাযোগ করি। টেলিফোন ধরলেন একজন পুলিশ কনস্টেবল। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'মওলানা সাহেব জেগে থাকলে টেলিফোনটি তাঁর কাছে দিন।' পুলিশ ভদ্রলোক জানালেন, 'মওলানা সাহেব ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছেন। আপনার কথা থাকলে কাল দুপুরের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।' পরের দিন দুপুর বেলা আমি কোন খবর না দিয়েই পিজি হাসপাতালে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, মওলানা সাহেবের কামরার দরজায় একটা আড়াই সেরী ওজনের তালা ঝুলছে। দরজায় ডিউটিরত পুলিশ গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মওলানা সাহেব কি হাসপাতাল ত্যাগ করে চলে গেছেন?' উত্তরে তিনি জানালেন, 'না, তিনি ভেতরেই আছেন। লোকে বিরক্ত করে, তাই দরজায় তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে।' তিনি আরো জানালেন, চাবি আছে ভাসানী সাহেবের পুত্র আবু নাসের খান ভাসানীর কাছে। অদূরেই দেখি, বারান্দায় জনাব নাসের খান ভাসানী বেঞ্চের ওপর শুয়ে আরাম করছেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'আমাকে মওলানা সাহেব তলব করেছেন—তাই এ অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি।' তিনি সালাম সম্ভাষণের পর বললেন, 'হ্যাঁ, আব্বা আপনাকে খুঁজছিলেন আজ কয়েকদিন থেকে। তিনি দরজার তালা খুলে দিয়ে আমাকে বললেন, ভেতরে আসুন।' আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম মওলানা সাহেব শুয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছেন। পদযুগলের পাশে বসা বেগম আলেমা ভাসানী। মনে হলো, এই উপমহাদেশের বয়োবৃদ্ধ মজলুম জননেতা

www.pathagar.com

যেন একজন রণক্লান্ত সৈনিকের মতো কিছুক্ষণ সময় কাটাচ্ছেন। আমাকে দেখেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব উঠে বসে বললেন, 'আস তোমাকে বেশ কয়েক দিন থেকেই আমি খুঁজছি। তুমি নাকি আজকাল নিউজ গ্যাগ করার চাকরি নিয়েছ ?' উত্তরে আমি বললাম, কিছুদিনের জন্য সরকারী চাকরিতে আসতে হয়েছে। তবে নিউজ গ্যাগ করি একথা আপনাকে কে বলেছে ? উত্তরে তিনি বললেন, 'দেখ বাবা, আমরা সাদাসিধে মানুষ।' পেটে একদম কথা থাকে না। কাজেই সব বলে ফেলি। আমাকে এনার গাজীউল হাসান বলেছে, নিউজ গ্যাগ করার দায়িত্ব হুদা ভাইর। তাই ভাবছি, তুমি বোধ হয় আমার নিউজ সব গ্যাগ করছো।' আমি বললাম, 'হুজুর, আপনাকে সঠিক সংবাদ জানানো হয় নি। কতক নিউজ পরি-বেশনার ব্যাপারে সরকারের কিছু পলিসি রয়েছে। সেগুলো আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। তাছাড়া আপনার যে নিউজের কথা আপনি বলছেন, সে সম্পর্কে কয়েকদিন আগে বন্ধু এনায়েত উল্লাহ্ খান আমাকে বলেছেন। আমি তাঁর কথমতো সে নিউজটি হাবিবউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে এসে বি. এস. এস.কে দিয়েছি। আপনার সেই বিবৃতিটি ইতিমধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।' তিনি বললেন, 'দেখ আমি ফারাক্কার ব্যাপারে জেহাদ ঘোষণা করেছি। আমি চাই, তোমরা সবাই আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। যদি সাহায্য করতে না চাও, তবে ইন্দিরার কাছে চিঠি লেখ যাতে করে ঠিকমত পানি সাপ্লাই করে। তা না হলে আমি হাজার হাজার লোক নিয়ে ফারাক্কা ভেঙ্গে ফেলবো।' উত্তরে আমি বললাম, 'হুজুর, আপনার এসব কথাতো হরদম পত্রিকায় আসছে। কাজেই আমাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ থাকা উচিত নয়।' তিনি বললেন, 'শোন, তোমার এসব কথা আমি মানি না। তুমি একজন সাংবাদিক, ইত্তেফাকে কাজ করেছ। মুসলিম লীগের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কষ্ট ভোগ করেছ। তোমার পক্ষে সরকারী চাকরি গ্রহণ করা উচিত হয়নি।' হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'চাকরি ছাড়। আমি ভাবতেও পারিনি, তুমি সরকারের পদলেহী কুকুর হয়েছ।' আমি বুঝতে পারলাম, অবস্থা বেগতিক। মওলানা সাহেবকে কিছুতেই বুঝানো যাবে না যে, সরকার ওনার নিউজ পরিবেশনের ওপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন নি।

দুপুরে আরাম করার পরিবর্তে মওলানা সাহেব বিছানায় বসে রীতিমত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। দাদা ভাই

www.pathagar.com

নওরোজী, গোখেল, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মাহাত্মা গান্ধী, জিন্নাহ, সি আর দাস, সুভাষ বোস, গাফ্ফার খান, মতিলাল নেহরু, জওহেরলাল নেহরু. মওলানা আজাদ, কিসলু, ডঃ আনসারী, সিকান্দার হায়াত খান, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, বরদৌলি প্রমুখ নেতার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে পুরো আড়াই ঘন্টা ধরে উপমহাদেশের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। মজলুম জননেতা ভাসানীর এত কাছে বসে এসব বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য আমার হবে তা আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। ভাবলাম, আমি যেন একটি জীবন্ত ইতিহাসের সাথে কথা বলছি। মওলানা সাহেবের স্মরণশক্তি দেখে আমি অভিভূত হলাম। কথা প্রসঙ্গে তাঁর ভাসানচরের কিছু কাহিনী বর্ণনা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, 'শোন, সেখানকার হিন্দু জমিদারের অত্যাচারে নিরীহ মুসলমান প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিল। তারা কোনদিন এক লোক্মা গরুর গোশ্ত খেতে পারতো না। আমি সেখানে হিন্দু জমিদারকে চ্যালেঞ্জ করে একদিনে আড়াই শ' গরু কোরবানী করলাম। এসব খবর শুনে জমিদারের লোকেরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। সেদিন থেকে ভাসানচরে কেউ গরুর গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে আর কোন অসুবিধা বোধ করেনি।' মওলানা সাহেব তাঁর অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে এবার জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বললেন। তিনি বললেন, 'শোন, গত পরশু রাতে জিয়া এসেছিল আমাকে দেখতে। ওকে বলে দিয়েছি, ভালভাবে দেশ চালাতে। সাবধান করে বলেছি— আর যেন কথায় কথায় কেউ ব্রাশ ফায়ার না করে। তাকে আরো বলেছি, জনগণের কাছে যাও। লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখ। সায়েমের মতো বঙ্গ-ভবনে বসে থেকো না।' তিনি আরো বললেন, 'তুমি তো সাংবাদিক, দেশের নেতাদের সবাইকেই তো চেন। মজিবরের মত নেতা দেখেছ। ছেলেটা ভালই ছিল। শুধু ইন্দিরা গান্ধীর কথা শুনে কিছু কাজ খারাপ করেছে। যাক, ওকে যেন কেউ সমালোচনা না করে। মজিবরকে সমালোচনা করা একটা ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে। আরে মিয়া জান, মজিবর না হলে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট পেতে না।' আমি বললাম, 'হুজুর, হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কি?' তিনি বললেন, 'তোমার মাথা একেবারে মোটা। এটা বুঝলা না। হাণ্ড্রেড পার্সেন্টের অপর নাম স্বাধীনতা।' আমি বললাম, 'হুজুর, আপনাকে আড়াই ঘন্টা ধরে বিরক্ত করলাম, এবার উঠি।' তিনি বললেন, 'শোন, ভারতকে বলো বেশী টেরিবেরি না করে ফারাক্কার পানি ছাড়তে।

www.pathagar.com

আমার মেজাজ গরম হলে সোজা ফারাক্কায় গিয়ে পানি ছেড়ে দিব। আমাদেরকে নিয়ে খেলা নয়। বৃটিশ শার্দুল পালিয়ে গেছে, আর এসব কোন্ ছাড়! আমি এখনও দিনে শত শত জনসভা করতে পারি 'ইনশা-আল্লাহ।' বিদায় সম্ভাষণ টেনে আসার সময় তিনি আমার হাতে বেডের নীচ থেকে দুটো কলা আর কয়েকটি লিচু গুঁজে দিলেন। বললেন, 'খাও, খালি মুখে যেও না।' মজলুম জননেতা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তটি আমার কাছে সব সময় অতীব মূলবান বলে মনে হয়। অনাগত দিনে আমাদের দেশে এ ধরনের বিরল ব্যক্তিত্ব আর জন্মগ্রহণ করবে কিনা জানি না। মওলানা সাহেবের স্মৃতি আমাদের সবার মনে চিরজাগরূক থাক, এ কামনা করছি। আজ তাঁর ৮ম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতি রোমন্থন আমাদেরকে প্রেরণা দিক।

www.pathagar.com

জহিরুল হক

মহামিছিলের মহানায়ক

চাঁপাই নবাবগঞ্জে মে মাসের সতেরো তারিখের সকাল। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি ঝরছে। আকাশ যতো কালো তার চেয়ে আঁধার বেশী। আম্র-কানন আর লিচু বাগানে ঘন অন্ধকারের পর্দা টেনে বৃষ্টি ঝরছে মন্থর ধারায়। বৃষ্টি থামার আপাত কোন লক্ষণ নেই। আকাশভরা মেঘ।

আকাশে মেঘ। আম বন, লিচু বনের নীচে সরু রাস্তায় মানুষের ঢল। চাঁপাই নবাবগঞ্জে রাত কাটানোর পর লাখো জনতার মিছিল চলছে সীমান্তের দিকে। বৃষ্টিমুখর চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে বজ্রানির্ঘোষ শ্লোগান মুখে নিয়ে মিছিল পার হয়ে যাচ্ছে মহানন্দা। ফারাক্কা মহামিছিল চলছে কানসাট সীমান্তে। মহানন্দা পার হয়ে সামনে আরো ১৬ মাইল পথ।

মহামিছিলের মহানায়ক মওলানা ভাসানী তখনও সীমান্তের পথে যাত্রা শুরু করেন নি। কিছুক্ষণ পর তাঁর মিছিল অনুগমন করার কথা। মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে। আর মওলানা ভাসানী তখন কথা বলছিলেন কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে চাঁপাই নবাবগঞ্জের মনি উকিলের বৈঠকখানায় বসে। তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন বিগত দিনের রাজনীতির। স্বপ্ন দেখছিলেন ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার। সীমান্তমুখী মিছিলের শ্লোগানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল থেকে থেকে। শ্লোগানের আবহে সেই বৃষ্টিমুখর সকালে শতাব্দী প্রবীণ জননেতা বলছিলেন বৃটিশ-ভারতে সিরাজগঞ্জ কৃষক সম্মেলনের কথা। একটা পয়সা চাঁদা তোলা হয়নি। কৃষকরা সামর্থ্য ও অনুযায়ী নিয়ে এসেছিল চাল, ডাল, তরিতরকারী, নুন-তেল-লাকড়ি। এক মুঠো চাল চুরি করার কথা কেউ ভাবেনি। এক বেলায় ১৮শ মণ চাল-ডালের খিচুড়ী পাক হয়েছিল। তারপরও উদ্বৃত্ত ছিল ৯শ মণ চাল। লাকড়ি, তেল-নুনের হিসেব বাদই থাক। নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করলেন—কাকে বিশ্বাস করবো? পয়সা দেখলে কারো মাথা ঠিক থাকে না। কোন প্রোগ্রাম নিলেই বের হয় চাঁদা তুলতে। কে

www.pathagar.com

ক'টাকা চাঁদা তোলে তার হিসেব চাইলে বলে রশিদ বই হারিয়ে গেছে। এদের বিশ্বাস করো না তোমরা। যারা হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক, যাদের বাড়ীর কয়েক মাইল সীমানায় অন্যের জমি নেই, তারাই সব কৃষক-নেতা। এরা কৃষকের সমস্যা, কৃষকের দুঃখ বোঝে না। তোমরা যাও একটা গ্রাম বেছে কৃষকদের সঙ্গে আলাপ করে সার্ভে করো। দেখবে কৃষকদের মেরুদণ্ড নেই।

মওলানা ভাসানী বক্তা। সাংবাদিকরা নীরব শ্রোতা। কথা বলতে বলতে অসুস্থ বৃদ্ধ জননেতার কণ্ঠ আবেগে জড়িয়ে গেল। বললেন: আজ আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমি গরীব কৃষকদের জন্যে কি করে যেতে পারবো জানি না। তবে এখন মনে হয় এদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম। তার মূল্য আমি দিতে পারি নি। এই গরীব মানুষদের ভোট এনে আমি বারবার গদিতে বসিয়েছি কতগুলো বেঈমানকে, যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রাখেনি, যারা কৃষকদের কথা ভুলে নিজেরা সম্পদের পাহাড় তৈরী করেছে। আজ আর কিছু বলতে পারি বা না পারি, একটা কথা কৃষকদের বলে যাবো—এইসব নেতাকে তোমরা বিশ্বাস করো না, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হও।

মওলানা বলে চললেন: সব গ্রামে এই স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরতে না পারি, অন্তত আমার ১২ লক্ষ মুরিদকে একথা বলে যাবো। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি মুরিদদের দীক্ষা দেন। ছাপানো ফরমে লেখা থাকে: আমি আজীবন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কৃষকরাজ কায়েমের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। আমি রোযা-নামায-হজ্জ-যাকাত নিয়মিত আদায় করবো। ডুপ্লিকেট কপির মওলানা ভাসানী স্বাক্ষরিত কপিটি থাকে মুরিদের কাছে। আর মুরিদদের স্বাক্ষরিত কপিটি থাকে মওলানা সাহেবের কাছে। ধর্মপ্রাণ দরিদ্র কৃষকদের মনে দুর্বার রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির এই কৌশল একান্তই মওলানা ভাসানীর নিজের। সর্বহারা রাজনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে যারা কৃষকদের কাছে যেতে চেষ্টা করেন, এই কৌশলের কাছে তারা পরাস্ত হতে বাধ্য।

মওলানা ভাসানী আশাবাদী। কৃষকদের মধ্য থেকেই কৃষক নেতা বেরিয়ে আসবেন। তিনি বললেন: দিন সামনে রয়েছে, খুব দূরে নয়। দেখবে, এখন যাঁরা নেতা তাঁরা কেউ নেই। কৃষকরা এগিয়ে এলে এরা তখন পালাবে।

www.pathagar.com

১৬ মে ফারাক্কা মহামিছিল দ্বি-প্রাহরিক বিরতির জন্যে রাজশাহী শহর থেকে ১৩ মাইল দূরে প্রেমতলীতে থেমেছে। এর আগে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে মিছিল এসেছে প্রেমতলীতে। তখন আর বৃষ্টি নেই। রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মিছিলকারীদের মুখ। একটা পিকআপ ভ্যানের ওপর মাইক্রোফোন বাঁধা। পিকআপ ভ্যানের পা-দানিতে একটা পা রেখে মাউথপিস হাতে নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন মওলানা ভাসানী: আজ এই ঐতিহাসিক লং মার্চের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে দরিদ্র মানুষের ঐক্য। এই ঐক্য অটুট রেখে তোমরা এগিয়ে গেলে ধনী আর গরীবকে শোষণ করতে পারবে না। কৃষকরাজ তোমরা ইন্‌শাআল্লাহ্‌ কায়েম করতে পারবে।

অনন্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অধিকারী মওলানা ভাসানী ভবিষ্যতের কি কি ছবি দেখেছেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। ফারাক্কা মহামিছিল করে রাজশাহী থেকে কানসাট সীমান্ত পর্যন্ত ৫০ মাইল পথে তিনি কি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তার মূল্যায়ন ভবিষ্যতেই হবে। এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই বলা যায়—এ মিছিলের মাধ্যম এই বৃদ্ধ জননেতার ওপর জনগণের আস্থা আবার নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। এক মাস আগে ঢাকার ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হলে এক ক্ষুদ্র সমাবেশে তিনি ঘোষণা করলেন ফারাক্কা মিছিলের কথা। তারপর যেন সব দায়িত্ব চলে গেল যাঁরা মিছিলে যাবেন তাঁদের ওপর। এলাকাভিত্তিক কোন সাংগঠনিক সভা-সমাবেশ হলো না। কেবলমাত্র সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের মিছিলের আগের দিন পর্যন্ত রাজশাহীতে দেখা গেল না। শুধু মওলানা ভাসানী বসে রইলেন রাজশাহীতে। কখনও পান চিবুতে চিবুতে, কখনও বা লিচু খেতে খেতে কথা বললেন দর্শনার্থীদের সাথে। কি বিরাট কর্মসূচী! পঞ্চাশ মাইল পথ যাত্রার সাফল্য-অসাফল্যের ঝুঁকি। অথচ বৃদ্ধ নেতার চোখে-মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। অবিচল আস্থা নিয়ে তিনি বসে আছেন নির্বিকার। মিছিল হয়ে গেল। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একজন কৃষক, একজন শ্রমিক থেকে একজন সীমান্ত প্রহরী পর্যন্ত রচিত হলো এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের সেতু। মনাকষা সীমান্তের চৌকা ফাঁড়ি। দেড় মাইল দূরে ভারতীয় ভূখণ্ডে সবদেলপুর। ভারতীয় সেনাবাহিনী সবদেলপুর থেকে এগিয়ে এসে সীমান্ত খুঁটির প্রায় ওপরে ছাউনি ফেলেছে। বাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কনভয়ের সারি আর আমাদের চৌকা ফাঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন মাত্র এক প্লাটুন বিডিআর-এর

www.pathagar.com

জোয়ান। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, বিপক্ষের বিরাট শক্তির সামনে তাঁরা দাঁড়াতে পারবেন কিনা। উত্তরে তিনি বললেন, 'কেন পারবে না, পেছনে আপনারা এক লাখ এসেছেন।' সীমান্ত প্রহরীর মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন মাওলানা ভাসানী। যে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এক বৃদ্ধ নেতা ডাক দিয়েছেন ফারাক্কা মহামিছিলের, যে মিছিলে যোগ দিয়েছে দেশের লাখো জনতা।

ফারাক্কায় গঙ্গানদী থেকে একতরফাভাবে ভারতের পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিদেশেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যাপক বিক্ষোভ। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন অনেক বিদেশী সরকার ও পত্রপত্রিকা।

সম্প্রতি ফ্রান্সে বসবাসকারী বাংলাদেশের ছাত্র ও নাগরিকরা একতরফা পানি প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পোস্টার-প্লেকার্ড বহন করে বিক্ষোভকারীরা প্যারিসের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। এর পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা করে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী অর্পণের জন্যে তারা ভারতীয় দূতাবাসেও গমন করে।

নেভিল ম্যাক্সওয়েল

বৃটেনের বিশিষ্ট সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েল অস্ট্রেলিয়া থেকে এক বেতার ভাষ্যে বলেন, 'গাংগার পানি বাংলাদেশে জীবন-মরণ সমস্যা। ভারতের ফারাক্কা থেকে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে নদীমাতৃক এই দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যাবে।'

ইসলামী সম্মেলন

ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের আতিথ্যদানকারী রাষ্ট্র তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ডেমিরেল বলেন, 'গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে আমরা উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ এই প্রশ্নে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা স্বাভাবিক এবং কারিগরি দিক দিয়ে সঠিক।'

চীন

ফারাক্কার ব্যাপারে পিকিং থেকে প্রকাশিত 'পিকিং রিভিউ' (৯নং ইস্যু)-এর অভিমত, গঙ্গা নামের বৃহৎ নদীটি ভারত-বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

www.pathagar.com

এই নদীর পানি বন্টন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সমস্যা। কয়েক বছর আগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ মাইল দূরে এই নদীর উপর বাঁধ দেয়। পানি বন্টনের ব্যাপারে অনেকবার বৈঠক হলেও ভারতের অনমনীয় মনোভাবের জন্যেই কোন সুরাহায় আসা যায়নি। ভারত এ বছর একতরফাভাবে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি প্রত্যাহার করে তার আগ্রাসী এবং অবিনাশী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি চীনের সহযোগিতা রয়েছে।

জাপান

সফররত জাপানী মিশনের নেতা সামাকাওয়াকে ফারাক্কার ব্যাপারে অবহিত করলে তাঁর মন্তব্য, 'কোন বৃহৎ শক্তির ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয়।'

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম

স্মৃতির মিনারে মওলানা ভাসানী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি কিংবদন্তী। সাধারণত ভাসানীর মওলানা নামে পরিচিত এই মহান নেতা তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনে যে প্রভাব রেখে গেছেন তার মূল্যায়ন করা আমার লক্ষ্য নয়। তবে আমাদের কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে এই মহান নেতাকে যেভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল সেকথাই এখানে লেখার চেষ্টা করবো।

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগের ঘটনা। স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেই সব কথা বলতে হবে। সময়ের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যায় বটে, কিন্তু এমন কিছু ঘটনা থাকে যা কোনদিনই ম্লান হয় না। আর আমার জীবনে এটিও ঠিক তেমনি একটি ঘটনা। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও কৈশোরের সেই শেষ বেলার দিনগুলো আজো জীবন্ত হয়ে ওঠে, মনকে নাড়া দিয়ে যায়। আমাদের আবাস ছিল ভারতের বর্তমান আসাম-মেঘালয় রাজ্যে এবং বাংলাদেশের সীমানা যেখানে এসে মিলেছে ঠিক সেখানে। তিনদিকে নদীবেষ্টিত এই এলাকা অর্থাৎ মানকাচর থানা শহরটি আসামের অন্তর্ভুক্ত। শহর বলতে আমরা চট করে যা মনে করি মানকাচর অবশ্য তখন তা ছিল না তবে তাকে অনায়াসে একটি বর্ধিষ্ণু নদীবন্দর বলে অভিহিত করা চলে। মোটামুটি ঐ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থল বলা যায়। শহরের কোলাহল না থাকলেও বহমান জীবনের চাঞ্চল্য কম ছিল না।

সময়টা ১৯৪৬ সাল। বৃটিশ শাসনের নাগ-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার আন্দোলনে সারা ভারত তখন টালমাটাল। একদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে অখণ্ড ভারতের আন্দোলন অন্যদিকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তানের আন্দোলন। মুসলমানদের দাবি পশ্চিমে

www.pathagar.com

পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মির এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বে বিহার বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠন যেখানে মুসলমানরা পৃথকভাবে গড়বে স্বাধীন রাষ্ট্র। মুসলমানরা পৃথক আবাসভূমির আন্দোলনে আসাম প্রদেশও হয়ে উঠেছে চঞ্চল সেই দুর্বার আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে মানকাচরেও। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। কংগ্রেস যদিও নানা কারসাজির মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, কিন্তু তাতে সামান্যমাত্র স্তিমিত হয় নি পাকিস্তান আন্দোলন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং তাঁর যোগ্য সহযোগী আবুল কাসেম, মাহমুদ আলী প্রভৃতি তরুণদের নেতৃত্বে আসামে আন্দোলন নিচ্ছে এক জঙ্গী রূপ।

এখানে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক যে, আসাম প্রদেশে পাকিস্তান আন্দোলন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলনের চেয়ে ছিল একটু ভিন্ন রকমের। আসাম প্রদেশ প্রধানত ছিল মুসলিম প্রধান কংগ্রেস এবং বৃটিশ শাসনচক্র মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবীকে মোটেও সুনজরে দেখে নি যদিও তারা জানতো যে, মুসলমানদের এই দাবীকে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে পাকিস্তান যাতে কোনক্রমেই শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হলে আসামের মতো প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ প্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে দেয়া যাবে না। আর তাই আসাম প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যেই গত কয়েক দশক ধরে বঙ্গ প্রদেশ থেকে যে হাজার হাজার কৃষক এসে আসামে বসতি স্থাপন করেছে এবং তখনো করছিলো তাদের উৎখাত করতে হবে। আর তাই বৃটিশ ও কংগ্রেসের যোগসাজসে প্রণীত হলো লাইন-প্রথা। এর অধীনে দরং এবং কাছাড় জেলার বসতি স্থাপনকারী কৃষকদের উৎখাতের ব্যবস্থা করা হলো। সেই সঙ্গে স্থানীয় অধীবাসীদের বুঝানো হলো যে, বঙ্গ প্রদেশ থেকে যে হারে লোক এসে আসামে বসতি স্থাপন করছে তাতে এমন এক সময় আসবে যখন আদি অধিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে এবং তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর তখন তারা নিজদেশে পরবাসী হয়ে যাবে। স্থানীয় অধিবাসী এতোদিন

www.pathagar.com

এইসব তথাকথিত বহিরাগতদের, যারা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের মতো কালান্তক রোগ ব্যাধিকে উপেক্ষা করে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে বন-জঙ্গল সাফ করে অনাবাদী জমিকে ফসলী জমিতে পরিণত করে সোনা ফলাতে সক্ষম হয়েছিলো তাদের গ্রহণ করেছে। এখন কংগ্রেস এবং শাসকচক্রের সুপরিকল্পিত প্রচারণায় তারা এই অপেক্ষাকৃত নবাগতদের প্রতি হয়ে উঠলো বিরূপ। একটি কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, যারা বঙ্গ প্রদেশ থেকে সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করে আসছিল তারা বলতে গেলে সবাই ছিল মুসলমান। স্বাভাবিক কারণেই কংগ্রেস এবং শাসকচক্র লাইন-প্রথার মতো একটি অমানবিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে দ্বিধা করলো না। হাতীর পালের সাহায্যে রাতারাতি বসতির পর বসতি উৎখাতের প্রক্রিয়া শুরু হলো। ফসলভরা ক্ষেত পরিণত হলো ধূ ধূ প্রান্তরে, বসতবাড়ী হতে লাগলো উৎখাত। সর্বহারা মানুষের আহাজারীতে ভরে উঠলো প্রান্তর।

এই পরিস্থিতি কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষেই বদরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এগিয়ে এলো মুসলিম লীগ। শুরু হলো লাইন-প্রথা রদের আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলন একীভূত হয়ে গেল। গড়ে উঠলো দুর্বার আন্দোলন।

সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগলো প্রায় ঘুমন্ত মানকাচরে। ভাসানী মওলানার সুযোগ্য সহযোগী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব আবুল কাসেমের নেতৃত্বে মানকাচরকে কেন্দ্র করে শুরু হলো আন্দোলন। মানকাচরে এক জনসভার আয়োজন করা হলো। আসামের মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী সেই সভায় বক্তৃতা করবেন। আমরা স্কুলের ছাত্ররা যারা সবেমাত্র আন্দোলন আর রাজনীতিতে হাতেখড়ি নিয়েছি তাদের আনন্দ আর ধরে না। পরম উৎসাহে সভার আয়োজনে আমরা লেগে গেলাম। আমাদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মওলানা ভাসানী আসবেন। এতোদিন তাঁর নামই শুনে এসেছি। কখনো দেখি নি। তাঁর বক্তৃতায় নাকি আগুন ধরে, জন হয়ে পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ। এমন যাদুকরী শক্তির অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্বকে একেবারে কাছে থেকে দেখতে পাবো, শুনতে পাবো তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা সে কি কম সৌভাগ্যের কথা? শুনেছি মওলানা সাহেব ময়মনসিংহ থেকে ভাসানচরে যাওয়ার পথে মাস কয়েক কাটিয়েছেন আমাদের এই

www.pathagar.com

মানকাচরের পূর্ব দিকে দিয়ে প্রবাহিত কালোমদীর তীর ঘেঁষে-ওঠা পাহাড়ের ওপর মীরজুমলার মাযারে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে মোগল সেনাপতি মীরজুমলা আসাম অভিযান থেকে নৌপথে ফিরে যাওয়ার সময় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। আর সেই থেকেই এই পাহাড় মীরজুমলার মাযার বলে অভিহিত হয়ে আসছে। মীরজুমলার খোদ সেখানে সমাহিত হয়েছেন কিনা যে সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ যে এই গাড়ো পাহাড়ের কোল থেকেই প্রবাহিত হতো এবং কালক্রমে তার গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার ফলেই মানকাচরের সৃষ্টি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি পুরানো কবরের চিহ্ন সম্ভবত এখনো বর্তমান আছে। এবং ঐ এলাকার মুসলমানরা ওখানেই ঈদের নামায আদায় করে থাকে। সেই যা-ই হোক, মওলানা সাহেব যখন ঐ মাযারে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি এতোটা খ্যাতি লাভ করেন নি। স্বভাবতই তাঁকে দেখার একটা তীব্র বাসনা আমাদের সবার মনে ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই জানা গেলো প্রশাসন আমাদের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। সেখানে কোন সভা করা যাবে না। অথচ সভার দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। সভা অনুষ্ঠানের কথাও দূর-দূরান্তরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এখন কি হবে? আমরা সবাই হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। কিন্তু জনাব আবুল কাশেম অতো সহজে দমবার পাত্র নন। তিনি আমাদের অভয় দিয়ে বললেন। সভার আয়োজন যখন হয়েছে তখন সভা হবেই। এখন সভা অনুষ্ঠানের জায়গাটা শুধু একটু বদলাতে হবে। আগেই মানকাচরে আসাম-বঙ্গ প্রদেশের একেবারে সীমারেখায় অবস্থিত নতুন সভাস্থল নির্ধারিত হলো জিঞ্জিরাম নদীর তীরে আসাম সরকারের আওতার বাইরে বঙ্গ প্রদেশের এলাকায়। বলাবাহুল্য, বঙ্গ প্রদেশে তখন মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন। সভার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলো। এই সভা যে এক অভূতপূর্ব বিরাট জনসভা হবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আসাম সরকার সত্যিই শংকিত হয়ে পড়লো। তারা শুধু ১৪৪ ধরা জারি করেই ক্ষান্ত হলো না, মানকাচরে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হলো এবং তেমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে যাতে তৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় সেজন্য গারো পাহাড় জেলার ডেপুটি কমিশনার মি. এল. এল. পিটারসকে ঐ এলাকার জন্যে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করা

www.pathagar.com

হয়। জেলা সদর ধুবড়ীর দূরত্ব প্রায় ৪৬ মাইল এবং যোগাযোগের ব্যবস্থাও তেমন ভালো নয়। অন্যদিকে গারো পাহাড় জেলা সদর তুরার দূরত্ব মাত্র ৩০ মাইল এবং যোগাযোগও অপেক্ষাকৃত ভালো। সভার দিন এসে গেলো। চারদিকে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। আমরা যারা সভায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবো তাদের মধ্যেও রীতিমত সাজসাজ রব। সভার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। হেমন্তের ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। সভা যেখানে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সামিয়ানা টাংগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে নেতৃবৃন্দের জন্যে। আর স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে খাটানো হবে গোটা দুয়েক তাঁবু। সভার ঠিক আগের দিন হঠাৎ করেই আমাকে যেতে হলো মাইল তিনেক দূরে রৌমারিতে। সেদিন আর ফেরা হয় নি। তাই পরদিন সকালেই রওনা হয়েছি। রাস্তায় দেখলাম বেশ কিছু লোক আমার পথে রওয়ানা হয়েছে। সঙ্গে পুটলা-পুটলি সম্ভবত আত্মীয় বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই দেখলাম হাঁড়ি-পাতিলও রয়েছে। একজন একটা বেশ তরতাজা খাসীও নিয়ে যাচ্ছে। বেশ অবাক লাগলো! জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ওরা মওলানা সাহেবের সভায় যাচ্ছে। সভায় যাচ্ছে তা হাঁড়ি-পাতিল কেন জিজ্ঞেস করতেই ওরা এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন আমি নেহায়েৎ বোকা। আর কথা না বাড়িয়ে পথ চলতে লাগলাম। ওদের মধ্যেকার আলাপ আলোচনা আমার কানে আসছে। ওরা বলছে, এবার পাকিস্তান হবেই। আর একজন বিজ্ঞের মত বলে উঠলো, হবে না মানে দেখো নাই মওলানা সাহেব সূর্যের ফ্লাগ উড়িয়েছে। শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম! ঐ সময়ে সূর্যে কলংক দেখা গিয়েছিলো। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায়ও খবর প্রকাশিত হয়েছিল। আমি একবার ভাবলাম ওদের ভুলটা ভাঙিয়ে দিই কিন্তু সাহস পেলাম না। ওরা মওলানা সাহেবের একান্ত ভক্ত তাতে আর সন্দেহ ছিল না। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময়ও এ ধরনের একটা কথা রটেছিল। কুরআন শরীফের ভেতর নাকি মওলানা সাহেবের দাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। আর তার ফল কি হয়েছিল সেকথা সবারই জানা। সেবার যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা নির্বাচনে একচেটিয়া জিতে গিয়েছিল। আমরা যখন মানকাচরের একেবারে কাছে এসে পৌঁছলাম বেলা তখন গোটা দশেক হবে। এর মধ্যে দেখলাম সভাস্থলের দিকে দলে দলে লোক যাচ্ছে। অথচ সভা শুরু হবে বেলা দুটোয়। যাই হোক, এতসব ভাবনা ছেড়ে দ্রুত বাড়ীর দিকে চললাম। সভায় যাওয়ার প্রস্তুতি

www.pathagar.com

নিতে হবে। বাসায় যেয়ে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে কিছু নাস্তা করে ছুটলাম বন্ধু আনোয়ারের বাড়ী। সেই আবার আমার নেতা। কিন্তু হায়, ওর বাসায় যেয়ে শুনলাম ও চলে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু কি আর করবো? একাই রওনা হলাম। সভাস্থলে পৌঁছতে আমার ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগলো। সেখানে গিয়ে দেখি হুলস্থূল ব্যাপার। সভা শুরু হওয়ার তখনো দু'তিন ঘন্টা বাকী কিন্তু সভার জন্যে যতোটুকু জায়গা তৈরী করা হয়েছিল তা প্রায় ভরে উঠেছে। বেলা দুটো নাগাদ কি অবস্থা দাঁড়াবে কিছু বলা যায় না। তবে স্থানে সংকুলানের অসুবিধা হবে না। কেননা চারদিকে রয়েছে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। কিন্তু তার চেয়েও অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার ছিলো। দেখলাম বেশ কয়েক জায়গায় রান্নার আয়োজন চলছে। এতক্ষণে হাঁড়ি-পাতিলের রহস্যটা আমার কাছে খোলাসা হলো। সভার কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ যেখানে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে এবং আমাদের তাঁবু পড়েছে সেখানে আরো অবাক হওয়ার মতো জিনিস ছিলো। দেখলাম আমাদের তাঁবুর পাশে চাটাই বিছানো আর সেখানে স্তূপ করা রয়েছে চাল-ডাল, লাউ-কুমড়া, বেগুন-আলু। আর একটু দূরে বেশ কয়েকটা খাসী এবং গরু বাঁধা। যাক্ লিডারের সংগে দেখা হতেই দেরীর জন্যে বকা খেতে হলো। সবাই খুব ব্যস্ত। তবুও জিজ্ঞেস করলাম চাল-ডাল, গরু খাসীর রহস্য। লীডার অর্থাৎ আনোয়ার জানালো সভায় যারা এসেছে তারা মওলানা সাহেবের জন্যে এসব নজরানা এনেছে। এ ধরনের ব্যাপার দরগাহ বা মাযার শরীফে ঘটে থাকে বলেই জানতাম। কিন্তু কোন জনসভায় এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই বিরল। একজন বয়স্ক সহযোগী বললেন যে, এরা সকলেই মওলানা সাহেবকে পীরজ্ঞানে ভক্তি করে। আর তাই এরা সকলে নিজ নিজ সামর্থ্য মতো কিছু না কিছু নিয়ে এসেছে। যাই হোক বেলা বাড়ার সংগে সংগে মানুষের ভীড় বাড়ছে। আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সভাস্থলের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়িয়ে মানুষের ভীড় ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল প্রান্তরে। শুধু মানুষ আর মানুষ। চারপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে তখনো মানুষ আসছে। স্রোতের মতো মানুষ আসছে সভাস্থলের দিকে। এমন অভূতপূর্ব জনসমাগম এ অঞ্চলের কেউ এর আগে দেখেছে বলে মনে হয় না। যেসব নেতা সভায় এসেছেন তাঁরাও অবাক বিস্ময়ে দেখছেন মানুষের এই সমাগম। সভার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু আসল মানুষটি এখনও এসে পৌঁছান নি।

www.pathagar.com

সমুদ্র গর্জনের মতো সভাস্থল থেকে শ্লোগান উঠছে 'নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর' এবং আরো বিভিন্ন ধ্বনি। নেতাদের চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। মওলানা সাহেব এখনো এসে পৌঁছান নি। মোটরে তার আসার কথা। পথে কি কিছু অঘটন ঘটলো? ইতিমধ্যেই কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সাইকেল নিয়ে যে পথে মওলানা সাহেব আসবেন সেপথে খোঁজ নিতে চলে গেছে। বিশাল জনতার মাঝে একটা চাপা অস্বস্তি যেন গুঞ্জরিত হচ্ছে। নেতারা অনেকে বক্তৃতা করে জনতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। এমন সময় খবর এলো মওলানা সাহেব গরুর গাড়ীতে আসছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সভায় এসে পৌঁছুবেন। মাইকে এ খবর ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত হয়ে উঠলো। সভাস্থল থেকে একটা অস্বস্তির কালো মেঘ যেন কেটে গেলো। যে মোটরে মওলানা সাহেব আসার কথা তা রাস্তায় বিকল হয়ে যাওয়ায় মওলানা সাহেবকে গরুর গাড়ীতে আসতে হচ্ছে বলেই এই দেরী। এখানে বলে রাখা দরকার যে, তখনকার দিনে আজকের মতো মোটর গাড়ীর এতো প্রাচুর্য ছিল না। এবং যাও ছিলো তাও তার সচলতার উপরও তেমন নির্ভর করা যেতো না—তাই এই বিভ্রাট। যা-ই হোক মওলানা সাহেব আসছেন শুনে আমরা কয়েকজন এগিয়ে গেলাম। প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর আমরা প্রাথিত গরুর গাড়ীর দেখা পেলাম। গাড়ী তার ঢিমেতেতালা গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভেতরে মওলানা সাহেব বসা। আমরা গাড়ীর সংগে এগিয়ে ছে আর মওলানা সাহেবকে দেখছি। তাঁর হাতে একখানা বই। আমার খুব কৌতূহল হলো। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কি বই পড়ছেন? মওলানা সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ইংরেজি শিখছি। তাঁর হাতে একখানা প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষার বই। মওলানা সাহেবের বয়স তখন ৪০ থেকে ৫০ এর মধ্যে। আর তিনি ইংরেজি শিখছেন এবং সহজভাবে স্বীকার করতেও তাঁর কোন দ্বিধা নেই। আমরা সবাই সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মওলানা সাহেব যে সাধারণের চেয়ে উর্ধ্বে ছিলেন এই সামান্য ঘটনাই তার প্রমাণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সভাস্থলে পৌঁছে গেলাম। স্বেচ্ছাসেবকরা দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্চ পর্যন্ত রাস্তা করেছে। নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এসে মওলানা সাহেবকে সংবর্ধনা জানালেন। মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস হয়ে উঠলো প্রকম্পিত। সভার কাজ শুরু হয়ে গেল।

www.pathagar.com

দু'-একজন নেতার বক্তৃতা শেষে মওলানা সাহেব বক্তৃতা করলেন। ইতিমধ্যে সভার পরিস্থিতি এবং ভক্তদের নিয়ে আসা বিভিন্ন জিনিষ সম্পর্কে মওলানা সাহেবকে অবহিত করা হয়েছে। মওলানা সাহেব বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতার সময়ে ঐ বিশাল জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিশ্চুপ। লক্ষ লোকের এই সমাগমে গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুরের সংখ্যাই ছিল শতকরা ৯০ ভাগ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতো সুশৃংখল জনতার কথা ভাবাই যায় না! বক্তৃতার সময় কোথাও এতটুকু বিশৃংখলা নেই। আজকের দিনে এমনটা আশাই করা যায় না। মওলানা সাহেব আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন যা আজ আমার মনে নেই। তবে দু'টি ঘোষণার কথা মনে আছে যার একটি হচ্ছে মওলানা সাহেব মিছিল নিয়ে মানকাচর গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন এবং সভাস্থলে একটি কেল্লা গড়ে তুলবেন, যার নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান কেল্লা এবং সেখানে ন্যাশনাল গার্ড ট্রেনিং দেয়া হবে। জনতাকে মওলানা সাহেব বললেন, সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে ঘর তুলে দিতে হবে এবং এখানে যে কয়েক শ' ন্যাশনাল গার্ড ট্রেনিং নেবে তাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তও জনগণকেই করতে হবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনতা জিন্দাবাদ ধ্বনি সহকারে হাত তুলে সমর্থন জানালেন। সেই দিনই গোড়াপত্তন হলো ঐতিহাসিক পূর্ব পাকিস্তান কেল্লার। এই কেল্লা ১৯৪৭ সালের আগস্টে বৃটিশ এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আসাম সরকারের প্রচণ্ড উদ্বেগের কারণ হয়ে ছিল এবং এমন দিন ছিল না যেদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই কেল্লা সম্পর্কিত খবর বের হয় নি। কলকাতার যুগান্তর, আনন্দ বাজার প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় বেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে এই কেল্লা সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই কেল্লা তৎকালীন বৃটিশ এবং কংগ্রেসী সরকারের জন্যে এক ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সভার পরদিনই কেল্লার জন্যে ঘর তৈরীর কাজ শুরু হয় এবং দু'দিনের মধ্যেই একটি ১শ' হাত দীর্ঘ খড়ের ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়, এর জন্যে প্রয়োজনীয় খড়, বাঁশ, শন সব কিছুই জনগণ স্বেচ্ছায় দিয়েছে। কাউকে নির্দিষ্ট করে বলে দিতে হয় নি। আর কেল্লার অধিবাসীদের জন্যে খাবারও আসতো জনগণের কাছ থেকে। সবাই নিজের নিজের সাধ্যমত চাল, ডাল, লাউ-কুমড়া, শাক-সব্জি গরু, খাসি দিয়ে যেত কেল্লার ভাণ্ডারে। আর সেদিন উপস্থিত জনতার নিয়ে আসা চাল-ডালের পরিমাণও ছিল বিরাট যা ছিল কেল্লার রসদের ভিত্তি। এই

www.pathagar.com

কেল্লা সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়; কিন্তু তা বলে এই নিবন্ধ দীর্ঘায়িত করবো না। এবার অন্য ঘোষণা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে কিছু কথা। এই সমাবেশের খবর পেয়ে ধুবড়ী থেকে এসেছেন ডেপুটি কমিশনার জি. পি. জার্মান আর তুয়া থেকে এসেছেন এল. এল. পিটার্স। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য মওলানা সাহেব মিছিল করে সভাস্থল থেকে যাবেন শুনে তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এতো লোক যদি এক সঙ্গে শহরে ঢুকে পড়ে তবে যে-কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। তারা খবর পাঠালেন মওলানা সাহেবের কাছে আলোচনার জন্যে। আলোচনায় ঠিক হলো মওলানা সাহেব নেতৃবৃন্দ সহকারে একটা ছোটখাটো মিছিল নিয়ে থানা পর্যন্ত যেয়ে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করবেন। কিন্তু জনতা মওলানা সাহেব এবং নেতৃবৃন্দকে সে-ভাবে যেতে দিতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা সাহেব তাদের বুঝিয়ে রাজী করলেন। মিছিল মানকাচরের বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হবে তাদের হাতে লাঠি থাকবে না। এরপর মওলানা সাহেব নেতাদের নিয়ে থানা পর্যন্ত যাবেন। হেমন্তের সেই অপরাহ্নে লাখো মানুষের সুশৃংখল সেই মিছিলের দৃশ্য আজও যখন আমার চোখে ভেসে ওঠে তখন মনটা আবেগে ভরে যায়। একটি মানুষের যাদুকরী প্রভাবের কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। এমন মানুষের আবির্ভাব আবার কবে ঘটবে এদেশে।

www.pathagar.com

বদরুদ্দীন সামাদ

স্মৃতির অলিন্দে মওলানা ভাসানী

চারদিকে হৈ-হল্লোড়। অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক-রিকসাওয়ালা-ট্যাক্সীওয়ালা-ফেরীওয়ালা-কামার-কুমোর-জেলে-তাঁতী প্রভৃতি মেহনতী মানুষের মাঝে বয়ে চলেছে আনন্দের বন্যা। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর আজ মজলুম মানুষের নেতা, সর্বস্তরের মানুষের চোখের মণি, বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসছেন ওদের এই ঐতিহ্যবাহী শহরে। তাই এতো প্রাণ-প্রাচুর্য, এতো হৈ-হল্লোড়। তিনি জনসভা করবেন, বাঁচার বাণী শোনাবেন, বিভেদ-বিসম্বাদ হানাহানি ভুলে একাত্মতা ঘোষণা করার ডাক দেবেন, দলমত-জাতি ভুলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে লওয়ার পরামর্শ দেবেন—এ কথা ঘন ঘন বেশ কয়েক দিন হতে মাইকযোগে শহরে প্রচার করা হয়েছে। হ্যাণ্ডবিল, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, দেওয়াললিপিতে শহর ছেয়ে গেছে। এতোদিন তাই শহরবাসী চাতক-পাখীর ন্যায় আজকের এই দিনটির দিকে চেয়েছিল। আজ সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন। শহরে আজ নেমেছে জনস্রোতের ঢল। সুদূর পল্লী হতে পিপীলিকার ন্যায় খেটে খাওয়া মানুষ সারিবদ্ধভাবে এসে ভীড় করছে শহরে। শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভোজ্য সামগ্রী এরই মধ্যে ধুলট হয়ে উড়ে গেছে। বেজায় বিক্রী। দু'হাতে পয়সা লুটছে ওরা। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের মজলুম মানুষ পাকিস্তানী বর্বরদের হাতে সব হারিয়ে সর্বহারা। সেদিকে ওদের খেয়াল নেই। ওরা চাহিদার মুখে ভোজ্য সামগ্রীর দর বাড়িয়েছে। ওদের অজুহাত, সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশী অর্থাৎ অর্থনীতির সেই মালথেসিয়ান থিওরী, 'ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই'য়ের কচ্‌কচানি। একেই বলে কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। বৈশাখের এই দারুণ দাবদাহে হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিকরা পৌষের আমেজ উপভোগ করছে!

www.pathagar.com

তারিখটা ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ তখন সবেমাত্র স্বাধীনতার আঁতুড় ঘর হতে বেরিয়ে সূর্যের মুখ দেখেছে। এ কাহিনী তখনকার। নবজাত শিশুর শরীরে তখনও স্রাবের লালা। পরিচর্যার তখনও দারুণ প্রয়োজন, পেঁচোর হাত হতে শিশুকে রক্ষার। নবজাত শিশুকে ঘিরে চারদিকে শত্রুর ভীড়। শত্রু ঘরে, শত্রু বাইরে; শত্রু আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। স্বাধীনতা নামক নবজাত শিশুর সেই ক্রান্তিলগ্নে রক্ষে কবচ সঙ্গে নিয়ে ধন্বন্তরী আসছেন শোনাতে আশার বাণী, বাঁচার বাণী, স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার বাণী। সাধারণ মানুষ তাই আজ আনন্দে আত্মহারা—কৃষক এসেছে লাঙল ঘাড়ে, জেলে জাল স্কন্ধে, মাঝি-মাল্লা বৈঠা হাতে, পাটকল শ্রমিক মাকু হাতে অর্থাৎ ওরা নিজ নিজ পেশার প্রতীক সঙ্গে নিয়ে এসেছে বর্ষীয়ান নেতাকে জানাতে ওদের সশ্রদ্ধ সালাম। নিঃশেষ করে দিতে এসেছে ওদের হৃদয় নিঙড়ানো প্রীতিসিক্ত নৈবেদ্য। নেতার বয়স হয়েছে! বলা যায় না কখন ওপারের ডাক আসে! সুতরাং দু'চোখ ভরে দেখতে এসেছে ওরা ওদের প্রাণের নেতাকে। মনের মানুষকে।

যশোর জজকোর্ট। দক্ষিণে বিস্তৃত ঈদগাহ ময়দান। এখানে শহরের মানুষ বছরে দু'বার জমা হয়। মুসলমানদের দুই প্রধান উৎসব, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন। আরো সময় সময় শহরবাসীর কিছু কিছু মানুষ জমা হয় রাজধানী হতে আগত সরকার প্রধান বা রাজনৈতিক নেতাদের শুভাগমনে। কিন্তু আজকের এই জনসমাগম স্বতঃস্ফূর্ত। মাঠে-ছাদে আশে-পাশে তিল ধরনের স্থান নেই। এতো মানুষ ইতিপূর্বে কখনো এ মাঠে হয়েছে বলে শোনা যায়নি। এই মাঠে আজ বর্ষীয়ান জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ দেবেন। সুতরাং মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে বাঁধা হয়েছে সুউচ্চ বক্তৃতা মঞ্চ। মঞ্চ লাল শালুতে শোভিত। মঞ্চকে ঘিরে মানুষের ভীড়। মঞ্চের উপর স্থানীয় রাজনৈতিক ছাত্রনেতা এবং কিছু কিছু পাতি নেতা। এ ক'মাস আগেও স্বাধীনতা যুদ্ধের যারা বিরোধিতা করেছিল কিছু কিছু তাদেরকেও গা ঢাকা দিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যাচ্ছে। ঘুরার কারণও আছে ওদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওরা জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সুতরাং ওরা এখন চাচ্ছে জনগণের কাতারে শামিল হতে। জননেতা মওলানা ভাসানী আজ সকলকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দেবেন সব রকম বিভেদ ও মানসিকতা ভুলে স্বাধীনতা রক্ষার

www.pathagar.com

বজ্রকঠোর শপথ নিয়ে এগিয়ে আসার। এই ঘোষণা শোনার আকুল আগ্রহ নিয়ে শঙ্কাসঙ্কুল চিত্তে এখানে-সেখানে ঘুরঘুর করছে ওরা।

সরকারের গুপ্তবাহিনীও আজ বেশ সক্রিয়। 'মাস এ্যাজিটেটর' বলে মওলানা সাহেবের একটা দুর্নাম আছে। সুতরাং খুব সাবধান, দেখো যেন তিনি মজলুম মানুষদের খেপিয়ে না তোলেন। পাশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেন কোন বে-ফাঁস কথা না বলে ফেলেন! বললে, তার তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া কি সঙ্গে সঙ্গে বেতারবার্তায় জানাবে। টেলিফোনে? না-না, টেলিফোনে না। টেলিফোনে সিক্রেট কথার সিক্রেসী থাকতে না-ও পারে। টেলিফোন ট্যাপ হতে পারে, ক্রস কানেকশন হতে পারে। সাবধানের মার নেই! সুতরাং সরকারের গুপ্তবাহিনী অত্যন্ত তৎপর। ওদের খবর আছে অবাঞ্ছিত কিছু মানুষ জনসভা পণ্ড করার চেষ্টা করতে পারে। ওদের গুপ্তসংবাদ বিদেশী কিছু চর ইতিমধ্যে সভাস্থলে প্রবেশ করেছে। তাদের উদ্দেশ্য, সব স্তরের মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করার মওলানা সাহেবের ডাক বানচাল করে দেওয়া। ওদের উদ্দেশ্য, দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করা। সুতরাং গুপ্ত পুলিশ অত্যন্ত তৎপর। এছাড়া উর্দিপরিহিত পুলিশ লং-হ্যাণ্ডনোট নেয়ার উদ্দেশ্যে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে ময়দানের এক কোণে স্থান নিয়েছে মাইকের কাছাকাছি। মওলানা সাহেবের আক্ষরিক (ভার্বেটিম) নোট নিতে হবে। সুতরাং মাইকের কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন। তাই ওরা স্থান নিয়েছে মাইকের কাছাকাছি। তাই যা বলছিলাম। চারদিকে হৈ-হুল্লোড়। অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা। উৎসাহ স্বাধীনতা-দরদী মানুষের মনে, উৎসাহ স্বাধীনতা বে-দরদী মানুষের মনে, উৎসাহ আমলা-ফয়লাদের মনেও। তফাৎটা কেবল উৎসাহের মাত্রার। স্বাধীনতা-দরদী মানুষের উৎসাহ তারা স্বাধীনতা রক্ষা করবে, সন্ধান পাবে; বে-দরদীদের উৎসাহ, তারা বিজিত সৈনিক হয়েও জয়ী সৈনিকদের সঙ্গে এক কাতারে শামিল হওয়ায় অধিকার পাবে এবং আমলা-ফয়লাদের উৎসাহ, দেশ এখন স্বাধীন। সুতরাং বেতনবৃদ্ধি না হয়ে এবার আর যায় না। মজলুম মানুষের নেতা মওলানা ভাসানী। সরকারের কাছে তাদের সে দাবী আজ পেশ না করে ছাড়বেন না। তাই আজকের এ জনসভা সর্বস্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মওলানা ভাসানীর নাম শুনেছি সেই বৃটিশ আমলে। চোখে দেখেছি ওঁকে ৯৯৫৪ সালে। তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের

www.pathagar.com

তোড়জোড়। চারদিকে মিটিং মিছিল। নূরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকারকে কবর দেওয়ার হাঁক-ডাক। অভূতপূর্ব গণজাগরণের সেই প্রবল জোয়ারে যুক্তফ্রন্টের বৈঠা হাতে প্রথম দেখলাম মওলানা ভাসানীকে। তখন আমি যশোর জেলার শৈলকুপা থানার অফিসার-ইন-চার্জ। এই এলাকায় ভাসানী সাহেব আসছেন জনসভা করতে। ভাসানী সাহেব আসছেন শুনলে তখন পুলিশ অফিসারদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো। অপরাধ দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ অফিসারদের ক্রিমিন্যাল পেনাল কোডের প্রয়োগ পদ্ধতি-বহির্ভূত কিছু কিছু বে-আইনী কাজ-কারবারও করতে হয়। যেমন চোরাই মাল উদ্ধার ও স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে সন্দিগ্ধ অপরাধীর উপর দৈহিক নির্যাতন, শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্যে ১৪৪ ধারা জারির বন্দোবস্ত, ১০৭ ধারায় বণ্ড নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে যে কিছু কিছু নির্দোষ মানুষ হয়রান হয় না—তা আমি বলছি না। কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে সময় সময় সে রকম কিছু না করে উপায় থাকে না। সুতরাং পুলিশ অফিসার কখনো এলাকার সকলের কাছে প্রিয় হতে পারে না। আর এ রকম দাবী যে অফিসার করেন তিনি হয় সত্যের অপলাপ করেন, না হয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলেন। সে যা-ই হোক, মওলানা ভাসানী মজলুম মানুষের নেতা বিধায় সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছিলেন অনায়াস-গম্য। ভিজিংটিং কার্ড দিয়ে বা পূর্বানুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফলে কখন যে কে কি কথা বলে ফেলে আর তার প্রতিক্রিয়ায় ভাসানী সাহেব জনসভায় পুলিশ অফিসারদের "খাল ছাড়িয়ে লবণ লাগানো"র হুমকি দেন তার ভয়ে পুলিশ অফিসাররা ঘন ঘন দোওয়া-দরুদ পড়তেন। কারণ সে রকম কিছু বলে ফেললে তার জের চলবে ঢাকা পর্যন্ত। কেন এমন হলো, কেন অমন হলো, কেন ঐসব কথা মওলানা সাহেবের কানে গেল ইত্যাদি ধরনের এক রাশ 'কেন'র জবাব দিতে দিতে প্রাণ হয়ে উঠবে ওষ্ঠাগত। তারপর কিছু হোক আর না হোক, এ্যানুয়েল কনফিডেনশিয়াল ক্যারেকটার রোলে সকলের অজ্ঞাতে লিখে রাখবেন, 'ট্যাক্‌টলেস'। আর সেই 'ট্যাক্‌টলেস'কে 'ট্যাক্‌টফুল' করে ভবিষ্যতে প্রমোশন পেতে জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাবে লু' হাওয়া। সুতরাং মওলানা সাহেব এলাকায় আসছেন শুনলেই পুলিশ অফিসারদের কাঁপুনি দিয়ে গায়ে জ্বর আসতো।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু পড়াশুনা করা ছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক সহচরদের অনেকেই আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর অন্তর, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি," একথা আমি আগে হতেই জানতাম। তবুও শঙ্কিত। কারণ তাঁর কানে যাওয়ার মত এলাকায় এমন কিছু না করলেও সব মানুষ তো আর সমান নয়। আর আমিও অজাতশত্রু নই। তাই চোখ-কান খোলা রেখে আমি দণ্ডায়মান জনসভার এক পাশে। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তো রয়েছেই।

যথাসময়ে মওলানা সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠলেন মঞ্চে। মুখে পাকা দাড়ি, মাথায় গোল টুপি, পরিধানে লুঙ্গি, পায়ে চটি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী ও হাতে বেতের লাঠি। বিপুল করতালির মধ্যে তিনি অনলবর্ষী বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার সব কথা আজ আর মনে নেই। তবে বক্তৃতার শেষে তিনি উদাত্ত কন্ঠে জনগণকে ডাক দিলেন নূরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকারের কবর রচনার। পরিশেষে উর্দি পরিহিত পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ লিখে যাও তোমরা, যতো পার লিখে যাও। তোমরা আমাকে কম্যুনিস্ট বলো আর যা কিছুই বলো না কেন আমি কিছুই মনে করবো না। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও শোষণের জন্য আমি কিছুতেই তোমাদেরকে ক্ষমা করবো না। এ রকম কোন অভিযোগ যদি আমি পাই তবে মনে রেখো, তোমাদের ছাল ছাড়িয়ে আমি লবণ লাগাবো। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। আর আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক্, এখনো তবে অভিযোগ পান নি। ভবিষ্যতে পেলে গায়ের ছাল থাকবে না। আপাতত রয়ে গেল। তাছাড়া ছাল ছাড়িয়ে লবণ লাগানোর হুমকি তো তিনি সব সভাতেই দেন। ওটা বাত্‌কা-বাত। চাকরিটা এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেল। আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।

এরপর মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় মোলাকাত খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে। সেটা বোধ হয় ১৯৭১ সালের ৪ঠা মার্চ। আমি তখন খুলনার ডি. আই. ও (ওয়ান)। জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে মার্চের অগ্নিক্ষরা দিনের অপরাহ্নে সেদিন শহীদ হাদিস পার্কে ছিল সর্বস্তরের মানুষের এক জনসভা। সেখানে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে পশ্চিম পাকিস্তানী-দের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা—তোমরা, আমরা—আমরা। আমরা—

www.pathagar.com

তোমরা কোনদিনও এক হবো না। সুতরাং তোমাদেরকে আসসালামো আলায়কুম। বুঝলাম, একটি নতুন জাতি সেই মুহূর্তেই জন্ম নিল।

সেদিন ভাসানী সাহেবের ভাষণ শুনে অনেকদিন আগে পড়া একটি প্রবন্ধের কথা আমার মনে পড়েছিল। প্রবন্ধটির নাম ছিল, "তোমরা ও আমরা"। প্রবন্ধকারের নাম আজ আর মনে নেই। তবে মনে হয় প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী। প্রবন্ধটি আমাদের আই. এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল। প্রবন্ধে প্রবন্ধকার 'তোমরা' বলতে বুঝিয়েছেন ইউরোপকে এবং 'আমরা' বলতে তদানীন্তন ভারতবাসীকে। প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম-কর্ম কোনটির সঙ্গে আমাদের মিল নেই। এমন কি বিয়ের ব্যাপারেও গরমিল। কারণ তোমরা বিয়ে কর আর আমাদের বিয়ে হয়। সুতরাং তোমরা—তোমরা, আমরা—আমরা। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনদিনও মিল হতে পারে না। ভাসানী সাহেবের সেদিনের ভাষণে ছিল ঐ "তোমরা ও আমরা" প্রবন্ধের একই সুর। এর প্রায় এক বছর এক মাস পরে যশোরের জনসভায় ভাসানী সাহেবের সঙ্গে এই আমার তৃতীয় মোলাকাত। ১৯৫৪ এবং ১৯৭১ সালের জনসভায় তাঁকে যে পোশাক ও সুরতে আমি ভাষণ দিতে দেখেছি আজ এই ১৯৭২ সালের ২৪শে এপ্রিলের জনসভায়ও তিনি সেই একই পোশাক ও সুরতে দণ্ডায়মান। যা কিছু তফাৎ তা ১৯৫৪ সাল হতে ১৯৭২ সাল, এই আঠারো বছর বয়স বৃদ্ধির।

ঘন ঘন করতালির মধ্যে মওলানা সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। কিন্তু বক্তৃতা শোনার আমার ফুরসৎ নেই। আমি ব্যস্ত। চারদিকে নজর রাখতে হচ্ছে। নানা রকম 'এলিমেন্ট' শ্রোতার ভীড়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এবং সে রকম কিছু একটা ঘটলে সমস্ত দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে ডি. আই. ও (ওয়ান) অর্থাৎ আমার উপর। কারণ আমি এখন যশোরের ডি. আই. ও (ওয়ান)। উপর হতে কৈফিয়েত চাইবে ঃ এমন যে অঘটন ঘটবে তার সংবাদ তুমি পূর্বাহ্নে সংগ্রহ কর নি কেন? তোমার এজেন্ট কি করছিলো? বলছো, এজেন্ট সংবাদ দিয়েছে? কই, পুট-আপ কর দেখি। হ্যাঁ, সংবাদ তো আছে দেখছি। তবে আগ-ভাগে ঐ সমস্ত ডিস্টারবিং এলিমেন্টগুলোকে পিক-আপ কর নি কেন? এস. পি.-কে সাজেশন দিয়েছিলে? তাও তো দিয়েছিলে দেখছি। তবে পিক-আপ করা হয় নি কেন? বুঝি ঘুমাচ্ছিলে?

www.pathagar.com

এস. পি. বিজিম্যান। তুমি ও. সি.-কে ডাইরেকশন দাও নি কেন? সুতরাং সভাস্থলে গোলমাল হওয়ার জন্যে দায়ী তুমি। তুমি, 'ট্যাক্‌টলেস'। আবার ঘুরে-ফিরে পুলিশ বিভাগে বহুলপ্রচলিত টার্ম সেই 'ট্যাক্‌টলেস' যার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার। মোদ্দাকথা, যতো দোষ নন্দ ঘোষ। পানি তুই না ঘোলা করেছিস, তোর বাপ ঘোলা করেছে। রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে গোলমাল হলে কোন রকমে ডি. আই. ও. (ওয়ান)-র এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

সুতরাং এখন আমি ব্যস্ত, যেহেতু ডি. আই. ও. (ওয়ান)। এখন আমি সাইকেলে চড়ে চারদিকে চক্কর দিচ্ছি। কারো সঙ্গে কথা কওয়ার এখন আমার সময় নেই। আমার লোকজনদের ডিউটি সুপারভাইজ করতে এখন আমি ব্যস্ত। কারণ আমি জানি ঠিকমত ডিউটি সুপারভাইজ না করলে ওরা কাজে ফাঁকি দেবে। গল্প-গুজবে মেতে থাকবে। ফলে অনেক সমস্যার উদ্‌ভব হওয়া বিচিত্র নয়! আর তার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে এই পুওর ডি. আই. ও. ওয়ানকে, যেহেতু সভাস্থলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার আমি ওভার-অল-চার্জে। আপনার পাসপোর্ট তদন্তের রেজাল্ট জানতে চাইছেন? না, এখন কথা কওয়ার সময় নেই। অফিসে আসুন। আপনি রিভলভার লাইসেন্স সম্বন্ধে আলাপ করতে চান? জ্বী-না, এখন আমার আলাপের সময় নেই। আগামী কাল অফিসে আসুন। এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না। কারণ এখন আমি একটা জরুরী ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত।

ঃ এই যে বেদুঈন সাহেব?

কে আবার ডাকছেন আমাকে! পিছু ফিরে চেয়ে দেখি কবি জসীম উদ্দীন সাহেব। সঙ্গে একজন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী সুপুরুষ যুবক। মুখে দাড়ি। বয়স তিরিশের কোঠায়।

আরে বাপরে কি সৌভাগ্য আমার! তাড়াতাড়ি সাইকেল হতে নেমে এগিয়ে গিয়ে বললাম ঃ আদাব স্যার! তিনি আদাব গ্রহণ করে সঙ্গী যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন ঃ হাসান আবদুল কাইয়ুম। বাড়ী শ্রীপুর থানার দ্বারিয়াপুর। আপনাদের শহরের জামাই।

এবার জনাব কাইয়ুম সাহেব এগিয়ে এসে সহাস্যে করমর্দন করে জানালেন তিনি শহরের উপকণ্ঠে খড়কির পীর সাহেবদের বাড়ীতে বিয়ে করেছেন। আমিও আমার পরিচয় দিলাম কাইয়ুম সাহেবকে। সেদিন সেই

www.pathagar.com

পর্যন্ত। কারণ কাজে ব্যস্ত থাকায় বেশী সময় দিতে পারি নি ওঁদের সঙ্গে আলাপচারিতে। কিন্তু এই কাইয়ূম সাহেবের সঙ্গেই আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল এর প্রায় আট বছর পর, ১৯৮০ সালে। তখন তিনি খুলনা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক। আর আমি সহকারী পরিচালক খুলনা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার।

যাক, সে আর এক কাহিনী।

সেদিন যশোরের সেই জনসভায় অনলবর্ষী বক্তা মওলানা ভাসানী সকলকে বিভেদ ভুলে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার ডাক দিলেন। বললেন, স্বাধীনতা-যুদ্ধকালে দেশের ভেতরে বা বাইরে যে যেখানেই থাকুক না কেন, স্বাধীনতা অর্জনে কারো অবদানকে খাটো করে দেখার মানসিকতা আমাদের বর্জন করতে হবে। এখন দলাদলি-হানাহানির সময় নয়। এখন একাত্ম হয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষে করার শপথ নিতে হবে। তিনি আরো বললেন, এজিদ-নমরুদদের, জালিম বংশধরদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মজলুমদের যে সংগ্রাম চলছে বাংলাদেশের জনগণ তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছে। আমরা যুদ্ধ চাই না—আমরা চাই সকলের বন্ধুত্ব, আমরা চাই শান্তি। এটা আমার ইসলামের শিক্ষা। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বললেন, অত্যাচারী কোনদিনও টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাস এর প্রমাণ। পরিশেষে জালিমদের তিনি সাবধান হওয়ার সতর্কবাণী জানিয়ে ভাষণ শেষ করলেন।

মওলানা ভাসানীর নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক জীবন, অনাবিল মানবপ্রীতি এবং নিখাদ দেশপ্রেম তাঁকে সর্বস্তরের মানুষের আপনজনে পরিণত করেছিল। ইতিপূর্বে অনেকের মত আমারও ধারণা ছিল তিনি একজন চীনাপন্থী কম্যু-নিস্ট। কিন্তু বক্তৃতার মাঝে কথায় কথায় ইসলামের শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেওয়ায় আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল সেদিন। অবশ্য তাঁকে কম্যুনিস্ট সাম্যবাদে বিশ্বাসী বলে বহুল প্রচার করেছিল পুঁজিপতিরা।

তদানীন্তন পাকিস্তানের শাসকগণ মওলানা ভাসানীকে অর্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি সব কিছুর প্রলোভন দেখিয়েও তাঁর মতবাদ হতে তাঁকে ইঞ্চি পরি-মাণও টলাতে পারেন নি। বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি রয়েছিলেন হিমালয়ের ন্যায় অটল। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তাঁরা তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে প্রচার করেছেন জনগণের কাছে। তাঁরা জানতেন কম্যুনিস্ট

www.pathagar.com

সম্বন্ধে ভীতি আছে জনগণের মনে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ চিনতেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা মওলানা ভাসানীকে। তাই তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের গণধিকৃত নেতাদের সে প্রচার—সে বিবৃতি।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বিরচিত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' পুস্তকখানি পড়ে মওলানা সাহেবের বাগ্মিতা, স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, মতবাদে অটলতা ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ফলে মনে মনে তাঁকে আমি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বইখানা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও আমি কিন্তু একদিনের জন্যেও বইখানি হাতছাড়া করি নি। সে বই আজও আমার নিজস্ব পাঠাগারের সম্পত্তি।

মওলানা ভাসানীর আমি একজন ভক্ত ছিলাম। তাই ১৯৮০ সালে স্থানীয় শ্রমিক নেতা ও প্রাক্তন এম. পি. জনাব আশরাফ হোসেন যখন মওলানা ভাসানীর স্মৃতি অক্ষয় রাখার মানসে খালিশপুরে 'মওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ' নামে একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন, তখন অন্য সকলের সঙ্গে আনন্দের সাথে আমিও সে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। সে স্কুলের কার্যকরী সংসদের আজো আমি একজন সদস্য। অত্যন্ত খুশীর খবর সে বিদ্যালয় হতে এবারই প্রথম কতিপয় ছাত্রী এস. এস. সি. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অমর হোক মওলানা ভাসানী, অমর হোক তাঁর স্মৃতিবাহক স্কুল 'মওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ'—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

www.pathagar.com

সৈয়দ ইরফানুল বারী

মওলানা ভাসানীর ঈদ

হিজরী ১৩৯০ অর্থাৎ ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারীতে যে ঈদুল আযহা গেল তার কথাই লিখছি।

সামাজিক ও ধর্মীয় অনেক অনুষ্ঠান মওলানা ভাসানীকে পালন করতে দেখেছি। প্রতিটিতে কিছু না কিছু থাকে যা সাধারণের জন্য অভাবিতপূর্ব। অনুষ্ঠানগুলোতে মওলানা সাহেব বরাবর বাড়ীতে থাকার চেষ্টা করেন। পরিজনমুরীদদের নিয়ে পালন করা কর্তব্য মনে করেন। সেবারের ঈদুল আযহায় মওলানা সাহেব সন্তোষে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও নাত-নাতনী কেউ ছিল না। তাঁরা পাঁচবিবিতে ছিলেন।

সখের গাভীগুলোর চাহিদা মেটানো থেকেই মওলানা সাহেব ঈদের প্রস্তুতি শুরু করেন। গাভীগুলো কোন ফর্দ পেশ করেছিল, তা নয়। কিন্তু ঈদের বিশেষত্ব থেকে বাড়ীর পালিত পশুকেও বঞ্চিত রাখা যাবে না— মওলানার ব্যক্তিগত মত তাই। সেদিনগুলোতে গরুর সবচেয়ে স্বাদের খাবার ছিল কাঁচা খেসারী কলাই। কাঁচা থাকতে অনেক কৃষক গোটা কলাই ফসল বিক্রি করে ফেলে। বেশ খোঁজাখুঁজি করে মওলানা সাহেব এমনি একটি ফসল খরিদ করেন। ঈদের আগের দিন বোঝাই করে সেগুলো বাড়ীতে আনা হয়। মজার ব্যাপার, সেদিন মওলানা সাহেব গরুগুলোকে কলাই খেতে দিলেন না। ঈদ উপলক্ষে আনা। তাই পরদিনের জন্যে রেখে দেয়া হয়। জনৈক মুরীদ আমাকে রস করে বলেছিলেন, "হুজুরের গরু হয়ে জন্ম নেয়াও ভাগ্যের কথা!"

অনুষ্ঠান বিশেষে প্রস্তুতি নেয়াটা মওলানা সাহেব বরাবরই পছন্দ করেন। তা সাদামাটা গোছের হতে পারে। কিন্তু তাতে কৃত্রিমতা থাকে না। ঈদের আগের দিনই ঠিক করে নিলেন, কি পরবেন। নাটোরের জনৈক মুরীদ একটি লুঙ্গি দিয়েছে। ঈদ উপলক্ষে তাই পরা যাবে। আর সবই পুরাতন।

www.pathagar.com

তাই ঘষামাজা দরকার। মুহম্মদ পাঞ্জাবী ও গেঞ্জি ধুয়ে দিল। বিশেষ যত্নের মধ্যে এতটুকু হলো। তারপর ইস্ত্রী নয়, বরং মওলানার নির্দেশে বালিশের নীচে ভাঁজ করে রাখা হলো। বিকেলে তাঁর চটি জুতায় কালি লাগিয়ে আনতে মুহম্মদকে টাঙ্গাইল পাঠালেন। সেগুলো পরদিন গোসলের পূর্ব পর্যন্ত পায়েই নিলেন না।

ঈদের ভোরে মওলানা সাহেবের পয়লা হুকুম হলো—গাভীগুলোকে গোসল দিয়ে আন। হোসেন আর নূরু ত্বরিতে তা সেরে ফেলল। তারপর ওগুলোকে তরতাজা কলাই খেতে দেয়া হলো। মওলানা সাহেবও সকাল সকাল গোসল করতে গেলেন। তোলা ঠাণ্ডা পানি ঢালতে ঢালতে বললেন, ঘরে বাসের সাবান আছে নাকি? মুহম্মদ বলল, না। আমার ছিল। নিয়ে গেলাম। বছরে দুই ঈদের দিনে মওলানা সাহেব গায়ে সাবান দিয়ে থাকেন। আর কোথাও কেউ যদি গায়ে পড়ে দিয়ে দেয় তো দেয়া হয়। গোসল সেরে মওলানা নতুন লুঙ্গিটা পরলেন। ভাঁজ ভেঙ্গে গেঞ্জী, পাঞ্জাবীও। এক রাতের জন্য তুলে রাখা চটি জুতাগুলো প্রাণ পেয়েছে বটে। মাথায় যখন টুপিটা চাপাতে যাবেন আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার বাসের তেলটা আনো না।' আমি আহ্লাদের সাথে তাঁর মাথায় সুগন্ধি তেল মেখে দিলাম। মুহম্মদ দিয়ে দিল আতর। মুশকিল বাধল সুরমা নিয়ে। কাগজের পুরিন্দায় সুরমা। ঘরে সুরমাদান কিংবা শলাকা নেই। মওলানা বললেন, 'পানের বটা দিয়ে দে।' আর বললেন, 'বটার আঁশগুলো উঠিয়ে নে।' ভেজা ভেজা বটায় সুরমা আটকায়। মুহম্মদ তাই করল। মওলানার চোখে সুরমা বেশ মানাল। আমি একটা আয়না ও চিরুণী তাঁর হতে দিলাম। সুন্দর করে তিনি সফেদ দাড়িগুলো আঁচড়িয়ে নিলেন।

কাগমারীর পীর শাহ জামানের মাযার প্রাঙ্গণে ঈদের জামাত হবে। ছোট্ট মাঠ। দশ গ্রামের মানুষ জমায়েত হয়। হাজির থাকলে মওলানা সাহেবই নামায পড়ান। যথাসময়ে এবারও তিনি পৌঁছে গেলেন। নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ দিলেন। বললেন, যারা মনে করে আল্লাহ আমাদের নিকট পশু কুরবানী যাঞ্চা করেন তারা ইসলামের কিছুই বুঝে নাই। অ.ল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমাদের খাহেশকে ত্যাগ করাই আসল কুরবানী। যারা ত্যাগী তারাই চরিত্রবান। সৃষ্টির কল্যাণে তাদের জীবন উৎসর্গই আল্লাহ্ মহাবিচারের দিন গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

নামায থেকে ফিরে এসে মওলানা সাহেব কুরবানীর হুকুম দিলেন। ময়মনসিংহের সৈয়দ শরফুদ্দীন হাবীব (মরহুম) একটি গরু পাঠিয়েছিলেন। মুরীদদের কেউ কেউ খাসী দিয়েছিলেন।

সব জবেহ হলো। মওলানা সাহেব কাউকে গোশ্‌ত দেন না। পাক সেরে সব একেবারে খাইয়ে দেন। মশ্‌লার অভাবে অনেক গরুর গোশ্‌ত বিক্রি করে দেয় অথবা কোন রকম সিদ্ধ করে খান। তাই মওলানা সাহেব খিচুড়ী ও গোশ্‌ত খাওয়ান। মওলানা সাহেবের বাড়ীতে একটা কুকুর থাকত। এক টুকরা ভাল গোশ্‌ত কুকুরটাকে তিনি নিজে খেতে দিলেন। বললেন, নাড়ি-ভুড়ি তো খাবেই। কিন্তু কুরবানীর গোশ্‌তের অংশ হিসাবে ওটা। দুপুরে হাজার হাজার লোকের জমায়েত। সবার হাতে কলাপাতা। দশে মিলে শিগ্‌গির পাক হয়ে গেল। বিকেলে গরু, খাসী যা পাক হয়েছিল সব খাওয়ানো হলো। আমরাও কিছু কিছু খেতে পেলাম বটে। রাতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য—মওলানা সাহেব ও আমরা ডাল ভর্তায় ভাত খেলাম। খেতে বসে মওলানা সাহেব মুহম্মদকে বললেন, 'একটা ভুল হয়ে গেল রে। বাবুর মার (স্ত্রী) জন্যে আমাদের কুরবানীর তরকারী তো রাখা হলো না।' তারপর নিজেই বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল নানান জায়গা থেকে তো তরকারী আসবেই।'

১৯৭২-এর ঈদুল আযহা এলো অনেক নতুনত্ব নিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ঈদ। মাত্র ক'দিন হয় মওলানা সাহেব ভারত থেকে ফিরেছেন। ঈদুল ফিতরে তিনি দিল্লীর শাহী মসজিদে সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত অবস্থায় নামায আদায় করেছেন। ঈদুল আযহায় আবার তিনি স্মৃতিময় সন্তোষে। স্ত্রী, মেয়ে ও নাত-নাতনী নিয়ে ঈদ করলেন। সেবারে অনেক ব্যতিক্রম। মওলানার মুরীদদের হালও খুব খারাপ। অতএব মওলানারও। সবই তো পুড়েই গেছে। ঘরে খাবার বাসনটি পর্যন্ত নেই। রাতের হ্যারিকেন নেই। বিছানাপত্তর নেই। একটি চৌকিও নেই। মেঝেতে খড় আর কাঁথা বিছিয়ে ভাসানী চরের মওলানার স্ত্রী, মেয়ে, নাত-নাতনী রাত গুজরান করছিলেন। টাঙ্গাইলের তদানীন্তন সিভিল সার্জনের তাকিদে মওলানা সাহেবের জন্যে একটি চৌকির ব্যবস্থা হয়েছিল। অভাবনীয় অনাড়ম্বরে মওলানা ভাসানীর বাড়ীতে সেবারের ঈদুল আযহা গেল। মওলানার পারিবারিক জীবনে অনেক রসঘন ঘটনা ঘটে থাকে। সে ঈদেও একটা ঘটল। ভুলবার নয় অন্তত ভাসানী-সন্ধানীর জন্যে।

www.pathagar.com

ঈদ উপলক্ষে কে একজন মওলানার কনিষ্ঠা নাতিনের জন্যে লাল মোজা কিনে দিয়েছিল। ঈদের দিন একটি মোজা পাওয়া গেল। আরেকটি পাওয়াই গেল না। মওলানা নিজে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। না, পাওয়া গেল না। সবাই আফসোস করলেন, নতুন মোজা। সেলু পরতে পারল না। সেলু কাঁদল। মওলানা অনেক বুঝিয়ে সামলে নিলেন। পরদিন সকাল বেলা। সেলু তার দাদার কাছে পয়সা চাইল। বিস্কুট খাবে। মওলানা সাহেব সস্নেহে পকেট থেকে ভাংতি পয়সার লাল একটি পুটলি বের করলেন। সেলু চেঁচিয়ে উঠল, এই তো আমার মোজা! সরোষে মওলানা সাহেবের স্ত্রী এগিয়ে এলেন। অপরাধীর স্বরে মওলানা বললেন, 'খেয়াল করিনি। পাঞ্জাবীর পকেট ছিদ্র হয়ে গেছে। কিন্তু মোজায় পয়সা তা ভেবেই দেখিনি।'

www.pathagar.com

ফয়জুর রহমান

একজন খাঁটি বাঙালীর প্রতিবিম্ব

বিদ্যাসাগর অংক শিখেছিলেন মাইল পোস্ট গুণে গুণে। আমার বাল্যশিক্ষা তথা বাংলা শেখার হাঁটি হাঁটি পা পা বোধ করি অমনি এক অদ্ভুত দৈব নিবন্ধনে ঘটেছিল। বর্ণ শিক্ষার পর পরই আমি আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠক হয়ে যাই, যদিও ভাষার গূঢ় অর্থ ও প্রকাশভঙ্গি দু'ই আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল। বানান করতে করতে পড়তাম বড় বড় টাইপে সাজানো জাপান, জার্মানী, রাশিয়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারত ছাড়, দাঙ্গা ইত্যাদি ভারী ভারী শব্দ। গুরুজনেরা অবশ্য আমার এই পত্রিকা পড়ার ইঁচড়ে পাকা প্রবণতা পছন্দ করতেন না, শুধু ব্যতিক্রম ছিলেন আমার আব্বা। যখনই সময় পেয়েছি ছোট অক্ষরগুলোর দিকেও তাকাতে চেষ্টা করেছি এবং সেখানেই প্রথম হোঁচট খেলাম, সেটা বোধ করি ৪২ সালের ঘটনা। আসাম প্রসঙ্গে স্যার ছাদুল্লার নামের পাশে একটি নাম—ভাসানী মওলানা। বালক মনে রেখাপাত করার মত নাম বটে, তাৎক্ষণিক ছান্দসিক প্রতিক্রিয়া ভাসানী, জাগানী, পরাণী ইত্যাদি। বুঝি বা হেসেছিলাম, আব্বাকে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন ঃ ইনি সাধারণ মওলানা নন, একজন জবরদস্ত রাজনৈতিক নেতা, ভাসান চরের নাম থেকে তাঁর নাম হয়েছে ভাসানী।

পরবর্তী সাত বছরে ঐ নাম বহুবার শুনেছি, পত্রিকায় দেখেছি, তবে আমার কল্পনায় আসাম তখনও অনেক দূরে, লাইন-প্রথা কি এবং কেন তা উপলব্ধি করার বয়স আমার তখন হয় নি। কিন্তু সেকালেও আমার পরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠ মহলে মওলানা ছিলেন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ৪২ থেকে ৪৭ সাল—বাঙালী মুসলমানের জীবনে আত্মস্থ হওয়ার সময়। তাই ৪৭ সালের ঘটনাপ্রবাহ বোধগম্য কারণে আমাদের মত কিশোরদেরকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু ১৪ই আগস্ট ৪৭-এর পর বাঁধভাঙ্গা নদী যেন শৈবালদামে বন্দী হলো। ৪৯-এর একদিন। আমরা তখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়

www.pathagar.com

শুনলাম মওলানা ভাসানী এবং কিছু তরুণ অনলবর্ষী বক্তা ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বিরোধী দলীয় প্রথম সভা করবেন। এই খবর তরুণদের ভেতর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, ফলে তৎকালীন সরকার পৌরসভা এলাকায় সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। অবশ্য মওলানা এসেছিলেন এবং পৌরসভা এলাকার বাইরে একটি ধানক্ষেতে বক্তৃতাও করেছিলেন। তাঁর সেদিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু আমার মনে নাই; তবে শুধু মনে পড়ে তার হুঙ্কার। '৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের মত আমিও নিজকে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মী হওয়ার সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করেছিলাম। নান্দাইল এবং দেবীদ্বার এই দুই অঞ্চলে আমি আমার সহপাঠীদের নিয়ে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত হই আর নান্দাইলেই খুব কাছ থেকে আবার শুনি এই অমিতচেতা সিংহপুরুষের হুঙ্কার। এরপর বহু জনসভায় মওলানাকে ভাষণ দিতে শুনেছি। যেমন শুনেছে বাঙলার সাধারণ মানুষ। এক কথায় মওলানার কাছে আমি ছিলাম একটি অপরিচিত যুবক। আজ যদি বলি জীবনে একবার ভিন্ন মওলানার সাথে আর কখনও আমার যথার্থ দেখা হয় নি, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? অথচ আমি তো তাঁকে চিনেছি বহুকাল ধরে, আর তিনিও আমাকে জেনেছেন অনেকদিন যাবত এবং সেটাই আমার সুখস্মৃতি।

১৯৭২ সালের মে মাসের দিকের ঘটনা। আমি তখন 'মুখপত্র' ও 'স্পোকসম্যান' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পদনায় ব্যস্ত। সে সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা নাই বা বললাম। ছোট একটি চিরকুট বয়ে নিয়ে এলেন মওলানা ভাসানীর পুত্র আবু নাসের। সাদামাটা কথায় মওলানা অনুমোদন করে আমার কার্যক্রম এবং পরিশেষে দোয়া করে দীর্ঘ স্বাক্ষর রেখেছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এ ছিল আমার জন্য আশাতীত পুরস্কার। ৭২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ৭৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত জেলে কাটানোর পর জেল থেকে বেরিয়ে গেলাম মওলানার দর্শন লাভ করতে সন্তোষ। এ যেন অতি পরিচিত জনের সংগে সাক্ষাত করার অপূর্ব পুলক। সন্তোষে প্রায় ১৮ ঘন্টাব্যাপী আমার অবস্থান এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা হয়ে আজো স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। কি পরম সমাদরে, কি অপূর্ব আন্তরিকতায় তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন এবং খাওয়ালেন, সন্ধ্যায় পুকুর পাড়ে তাঁর মুখোমুখি বসে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে করলাম অন্তরঙ্গ আলোচনা। এর মধ্যে আমার কনিষ্ঠতম সন্তানকে

www.pathagar.com

তিনি ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়ালেন। আমরা কি আলোচনা করেছিলাম, আমার চিন্তায় তাঁর কি প্রভাব পড়েছে এবং তিনি আমার কাছে কি প্রত্যাশা করেছিলেন তা প্রকাশ করা আমি সমীচীন মনে করি না। যে দুর্লভ সম্মান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, যে অপরিমেয় আস্থা তিনি আমার মনে সৃষ্টি করেছিলেন, সেসব আমার চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। জীবনের অধিকাংশ সময় আমি মওলানাকে দেখছি, দূর থেকে গিরিশৃঙ্গ নিরীক্ষণ করার মত। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা বক্তব্যে আমি সর্বদা একমতও ছিলাম না, তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যও আমার নেই। মওলানা আমাদের রাজনীতির তেপান্তরের মাঠে এক বিরাট বটবৃক্ষ। গ্রীষ্মের অলস মধ্যাহ্নে সেথায় বহু বিচিত্র বর্ণের পাখির ঘটেছে সমাবেশ। এদের কেউ কেউ সেই বটবৃক্ষের ফল খেয়েছে, তার শাখায় বসে শীতল হয়েছে, আবার কেউ কেউ মলত্যাগও করেছে। মহীরুহ নির্বিকার শতাব্দিব্যাপী কালের সাক্ষী হয়ে সে আমাদের দিয়েছে অনেক কিছু, নিয়েছে কি তা ভাবীকালের ইতিহাসবিদদের জন্য তোলা রইল। যমুনা পাড়ের মানুষ, আসামের জঙ্গলে লেলিয়ে দেয়া হাতী ও লাইন-প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষ, রাজ-নৈতিক অধিকার হারানো বাংলার জনগণ, বিপ্লবী জননায়ক হিসাবে, কৃষক আন্দোলনের হোতা হিসাবে, ধর্মগুরু হিসাবে, মুক্তবুদ্ধি প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব হিসাবে যুগ যুগ ধরে মওলানাকে স্মরণ করবে বলে প্রত্যাশা করি। মওলানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিল, যা ব্যবহৃত হতো রাজনীতির মূল সুর উদ্‌ঘাটনে। তাই তাঁকে দেখেছি মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে, আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে, ন্যাপ-এর নেতা হিসাবে, খোদাই খেদমদগার হিসাবে, বলতে ইচ্ছা করে একই অংগে এত রূপ। আসলে মওলানা ছিলেন যথার্থই গণমানুষের নেতা। কোন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা মতবাদের নেতা নন। মুসলমান তিনি অবশ্যই ছিলেন; কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাঙ্গালী যা বিধৃত হয়ে রয়েছে তাঁর অশনে বসনে, লুঙ্গী আর তালপাতার টুপিতে, মাটির শান্‌কিতে, ভাতের নৌকায় আর পীর-মুরীদির নিবিড় বন্ধনে।

www.pathagar.com

কামাল লোহানী

বিতর্কিত চরিত্র মওলানা ভাসানী

ভাসান চরের চ্যাগা মিয়া। জুতোর দোকানে কাজ করেন আর পানিতে ফুঁক দেন। মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে। মানুষেরই কানে কানে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। পানিপড়া নিয়ে মানুষ উপকার পায়। এতেই তাঁর আনন্দ, লোকে তাঁকে ভালবাসতে থাকে।

মাদ্রাসা পড়া পীরের সাথে বাগদাদ সফর ও শিক্ষা গ্রহণ এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ভাসান চরের চ্যাগা মিয়া অর্থাৎ আবদুল হামিদ খান ফিরে আসলেন দেশে। মন তাঁর অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতায় জ্যোতিষ্মান। প্রাণ তাঁর কেঁদে ওঠে মজলুমের জন্যে। জালিমের বিরুদ্ধে উচ্চকিত তাঁর কণ্ঠস্বর। জুলুমবাজ জমিদারের অত্যাচার রুখতে তিনি গরীব কৃষকের সংঘবদ্ধতার নিশানবরদার। হুংকারে তাঁর শত সহস্র সমুদ্রতরঙ্গের মিলিত বজ্রনিনাদ। বক্তৃতায় তাঁর আগুন ঝরে, মানুষমাত্রেই মন্ত্রমুগ্ধ।

সিরাজগঞ্জের ধানগড়ার এক অখ্যাত পল্লী একদিন জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেল। স্মরণীয় হয়ে ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় স্থান করে নিল। আর সেই চরের কৃষকদের আদরে পালিত সন্তান চ্যাগা মিয়া আবদুল হামিদ খাঁ হলেন মওলানা ভাসানী।

মওলানা ভাসানীর জীবন সুদীর্ঘ সংগ্রামে স্পন্দিত। তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করবার অপপ্রয়াস খুব একটা কম ঘটে নি। কেউ তাঁকে পুঁটি মাছের মত ভেজে খেয়ে ফেলতে চেয়েছেন, কেউ পরামর্শ দিয়েছেন রাজনীতি ছেড়ে দিতে। কেউ বা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করেছেন পল্টনী গলাবাজিতে।

পাঠক, আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। কেউ তাঁর লুঙ্গিও টেনে খুলে ফেলতে চেয়েছেন কাগজের পাতায় (যে কাগজ অবশ্য তাঁরই সৃষ্টি এবং ভেজে খেতে চাওয়া সেই রাজনীতিবিদ বাগ্মীও তাঁরই তৈরি নেতা)।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের আমলে এই বঙ্গে রাজনীতি করবার মত জায়গা যাকে করে দিয়েছিলেন, গণআন্দোলন গড়ে তুলে। তিনিও সেকালে রাষ্ট্রের শাসনশীর্ষে বসেও কোনদিন একাত্ম হতে পারেন নি ···এদেশের প্রগতিবাদী কিংবা বামপন্থী রাজনীতিকেরা যন্ত্রতন্ত্র ওঁকে ব্যবহার করতে গিয়ে বিবিধ স্বার্থে কাজ সেরে ফেলার পর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তাঁর শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাঁকে বার বার ত্যাগ করেছেন, বিব্রত করেছেন। আবার হালে পানি না পেয়ে তাঁরই কাছে ছুটে গিয়েছেন উদ্ধারের জন্যে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। মওলানা ভাসানী এদের সবাইকে কৃপার চোখে দেখেছেন। মদদ দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা হোক, সেটা চাই। তাই তিনি বারবারই রাজনীতি করতে গিয়ে তাদেরকেই টেনে তুলেছেন। কাছে জায়গা দিয়েছেন, রাজনীতির পাঠ শিখিয়েছেন। কিন্তু তারাই তাঁকে ভাঙিয়ে খেয়েছে. অথচ করতে পারে নি কোন কিছুই।

অথচ যে কোন সংকটকালে দেখেছি মওলানা ভাসানী ত্রাতা হিসেবে দেখা দিয়েছেন। বিপ্লবী থেকে শুরু করে প্রো-বামপন্থী সবাই আমরা তাঁকে সামনে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন দৃঢ়-বলিষ্ঠতার সাথে। কাউকে রেহাই দেন নি তিনি।

মওলানা ভাসানীই প্রথম পশ্চিম পাকিস্তানকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলেছিলেন। উপেক্ষিত অবহেলিত পূর্ব পাকিস্তানকে দোহন করে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পর্বতপ্রমাণ উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করার জন্য এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে বিক্ষুব্ধ বাংলা সেদিন গর্জে উঠেছিল পল্টনের বিশাল জনসমুদ্রে, প্রিয় নেতার বলিষ্ঠ কণ্ঠে। সফেদ পাঞ্জাবী পরা তাল পাতার টুপি মাথায় একজন অশিক্ষিত মানুষ সেদিন যে সিদ্ধান্ত অকপটে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন, সেই দিক-নির্দেশই একদিন সত্যে পরিণত হলো—দেশ বিতাড়িত করলো পশ্চিমা শোষকদের। মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পেলাম আমরা। কিন্তু যারা আজ স্বাধীনতার সার্বিক কৃতিত্ব দাবী করেন, তারাই সেদিন মওলানা ভাসানীকে গালমন্দ করেছিলেন সবচে বেশী। সত্তরের নির্বাচনকে উপেক্ষা করে যখন 'ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই' শ্লোগান উঠেছিল সেদিনের তেজগাঁ বিমান বন্দর কাঁপিয়ে, রাজপথকে প্রকম্পিত করে,

www.pathagar.com

কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেক সিং-এর কিষাণ সম্মেলনে ক্ষেত-খামার ও কলকারখানায় আগুন জ্বালিয়ে দেবার আহ্বান জানিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই সত্তরেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ জৌলুসকামী পরাঙ্মুখ রাজনীতিকেরা সেদিন মওলানা ভাসানী ও তাঁর দল ন্যাপকেও হঠকারী সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থান্বেষী, গণবিরোধী বলতেও দ্বিধা করেন নি।

একাত্তরের লড়াইতে এই মওলানা ভাসানীই কিন্তু ভারত সীমানায় প্রায় বন্দী জীবন যাপন করলেও এই শক্তিকেই সমর্থন করেছেন। তাদেরও এমন কোন নেতা তখন ছিলেন না, যিনি মওলানা ভাসানী কিংবা শেখ মুজিবের স্ট্যাচারে দাঁড়িয়ে অধিকৃত এলাকায় ধুকে ধুকে মরা বাঙ্গালীদের প্রতি এক আস্থার আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে পারেন। তখন তাঁকেই অর্থাৎ মওলানা ভাসানীকেই ব্যবহার করতে হলো। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রচার করা হলো মওলানা ভাসানীর রেকর্ড করা বক্তৃতা একাত্তরের জুন মাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। আবার আরো পরে মুজীব নগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধকালীন কাজকর্মে পরামর্শ দেয়ার জন্য সব দলের আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং), বাংলাদেশ কংগ্রেস ইত্যাদির প্রতিনিধি নিয়ে সর্বদলীয় পরামর্শ সভা গঠন করা হলো। সেখানে সম্মিলিত দলগুলোর সাথে আদর্শগত বিরোধ থাকলেও মওলানা ভাসানীকে তাঁরা বাদ দিতে পারলেন না সেদিন। তবে সৌভাগ্য তাদের, এর বৈঠক কোলকাতায় মাত্র একদিনই হয়েছিল—অজ্ঞাত কারণে আর কোনদিন এ সভা বসে নি। তবে অনুষ্ঠিত একমাত্র সভায় মওলানা ভাসানীই ছিলেন ডোমিনেটিং এবং সাড়ে তিন ঘন্টা বক্তৃতার পর বৈঠক শেষ হয়ে যায়, আবার মিলিত হবার আশ্বাস নিয়ে। যারা সেদিন ভারত ভূখণ্ডে পাত পেড়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ে জান কোরবান করে দিয়েছিলেন তারাই কিন্তু কাগমারী সম্মেলনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে তোরণ করায় মওলানাকে ভারতের দালাল আর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ও সিয়াটো সেন্টো চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে জননেতাকে রাশিয়ার দালাল বলতেও দ্বিধা করেন নি। এমন কি দেশ স্বাধীন হবার পর মনি সিংয়ের পার্টির আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসে প্রতিবেশীদের স্বগোত্র নেতা রাজেশ্বর রাও বাংলাদেশের নির্লোভ ও জনপ্রিয় এক মজলুম নেতার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

উক্তি করতেও দ্বিধা করেন নি। (অবশ্য এদেরই শীর্ষস্থানীয় নেতা এস. এ. ডাঙ্গে এক বিবৃতি দিয়ে কমরেড চারু মজুমদারকে হত্যার পর তাকে সাচ্চা কমিউনিস্ট বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, অথচ জীবদ্দশায় তাকেই এরা অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেছেন। এমন চরিত্রই প্রতিফলিত সর্বত্র ও সর্বকালে।)

যারা বামপন্থী এবং চীনের পথকে অনুসরণ করে রাজনীতি করেছিলেন, তাদের বিভক্তি দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ খণ্ডে ছিল। এঁরা কিন্তু সবাই এক সময় রাজনৈতিক কৌশলের কারণে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, গণতন্ত্রী দল, পূর্ববঙ্গ শান্তি কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত ছিলেন রাজনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে। এঁরা সকলেই মওলানা ভাসানীকে নিয়েও পলিটিক্স করেছেন অজস্র। এ গ্রুপ ছেড়েছেন তো অন্য গ্রুপ—যাঁরা ওৎ পেতে ছিলেন তারা তাকে ধরে ফেলেছেন। যারা ধরতে পারে নি তারা তখন মওলানাকে সমালোচনা করতে শুরু করেছেন এবং তার শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে তাকে এর ওর দালাল (এমন কি আয়ূব খাঁরও) বলে আখ্যায়িত করতে মার্কসবাদকে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য এরা সবাই মওলানাকে সিঁড়ি ধরেই রাজনীতি করেছেন নিশ্চিন্তে। শুধু কি রাজনীতি? বহু শীর্ষ-স্থানীয় নেতার পারিবারিক কলহও (এক আধজন সর্বোচ্চ শিখরেও উঠেছেন) মওলানার কাছে এসেছে এবং তিনি মিটিয়েও দিয়েছেন। এমন নেতাদের কেউ হয়ত নেই. কেউ বা আবার রাজনীতিতে নীরব। আরেক ধরনের আছেন যারা সুযোগসন্ধানী ; মওলানা ভাসানী নামটাকেই বেচে খেয়েছেন এবং খাচ্ছেন, তাঁর নামে নানান ধরনের সংগঠন গড়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে নতুনের সাথে পুরনো রাজনীতিকরা এককালে ভাসানী অনুসারীদের নিয়ে জমজমাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অথচ মওলানা ভাসানী সারাটা জীবন যাদের জন্য উৎসর্গ করে গেলেন সেইসব মানুষকে ফাঁকি দিয়ে আজ তারা সাত মহলার মালিক, সমাজের তারা মহাজন, তাঁর নাম ভাঙিয়ে টাকা তুলেছেন এমন ব্যক্তিও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বেশ একটা কেউকেটা হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়েছেন। এখন অনেকেই মওলানা ভাসানীকে বেচতে চাইছেন, যারা কোনদিন মওলানার আদর্শ বা তাঁর রাজনীতিতে কোনদিনই বিশ্বাস করে নি।

www.pathagar.com

একটি ঘটনা

বছরটা আমার ঠিক মনে নেই। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিশেষ অধিবেশন হতে যাচ্ছে টাঙ্গাইলে। আমরা তখন ক্রান্তি নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। রাজনীতি ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীকেই অনুসরণ করি, মোহাম্মদ তোয়াহা ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক। যুগ্ম এবং কিছু সময় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান। সুতরাং প্রাধান্য তাদেরই। জোগাড়-যন্ত্র করার দায়দায়িত্ব তাদের। 'কমিউনিস্ট'রা (মানে পিকিংপন্থী) আবার অন্তঃকলহে ব্যাপৃত। ফলে তারা ব্যস্ত সেই ঝামেলা নিয়ে। স্ট্রাটেজী ঠিক করছেন সম্মেলনের। ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী ন্যাপ কাউন্সিল অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে হুজুরের নির্দেশে। সুতরাং যেতেই হবে। কিন্তু সবচে বড় সমস্যা—যাবে কি করে? এতগুলো ছেলেমেয়েকে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা হবে? কথা হোল, ন্যাপ যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। আমরা আমাদের গণ-সংগীতের আসর, নাটক 'আলোর পথযাত্রী', নৃত্যনাট্য 'জ্বলছে আগুন ক্ষেতে ও খামারে' পরিবেশন করবো। তার জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্চ তৈরী, আলোক নিয়ন্ত্রণ ও শব্দ বিন্যাস ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দিলাম, কারণ এগুলো না হলে কিছুই হবে না। মানে অনুষ্ঠান করা যাবে না। সময় মতন সকাল বেলা সব ছেলেমেয়েরা জমায়েত হলো তোপখানা রোডের মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের টিন শেডের তলায়। কিন্তু বেলা গড়িয়ে যায় বাহনের কোন পাত্তা নেই। অবশেষে টেলিফোন করে ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের স্ত্রী মিসেস বিজয়া খানকে জানালাম এবং জানতে চাইলাম কি ব্যবস্থা হয়েছে। উনি কিছুই জানেন না। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। যেতে তো হবেই। কি করি? শেষ পর্যন্ত গুলিস্তানের পেছনের বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটা গাড়ী নব্বই টাকায় ঠিক করা হলো যে আমাদের নিয়ে যাবে এবং ফেরত আসতে হলে এই পরিমাণ টাকা দিতে হবে। তাই হলো। আমরা বেলা তিনটায় পৌঁছলাম টাঙ্গাইলে। পৌঁছে দেখি মঞ্চের কোন ব্যবস্থা নেই। নেই ছেলেমেয়েদের বসার কিংবা দাঁড়াবার জায়গা। এদিকে পেটে দানা পড়ে নি! এখানেও সম্ভবত কোন আয়োজন নেই। একজন এসে নিয়ে গেলো মেয়েদের, কোথায় যেন খাওয়াবে আর আমাদের জন্যে কোন এক হোটেলে ব্যবস্থা করা হলো। খাওয়া তো হলো। কিন্তু অনুষ্ঠানের কি হবে? সন্ধ্যে হয়ে আসছে। প্রতিনিধিরা জমায়েত হয়েছেন।

www.pathagar.com

লোকজন উপস্থিত হয়েছেন হাজারে হাজারে। কেউ কিছু বলতে পারছেন না। সহিদ ভাইকে (কোষাধ্যক্ষ সাইদুল হাসান) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। মতিন ভাই ও আলাউদ্দিন ভাই বললেন, 'এটাতো ঠিক নয়। আপনাদের ডেকে এনে কোন ব্যবস্থা না করাটা সত্যিই অন্যায়। মওলানা সাহেবকে বলুন।' (মতিন আলাউদ্দিন গ্রুপের সাথে তোয়াহা গোষ্ঠীর মতপার্থক্য ছিল এই সময়)। অনুষ্ঠানের ঘোষিত সময় এসে পড়তে আমি ক্রান্তির সম্পাদক হিসেবে মাইকে গেলাম এবং পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অনুষ্ঠান করতে না পারার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু এতে মওলানার পুত্র নাসের ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'আপনি কি পেয়েছেন? টাঙ্গাইলের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনি মওলানাকে এ্যাকিউজ করলে কি করে?' আমি বললাম, 'যাঁকে এ্যাকিউজ করলাম তাঁর কাছেই যাচ্ছি। সামনাসামনিই এ্যাকিউজ করবো। আপনি চলুন না।' 'ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রস্তাব করলাম ঃ চলো আমরা সবাই মিলে মওলানা সাহেবের কাছে যাই। বলি গিয়ে ন্যাপ নেতাদের অব্যবস্থার কথা।' সবাই হেঁটে গেলাম মওলানা ভাসানী যেখানে আছেন সেখানে। কোন এক সিনেমা হলের মালিকের বাসায় ছিলেন তিনি। ওহ্ সে কী ভিড়! আমরা এতোগুলো লোক ভেতরে ঢুকি কেমন করে? এই সব ভেবে বেশ খানিকটা জায়গা করে নিলাম। বরিশালের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আমাদের সবার স্যার, 'ক্রান্তির' অন্যতম সহ-সভাপতির নেতৃত্বে সবাই ঘিরে দাঁড়ালাম প্রিয় নেতাকে। আমার দিকে তাকিয়ে হুজুর বললেন, 'তোমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে, ক্ষমা করে দিও।'

এ কি কথা শুনি! আমরা ভেবেছিলাম আমার বক্তব্যে এবং নাসের ভাসানীর অভিযোগে হুজুর হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, কিন্তু এতো ভিন্ন সুর। তাছাড়া আমরাও যে ক্ষোভ নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তা নিমেষেই পানি হয়ে গেলো এবং বললাম, 'না না, হুজুর, আমাদের কোন কষ্ট হয় নি। আপনি তার জন্য ক্ষমা চাইবেন কেন? বরং আমরা অনুষ্ঠান করতে পারলাম না বলে যে বেয়াদবী করলাম সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

মওলানা ভাসানী বললেন, 'জনসাধারণের জন্য গান গাও, নাটক করো, মুকুন্দ দাস যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতো অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেমনি-ভাবে গ্রামে গ্রামে নেমে পড়।' তারপর আমরা যখন বিদায় চাইলাম

www.pathagar.com

তাঁর কাছ থেকে, তিনি তখন তাঁর ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে খুচরো যা পয়সা ছিল সব উজাড় করে স্যারের হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, 'এই পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েদের চা খাইয়ে দিও। আমি শুনছি এদের খাওয়া-দাওয়ারও অনেক অসুবিধা হবে।' এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব পৃথিবী জোড়া যাঁর নাম, এন্যুরিন বিভানের মত বৃটিশ যাঁকে আগুনখেকো অর্থাৎ অনলবর্ষী বলে আখ্যায়িত করেছে, এই কি সেই মওলানা ভাসানী? অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে যাঁর শিরা-উপশিরা টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে, যাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে আগুন ঝরে শত্রুর বিরুদ্ধে—এই কি সেই বাগ্মী, সেই অগ্নিঝরা অননুকরণীয় বক্তা! এমন সরলও হতে পারেন তিনি! আমাদের সবাই কিন্তু নিজেদের রাগ নিয়ে তাঁর কাছে আসার ব্যাপারে ঔদ্ধত্যের কথা ভেবে লজ্জায় তখন মাটির সাথে মিশে গেছেন।

আরেকটি ঘটনা

১৯৫৪ সালের মার্চে আমি তখন পাবনা জেলে। পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রতিদিনই যুক্তফ্রন্টের জয়ের খবর আসছে, আর প্রতিদিনই আমাদের খাওয়ার জন্য জেল গেটে আসছে নানা ব্যঞ্জন। একের পর এক মুসলিম লীগের ভরাডুবির খবর আসছে। আমরা খুশীতে বাগ্ বাগ্। ওদিকে যুক্তফ্রন্টের অসামান্য সাফল্যে সারা পূর্ব বাংলায় ২৬শে মার্চ 'শুকরিয়া দিবস' পালিত হলো। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো এক বিরাট জনসভা। সভায় মওলানা সাহেবকে উপহার দেয়া হলো কুরআন শরীফ, রূপোর তলোয়ার এবং চামড়ার একটি চাবুক। চাবুকটি দেওয়ার সময় জনসভায় বিপুল করতালি এবং হর্ষধ্বনি শোনা যায়। সেদিনের সভায় মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'এ জয় কোন ব্যক্তির নয়, এ জয় দেশবাসীর, সাড়ে সাতকোটি মানুষের, আপনারা জানবেন, এ জয় ভাসানীর বা হক সাহেবের নয়।' আর যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেরে বাংলা বলেন, '২১ দফা পালন না করলে আপনারা তো ছাড়বেন না। তাছাড়া মওলানা সাহেবের চাবুক তো রইলোই আপনাদের হাতে।'

আরও একটি ঘটনা

শোনা যায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সম্পর্ক পিতাপুত্রের মত ছিল। মওলানার অপত্য স্নেহ দেখেছি তাঁর জন্য আর শেখ মুজিবের

www.pathagar.com

দেখেছি মওলানার জন্যে কি অগাধ শ্রদ্ধা! শুনেছি শেখ যত বড়ই হোন না কেন, মওলানার খবর ব্যক্তিগতভাবে রাখতেন, অসুখে বিসুখে ফলের ঝুড়ি পাঠাতেন। মাঝে মধ্যে লুঙ্গি পাঞ্জাবীও এ তালিকার বাইরে থাকতো না। এমন কি মওলানা সম্পর্কে কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন কটূক্তি করলে তাকে শেখ ধমকাতেন। বলতেন, 'মওলানা সাহেবকে তোরা কি বুঝবি?' একবার পুরনো গণভবনে কোরবান আলীকে তো আমার এবং ফয়েজ ভাইয়ের (সাংবাদিক ফয়েজ আহম্মদ) সামনে দারুণভাবে ধমকেই দিলেন। বললেন, 'মওলানা সাহেব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবি না। ওটা আমার সাবজেক্ট। উনি কি বলেন, তাঁকে কিভাবে ঠিক করতে হবে, ওটা আমি জানি।' অবশ্য রাজনৈতিক পর্যায়ে তিনি নিজে এবং তাঁর দলের চুনোপুটিরাও মওলানা ভাসানীকে প্রকাশ্যে জনসভায় কিংবা বিবৃতি দিয়ে যা-তাভাবে আক্রমণ করেছেন।

একবার আমার মনে আছে, আমি তখন বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক। আর সংবাদ বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্বে সাইফুল বারী। মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকা ফিরেছি ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১। শেখ মুজিব ফিরে এলেন ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২। মানুষের ভিড় দেখেছি কিন্তু এমন দেখিনি কখনো। পাকিস্তানী জল্লাদ শাসকদের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লণ্ডন ও দিল্লী হয়ে শেখ মুজিব দেশে ফিরে আসলেন। সে কি অভূতপূর্ব দৃশ্য! বিমান বন্দরে কত শত আয়োজন, ভারতীয় মিত্রবাহিনী সম্পূর্ণ রানওয়ে খালি করে রেখেছেন নিরাপত্তার কারণে। বাংলাদেশ বেতার থেকে আমরা তাঁর শুভাগমনের বিজয়বার্তা প্রচার করে দিলাম ধারাবিবরণী দিয়ে। দেশবাসীও উৎসুক, জগতবাসীকে জানিয়ে দিলাম জল্লাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নেতা ফিরে এসেছেন স্বাধীন বাংলাদেশে। আমাদের পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতার দেবদুলাল, দিল্লী থেকে আসা সুরজিৎ সেন এবং যশদেব শিং যথাক্রমে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে ধারাবিবরণী প্রচার করলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লড়াইয়ের পুরোধা বীর সেনানী, এমন কি একাত্তরেও যিনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণে থেকে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে মানুষকে সাহস জুগিয়েছেন, যুদ্ধ চলাকালে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবকে যিনি অসময়োচিত বলে প্রত্যাখ্যান করে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশকে স্বাধীন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই মওলানা ভাসানী কবে দেশে ফিরে এলেন তা দেশবাসী জানতো না।

www.pathagar.com

খবরের কাগজে যেদিন সংবাদ প্রচারিত হলো সন্তোষ থেকে সেদিন আমরা ভাবলাম মজলুম জননেতা ফিরে এসেছেন।

সেদিন টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান ছিলো। আমরা বেতার থেকে গিয়েছিলাম, ফিরতে বেশ রাত হয়েছে। ফিরে এসেই আমি ডিউটি রুমে বসে কাজ পর্যবেক্ষণ করছি। এমন সময় পিয়ন সুলেমান এসে খবর দিলো গণভবন থেকে টেলিফোন এসেছে। আমাকে চাইছেন, ছুটে গেলাম। রিসিভার তুলে নিতেই সম্ভবত মি. রোজারিও বললেন, 'ধরুন, শেখ সাহেব কথা বলবেন।' ইতিমধ্যেই গুরু গম্ভীর গলার ঝাঁঝালো শব্দ ছুটে আসতে শুরু করেছে, 'কি পাইছেন আপনারা? একটা মানুষ কেবল দ্যাশে ফিরা আইলো হে কি না কি, না ভাইবাই না জাইনাই আপনারা রেডিওতে যা খুশী তাই লিখতে পড়তে শুরু কইরা দিছেন। উনিই দ্যাশটা স্বাধীন করছেন নাহ্। এই সব বন্ধ করেন। আগে বুইঝা দেহি, উনার মনে কি আছে না আছে, ব্যবহার ক্যামন করেন, তারপর পাবলিলিটি দেয়ার কথা ঠিক করা যাইবো।'

আমি একেবারে থ'। কৈ আমার প্রোগ্রামের কোথাও তো অনুচ্চারিত নামের ব্যক্তিটি সম্পর্কে কোন উল্লাস প্রকাশ করা হয়নি। তখন সাহসে বুক বেঁধে বললাম, 'লীডার, আপনার কওয়া শেষ হইছে? এইবার কন ঘটনাটা কি? আমার তো এমন কোন ঘটনা জানা নাই।'

'আপনি জানেন না তো রেডিওতে যায় কেমনে?'

'কোথায় গ্যাছে কি গ্যাছে, আপনি বলেন খোঁজ নিয়া দেখি।'

'খবরে কেমন কইরা মওলানা সাহেব সম্পর্কে ঐ রকম একটা জিনিস গেলো? আপনি এইগুলা দ্যাহেন না? আপনারা পাইছেনটা কি?'

'না, এইটা আমার ব্যাপার না, এটা আমাদের বারী দেখে।'

'বারীর নম্বর কত? তুই কাল দেখা করিস।'

ঘটনাটা আর কিছুই নয়, সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এম. আসলাম। তিনি বেতারে নিয়মিত নিউজ কমেন্ট্রি লিখতে শুরু করেছেন এবং মওলানা ভাসানী ফিরে আসার সংবাদকে উপলক্ষ করে একটি কমেন্ট্রি লিখেছেন। তাতে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মওলানার ভূমিকার কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং ১৯৭০ সালের

www.pathagar.com

ডিসেম্বরে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলার ঘোষণা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেছিলেন বলেই এত ল্যাঠা!

শেষ উল্লেখ্য ঘটনা

মওলানা ভাসানীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁরই দলের একজন ব্যবসায়ী সদস্য গোলাম কবীর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত অনিয়মিত দৈনিক বঙ্গবার্তা কিনে ঢাকায় নিয়ে এলেন। ধুমধাড়াক্কার সাথে এর প্রকাশনার ব্যবস্থা করলেন। টঙ্গীর প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কাজী জাফর তখন ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক। তিনি আত্মগোপন করে আছেন। অবশ্য ঢাকা শহরের মাঝ দিয়েই তিনি দিনে-দুপুরে চলাফেরা করেন। গাড়ী চড়ে খবরের কাগজ মুখের সামনে মেলে রাখেন সব সময়। তিনি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও দলের লোক জোগাড় করে দিচ্ছেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং কর্মঠ হিসেবে স্বনামখ্যাত অনেককেই নিয়ে এসে জমায়েত করা হলো, শুধু প্রফেশনাল লোকজন এতে নেয়া হলো না। ফয়েজ আহমদ হলেন প্রধান সম্পাদক আর আমি বার্তা-সম্পাদক। সংবাদ বিভাগে প্রায় সবাই নতুন দু'একজন ছাড়া। যুগ্ম সম্পাদক হাসানুজ্জামান খান, সম্পাদকীয়তে নূরুল হুদা কাদের বক্স, সহকারী হলেন আনোয়ার হোসেন (সদ্য চীন প্রত্যাগত)। প্রেস ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী আহমদ নজীর। প্রেসের কম্পোজ হতো নিজেদের প্রেসে, রাতে সব ফর্মা রিক্সা করে চলে যেতো ইত্তেফাকে। শেষ সংবাদ দিতাম আমরা রাত ৮টা থেকে সাড়ে আটটায় যখন অন্যদের কাজ শুরু হতো। যাহোক রাত আড়াইটার মধ্যে যে করেই হোক যতটাই হোক ছাপা শেষ করতে হতো। আমাদের সে কারণে অবশ্য যদি কেউ জিজ্ঞেসও করেন কত এই পত্রিকার সার্কুলেশন ছিল, বলতে পারবো না। যা ছাপা হতো, থাকতো না একটাও, পত্রিকাটি খুবই পরিচ্ছন্ন ছিল। এর প্রকাশ ছিল ধূমকেতুর মতন। উজ্জ্বল ছিল রূপে, বলিষ্ঠ ছিল প্রকাশে। তাই সমাদৃত হয়েছিল পাঠকমহলে। আমরাও স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করতে পেরেছিলাম। খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন বাদ দেয়া অথবা শালীনতাবিরোধী যে কোন বিজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ও স্বাধীনতা আমাদের ছিল।

একদিন ঠিক করা হলো ঃ মওলানা ভাসানীর জন্মদিন উপলক্ষে এই পত্রিকায় একটি বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে। ফয়েজ ভাই ও আমি যাবো

www.pathagar.com

সন্তোষে মওলানার ইন্টারভিউ আনতে। রশিদকে নিয়ে যাবো এমন দুর্লভ চরিত্রের ঐতিহাসিক পুরুষটির কীর্তি আর কর্মকাণ্ড আমাদের আলোকচিত্র-মালার গ্রন্থনাকে সমুজ্জ্বল করতে।

এত কথার অবতারণার পর, তিনি যে কত সরল ও মহৎ ছিলেন তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। অনেকে হয়ত হঠকারী মনে করতে পারেন আমার আচরণে। কিন্তু ভাসানীর মত ব্যক্তিত্বের এমন চমকপ্রদ সরল সহজ মহানুভবতা কারও চরিত্রে দেখা গেছে বলে আমি জানি না কোন সংকীর্ণতা যাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি।

যথারীতি আমি ও ফয়েজ ভাই ফটোগ্রাফার রশীদকে নিয়ে একটা টেপ রেকর্ডার হাতে নিয়ে সকাল সকাল পৌঁছলাম সন্তোষ। মনুর গাড়ীতেই বোধ হয় গেছিলাম। হুজুর তখনও নিজের অবিন্যস্ত শোয়ার ঘরে বসেই দেখা করেছেন। আমরা যেতে বললেন, 'তোমরা আসছ। বইসো। নাস্তা কর।' বলেই এক হাতে লুঙ্গিটা ধরে ঘরের কোণে রাখা একটা মিটসেফ থেকে ছোট্ট হাঁড়িতে রাখা মণ্ডা আর কাগজে পেচানো পাউরুটি এনে দিলেন তাঁর বসে থাকা চৌকির উপর। হুজুরকে বললাম আমাদের কথা। এরপর বেরিয়ে গেলাম ছবি তোলার কাজে। ফিরে এসে রেকর্ডার নিয়ে আমরা ঘরের সামনে উঠোনটায় বসলাম তাঁর ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য। শুরু করার আগে অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করা হলো। ফয়েজ ভাই প্রশ্ন করলেন, 'হুজুর, আপনার জন্মদিনটা কবে যদি কন তাহলে আমরা একটা সাপ্লিমেন্ট বাইর করতে চাইতাছি।'

ঘটনাটা হলো : নব্বইয়ের উপরে তাঁর বয়স। তাছাড়া কেউই এসবের ঠিকুজি রাখেন নি। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যাবার পর আবদুল হামিদকে বহু দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছে জীবন সংগ্রামে। তাই জৌলুসভরা জীবন যাদের তাদের মত বার্থডে'র ডেটটা তাঁর বা অন্য কারও মনে নেই। কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার মত কোন কপটতা কৃত্রিমতা তাঁর ছিল না বলেই তিনি এমন একটা মহৎ উচ্চারণ করতে পারলেন। তাইতো এত বড় বিশাল ব্যক্তিত্বকে কোন সংকীর্ণতা স্পর্শ করতে পারে নি। সে কারণেই তাঁর মত বিরাট রাজনৈতিক পুরুষ এমন কথাও সরলভাবে বলতে পারতেন। এ তাঁর মহত্ত্বের পরিচয়।

www.pathagar.com

নিপীড়িত মানুষের জন্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় যে অগ্নিপুরুষ সংগ্রামের প্রজ্বলিত মশাল হাতে ছুটে বেড়িয়েছেন, সরল মন নিয়ে সাধারণ প্রাণশীর্ণ কৃষকের জীর্ণ কুটিরে পৌঁছেছেন, সেই মজলুম জননেতা আজ ছ'বছর নেই ; কিন্তু প্রতিদিন অনুভব করি তিনি নেই।

তিনি অন্যায়কে রুখে দাঁড়াতেন। সামনে এগুনোর সাহস দিতেন। আমরা তো দেখেছি দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যখন চক্রান্ত চলছে, রাজনীতিবিদরা সাহস পাচ্ছেন না। ভাবছেন কি করবেন। গুঞ্জন তুলেছেন, দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ বলছেন না কিছুই। এমনি সময় একদিন একটি কণ্ঠ শোনা গেল সমুদ্র-গর্জনে সুদূর সন্তোষ থেকে সেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ঢাকায় দেখলাম মহাবিপ্লবী, পাতি বিপ্লবী, ভাসানীবিরোধী সব মহাশয়েরা স্বস্তির সাথে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচলাম।' তবুও বললেন না, 'চলুন ভাসানীর এই হুঁশিয়ারিতে আমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাই সাহসে বুক বাঁধি। সবাই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক হই।'

সমালোচনা করা সহজ। সাহস করা দুরূহ। মওলানা ছিলেন সাহসের উৎস। তিনি চলে গেছেন। তাঁকে নিয়ে লেখার, হাজারো দিনের কাহিনী রচনার আছে। অনেক কিছুই রূপকথার মতই শোনাবে। তবে সাংবাদিক হিসেবে আমার একটি কথাই মনে হয়েছে : এমন একজন চলে গেছেন যাঁর কাছে গেলে যে কোন সাংবাদিক একটি খবর তৈরী করতে পারতেন। তিনি ছিলেন সংবাদের অপরিমিত উৎস।

মওলানা ভাসানী তাই অমর। নিপীড়িত মানুষের বুকে তাঁর অক্ষয় আসন পাতা।

www.pathagar.com

ফজল এ-খোদা

পুরুষোত্তম মওলানা ভাসানী

'খামোশ'। সাহসা যেন বোম ফাটলো। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সভাস্থল। হাজার হাজার মানুষ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই! কিছুক্ষণের জন্য টুঁ শব্দটি কেউ করল না। মনে হোল প্রাণহীন কতগুলো পুতুল যেন গায়ে গায়ে ঠেসে রাখা আছে! মানুষের গলা দিয়ে যে এমন আওয়াজ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। মাইকের তখন তেমন বহুল প্রচলন হয় নি। শত শত চোঙা নিয়ে লোকে প্রচার করছে ঃ 'নৌকা মার্কা বাক্সে—ভোট দিন।'

১৯৫৪ সাল। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফন্টের সময়। আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র। জিন্নাহ-লিয়াকতের নামই শুধু আমরা জানি। তাঁরাই পাকিস্তানের বড় নেতা। তাঁদের কখনো চোখে দেখি নি। বইতে শুধু ছবি দেখেছি। আর বয়স্কদের কাছে শুনেছি তাঁদের সম্পর্কে নানা গল্প-কাহিনী। তাই ভাবতাম তাঁরাই যখন নেই তখন দেশের বড় দুর্দিন। কিন্তু না। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে দেখে সেই কৈশোরকালেই আমার প্রত্যয় জন্মেছিল বাংলাদেশেও এমন সাহসী ও শক্তিশালী মানুষ আছে। যাঁর এক আওয়াজে হাজার হাজার লোক নীরব হয়ে যেতে পারে। পরনে সাদা লুঙ্গী, গায়ে ঢিলেঢালা সাদা পাঞ্জাবী, মাথায় তালের আঁশের গোল টুপি, সৌম্য এক দরবেশের মত মুখভর্তি সাদা দাড়ি। যেন কেশর ফোলানো এক বিশালকায় সিংহ। সিংহই বটে! আওয়াজ তো নয়—সিংহের গর্জন!

প্রায় এক মাস আগে থেকেই প্রচার হয়ে গেল ভাসানী সাহেব আসছেন। বেড়া থানা জুড়ে যেন সাজ সাজ পড়ে গেল! পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ক্ষেতে-নৌকায়, চায়ের দোকানে, তহশীল-কাচারীতে, স্কুলে-মাদ্রাসায় সবদিকে সবখানে একই কথা ভাসানী। ভাসানী আর ভাসানী। ভাসানী নামে যাদু যেন সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভাসানী সাহেবকে নিয়ে কত যে গল্প তার ইয়ত্তা নেই! যে-ই ভাসানী সম্পর্কে কিছু বলতে পারে

www.pathagar.com

তারই কদর বেড়ে যায়। তাকে চা-পান-বিড়ি-সিগ্রেট খাইয়ে ভাসানী সাহেবের কথা শুনতে চায় লোকে। বক্তাও নানা রকম গল্প ফেঁদে নানা ভঙ্গীতে নানা কথা বলে যায় অবলীলাক্রমে। এই আমরা যারা বিদ্যালয়ের ছাত্র তারা কিন্তু কেউই ভাসানী সাহেবের নাম আগে কখনো শুনি নি। বড়দের মুখে কিম্বা শিক্ষকদের কাছেও শোনার সৌভাগ্য হয় নি আমাদের। কিন্তু কিছুদিন হলো বিশেষ করে হাটের দিনে যখন ভোটের মিছিল বের হতে শুরু করেছে সেই তখন থেকেই শুনছি ঃ হক-ভাসানীর নৌকা মার্কা বাক্সে ভোট দিন, ভোট দিন। শুনে শুনে আমরা ভাবতাম হক-ভাসানী আবার কি ? হক-ভাসানী এ আবার কি রকম নাম ? আর তাছাড়া ভোটের ব্যাপারটিও আমাদের জ্ঞানের অগম্য ছিল। আজকে যেমন প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাও জানে ভোট জিনিষটা কি—সেই সময়ে কিন্তু বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্ররাও ভালো করে জানতো না, ভোট কাকে বলে ? বিদ্যালয়ের টিনের বেড়ায়, হাট-বাজারের ঘরের বেড়ায়, তহশীল-কাচারীর—বিশেষ করে সার্কেল অফিসারের ও দলিল রেজিস্ট্রি অফিসের বেড়া ও দেয়ালে নৌকা ও হ্যারিক্যানের ছবি ছাপানো বড় বড় কাগজ লাগানো হয়েছে। অনেক পরে জেনেছি এগুলোকে পোস্টার বলে। এমনি একটি নৌকার ছবিসম্বলিত পোস্টার থানার দেয়ালে লাগানোর অপরাধে একজন কলেজের ছেলেকে এ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমরা দল বেঁধে দেখতে গেলাম কি এমন কাগজ লাগানো হয়েছে বলে কলেজের ছাত্রকে পুলিশ এ্যারেস্ট করতে পারে ? তখন কলেজের ছাত্রদের প্রতি আমাদের ভীষণ সম্মানবোধ ছিল। আমরা মনে করতাম কলেজের ছাত্র মানেই জ্ঞানী ও উচ্চ শিক্ষিত। তারা কখনো কোন ভুল করতে পারে না। কেননা কোন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লে কিম্বা কোন শিক্ষক দীর্ঘদিনের জন্য ছুটিতে থাকলে আমরা দেখতাম ঐ শিক্ষকের কলেজে পড়া কোন ছেলে বা কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কিম্বা কোন প্রিয় ছাত্র সেই শিক্ষকের বদলে আমাদের ক্লাস নিতেন। স্বভাবতই ধারণা করা হতো যারা বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র তারাই কেবল কলেজে পড়তে পারে। আর কিনা সেই কলেজের ছাত্রকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে ! থানার ভেতরে যাবার সাহস তখনো আমাদের হয় নি। তাছাড়া আমরা জানতাম সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছাড়া কোন ভালো বা ভদ্রলোক কখনো থানায় যায় না। তাই আমরাও থানার কাঁটাতারঘেরা এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম থানার দেয়ালে

www.pathagar.com

দেয়ালে হ্যারিক্যানের ছবিওয়ালা বড় বড় কাগজগুলো টাঙানো আছে। এই হ্যারিক্যানের ছবি যে টাঙিয়েছে তাকে ধরা হয় নি; যে নৌকামার্কা কাগজ লাগাতে গিয়েছিল তাকেই শুধু ধরা হয়েছে এবং নৌকার ছবিগুলো সব ছেঁড়াফাঁড়া। নৌকার ছবিগুলো এমনভাবে আঁটা হয়েছিল যে, সম্পূর্ণ তুলে ফেলার চেষ্টা করলেও কিছু কিছু তখনও দেয়ালে রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, নৌকার ছবি একটিতেও নেই! যত আক্রোশ যেন ঐ নৌকা মার্কার প্রতি। যেটি ছেঁড়া যায় নি বা তোলা যায় নি সেই নৌকার ছবিতে গোবর লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সেই দিন বিকেলেই জানতে পারলাম পোস্টার লাগানো কলেজের ছাত্রটিকে যদি ছেড়ে দেওয়া না হয় থানা আক্রমণ করা হবে এবং শহর থেকে দলে দলে কলেজের ছাত্ররা আসছে। তারা একজোট হয়ে থানা ঘেরাও করবে এবং ছেলেটিকে যে-ভাবেই হোক থানা থেকে মুক্ত করে আনবে। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যেও দেখলাম ভীষণ উত্তেজনা। রটে গেল ভাসানী সাহেবের এক বিশ্বস্ত শিষ্য নাকালিয়া জয়নগরের আবদুল আউয়াল সাহেবকে পাঠানো হচ্ছে এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার জন্য। পরের দিন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রনেতা সম্ভবত জয়নুল আবেদীন সাহেব এলেন আমাদের বেড়া বিপিন বিহারী উচ্চ-বিদ্যালয়ে। তাঁর সঙ্গে আরো ক'জন কলেজের ছাত্র। ক্লাসে ক্লাসে সাড়া পড়ে গেল। আমাদের শিক্ষক ও বেড়া সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আবদুল বাতেন সাহেব ক্লাসে ক্লাসে এসে জানালেন, 'পাবনা কলেজের ছাত্র তোমাদের এক বড় ভাই তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তোমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।' আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্ররা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসলাম এবং বাইরে স্কুলের খোলা আঙিনায় দাঁড়িয়ে গেলাম। এই প্রথম আমরা বেড়ার ছাত্ররা ভালো-ভাবে জানতে পারলাম শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। এঁরা সবাই দেশের ভালোর জন্য কাজ করছেন। সুতরাং তাঁদের কথা আমাদের সবাইকে মানতে হবে। আরো জানলাম এই নৌকা হচ্ছে আমাদের প্রাণের প্রতীক। এই প্রতীকের সম্মান আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। এই প্রতীকের জন্য আমাদের ভাইকে যারা জেলে আটকে রেখেছে তারা আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু। আমাদেরকে সব শেষে বলা হলো, আমরা ছোট, আমাদেরকে এখন কিছুই করতে হবে না, শুধু পড়াশুনায় মনোযোগী হতে হবে, দেশকে

www.pathagar.com

এবং দেশের মানুষকে জানার চেষ্টা করতে হবে। আর বড় ভাই-বাপ-চাচাদেরকে বুঝাতে হবে সামনের এই নির্বাচনের সঙ্গে আমাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত। সবাইকে হক-ভাসানীর নৌকা মার্কা বাক্সে ভোট দেবার কথা বলতে হবে। বেড়া স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হলো। সবাইকে আহ্বান জানানো হয়েছিল ভাসানী সাহেবের মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য। ঐদিন বিকেলেই আমরা জানতে পারলাম আটকে রাখা সেই কলেজের ছেলেটিকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং থানার দেয়ালে যত হ্যারিক্যান মার্কা পোস্টার ছিল সবই তুলে ফেলা হয়েছে, আর লাগানো হয়েছে নৌকা মার্কা পোস্টার।

এই ছাত্র আটকের কথাই ভাসানী সাহেব বক্তৃতায় বলছিলেন। এই সময় সভার এক কোণে চেয়ার টেবিলে বসে থানার দারোগা সাহেব খাতাতে কি যেন টুকে নিচ্ছিলেন। বক্তৃতার মাঝখানে দারোগা সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন। আর অমনি বজ্র আওয়াজ হলো, 'খামোশ!' শয়তানের বাচ্চা শয়তান। পাঞ্জাবী-ইংরেজের পা চাটার দল। চাবুক মেরে তোদের পাছার ছাল তুলে নেয়া হবে। সাপের পাঁচ পা দেখেছিস্। ঘুঘু দেখেছিস, ফাঁদ দেখিস নি। তোরা আমাদের সোনার ছেলেদেরকে ঢাকার রাজপথে পশু-পাখীর মত গুলী করে হত্যা করেছিস। তাদের অপরাধ—তারা তাদের মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার চেয়েছিল। তোরা কোন্ ভাষায় কথা বলিস? বেজন্মার দল। তোরা কোন্ জমিদার-নবাবের বাচ্চা? তোদের মনে রখো উচিত এই কিষাণ, মজুর মুটেরাই হচ্ছে তোদের মালিক। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ট্যাক্সেই তোদের ছেলেমেয়ে-পরিবারের পেটে ভাত যায়। খুনী নূরুল আমিন তোদের বাবা নয়। তোদের আসল বাপ-মা হচ্ছে এই নেংটিপরা খেটে খাওয়া মানুষেরা যারা না খেয়ে তোদের মুখে অন্ন তুলে দেয়। হুঁশিয়ার! এখনো সময় আছে। মানুষের বন্ধু হয়ে যা, মানুষের সেবক হ। এখনো হুঁশ হয় না? যখন এই না-খাওয়া মানুষেরা একজোট হয়ে গায়ের চামড়া তুলে নেবে তখন আল্লাহ্র নাম নেওয়ারও সময় পাবি না বলে দিচ্ছি। চাকর হয়ে জন্মেছিস, চাকর হয়েই থাক। মালিক হওয়ার চেষ্টা করিস না। ভালো হবে না।' এই সময় মানুষের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। ভাসানী সাহেব হুকুম দিলেই তারা দারোগা-পুলিশের চামড়া এই মুহূর্তেই তুলে নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় ক'জন নেতৃস্থানীয় মুরুব্বীরা দারোগা-পুলিশদেরকে সভা

www.pathagar.com

থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সভা চলাকালীন এমন কি সভা শেষ হওয়ার পরেও দারোগা-পুলিশকে আর দেখা যায় নি। এছাড়া এ দিনের পর থেকে পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে পুলিশকে কেউ দেখে নি। কেবলমাত্র ভোটের দিনে ভোট কেন্দ্রে পুলিশের নির্দিষ্ট উপস্থিতি ছিল তাও নামমাত্র। তাদের কোন ভূমিকাই ছিল না বলা চলে। কাঠের পুতুলের মত এক ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিল তারা। পুলিশকেও যে চাবুক মারা যেতে পারে এ কথা এর আগে আমাদের বয়সীরা কেউ কখনো শোনে নি। আমাদের যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে পুলিশ হচ্ছে চাক্ষুষ জল্লাদের মত। ওরা ইচ্ছে করলে যে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে পেটাতে পারে। ভাসানী সাহেবের কথাতেই এই প্রথম বুঝলাম দারোগা-পুলিশেরা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য, হুকুম করার জন্য নয়। তারা আমাদেরই চাকরি করে। শান্তিপ্রিয়দের শান্তি নিশ্চিত করাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব। কাউকে পেটাবার জন্য বা গুলী করার জন্য তাদেরকে রাখা হয় নি। সেদিনের পর থেকে পুলিশ সম্পর্কে ধারণাই আমাদের সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

ভাসানী সাহেব আরো বললেন, 'বাংলার মানুষ! তোমরা শুধু মা'র হজম করতে জানো; রুখে দাঁড়াতে জানো না। তোমরা অধিকার আদায় করতে জানো না। এবার অধিকার আদায় করতে জানতে হবে। এবার শোষক শয়তানদের বুঝিয়ে দিতে হবে তোমরাও জাগতে পারো, তোমরাও এক জোট হতে পারো। আল্লাহ্র দুনিয়ায় সবারি বাঁচার অধিকার আছে। কেউ খাবে আর কেউ না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে—এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না।' এই সময় সভার এক দিক থেকে শ্লোগান উঠলো—কেউ খাবে, কেউ খাবে না—তা হবে না, তা হবে না। 'কে বলে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই কি স্বাধীন দেশ? বৃটিশ আমলে যে মানুষের গায়ে লুঙ্গী-গামছা-গেঞ্জি ছিল আজ তার পরনে নেংটি। কেন? আগে শাসক ছিল ইংরেজ, এখন শাসক হয়ে বসেছে পশ্চিমা পাঞ্জাবী। এদেশ আমাদের। আমাদের দেশ আমরা শাসন করব। দেড় হাজার মাইল দূর থেকে কেউ রক্তচক্ষু দেখাবে আর আমরা সেলাম জাঁহাপনা বলব তা হতে পারবে না। আমার কৃষক পাটের দাম পায় না। কেন পায় না? আমার দেশের পাট নিয়ে ইংরেজ ডাণ্ডি ম্যানচেস্টার বানিয়েছে। আর পাঞ্জাবীরা সেই পাট দিয়ে করাচি বানাচ্ছে। আমরা পাট জন্মাব, নেংটি পরতে পরতে ন্যাংটা হয়ে যাব আর তারা কোট, টাই-স্যুট পরে নতুন ইংরাজ হয়ে আমাদের ওপর চাবুক ঘুরাবে? না। সে

www.pathagar.com

স্বপ্ন সফল হবে না, রক্তচোষার দল ! বলে, মুসলমান ভাই ভাই। মানি, আমিও মানি দুনিয়ার মুসলমান ভাই ভাই। কিন্তু বাংলার মুসলমান ভাইরা চাকরি পায় না কেন ? বাংলার মুসলমানেরা কয়জন সেনা বিভাগে আছে ? আমরা মুসলমান। আল্লাহ্-রাসূলের খোলাফায়ে রাশেদীন আমাদের আদর্শ। তবে আমরা সংখ্যায় বেশী হয়েও আমাদের পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই কেন ? কি দোষ করেছি আমরা ? আমাদের পেটে ভাত নেই আর খুনী নূরুল আমিন, মুসলিম লীগের পাতি পাণ্ডা নূরুল আমিন ঢাকায় শ্বেতপাথরের দালান বানাচ্ছে। শাদ্দাদের বেহেস্ত বানাবার স্বপ্ন দেখছে। আবার ভোট চায়। কিসের ভোট ? এবার বুঝিয়ে দেবো বাংলার মাটিতে মীরজাফরদের স্থান নেই। বলে, বাংলার মানুষ যুদ্ধ করতে জানে না, বাঙালীরা অলস। শুধু বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করলেই যোদ্ধা হয় ? যারা সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত ক্ষেতে-খামারে ফসল ফলায়, কলেকারখানায় উৎপাদন করে তারা কি যোদ্ধা নয় ? যারা খরা, বন্যা, ঝড়-তুফান, মহামারী, ক্ষুধাকে প্রতিদিন মোকাবেলা করে বেঁচে থাকে তারাই প্রকৃত যোদ্ধা। সেনা বিভাগে বাঙালীদের চাকরি হয় না। তারা নাকি অলস ? আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তোদের স্বর্ণসূতা পাট কারা জন্মায় ? যে পাট থেকে তোরা কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছিস বাংলার মাটি থেকে ? বিশ্বাস-ঘাতক মীরজাফরের দল ! শয়তানেরা সুযোগ পেলেই ধূর্ত শিয়ালের মত ধুয়া তুলবে, ইসলাম গেল ইসলাম গেল ! ওরা নাকি খাঁটি মুসলমান ? কিসের মুসলমান ? মদের গন্ধে যাদের কাছে যাওয়া যায় না তারা আবার মুসলমান ! সকাল সন্ধ্যা মদ খেয়ে যারা আল্লাহ-রাসূলের নাম মুখে আনে তারা যদি পাক্কা মুসলমান হয় তাহলে অবিশ্বাসী কারা ? ওরা মুসলমান নামধারী জানোয়ার ! গজব পড়বে। ওদের ওপর আল্লাহ্র গজব নাজেল হবে। আমি বলে দিচ্ছি সেদিনের আর বেশী দেরী নেই। বাংলার মুসলমানরাই হচ্ছে আসলে পাক্কা ঈমানদার মুসলমান, যারা আল্লাহ্-রাসূলের নাম নিতে অজু করে, পাক-সাফ হয়, যারা আল্লাহ্কে ভয় পায়, আল্লাহ্র-রাসূলের হুকুম মত কাজ করে, সেই ঈমানদার বাঙালী মুসলানরা হচ্ছে তোদের কাছে কাফের। বেজন্মার দল, তোরা আবার সেই কাফেরদের কাছেই ভোট চাস ? সেই কাফেররাই তোদের এবার 'সঙ্গেছার' করবে। ভোটের পাথর দিয়েই তোদেরকে জ্যান্ত দাফন করবে। তোদের এবার নিস্তার নাই !'

www.pathagar.com

আরো অনেক কথা বলেছিলেন। সে সব কথা এই এত বছর পরে মনে করে লিপিবদ্ধ করা সত্যি অসাধ্য। আর এইটুকু শুধু মনে পড়ছে ভাসানী সাহেব তাঁর সেদিনের সেই বক্তৃতার শেষের দিকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে ডেকে এনেছো। তোমরা ডাকলেই আমরা আসি। শরীর ভালো নেই তবু এসেছি। তোমরা আজ আমার কাছে ওয়াদা করবে তোমরা সবাই এবার নৌকা মার্কা বাক্‌সে ভোট দেবে। আমি গদি চাই না। আমি চাই গরীব মজুরেরা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে পাক, মোটা কাপড় পরতে পারুক; আমি এইসব মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই। এদেশের মানুষ যদি নাই খেতে পায়, যদি নাই পরতে পায় তবে কিসের স্বাধীনতা, কিসের রাজনীতি? ওয়াদা করো নৌকা মার্কায় ভোট দেবে কিনা?' 'দেব দেব' বলে সভায় উপস্থিত সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো। আর সভাস্থল মুহুর্মুহু মুখরিত হলো—মওলানা ভাসানী, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ শ্লোগানে। মনে আছে এই সভায় আরো অনেকের সাথে যুক্তফ্রন্টের নেত্রী সেলিনা বানুও বক্তৃতা করেছিলেন। ভাসানী সাহেবের সঙ্গে আসা একজন ভোটের প্রচারণামূলক দুটি গানও গেয়েছিলেন। তাঁর নাম আর মনে নেই। গানের কলি ছিল— 'শোন বেড়াবাসীরে, মুসলিম লীগের পাণ্ডারে আর ভোট দিও না।'

ভাসানী সাহেব রাত যাপনের জন্য উঠেছিলেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নেতা আবদুল বাতেন সাহেবের বাড়ীতে। আমার বাড়ীর কাছেই বাতেন সাহেবের বাড়ী। পরের দিন সকাল বেলা আবার ভাসানী সাহেবকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি এত সকালেই শত শত লোক এখানে ওখানে ভীড় করে আছে। গ্রামের অনেক মেয়েরাও এসেছে। মেয়েরা ভাসানী সাহেবকে এক নজর দেখতে চায়। বেড়া আমার নানীর দেশ। সেই সুবাদে বেড়া অঞ্চলের প্রায় সবাই বয়স্ক হলে আমার নানা, না হ'লে আমার মামা। আর মেয়েরাও তাই, হয় নানী, নইলে খালা। তাই বাতেন মামার কাছে আবদার করলাম ভাসানী সাহেবের কাছে যাব। ভাসানী সাহেবের তখনও সকালের নাস্তা হয় নি। বাতেন মামা কি যেন চিন্তা করে বললেন, 'হ্যাঁ, হুজুর ছোটদেরকে খুব পছন্দ করেন। ঠিক আছে, এই জগ আর গ্লাসটা ধর। চল।' আমি গ্লাস-জগ নিয়ে বাতেন মামার পিছু পিছু ভাসানী সাহেবের বিছানার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বাতেন মামা বললেন, 'হুজুর! এ আমার এক ভাগ্নে। কবিতা লেখে।' ভাসানী সাহেব সেই তাঁর দরাজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলে, তোমার নাম কি?' আমি আমার নাম বলতেই

www.pathagar.com

বললেন, 'বাঃ বেশ নাম তো! তোমার বাবা-মা তো তোমার নামটি বড় সুন্দর রেখেছেন। তুমি কবিতা লেখো? কি কবিতা লেখো? কাকের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং!' ভাসানী সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলছেন—এই ভেবে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ! কি উত্তর দেবো? সম্ভবত ভয়ও করছিল। তিনিই আবার বললেন, 'ভালো ভালো কবিতা লিখবে। নজরুলের মত কবিতা লিখবে।' তারপর তিনি খেতে লেগে গেলেন। আমি কিন্তু আর দাঁড়াই নি। এক ফাঁকে চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ী চলে এসেছিলাম। পরে বন্ধুদের কাছে গর্ব করে বলতাম, 'আমি ভাসানী সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাকে নজরুলের মত কবিতা লিখতে বলেছেন।' কিন্তু আল্লাহ্‌তা'আলা আমাকে সে ক্ষমতা দেন নি যে, নজরুলের মত কবিতা লিখি। কি দুর্ভাগ্য আজ পর্যন্ত একটি লেখাও নজরুলের মত লিখতে পারলাম না!

এর কিছুদিন পরেই দারুণভাবে রটে গেল কুরআন শরীফের মধ্যে ভাসানী সাহেবের দাড়ি পাওয়া গেছে। কে পেয়েছে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু হাটে, বাজারে, গাঙের ঘাটে, কুয়ো তলায় সবখানে একই আলোচনা—কুরআন শরীফে ভাসানী সাহেবের দাড়ি। চারদিকে ভীষণ উত্তেজনা। কুরআন শরীফ খুলে দেখার হিড়িক পড়ে গেল। যে কুরআন শরীফ দাদার আমল থেকে তাকে বা সিন্দুকে তোলা আছে তাও এই রটনায় ঝাড়া-পোছা হয়ে গেল। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল অমুকের বাবা মুন্‌শী সাহেব কুরআনের মধ্যে দাড়ি পেয়েছেন। ব্যাস, আর কথা নেই! বুড়ী-ছুঁড়ি-জোয়ান-শিশু-বুড়ো সবাই ছুটলো সেই বাড়ীতে। সেই সৌম্যমূর্তি মুন্‌শী সাহেবের মুখেও বেশ বড় বড় সাদা চাপ দাড়ি। তিনি সবাইকে বলে বলে উত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেছেন যে, তিনি সত্যি সত্যি কুরআন শরীফে এক গাছা দাড়ি পেয়েছেন। কুরআন শরীফ পড়তে কখন দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আঙুলের সাথে মুন্‌শী সাহেবের নিজেরই এক গাছা দাড়ি উঠে গিয়ে পাতা ওল্টাবার সময় কুরআনের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল হয়তো বা। তবু যখন দাড়ি, তখন ওটা ভাসানী সাহেবেরই দাড়ি, ঐ পিচেট মুন্‌শীর দাড়ি ওটা কিছুতেই হতে পারে না; যে ছেলের কনে দেখতে গিয়ে নিজেই সে মেয়ে বিয়ে করে আনতে পারে তার মত লোকের দাড়ি কুরআন শরীফের মধ্যে থাকে—এটা অসম্ভব। সুতরাং কুরআন শরীফের মধ্যে

www.pathagar.com

পাওয়া দাড়ি গাছা ভাসানী সাহেবেরই। ভাসানী সাহেবের মত বুযুর্গ-পরহেজগার লোকের দাড়ি কুরআন শরীফের মধ্যে আসা বিচিত্র নয়। এ সবই আল্লাহর কুদরতী!

দাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটি মিটে যেতে না যেতেই কিছুদিনের মধ্যে একইভাবে রটে গেলে চাঁদের মধ্যে ভাসানী সাহেবকে শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে কোলাকুলি করতে দেখা গেছে। এবারও সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি। সর্বত্র গোয়ালে, ঢেঁকিশালে, দোকানে, কাছারীতে একই কথা ভাসানী-হক সাহেবের কোলাকুলির ছবি চাঁদের মধ্যে। আদিকাল থেকেই চাঁদের মধ্যে কালো কালো যে দাগ আছে তাই দেখে আমরা নানা ছবি, নানা দৃশ্য কল্পনা করে আসছি—কখনো চাঁদের বুড়ী চড়কা কাটছে, কখনো চাঁদে জ্বীন-পরীদের ঘর-দরোজার দৃশ্যও দেখা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে চাঁদের ঐ কালো দাগ দেখে আমরা নানা রকম দৃশ্য কল্পনা করে গল্প ফাঁদতে ভালোবাসি। হয়তো বা কোন কল্পনাবিলাসী এ রকম একটি গল্প রটিয়ে দিয়ে মজা দেখছে। আর আমরাও সেই কল্পনাকে মনে রেখে চাঁদের কালো দাগ দেখে দেখে ভাসানী-হক সাহেবের কোলাকুলিই বোধে নিয়ে সেভাবেই ভাবছি। দু-একজন চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হলো। চ্যালেঞ্জ করে কেউ কেউ জিতেও গেল। চাঁদের মধ্যে ঐ কালো দাগগুলো দেখে ভেবে নিতে পারলেই হলো। তাহলেই হয়ে গেল।

আমাদের ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সহজেই বিশ্বাস করেছিল চাঁদের মধ্যে হক-ভাসানীকে কোলাকুলি করতে দেখা গেছে। কেননা তাঁরা যেমন ঈমানদার তেমনি ইসলামের খিদমতগার ও মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তাই আল্লাহ্‌তা'আলা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বিশেষ করে অবিশ্বাসীদেরকে হিদায়েতের জন্য এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও দয়ালু। তাঁর অসীম শক্তিতে সন্দেহ পোষণ করা মানেই কুফরী। এমন অকাট্য যুক্তির কাছে মুসলিম লীগের সৎ ও ধার্মিক কর্মীরাও এই অলৌকিক প্রচারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। হক-ভাসানীর বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই সরাসরি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধচারণ করা। হক-ভাসানী আল্লাহ্‌র খাস বান্দা হিসেবে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে তখন দারুণ জনপ্রিয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা অর্থাৎ হক-ভাসানীর অনুসারীরা কেউই নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়েন না।

www.pathagar.com

আর মুসলিম লীগের কর্মীরা যেমন নামাযী তেমনি করে পাকিস্তানে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের কর্মীরা ঐ সময় যখনই যেখানে হ্যারিক্যানের পক্ষে সভা কিম্বা ক্যানভাস বা প্রচার করতে গেছে, তারাই জনতা কর্তৃক রামধোলাই হয়ে কেউ হাসপাতালে নীত হয়েছে, কেউ মাথায় মুখে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে অর্থাৎ হক-ভাসানীর বিরুদ্ধে কোন উচ্চারণ করা মানেই বেদাতি বা বেসরা কাজ। অবশ্য নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে চাঁদ সংক্রান্ত ব্যাপারে আর কেউ কোন উচ্চ-বাচ্য করে নি। তবে এখনো কোন চায়ের দোকানে বা চাঁদনী রাতে বাড়ীর আঙিনায় গল্পের আসর বসলে ঐ সব কথা নিয়ে গল্প দারুণভাবে জমে যায়।

১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সাধারণ নির্বাচন দিয়েছেন। তখনো তিনি ফিল্ড মার্শাল হয়ে বসেন নি। সম্মিলিত বিরোধী দল ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় সারা দেশ সয়লাব হয়ে গেছে। আমি তখন ভিলেজ এইড কার্যক্রমের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান এডাল্ট এডুকেশনে কাজ করি। একদিন দেখলাম ভাসানী সাহেব আইয়ুব প্রশাসনের বিরুদ্ধে পল্টনে বক্তৃতা করছেন। তিনি বলছেন, 'সামরিক জান্তার এই অভিনব ভাওতা অর্থাৎ এই নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নির্বাচন আমরা মানি না। সামরিক জান্তার অধীনে কোন নির্বাচন হতে পারে না। নির্বাচন যদি হতেই হয় তবে প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে। নির্বাচনে নামতে হলে সামরিক উর্দি ছাড়তে হবে। নির্বাচনের নামে পূর্ব পাকিস্তানকে আর শোষণ করা চলবে না। সিন্ধু নদীর পানি সমস্যার ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে রফা করা যায়। তখন কাশ্মীর নামের কুমীরের বাচ্চা দেখাবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভারত যে গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে সে ব্যাপারে আইয়ুব শাহী নীরব কেন? আমরা ফারাক্কার কথা বললেই কাশ্মীরে হামলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম বিপন্ন হয়। এই ধোঁকাবাজি আর কতদিন চলবে? বাংলার মানুষ সব বোঝে। বাংলার বাঙালী মুসলমানেরা মূর্খ হলেও অজ্ঞ নয়। আমরাও গঙ্গার ভাটিতে পদ্মায় বাঁধ চাই। পদ্মায় বাঁধ দিয়ে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে পানি জমা রেখে

www.pathagar.com

শুকনো মৌসুমে তা ব্যবহার করতে হবে। তখন বলবে অত টাকা নেই! কিন্তু মংলা বাঁধের টাকা কোথা থেকে আসে? পূর্ব পাকিস্তানের পাটের শত শত কোটি টাকা কোথায় যায়? আইয়ুব, তুমি শুনে রাখো, দরকার হলে তোমার গলায় গামছা দিয়ে পদ্মা বাঁধের টাকা আদায় করা হবে। ভারত যদি ফারাক্কা বাঁধ বন্ধ না করে তা'হলে পদ্মায় বাঁধ দিতেই হবে। না হলে আইয়ুব তোমার পাকিস্তানকে সালাম আলেকুম। তোমার পথ তুমি দেখো, আমাদের পথ আমরাই খুঁজে নেব। তুমি ভেবো না আল্লাহ্‌র বড় তুমি। আল্লাহ্‌র গজব কেউ ঠেকাতে পারে নি, তুমিও পারবে না। ইস্কান্দার মীর্জাকে বন্দুকের গুতোয় দেশ থেকে তাড়িয়ে ভেবেছো তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে? না—তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দেশ চলবে না; দেশের না-খাওয়া মানুষের ইচ্ছায় দেশ চালাতে হবে। এই সব ভুখা-নাঙা কোটি কোটি মানুষের জন্যেই এই দেশ। তুমি ও তোমার দোসর বিশ পরিবারের জন্য এই দেশ নয়। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় জালিমের কোন স্থান নাই।'

১৯৬৫ সাল। সবে পাক-ভারত যুদ্ধ শেষ হয়েছে। একদিন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে (মিউজিক কলেজ) কথায় কথায় শরমিনের কাছে জানলাম ভাসানী সাহেব এখন ঢাকায় এবং তাদের বাসায় আছেন। আমি ভাসানী সাহেবকে দেখতে যেতে চাই শুনে সে বললো, 'ভাসানী সাহেব অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্যে ঢাকা এসেছেন।' আমার আগ্রহ দেখে বললো, 'ঠিক আছে, আপনি সকালের দিকে আমাদের বাসায় আসুন; কত লোকই তো আসছে! ওনার যতই অসুখ হোক কাউকেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মা অবশ্য প্রথম প্রথম তাঁর বিশ্রামের কথা চিন্তা করে কিছুটা কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরে দেখলেন কন্ট্রোল করলেও যা, না করলেও তাই। তাই এখন আর কাউকেই নিষেধ করেন না। লোকে তাদের হুজুরের কাছে আসবেই।' শরমিন হাসান তখন মিউজিক একাডেমীর নাচের ক্লাসের একজন ছাত্রী। ভালো নাচতে পারতো মেয়েটি। শরমিনের মা ফরিদা হাসান একজন অত্যন্ত পরিচিত সমাজসেবী মহিলা। এছাড়া তিনি ঢাকার চারু-কারু শিল্পের একজন অত্যন্ত গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষিকা। সেই সুবাদে আমার ব্যক্তিগত শিল্পী বন্ধু গোলাম সারোয়ারের মাধ্যমে ফরিদা হাসানের সঙ্গে পরিচয়। ফরিদা হাসান যেমন রুচিবতী মহিলা তেমনি অতিথি-পরায়ণ ও বন্ধুপ্রিয়। এ কারণেই তাঁর বাসায় গিয়ে ভাসানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কোন সঙ্কোচ হলো না।

www.pathagar.com

সেদিন সম্ভবত রোববার, ছুটির দিন ছিল। ফরিদা হাসানের বাসা তখন নিউ ইস্কাটনের নেভী অফিসের পেছনে। লোকজনের আনাগোনা দেখেই বুঝতে অসুবিধা হলো না এখানেই ভাসানী সাহেব আছেন। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলাম। কেউ কিছু বললো না। ঘরভর্তি লোক। সবাই চুপচাপ। আমি নিঃশব্দে এক কোণে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাসানী সাহেব কথা বলছেন। তিনি বলছেন, 'ইসলাম একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি। যুগ ও কালের চাহিদা অনুসারে ইসলামই পথ নির্দেশ দিতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা কম্যুনিজম কথাটা শুনলেই ভয় পায়। কম্যুনিজম তো কমন পিপলের কমন ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছার কথাতো পৃথিবীতে ইসলামই প্রথম বলেছে। কার্ল মার্কস ও লেনিন কোথা থেকে এসেছে? ইসলাম পৃথিবীতে এসেছিল বলেই কার্ল মার্কস ও লেনিনের জন্ম। মাও সেতুং যা বলছে সেই একই কথা। কমন পিপলের কল্যাণ। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সেখানে মানুষে মানুষে, নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তির গায়ের জোরে, ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, খেয়াল-খুশীমত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে না। সমষ্টির মতামতই শেষ কথা। আমি এজন্যেই ইসলামী কম্যুনিজমের কথা বলি। কম্যুনিজম বললে এখন সাধারণ লোকে বোঝে। তারা মনে করে কম্যুনিজম হলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের শোষক শাসক-গোষ্ঠী কম্যুনিজমকে ভয় পায়। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে কম্যুনিজমকে বিকৃতভাবে প্রচার করে। তারা বলে, কম্যুনিজম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তরায়। কম্যুনিজম ব্যক্তি মতামতের কোন মূল্য দেয় না। কিন্তু আমি বলি, প্রত্যেক মানুষ যদি পেট পুরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, অসুখে চিকিৎসা পায়, সহজেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় তাহলে কথা বলার প্রয়োজন কি? মানুষের মৌলিক চাহিদা যদি মিটে যায় তবে তার অসন্তোষ প্রকাশের সুযোগ কোথায়? এবং একজন মানুষ খেয়ে বাঁচতে পারলেই সে তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'য়ালার কথা ভাববার অবকাশ পাবে। পরকালের কাজেও উদ্যোগী হবে। আর যদি একজন মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে, এক ফালি কাপড় বিনে উলঙ্গ থাকে, শিক্ষা লাভের সুযোগ না পায় তাহলে তার মধ্যে ভালো-মন্দ বিচার আসবে কি করে? এজন্যেই আগে ভাত চাই এবং এটাই হলো আমার

www.pathagar.com

ইসলামী কম্যুনিজম। আমরা মুসলমান এবং খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ-রাসুলকে আমরা ভয় করি। কিন্তু যারা আল্লাহ্-রাসূলের হুকুমকে থোরাই কেয়ার করছে তাদের বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ। এই জেহাদ মানুষের বাঁচা-মরার জেহাদ। এই মানুষকে—যাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে সেই ক্ষমতা অনুযায়ীই পরস্পরের কল্যাণে ব্রতী হতে হবে। যে কোন শাসককেই আমরা মেনে নিতে পারি যদি ঐ শাসক ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টির স্বার্থে আইন করে, পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কেউ শাসক হয়ে বসলেই সে তার প্রভুত্ব ফলাতেই বেশী ব্যস্ত। কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করে বসে। কেননা প্রচলিত নিয়মে সেই শাসকের হুকুম তামিল করার জন্য থাকে অস্ত্রধারী এক বিরাট ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনী। শাসকের সন্তুষ্টির জন্য সেই অস্ত্রধারীরা কথায় কথায় সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়, অগণিত মানুষকে অসহায় করে তাদের দাপট বজায় রাখতে চায়। এই বর্তমান বিশ্বে সেই শাসক কিন্তু বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। অত্যাচারিত মানুষ একদিন একজোট হয়ে সেই শাসকের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই আন্দোলন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের নেতৃত্বের তেমন প্রয়োজন হয় না। তবু নিয়ম অনুসারেই সেই আন্দোলনের মধ্যে একজন নেতা হিসেবে চিহ্নিত হয় যায় এবং তাদেরকেই জনদরদী বলে মনে হয়। আর সরল সোজা গণমানুষ তাকেই পরবর্তিতে নেতা বলে মেনে নেয়। শাসক বদল হয়। শাসকের চরিত্র তাতে এতটুকু বদলায় না। এই নতুন শাসকও সেই পূর্ববর্তী শাসকের ট্রেডিশনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। কেননা শাসনের পদ্ধতির তো পরিবর্তন হয় না। সেই আমলা, সেই সেনাবাহিনী, সেই পুঁজিপতি এবং তাদের কার্যপদ্ধতি সেই একই রকমই থেকে যায়। তাই কোন ব্যক্তির পরিবর্তনে সাধারণ মানুষের জন্য কোন বিপ্লব সাধিত হয় না। আগে চাই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন। যে শাসন ব্যবস্থা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ বয়ে আনবে, যে ব্যবস্থায় কেউ ইচ্ছে করলেই কাউকে শোষণ করতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি, সেই পরিবর্তন ইসলামী শাসন পদ্ধতিতেই একমাত্র সম্ভব। কাউকে গবেষণা করে সেই ইসলামী শাসন-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে না। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন-ব্যবস্থা আমরা সহজেই চালু করতে পারি। আর এটাই আমার ইসলামী কম্যুনিজম।'

www.pathagar.com

এমন সময় বাড়ীর কর্ত্রী ফরিদা হাসান এসে বললেন, 'হুজুর, আপনার গোছলের সময় হয়ে গেছে।' হুজুরও বললেন, 'হ্যাঁ, তাইতো! কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। আর আমার শরীরটাও আজকাল কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। ঠিক আছে তোমরা এখন যাও।'

এখন আর ব্যক্তিগতভাবে হুজুরের সঙ্গে কোন কথা ঠিক হবে না ভেবে আমিও সবার সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পথে আসতে আসতে ভাবলাম এত সব কঠিন কথাগুলো ভাসানী সাহেব কি সহজ করে বলতে পারেন। আমার মনে হলো ওঁর কাছে গেলে বই-পুস্তক না পড়েও অনেক কিছু শেখা যায়, অনেক কিছু জানা যায়। এমন একজন মানুষকে কাছে থেকে দেখার এবং সামনে বসে তাঁর কথা শোনার সৌভাগ্যে নিজেকে খুব গর্বিত মনে হতে লাগলো। ভাবলাম, ভাসানী সাহেবকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনার সৌভাগ্য এমন করে ক'জনার ভাগ্যে ঘটে! কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমি আমার যোগ্যতা ও অবস্থার কথা ভুলে গেলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমিও ভাসানী সাহেবের একজন শিষ্য, অনুসারী।

১৯৬৯ সাল। তারিখটা মনে নেই। তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তথা-কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রের নামে শেখ মুজিবর রহমানসহ আরো অনেক বাঙালীদের বিচারের প্রহসন চলছে। প্রতিদিনই খবরের কাগজে আগরতলা মামলার বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। কতিপয় বাঙালী বিশ্বাসঘাতক-গাদ্দার এই মিথ্যে সাজানো মামলার সাক্ষী হিসেবে পেতেও আইয়ুব খানের অসুবিধা হয় নি। এই বিচার চলার সময়েই পশুরা পাক-বাহিনী সার্জেন্ট জহরুল হককে সেলের মধ্যেই গুলী করে হত্যা করে। কিন্তু আইয়ুব খানের তথ্য বিভাগের দোসররা প্রকৃত ঘটনা চেপে গিয়ে বেতার টেলিভিশনে রটিয়ে দিল আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালাতে গিয়ে কারারক্ষীদের গুলীতে নিহত হয়েছে। কিন্তু জহরুল হক হত্যার প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ স্থানীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলো আড়ম্বরে ছেপে দিল। বিচারের রায় না হতেই যারা একজন মামলার আসামীকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করতে পারে তারা যে এমনি করে সকল বন্দীকেই একদিন যে কোন অজুহাতে হত্যা করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? ঢাকা উত্তপ্ত হতেই সারা বাংলাদেশ যেন রাতারাতি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সারা দেশ যেন এক সঙ্গে এক স্বরে আওয়াজ তুলল—এ বিচার আমরা মানি না, মানি না; আগরতলা

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র মামলা পাঞ্জাবীদের মনগড়া সাজানো মামলা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মিথ্যা, মিথ্যা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠলো। এই সময় একদিন আমি পেশাগত কারণে পাটুয়াটুলীর বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ফিরছিলাম। নবাবপুর রেলক্রসিং পার হয়েই আর এগুতে পারছিলাম না। শুধু মানুষ আর মানুষ। ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। রিক্সা, বাস, গাড়ী সব লাইন ধরে থেমে আছে। জানলাম পল্টনে আজ ভাসানী সাহেবের মিটিং হচ্ছে। ভাসানী সাহেবের মিটিংয়ের কথা শুনেই কোনরকমে এগুতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে এসেই থেমে যেতে হলো। সভায় মাইক এমনভাবে লাগানো হয়েছে যে, মানুষ এখান থেকেই ভাসানী সাহেবের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ভাসানী সাহেব হঠাৎ 'খামোশ' বলে চীৎকার করে উঠলেন। আর সমস্ত এলাকা যেন তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ভাইয়েরা! আমি এখানে এই পল্টনে বক্তৃতা করছি। আর এই সময় ক্যান্টনমেন্টে আমার ছেলে শেখ মুজিবের ওরা বিচার করছে। শেখ মুজিবের কিসের বিচার? না শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র করেছে। কিসের ষড়যন্ত্র? ভাওতাবাজীর একটা সীমা আছে। বিচারে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা কোন্ দেশের আইন? এ আইন শয়তানের আইন। এ বিচার আমরা মানি না। আমাদের ছেলেকে জেলে রেখে আমরা এখানে মিটিং করছি, বক্তৃতা করছি। না, আর বক্তৃতা নয়। চলো ক্যান্টনমেন্ট। জেলের তালা ভেঙে আগে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনব। দেখি কে ঠেকায়?' সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান উঠলো—'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।' তারপর আর ভাসানী সাহেবের কোন কথা শোনা গেল না। কেবল শ্লোগান-চীৎকরে পল্টন-গুলিস্তান এলাকা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল দৌড়াদৌড়ি—কে কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা গেল না। আমি মতিঝিল নটরডেম কলেজের দিকে দৌড়াতে লাগলাম। কেননা ঐ দিকে মানুষের ভীড় কিছুটা কম ছিল। তাছাড়া গুজব রটে গেছে ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে। তারা যেখানে যাকে পাচ্ছে তাকেই গুলী করে হত্যা করছে। আমি তখন থাকি বাংলা মটরের জহুরা ম্যানসনের পেছনের গলিতে। পথেই শুনতে পেলাম জনতা আগরতলা মামলার প্রধান বিচারক হামিদুর রহমানের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, হাসান আশকারীর বাড়ী পুড়িয়ে একেবারে ধ্বংস করেছে, ক্যান্টনমেন্টে আগুন লাগানো হয়েছে।

www.pathagar.com

পথে যত বাস, ট্রাক, কার ছিল সব কিছুতেই আগুন দিয়েছে। পুলিশকে গুলী চালাতে বলা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ গুলী চালাতে রাজী হয় নি। তাই সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। সেনাবাহিনী কারফিউ জারী করেছে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল ভাসানী সাহেব এখন কোথায়। তিনি কি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট গেছেন? ক্যান্টনমেন্ট গেলে ভাসানী সাহেবের যদি কিছু হয়? না, ভাসানী সাহেবের মত লোককে ওরা কিছু বলতে সাহস করবে না। অন্যদের যা-ই হোক আমার কেন জানি দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে ভাসানী সাহেবের কিছু হবে না। ভাসানী সাহে-বের কেউ কিছু করতে পারবে না। কেননা এর আগে যত আন্দোলন হয়েছে হয় তাঁকে তাঁর বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে নইলে জেলে নিয়ে গেছে। এর বেশী কেউ তাঁর কিছু করতে পারে নি।

অনেকের কাছে খবর নিয়ে জানলাম ভাসানী সাহেবের কিছু হয় নি, তিনি সুস্থ আছেন এবং মুক্ত আছেন। কিন্তু আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলার সকল আসামীকে মুক্তি দিয়েছে। রাত্রে রেডিওতে শুনেই নিজের মনেই চীৎকার করে উঠেছিলাম, 'মওলানা ভাসানী, জিন্দাবাদ।'

এরপরে ঢাকায় ঐ দিনের ঘটনা নিয়ে নানা রকম গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন ভাসানী সাহেব মিছিল নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। ভাসানী সাহেব একা সামনে এগিয়ে গিয়ে পজিশন নিয়ে থাকা সেনাদের বন্দুকের নল দু'হাতে সরিয়ে ধরলে মিছিল এগিয়ে যায় এবং যে ঘরে মুজিবসহ সবাইকে আটক করে রাখা হয়েছিল সেই দরজার তালায় ভাসানী সাহেব নিজে এক জোয়ানের কাছ থেকে একটা বন্দুক নিয়ে প্রথমে আঘাত করেন। পরে সবাই সেই তালা ভেঙে মুজিবকে মুক্ত করে। এমনি নানা রকমের গুজবে ঢাকা তখন সরগরম। এই গণ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর পরই রটে গিয়েছিল ভাসানী সাহেব গ্রামের কৃষক-মজুর ও তাদের লাঙ্গল-কোদালসহ লক্ষ লক্ষ গরু-মহিষ নিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল করবেন। তিনি ঢাকার প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেবেন যদি না সরকার এই মিথ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করে, যদি না ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। ভাসানী সাহেবের দাবী ছিল ফারাক্কা সমস্যাকে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় তুলতে

www.pathagar.com

হবে। তাঁর যুক্তি ছিল কাশ্মীর সমস্যার চেয়েও ফারাক্কা সমস্যা এ অঞ্চলের জন্যে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ফারাক্কার জন্য বাংলার গোটা জনপদ মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য যেখানে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে সেখানে প্রয়োজন হলে ডিনামাইট দিয়ে ফারাক্কা উড়িয়ে দিতে হবে। ফারাক্কা এই বাংলার মানুষের মরণ ফাঁদ ; জেনেশুনেও এ ফাঁদে আমরা কিছুতেই পা দিতে পারি না।

১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চের রাত থেকে ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশে পাক-বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করেছে। বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হলো। আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এখন নিরাপদে মুক্ত এলাকায় আছেন। এই প্রচারের পর পরই রেডিও পাকিস্তান থেকে বার বার ঘোষণা দেওয়া হতে থাকলো : না, শেখ মুজিব এখন পাকিস্তানের কারাগারে। তক্ষুণি আমার কেবলি জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ভাসানী সাহেব এখন কোথায়? পাক-বাহিনী তাঁকে পেলে তো কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তাহলে কি ভাসানী সাহেবও পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছেন? কিন্তু তা কি করে হয়? শেখ মুজিব না হয় বিপ্লবী নেতা নন। কিন্তু ভাসানী সাহেব তো অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা। তিনি তো এভাবে ধরা দিতে পারেন না। আবার ভাবি, তিনি যেমন অসমসাহসী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তিনি পাক-বাহিনীর ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন তাও তো সম্ভব নয়। এ রকম অনেক জল্পনা-কল্পনা মনের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকলো। প্রায় মাস দেড়েক পরে, সম্ভবত এপ্রিলের শেষে কিম্বা মে মাসের প্রথমে জানতে পারলাম ভাসানী সাহেব নিরাপদে আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি মুক্ত এলাকায় সভা করে প্রত্যেক বাঙালী মুসল-মানকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমি তখন এক শরণার্থী ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্যে তৈরী হচ্ছি। আমি যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তখন ভারত থেকে সদ্য ফিরে আসা এক অপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারলাম ভারত সরকার ভাসানী সাহেবকে অন্তরীণ করে রেখেছেন। তাঁর গতিবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে কোন সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না। এমন কি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর যে কোন কথা প্রচার করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কেননা ইন্দিরা গান্ধী সরকারের ভয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যদি পশ্চিম বাংলা ও আসাম সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। বৃহত্তর বাংলার আন্দোলন যদি এই সুযোগে সত্যি সত্যি শুরু হয়! আওয়ামী লীগের ভয় যদি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ভাসানী সাহেবের হাতে চলে যায়? এ কারণেই নাকি আওয়ামী লীগের যোগ-সাজসেই ভারত সরকার ভাসানী সাহেবের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য দেশ স্বাধীনের পর (সম্ভবত সময়টা ছিল ১৯৭৪ সাল) ঢাকার এক জনসভায় ভাসানী সাহেবের বক্তব্যে এ কথার আংশিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেছিলেন, 'আমি যেমন ১৪ বছর আগে পশ্চিম পাকিস্তানকে সালাম আলায়কুম জানিয়েছিলাম তেমনি আজ ঘোষণা করছি, এই স্বাধীন বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ এখনো স্বাধীন হয় নি। যতদিন না আসাম ও পশ্চিম বাংলা এই বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে ততদিন বাংলাদেশের মানচিত্র পরিপূর্ণ হবে না। আমি আজ বলে গেলাম, আমার সেই স্বপ্নের বাংলা আমি বেঁচে থাকতেই দেখে যাব, দেখে যাব। সেই বাংলাদেশ হতেই হবে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে। যেমন পারে নি পশ্চিমা মাথামোটা পাঞ্জাবীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে। বাংলাদেশের মানুষ যখন একবার জেগেছে তখন আর কোন মীরজাফরই তাদেরকে রুখতে পারবে না।'

১৯৭৪ সাল। ভাসানী সাহেব লং মার্চের ডাক দিলেন। হয় ভারত সরকারকে ফারাক্কা দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি ছাড়তে হবে নইলে আমরা লং মার্চ করব। আমাদের মরণ ফাঁদ ফারাক্কা ভেঙে দেব। আন্তর্জাতিক নদীতে বাঁধ দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মরুভূমিতে পরিণত করার কোন অধিকার কারো নেই। সে যত বৃহৎ শক্তিই হোক আর যত আগ্রাসীই হোক আমরা আমাদের জীবন দিয়ে সেই ন্যায্য হিস্যা আমরা আদায় করবই। শেখ মুজিবুর রহমান ছুটে গেলেন সন্তোষে। পুরো একদিন কাটালেন ভাসানী সাহেবের সঙ্গে। ভাসানী সাহেব তাঁর ঘোষিত নীতির এক চুলও হেরফের করতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'শেখ মুজিবর রহমানের সরকার ভারত সরকারের কাছে ২৫ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ। তার পক্ষে গঙ্গার পানির ন্যায্য পাওনা আদায় করা সম্ভব নয়। বাংলার মানুষের জন্য আমাকেই তা আদায় করতে হবে।' পরের দিন সমস্ত জাতীয় দৈনিকে সে খবর যথারীতি প্রকাশিত হলো।

www.pathagar.com

১৯৭৬ সাল। খবরের কাগজে দেখলাম ভাসানী সাহেব অসুস্থ হয়ে পি. জি হাসপাতালে আছেন। আমি তখন বেতার প্রকাশনা দপ্তরের সম্পাদকের পদে কাজ করি। আমার দপ্তর তখন ধানমণ্ডির তিন নম্বর সড়কে। আমাকে বেতার ভবনে আসতে হয়। বেতারের দরোজার উল্টো দিকেই পি: জি হাসপাতালের দরোজা। শুধু রাস্তাটা পার হলেই হলো। ভাসানী সাহেবকে দেখার খুব ইচ্ছে হলো। যখনই যাই ভাসানী সাহেবের কেবিনের সামনে ভীড়। কিন্তু মেডিক্যাল বোর্ডের নিষেধ—ভাসানী সাহেবকে কিছুতেই বিরক্ত করা যাবে না। তাঁর এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সবারই এক কথা হুজুরকে এক নজর দেখেই চলে যাব। এক নজর দেখাও যে কত সাংঘাতিক হতে পারে তা ভাসানী সাহেবকে দেখার সেই নাটক চাক্ষুষ না দেখলে আদৌ অনুমান করা সম্ভব নয়। ভীড় দেখি আর ফিরে আসি। আমার আর ভাসানী সাহেবের কেবিনে ঢোকা কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত লোক যেন ভাসানী সাহেবকে নিজের চোখে দেখতে চায়। তিনি কি সত্যি সত্যি দারুণ অসুস্থ? একেবারেই কি বিছানাগত হয়ে গেছেন? পত্রিকায় প্রত্যহ প্রকাশিত মেডিক্যাল বুলেটিন দেখে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। এরই মধ্যে একদিন মেডিক্যাল বুলেটিনে জানা গেল ভাসানী সাহেবের অবস্থা উন্নতির দিকে। কিন্তু দর্শনার্থীদের সাক্ষাতের উৎসাহে ভাটা পড়ার চেয়ে আরো যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভাসানী সাহেবের স্বাস্থ্যের আরো উন্নতির লক্ষ্যে দর্শনার্থীদের গতিবিধি বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় নিষিদ্ধ করে দিলেন। কেউ আর সহজে হাসপাতালে প্রবেশের সুযোগ না পাওয়ায় দুপুরের দিকে ভাসানী সাহেবের প্রকোষ্ঠের সামনে বলতে গেলে আর তেমন লোকের আনাগোনা থাকলো না। এই সুযোগে আমি একদিন কায়দামত নার্স ও ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্রকোষ্ঠে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখি ভাসানী সাহেব আধা কাত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন; আর ভাসানী সাহেবের বেগম সাহেবা তাঁর মাথার কাছে বসে আছেন। আমি আর সময় না নিয়ে টুক করে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেই বললেন, 'কে?' আমার কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বেগম সাহেব উত্তর দিলেন, 'একটি ছেলে।' সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম, 'হুজুর! আমি, ফজল-এ-খোদা।' আমি আমার নাম বলতেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। 'কোথায় আছিস এখন?'

www.pathagar.com

'ঢাকায়। হুজুর, আপনি এখন কেমন আছেন?' 'ভালো নারে। দ্যাখনা, তপন-টপন ভরেই পেশাব করে ফেলি। গত দু'দিন হলো একটু আধটু খেতে পারছি। আচ্ছা তুই এখনো কবিতা টবিতা লিখিস নাকি?' 'জী' বলতেই তিনি বললেন, 'তোদের ওসব কবিতা টবিতা হয় না। লোকে তো কিছুই বোঝে না। তোদের কবিতা তোরাই বুঝিস কেবল! নজরুল যে এত কঠিন কঠিন কথা লিখেছে—সে তো আমিও বুঝি। তবে তোর ঐ গানটি তুই বড় ভালো লিখেছিস। যুদ্ধের সময় ঐ গানটিই আমার কাছে বেশী ভালো লাগতো। শহীদ ও সংগ্রামের ইতিহাস দুটোই ঐ গানের মধ্যে আছে। সালাম সালাম না কি যেন গানটি?' আমি গানটির প্রথম কলি বলতেই বললেন, 'বড় ভালো গান। এ রকম গান আরো লিখতে পারিস না! বেতারের কি একটা পত্রিকায় দেখেছিলাম গানটি নাকি শেখ মুজিবের প্রিয়। তোকে বলছি গানটি আমারও খুব প্রিয়।' বেগম সাহেব বললেন, 'আপনি আবার কথা বলছেন। ডাক্তার না আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করেছে!' ভাসানী সাহেব তৎক্ষণাৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'নিষেধ করলেই হলো! সারা জীবন যে কথা বলে গেল---ওরা নিষেধ করলো আর আমি কথা বলা বাদ দিলাম! মরলে তো আর কথা বলতে আসব না।' কথা শেষ করতে না করতেই এক ঝাঁক ডাক্তার ঢুকে গেল। আর আমি যেমন এসেছিলাম তেমনি কাকেও কিছু না বলে আলগোছে সটকে পড়লাম বলা যায়। ভাবলাম, কি জানি পাছে যদি ডাক্তারদের ধমক খেতে হয়। কেবিন থেকে বেরিয়ে ভাবলাম কই ভাসানী সাহেবকে দেখে তো মনে হলো না তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ! এ রকম অসুখ তো সবারই হয়। স্বাস্থ্যের তো তেমন হেরফের দেখলাম না। কণ্ঠও তো সেই দরাজ আগের মতই এবং পরিষ্কার! মনে মনে উচ্চারণ করলাম, আল্লাহ তাঁর আরও বহু বছর হায়াত দারাজ করুন। আমার গানের প্রশংসা করায় সেদিন কি যে আনন্দ হয়েছিল তা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই!

বাংলাদেশের একজন গীতিকবি হিসেবে যেমন গর্ব হলো তেমনি নিজেকে বেশ অহঙ্কারী অহঙ্কারী মনে হতে লাগলো। আমাকে এ গানের জন্য যদি কেউ স্বর্ণপদকসহ লাখ টাকাও দিত তবু বুঝি তেমন আনন্দ হতো না, যত বেশী আনন্দিত হয়েছিলাম, খুশী হয়েছিলাম ভাসানী সাহেবের স্বীকৃতিতে। আমি যেন ঐ দিনই একজন বড় গীতিকবি হয়ে গেলাম। সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, ভাসানী সাহেবও গান পছন্দ করেন!

www.pathagar.com

শুনেছি তিনি একজন দারুণ স্মৃতিধর। কিন্তু কি রকম স্মৃতিধর তা কখনো অনুমান করতে পারি নি। কথিত ছিল তিনি কারো সঙ্গে একবার কথা বললে দশ/বিশ বছর পরেও তার নামসহ তাকে চিনতে পারতেন। একবার যে কথা বলতেন বা শুনতেন সে কথা কখনো তিনি বিস্মৃত হতেন না। তা হুবহু তাঁর মনে থাকতো। এই স্মৃতি সম্পর্কিত ঘটনা আমার ব্যাপারেই আমি হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম। সেই ১৯৫৪ সালে যখন আমি বাংলাদেশের লক্ষ কিশোরের একজন এবং আমি কবিতা লিখতাম বলে শুনেছিলেন; আর এই ১৯৭৬ সালে অর্থাৎ এই দীর্ঘ ২৩ বছর পরেও তিনি আমার নাম শুনেই আমাকে চিনতে পারলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার খোঁজ-খবর নিলেন। সত্যি বিশ্বাস করা কঠিন! কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি সত্য।

প্রাসঙ্গিক কারণেই একটি শোনা কথা এখানে উল্লেখ করছি। যে কথা এখানে এখন উল্লেখ করবো সে সম্পর্কে আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। নিছক শোনা কথা। ভাসানী সাহেব মাও সেতুং-এর বিশেষ আমন্ত্রণে চীন সফরে গিয়েছিলেন। দোভাষীর মাধ্যমেই চীনের নেতাদের সঙ্গে তিনি ভাব বিনিময় করেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি মাও সেতুং-এর সঙ্গে একান্ত একান্তে মিলিত হয়েছিলেন। যেখানে তাঁদের ভাব আদান-প্রদানে কোন দোভাষী উপস্থিত ছিল না। তাঁরা প্রায় দীর্ঘ দেড় ঘন্টা কাল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁরা যখন সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন উভয়ই খুব হার্ষোৎফুল্ল ছিলেন। তাঁরা দু'জনই নাকি তখন খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসছিলেন—মাও সেতুং-এর এমন হাসি নাকি এর আগে চীনারা কখনো দেখেন নি বা শোনেন নি। আর ভাসানী সাহেবের দরাজ হাসিতে নাকি ভাসানী সাহেবের সঙ্গে নিয়োজিত চীনা মহিলা দোভাষী ভয়ে দরোজার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর বলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে তাহলো মাও সেতুং যেমন ভাসানী সাহেবের ভাষা বাংলা জানতেন না তেমনি ভাসানী সাহেবও মাও সেতুং-এর ভাষা চীনা জানতেন না। দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই কি করে এত দীর্ঘ সময় ধরে দু'জনে একজন আরেকজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করলেন তা সত্যি অকল্পনীয় ব্যাপার। পৃথিবীর এই ব্যতিক্রমধর্মী মানুষের কার্যকলাপ সব সময়ই সাধারণের বোধের অগম্য। আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে যা অসম্ভব তাই তাঁরা সম্ভব করে তোলেন। তাঁরা

www.pathagar.com

মাঝে মধ্যে স্বভাব যাদুকরের মত এমন সব ঘটনার অবতারণা করেন যা পরবর্তীতে রূপকথা বলে মনে হয়। এবং তাঁরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে রূপকথার নায়ক হয়ে যান। ভাসানী সাহেব তেমনি একজন রূপকথার সম্রাট। অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী।

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন শাসক-গোষ্ঠীর ত্রাস এবং অবহেলিত, বঞ্চিত, নিরুপায় গণমানুষের ছিলেন বন্ধু, আত্মার আত্মীয়। যখনই কোন সঙ্কট—বন্যা, মহামারী, অজন্মা, খরা, সাইক্লোন দেখা দিয়েছে তখনই তিনি কৃষক-শ্রমিক-মজুরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মানুষের পক্ষে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যখনই কোন শ্রমিক গোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হয়েছে তখনই তিনি সেই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ঘেরাও করে, অনশন ধর্মঘট করে দাবী আদায় করে ছেড়েছেন। তেমনিভাবে দেশের বিশেষ সঙ্কটকালে—১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হলে ভাসানী সাহেব প্রথম গর্জে উঠলেন, সারা দেশের মানুষকে সংগঠিত করলেন। তিনি বললেন, "সার্বভৌমত্ব যখন বিপন্ন, স্বাধীনতা যখন হুমকির সম্মুখীন তখন আমাদের সবাইকে সব রকম বিভেদ ভুলে যেতে হবে। আগে দেশ। দেশ বাঁচলেই তবে আমরা বাঁচব।" ঐ সময় পাকিস্তানের শাসক ছিল জেনারেল আয়ুব খান। ভারতের প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে তাসখন্দের চুক্তি শেষ করেই আয়ুব খান সন্তোষে ছুটে এসেছিলেন ভাসানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত যত শাসকই এসেছে তাঁরা কম-বেশী ভাসানী সাহেবের কাছে ঋণী। ভাসানী সাহেব কখনো কোন শাসকের সঙ্গে সংলাপে অংশ গ্রহণ করতে যান নি বরং পরামর্শ নেবার জন্য সব শাসকই তাঁর পর্ণ কুটিরে এসে হাজির হয়েছে। তিনি কখনো কারো কাছে নত হন নি, তাঁর কাছেই সবাই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। মুকুটবিহীন সম্রাট বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

শুধু দেশ নয়, বিশ্বের যেসব মানুষেরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য, অধিকারের জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের পক্ষেও তিনি ছিলেন নিরলস সোচ্চার কন্ঠ। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ভিয়েতনাম, প্যালেস্টাইনসহ সকল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন মওলানা ভাসানী। তিনি শুধুমাত্র আমাদের জাতীয় নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রতিবাদী কণ্ঠ, আন্তর্জাতিক নেতা, বিশ্ববিবেক।

www.pathagar.com

১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৬ সাল, রাত ৮-২০ মিনিট। মওলানা ইন্তেকাল করেন। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হলো। মওলানা ভাসানীর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কৃষক-শ্রমিক, ধনী-নির্ধন, আমলা-মন্ত্রী, নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সবাই এই আকস্মিকতায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও নির্বাক হয়ে গেল। ঘরে ঘরে, গাঁও-গঞ্জে, শহরে-নগরে নেমে এলো গভীর শোকের ছায়া। ঢাকার বাতাসে যেন নিম্নচাপের সৃষ্টি হলো। সবার মুখেই একই কথা ভাসানী সাহেব আর নেই। সারা দেশ যেন সঙ্গে সঙ্গে এতিম হয়ে গেল।

সারা দেশের মানুষ ঢাকায় ভেঙে পড়লো। নদীর স্রোতের মত চারদিক থেকে মানুষের মিছিল আসতে শুরু করল। তাদের কণ্ঠে গগনবিদারী ধ্বনি মওলানা ভাসানী, অমর হোক, অমর হোক। মানুষ আর মানুষ। ঢাকার রাজপথে অলিতে-গলিতে শুধু মানুষ। ঢাকা মানুষের মহাসাগর হলো। পথে পথে ট্রাফিক বন্ধ হয়ে গেল। চিরবিদায়ের আগে তারা তাদের প্রিয়নেতাকে একবার দেখে নিতে চায়। সুদূর গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে সলিমদ্দী-কলিমদ্দিদের মত মানুষ। ট্রেনে-বাসে তিল ধারণের স্থান নেই। মানুষ আসছে তো আসছেই। বেতারে প্রচার হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত ও হাম্‌দ-না'ত। পত্র-পত্রিকার সারা পাতা জুড়ে কালো বর্ডারে ভাসানী সাহেবের ছবিসহ তাঁর জীবনী ও জীবন আলেখ্য। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে, দেশের শোক-সন্তপ্ত মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতে থাকলো একের পর এক শোকবার্তা।

মওলানা ভাসানীর জানাজায় কত মানুষ হয়েছিল তা সাংবাদিকেরাও অনুমান করতে পারেন নি। এক এক পত্রিকায় এক এক রকম হিসেব প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভাসানী সাহেবের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে যেখানে তিনি তাঁর শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন সেই সন্তোষে তাঁকে দাফন করা হলো। তাঁর দাফনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আল্লাহ্‌ তাঁর একজন প্রিয় প্রতিনিধিকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মানুষ তাদের একজন বিশ্বনেতাকে চিরদিনের জন্যে হারালো। রাজা যায় রাজা আসে; ভাসানী যায়, ভাসানী আসে না কখনো।

www.pathagar.com

রাজিয়া মজিদ

ভাসানীকে যেমন দেখেছি

অনেক দিন থেকে আমি অসংখ্য লোকের মুখে এই শব্দমালা শুনে আসছি, শওকতে বুলবুল গরীবে নেওয়াজ খাজায়ে খাজেগান পীরে মুর্শিদান শাহ্-এ সূফিয়ান মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কিন্তু এই শব্দ-অলংকার কার জন্য অর্থাৎ তিনি কে? কিসের জন্য তা তখনো জানি নে। যাকেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছি তার চক্ষুই ছানাবড়া, 'কি আশ্চর্য! তাও জান না?' এমনভাবে সংশয়াকুল চোখ তুলে তারা তাকিয়েছে যে, আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার যেন শূন্য! এর জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। সত্যিই আমি লজ্জিত!

পরে অবশ্য জেনেছিলাম এগুলো মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামের বিশেষণ। শুধু কি নামের বিশেষণ? নামের বিশেষণ মানেই মানুষটার বিশেষণ। মানুষ নামের সংগে কখন ডিগ্রী ও বিশেষণ লাগায়, যখন সে নিজ গুণে, নিজের চেষ্টায় এবং প্রতিভায় সেগুলো অর্জন করে। কিন্তু ভাসানী এই বিশেষণ নিজে লাগান নি। তাঁর অগণিত ভক্ত তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভালবেসে এগুলো তাঁর নামের আগে সংযোজন করেছে।

ভারী নামে সৌন্দর্য বাড়ে কিনা জানি নে। গুরুত্ব তো অবশ্যই বাড়ে।

ভাসানীর নাম কাগজে পড়ি, লোকের মুখে শুনি এই পর্যন্ত। আমি তাঁকে চোখে দেখি নি। আমি ফরিদপুরে বড় হলেও টাঙ্গাইলের মেয়ে। আমার বাপ-দাদার ভিটে-বাড়ি টাঙ্গাইলে আর ভাসানী সেই টাঙ্গাইলেরই লোক। এই স্বনামধন্য ব্যক্তিটিকে চোখে দেখব না, এটা কেমন কথা? নিজের বাড়ির লোককে আগে না চিনলে পৃথিবীর কাউকেই চেনা হয় না। অতএব মন স্থির করে ফেললাম, টাঙ্গাইল যাব এবং ভাসানীকে দেখব। হ্যাঁ, আমি তাঁকে রাজনৈতিক মঞ্চে অথবা মিছিলে দেখি নি। একেবারে কাছে থেকে দেখেছি অর্থাৎ তাঁর সন্তোষের বাড়িতে। ময়মনসিংহ থেকে

www.pathagar.com

টাঙ্গাইল গেলাম। তারপর রিক্সায় সন্তোষে। আমার দলে আরো অনেকে—বোন, ভাগ্নে, ভাগ্নী। বুকে দুরু দুরু ভাব, দেখা করবেন কিনা কে জানে? যে ব্যস্ত মানুষ!

শুনেছিলাম তিনি খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাই বলে এত সহজ, সরল জীবন ব্যবস্থা তা জানতাম না। ছনের ঘর। মাটির মেঝে তক্তোপোষের ওপর মাদুর পাতা। দুপুরের খাবার পর তিনি মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ি এবং ঘরের দ্বার উন্মুক্ত। রাজনৈতিক নেতা তো দূরের কথা, সামান্য একজন পদস্থ সরকারী কর্ম-চারীর সংগে দেখা করতে গেলেই কত ঝামেলা। কত ফর্মালিটিজ মানতে হয়। বেশীর ভাগ সময় দেখাই হয় না, সাহেব ব্যস্ত আছেন, চিরাচরিত কথা; অথচ ভাসানীর বাড়ির দরজা সবার জন্যই ছিল অবারিত এবং উন্মুক্ত। আমরা কোন রকম বাধার সম্মুখীন হলাম না কিংবা সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদও কেউ করল না। অতএব সংকোচহীন পদে তাঁর ঘরে সরাসরি প্রবেশ। তিনি উঠে বসলেন। হাসিমুখে বসতে বললেন। আমরা মাদুরের বিছানায় তাঁর পাশেই বসলাম। প্রথম সম্বোধনেই 'তুমি'। কেমন আছ? কোথায় থাক, কি নাম তোমাদের ইত্যাদি।

পরিচয় দিলাম।

তিনি খুব খুশি। বললেন, 'তুমি টাঙ্গাইলের মেয়ে। এত কাছে থাক, এতদিন আমাকে দেখতে আস নি কেন?'

আমি মুগ্ধ এবং বিস্ময়াবিষ্ট। যেটুকু মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তাও ধুয়ে মুছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার মনে হলো, তিনি যেন আমার পরম আত্মীয়। শুধু তাই নয়, শুভার্থী। কতদিন থেকে যেন তাঁর সংগে আমার পরিচয়!

আমি লিখি শুনে তিনি আরো খুশি। বললেন, 'তোমাদের মত মেয়ে-দেরই আমাদের দরকার সমাজ সেবার ক্ষেত্রে। দ্যাখ, তোমরা আমাকে রাজনীতিক বলতে চাও বল, আসলে আমি তো সমাজসেবী।'

মৃদু কণ্ঠে আমি বললাম, 'রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্যই তো সমাজ সেবা।'

ভাসানী উচ্ছ্বসিত, 'বাঃ তুমি তো চমৎকার কথা বলেছ; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিকরা কি সে কথা বোঝেন? তাঁদের প্রধান

www.pathagar.com

লক্ষ্য পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতা দখল। দ্যাখ না, ক্ষমতা দখল নিয়ে কেমন কাড়াকাড়ি? কিন্তু আমি এই ক্ষমতার ভাগাভাগিতে থাকতে চাই না।'

বিনীতভাবে বললাম, 'জানি, আপনি এ সবের উর্ধ্বে। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে আপনি আমাদের জন্য আরো কাজ করতে পারতেন।'

ভাসানী আমার সংগে একমত হলেন না। বললেন, 'না। সিংহাসনে বসে ক্ষমতার দণ্ড ঘোরানোর চেয়ে আমি জনতার সারিতে থাকতে ভালবাসি। আর জনতার শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি।'

আমি এই নির্লোভ ব্যক্তিটির কথা যত শুনলাম তত মুগ্ধ হলাম।

ভাসানী বললেন, 'যারা ক্ষমতায় গিয়ে সরকার গঠন করেন, তাদের ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার লোক নেই। কেউ ভয়ে চুপ করে থাকে। কেউ কেউ তাঁদের তোষামোদ করে নিজেদের স্বার্থ বাগিয়ে নেয়। কাজেই সরকারের কাজের সমালোচনা হয় না ঠিকমত। আমি সেই অপ্রিয় কাজটা করে থাকি।'

আমি ভাসানীকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাঝারি সাইজের লোক। একটু মোটাসোটা। সাদা দাড়ি। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে খুব সৌম্য শান্ত দেখায়। কিন্তু তাঁর ভেতরের তেজ আগুনের মত। তাঁর কথার ভঙ্গি সহজ, সরল বলেই অত্যন্ত দীপ্ত। যা তিনি বিশ্বাস করেন তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। রাজনীতিকদের স্বভাবসিদ্ধ ট্যাক্‌টিকস্‌ নেই তাঁর বাচন ভংগিতে। তিনি আমাকে বললেন, 'মেয়েরা রাজনীতি আলোচনা করে কম, এ বিষয়ে লেখেও কম। তুমি এদেশের রাজনীতির ধারা এবং তার ক্রমবিকাশ নিয়ে একটা বই লেখ। আমি তোমাকে ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে সাহায্য করব।'

আমি 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বললাম না। আমি জানি এটা কত দুরূহ কাজ। এবং এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আমার এখন দারুণ আফসোস হয়। আমি যদি সাহস করে এ কাজে এগিয়ে যেতাম তাহলে তাঁর জীবনের অনেক তথ্য এবং তাঁর রাজনীতি প্রজ্ঞার অনেক নতুন কথা জানতে পারতাম। যে সুযোগ মানুষ হেলায় হারায় তা বোধ হয় আর কখনো ফিরে আসে না। ভাসানীকে সামনাসামনি দেখে, তাঁর সংগে কথা বলে আমার এই কথাই মনে হয়েছে,

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী প্রমুখ সবার উপরে মানুষ হিসাবেই ভাসানী বড়। এমন স্নেহপরায়ণ লোক আমি আর দেখি নি। মানুষকে এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি আপন করে নেন। সেই ব্যক্তিটির তৎক্ষণাৎ মনে হয়, ভাসানী যেন তার কতদিনের চেনাজানা আপন লোক! মানুষের মনকে জয় করার এই ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি জনপ্রিয় জননেতা।

ভাসানী শুধু আচার-ব্যবহার এবং পোশাক-আশাকে সাধাসিধে ছিলেন তাই নয়, খাওয়া-দাওয়াতে সাধারণ বাঙ্গালী। ডালভাত তাঁর প্রিয় খাদ্য। এছাড়া ফলমূল খেতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর ঘরে এ জিনিসের অভাব ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। আমরা আর অপেক্ষা করতে চাইলাম না। তিনি আমাদের এটা ওটা খাওয়ালেন। শুধু তাই নয়, নিজ হাতে চৌকির নিচ থেকে বড় বড় দুটো আনারস টেনে বের করে আনলেন। বললেন, 'বাসায় নিয়ে যাও। পরে খেয়ো।'

শুধু আনারস নয়, কয়েক কাদি কলাও দিয়ে দিলেন। না নিয়ে উপায় ছিল না। দাবি কখনো উপেক্ষা করা যায় না। তবে মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলাম, তার জন্য আমাদেরও কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর চিরাচরিত প্রথা মেহমানদারিতে তিনি যে এখনো এত নিষ্ঠাবান, তা কেমন করে জানব?

সেই লুঙ্গি পরা, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবী, মাথায় গোল টুপির অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষটাকে কখনো ভোলা যায় না। জীবনযাত্রার প্রণালীতে ভাসানী ছিলেন একজন সাধারণ বাঙ্গালী। গাঁয়ের একজন অতি পরিচিত মানুষ। অথচ তেজে, সাহসে এবং স্পষ্টবাদিতায় তিনি অসাধারণ। এই মানুষের কোন জুড়ি নেই। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে ভাসানী মিশে আছেন একাত্ম হয়ে। আবার অনন্য প্রতিভায় তিনি ভাস্বর হয়ে আছেন তাদেরই মধ্যে।

www.pathagar.com

মওলানা আবদুল মতীন

মওলানাকে যেমন দেখেছি

ষোলই মে, ১৯৭৬। ফযরের আযানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। আযানের শেষ সুর আস্‌সালাতু খাযরুম মিনান নাউম—নিদ্রার চেয়ে নামায উত্তম। বিছানা ছেড়ে উঠে মনে পড়ল, আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে আরবের সেই মরুভূমির মিনার থেকে যে মধুর ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে আজও সেই সুর ধ্বনিত হচ্ছে, ধ্বনিত হবে অনন্তকাল ধরে, যে বাণীতে নিহিত ছিল শান্তির অমৃত স্বাদ, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল লক্ষ কোটি জনতা। সেই আদর্শ, সেই বিশ্বাস আজ সারা বিশ্বে ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করছে। সেই শান্তির অমোঘ বাণী ইসলাম।

অযু করে নামায শেষ করলাম। কক্ষের পূর্বদিকে জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ শব্দে একটা ট্রেন চলে গেল। ট্রেনের শেষ বগীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম প্রতিদিন কত শত শত যাত্রী এই বাষ্পীয় শকট বয়ে নিয়ে যায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। তার বুকে চেপে কত শত লোক বয়ে চলে! যাত্রীরা আসে নামে, কিন্তু বাষ্পীয় শকট তার বিরামহীন গতিতে করে যাওয়া-আসা। দরজায় কে যেন নক্ করল—সম্বিত ফিরে এলো, দরজা খুলে দিলাম। দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুবর সামছুল আলম খান। তিনি বল্লেন, 'তাড়াতাড়ি করেন মওলানা, একটু পরেই তো সেই মহামিছিলের যাত্রা!' তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ছুটলাম রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানের দিকে। এ মিছিল মহামিছিল। এ মিছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের মিছিল, এ মিছিল শান্তিকামী মেহনতি মানুষের মিছিল। মওলানার ডাক শতাব্দীর মহানায়কের ডাক, মজলুম জননেতার ডাক—এ ডাকে বাংলার নিপীড়িত কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে নি। আমিও পারি নি। তাই বন্ধুবর সামছুল আলম, মিসেস লাইফুন নাহার সমভিব্যাহারে

www.pathagar.com

এই মহামিছিলে শরীক হওয়ার জন্য দু'দিন পূর্বে ঢাকা থেকে রাজশাহী পৌঁছেছি। ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই। রাজশাহীর কোন হোটেলে এমন কি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও কোন ঠাঁই নেই। মহামিছিলের আহ্বানে আগে থেকেই রাজশাহী লোকে-লোকারণ্য। বৃটিশ আমলে বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার এবং পরবর্তীতেও বিভাগীয় হেড-কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না এই রাজশাহীতে।

রাজশাহী নামটি বড় সুন্দর। প্রবাদ আছে---রাজা-জমিদারদের পীঠ-স্থান এই রাজশাহী। কিন্তু যাদের দ্বারা তারা রাজা, যাদের কষ্টের সম্পদ দিয়ে রাজপ্রাসাদ গড়ে উঠেছে, সেই প্রজাদের শত জীর্ণ মলিন দেহ দেখে বার বার মনে হয় শোষণের কি নির্মম পরিহাস! মনে পড়ে বিদ্রোহী কবির সেই পংক্তি—আমি সেই দিন হব শান্ত/যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিতে না/ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ / ভীম রণভূমে রণিবে না/... ... হব শান্ত। মনে পড়ে যাঁর আহ্বানে সুদূর ঢাকা থেকে রাজশাহীর এই মহামিছিলে শরীক হওয়ার জন্য এসেছি, সেই শতাব্দীর মহানায়ক, অত্যাচারী-জুলুমের ত্রাস, সংগ্রামের পথ-প্রদর্শক, মজলুমের বন্ধু মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কথা সেদিনের সেই বিদ্রোহী-কণ্ঠ জমিদার মহাজনের অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার শোষিত-নির্যাতিত কৃষক সমাজকে উদ্দীপ্ত করে সংগ্রামে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে সেই চেতনার পতাকা নিয়ে জমিদার-মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দেশ-বাংলার মেহনতী মানুষের চেতনায় পরবর্তী ফলস্বরূপ বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন, বেঁচে থাকার আন্দোলন, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের আন্দোলন, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—সে আন্দোলন আজো চলছে, আরো চলবে। মজলুম জননেতার সেই অমর বাণী—লক্ষ জনতার সামনে তিনি বলতেন, 'আমার প্রয়োজন সেইদিন ফুরাবে যেদিন জালিম ও মজলুমের কোন ভেদাভেদ থাকবে না।'

রাজশাহীর জনৈক বন্ধুর সাহায্যে বহু কষ্টে একটি হোটেলের তিনটি রুম পেলাম। হোটেল ছেড়ে রাস্তায় এলাম। যেদিকে তাকাই শুধু মানুষ আর মানুষ! বন্ধুবর সামছুল আলম খানের হাত ধরে সামনে এগিয়ে চলছি। মানুষের প্রচণ্ড চাপ। প্রায় দেড় ঘন্টা পরে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছলাম। মাদ্রাসা ময়দান লোকে লোকারণ্য। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে

www.pathagar.com

মঞ্চের নিকটে পেঁছিলাম। নেতা এসেছেন আমাদের কিছুক্ষণ আগে। মৃদু মৃদু করতালি, আকাশ ফাটানো ধ্বনি রাজশাহীর আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। জনসমুদ্রের সেই শ্লোগান ঃ 'চল চল ফারাক্কা চল', 'ফারাক্কা বাঁধ মরণ ফাঁদ—ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও।'

পূর্ব দিগন্তে সূর্য লক্ষ মানুষের চক্ষে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সংগ্রামে দীপ্ত শিখা। মনে পড়ল চৌদ্দ শত বছর আগের সেই কারবালার কথা। এক কোষ পানির জন্য সেই জিহাদ। আজও বিংশ শতাব্দীতে সেই পানির জন্য সংগ্রাম, পানির জন্য জিহাদ। মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ চাপে মঞ্চে উঠতে পারছি না। হঠাৎ মঞ্চ থেকে হাত দিয়ে ডাকছেন মজলুম জননেতার একমাত্র সুযোগ্য সন্তান আবু নাসের খান ভাসানী, 'বাবু ভাই!' কয়েকজন পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে মঞ্চে উঠলাম। মঞ্চে দাঁড়াতেই হুজুর বললেন, 'মতীন বক্তৃতা কর।' হতভম্ব হয়ে গেলাম। মঞ্চে তখন বড় বড় জাঁদরেল নেতারা উপবিষ্ট। দাঁড়িয়ে আছি। বজ্রকণ্ঠে আবার হুকুম, 'বক্তৃতা দাও।' সম্বিত ফিরে পেলাম। মাইকের সামনে দাঁড়ালাম, যেদিকে তাকাই শুধু মানুষ আর মানুষ। সংগ্রামের দীপ্ত শিখায় উদ্ভাসিত সংগ্রামী মানুষের কাফেলা। কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়েছিলাম। পার্শ্বে চেয়ারে উপবিষ্ট লক্ষ জনতার সংগ্রামের উৎস ৯৬ বছরের বৃদ্ধ আমার হুজুরকে দেখছিলাম। চোখের দিকে তাকাতেই তাঁর চোখের সে নির্দেশ আমার হৃদয়ে অনুভব করলাম, ইসলামের যে দীক্ষা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বাণী। সেদিন কি বলেছিলাম তা আজ মনে পড়ে না। শুধু এতটুকু মনে পড়ে যাঁর আহ্বানে লক্ষ জনতা শরীক হয়েছে, এই মহা-মিছিলে আমিও তো সেই লক্ষ জনতারই একজন। আমি সেই মহানায়কের সংগ্রামের ডাকে নিজেকে উৎসর্গ করার কথাই বলেছিলাম।

www.pathagar.com

শরফউদ্দিন আহমদ

একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

ইসলাম ধর্মের বিধান এই যে, জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের কর্তব্য। যদি তেমন শক্তি থাকে তাহলে জুলুমের বিরুদ্ধে শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করতে হবে। যদি তা না করা যায়—তবে মৌখিকভাবে তার প্রতিবাদ করতে হবে। যদি তাও অসম্ভব হয়, তবে মনে মনে হলেও প্রতিবাদ করতে হবে অর্থাৎ খাঁটি মুসলমান হলে যে কোন জুলুমের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিবাদী হতেই হবে। কিন্তু এই কর্তব্য কাজ থেকে আমরা নিজের ব্যক্তিস্বার্থে এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদাই দূরে থাকি। তাই যে দু'একজন এই কর্তব্য কাজকে ধর্মের একটা অঙ্গ বলে মনে করেন—তাঁরাই আমাদের কাছে খাঁটি মানুষ বলে শ্রদ্ধেয়। এই শ্রেণীর খাঁটি মানুষের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়—তিনি আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সকলের পরিচিত মওলানা ভাসানী। জালিমের বিরুদ্ধে, জুলুমের প্রতিবাদে, অত্যাচারের মুকাবিলায় মওলানা ভাসানী একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

জীবনের শুরু থেকেই যে কর্মজীবনের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কোথাও তিনি আপোষ করেন নি। কোন অত্যাচারের কাছেই তাঁকে নতি স্বীকার করতে দেখা যায় না। বরং সাহসে বুক বেঁধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে গেছেন। দেশের আপামর জনসাধারণের বুকে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি সারা জীবন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকেও গদি অধিকারের লোভে ব্যক্তিত্ব ও নীতি বিসর্জন দেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন গদিতে বসে নয়, জনগণের খেদমত জনগণের কাতারে থেকেই করা সম্ভব। কারণ গদির মোহ ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত করে দেয়। আর তাই তাঁকে সারা জীবন বিরোধী

www.pathagar.com

দলীয় নেতারূপে কাটাতে হয়েছে। হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সনে সরকার গঠন করলেও তিনি কোন পদ দখল না করে তখনও ছিলেন সরকারী কর্মকাণ্ডের বাইরে। আসলে যে কোন সরকারকে ভুল পথ থেকে, ক্ষমতার অপব্যয় করা থেকে, অন্যায়-অত্যাচার থেকে দেশ-পরিচালকদের বিরত রাখাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনাদর্শ—একমাত্র সাধনা। আর সে কারণেই মওলানা ভাসানী দেশবাসীর অতি প্রিয় নেতা—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তি মওলানা ভাসানীর ব্যক্তি চরিত্রই একটি প্রতিবাদ। বর্তমান যুগের রীতিনীতি ও আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চাকচিক্যময় পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত। বসবাস করেছেন গ্রাম-বাংলার সাদামাটা খড়ের ঘরে। মওলানা ভাসানীর কথা মনে জাগলেই যে ছবিটি চোখে পড়ে—তা তাঁর লুঙ্গি, পাঞ্জাবী ও টুপী। তাল গাছের আশ্‌ দিয়ে তৈরী যে ধরনের টুপি তিনি পরতেন তা এদেশে ভাসানীর টুপি নামেই খ্যাত। লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবী তাঁর একমাত্র পোশাক। কাঁধের উপর একটি ছোট চাদর। দেশে-বিদেশে, সর্বত্রই তিনি এই পোশাকে চলাফেরা করতেন। আয়ুবী আমলে একবার জাতীয় পোশাক আরোপ করার তোড়জোড় উঠেছিল। মওলানা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানে আস্‌কান-চোঙ্গা, জিন্নাহ্‌ টুপি জাতীয় পোশাক হতে পারে; কিন্তু এ অঞ্চলের শতকরা আশি ভাগ লোকের পোশাক লুঙ্গি হবে জাতীয় পোশাক।' রসিকতার ছলে প্রকাশ করেছিলেন যে, নদীমাতৃক দেশে সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে লুঙ্গিই শুকনা রাখা যায়। আসলে অসম্ভব সাদাসিধাভাবে চলতে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন একেবারে সহজ সরল সাধারণ। ইসলামী শরিয়তের খাঁটি অনুসারী।

জমিদার-তালুকদার প্রভুদের অত্যাচারে কৃষক, মজুর তথা জনজীবন চিরকাল ধরে অত্যাচারিত হয়ে আসছিলো—তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু। শ্রমজীবী মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে চিরদিন সোচ্চার ছিলেন। অশিক্ষিত, অজ্ঞ, ঘুমন্ত দেশবাসীকে তথা মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তুলতে তিনি কোনদিন পিছপা হন নি। এদেশের সাধারণ মুসলমানের কাছে আজও মওলানা

www.pathagar.com

ভাসানী পীর বা ধর্মীয় নেতার মর্যাদায় আসীন। তাঁর ভক্ত সংখ্যা যে অগণন তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সম্মেলনে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

১৯৪৭ সনে দেশ-বিভাগের পর এই অঞ্চলের রাজনীতির সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। স্বৈরাচারী পশ্চিমা শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যতগুলো ন্যায্য আন্দোলন হয়েছে মওলানা ভাসানী কোন না কোন প্রকারে তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আসলে স্বাধীনতার নামে দেশ বিভাগের পর পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের ভাগ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। বরং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে জুলুম চালিয়ে এ অঞ্চলের মানুষকে পদানত করে রাখতে চেয়েছে। স্বীয় বৈশিষ্ট্যে মাথা উঁচু করে চলতে দিতে চায় নি।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ই এদেশে আন্দোলন শুরু হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে '৪৮ সনে এদেশ প্রতিবাদমুখর হয়। বায়ান্নোতে তার চারম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু বায়ান্নোরও আগে ১৯৪৯ সনে রাজনৈতিক কারণেই এ অঞ্চলের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্যই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি হন মওলানা ভাসানী। সংগঠনের প্রথম জনসভায় স্বৈরাচারী সরকারের কাছে দাবী জানানো হয় যে, এদেশের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার চায়। দেশরক্ষার পূর্ণ ক্ষমতা ও নিজস্ব সৈন্যবাহিনী দাবী করে। এই জনসভার সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। এদেশের মজলুম জনগণের মুখপত্র হিসেবে মওলানা ভাসানী প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। এই পত্রিকার মাধ্যমেই এ দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন শুধু এ দেশেই নয়—সমস্ত বিশ্বে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কোন দেশে ভাষার জন্য এমন আন্দোলন হয় নি —জীবন উৎসর্গিত হয় নি। এই আন্দোলনে শরীক হয়ে যে সমস্ত ছাত্র নিহত হয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশের অন্যান্য নেতার সঙ্গে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

১৯৫৩ সনে ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। '৫৪ সনের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। হক সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা

www.pathagar.com

সরকার গঠনের পর উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ঘটনা ১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সপ্তাহকালব্যাপী অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। সম্মেলনের শেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি মওলানা হলেও যে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সেদিনের বক্তৃতায়। জাতীয় মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক মুক্তি অপরিহার্য এ কথা তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেন।

এ বছরেই তিনি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য স্টকহলম-এ যান। 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থে খোন্দকার ইলিয়াস তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে সেই সম্মেলনে মওলানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে বিশ্ব মজলুমের নেতা ছিলেন তার স্বাক্ষর গ্রন্থটিতে মেলে।

১৯৫৭ সনের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাগমারীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে শেষবারের মত তিনি কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি কটাক্ষ করে তাঁর ঐতিহাসিক 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন।

তারপর নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের উত্থান। সারা দেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় মোনায়েম খানের রাজত্ব। এর মধ্যেই এ.কে. ফজলুল হক ইন্তিকাল করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কারারুদ্ধ হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। হামদুর রহমানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ শিক্ষা দিবস পালিত হয়। মওলানা ভাসানী কিন্তু নিশ্চুপ থাকেন নি। পল্টনের লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে অনেকের সঙ্গে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য মওলানা জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। ছাত্র-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

১৯৬৭ সনে সরকার শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করেন। ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ সমগ্র দেশে ফেটে পড়ে। ছাত্র-সমাজ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। তারা ঐতিহাসিক এগারো দফা ঘোষণা করেন। পরে ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য মওলানা ভাসানী বীরবিক্রমে এগিয়ে আসেন। '৬৯-এর ৬ই ডিসেম্বর পল্টনে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সেদিন জনসাধারণ শপথ

www.pathagar.com

নেয়—জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো। পরে লাট ভবন ঘেরাও করা হয়। এদেশে ঘেরাও আন্দোলনের শুরু সেই থেকে। মওলানা ভাসানী তার পথ-প্রদর্শক।

গুলী, কারফিউ অমান্য করে হরতাল মিছিলের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ যে ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের পরিচয় দেয় তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ৬৯-এর ১৯শে জানুয়ারীর আন্দোলন নজিরবিহীন। এত বড় মিছিল, বিক্ষোভ আর শোকসভা এর আগে হয় নি। এ সময়েই সার্জেন্ট জহরুল হকের মৃত্যু। নিষ্ঠুরভাবে বন্দীদশায় বিচারাধীন অবস্থায় তাঁকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এই অন্যায় হত্যার প্রতিবাদে সেদিন যে মিছিল, শোকসভা ও জানাযা হয়েছিল মওলানা ভাসানী ছিলেন তার পুরোধা। তাঁর নেতৃত্বেই শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল।

আইয়ুবী রাজত্বের শেষে ইয়াহিয়ার আমলেও দমন নীতি সমান তালে চলতে থাকে। '৭০-এ দেশের উপকূল অঞ্চলে যে মহাপ্রলয় হয়, সরকার তার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে। বিশ্ববিবেক যখন সহানুভূতিতে উদ্বেলিত তখন ইয়াহিয়া সরকার মহাপ্রলয়ে কবলিত নিঃসহায় মানুষের ট্রাজেডি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। মওলানা ভাসানী সে অঞ্চল পরিদর্শন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। মাঝ পথে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। '৭০ সনের ২৩শে নভেম্বর পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারের নগ্ন হৃদয়হীনতার ছবি তিনি তুলে ধরেছিলেন। আল্লাহ্র কাছে তার বিচার দাবী করেছিলেন। এই সভাতেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করা হয়।

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মওলানা ভাসানীকে বাঙালীর স্বাধিকার আদায়ের দাবীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। স্বাধীনতার পরও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নবীন বাংলাদেশে যে সমস্ত অব্যবস্থা চলে আসছিল—তারও বিরুদ্ধে ভাসানী ছিলেন প্রতিবাদ-মুখর। আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা তিনি নানাভাবে তুলে ধরেছিলেন। রিলিফ বিষয়ক কারচুপির ব্যাপারে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শেখ মুজিবের একনায়কত্ব তথা বাকশালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দাবী তুলেছেন। ভারতীয় বৈরী

www.pathagar.com

নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করেছেন। 'ফারাক্কা চল' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন—ন্যায়ের পথে প্রতিবাদ করতে তিনি কখনও ভয় পান নি।

মোটকথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু দেশের বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে এমন একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের খুবই প্রয়োজন। আমরা মওলানা ভাসানীর সেই প্রতিবাদী কণ্ঠের 'প্রতিধ্বনি' শোনার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে আছি।

www.pathagar.com

মুহম্মদ কোরবান আলী

স্মৃতিতে মওলানা ভাসানী

১৯৪১-৪২ সালের কথা। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মাহমুদাবাদের নবাব আসবেন আসামের হামিদাবাদ। সভার পূর্বদিন আসরের নামাযের পরে মওলানা তাঁর তৎকালীন সেক্রেটারী মানিক সরকারকে ডেকে বললেন, 'নবাব সাহেব ধুবড়ী থেকে আসবেন কিভাবে? ধুবড়ী থেকে তো কোন রাস্তা নেই। ধুবড়ী থেকে হামিদাবাদ প্রায় ৬/৭ মাইল পথ। কি করা যায়?' মওলানার দুশ্চিন্তা দেখে শিষ্যরা নেমে গেল রাস্তা তৈরীর কাজে। পরদিন বেলা ১০/১১ টার মধ্যে তৈরী হয়ে গেল রাস্তা। নবনির্মিত এই রাস্তা দিয়েই হামিদাবাদে এলেন নবাব। হামিদাবাদের এই সভাতেই তৎকালীন পাকিস্তানী পতাকা আসামে প্রথম উত্তোলন করেন মওলানা ভাসানী। মওলানা তখন আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি।

মওলানাকে নিয়ে কতো স্মৃতি কতো কথা আমার। কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টার কথা বলি? যে আসাম মওলানাকে বানিয়েছে মেহনতী মানুষের নেতা, পরিণত করেছে জাতীয় বিবেকে, সেই আসাম জীবনের শুরু থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত কতভাবেই না তাঁকে দেখেছি! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যের স্মৃতি। কী বিরাট শক্তিধর মহীরুহসদৃশ এই মানুষটি অথচ কী সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়!

আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি থাকাকালীন তিনি ১৯৩৭ সালের দিকে আসাম আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন একবার। সারা জীবনে এই একবারই তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।

শিক্ষা নিয়েই শুরু হয়ে আসামে মওলানার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন। আসামে তিনি প্রথম নিজস্ব আস্তানা গাড়েন ভাসানীর চরে। এই ভাসানীর

www.pathagar.com

চর থেকে 'ভাসানী' নাম যুক্ত হয় তাঁর নামের সাথে। তাঁর পুরো নাম নিজে লিখতেন আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী। তাঁর পুরো নাম হয়ত অনেকে জানেন না। কিন্তু তিনি 'ভাসানী' নামের সারা বিশ্বে পরিচিত ছিলেন।

এই ভাসানীর চরে তিনি প্রথম একটি জুনিয়র মাদ্রাসা পত্তন করেন। অবশ্য এর আগে তিনি তিনডুবিতে একটি মক্তব স্থাপন করেন এবং সেখানে শিক্ষকতা করতেন। তারপর তিনি চলে আসেন দক্ষিণ শালমারায়। এখানে এসেই তিনি পত্তন করেন দক্ষিণ শালমারা হাই স্কুল। নাম দেন 'প্রজাবন্ধু'। এই নাম নিয়েই শুরু হয় গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গে বিরোধ। ইনি বিখ্যাত সিনেমা নায়ক ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার পিতা। রাজা বললেন, 'আমার রাজ্যে প্রজার নামে হাই স্কুল হতে পারে না।' কিন্তু ভাসানী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি যুক্তি দেখালেন, 'সম্পূর্ণরূপে প্রজাদের দানে এবং প্রচেষ্টায় এ স্কুল হয়েছে। এখানে তাদের ছেলেমেয়েরাই শুধু পড়বে। (এটা ১৯৩৫/৩৬ সালের কথা। তখনও আমাদের পল্লী এলাকায় মেয়েদের শিক্ষা হাই স্কুল পর্যন্ত পৌঁছেনি)। রাজ বা রাজবংশের একটি প্রাণীও এখানে আসবে না লেখাপড়া করতে।' কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী জোতদারেরা সবাই রাজাকে সমর্থন করলেন। ফলে তিনি আর টিকতে পারলেন না; চলে গেলেন হামিদাবাদে। রাজা সে হাই স্কুলের নাম দিলেন তার মেয়ের নামানুসারে 'রাণী ভবানী প্রিয়া'।

এভাবেই পরিত্যক্ত হলো বিশ্বে প্রথম বাংলায় প্রদত্ত কোন প্রতিষ্ঠানের নাম। দক্ষিণ শালমারায় থাকাকালীন মওলানা নিজে দুই ঈদের নামায পড়াতেন। তাতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত। পায়ে হেঁটে যত দূর থেকে সম্ভব মানুষ আসত মওলানার পিছনে নামায পড়তে, তাঁকে এক নজর দেখতে। এই দিনের আরও দুটো আকর্ষণ ছিল। যারা নামায পড়তে আসতো তাঁরা প্রায় সবাই ক্ষীর-খিচুড়ী পাক করে ধামা ভর্তি করে নিয়ে আসতো। নামাযবাদ সমস্ত লোক এক জামাতে মাটিতে কলার পাতা পেতে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করত। মওলানা সাহেব কাতারের মাঝ দিয়ে হেঁটে হেঁটে তার তদারকি করতেন। সে ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য! বিকাল বেলা হত লাঠিখেলা ও ঘোড়দৌড়। তিনি নিজেও এ দুটো খেলা জানতেন এবং খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি সাধারণ মানুষের এই নিরলস আনন্দের জন্য এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এর পিছনে তাঁর যুক্তি ছিল, 'এরা সাধারণ গরীব

www.pathagar.com

চাষী। এদের জীবনে আনন্দ-উৎসবের কোন সময় বা সুযোগ নেই। বৎসরে দুটো দিনও যদি এভাবে আনন্দ দেয়া যায় তবু এদের আত্মা একেবারে মরে যাবে না।' কত গভীর দরদ ভরা উক্তি। এদেশে এমন কথা অন্য কোন নেতা বলেছেন কিনা সন্দেহ।

হামিদাবাদ এখানে থেকে ৮ মাইল উত্তরে। এর নাম ছিল আগে ঘাগমারী, এক ঊষর গণ্ডগ্রাম। বিরল জনবসতি। মওলানা সেখানে গিয়ে আস্তানা গড়ার সাথে সাথে গ্রামের চেহারা দ্রুত পাল্টাতে লাগল। প্রথমে তিনি মসজিদ এবং মুসাফিরখানা তৈরী করেন। এর পর ডাক্তারখানা, পশু হাসপাতাল ও পোস্ট অফিস পত্তন করেন। কিছুদিন পর মসজিদ ও ডাক্তারখানা পাকা করেন। আমরা এ দুটোই সর্বপ্রথম দালান দেখেছি। আসামে ভূমিকম্প বেশী হয় বলে দালান করা হয় না। তাছাড়া গৌরীপুরের রাজার নিষেধ ছিল তার রাজ্যে কোন প্রজা দালান তৈরী করতে পারবে না। সে নির্দেশ ভাসানী এভাবে উপেক্ষা করেন। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। এখানে তিনি পত্তন করেন প্রথমে প্রাইমারী স্কুল, হাই মাদ্রাসা ও হাই স্কুল। হাই মাদ্রাসা ও হাই স্কুল প্রথমে কয়েক বৎসর অবৈতনিক ছিল। ফলে দলে দলে ছাত্র এসে ভরে গেল স্কুল-মাদ্রাসা। তাছাড়া দূর দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে জায়গীর করে দিতেন মওলানা সাহেব। এখানে উইভিং স্কুল ও ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজও পত্তন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম এ কলেজ থেকে ৫ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। তাঁদের মধ্যে ২ জন পাশ করেন। তখন পাকিস্তান ও ভারত ভাগ হয়ে যাওয়ায় সে কলেজ আর টিকে থাকে নি। তাছাড়া কলেজের জন্য যে প্রকাণ্ড দালান শুরু করেছিলেন, তা ১৯৪২ সালের এক প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে যায় ছাদ করার আগেই। ১৯৩৬ থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত হামিদাবাদ ছিল সারা আসামের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। ১৯৩৭ সালে সর্ব ভারতীয় প্রথম নির্বাচনে আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদে ভাসানী বিপুলভাবে জয়ী হন। এটাই তার জীবনের প্রথম এবং শেষ নির্বাচন। তিনি আর কখনও নির্বাচনে অংশ নেন নি। মানকাচরের খান বাহাদুর আবদুল লতিফ সেবারে কংগ্রেস এবং গৌরীপুরের রাজার সমর্থন নিয়ে ভাসানীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এর আগে থেকে তিনি আসামের 'লাইন প্রথা' তুলে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এবারে তিনি আইন সভার প্রথম অধিবেশনেই এ আইন বাতিল করার জন্য মুসলিম লীগের তরফ থেকে বিল আনলেন। কিন্তু আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ্‌র সহযোগিতার অভাবের দরুন সে বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হলেন। এর প্রতিবাদে তিনি আইন সভা থেকে পদত্যাগ করলেন। 'লাইন প্রথা' এক কুখ্যাত আইন যার ফলে অন্য কোন প্রদেশের লোক 'বলক সীমানা'র মধ্যে জমি কিনে বসবাস করতে পারত না। বলক এরিয়া শুধু আসামের অধিবাসীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আসামে তখন লোকসংখ্যা খুব কম ছিল এবং প্রচুর জমি পতিত পড়েছিল বন-জঙ্গল হয়ে। আসামের জমি অত্যন্ত উর্বর। বাংলাদেশে তখন দুর্ভিক্ষ। ফলে হিন্দু-মুসলমান মিলে প্রচুর লোক তখন আসামে যেতে থাকে। কিন্তু 'লাইন প্রথা' বলবৎ থাকায় তারা স্থায়ী হতে পারছিল না। যারা বন-জঙ্গলে বা ব্রহ্মপুত্রের চর-চাপড়ে বসবাস করতে থাকে তাদেরও মাঝে মাঝে হাতী দিয়ে ঘরবাড়ী ভেঙে দেয়া এবং জ্বালিয়ে পর্যন্ত দেয়া হত আগুন দিয়ে। এটাকে তখন বলা হত 'বাঙ্গাল খেদা'। ভাসানী আইন করে এ কুপ্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এই বাঙ্গাল খেদার শিকার হত বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়। এটা চরমে পৌঁছে ১৯৫০ সালে যখন লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে চিরতরে তাড়িয়ে দেওয়া হয় আসাম থেকে। মান-ইজ্জত লুন্ঠন করা হয় নির্বিচারে মা-বোনদের। অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে এ সময়। নারী, শিশু, বৃদ্ধা, যুবা কেউই রেহাই পায় নি এ নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে। নূন-নেহেরু চুক্তির ফলে কয়েক মাস পরে কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল সাময়িকভাবে। কিন্তু সে আন্দোলন বন্ধ হয় নি কখনও। আজো সে আন্দোলন সমানে চলছে।

১৯৫০-এর পরে স্যার সাদুল্লাহ্‌ দুঃখ করে বলতেন, 'আসাম পাকিস্তান না হওয়ার জন্য আমিই দায়ী। ভাসানীর কথামত লাইন প্রথা ভেঙ্গে দিলে আসাম পাকিস্তান হয়ে যেত।'

হামিদাবাদে তখন অনেক সভা-সম্মেলন হয়েছে। তার মধ্যে দুটো সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রথমটিতে প্রথম মাইক্রোফোন আনা হয়, যা এর আগে এতদ্‌অঞ্চলে কেউ কখনও দেখে নি। এ সভাতেই মাহমুদাবাদের নবাব এসেছিলেন এবং পাকিস্তানী পতাকা আসামে প্রথম

www.pathagar.com

উত্তোলন করা হয়। সারা ভারত থেকে নেতা এবং মুসলিম লীগ কর্মীরা এসেছিলেন এ সভায়।

দ্বিতীয়টিতেও লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। এ সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল উট। উট এ এলাকার মানুষ কখনও দেখে নি। সভার বেশ কিছুদিন আগেই উট দুটো আনা হয় এবং দক্ষিণ শালমারা থানার অধিকাংশ গ্রামে তা ঘুরিয়ে দেখান হয়। এর ফলে সে সভাতে লোক সমাগম হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। সে উট জবেহ করে খাওয়ানো হয় সভার সমস্ত লোককে।

হামিদাবাদে ভাসানীর প্রায় সমস্ত সভাতেই সমস্ত লোকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। এ সবই দান করতেন তাঁর মুরিদ বা ভক্তেরা। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, ডিম, দুধ, দৈ, চাল, ডাল আর কলার পাতা ও খড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতেন সবাই। সভার সমস্ত কাজও করে দিতেন তারাই হাসিমুখে।

এ সময়ের আরও কিছু ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালের দিকে তিনি আসামে প্রথম সরকারী নৈশ বিদ্যালয় চালু করেন। সরকার বই সরবরাহ করত এবং বাতি ও তেলের খরচ বাবদ মাসে ৫ টাকা করে দিত। বাকী সব গ্রাম্য সাহায্যে চালাতে হত। এ প্রচেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। তা থেকে কিছু কিছু নৈশ স্কুল প্রাইমারী ও মাইনর স্কুল পর্যন্ত উন্নীত হয়। এ থেকেই মুসলিম সমাজে আসামে শিক্ষার দ্বার খুলে যায়। মুসলমান যোগানীরা তখন ধুবড়ীতে দুধ বিক্রি করতে যেত। কোন কারণে দুধ জ্বালে না টিকলে যোগানীদের ভীষণভাবে অপমান করত শহরের বাবুরা। এতে ভাসানী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং ধুবড়ীতে নিয়ে দুধ বিক্রি করা বন্ধ করে দেন। এতে বিশেষ করে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিয়ে খুব সমস্যা দেখা দেয়। ডেপুটী কমিশনার তখন হামিদাবাদে আসেন এবং সের প্রতি এক পোয়া পানি দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে যান। কিছু পানি দিলে দুধ সহজে নষ্ট হয় না। পরদিন থেকে দুধ যথারীতি শহরে যেতে শুরু করে। অলিখিত আইন হিসাবে এ প্রথা পাকিস্তান-হিন্দুস্তান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরের অবস্থা জানি না।

এক হিন্দু ডাক্তার রাত্রি বেলা এক মুসলমান কলেরা রোগীর বাড়িতে যেতে অস্বীকার করে। সে রোগী মারা যায়। তৎক্ষণাৎ এ খবর ভাসানীকে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়। ভাসানী প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ্‌কে টেলিগ্রাম করেন। ফলে সারা আসাম থেকে মুসলমান ডাক্তার ধুবড়ীতে পাঠান হয়।

আসামে বহু প্রকার ওজন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন। ৬০, ৮০, ৮৪, ৯০ ও ১২০ তোলার সের ছাড়াও ছিল দোন ও তুলাদণ্ডের ওজন পদ্ধতি। এ সবের গোলকধাঁধায় ফেলে অসৎ ব্যবসায়ী ও মহাজনরা সাধারণ, অশিক্ষিত ও নিরীহ চাষীদের নানাভাবে হয়রানি ও প্রবঞ্চিত করত। এর বিরুদ্ধে ভাসানী তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সরকার থেকেও চাপ সৃষ্টি হয়। কিছু দিনের মধ্যেই শুধু ৮০ তোলার সের ছাড়া আর সব ওজন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়।

দক্ষিণ শালমারা ও হামিদাবাদের মধ্যস্থলে চতলা ও সূর্য্যমনি নামে দুটো বিরাট বিল। পশ্চিম দিক বাদে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ে বিস্তীর্ণ আবাদী জমি। কিন্তু বর্ষার শুরুতেই পানি এসে সমস্ত আউশ ধান প্রতি বছরই ডুবিয়ে দেয়। চাষীদের পেটের ভাত আর জোটে না। ভাসানী সরকারী ব্যবস্থাপনায় দুটো উচ্চ শক্তিসম্পন্ন পাম্প মেশিন বসিয়ে দেন বিলের ধারে। বিলের তিন পাড়ে প্রচুর বোরো ধান জন্মে। চাষীদের মুখে হাসি ফোটে। কয়েক বছর পর পাম্প দুটো নষ্ট হয়ে যায়। আসামে পাম্প মেশিনের কথা শোনা যায় নি এর আগে।

আমার বিজ্ঞান পড়ার বাসনা ছিল প্রবল। কিন্তু আমাদের কাছাকাছি কোন কলেজে তখন বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। বিজ্ঞান পড়তে হলে হয় গৌহাটী না হয় রংপুর যেতে হয়। কিন্তু রংপুর তখন পাকিস্তান। সেখানে সম্ভব নয়। গৌহাটীতে পড়তে হলে হোস্টেলে থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের সাংসারিক অবস্থা ততটা ভাল ছিল না। তাই ম্যাট্রিক পাস করার পর সমস্যা দেখা দিল এ নিয়ে। এক পর্যায়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো আমার। মওলানা সাহেব তখন হামিদাবাদে। আমি বাবাকে প্রস্তাব দিলাম, 'চলুন মওলানা সাহেবের কাছে যাই। তিনি যা বলবেন আমি তাই করব।' বাবা রাজী হলেন। তার পরদিনই বাবাকে নিয়ে হামিদাবাদে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লাম। সাহস পেলাম না ভাসানীর মুখোমুখি হতে। বাবা একা গেলেন এবং বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন ভাসানীর সঙ্গে। বাবার হয়ত আশা ছিল, যদি ভাসানী লেখাপড়া বন্ধ করতে বলেন তবে ভাল হয়। সব শুনে তিনি আমাকে

www.pathagar.com

ডাকলেন। আমি বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করছিলাম। আমি ঘরে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। আমার পরীক্ষার ফলাফল এবং আমার ইচ্ছার কথা সব শুনে আমাকে বললেন, 'দেখ তুমি পিতার বড় ছেলে। সংসারে কাজের লোকের দরকার। তুমি বিদেশে গেলে পয়সাও যেমন বেশী লাগবে আবার পিতারও সংসারে সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। একা সংসার করে যদি তোমার টাকা-পয়সা দিতে না পারে তবে তোমার পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে ধুবড়ীতে নতুন কলেজ হয়েছে। সেখানে কলা বিভাগেই পড়। ফল ভাল হলে সব শিক্ষারই দাম আছে।' আমি পুনরায় সালাম করে তাঁর দোয়া নিয়ে চলে এলাম এবং তার পরদিন ধুবড়ী কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেদিন ভাসানীর এ পরামর্শ না পেলে আমার জীবনে শিক্ষার সুযোগ হয়তো হত না---এটাই ভাসানীকে নিকট থেকে দেখার আমার জীবনের প্রথম সুযোগ। অবশ্য বেশ কয়েকবার আমি একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছি।

এখানে হয়ত ভাসানীর বাড়ির কিছু বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য এর আগে হামিদাবাদে কয়েক মাস পড়েছিলাম। কিন্তু তখন কোনদিন তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যাই নি। বাড়ী মানে ১৪/১৫ হাত লম্বা একটি টিনের ঘর। পিছনে একটি ছোট পাকঘর। ঘরে পাটখড়ির বেড়া। বাঁশের বেড়ার পায়খানা। ঘরে একখানা চৌকি। তাতে একটি কাঁথা বিছানো। কিন্তু তিনি মাটির মেঝেতে চাটাই পেতে বসে আছেন। খুব কম দামের একখানা চাদর পাতা ছিল চাটাই এর উপর। তিনি এ বাড়ীতেই বাস করেছেন ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। এছাড়াও আমতলী, আদাবাতী ভুরুঙ্গামারী ও সন্তোষে তাঁর বাড়ি আমি দেখেছি। সব বাড়ীর চেহারা এবং চরিত্র প্রায় একই। আমতলীতে ছিল ছনের দোচালা ঘর। আসবাবপত্র বলতে চৌকি। বসবার জন্য বেঞ্চ, টুল ইত্যাদি। ভুরুঙ্গামারীর বাড়ীতে দুটো ছনের চারচালা ঘর। পাকঘর ও গোয়াল ঘর দোচালা। এখানে একটি খাট ও কয়েকখানা চেয়ার ছিল। এখানে তাঁর ছোট স্ত্রী থাকতেন। তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে। ভাসানী এই বাড়ীতে দুবার গিয়েছেন, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে সন্তোষের বাড়িও দেখেছি। সেখানেও ঐ কাঠের চৌকি। তাতে খড় বিছানো। একটি পাতলা তোষক ও সামান্য একটি চাদর।

www.pathagar.com

১৯৩৪ সালে প্রথম তাঁকে দেখেছিলাম লুঙ্গী, পাঞ্জাবী ও বেতের টুপি পরিহিত। আর শেষ দেখেছি ১৯৭৬ সালের ১৭ই মার্চ ফারাক্কা মিছিলের অগ্রভাগে একই বেশে। এই দীর্ঘ দিনে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা দিয়ে অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। বৃটিশ চলে গেছে। পাকিস্তান এসেছে। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ; কিন্তু বিশ্ববরেণ্য মজলুম জননেতা ভাসানীর বেশবাসের পরিবর্তন হয় নি একটুও। এমনি ছিল তাঁর জীবনযাত্রার মান। তিনি সারা জীবন এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য ভেবেছেন, কিন্তু নিজের জন্য, নিজ পুত্র, কন্যা, জায়ার জন্য ভাববার অবসর পান নি কখনও।

তিনি যখন ১৯৫৭ সালে ভুরুঙ্গামারীর বাড়ীতে যান, তখন তাঁর এক মুরিদ কন্যা এবং প্রতিবেশী তাঁকে বললেন, 'হুজুর, এটা গাঁও গেরাম। এখানে লেখাপড়ার কোন সুযোগ নাই। আপনার ছেলেমেয়েদের আপনার কাছে নিয়ে যান। ওদের ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'সারা পূর্ব পাকিস্তানের কত লোকের সন্তানের ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে তোদের সরকার ? যেখানে শতকরা ৯০ জন লোক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেখানে মওলানা ভাসানীর সন্তানেরা ভাল শিক্ষা পেলেই বা তাতে কি লাভ হবে ?'

সেবারে তিনি গরু গাড়ীতে উঠে বসেছেন ভুরুঙ্গামারী যাবার জন্য। তাঁর তিন ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে ডান পাশে দাঁড়ান। আমি তখন বললাম, 'আতাউর রহমানের কোন চাকরি নেই। ধলডাঙ্গা মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেন নামমাত্র। বেতন পান না ঠিকমত। ওঁর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে ওর চলার পথ হত।' তিনি বললেন, 'ওর চাকরির দরকার তা বুঝি। আবু হোসেন সরকারকে একটা টেলিফোন করলেই চাকরি হয়ে যাবে তাও বুঝি। কিন্তু সারা জীবনের নিজের জন্য কিছু করি নি, কাউকে ধরি নি। এখন শেষ বয়সে নিজের জামাইয়ের জন্য চাকরির উমেদারী করা ঠিক হবে ? তুই কি বলিস ? তাছাড়া যে নিজের যোগ্যতা দিয়ে চাকরি জোগাড় করতে পারে না, সে অন্যের দেয়া চাকরিও করে খেতে পারবে না।' আতাউর রহমান সাহেব ভাসানীর তৃতীয় স্ত্রীর বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তখন সে মেয়েও ছোট ছিল। এর কিছুদিন পরে তিনি সে মেয়ে ছেড়ে বিয়ে পুনরায় আসামে চলে যান।

মওলানা ভাসানী বিয়ে করেছেন তিনবার। প্রথম স্ত্রী পাঁচবিবির। তিনি এখন জীবিত আছেন। দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন সন্তোষে। তিনি

www.pathagar.com

নিঃসন্তান অবস্থায় অল্পদিন পরেই মারা যান; তৃতীয় বিয়ে করেন রাজশাহীর রাণীনগরে। তিনি ১৯৬২ সালের দিকে রাজশাহী সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। অনেকের ধারণা ভাসানীর অসংখ্য স্ত্রী। পাকিস্তান সরকারের ধারণাও এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ছিল না। জানি না এটা কি ভ্রান্ত ধারণা থেকে না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত? ভাসানীর তৃতীয় স্ত্রীর নামানুসারে কামাডাঙ্গারীয়া গ্রামে 'হামিদা বানু' আপগ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর আগেই। স্কুলের জন্য জমি দান করে গিয়েছিলেন তিনি নিজেই; কিন্তু সে স্থানটি নদীতে ভেঙে যাওয়ায় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়েছে দক্ষিণ ছোট গোপালপুর গ্রামে। কিন্তু আজও সরকারী মঞ্জুরী ও অনুদান না পাওয়ায় সে স্কুলটি উঠে যাওয়ার পথে। সরকার এদিকে দৃষ্টি দিলে ভাসানীর স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষা পেত এবং স্থানীয় শিক্ষা সমস্যাদি কিছুটা লাঘব হত।

১৯৬২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হঠাৎ গরু গাড়ী করে এসে নামলেন ভাসানী জনাব ওয়াজেদ আলী শিকদার সাহেবের বাড়ির উঠানে। আমি সালাম দিতেই তিনি আমায় বললেন একটি লুঙ্গি ও গোসলের পানি দিতে। আমি পানি ও লুঙ্গি দিলাম এবং বললাম, 'আপনার কি একটাই মাত্র লুঙ্গি?' জবাবে তিনি বললেন, 'দুটো লুঙ্গি ছিল কিন্তু রৌমারী থেকে রওয়ানা হবার সময় একটা লুঙ্গি ভুল করে সেখানে রেখে এসেছি।' গোসল করে আমার লুঙ্গি পরে জুমআর নামায আদায় করলেন মসজিদে গিয়ে। সেদিন শুক্রবার ছিল। এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। বিশ্ববরেণ্যে নেতা তাঁর পরিধানের জন্য একটি মাত্র লুঙ্গি। এমন কথা কল্পনায়ও আসে না আমাদের। এখানেই তিনি ছিলেন সাধারণের মধ্যে অসাধারণ।

নামায শেষে জিজ্ঞেস করলেন সকলের কুশলাদি। সেটা ছিল রমযান মাস। আমার শ্বাশুড়ীকে ইফতারের জন্য চিতুই পিঠা বানাতে বললেন। আসাম থেকে আসার পরে আর নাকি তিনি চিতুই পিঠা খান নি। গড়াই বা টাকী মাছ দিয়ে মাস কালাইয়ের ডাল এবং মুরগির গোশ্‌ত দিয়ে মিঠা কুমড়ার তরকারী পাক করতে বললেন।

সেদিন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে এক মাদুরে বসে ইফতার করেছি এটাও এক অনন্য স্মৃতি। তিনি খেতে পারতেন ভাল। ইফতারের আয়োজনও নেহায়েৎ মন্দ ছিল না। তার পরও তিনি এক বাটি কালাইয়ের ডাল, এক বাটি মিঠা কুমড়ার তরকারী এবং ১৭টি চিতুই পিঠা খেয়েছিলেন। তখন তাঁর

www.pathagar.com

বয়স ৮২ বৎসর। প্রায় ২৭/২৮ বৎসর পর তাঁর পিছনে মাগরিবের নামায পড়লাম একই মাদুরে দাঁড়িয়ে।

পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারী। শহীদ দিবস উপলক্ষে তিনি সভা করলেন মসজিদের সামনে। আশপাশ হাটে ঢোল দিয়ে সভার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সভায় অনেক লোক সমাগম হলো। থানা থেকে এক দারোগা সাহেব এলেন সভার রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি একটু আড়ালে গিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন। এটাও দৃষ্টি এড়ায় নি তাঁর। তিনি গর্জে উঠলেন, 'কেন দারোগা সাহেব, আড়ালে গিয়ে কি রিপোর্ট লিখবে, যা লিখতে হয় সামনে এসে লিখ। ভাসানীর বিরুদ্ধে শক্ত রিপোর্ট না লিখলে ত তোমার চাকরি শক্ত হবে না। তোমার যা খুশী তুমি লিখ তাতে ভাসানীর কিছু আসে যায় না। একমাত্র খোদা ছাড়া ভাসানী কাউকে ভয় করে না।' সভা ভাঙার পর দারোগা সাহেব আমাকে ধরলেন একটু ভাসানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, ভাসানী তখনও স্টেজ থেকে নামেন নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বিভিন্ন লোককে পানি পড়া, তেল পড়া, চাল পড়া, ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি দিচ্ছেন। এমন সময় দারোগা সাহেবকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। দারোগা সাহেব সালাম দিতেই ভাসানী বললেন, 'আরে তোমাকে অনেক গালমন্দ করেছি, তা তুমি কিছু মনে করো না কিন্তু।' দারোগা সাহেব বললেন, 'হুজুর, গালমন্দ যতই করুন আপনার কথায় আমরা কেউ কিছু মনে করি না। আপনি আমাদের উপরে দোয়া রাখবেন সর্বদা।' এ কথার সাথে সাথে ভাসানী হু হু করে কেঁদে ফেললেন। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়তে লাগল। ভারী গলায় বললেন, 'তোমাদের দিকে চেয়েই ত বেঁচে আছি এখনও। তোমাদের জন্য দোয়া না করে কি পারি! তোমরা ত আমাদেরই সন্তান। তোমরাই ত এ দেশের ভবিষ্যৎ। তা তোমাকে একটা কথা বলি, শোন। এদেশের কৃষকেরা বড় অসহায়! তাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই! তারা জানে না জমিতে কখন সার দিতে হয়, কখন সেচ দিতে হয়। তারা জানে না ভাল বীজ না বুনলে ভাল ফসল পাওয়া যায় না। কৃষির টাকা দিয়েই তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন তোমার পিতা। এখন তুমি দারোগা হয়ে তাদের জন্য কিছু কর। তারা কেউ তোমার কথা ফেলতে পারবে না। তা তুমি যখন যে গ্রামে যাও তখন সে গ্রামের ২/৪ জন কৃষক, যাকে সামনে পাবে, তাকেই দু'কথা বলবে যে, সময়মত সার ও সেচ না দিলে ভাল ফসল হবে না। এভাবে চেষ্টা করলে তাদের বড় উপকার হবে।' এভাবে তিনি

www.pathagar.com

যখন, যেভাবে যতটুকু সুযোগ পেতেন দেশের কৃষকদের জন্য দু'কথা বলতেন, চেষ্টা করতেন তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের। তিনি কখনও তাদের কথা ভুলে যেতেন না। তাই তাদের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন তিনি!

তিনি তাঁর মুরিদ তথা সাধারণ মানুষকে কত ভালবাসতেন তার সর্বশেষ নজির মেলে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের ওসীয়ত থেকে। তিনি আমাদের জাতীয় নেতা ছিলেন। তাই অনেকের ধারণা ছিল যে, ঢাকাতে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের পাশেই তাঁরও মাজার হবে। কিন্তু বাংলার চাষী, মজুর, তাঁতী, কামার-কুমার বড় গরীব। তারা বেশী পয়সা খরচ করে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে ঢাকায় আসতে পারবে না বলে তিনি তাঁর মাজার সন্তোষে দেওয়ার জন্য ওসীয়ত করে গিয়েছেন।

তাঁর ঘটনাবহুল জীবন। তাঁর জীবনের কিছু ঘটনার কথা আমি তাঁর নিজ মুখ থেকে শুনেছি। তার কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি। কেউ কেউ বলতেন ভাসানী বয়স খুব বাড়িয়ে বলেন। আসলে তাঁর বয়স অত নয়। একবার বৃটিশ হাই কমিশনার তাঁর প্রকৃত বয়স জানতে চান। তিনি বলেন, 'তোমাদের সরকার প্রথম যখন আমাকে জেলে দেয় তখন সেখানে আমার বয়স লিপিবদ্ধ আছে।'

তিনি জীবনে ২৭ বার জেল খেটেছেন। জেলে মোট কাটিয়েছেন প্রায় ৩১ বছর। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পৃথিবীতে দীর্ঘদিন এতো আর কেউ সম্ভবত জেল খাটেন নি। আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে ভাসানীকে জেলে পুরে দেন। একাধারে সাড়ে চার বছর ধরে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখেন। একবার করাচীতে তাজমহল হোটেলে আইয়ুব খানের ছেলে গওহর আইয়ুব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কথাবার্তার পর বিদায়ের সময় গওহর আইয়ুব ভাসানীর হাত নিয়ে নিজের মাথায় ঘষতে ঘষতে বলেন, 'হুজুর, আমার যাতে টাকা পয়সা হয় সেজন্য একটু দোয়া করবেন। আপনি দোয়া করলে আল্লাহ রহমত করবেন।' তিনি বলেন, 'শুনেছি তুমি গান্ধারা ইণ্ডাস্ট্রির মালিক হয়েছে এবং ব্যাংকেও তোমার ৪৮০ কোটি টাকা জমা আছে। এরপরও যদি তোমার আরও টাকার জন্য ভাসানীর দোয়া লাগে, তবে এ দেশের সাধারণ মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে?'

ভাসানী প্রথম হজ্জে যান ১৯৪১-৪২ সালের দিকে। ইবনে সউদ তখন সৌদী আরবের বাদশাহ। তিনি ১০০০ হাজীকে দাওয়াত করেন তাঁর প্রাসাদে

www.pathagar.com

এক ভোজসভায়। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে যেহেতু মাত্র এক হাজার হাজীকে দাওয়াত করা হয়েছে, তাই কেবল তাঁর মত মৌলভী মওলানাদের দাওয়াত করা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সেখানে ভাসানী ছাড়া অন্য কেউ পাঞ্জাবী, টুপি পরিহিত ছিলেন না। সকলেই ক্লীন শেভ ও স্যুটধারী। খানার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কাটা চামচে। বিরাট হল ঘর। দেখতে দেখতে তিনি শেষ পর্যন্ত যান এবং গেটের দিকে মুখ করে আসন গ্রহণ করেন। খানা শুরু হলে বাদশাহ প্রবেশ করেন হলে। তিনি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে থেমে যান। আমার সাথে বাদশাহ প্রথম কথা বলেন। আমার নাম ও পরিচয় আমি তাঁকে বলি। কথা হচ্ছিল দোভাষীর মাধ্যমে। তাঁর সাথে বাদশার প্রথম কথা বলার কারণ হিসাবে তাঁর লুঙ্গি পাঞ্জাবী ও দাড়ি টুপি বলে মনে করেন তিনি। সকলে যেখানে কাটা চামচ দিয়ে খাচ্ছিলেন সেখানে তিনি হাত দিয়ে খাচ্ছিলেন—এটাও হতে পারে। তিনি মনে করতেন একই কাটা চামচ অনেকের মুখে যায়। কিন্তু খোদা প্রদত্ত হাত অন্যের মুখে যায় না। তাই তিনি কাটা চামচ দিয়ে খাওয়া পছন্দ করতেন না।

মওলানা আসামে গিয়েছিলেন জলেশ্বরের পীর নাসির উদ্দিন বোগদাদী সাহেবের সঙ্গে। সেখানে তিনি দীর্ঘ দিন থেকে পীরের সেবা করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। সেখানে থেকে পীরের খেলাত লাভ করে জলেশ্বর ত্যাগ করার ঘটনা তাঁরই এক সতীর্থ পীরভক্ত জনাব হেলাল উদ্দিন এভাবে বর্ণনা করেছেন। "একদিন দুপুর বেলা আমি ও মওলানা ভাসানী এক সঙ্গে চাষের জমিতে মই দিচ্ছিলাম। এমন সময় পীর সাহেব এসে মইয়ের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। এক সময় মইয়ের সামনে গিয়ে তাঁর হাতের লোহার লাঠি টান দিয়ে খুলে তার ভিতর থেকে দু'আনার তামার পয়সা বের করে তা মইয়ের সামনে বিছন বোনার মত করে ছিটিয়ে দিলেন। ভাসানী চটপট মই থেকে নেমে গিয়ে সব কয়টি পয়সা কুড়িয়ে সংগ্রহ করলেন এবং পীর সাহেবকে সালাম করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পীর সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে তাঁকে দোয়া করলেন। আমি মই নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিলাম। পীর সাহেব আমাকেই মই ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বললেন। এর পর থেকেই ভাসানীর নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু হয় এবং লোকজন তাঁর কাছে ভিড়তে শুরু করে। এই নাসির উদ্দিন বোগদাদী সাহেবকেই তিনি তাঁর পীর বলে

www.pathagar.com

পরিচয় দিতেন। তাঁর নামে সন্তোষে তিনি একটি হোস্টেলেরও নামকরণ করেছিলেন। হজ্জের পরে মদীনা শরীফেও তিনি ৩/৪ মাস অবস্থান করেন এবং এক পীরের নিকট আধ্যাত্মিক সবক গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার এক রাস্তার ধারে বসে জুতা সেলাই করতেন। আমার শ্বশুরকে (জনাব ওয়াজেদ আলী শিকদার) হজ্জে যাওয়ার সময় ভাসানী তাঁর মদীনার পীরের সঙ্গে দেখা করে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে খুঁজে পান নি।

একবার ভূরুঙ্গামারীতে জনাব আবদুল হালিম নামে এক ব্যক্তি ভাসানীকে খুব করে ধরলেন তাঁকে খেলাত অর্থাৎ মুরিদ করার অনুমতির জন্য। বহু সাধ্য-সাধনা, শেষ পর্যন্ত ভয়-ভীতি পর্যন্ত দেখালেন সারা রাত ধরে। কিন্তু কিছুতেই ভাসানী তাঁকে খেলাত দেন নি। তাঁর একই কথা যে, শরীয়ত বিরোধী কাজ কর্ম করে হাজার বার খেলাত নিলেও তাতে কোন লাভ হবে না। আর তাসাওউফের পথে সাধনায় যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে খেলাত চেয়ে নিতে হয় না। জনাব আবদুল হালিম সাহেব ভাসানীর জলেশ্বরের পীর বোগাদাদী সাহেবের এক পালিতা-কন্যা বিবাহ করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি ভাসানীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন আগে থেকেই। কিন্তু কোন অনুনয়, বিনয়, ভয়-ভীতি ও পরিচয়ের সূত্র ধরে ভাসানীকে বিচ্যুত করা যায় নি তাঁর নীতি ও আদর্শ থেকে।

তিনি শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতেন না এবং তা পছন্দও করতেন না। কখনও তাঁর নামায ক্বাজা হতে দেখি নি। সারা দিন তিনি নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু রাত ১টা/২টার পর থেকে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে নিরিবিলি কাটাতেন। অনেকের ধারণা শেষ রাতে তিনি জিকির-আজকার করে কাটাতেন। একবার আমি আজমীর-গামী এক পীর সাহেবকে ভাসানীর কামেলীয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ভাসানী ও আমার পথ এক নয়। তবে অনেক আগে এক সময় আমি তাঁকে খেয়াল করেছিলাম, তাতে তাঁর সাড়া পেয়েছিলাম। ভাসানীকে কেউ বলেন কুতুব। কেউ বলেন এদেশের গাউস। তাঁর আধ্যা-ত্মিক শক্তি ছিল বলে আমার বিশ্বাস।

১৯৭০ এর জুন মাস। হঠাৎ করে ভাসানীর সাথে দেখা হল খুলনায় জনাব আবদুল জব্বার সাহেবের বাসায়। তিনি তখন খুলনা জেলা ন্যাপের সভাপতি। ৪/৫ জন লোক তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। আমি যাবার পরে

www.pathagar.com

এক এক করে সবাই উঠে গেলেন। শেখ মজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন তখন চরমে পৌঁছেছে। আমি তাঁর কাছে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমাদের কাজ চলছে। দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে খুব গণ্ডগোল হতে পারে। ঐ সময় শহরে না থেকে গ্রামের দিকে চলে যাবি।'

একবার খুলনার এক জনসভায় ভাসানী বক্তৃতা শুরু করার অল্পক্ষণ পরেই এক দারোগা এসে বললেন, 'হুজুর আপনাকে এখনই থানায় যেতে হবে।' অনুমতি থাকা সত্ত্বেও যখন থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সভা করতে দেওয়া হবে না তাঁকে। তাই তিনি চট করে বললেন, 'একটু মোনাজাত করে সভা শেষ করে দিচ্ছি।' এই বলে মোনাজাত ধরলেন। রাব্বানা আতেনা বলে শুরু করে তাঁর পুরা বক্তব্য মোনাজাতের মধ্য দিয়ে যখন শেষ করলেন তখন আধ ঘন্টার উপরে সময় পার হয়ে গেছে। অনেকে কেঁদে ফেলেছেন। দারোগা সাহেবও রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। ভাসানী ছুটলেন থানার দিকে। দারোগা সাহেব বললেন, 'হুজুর, আর থানায় যেতে হবে না আপনাকে।'

আসাম থেকে আসার পর তিনিই প্রথম বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের পত্তন করেন। তখন মুসলিম লীগের একচ্ছত্র রাজত্ব চলছিল সারা পাকিস্তানে। পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিমটুকু বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয় দলের। সেই আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রেও ভাসানীর অবদান কারও চেয়ে কম নয়। গণ আন্দোলন সৃষ্টি করে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে খালাস করাতে ভাসানীর অবদান সবার শীর্ষে। শেখ সাহেব মুক্ত হতে না পারলে হয়ত ভুট্টোর মত তাঁকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ত আইয়ুব খান। শেখ সাহেবকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু কোন ভালবাসাই তাঁকে দেশপ্রেম ও সাধারণ মানুষের কথা ভুলাতে পারে নি। তাই তিনি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশে অবস্থান ও সীমানা চুক্তি ব্রিট্রেড-এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন যার ফলে ভারত দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার এবং সীমান্ত চুক্তি বাতিল করতে হয়। ভাসানীর প্রতিবাদের ফলেই ২৫ বৎসর মেয়াদী চুক্তির ব্যাপারে আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না। ভাসানীর প্রচেষ্টার ফলেই চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। যুক্তফ্রন্টের আমলে পাকিস্তানের সাথেও চীনের সম্পর্কের

www.pathagar.com

উন্নতি হয় তাঁরই চেষ্টার ফলে এবং চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই ঢাকায় আগমন করেন। এর পূর্বে চীন-ভারত সম্পর্ক খুবই সৌহার্দপূর্ণ ছিল। ফলে পাকিস্তানের সাথে চীনের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল না।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইজেন হাওয়ার চীনের বিরুদ্ধে 'যুক্ত প্রতিরক্ষা' নামে সেনোটা ও সিয়াটোর মত এক চুক্তির প্রস্তাব দেন। উদ্দেশ্য কম্যুনিজম ঠেকান। মার্কিনী সহায়তায় ভারত ও পাকিস্তান মিলিতভাবে এই প্রতিরক্ষা গড়ার কথা। এই সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পরামর্শের জন্য ভাসানীকে ডেকে পাঠান। এ ব্যাপারে ভাসানীর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'চীনের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেন দরকার তা তিনি বুঝতে পারেন না।' আইয়ুব খান বলেন, 'মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধে ভারতের যে টাইট অবস্থা- হয়েছিল তাতে যুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া চীনকে ঠেকানো যাবে না।' ভাসানী বলেন, 'যুক্তিবাদী হোন। পরের মুখে ঝাল খাবেন না। আপনার পাঠান, বেলুচ ও জাট বাহিনী এবং ভারতের শিখ রেজিমেন্টের সামনে চীনা সৈন্যরা দাঁড়াতেই পারবে না। কারণ তারা আকারে অনেক ছোট। শুধু আকার ছোট বলেই ত বাংগালীদের আপনি সেনাবাহিনীতে নিচ্ছেন না। চীনারা বাংগালীদের চেয়ে ছোট। কাজেই তাদের ভয়ে ভীত হবার কোন যুক্ত নাই।' এ কথার মর্মার্থ আইয়ুব খান উপলব্ধি করেন এবং তখন থেকেই বাংগা-লীদের বর্ধিত হারে সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাংগালী সৈন্যরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং ১৯৭১ সালে আইয়ুব খানের দোসর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন ক্ষুদ্রাকৃতিবিশিষ্ট বাংগালীরা। কিন্তু ভাসানীর এত বড় অবদানের মূল্যায়ন হয় নি এতটুকুও।

শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন প্রথম কাতারের নেতা। আসামে তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর চেষ্টাতে কায়েদে আজম মিঃ জিন্নাহ একবার মাত্র আসামের বড়পাটায় গিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর আসাম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট বড়ধলৈ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন স্যার সাদুল্লাহর ১৭ বৎসর মন্ত্রিত্বের পর। ভাসানী তখন আসাম মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট। বড়ধলৈ ভাসানীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রস্তাব দেন যে, গোয়ালপাড়া জেলা, কামরূপের বড়পাটা মহযুথ, সিলেট ও কাছাড় জেলা পুরোপুরি তারা

www.pathagar.com

আপোষে পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে রাজী আছে যদি আসামের বাকী অংশ তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এ প্রস্তাব নিয়ে ভাসানী কয়েকবার মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব সময়ের অভাবের অজুহাতে ভাসানীর সাথে আলোচনায় বসেন নি। শেষবারে তিনি লিয়াকত আলী সাহেবকে ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। আলোচনা শেষে লিয়াকত আলী খান বলেন, "যদি এটুকু নিয়ে সারা আসামের দাবী ছেড়ে দেন তবে আসামের বাকী অংশের মুসলমানের ভাগ্যে কি ঘটবে?" তিনিও এর কোন সমাধান দেন নি। পরে গণভোটের মাধ্যমে একমাত্র সিলেট জেলা পাকিস্তানে যুক্ত হয় করিমগঞ্জ মহকুমা বাদ দিয়ে।

ভাসানী ছাড়া ভারতের পূর্বাংশের আর তেমন কোন সংগ্রামী ও সক্রিয় নেতা মুসলিম লীগে ছিলেন না বলা চলে। কারণ শেরে বাংলা তখন মুসলিম লীগের বাইরে। সোহরাওয়ার্দীও বাংলা বিভক্তির ব্যাপারে মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে একমত ছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ ভাসানীকে কয়েদ করায় তিনি র‍্যাড-ক্লিফের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পারেন নি। একদিকে গোয়ালপাড়া পাকিস্তানে না আসায় ভাসানী আসামে রয়ে গেলেন অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বাদ দিয়ে নাজিমউদ্দিন সাহেব তড়িঘড়ি করে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। নাজিমউদ্দিনের পর জনাব নূরুল আমিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর সময়ে দুটো প্রধান ঘটনা তাঁর শাসনকে জনগণের কাছে ভীষণভাবে অসহনীয় করে তুললো। এর একটি হল লবণের দাম ১৬ টাকা সের এবং ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে পুলিশের গুলীতে ছাত্র নিহত। এর প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ভাসানী, শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মিলিত প্রচেষ্টায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ব্যাপকভাবে বিজয়ী হয়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন পর্যন্ত পরাস্ত হন নির্বাচনে। যুক্তফ্রন্টের শর্তাবলী প্রণীত হয়েছিল মূলত ভাসানীর কথামত। নির্বাচনের প্রতীক 'নৌকা'-ও নির্ধারণ করেছিলেন ভাসানী।

ভাসানী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন না, সরকারী দলে থাকেন না এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন না—এ নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে। একবার আমে-রিকা থেকে এক সাংবাদিক এলেন সন্তোষে তাঁর সাথে দেখা করতে। সাংবাদিক প্রশ্ন রাখলেন, 'আপনি মন্ত্রী হন না কি আপনি দেশ শাসন

www.pathagar.com

করতে পারবেন না; আর নির্বাচনে দাঁড়ান না কি ভোট পাবেন না সেই ভয়ে না কি অন্য কিছু ?" ভাসানীর জবাব সংক্ষিপ্ত, "আপনি সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছেন। আপনি এ দেশের শাসন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনাদের মত আমাদের দেশের মন্ত্রীরা দেশ শাসন করে না। দেশ শাসন করে থানার দারোগা আর মহকুমার এস. ডি. ও. সাহেবরা। নির্বাচনে না দাঁড়ানোর কারণ হল যারাই নির্বাচনে দাঁড়ায় তাঁরাই পরে জনগণের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে লেগে যায়। আমি জনগণের সাথে থাকতে চাই। তাই নির্বাচন করি না, নির্বাচন করাই।'

১৯৬৪ সালের দিকে একবার রাজশাহীতে আসেন মওলানা ভাসানী। তিনি তখন পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি। জনাব আতাউর রহমান সাহেব তখন ন্যাপের রাজশাহী জেলার সভাপতি। তাঁর বাড়িতে কর্মী সম্মেলন। রাত সাড়ে নয়টার দিকে আমি সেখানে দেখা করতে গেলাম। সম্মেলন শেষে আমি সাক্ষাৎ পেলাম। সালাম দিয়ে কিছু আলাপের পর বিদায়ের সময় আমি তাঁর হাতে ১০টি টাকা দিলাম। তিনি টাকাটা পকেটে না রেখে হাত উঁচু করে সবাইকে দেখতে লাগলেন। এক হাতে টাকা এবং এক হাতে আমার হাত ধরে তিনি দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'মিয়ারা দেখ, এক ভক্তের জামাই এই দশটি টাকা দিয়েছে। এটা ভাসানী নিজে খাবে না। তাঁর স্ত্রী পুত্রও কেউ এ টাকা পাবে না। ভাসানীর এমন লক্ষ লক্ষ মুরিদ ও ভক্ত আছে। তারা সবাই অকাতরে দান করে। সেটাতেই ভাসানীর স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চলে। আর সরকার বলে ভাসানী এত টাকা পায় কোথায় ? এ টাকা ভোগ করলে আর সকলের মত ভাসানীর ঢাকা করাচীতে ২/৪ টা দোতলা বাড়ি থাকত।' সেদিন বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম ভাসানীর কাণ্ড দেখে। এমন ঘটনা অনেক দেখেছি যে, একদিকে যেমন লোকে তাকে টাকা পয়সা দিচ্ছে অন্যদিকে তিনি আবার সংগে সংগেই তা বিতরণ করে দিচ্ছেন দুঃখীদের মধ্যে।

১৯৫৬ সালে বার্লিনে বিশ্ব শান্তি কমিটির বৈঠক বসে। পাকিস্তান থেকে একমাত্র ভাসানী সে বৈঠকে আমন্ত্রণ লাভ করেন। ইস্কান্দার মির্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। লণ্ডন পর্যন্ত যাওয়ার পর কৌশলে ভাসানীর বার্লিন গমন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ভাসানীও তা টের পেয়ে অন্য লোক মারফত তাঁর লিখিত ভাষণ সম্মেলনে পাঠিয়ে দেন। সেটাই ছিল বিশ্ব

www.pathagar.com

দরবারে পঠিত সর্বপ্রথম বাংলা ভাষণ। দ্বিতীয় ভাষণ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সুসাহিত্যিক বহুস বসু পিকিং-এ ১৯৫৮ সালে কোরিয়া শান্তি সম্মেলনে। তৃতীয় ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান নয়া দিল্লীতে ১৯৭২-এর জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলায় আসার পথে।

তখন সিলেটের খোন্দকার ইলিয়াস ভাসানীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। 'ভাসানী যখন ইউরোপে' বই লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেন।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তিনি মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা হাসমত মোহানী ও মওলানা আবুল কালাম আজাদকে শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে তিনি কাগমারীতে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়াও পণ্ডিত নেহেরু, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিশ্বের বহু নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপ-পরিচয় ছিল। তাঁদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডা. সুয়েকর্ন, মিশরের কর্নেল নাসের এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, চীনের মাও সেতুং ও চৌ এন লাই-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বার্ট্রান্ড রাসেল যখন লোকের দেখা সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তিনিও এক সময় সাগ্রহে দেখা করে যান ভাসানীর সঙ্গে লণ্ডনে। একবার চীন সফরে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে চৌ এন লাই তাঁকে দেখতে আসেন সাইকেলে করে। তাঁর সাইকেলে আসার কারণ জানতে চাইলে চৌ এন লাই বলেন, "আজ ছুটির দিন। তাছাড়া আপনাকে দেখতে এসেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে। এটা কোন রাষ্ট্রীয় কাজ নয়। সরকারী কাজ ছাড়া আমি সরকারী গাড়ী ব্যবহার করি না।" এ প্রসঙ্গে ভাসানী বললেন, "যদি আমাদের দেশের শুধু সরকারী গাড়ীর অপচয় রোধ করা যেত তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যেত।" সরকারী অর্থের অপচয়ে তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য তিনি পাকিস্তানের শুরু থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সকল সরকারকেই অনুরোধ করেছেন।

একবার কর্নেল নাসেরের আমন্ত্রণে তিনি মিশর সফর করেন। কর্নেল নাসের তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত বাগান প্রদর্শন করান। সেখানে ফলমূলের গাছের ফাঁকে আলু চাষ করা হয়েছে এবং গাছে চাষ করা হয়েছে মৌমাছির। এভাবে একই বাগান থেকে ত্রিবিধ উৎপাদন করেছেন মরুভূমির দেশেও।

www.pathagar.com

কৃত্রিম উপায়ে আকাশে মেঘ জমিয়ে বোমার সাহায্যে তা ফাটিয়ে বৃষ্টি আকারে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জর্ডনের কথা তিনি বলেছেন যে, সেখানে একই আলু গাছ থেকে তিনবার আলু আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি ইরাক থেকে কারবালা প্রান্তর দেখতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় করে। তিনি বলেন, "কার-বালার মত এত সুন্দর খেজুরের বাগান আর কোথাও দেখি নাই জীবনে।"

এখানে তাঁর দুঃখ হলো, যে দেশে শুধু চাষ করে বীজ বুনলেই ফলন হয় সে দেশকে খাদ্যের জন্য বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এর জন্য আমাদের ভাগ্য নয়—সরকারই দায়ী।

নির্মিত হয়নি তাঁর কোন স্মৃতিসৌধ। 'ভাসানী স্মৃতি সংসদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড দেখি মুখব্যাদান করে ছাদের উপর কাত হয়ে পড়ে—আমাদেরকে নির্মম বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপহাস করছে আত্মবিস্মৃতির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকের নামে হল তৈরী হয়েছে এটা ভালো কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এখানে এই মহান জননেতার নামে একটি কুটিরও তৈরী করা হয় নি। তাঁর মৃত্যুর নয় বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি পূর্বাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ প্রণীত হয় নি। এটা আমাদের জাতীয় দৈন্যকেই প্রকটভাবে তুলে ধরে।

পক্ষান্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সন্তোষে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়টা না চালিয়ে অন্যত্র ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভাসানীর অবদানকে অস্বীকার করারই অপচেষ্টা। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন ও সন্তোষে ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই হবে ভাসানীর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একমাত্র নিদর্শন।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান

মওলানা ভাসানীকে যতটুকু মনে পড়ে

১৯৬৩ ইংরেজীর প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে চট্টগ্রাম জেলার বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়, বিশেষত পটিয়া ও বোয়ালখালী থানার রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বস্থ সমুদয় অঞ্চলে এ ক্ষতির পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী। সুতরাং আমাকে দুঃস্থ ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করতে হলো। চট্টগ্রাম নাগরিক সাহায্য সমিতির আমি ছিলাম কার্যত সভাপতি। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জনাব হাজী ইসলাম খান সাহেব ও অক্লান্ত কর্মী জনাব আজিজুর রহমান সেক্রেটারী। আমাদের এ কমিটি অন্যান্য মেম্বারের সহযোগিতায়, যেমন খেদমত কমিটি ও রেডক্রস সোসাইটির সহযোগিতায় রিলিফ কাজ ভালভাবেই চালিয়েছিল। কিন্তু এ সাহায্য সার্কেল অফিসার ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে বিলি-ব্যবস্থার ফলে যথাস্থানে না পৌছার দরুন নানা স্থানে এদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে।

একদিন নাগরিক রিলিফ কমিটির এক সাধারণ সভায় চাঁদা তোলার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বক্তৃতা করার পর মাগরিবের নামাযের সময় নিকটবর্তী হওয়াতে আমি সভাপতিরূপে কিছু বলতে যাব এমন সময় আমার পিছন দিক থেকে কয়েকজন ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয়ে আমাকে চুপি চুপি জানালেন, মওলানা সাহেব কিছু বলতে চান। তিনি কোথায় জানতে চাইলে তাঁরা আমার পিছনের সারিতে উপবিষ্ট একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিয়ে দিলেন। চেহারা ও বেশবাস দেখে তাচ্ছিল্যভরে বললাম, 'এখন বাজে মোল্লার বক্তৃতা করবার সময় নেই।' একজন আমার কানে কানে বলল, 'ইনি মওলানা ভাসানী সাহেব। তাঁকে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় দিন।' নাম শুনে তাঁকে আমি সাদরে আহ্বান জানালাম। তিনি উঠে পাঁচ মিনিটের বেশী বললেন না বটে, কিন্তু যা বললেন তার মধ্যে দুঃস্থ জনগণের প্রতি তাঁর মমতা যেমন উছলে পড়ল তেমনি গভর্নমেন্টের প্রতিও তীব্র সমালোচনার

www.pathagar.com

তীক্ষ্ণ তীর নিক্ষিপ্ত হলো। তিনি দু'একদিনের মধ্যে আমাদের রিলিফ ফান্ডে ছয় হাজার টাকা চাঁদা দেবেন—এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি কোনরূপ মন্তব্য ছাড়া তাঁকে এবং অন্যান্য যাঁরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করলাম।

এর কিছুদিন পরে ভাসানী সাহেব চট্টগ্রাম এলে আমার কনিষ্ঠ ছেলে জহরুল ইসলাম তাঁকে আমার নাম করে বাড়ীতে একদিন বিকেলে চায়ের দাওয়াত করে। মওলানা সাহেব তাকে খুব ভালবাসে, তার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও একনিষ্ঠতার কথা তিনি জানেন। তিনি একদিন বিকেলে ১৯৬৩ ইংরেজী শেষের দিকে আমার বাড়ীতে আসলেন। চা-নাস্তা খেতে খেতে আমার এখানে দৈনন্দিন বৈকালিক বৈঠকের লোকজনও আসতে শুরু করল। আদর-আপ্যায়নের মধ্যে তাঁকে আমি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, 'মওলানা সাহেব, বয়সে তো অনেক হলো প্রায় কবরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখনও কি আপনার ভাঙার খেলা শেষ করে গড়ার আয়োজনে লিপ্ত হবার সময় হয়নি? মৃত্যুর পর আপনার স্মৃতি কি কেবল কালাপাহাড়ের মত ভাঙার সাথে জড়িত হয়ে থাকবে? জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি গড়ে তোলবার ব্যাপারে ইতিহাসে আপনার কি কোন চিহ্নই থাকবে না?' একথা শুনে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'দেখুন, ভাঙার দিকেই আমার প্রবণতা যেন সহজাত। যা আজ আমি গড়ে তুলতে চাই কাল তা আবার ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় কিছুই আমার মন মত হচ্ছে না। কাজেই আমি তৃপ্তি পাই না।' আমি তাঁকে নিতান্ত সরলভাবে বললাম, 'আইয়ুব সরকারের আমলে ভাঙা-গড়ার খেলায় জুৎ করতে পারবেন না। সেটা আমরা যেমন বুঝি, আপনিও বোঝেন। অথচ আপনারা দু'জনেই মনে-প্রাণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতি কামনা করেন। সুতরাং যে ক'টি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে তাঁর সঙ্গে আপনার মতের মিল খুঁজে পান সেসব ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বর্থের খাতিরে আপনি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন। একজনের পক্ষে দেশের সকল সমস্যার সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আপনার সংগে আলোচনার ফলে হয়ত তাঁর দৃষ্টির পরিধি সম্প্রসারিত ও সমাধানের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রস্তাবসমূহও তিনি এক সময় বিবেচনার জন্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং সেসবের কয়েকটি গ্রহণও করেছেন।'

www.pathagar.com

মাগরিবের নামায আমার এখানে বরাবরই জামাতের সাথে পড়া হয়। সেদিন মওলানা সাহেব ইমামতি করলেন। নামাযের পর কিছুক্ষণ ধরে একটিমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করলাম। বললাম, 'ষাটের উর্ধ্বে বা তার কাছাকাছি বয়সের যত নেতা আছেন, সবাইকে নিয়ে একটি "কাউন্সিল অব এল্ডারস" গঠন করে তার উপর নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়া হবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক চরিত্রবান রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত কর্ম পরিষদের উপর কার্যনির্বাহের অর্থাৎ নীতিগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার ভার অর্পণ করা হবে। তাঁদের মধ্য থেকে মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত হবে। এতে দলাদলি ও নেতৃত্বের কোন্দল অনেক পরিমাণে হ্রাস পাবে। যে কোন বিরোধী পার্টির ভূমিকা হবে গঠনমূলক সমালোচনা—বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা নয়, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে গদি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও মারামারি করলে দেশের যে ক্ষতি ১৯৫২ হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত হয়েছে বিষাদময় ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বিদ্বেষপূর্ণ দলাদলি ইসলাম সমর্থন করে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর সমর্থদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে পত্রযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে কেউ নিন্দনীয় মনে করতেন না।

কাউন্সিল লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাতে ইসলাম ইত্যাদি বিরোধী দলের ভিন্ন ভিন্ন প্রচারণায় জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে অবশেষে একান্ত বিরক্তির সাথে এগুলোর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে লোক সংগ্রহ করে জনপ্রিয়তা প্রদর্শন করতে চেষ্টা পেলেও আসলে তামাসা ও হুজুগের আকর্ষণে অনেক সময় সব দলের সভায় ভিড় জমে। কিন্তু তাতে কিছুরই প্রমাণ হয় না। বাস্তবধর্মী গঠনমূলক সমালোচনার উদ্দেশ্যে একটি বিরোধী দল যে কোন সরকারের কাম্য। হয়ত প্রেসিডেন্ট সাহেবও তাই চান (১৯৬৩)। কিন্তু আমাদের এমন বরাত যে, তুচ্ছ স্বার্থ ও নেতৃত্বের মোহে দেশের যাঁরা হিতকামী সেজে নানা দলে বিভক্ত হয়ে অরণ্যে রোদন করছেন, তাঁরা কিছুতেই এই সরল সোজা কথাটা বুঝলেন না। মওলানা সাহেব যদি ঐ উদ্দেশ্যে অকপট চেষ্টা করেন তবে তিনি জনসাধারণ ও সরকার উভয়ের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন।'

www.pathagar.com

তিনি বললেন, 'প্রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে আমি কি করে নিজ হতে দেখা করতে যাই? তিনি ডাকলে অবশ্য যেতে পারি।' উত্তরে জানালাম যে, ইচ্ছে থাকলে উপায় আপনি হয়ে যাবে। সেজন্য তাঁকে চিন্তা করতে হবে না। নতুন পার্টি করার প্রশ্নে তিনি বললেন, 'দেশে নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক নেতার দুর্ভিক্ষ লেগেছে। স্বার্থ ছাড়া অর্থাৎ পদ, খ্যাতি, অর্থ ক্ষমতা ইত্যাদির প্রলোভন ছাড়া কেউ কাজ করতে রাজী নয়। আপনার মত দশজন লোক পেলে এরূপ পার্টি করা সম্ভব হত।' আমি হেসে বললাম, 'সে দশজনের মধ্যে তাঁর কথামত তিনি ও আমি ছাড়া আটজন লোকের দরকার। তাঁদের পাঁচজন বাছাই করার ভার যদি তিনি নেন, অবশিষ্ট তিনজন বাছাই করার ভার আমি নিতে পারি। তিনি মেহের-বাণী করে কিছুদিন এরূপ গঠনমূলক কোন কাজে লিপ্ত থাকুন সেটাই আমি মনে প্রাণে কামনা করি।'

মওলানা ভাসানী—আমার ধারণা, তিনি যেন একটি ধ্রুব লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেটা হাসিলের জন্য কোন একটি সুচিন্তিত পন্থা বা ছবিল খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরেছেন। যখন যে উপায় উপযোগী মনে হয়, তাই তিনি আঁকড়ে ধরেন এবং যখনই বুঝতে পারেন তাতে কার্য সিদ্ধি হবে না তখনই অন্য উপায়ের সন্ধানে আকুলি বিকুলি করেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন।

www.pathagar.com

মাহমুদ আলী

স্মৃতির পাতা খুলে

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে আমি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নিকট থেকে এই মর্মে এক জরুরী বার্তা পেলাম, আমাকে কমিটি অফ একশনের সভা, বেঙ্গল আসাম মোজাহিদ সম্মেলন, বেঙ্গল আসাম ন্যাশনাল গার্ডস কনফারেন্স, বেঙ্গল আসাম নও-জোয়ান সম্মেলন এবং বেঙ্গল আসাম লিটারেরি কনফারেন্সে যোগদানের জন্য ধুবড়ী (আসাম) রওয়ানা হতে হবে। পরদিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলোতে এই খবর বেরুলো যে, বাংলাদেশ থেকে অনেক মুসলিম লীগ নেতা উক্ত সম্মেলন-সমূহে যোগদান করবেন। সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী। আর সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালেরই ৩রা ও ৪ঠা মার্চ।

ধুবড়ী (আসাম) বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি ছোট্ট শহর, এক বর্গমাইল ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি উঁচু ভূমিতে অবস্থিত। ১৯৪১ সালের সেনসাস অনুসারে সেখানে ২২,০০০ লোকের বসতির মধ্যে বেশীর ভাগই হিন্দু। শহরের পার্শবর্তী গ্রামগুলো বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান অধিবাসীতে পূর্ণ।

কলকাতা থেকে আগত 'মুসলিম লীগ উইমেন্স ন্যাশনাল গার্ডস'-এর অনেক সদস্যসহ মুসলিম লীগের বহু নেতা, প্রতিনিধি ও অতিথিদের—যাঁরা সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসছেন, সবারই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ধুবড়ীর মতো ছোট্ট একটা শহরে যেখানে কোন হোটেলের ব্যবস্থা নেই। মওলানা সাহেবের জরুরী বার্তা পেয়ে যখন আমি সিলেট থেকে ধুবড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম, আমাকে উপরোক্ত সমস্যা খুবই উদ্বিগ্ন করে তুললো। কিন্তু ধুবড়ীতে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম! সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেছে—মওলানা ভাসানী খুব ভালো করেই জানেন, কি করে এসব কাজ

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ সাফল্যের সাথে সমাধা করতে হয়। দেখে অবাক হলাম, সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু সকল প্রতিনিধি ও অতিথির জন্য একটা রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এমন নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে, কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই।

খোলা মাঠ, (যেখানে সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল) সেখানে অনেক চালা ঘর তৈরী হয়েছে। মাঝখানে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল। চালা ঘরে প্রতিনিধিদের এবং অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মওলানা ভাসানী ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রিতদের সকল প্রকার সুবিধার দিকে নিজেই নজর রাখছেন ও এ চালা ঘর থেকে ও চালা ঘরে ছুটাছুটি করছেন।

আমরাও ঘুরে ঘুরে হঠাৎ দেখতে পেলাম, মওলানা নিজ হাতে কুয়ো থেকে পানি তুলে বড় বড় বালতি ভরছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত মেহমানদের গোসলের জন্য। তাঁর ব্যবস্থাপনা এমন নিখুঁত ছিল যে, অতিথিদের এতটুকু অসুবিধা হয়নি।

সম্মেলনস্থলসহ বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল বহু মানব সন্তান—যারা বাংলা দেশের সামন্ত প্রভুদের মর্মান্তিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে পূর্বপুরুষদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই অসহায় দুর্ভাগারা আসামের জঙ্গলে এসে ডেরা বেঁধেছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আগত এই হতভাগারা ঝাড়-জঙ্গল কেটে চাষাবাদ করে বিস্তীর্ণ অনাবাদী জমি শস্যশ্যামলা করে তুলুক, আসামের সম্পদ বৃদ্ধি করুক, আসাম সরকার তা চায় না, যুগযুগান্তর ধরে বন্য জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্রে এই বিস্তীর্ণ এলাকাকে 'সংরক্ষিত' করে রাখাই আসাম সরকারের নীতি, অসহায়ভাবে বিচরণরত এই সকল পুরুষ ও নারী দেখলো, মওলানা ভাসানী একদল বীর যুবক নিয়ে তাদের পক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই এসেছে হাজার হাজার পুরুষ ও নারী। এই সম্মেলন তাদের জন্য এনেছে মুক্তির আহ্বান।

মওলানা এখানে সেখানে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কদমবুসি করছে। শুধু তাই নয়, তাঁর অসংখ্য ভক্ত একটি করে টাকা তাঁকে নজরানা দিচ্ছেন, এক টাকার নোটের ছড়াছড়ি। এবং এই টাকা দিয়েই তিনি সম্মেলনের বিপুল ব্যয় মুকাবিলা করেছিলেন। এমন কি অন্য কোন টাকার আর দরকার পড়েনি।

www.pathagar.com

অগণিত অতিথি প্রতিনিধি ও কর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন চা'ল, তরকারী এবং রান্নাবান্নার অন্যান্য সামগ্রীর। দেখা গেলো, এসবেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তিনি নাকি তাঁর ভক্তদের আগেই বলে রেখেছিলেন এ সবের কথা। প্রচুর মাংস ও মাছও এসে গেছে।

বাবুর্চিরা রান্না করছে। রান্না চলতেই লাগলো। অসংখ্য লোক খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে নিয়োজিত বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। মওলানা নিজে সবদিকে তদারক করছেন। অতিথিদের কোথায় এতটুকু ত্রুটি হয় সে ভয়ে মওলানা সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন। তিনি যে পর্যন্ত না সব কাজ নিজের চোখে দেখেছেন সে পর্যন্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না।

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আবদুল মজিদ জিয়া উস্-শামস্ (আইনজীবী) এবং আমাদের আইন সভার প্রাক্তন সদস্য আমাকে জানালেন যে, তিনি বৈকালে শহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা বের করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে ডিপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনো তার কোন উত্তর পান নি। আমি জানতাম, হয়তো তিনি এর কোন উত্তর পাবেন না। যদিও বা উত্তর আসে, তাহলে তাঁর আবেদন না-মঞ্জুরের বার্তা নিয়েই আসবে। আমরা সরকারের উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছি। সুতরাং এই সরকারের অধীনে চাকরিরত একজন ডিপুটি কমিশনার কিছুতেই আমাদের অনুমতি দিতে পারেন না। তাই আমরা নিজেদের দায়িত্বেই একটি শোভাযাত্রা বের করতে মনস্থ করলাম। আমরা আর অনুমতির ধার ধারলাম না। শোভাযাত্রার কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, সুতরাং এই শোভাযাত্রা বের করতেই হবে।

শোভাযাত্রা বের হলো, শহরের ভেতর দিয়ে শোভাযাত্রা চলতে লাগলো।

বহু সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল শহরের রাস্তা ঘাটে। আমাদের শোভাযাত্রায় ছিল প্রায় বিশ সহস্রেরও অধিক লোক। আইন সভার বহু সদস্য এবং অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানী শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে তা পরিচালনা করতে লাগলেন। শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ এবং আসামের মুসলিম লীগ, ন্যাশানাল গার্ডস-এর নেতৃত্ব করেন আই. এ.

www.pathagar.com

মুহাজির এবং সৈয়দ বদরুল হোসেন। দি উইমেন ন্যাশনাল গার্ডস্ দলকে পরিচালনা করেন মিসেস রোকেয়া আনোয়ার।

আমাদের গোটা শহর ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

শোভাযাত্রা প্যাণ্ডেলের দিকে ফিরছে। কিন্তু আমরা আমাদের প্যাণ্ডেল থেকে এক ফার্লং-এর মতো পথ দূরে থাকতেই দেখতে পেলাম অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত বিরাট একটি পুলিশ বাহিনী শোভাযাত্রার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা ঘোলাটেই মনে হলো।

আমি পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যখন আমাদের গন্তব্যস্থলে প্রায় পেঁছে গেছি, তখন এভাবে পথ আটকানোর অর্থ কি ?' আমি তাঁকে আমাদের পথ ছেড়ে দিতে বললাম। কিন্তু তিনি জানালেন যে, ডিপুটি কমিশনারের আদেশ ছাড়া তিনি আমাদের পথ ছেড়ে দিতে পারেন না। আমি তাঁকে যত তাড়াতড়ি সম্ভব ডিপুটি কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি আনাবার জন্য বললাম। পুলিশ অফিসার ডিপুটি কমিশনারের নিকট অনুমতির জন্য নোট লিখে পাঠালেন। ইতিমধ্যেই মাগরেবের নামাযের সময় হয়ে এলো। আমরা সবাই রাস্তার উপরই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম এবং নামায পড়লাম।

নামাযের শেষে সেদিনের মোনাজাতটাই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোনাজাতের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ইমাম দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন ঃ আল্লাহ যেনো অসহায় গরীবদের বৈধ দাবিদাওয়া পূরণের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করেন। এবং সকল অত্যা-চার ও অবর্ণনীয় দুঃখ অবসানের জন্য তাদেরকে সকল প্রকার শক্তি যোগান।

মোনাজাত শেষ হবার পরেই আসলো ডিপুটি কমিশনারের অনুমতি-পত্র। আমরা সবাই আবার গন্তব্যস্থলের দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই নজরে পড়লো, বহু লোক লাঠি-বল্লম হাতে নিয়ে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ তারা কার থেকে যেনো শুনেছে যে, আমাদের ওপর পুলিশ অত্যাচার করেছে এবং মওলানা ভাসানীসহ অনেকে আহত হয়েছেন। তাদের রাগ-দুঃখের নিরসন হলো যখন মওলানা সশরীরে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

www.pathagar.com

আমরা প্যাণ্ডেলে ফেরার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্মেলন আরম্ভ হলো। প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল। তার এতটুকু স্থানও খালি নেই। প্যাণ্ডেলের বাইরের খালি জায়গাতেও লোকে লোকারণ্য।

মওলানা ভাসানী দাঁড়ালেন লাউড স্পীকারের সামনে। মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস। মওলানা ভাসানী পুরো দু'ঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন। তিনি দেশের ও জনসাধারণের সকল প্রকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'আসামের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে—আসুন আমরা সবাই এই মহান সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। আমরা ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সংগ্রাম বন্ধ করবো না।' তাঁর বক্তৃতা কালে সবাই স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনেছিল—অত বড় সভার কোথাও এতটুকু শব্দটি পর্যন্ত হয়নি।

এই সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম লীগের নেতারাও বক্তৃতা করেন এবং অনেক উৎসাহের সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সত্যাগ্রহে যোগদান করার জন্য হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আসামে পাঠানো হবে। কিন্তু যখন সময় হলো, দেখা গেলো এদের প্রেরিত একজন স্বেচ্ছসেবকও আসামে এলো না।

বাংলাদেশের প্রদেশিক মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ ইউসুফ আলী চৌধুরীর (মোহন মিয়া) মারফত দু'হাজার টাকা ছাড়া এই আন্দোলনে আর কোন সাহায্য বাংলা থেকে পাওয়া যায় নি।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে শেষ হলো সম্মেলন। প্রতিনিধি, অতিথি এবং সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্য ব্যক্তি সবাই নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে রওনা হয়ে গেলেন সম্মেলন থেকে লব্ধ প্রেরণা সঙ্গে নিয়ে।

www.pathagar.com

শাহেদ আলী

মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে

মওলানাকে প্রথম দেখি খুব সম্ভব ১৯৪০-এ। তখন আমি সুনামগঞ্জ জুবিলী হাই স্কুলের ছাত্র। স্কুলের কাছেই জামে মসজিদ। যুহর এবং আসরের সালাত মসজিদেই আদায় করি। একদিন শুনলাম মওলানা আবদুল হামিদ খান বক্তৃতা করবেন মসজিদ প্রাঙ্গণে—আসরের সালাতের পর। তাঁর নাম পত্রিকায় প্রায়ই পড়তাম ঃ তিনি আসাম উপত্যকার মুসলমানদের অধিকার বিশেষ করে, বাংলাদেশ থেকে যে সব ছিন্নমূল মানুষ ওখানে গিয়ে বন-জঙ্গল সাফ করে, বাঘ, ভালুক, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের সাথে লড়াই করে আসামকে সোনার দেশ বানিয়েছে, তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন। সেই মওলানা এসেছেন সুনামগঞ্জে। আমি আমার ক'জন ছাত্র বন্ধুকে নিয়ে ছুটলাম মসজিদের দিকে।

সালাতের পর খুব কাছে থেকে দেখলাম মওলানাকে। তাঁর মাথায় ছিল পাগড়ী, পরনে পাজামা আর লম্বা সাদা কুর্তা। গোলগাল মুখে কাল চাপ দাড়ি। উচ্চতায় খাটোই বলা যায়। মসজিদ প্রাঙ্গণে মওলানা বক্তৃতা করলেন ইসলামের উপর। কি যে জোস্, তেজ তাঁর বক্তৃতায়! শ্রোতা ছিলাম আমরা মাত্র ক'জন। কিন্তু মওলানার বক্তৃতায় আমরা সেই অল্প ক'টি মানুষ উৎসাহ উদ্দীপনায় যেন ফেটে পড়লাম।

এর পর থেকে পত্র-পত্রিকায় যখনই মওলানার কোন খবর বের হয়, খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ি। আসাম উপত্যকায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন মওলানা। কিছুদিন পর আসামের রাজধানী সিলং-এ তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হল আবার। পরিষদ ভবনে সেদিন বক্তৃতা চলছিল। আসামে তখন সাদউল্লাহ মন্ত্রী সভা ক্ষমতায়। মওলানা ছিলেন পরিষদে মুসলিম লীগের সদস্য। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গী আর সাদা কুর্তা। সাদউল্লাহ্‌র মন্ত্রীসভা ছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা। কিন্তু সাদউল্লাহ্‌কে আক্রমণ করে মওলানা যে

www.pathagar.com

ভাষণ দিলেন তাতে পরিষদের লীগ দলীয় সদস্যদের মুখ একেবারে কাল হয়ে গেল।

অন্যায়, প্রতারণা ও শঠতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দিলেন মওলানা। বুঝলাম মওলানা পার্টির সদস্য বটে কিন্তু পার্টির গোলাম নন। তিনি তাঁর বিবেককে পার্টির নেতৃত্বের কাছে বন্ধক দিতে রাজী নন। তাঁর দৃষ্টিতে পার্টির লক্ষ্যের চাইতে পার্টির শৃঙ্খলা বড় নয়। পার্টি যদি তার আচরণে, পার্টির ঘোষিত আদর্শ ও তার লক্ষ্যকে চাপা দিয়ে কেবলই ক্ষমতা অর্জন ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য ষড়যন্ত্র ও দলাদলিতে মগ্ন থাকে, মওলানা তা বরদাস্ত করতে রাজী নন। সেদিন আইন সভায় মওলানা যে বক্তৃতা করেন তাতে মুসলিম লীগ দলীয় পার্লামেন্টারী পার্টি বিব্রত বোধ করলেও মওলানা পার্টির মূল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করেছিলেন। নিপীড়িত জনগণের স্বার্থ রক্ষা, তাদের মুক্তি ও অধিকার সংরক্ষণই গণ-ভিত্তিক যে কোন পার্টির আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুসলিম লীগকে এ ধরনের একটি গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনার বিষয়। তাঁর নিজস্ব কর্মসূচী প্রণীত হয়েছিল এই লক্ষ্যেই।

সিলেটে এসে 'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করি আমি। 'প্রভাতী' ছিল আসামের মুসলিম ছাত্র ও যুব আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র। কলেজে ভর্তি হয়েছি কিন্তু সময় যায় ছাত্র আন্দোলনে, পত্রিকা সম্পাদনায়। মুসলিম লীগের প্ল্যান প্রোগ্রাম কার্যকর করার জন্য আমরা কাজে লেগেছি দল বেঁধে। কিসের কলেজ আর কিসের পড়াশুনা! মওলানা এ ধরনের কর্মীদের পছন্দ করেন, নিজের সন্তানের মত ভালবাসেন। 'প্রভাতী'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন রজিউর রহমান ; খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন ; মেট্রিক এবং ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাণ্ড করেছিলেন। আই. এ. পাস করার পর তিনি চলে যান কলকাতায়। তখন 'প্রভাতী'র সম্পাদনার ভার পড়ল আমার উপর। কিছুদিনের মধ্যেই 'প্রভাতী' একটি অসাধারণ পত্রিকা হয়ে উঠলো। বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনার বাহন এই কাগজটি তরুণ সমাজ ও কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনার ঝড় সৃষ্টি করলো। আসাম মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন মাহ্‌মুদ আলী, তসদ্দুক আহমদ, কাজী মাহ্‌বুবুর রহমান প্রমুখ। তসদ্দুক আমার সিনিয়র হলেও বি. এ. পড়ি এক সঙ্গে। মাহ্‌মুদ আলীর সঙ্গে শেখ ঘাটে থাকি। আমাদের দু'জনের বিছানা একটা ; আর ছিল দু'জনার জন্য একটা মাত্র লম্বা বালিশ।

www.pathagar.com

মওলানা সিলেটে এলেই শেখ ঘাট আসেন। মুসলিম লীগের অফিসও ছিল শেখ ঘাটেই। অফিসে বসে কিংবা রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দীর্ঘ আলোচনা হত মওলানার সাথে। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও স্বাপ্নিকতা আমাদেরকে উজ্জীবিত করত, মাতিয়ে তুলত। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর বাঘ-ভালুকের দেশ আসামকে যারা মরণপণ সংগ্রাম করে শস্য-শ্যামল করে তুলেছে, পর জমিকে সোনার দেশ বানিয়েছে ওরা সবাই এসেছিল বাংলা-দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে। জমিদারদের জুলুমে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছিন্ন বা নদী সিকোস্তির ফলে সর্বহারা এই সব মানুষের শ্রমে ও সংগ্রামে আসাম সুবর্ণ ভূমি হয়ে উঠলেও আসামের কায়েমী স্বার্থবাদীরা আসাম থেকে এদেরকে উৎখাত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। আসামের এই বহিরাগত জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ শুরু করেন মওলানা, আল্লাহ্‌র যমীনে নিপীড়িত এসব মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য এদেরকে সংগঠিত করেন, গড়ে তোলেন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা। মুসলিম লীগ যে জনগণের প্রতিষ্ঠান—মওলানার নেতৃত্বে তাই বাস্তবায়িত হল আসামে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এতে আক্রোশে ফুলতে থাকে এবং মওলানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সর্বত্র।

একদিন শেখ ঘাট মুসলিম লীগ অফিস থেকে বেরিয়ে আমি আর মওলানা পাশাপাশি হাঁটছি। জীতু মিয়ার বাড়ি ছাড়িয়ে পূর্ব দিকে বন্দর বাজারের দিকে চলেছি। মওলানার পরনে ছিল লুঙ্গী আর পাঞ্জাবী আর বগলে একটা ব্যাগ। বললেন, 'দেখ, তোমাদের সিলেটে বোধ হয় আমার আর আসা হবে না!'

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি কেন মওলানা এ কথা বলছেন। জবাবে মওলানা বললেন, 'সিলেটের মুসলিম জমিদার গোষ্ঠী তাঁর উপর ভীষণ ক্ষেপে আছেন। কারণ মওলানা চাষী, মজুর, জেলে, তাঁতীদের জন্য লড়াই করেন; জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন।'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করি মওলানাকে, 'মুসলিম লীগ কি জনগণের প্রতিষ্ঠান, না কতিপয় জমিদার সামন্তর প্রতিষ্ঠান? মুসলিম লীগতো মুসলিম জনতার সংগঠন, নিপীড়িত মানুষের সংগঠন। মওলানা সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সংগ্রাম পরিচালনা করে তো লীগের মৌলিক লক্ষ্যকেই রূপ

www.pathagar.com

দেবার চেষ্টা করছেন। মওলানা যদি তা না করতেন তাহলেই তো তিনি লীগের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন।'

মওলানা আমার কথায় ভীষণ খুশী হয়ে বললেন, 'আমি জানি তোমরা নওজোয়ানেরা জনগণের সংগে আছ।'

আমি বললাম, 'আর জনতা আছে আপনার সঙ্গে। কাজেই সিলেট প্রবেশে আপনাকে বাধা দেয় এমন বুকের পাটা কার আছে!' এ বিষয়টি নিয়ে আমি 'প্রভাতী'তে নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয়টি লিখি প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে।

অভিযোগ

আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে—তিনি নাকি সুর্মা ভ্যালিতে আসিয়া প্রজা বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাইতেছেন...জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছেন। মওলানা সাহেব এই মিথ্যা অভিযোগের জন্য আমাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন।

আমরা যতদূর জানি মওলানা সাহেব সুর্মা-ভ্যালির 'বাঙালদের' মধ্যে আসিয়া এখনো প্রজা বিদ্রোহ বা জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও করেন নাই। এজন্য অবশ্য আমরা লীগ সভাপতিকে খুব প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিতে পারিতেছি না। চুরি-ডাকাতি অথবা প্রভু-পদলেহনের ভিতর দিয়া অর্জিত শোষণের এই ঘৃণিত ঐতিহ্যের বর্বরতা বিলম্বিত হইতে থাকুক—জনগণ ইহা চায় না। বরং, যদি মওলানা সাহেব বিদ্যুৎ-গর্ভ মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইহার ধ্বংস কামনা করিতেন...তবেই জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারিত। তবু মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে—এমন কি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ওয়ার্কিং কমিটির কতিপয় সদস্যও নাকি এ অভিযোগ করিয়াছেন।

আসল রহস্য আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার না হইলেও কিছুটা ধারণা আমরা করিতে পারিতেছি। আসাম-ভ্যালিতে মওলানা সাহেবকে কেন্দ্র করিয়াই মুসলিম গণজাগরণ সূচিত হইয়াছে—যার ফলে সেখানকার জমিদার সম্প্রদায়ের মর্মমূলে আজ দুঃস্বপ্নের শেষ নাই। লাইন-প্রথার ব্যাপারেও

www.pathagar.com

আমরা তাঁর অজেয় বিপ্লবী কর্মপন্থার পরিচয় পাইয়াছি। সেই জমিদার নহেন—জননেতা লীগ সভাপতি সুর্মা-ভ্যালিতে আনাগোনা করিতেছেন দেখিয়া এখানকার স্বার্থ-সর্ব্বস্ব অথবা জমিদার গোষ্ঠী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের টনক নড়িয়া উঠিয়াছে—থাকিয়া থাকিয়া তারা শুধু বিদ্‌ঘুটে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন ঃ সুরমা উপত্যকায়ও কি আগুন জ্বলিয়া উঠিল? শেষকালে কি চাষা-ভূষার (কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় অভিজাত সম্প্রদায় যা মুখভংগী করেন !) হাতেই তারা মার খাইতে চলিয়াছে ?

অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়। জমিদারী-প্রথা এতোদিন মানুষের শিরায় শিরায় শিকড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সমুদয় রক্ত শোষণ করিয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছে। জমির সংগে বাহ্যতঃ এবং মনতঃ আর্থিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক না থাকিলেও কতকগুলি ধাঁড়িবাজ লোক জমিদার সাজিয়া দেশের সত্যিকার জমিদার যে দোষী সম্প্রদায়—তাঁদের জীবন মরণ নিয়া এতদিন ছিনিমিনি খেলা খেলিয়া আসিয়াছে। একদিকে অজ্ঞতাপ্রসূত অন্ধ আনুগত্য অন্য দিকে আদিম পশুশক্তি—ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই এতদিন এই অবৈজ্ঞানিক ও গণস্বার্থবিরোধী প্রথা টিকিয়াছিল। কিন্তু অন্ধ আনুগত্য ও পশুশক্তি দুইয়েরই দিন ফুরাইয়াছে। ইতিহাসের চরম প্রতিশোধ আজ এইসব রক্তচোষার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হাত-পা ছুঁড়িয়া আর্ত-চীৎকার তুলিলে চলিবে কেন ?

লীগ-সভাপতি যদি আজ এ অঞ্চলে আসন্ন গণ-বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ভালোই করিবেন। কারণ এইখানে তার দায়িত্বের কথা আসিয়া পড়ে। মুসলিম লীগ একটা গণ-প্রতিষ্ঠান এবং মৌলানা সাহেব তার সভাপতি—কাজেই গণ-স্বার্থের কথাই আজ তাকে সকলের আগে ভাবিতে হইবে। তিন তলার পাঁচজন নয়—রাস্তার পঁচানব্বইজনকে লইয়াই লীগ-সভাপতির দেশ। এদের সমবেত শক্তি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া মুসলিম লীগের হাড়ে হাড়ে যে ডিনামিক-ফোর্সের সঞ্চার করিতেছে---জমিদারী প্রথা কেন আরো অনেক জবরদস্ত প্রথাও তার সম্মুখে ঝরা-পাতার মত উড়িয়া যাইতে বাধ্য।

দেশের পঁচানব্বইটি লোক চাষী মজুর। ইহারা অশিক্ষিত অর্ধনগ্ন ক্ষুধা-ক্লিষ্ট আর ইহার জন্য মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী-প্রথাই দায়ী। আজ পাঁচজনের গাড়ী-বাড়ী আর লাল-পানি কিছুটা সংকোচিত করিয়া এই পঁচানব্বইজনের ডাল-ভাতের বরাদ্দটা যদি একটু বেশী করা যায়...এর চাইতে

www.pathagar.com

বিজ্ঞানসম্মত কাজ আর কি হইতে পারে? মৌলানা সাহেব নীরব থাকা কালেই যখন অভিযোগ উঠিয়াছে--সত্যি সত্যি কার্যক্ষেত্রে নামিলে অভিযোগ নয়—দুরতিক্রম্য বিরোধিতা আসিয়া পড়িবে। তবু লীগ সভাপতিকে আমরা আশ্বাস দিতেছি—ঘাবড়াইবার কিছু নাই...জনমত রহিয়াছে তার পক্ষে আর আছি আমরা...জাগ্রত মুসলিম যুবশক্তি।

ওয়াকিং কমিটির কোন্ কোন্ সদস্য অভিযোগটি উত্থাপন করিবার সতর্কতা দেখাইয়াছেন...আমরা তাহা জানি না। তবে, এ-জ্ঞান আমাদের ভাল করিয়াই হইয়াছে যে, মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিঃ ভেবলেনের "রক্ষিতা শ্রেণী" বা সংশ্লিষ্ট-মহল হইতেই অভিযোগটি উঠা স্বাভাবিক এবং বর্তমান ক্ষেত্রেও হয়ত তাদের পক্ষ হইতেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অনেক শ্মশানচারী জীবই দেবতার বেশ ধরিয়া মানুষের সমাজে বাস করে কিন্তু স্বার্থে আঘাত পড়িলেই তাদের সকল আবরণ খসিয়া যায়... তখন তারা আসল মূর্তিটি ধারণ করে। জনসাধারণের উন্নতি ও মুক্তির গলা চাপিয়া ধরিয়া যারা পাকিস্তানের কেল্লা ফতে করিতে গদা বাগাইয়াছেন... মুসলিম লীগের সেইসব ভীমদেবতারে আমরা কয়েকটা কথা জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ঘটনার পারম্পর্য ও পরিণতি হইতে যারা শিক্ষালাভ করিতে পারে না--ঐসব সদস্যের স্মরণ রাখা উচিত ঃ মুসলিম লীগ এখন আর দু'চারজন জমিদার আর নবার-সুবার প্রতিষ্ঠান নয়। তার পিছনে সর্বহারা চাষী আর শ্রমিক-মজুরের হাড়-পেষা শক্তি সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই মুসলিম লীগের আজিকার ভূমিকা সত্যিকার গণ-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। কায়েদে আজম তো স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ If Pakistan means Pakistan of the landlords and capitalists I would not have it. কাজেই মুসলিম লীগের ভিতরে থাকিয়া গণস্বার্থবিরোধী মনোভাব পোষণ করিলে শুধু লীগওয়ালা বলিয়াই জনসাধারণ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না? গণস্বার্থ ও তাদের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব নিকাশে যদি সংঘর্ষ বাঁধে এবং তারা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের আবর্জনা খিজরাইবার নোঙ্রামিকেই পছন্দ করেন—অবিলম্বে মুসলিম লীগে গুরুত্বপূর্ণ সকল আসন হইতে তাদের নামিয়া আসা উচিত। ইচ্ছা করিয়া না নামিলে-- সময় দূরে নয়--যখন জনতার লাঞ্ছনার মধ্যে মাথা হেট করিয়া স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত আসনের নীচে তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। জনসাধারণের ইচ্ছা-আকাংক্ষার সাথে যারা সমান্তরালভাবে চলিতে পারে না...জনসাধারণ তাদের নেতৃত্বের ভিখারী নহে।

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়টি কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের রক্ষণশীল অংশটি ভেতরে ভেতরে চটলেও প্রকাশ্যে প্রতিবাদের সাহস পেল না। মওলানা বেজায় খুশী হলেন।

এরপর মওলানা প্রায়ই আসেন সিলেট। এর আগে সম্ভবত ১৯৪৩-র শেষের দিকে আল্লামা আজাদ সুবহানি একবার সিলেট এসেছিলেন। আমি দরগাহ্ মহল্লায় যে বাড়িতে থাকতাম আল্লামা তার পাশের বাড়িতেই উঠে-ছিলেন। তাঁর নাম জানতাম কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তাঁকে দেখতে গেলাম একদিন। আল্লামা খাটের উপর শুয়ে আছেন। পরনে লুঙ্গী, মুখভরা দাড়ি, গায়ের রঙ শ্যামলা; পায়ের গোছা খুবই পুষ্ট আর সুগঠিত। আমি থাকতে থাকতেই আল্লামা বিছানা ছেড়ে উঠলেন। আগন্তুকদের সাথে দু'চার কথা বলে পটলা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—ফুলবাড়ি যাবেন। মওলানা ভাসানীকে দেখলেই মনে পড়ে আল্লামা আজাদ সুবহানীর কথা; দু'জনেরই গায়ের গড়ন, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও জীবন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন।

আসামে তথা ভারতে মুসলিম লীগ আন্দোলন তখন তেজী হয়ে উঠেছে। বঞ্চিত মুসলমানদের মধ্যে এসেছে জাগরণের বন্যা এবং তা দেখে কংগ্রেসী নেতৃত্ব আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছেন; জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ্ কংগ্রেসের শ্লোগান দিচ্ছে। মওলানার অনেক মুরীদ ছিলেন সিলেটে। তাদেরকে তিনি তাঁর রাজনীতিতেও টানতে শুরু করলেন। তারা তার মুর্শীদের ডাকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ্-এ যোগ দেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগঠিত করার জন্য আদা পানি খেয়ে লাগেন। একবার মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সিলেট আসেন। নয়া সড়ক মসজিদ ছিল তাঁর কেন্দ্র। তিনি রোজ ওখানে ভাষণ দিতেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে তিনি বলতেন কাফের। সেই সময় গোবিন্দ চরণ পার্কে মুসলিম লীগের ডাকে এক ঐতিহাসিক জনসভা হল। তাতে মওলানা ভাসানী জ্বালাময়ী ভাষায় অপূর্ব এক ভাষণ দিলেন। মওলানা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'মাদানী সাহেব জিন্নাহ সাহেবকে মুসলমান স্বীকার করতে রাজী নন তিনি কি তাহলে বলতে চান গান্ধী, নেহরু এবং পেটেলরা মুসলমান; এবং সে কারণেই মাদানী সাহেব তাদের দামন ধরেছেন?'

www.pathagar.com

সিলেটের লোকেরা এমন অনলগর্ভ ভাষণ এর আগে আর কখনও শোনে নি। মওলানার বক্তৃতার পর জনতা উত্তেজনার চরমে ওঠে এবং সভা শেষ হতে না হতেই লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে নয়া সড়ক মসজিদের দিকে এবং মসজিদটিকে ঘেরাও করে ফেলে। এরপর মওলানা মাদানী সিলেট ত্যাগ করে চলে যান। মওলানা ভাসানীর সেই দিনকার বক্তৃতার ভাষা, ভঙ্গী, যুক্তি এবং তাঁর গর্জন লক্ষাধিক মানুষের জনসভায় এক দাবানল সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৬-র প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনের জন্য মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়। মওলানা ভাসানী, জনাব মুনাওয়ার আলী প্রমুখ ছিলেন তার সদস্য। এঁরা প্রায় নিয়মিত মুসলিম লীগ অফিসে বসতেন। আন্দোলনের চালিকা শক্তি ছিলাম আমরা ছাত্র সমাজ। তাই ছাত্রদের পরামর্শকে তাঁরা খুব গুরুত্ব দিতেন। আমার এলাকায় আমার পরামর্শ মতই জনৈক ভদ্র-লোককে নমিনেশন দেওয়া হয়। তাতে সাবেক এম. এল. এ. যিনি নিজেও একজন প্রার্থী ছিলেন এই নমিনেশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু করেন। মুনাওয়ার আলী সাহেব আমাকে তাঁর পুত্রের মতই স্নেহ করতেন। তিনি এই বিজ্ঞপ্তিতে ভয়ানক মর্মাহত হন। আমাকে মুসলিম লীগ অফিসে পেয়ে বললেন, 'দেখলে শাহেদ, মকবুল কি লিখেছে?' তাঁর ক্ষোভ এবং অভিমান তাঁকে করুণ করে তুলেছিল। মকবুল হোসেন তাঁরই ছাত্র ছিলেন একদিন। মওলানা কিন্তু আমাদেরি সামনে বিবৃতিটি পড়ে হাসলেন। মকবুল হোসেন তাতে লিখেছেন, অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই বোর্ডের নমিনেশন অবৈধ; জনগণ তা মেনে নেবে না। মুনওয়ার আলী সাহেবের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে; কাজেই তারা বহিরাগত, আবাদী। আর মওলানা ভাসানীর জন্ম তথাকথিত অভিজাত পরিবারে নয়। এজন্য সিলেটের অভিজাত মহলের একটি অংশ নিজেদের মধ্যে মওলানাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। মকবুল হোসেন অজ্ঞাত কুলশীল বলে এঁদেরকেই টিটকারি দিয়েছিলেন।

মওলানা এতদিন আসামের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় একাকী সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। এবার তিনি গোটা আসামের মুসলমানদের নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সর্বহারাবিরোধী এই লাইন-প্রথা উচ্ছেদ না করে মুসলমানেরা থামবে না। মুসলমানদের জন্য

www.pathagar.com

এই অভিজ্ঞতা ছিল অভূতপূর্ব। সর্বস্বপণ করে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম এই আন্দোলনে। আসামের এই রক্তঝরা দিনগুলির কাহিনী আমাদের সংগ্রামী ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায় রচনা করেছে। বলা বাহুল্য, মুসলিম লীগ বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে। মওলানাই তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ থেকে সরিয়ে দুর্মর সংগ্রামের রক্তাক্ত পথে নিয়ে এলেন। চরম আত্মত্যাগের জন্য এভাবেই তৈরী হয়েছিল আসামের মুসলিম জনতা—মওলানা ভাসানীর গতিশীল বৈপ্লবিক নেতৃত্বে। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ সত্যিকার গণপ্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল জনাব আবুল হাশিমের বলিষ্ঠ এবং উদ্দীপনাময় নেতৃত্বে। আসামে মুসলিম লীগ জনগণের বৈপ্লবিক সংগঠন হয়ে উঠলো মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জঙ্গী পরিচালনায়। এঁরা দু'জনেই ছিলেন ইসলামের রব্বানী দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও দার্শনিক আল্লামা আজাদ সুবহানীর বন্ধু, সহকর্মী ও ভাবশিষ্য।

মওলানার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় না। সিলেট রেফারেণ্ডামের সময় মওলানা ছিলেন আসাম উপত্যকায়। বাংলা আসাম মিলিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের স্বাপ্নিক ছিলেন মওলানা। নতুন বৃটিশ পরিকল্পনায় আসাম হয়ে গেল ভারতের অংশ। গোয়ালপাড়া, কাছাড়, করিমগঞ্জ প্রভৃতি জেলা এবং অঞ্চলকেও আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয়ায় মওলানা ভীষণ আহত হন। তিনি স্থির করলেন আসামেই থাকবেন। আসামের মজলুম মুসলমানদের, বিশেষ করে বহিরাগত মুসলমানদের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্যই তিনি ওখানে রয়ে গেলেন—যেমন আবুল হাশিম থেকে গিয়েছিলেন পশ্চিম বঙ্গে, ওখানকার মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর আমি ঢাকায় তমদ্দুন মজলিস আর 'সৈনিক' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একদিন খবর পেলাম মওলানা ঢাকায় এসে উঠেছেন চকবাজার আরহামরা হোটেলে। খবর পেয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি ছুটে যাই। আমাকে পেয়ে কি যে খুশী হলেন মওলানা! আমি তাঁকে মজলিস অফিসে ১৯ নং আজিমপুরে দাওয়াত করি। ১৯ নম্বর আজিমপুর ছিল আবুল কাশেম সাহেবের বাসা, মজলিস কর্মীদের আড্ডা, মজলিস ও 'সৈনিকে'র অফিস। তখন পর্যন্ত মজলিস কর্মীরা তো নয়ই, বাংলাদেশের বহু রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতাও মওলানার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না। মজলিসের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে মওলানা খুবই উৎসাহিত হন।

www.pathagar.com

তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে আবেগ ও উদ্দীপনাময় এক ভাষণ দেন এবং মজলিসের জন্য নিয়মিত চাঁদার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর এই ঘোষণার কথা 'সৈনিক' এ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল।

এর পর বেশ কিছুকাল মওলানার দেখা নেই। ইত্যবসরে আমি বগুড়া কলেজে যোগ দেই অধ্যাপক হিসাবে। একদিন ভারত থেকে একটা কার্ড পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম! মওলানা সাহেব হামিদাবাদ গোয়ালপাড়া থেকে (২৩-৭-৫২) লিখেছেন ঃ

'দোয়াবরেষু,

আশা করি খোদার ফজলে ভাল আছ। আমি চার বৎসর পর আসাম সরকারের অনুমতি লইয়া আসামের বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়ী ঘর জমা-জমি প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশই বাঙ্গালী মুসলমানদের দ্বারাই প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। খোদা চাহেত এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে অবস্থান করিব। তোমরা পাকিস্তান সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগতভাবে আন্দোলন করিবা। বৃটিশের গোলামের পরিবর্তে পাঞ্জাবী বিহারী বর্জুয়াদের গোলাম হওয়া নেহায়েত ক্ষতির কারণ হইবে।'

চিঠির শেষের দিকে ছোট্টো একটা অনুরোধ তাঁর জনৈক আত্মীয় (তাঁর নামও আবদুল হামিদ)-কে যেন একটা জাগীর করে দেই।

ঘটনাটি উক্ত চিঠির আগের কিংবা পরের কথা, মনে নেই। এক দিন, তখন শীতকাল, কলেজ থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দেখলাম কলেজ প্রাঙ্গণেই এক জনসভা, তাতে বহু দরিদ্র লোকের ভীড়। হঠাৎ শুনলাম বক্তা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আমি তাঁর সাথে দেখা করি। দেখি কি, কেউ তাঁর সামনে ছোট্ট মাটির পাত্রভর্তি পানি তুলে ধরেছে, কেউ বা বোতল, কেউবা গাছের শিকড়, আর মওলানা ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কি বলছেন, আর ফুঁক দিচ্ছেন। আমার মুখে হাসি দেখে মওলানা বললেন, 'দেখো, যে যা বিশ্বাস করে তাই নিয়ে তাকে বাঁচতে দাও। কারও বিশ্বাসে আঘাত দিও না। এদের বিশ্বাস আছে বলে ঝাড় ফুঁকে ওদের সে উপকার হয়, তোমাদের ডাক্তার ওষুধ-পত্রে তা হয় না। তাছাড়া, ডাক্তার দেখানোর, ওষুধ কেনার সামর্থ্যই বা আছে কয়জনের?'

www.pathagar.com

মওলানা ঢাকায় এসে কারকুন বাড়ী লেইনে ইয়ার মুহাম্মদ খানের বাসায় ওঠেন। তখন তিনি সাপ্তাহিক ইত্তেফাক কাগজটির সম্পাদক এবং প্রকাশক উভয়ই। অফিস ছিল নবাবপুর রোডে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন হয় মুসলিম লীগ। সাংগঠনিক ক্ষমতা, আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ও গতিশীল নেতৃত্বের বদৌলতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে জনাব আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত গ্রুপটিই অতি অল্পদিনের মধ্যে জনগণের মন জয় করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করে। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব তাঁদেরই হাতে এসে যায়। বাংলাদেশের তরুণ কর্মীবাহিনীর প্রায় সবটাই সংঘবদ্ধ হয় জনাব আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এবং আজাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। রক্ষণশীল অংশটির নেতৃত্ব দেন খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখরা। ১৯৪৬-এর নির্বাচনের পর সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে রক্ষণশীল অংশটি খাজা নাজিমদ্দিনকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করে; মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশটি থেকে যায় ক্ষমতার বাইরে। দেশে বিরোধী দল বলতে কোন কিছু ছিল না। সোহরাওয়ার্দী-হাশিমের এককালের কর্মীরাই বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘ দিন চলতে পারে না। নতুন রাজনৈতিক দল গঠন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি সম্মেলন হয় জনাব হুমায়ুনের বাড়ীতে—রোজ গার্ডেনে। মওলানা ভাসানী-সহ বাংলাদেশের বহু প্রথিতযশা রাজনেতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। আমি তখন 'সৈনিক'-এর সম্পাদক। কয়েজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আমিও গিয়েছিলাম সেই সম্মেলনে। জনাব আবুল হাশিমের ভাবশিষ্য সামছুল হক পার্টির মেনিফেস্টো তৈরী করেছিলেন মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনা করে। রব্বানী দর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুত সেই দীর্ঘ মেনিফেস্টো পড়ছিলেন জনাব সামছুল হক আর চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী বার বার মেঝেতে লাঠি ঠুকে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন। মওলানা সাহেব ব্যাক করছিলেন সামছুল হককে।

মওলানা সাপ্তাহিক ইত্তেফাক বের করে তার অফিস করেছিলেন নওয়াবপুর। এখানে মওলানা নিয়মিত বসতেন। আমি প্রায়ই যেতাম তাঁর সংগে দেখা করতে। কথা বলতে। প্রায়ই দেখতাম জনৈক সাংবাদিক

www.pathagar.com

ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি গায়ে, বেলতোলা খড়ম পায়ে তাঁর সামনে বসে আছেন। তাঁকে কথা বলতে দেখতাম না, কথা মওলানাই বলতেন।

১৯৫৪ নির্বাচনী অভিযানে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী-ফজলুল হকের নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সরল আবেগপ্রবণ জনগণকে মাতিয়ে তোলে। সারা পূর্ব পাকিস্তান সফর করে জনাব আবুল হাশিম ময়মনসিং এসে যুক্তফ্রন্টের ডাক দেন। মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল; কিন্তু তাতে ঠাঁই হল না জনাব আবুল হাশিমের। সেকুলার কম্যুনিস্ট সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর রাজনীতি জনাব আবুল হাশিমকে ভীষণ ভয় করত। শেষ পর্যন্ত খেলাফতে রব্বানী পার্টি পৃথকভাবে দশটি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আমাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়—আমার নিজ নির্বাচনী এলাকা সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা তাহিরপুর-জামালগঞ্জ থেকে। এই কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন জনাব মকবুল হোসেন চৌধুরী যিনি ১৯৪৬-এর নির্বাচনের সময় লীগ টিকেট না পেয়ে মওলানা ভাসানীকে 'অজ্ঞাতকুলশীল' বলে গালি দিয়েছিলেন। এবার মকবুল হোসেনের পক্ষে ও আমার বিপক্ষে এক বিবৃতি ছাপিয়ে আমার এলাকার ঘরে ঘরে মওলানা আকবর বাংলার নামে তা বিতরণ করা হয়। মওলানার এই ইশতেহারের ফলে আমার অনেক ভোট নষ্ট হয়। তবুও আমি মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদেরকে পরাজিত করে নির্বাচিত হই। এজন্যে মওলানার প্রতি স্বভাবতই আমার একটা ক্ষোভ ছিল—তিনি আমাকে এত স্নেহ করেন অথচ আমার বিরুদ্ধে এরূপ একটা আপত্তিকর বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে সমর্থন জানিয়েছেন একজন বিকৃত ব্যক্তিকে। এজন্য আমি মওলানাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করি।

তখন জগন্নাথ হল ছিল পরিষদ ভবন।

আমি একদিন পরিষদ ভবনে ঢুকছি—দেখি মওলানা বেরিয়ে আসছেন। তাঁর চেহারা খুব ময়লা ও বিমর্ষ।

আমাকে দেখেই বললেন, 'শাহেদ, একটা কাজ করতে পার?'

আমি সহাস্যে তাকে বলি, 'বলুন।' তিনি বললেন, 'সিলেটে বিশেষ করে সুনামগঞ্জে বন্যায় খুব ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে—অনেক লোক নিরাশ্রয়, বিপন্ন। আমি তাদের জন্য কিছু টাকা পয়সা রিলিফ-দ্রব্য সংগ্রহ করেছি। তুমি গিয়ে এগুলি ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়া আস।'

www.pathagar.com

আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হুজুর, আপনার দল রয়েছে, বহুকর্মী রয়েছে। তারাই তো এগুলি বিতরণ করতে পারে।'

মওলানা একটু করুণ হেসে যে মন্তব্য করলেন—তাতে বোঝা গেল তাদের উপর তাঁর মোটেই আস্থা নেই। ওদের হাতে এসব দিলে এগুলি যাদের পাওয়ার কথা তাদের হাতে কখনও পৌঁছবে না। সেদিন মওলানা ভাসানীর অনুরোধ সত্ত্বেও এ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে পারি নি।

এদেশে তথাকথিত বামপন্থী, কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করে আসছে। তাদের মধ্যে রয়েছে বহু ত্যাগী ও চরিত্রবান কর্মী। দেশের কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতী তথা বঞ্চিত নিপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মওলানা ভাসানী তাঁর কৈশোর থেকে সংগ্রামে লিপ্ত। ইসলাম মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিরন্তন জিহাদ হলেও, এদেশের আলিম-উলামা, ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এ জিহাদ থেকে রয়েছে দূরে, আওয়ামী নেতৃত্ব ও কর্মী সংগঠনে নেই সেই চরিত্র যা মওলানার কাছে আদর্শ; তাই বামপন্থী রাজনীতি তার কাছে একদা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির একটা উপায় বলে মনে হয়েছিল। কম্যুনিস্টরাও মওলানার ছত্রছায়ায় কাজ করাকে তাদের আন্দোলন রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য নিরাপদ মনে করে। মওলানার এ সময়কার রাজনীতি আমার মনে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে। ফলে আমি তাঁর থেকে মনের দিক দিয়ে অনেক দূরে সরে পড়ি। পল্টনের বিরাট বিরাট মিটিংয়ে যখন দেখতাম মওলানা মঞ্চে আযান দিয়ে একাই নামায পড়ছেন তার কোন কর্মীই তাঁর সংগে নামাযে দাঁড়াচ্ছে না, তখন মওলানার জন্য দুঃখ হত। মনে হতো এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে মওলানা আসলে নিজেই একা, নিঃসঙ্গ।

বেশ কিছুদিন পর। মওলানা ততদিনে রাজনীতির প্রতি অনেকটা বীত-শ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় আমি আর আজরফ ভাই (প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ) মওলানার সংগে দেখা করতে যাই সন্তোষ। ১৯৭০-এর মার্চ মাসের ৩ তারিখ। মিছিল ছিল মঙ্গলবার। আমরা এগারটায় সন্তোষ পৌঁছাই। মওলানা লাল শালু কাপড়ের উপর হুকুমতে রব্বানীয়া লিখে তা টাঙিয়ে রেখেছেন অফিসঘরের প্রবেশ পথের উপরে। আমাদেরকে দেখেই কি যে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বললেন, 'তোমরা এসেছ,

www.pathagar.com

আল্লায় তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন।' আমাদেরকে বসিয়েই তাঁর প্রথম কথা, 'তোমরা কি খাবে, বল ?' তারপর বুক পকেট থেকে টাকা বের করে এক লোককে বললেন, 'যাও, শিগ্‌গির মাছ নিয়ে আস।' তিনি প্রথমেই তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন তাঁর সিলেট-জীবনের কথা। সিলেটের বহু পরিবারের কথা। মওলানা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করলেন এবং গতানুগতিক রাজনীতি দ্বারা যে মানুষের মুক্তি আসবে না, এ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা বললেন। তাঁর মতে 'রব্বানী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল আমাদের দেশে নয়, দুনিয়ায় শান্তি আসতে পারে। কিন্তু তার জন্য মানুষের দরকার। আমাদের দেশে সত্যিকার মানুষের একান্ত অভাব। আদর্শ শিক্ষা এবং আদর্শ পরিবেশই সেই মানুষ গড়তে পারে। এজন্য তিনি সন্তোষে একটি আদর্শ ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছেন। জীবন সায়াহ্নে এসে মওলানার উপলব্ধি হয়েছে—আদর্শ-বর্জিত রাজনীতি মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে না, ধ্বংসই ডেকে আনে। তিনি চান যে, তাঁর এই শিক্ষা আন্দোলনে আমরা তাঁর সংগে কাজ করি।

যে লোকটিকে মওলানা মাছ আনতে পাঠিয়েছিলেন সে টাঙ্গাইল থেকে নিয়ে এল একটি কাতল মাছ। আমাদেরকে না খাইয়ে মওলানা কিছুতেই ছাড়বেন না। মাছ রান্না হলে আমাদেরকে তিনি খাওয়াতে বসালেন তার পর্ণ কুটিরের মাটির উপর বিছানো হুগলার ছাটাইয়ের উপর। মওলানা নিজে খাদিম করে আমাদেরকে খাওয়ালেন। খেতে খেতে আমি বললাম, 'রান্নাটি খুব চমৎকার হয়েছে।' মওলানা একথা শুনে বাটি নিয়ে ছুটলেন ভিতর বাড়ীর দিকে এবং এক বাটি ছালুন এনে আমার পাতে ঢেলে দিয়ে বললেন, 'খাও !' অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম মওলানার কাণ্ড কারখানা।

এরপর, প্রায়ই সন্তোষ যাই। হুকুমতে রব্বানীর ব্যানার আর ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পরিকল্পনা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। একদিন সন্তোষ গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে অসুস্থ হয়ে পড়ি। মওলানা আমাকে দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'তুমি বিশ্রাম কর, তোমার সংগে কথা হবে পরে।' সন্ধ্যার পরে ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে আমাকে দেখে প্রেসক্রিপসন দিয়ে গেলেন, মওলানা লোক পাঠিয়ে ওষুধ আনালেন টাঙ্গাইল থেকে। আমাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে শোও।' মওলানার পাশে খাটের উপর শুয়ে রইলাম।

www.pathagar.com

যখনই চোখ মেলি দেখি মাওলানা বসে আছেন আমার পাশে। মওলানা ইবাদতে মশগুল। সকালের দিকে আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠি এবং পরদিন ঢাকায় চলে আসি।

মওলানা তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে পেশ করার জন্য একটি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তার জন্য একটি কমিটি গঠিত হল। পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্মেলন এই নামে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভাপতি হলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর ইচ্ছায় আমাকে করা হল সে কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী। কমিটির সহসভাপতি ছিলেন জনাব আবুল হাশিম ও অধ্যক্ষ জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ। কমিটিতে অন্যরা ছিলেন জনাব এ. ফ. এম. সফি—কোষাধাক্ষ, জনাব অধ্যাপক মুহাম্মদ হোসেন-সহকারী সম্পাদক, অধ্যাপক জনাব অবদুল গফুর—সেমিনার সম্পাদক, সৈয়দ আসাদুজ্জামান—প্রচার সম্পাদক, অধ্যাপক সেকান্দর হায়াত—ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, সৈয়দ ইরফানুল বারী—প্রকাশনা সম্পাদক, জনাব এম. এ। আযম—সদস্য, মাওলানা পীর মুহসীন উদ্দীন—সদস্য, জনাব শাহ অজিজুর রহমান—সদস্য, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম—সদস্য, অধ্যক্ষ আশরাফ ফারুকী—সদস্য, জনাব ফুলদা চক্রবর্তী—সদস্য। এই সম্মেলনে শিক্ষা সম্পর্কিত আদর্শ প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার উপর।

সম্মেলনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। মওলানা আমার নিকট সৈয়দ ইরফানুল বারীকে পাঠালেন ঢাকায় অর্থ সংগ্রহের জন্য যেন আমরা চেষ্টিত হই। তিনি একটি চিঠিও দিলেন চাঁদার অর্থ শুভানুধ্যায়ীরা অন্য কারো হাতে না দিয়ে যেন কেবল আমার হাতেই দেন। ঢাকায় তার পুরানা সহকর্মীরা নাখোশ হন।

শিক্ষা সম্পকিত মূল প্রস্তাবনা রচিত হওয়ার পর ওয়ারীতে ২০ নম্বর ওয়ার স্ট্রিটে জনাব আবুল হাশিমের বাসভবনে সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও শিক্ষাবিদদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে তা আলোচিত ও গৃহীত হয়। কেবল দুই একটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়। আমি যে প্রস্তাবটি রচনা করেছিলাম সেভাবেই তা অনুমোদিত হয় এবং মওলানা তাতে দস্তখত করেন। জনাব আবুল হাশিম সেদিন সন্ধ্যায় চমৎকার ভোজের আয়োজন করেছিলেন।

www.pathagar.com

যথাসময়ে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় সন্তোষে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ৭১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে বহু শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ এলেন সম্মেলনে। ডক্টর কাজি মোতাহার হোসেন কদমবুসি করলেন মওলানাকে। মওলানা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এখানে এসে সবাই তাঁর কদমবুসি করে আনন্দিত হন। প্রস্তাবটি পড়তে দেয়া হলো অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে। সম্মেলন শেষ হতে না হতেই দেখা গেল ন্যাপের নেতৃস্থানীয় নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, গঠিতব্য ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন কমিটি দখল করার জন্য। মওলানা খুবই বিরক্ত হয়ে একটি ভাষণ দেন— আমরাও মওলানার উপর দায়িত্ব দিয়ে বিরক্ত হয়ে চলে আসি।

তারও পরের কথা। বাংলাদেশ হয়েছে--মওলানা ভারতীয় বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। ৭২-এর ১২ই জানুয়ারীতে খবর পেয়ে আমি আর এমদাদ (এমদাদ আলী খান) ভাই ছুটলাম সন্তোষের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় এগারোটা। হোস্টেল বিল্ডিং-এর পশ্চিম দিকে চাদোয়া টাঙ্গিয়ে মওলানা বসেছেন, চারদিকে চক্রাকারে চেয়ারে বসেছেন মশিউর রহমান-সহ ন্যাপের নেতা ও বহু কর্মী। মশিউর রহমানের মেয়ে রিতাও ছিল তাঁর সংগে। রীতা আমার বড় মেয়ের সাথে পড়তো। বেশ কড়া রোদ ছিল সেদিন। মওলানা ওদেরকে কি যেন বুঝাচ্ছিলেন। আমার উপর চোখ পড়তেই বললেন, 'আরে শাহেদ এসেছ, বস বস।' বসার জন্য কোন আসন ছিল না। তাই দাঁড়িয়েই থাকলাম আমরা দু' জন। মওলানা আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি ওদেরকে বলছি ধনতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে; এখন সময় এসেছে—সমাজতন্ত্রের উপর ইসলামীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার।' একথা বলেই তিনি আবার তাঁর পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। প্রায় ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম তাঁর অপূর্ব বিশ্লেষণ।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা—তা গণতন্ত্র হোক, আর সমাজতন্ত্রই হোক তা ভেতরে পঁচে গেছে। এ আর মানুষের চাহিদা মিটাতে পারছে না। মানব জাতি নতুনের অন্বেষণ আছে, নতুন অবলম্বন খুঁজছে। একমাত্র ইসলামই তা দিতে পারে--এই ছিল মওলানার মূল বক্তব্য। জুমার আযান হলে মওলানা উঠে পড়লেন। আমি এবং এমদাদ ভাই

www.pathagar.com

তাঁর পিছনে পিছনে ঢুকলাম মসজিদে, তাঁর ন্যাপের নেতা কর্মীদের একজনও মসজিদে ঢুকলো না। দেখলাম মওলানা আজও নিঃসঙ্গ। মসজিদে উপস্থিত ছিলেন আশেপাশের কুড়ি-পঁচিশজন বয়স্ক ও বৃদ্ধ কৃষক-মজুর, সম্ভবত যাদের অধিকাংশই জুতা পরে না—তাদের অধিকাংশেরই পায়ের গোড়ালী ফাটা। মওলানা সেই লোকগুলোর সামনে বসে তাঁর অপূর্ব ভঙ্গিতে বোঝালেন তৌহিদ কি, ঈমান কি, জিহাদ কি। ঈমানের চাবিটি হল ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা ও ভয়ভীতি থেকে চির-কালের জন্য মুক্তি। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে মুমিন প্রতি মুহূর্তে জিহাদ করে চলে, কাউকে সে পরোয়া করে না। এই অশিক্ষিত দরিদ্র লোকগুলোকে তাঁর কথা বুঝাতে গিয়ে মওলানা সেসব উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে যে ভাষায় কথা বলছিলেন তা ছিল আমাদের জন্য একে দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বুঝলাম—জননেতা কাকে বলে!

এরপর প্রায়ই মওলানার কাছে যাই, মওলানা 'হক কথা' পত্রিকা বের করলেন। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকারের হাতে ইসলাম ও জনগণের নিগ্রহের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন প্রচণ্ড প্রতিবাদ। কথা প্রসঙ্গে মওলানা একদিন বললেন মসজিদগুলোকে সংগঠিত করতে হবে। তার জন্য চাই নতুন খুৎবা, নতুন বক্তব্য যা মানুষকে শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত এবং বিপ্লবী চেতনায় মাতিয়ে তুলবে। তিনি আমাকে বললেন, 'খুৎবা লিখে দাও, ছাপিয়ে মসজিদে মসজিদে সেগুলি ইমামদের মধ্যে বিতরণ করবো।' প্রথম দু'টি খুৎবা লিখে দিলাম আমি। খুৎবা তথাকথিত ধর্মীয় ব্যাপার নয়। প্রতি এলাকার মুসলমানেরা প্রতি শুক্রবারে মসজিদে মিলিত হয়। এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তাৎপর্যই মূর্খ জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার, তাদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করার একটি কার্যকর সংস্থা হচ্ছে জুমা। খুৎবা বা ভাষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনতাকে শিক্ষিত করে তোলা। আল্লাহ্‌র ইবাদতে ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তোলা। তাই খুৎবা কি করে এমন ভাষায় দেওয়া হতে পারে--যা শ্রোতারা বোঝে না, যার বক্তব্যের সাথে মুসল্লিদের জীবনাদেশ ও কালের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশের চিরাচরিত জুমার নামাযের নিষ্ফলতা আরও অনেকের মতোই মওলানাকে পীড়িত করত। মওলানা মাতৃভাষায় বৈপ্লবিক প্রেরণাসূচক খুৎবা চালু করে আমাদের মসজিদ প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার একটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

একদিন আমি, বজলুল হক ও হাফিজ আবদুর রহীম গেলাম সন্তোষ, সন্ধ্যার দিকে। গিয়ে দেখি মওলানা তাঁর কুটিরের সামনে উঠানের উপর হোগলার চাটাই বিছিয়ে মিলাদের আয়োজন করেছেন। আমাদের পেয়ে মওলানা ভীষণ খুশি। মওলানা নিজেই মিলাদ পড়ালেন, তারপর উপস্থিত সবার জন্য পরিবেশন করলেন গোশ্‌ত-ভাত। ডক্টর মীর্জা নূরুল হুদা, কাদের সিদ্দিকী এবং আরও অনেকে সেদিন হাজির ছিলেন ওখানে। মাটির বাসনে খেতে দেওয়া হল ডক্টর হুদা এবং আমাদের সবাইকে। ডক্টর হুদা এবং আরও কয়েকজন বসেছিলেন একটি বেঞ্চিতে এবং বাঁ হাতে বাসন নিয়ে খাচ্ছিলেন। মওলানার এখানে এসে সামাজিক পদমর্যাদা, ভেদ-বৈষম্য এমনিতেই লোপ পেয়ে যায়। মওলানার সরল জীবন, ঈমানে আমলে ঐক্য, যেমন কথা তেমন কাজ মানুষকে ভুলিয়ে দিত তাঁর অহমিকা, সামাজিক পদমর্যাদা। বিশেষ কূটনীতিকেরা দেখা করতে এসেও তাঁদেরকে বেঞ্চিতেই বসতে হতো।

একবার মওলানা অনশন করেছেন ঢাকায় মতিঝিলে। গিয়ে দেখি মওলানা শুয়ে আছেন বিছনায়। অনেক লোক ভীড় করেছে। আমাদের নিলুফার—সেই কিশোর বয়সে একদিন যে মজলিশের কর্মী ছিল, দেখলাম সে মওলানার মাথা ঠাণ্ডা পট্টি দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে। ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'সব কিছুরই একটা মৌসুম আছে, মৌসুমের আগে করলেও ফল মিলে না—পরে করলেও ফল মিলে না। সময় মত কাজটি করলেই ঈপ্সিত ফল মিলে। এখন ইসলামের জন্য কাজ করার সময় এসেছে, আর বসে থেকো না, কাজে নেমে পড়।'

আর একদিন—মওলানার অদূরেই বসেছিলেন জনৈক বামপন্থী সাবেক ছাত্র নেতা এবং বর্তমানে তরুণ রাজনীতিবিদ। মওলানা তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে বললেন, 'দেখো, আমি ওকে বার বার বলছি আমি কম্যুনিস্ট নই, আমি মসুলমান। তোমরা কম্যুনিস্ট ভাল কথা, প্রকাশ্যে কমিনিউজম কর। যতদিন তোমাদের ছত্রছায়ার দরকার ছিল, আমি তা দিয়েছি। এখন তোমরা শিশু নও। তোমরা সাবালক হয়েছো, কেন তোমরা আমার পিছনে লেগে আছ? কিন্তু তবু কিছুতেই ওরা সরবে না।' সেই তরুণ নেতা মুখ নিচু করে বসেছিলেন, কথা বলছিলেন না।

www.pathagar.com

মওলানা তাঁর নিজের অফিস ঘরের সামনে হুকুমতে রব্বানীয়া ব্যানার টাঙ্গিয়েছেন। এ ছিল কম্যুনিস্টদের সংগে তাঁর ছাড়াছাড়ির চূড়ান্ত পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে তিনি গঠন করেছিলেন খোদায়ী খেদমতগার সমিতি—যা ইসলামের রব্বানী দর্শনেরই বাস্তব ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী। শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের এই দর্শনকে পরিস্ফুট ও বিস্তার করতে হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মানুষ গড়ার একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন—তাঁর জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নে। মওলানার অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর সংক্রামক প্রতিভা, তাঁর যাদুকরী ক্ষমতার আশ্রয়ে যারা রাজনৈতিক এবং দলীয় মতলব হাসিল করতে চেয়েছে তাদেরকে তিনি শুরু থেকেই চিনতেন। তিনি তাদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কাউকেই তিনি শত্রু বা পর মনে করতেন না। তিনি চাইতেন যে, ওরা তাঁর সাহচর্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে। কিন্তু মওলানার সে প্রত্যাশা সফল হয়নি।

www.pathagar.com

আবু সালেহ

আমাদের স্বাধীনতা ঃ মওলানা ভাসানীর কিছু টুকরো স্মৃতি

খুলনার রূপসা ঘাটে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ও পুলিশ বাহিনী মওলানা ভাসানীর গাড়ীর সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এই বাহিনীদ্বয় ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন খুলনার জেলা প্রশাসক জনাব ইনাম আহমেদ চৌধুরী, জেলা পুলিশ কর্মকর্তা, খুলনা সদর মহকুমা প্রশাসক ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা। রাত তখন ১২টা বেজে ৩৬ মিনিট। মওলানা ভাসানীর গাড়ীতে তখন উপবিষ্ট ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিশিষ্ট নেতা ও খুলনা জেলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি এডভোকেট আবদুল জব্বার ও তৎকালীন দৈনিক পয়গামের বার্তা সম্পাদক জনাব আসাদুজ্জামান বাচ্চু। এরা দু'জন গাড়ীর পিছনের সিটে বসেছিলেন। আমি গাড়ীর ড্রাইভারের কাছের সিটে বসা মওলানা ভাসানীর পাশে।

সরকারী বাহিনীগুলোর এই বিরাট বহর দেখে মওলানা ভাসানী বুঝলেন, স্বাধীনতার কর্মসূচী ঘোষণার জন্য সরকার তাঁকে গ্রেফতার করবে। তিনি পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে এডভোকেট জব্বার সাহেবকে বললেন, 'জব্বার, তুমি গাড়ী থেকে নেমে যাও—জেলখানায় কম্বল ও কাপড়-চোপর পৌছে দিও।' জব্বার সাহেবের সংগে জনাব আসাদুজ্জামান বাচ্চুও নেমে গেলেন। মওলানা ভাসানী আমাকেও নেমে যেতে বললেন এবং নিরাপদে গা ঢাকা দেয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হুজুর, আপনাকে এভাবে রেখে কোথাও যাবো না। গ্রেফতার হলে আমিও হবো।' আমি পিছনের সিটে এসে বসলাম। গাড়ী ঘাট পার হতে ফেরীতে উঠলো।

ঘটনাটি উনিশ শ' সত্তর সালের। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তখনও হয় নি। মওলানা ভাসানী উভয় নির্বাচনই বর্জন করেছেন। দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল

www.pathagar.com

এলাকায় ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক জলোচ্ছ্বাস ঘটে যাওয়ায় প্রায় ১৪ লাখ মানুষ মারা গেছে। অসংখ্য গবাদি পশুও বানের পানিতে ভেসে গেছে। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ত্রাণ কার্যের জন্য সরকারী উদ্যোগ মোটেই নেয়া হয় নি। মওলানা ভাসানী সে সময়ে ঢাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। জলোচ্ছ্বাসের খবর পেয়ে তিনি চিকিৎসকদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লেন দুর্গত এলাকায়। হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী সেই দৃশ্য দেখে এসে তিনি খুবই অস্থির হয়ে উঠলেন। এই বিশাল এলাকার ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণকার্যের জন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়া ছাড়া সমস্যার সুরাহাও সম্ভব নয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকবর্গ এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দও এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসে নি। তাদের এই আচরণ লক্ষ্য করে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, আর তাদের সাথে থাকা সম্ভব নয়। নির্বাচন বর্জন করলেন তিনি ও তাঁর দল। অনুধাবন করলেন, লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা অবশ্যাম্ভাবী হয়ে উঠেছে। আর এই স্বাধীনতার বাণী নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সারা দেশে ঝটিকা সফরে বেরিয়েছেন। এই সফরেরই অংশ হিসেবে তিনি খুলনার শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, পিরোজপুর, বাগেরহাট, ফকির হাট ইত্যাদি এলাকা সফর শেষে খুলনা শহরের উদ্দেশ্যে রূপসা ঘাটে এসে পৌঁছান। বাগের হাটে দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সাথে বৈঠক, প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ও মওলানার সন্ত্রাসবাদী আমলের এক সময়ের বিশ্বস্ত সাথী আবদুল গনি সরদারের বাড়ীতে দাওয়াত গ্রহণ এবং বাগের হাট ঘাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করতে গিয়ে হুজুরের খুলনায় পৌঁছার সময় বিলম্বিত হয়।

মওলানা ভাসানীর গাড়ীটি ফেরীতে উঠতেই খুলনা সদর মহকুমা প্রশাসক এসে জানালেন হুজুরকে খুলনা সার্কিট হাউজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানে সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মওলানা সাহেবের সংগে কথা বলতে চান। হুজুর এ সংবাদে একটু উত্তেজিতই হলেন। বললেন, 'কথা বলতে হলে এতো রাতে পথ থেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া কেন?'

এদিকে এডভোকেট জব্বার সাহেব ও বাগের হাটের ন্যাপ নেতা আমজাদ হোসেন (গোরাই মিয়া) সহ অন্যান্য ন্যাপ নেতৃবৃন্দ খুবই বিচলিত

www.pathagar.com

হয়ে পড়লেন। জব্বার সাহেবের মুখে একই কথা, খুলনা থেকে মওলানা গ্রেফতার হবেন আর আমরা তা মেনে নেবো তা হয় না। খুলনার প্রগতিশীল রাজনীতিতে এডভোকেট আবদুল জব্বারের নাম কিংবদন্তীর মতো। তাঁর জনপ্রিয়তা অভাবনীয়। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগিদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন এই মহান নেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে এডভোকেট আবদুল জব্বারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মওলানা ভাসানীর গাড়ীটি সার্কিট হাউজের সামনে এসে থামলো। পিছনে এডভোকেট আবদুল জব্বার, গোরাই মিয়া ও জনাব আসাদুজ্জামান বাচ্চু সাহেবদের গাড়ীও রয়েছে। মহকুমা প্রশাসকের কথাবার্তায় তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হন, মওলানাকে গ্রেফতার করা হবে না। সে কারণ তা'রাও সার্কিট হাউস অভিমুখে হুজুরের গাড়ী অনুসরণ করেছেন। গাড়ী থেকে হুজুর নামতেই সেনাবাহিনীর একটি দল সমবেত বুটের শব্দ তুলে সেনাবাহিনীর কায়দায় তাঁকে 'স্যালুট' করলো। সামরিক বাহিনীর কর্তাব্যক্তি (সম্ভবত কর্নেল) সিঁড়ি থেকে নেমে এসে হুজুরের কদমবুসি করলেন এবং তাঁকে ধরে সার্কিট হাউসের একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। অধিক রাতে তকলিফ দেয়ার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন তিনি। তিনি বলছিলেন, 'হুজুর' জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলি খান আপনার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আপনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছিলেন বলে সম্ভব হয় নি। তিনি আমাকে রেখে গেছেন কিছু আলোচনার জন্য।' জনাব ইনাম আহমেদ চৌধুরী, এডভোকেট আবদুল জব্বার, আমজাদ হোসেন গোরাই মিয়া, আসাদুজ্জামান বাচ্চু, আমি এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তারা পাশের ড্রয়িং রুমে বসলাম।

মওলানা ভাসানীর সাথে সামরিক কর্তাব্যক্তির কি কথা হয় তা জানার জন্যও আমরা কান খাড়া করে রইলাম।

মওলানা ভাসানী এমনি এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা যাঁর কাছ থেকে সহসা কোন কথা নেয়া দুরূহ ব্যাপার। বরং কথার বানেই তিনি প্রশ্নকর্তাদের হিমসিম খাইয়ে দিতেন। সামরিক কর্তাব্যক্তির কক্ষের দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হলেও মওলানার দরাজ কন্ঠের আওয়াজ আমাদের কানে এসে পৌঁছলো। তিনি একের পর এক বলে চলেছেন,

www.pathagar.com

দেশের সামগ্রীক পরিস্থিতির কথা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কথা। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কথা। আমরা শুরুতে শুনতে পেলাম মওলানা ভাসানী অত্যন্ত জোরালো কন্ঠে সামরিক কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই কি তোমার খেলাফাতুল মুসলেমীনি? তোমার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্যালনে গ্যালনে ঠিলায় ঠিলায় মদ খায়, অতি সাধারণ মহিলাকে (মহিলার নাম উল্লেখ করলেও এ নিবন্ধে উল্লেখ করা হলো না) নিয়ে রাত কাটায়। এজন্য আমরা পাকিস্তান চাইনি। সারা দক্ষিণ বাংলায় আজ হাহাকার, পর্যাপ্ত রিলিফ নেই। দুর্গত এলাকার মানুষ আজ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তোমার প্রেসিডেন্টের সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।' মওলানা ভাসানী বলছেন, 'এত অত্যাচার নির্যাতন অবিচার এবং চরিত্রহীনতার নজীরবিহীন ঘটনা পৃথিবীতে নাই। আমি বরাবর বলে আসছি সমস্যার সমাধান করতে, কিন্তু তা আজ পর্যন্ত কার্যকর হলো না। কি ভাবে পাকিস্তান টিকবে?' মওলানা ভাসানী তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আর সম্ভব নয়। আমি লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন তথা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা করেছি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এটাই হলো আমার সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচী।' সম্ভবত ঐ সামরিক কর্তাব্যক্তির বাড়ী ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার কিম্বা বেলুচিস্তানে। মওলানা তাঁকে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোমরাও তোমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করো।'

এডভোকেট জব্বার সাহেব আমাকে মওলানা সাহেবের কাছে ট্রেনের সময়সূচী জানানোর জন্য পাঠালেন। দরোজা খুলতেই কালোপনা এক ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন। আমি জোর করে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তবু তিনি যেতে দিচ্ছেন না। পরে জেনেছি তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা। প্রখ্যাত উপন্যাসিক, নাম বেদুঈন সামাদ। এ অবস্থার ভিতর থেকে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম এলো। আমি ঘরে প্রবেশ করেই মওলানা সাহেবকে বললাম, 'হুজুর পৌনে ৪টায় ট্রেন।' মওলানা সাহেব 'আচ্ছা' বলেই আবার কথায় সরব হয়ে উঠলেন। আমাকে চলে যেতে বা বসতে কিছুই বললেন না। তাঁর চেয়ারের পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘরের ভিতর তখন উৎকট মদের গন্ধ। কয়েকটি তাস টেবিলে-মেঝেয় এলোমেলো পড়ে রয়ে রয়েছে। সামরিক অফিসার অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে এবং অনড় হয়ে বসে শুনছেন মওলানা ভাসানীর কথা।

www.pathagar.com

কক্ষের ভিতরের পরিবেশ লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম মওলানা সাহেব কেনো এতো চড়া ও ধমকের সুরে সামরিক কর্মকর্তার প্রতি বাক্যবান ছুঁড়ছিলেন। পরে জানা গেলো, মওলানা ভাসানী আসার সময় বিলম্বিত হওয়ায় ঐ কক্ষে সামরিক অফিসারগণ তাস খেলছিলেন। ভেবেছিলেন এতো রাতে হয়তো তিনি আসবেন না। কিন্তু যখন এসে পড়লেন সে মুহূর্তে কক্ষটি পরিপাটি করার কথা তারা চিন্তাও করেন নি বা সুযোগ করে উঠতেও পারেন নি।

মওলানা সাহেবের কাছে দেরী হওয়াতে জব্বার সাহেব জনাব ইনাম আহমদ চৌধুরীকে আমার খোঁজ নিতে পাঠালেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই মওলানা ভাসানী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই যে ইনাম, কেমন আছো?' উত্তরে তিনি বললেন, 'জ্বী হুজুর, ভালো আছি। মওলানা সাহেব তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ভাষায় বললেন, 'মিছা কথা কও।' ইনাম আহমেদ চৌধুরী বললেন, 'না হুজুর, ছোট বেলায় আপনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, কখনও মিথ্যা কথা বলবে না—আমি সেই উপদেশ এখনও মেনে চলি।' মওলানা সাহেব একটু মুচকী হেসে বললেন, 'হ, তুমি সাচা কথা কওনের লোক। এই যে তুমি ডি. সি. হইছো—শুধু কাজ ভাসানী কোথায় মিটিং করবে তার দলের লোকদের এ্যারেস্ট করবে এই তো...... ......দেশের জন্য ভালো কিছু কাজ করো। তোমার বাবা গিয়াসউদ্দীন আহমদ চৌধুরী ছিলেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি যখন আলীগড়ে পড়তেন মাঝে মাঝে আমি তার ওখানে গেস্ট হয়ে থাকতাম। অমন নিরাহংকার ও ভালো মানুষ এই সাব-কন্টিনেন্টে দেখি নাই।'

মওলানা ভাসানী বলেন, 'দেখো ইনাম, তুমি সি. এস. পি. অফিসার হিসেবে অহংকার করো না। আমার হক (কমরেড আবদুল হক), আমার তোয়াহা (কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা) এবং আমার মতিন (কমরেড আবদুল মতিন) এরা সি. এস. পি. কেনো যদি তার উপরেও কোনো পরীক্ষা থাকতো তারা প্রথম হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় হতো না; কিন্তু ও পথে তারা যায় নি। ইউনিভার্সিটির উচ্চতরো ডিগ্রী লাভ করেও তারা নিজে-দের সুখ-সুবিধার প্রতি আগ্রহী হয় নি। গরীব ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মুক্তির জন্য তারা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে চলেছে। তারা তোমাদের ভয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ড হয়েছে। সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখে না। রাতের অন্ধকারে অন্ধকারে মিশে কৃষক ও শ্রমিকের দুঃখ-কষ্টের খোঁজ নিচ্ছে। তারা

দেশপ্রেমিক। তুমি ইনাম তাদের ধরতে পুলিশ পাঠাও এর চেয়ে অতীব দুঃখের আর কি হতে পারে !'

যে উদ্দেশে মওলানা সাহেবকে সার্কিট হাউসে আনা সামরিক কর্তা-ব্যক্তি সেদিকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারছেন না। কেননা মওলানা সাহেব একের পর এক কথা বলে চলেছেন। কোন বিরতি নেই। সে কারণ আলোচনার বিষয়টি উত্থাপন করারও কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

এর ফাঁকে তিনি মওলানা ভাসানীকে প্রশ্নাকারে না করে কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'হুজুর, ভারতীয় নক্সালাইটরা পূর্ব পাকিস্তানে এসে কি বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে ?'

মওলানা ভাসানী কথার উদ্দেশ্য বুঝলেন। অতো সহজেই তিনি এ কথার জবাব দিতে রাজী নন। আর তা'ছাড়া বিষয়টি মওলানা ভাসানীর এখতিয়ারভুক্ত নয়। তাই খুবই উত্তেজিত কন্ঠে তিনি বললেন, 'ভারতীয় নকসালাইটদের সাথে আমার কি সম্পর্ক ? তারা তাদের দেশে আন্দোলন করছে-যা কিছু করার সেখানেই করা উচিত তাদের। আমাদের দেশে তাদের প্রবেশ করা আইনবিরোধী।'

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ছে। ১৯৬৭/৬৮ সালের দিকে ভারতের পশ্চিম বঙ্গে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সি.পি. এম. এল. নকশালবাড়ী এলাকায় এক আন্দোলন শুরু করে। শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে ক্রমেই এ আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে থাকে। সারা পশ্চিম বঙ্গে এ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন পশ্চিম বঙ্গের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্থানীয় সংবাদে সি. পি. এম. এল.-র এই শ্রেণী শত্রু খতমের শিকারে নিহতদের খবরাদি খুব ফলাও করে প্রচার করা হতো।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও এই শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতির ঢেউ এসে লাগে। প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নকসালবাড়ী-র কায়দায় শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি ঐ সময়েই শুরু করার পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ ধরনের হত্যার রাজনীতি বেশ রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। চারু মজুমদারের আদর্শ অনুসরণ করে তারাও নেমে পড়েন শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতিতে।

www.pathagar.com

এ সময়ে মওলানা ভাসানী খুলনায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্মেলনে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'তোমরা নকসালপন্থী হইও না—কৃষকের মুক্তির জন্য ডুমুরিয়ার আদর্শ অনুসরণ করে ডুমুরিয়াপন্থী হও।' ডুমুরিয়া খুলনা জেলার একটি থানা। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি সেখানে প্রবল আন্দোলনে লিপ্ত ছিল।

এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়, মওলানা ভাসানী ভারতীয় নকসালপন্থীদের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ১৮ কিম্বা ১৯ তারিখ। ঢাকা মহানগরী তখন অসহযোগ আন্দোলনে মুখর। বিভিন্ন সড়কে ও এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেধড়ক গোলাগুলী চলছে। মওলানা ভাসানী তখন ঢাকার টিপু সুলতান রোডস্থ স্টেপ-ইন'-এ ঢাকা-মহানগরী ন্যাপের সভাপতি এম. এ. জলিলের বাসায়। গভীর রাত। তার কক্ষে শুধু আমি। জলিল সাহেব ঘুমুতে গেছেন। মওলানা সাহেব বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। এর মধ্যে টিপু সুলতান রোডে আচমকা গোলাগুলী শুরু হলো। সলিমুল্লাহ কলেজের সম্মুখের দোকানের বারান্দা গুলোতে শুয়েছিল—কিছু ছিন্নমূল মানুষ। গোলাগুলীতে তারা নিহত হলেন।

মওলানা ভাসানী আচমকা এই আওয়াজে বিছানা ছেড়ে ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গুলী হলো?' আমি বিস্তারিত বললাম এবং এই গুলীতে নিহতদের কথাও জানালাম। মওলানা ভাসানী তখন যেনো গর্জে উঠে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু এর মধ্যে টেলিফোনের শব্দ বেজে উঠলো। মওলানা টেলিফোন ধরতে বললেন। হ্যালো কে বলছেন—বলতেই উত্তর এলো খান এ. সবুর। মুসলিম লীগ নেতা খান এ. সবুর। মওলানার সাথে দেখা করতে চান—কখন সময় হবে এ কথা জানতে চাইলেন। মওলানা ভাসানী বললেন—পরদিন যে কোন সময়ে আসতে বলে দেয়ার জন্য।

কিছু সময় ধরে টিপু সুলতান এলাকায় চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থাকার পর শান্ত হয়ে এলো। মওলানা ভাসানী বিছানায় বসলেন গিয়ে। এক মুহূর্তের জন্যও আর শুলেন না। আমাকে পানি দেয়ার জন্য বললেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি ঢাকার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে জানতে

www.pathagar.com

চাইলেন। আমি সবিস্তারে বললাম। তিনি কমরেড আবদুল মতিন, কমরেড আলাউদ্দিন, কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননদের কথা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'গত বিকেলে মতিন ভাই আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। খুব ভীড় দেখে চলে যান। আবার আসবেন বলে জানিয়ে গেছেন। এছাড়া মেনন ভাইও এসেছিলেন হুলিয়া কাঁধে নিয়ে।' উল্লেখ্য, স্বাধীনতার কর্মসূচী দেয়ার জন্য কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন ও তৎকালীন ছাত্র নেতা মোস্তফা জামাল হায়দারের সামরিক আইনে দণ্ড প্রদান করা হয়। অবশ্য তাঁদের অনুপস্থিতেই এ বিচার করা হয়। এ ছাড়া তৎকালীন পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ১৯৬৯-এর ১১ দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহবুব উল্লাহ্‌কে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কর্মসূচী ঘোষণা করার দায়ে ১৯৭০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে মওলানা ভাসানীকে বললাম, 'হুজুর, পশ্চিম বঙ্গে নকশালপন্থীরা বেশ এগিয়ে গেছে তাদের আন্দোলন নিয়ে, আমাদের এখানেও কম্যুনিস্ট পার্টি ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। মতিন ভাইয়ের সাথে কথা বলে সে রকমই মনে হলো।' তিনি বললেন—সকলকে গ্রামে যেতে এবং কৃষকদের গেরিলা ইউনিট তৈরী করতে।

মওলানা ভাসানী বললেন, 'মতিনের বিশ্বস্ততার ত্রুটি নেই। কিন্তু এখানে নকশাল কায়দায় কোন কর্মসূচী সফল হবে না।' তিনি দৃঢ়চিত্তে বললেন, 'আগামী ৬ মাসের মধ্যে ভারতের নকসালপন্থীদের আন্দোলনও শেষ হয়ে যাবে।' কারণ উল্লেখ করে বললেন, 'শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই যদি এ আন্দোলন করতো তারা তাহলে হয়তো কিছু সফলতা অর্জন করতে পারতো। কিন্তু ভারত বিরাট দেশ। সমগ্র ভারতব্যাপী এ আন্দোলন পরিচালনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

মওলানা ভাসানী ভারতীয় নকসালপন্থীদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন একটি ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সে কারণ সামরিক অফিসারটির ঐ কথায় তিনি উত্তেজনা ও প্রকাশ বিরক্তি করলেন মাত্র। কথার ফাঁকেই জব্বার সাহেব এসে ঘরে ঢুকে বললেন, 'হুজুর, এখন রাত সাড়ে তিনটা। পোনে চারটায় ট্রেন।' মওলানা সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে আর নয় এখন উঠি।' অফিসার সাহেবও বললেন, 'বহুত আচ্ছা।' তার চোখে মুখে তখন পুরো ঘুমের আবেশ। আমরা পৌনে ৪টায় ময়মনসিংহের

www.pathagar.com

সরিষাবাড়ীতে যাবো। সরিষাবাড়ীর আদ্রার চর, ছদ্রাবাড়ীসহ আরও কয়েকটি চরাঞ্চলে মওলানা ভাসানীর সফরসূচী রয়েছে।

সার্কিট হাউস থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সামরিক কর্মকর্তা গেইটের সামনে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

অপর আর একটি ঘটনা। সম্ভবত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কয়েক মাস পর। মওলানা ভাসানী শারিরীক অসুস্থতার দরুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৯ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন। তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হামিদ খান মওলানা ভাসানীকে দেখতে হাসপাতালে এলেন, সম্ভবত রাত্রে। তৎকালীন ঢাকা মহানগরী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্য মরহুম জনাব সিরাজুল হক মন্টু (পরবর্তীতে বিএনপি পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী ও প্রতিমন্ত্রী) এবং আমি সে সময়ে ঐ কেবিনে উপস্থিত।

মওলানা ভাসানী সেনা প্রধানের আপ্যায়নের জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে বললেন। এ জন্য কেবিনের ভেতরের বারান্দায় গিয়ে কিছু ফল ও হরলিক্স সহ নাস্তার আয়োজন করতে লাগলাম। জেনারেল হামিদ খান মওলানা ভাসানীর সাথে এই ফাঁকে কিছু কথাবার্তা শুরু করেন। আমরা সে সব কথাবার্তার সমস্তটা শুনতে পারি নি। তবে যতটুকু শুনলাম তাতে বুঝলাম আওয়ামী লীগের ছয় দফার উপর তাদের কঠোর মনোভাব কি পর্যায়ে রয়েছে। তিনি মওলানা ভাসানীকে দেশের একজন বিজ্ঞ এবং অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করে বললেন, 'ছয় দফা দাবী হিন্দুস্থান সরকার কর্তৃক প্রণীত। এ দাবী বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তানের সংহতি ভেঙে যাবে। আপনি ছয় দফার বিরুদ্ধে কিছু বলুন এবং প্রতিরোধের জন্য কিছু করুন। মওলানা ভাসানীকে দেখলাম, ভিন্ন চরিত্রে। জেনারেল সাহেবের কথায় কোনরূপ সায় না দিয়ে বরং উল্টো ছয় দফার সাফাই গাইছেন। তিনি বলছেন, 'ছয় দফার দাবী একদিনে আসে নি। এ দাবী এখন পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৪ কোটি মানুষের দাবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দাবী থেকে শেখ মুজিব পিছপা হলেও জনগণ ছাড়বে না।'

এ ধরনের কথায় আমরা দু'জন আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রতি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থন তো দূরে থাক

www.pathagar.com

বরং বিরোধিতাই করছে সর্বত্র। কিন্তু এ পর্যায়ে এ ধরনের বক্তব্য আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করলো।

মওলানা ভাসানী জেনারেল হামিদ খানকে দৃঢ়চিত্তে বললেন, 'পাকিস্তানের সংহতি অটুট রাখতে হলে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করাই হলো এর একমাত্র ফয়সালা। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রদান না করার কোন যুক্তি নেই।' জেনারেল হামিদ খান চলে যাবার পর মওলানা ভাসানী বিড় বিড় করে কি যেনো বলছিলেন। একবার বলে উঠলেন, 'যাও—কথা না শুনলে আমিও এক দফা দেবো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবীই সেই এক দফা।'

মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পদ্মা বিধৌত এই বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি পৃথক ভূমি গড়ে তোলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালী জাতি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে সেই বৃটিশ শাসনামল থেকেই ছিল বঞ্চিত। পাকিস্তানের ২৫ বছরের ইতিহাসে এই জাতির উপর যে কঠোর অত্যাচার ও অবিচার চালানো হয়েছে তা ভাবতেও আতংকিত হতে হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালীর অবস্থান ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে পতিত হয়। বাংলাদেশের সম্পদ শুষে নিয়ে বৃটিশ শাসনামলেই যেমন গড়ে উঠে ভারতের বিভিন্ন বন্দর ও নগর ঠিক তেমনিভাবেই এ দেশের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক শ্রেণীরা আরো ফেঁপে ফুলে ওঠে।

বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক উন্নতি তথা মুক্তির জন্য তাই স্বাধীনতা ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প ছিল না। মওলানা ভাসানী তাই সকল বাধা-বিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেই নামলেন স্বাধীনতার দাবী নিয়ে।

আমার মনে পড়ছে স্বাধীনতার দাবী নিয়ে মওলানা ভাসানী রাতের ঘুমকে হারাম করে কিভাবে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সারা দেশ সফর করেছেন। সে সফরে কোন বিরতি ছিল না। কোন অবহেলা ছিল না। ঐ দিনগুলোতে তিনি শত শত জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন, স্বাধীনতার বাণী নিয়ে জনমত গড়ে তুলেছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানী। দলের সাধারণ সম্পাদক ঝানু রাজনীতিবিদ মশিয়ূর রহমান যাদু মিয়া। এ সময়ে

www.pathagar.com

দুই নেতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য একটি বিশেষ চক্র উঠেপড়ে লেগেছিল।

মওলানা ভাসানী এ সময়টিতে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। স্বাধীনতার কর্মসূচী তিনি দলের সিদ্ধান্ত হিসেবে ঘোষণা করেন নি। যার ফলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উপর সারির কয়েকজন নেতা তীব্র সমালোচনা করে বলেন, মওলানার স্বাধীনতার ডাক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।' কোন কোন নেতা মওলানাকে বিদেশী শক্তির ক্রীড়ানক হিসেবেও আখ্যায়িত করে ছাড়েন। বেশ কয়েকজন নেতা দলত্যাগও করেন।

অপর পক্ষে কোন কোন নেতা মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতার কর্মসূচীর পক্ষে থাকলেও ধীর লয়ে অগ্রসর হবার যুক্তি প্রদর্শন করতেন। এ অবস্থার মধ্যে মওলানা ভানানীকে নিতে হয় এককভাবে কঠিন সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্ত হলো 'তোর ডাক শুনে কেউ যদি না আসে তবে একলা চলো রে'— তিনি বুঝলেন, সময় ক্ষেপণ করে লাভ নেই। এতে বিতর্কই বাড়বে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পাটির অভ্যন্তরেই বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাদের কোন কোন গ্রুপ ইতি পূর্বেই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের আন্দোলন পরিচালিত করছিল।

মওলানা ভাসানী অনুধাবন করলেন, তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী ও নেতা তাঁর স্বাধীনতা কর্মসূচীর পক্ষে। অবশ্য পরবর্তীতে যাঁরা দলত্যাগ করেছেন তাঁরা ছাড়া ন্যাপের মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতাবিরোধী আর কারোর অস্তিত্ব ছিল না। মওলানা ভাসানী জনগণের নার্ভ বোঝেন। আন্তর্জাতিক হাওয়া বাতাসও বোঝেন অতি সহজেই। তিনি বুঝলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই তো মোক্ষম সময়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবী তিনি প্রথম করেন ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠনকালে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও নেতৃবর্গের আচরণ লক্ষ্য করে তিনি জানিয়ে দিয়ে ছিলেন আচ্ছালামু আলাইকুম।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দৃঢ় ঘোষণা। যে ঘোষণা আজো বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতি-হাসে ঐতিহাসিক আচ্ছালামু আলাইকুম বলে সর্বাধিকভাবে উচ্চারিত।

১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইউব খান এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হন। মওলানা ভাসানীকে করা হয়

www.pathagar.com

গৃহে অন্তরীণ। অসংখ্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে নয়া শাসনতন্ত্র দেয়ার মধ্য দিয়ে আবার রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ আসে। এর অল্পদিন পরই শেখ মজিবুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থ-নৈতিক বৈষম্য তুলে ধরে ছয় দফার দলীয় কর্মসূচী দেন।

উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে যখন লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন সে সময়ে শেখ মুজিবর রহমান মওলানার এই কর্মসূচীর বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে সংগঠিত হন।

তারপর ১৯৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও মহান গণঅভ্যুত্থানের ৬৯ সাল। এ বছরগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে আন্দোলনে আন্দোলনে স্বৈরাচারী শাসক আইউব খানের উৎখানের নজিরবিহীন সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গমালায়।

এই আপোষহীন সংগ্রামের পরিণতিতেই পাকিস্তানের লৌহমানব বলে কথিত ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইউব খানকে বিদায় নিতে হয়।

৭১-এর স্বাধীনতার ডাক মওলানা ভাসানীর ১৯৫৭ সালের 'আচ্ছালামু আলাইকুম' ঘোষণারই পূর্ণ অবয়ব।

মওলানা ভাসানীকে সে সময়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হুজুর, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বোধহয় অন্যদের হাতে চলে যাবে—আমরা কি করবো?' মওলানা ভাসানী বললেন, 'আগে স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য থেকেই সত্যিকার নেতা বেরিয়ে আসবে। এ জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। বাংলার সাড়ে ৮ কোটি মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়। তারা এখন বীর সৈনিকে পরিণত হয়েছে। এদের আর কেউ কোন কথা দিয়েই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।'

৭১-এর ৯ই মার্চ পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আয়োজিত জনসভায় মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব হুঁশিয়ার—বাংলার মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় তুমি বঙ্গ-বন্ধুই হও আর আমি ভাসানী যতই নয়নমণিই হই না কেন বাংলার মানুষ আজ স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। তুমি যদি এ আন্দোলন থেকে পিছটান দাও তাহলে জনগণ তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে' ইত্যাদি ..।

মওলানা ভাসানীর সেদিনের সে ভাষণ সারা পল্টনের মানুষের মনে

www.pathagar.com

এক অপূর্ব সাড়া যুগিয়েছিলো। যাদের মনে ভয় ও সংশয় কাজ করছিলো তাদের মনে নিয়ে আসে এক অনন্য জাগরণ।

১৯৭০ সালের জলোচ্ছাসের পর মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে পর পর কয়েকটি জনসভা করেন। প্রথম বার দুর্গত এলাকা ঘুরে এসে পর্যাপ্ত রিলিফ সামগ্রী সরবরাহের দাবী জানাতে এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি এই মহা দুর্যোগের খবর জানাতে। দ্বিতীয় বারের জনসভা অনুষ্ঠিত হয় দুর্গত এলাকায় সাহায্য বিতরণের নামে বিদেশী সাহায্য সংস্থার ষড়যন্ত্রমূলক গতিবিধি লক্ষ্য করে তা প্রতিরোধের জন্য। দ্বিতীয় বারের জনসভায় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান।

১৯৭০-এর ৪ ডিসেম্বর শুক্রবার। মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করার সংকল্প ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, 'এটা সাত কোটি মানুষের হায়াত মউতের লড়াই। ১৪ লক্ষ লোক ঝড়ে মরেছে। দরকার হয় আরও ১৪ লক্ষ মরবো। তবু আল্লাহ্‌কে হাজের নাজের জেনে বলছি—পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবো—স্বাধীন করবো।'

এই ঘোষণার সাথে সাথে সারা পল্টন জংগী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। ছাত্র ও ন্যাপকর্মীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে, স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর, কায়েম কর।

মওলানা সাহেব বললেন, 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান অর্জিত হলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয় নি। এটা পাকিস্তান প্রস্তাবের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করাও বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে।'

পল্টনে সেদিন যে শ্লোগান উঠেছিলো ঃ কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর—পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর, তা সত্যিই একদিন বাস্তবায়িত হলো, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হলো। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেলেন তা জাতিকে নতুন করে সংগ্রাম পথে পরিচালিত করে। সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ-এর বিরোধী সকল আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর নাম অগ্রদূতের ভূমিকায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং চিরদিন থাকবে।

www.pathagar.com

সৈয়দ জাফর

গৃহবন্দী মওলানা তখন আট কোটি মানুষের হৃদয়ে

মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। বাড়ির সামনে টাঙ্গাইল পোড়াবাড়ী রোডে পুলিশ-গোয়েন্দা। পুলিশ মোতায়েন বাড়িতে ঢোকার পথে বাকা-বেড়ার মুখে। বাড়ীর পেছনে পাট-কাঠির বেড়ার পাশ ঘেঁষে পুলিশের পাহারা। বাড়ীর নির্ধারিত কয়েকজন ছাড়া অন্য যে কোন লোকের ভেতরে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ।

অন্তরীণ মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার মিলবে কি-না সে সম্পর্কে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। সন্তোষের সেই তীর্থে পুলিশের অবস্থান দেখে সাক্ষাতের আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। স্বাভাবিক দিনগুলোর প্রহরা যদি এই হয়, তবে কোন বিশেষ দিবসে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় অনুমান করছিলাম।

ইতিমধ্যে সাদা পোশাকের কয়েকজন রাস্তায় জিজ্ঞাসা করলো আমার পরিচয়, গন্তব্য ও পেশা কি? এড়িয়ে গেলাম প্রকৃত পরিচয়। মুরীদ হিসাবে পরিচয় দিলাম। হুজুরকে সালাম জানানো আমার যাওয়ার উদ্দ্যেশ্য বলে জানালাম। রাস্তার পাশে বেঞ্চি পেতে বসে থাকা পুলিশ সাফ সাফ জানিয়ে দিলো ঃ বাইরের কারোর দেখা করার হুকুম নেই। বাকা বেড়ার পাশে যাওয়া এও নিষেধ।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। মওলানা সাহেবের বাড়ীর পরিচিত কয়েকজন আমাকে দোকানে চা খেতে দেখে গেলো। ঘন্টা দু'য়েক পরে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে দেখলাম টাঙ্গাইল জেলার উচ্চপদস্থ কয়েকজন পুলিশ অফিসার জীপ থেকে লাফিয়ে নামলেন। বাড়ীর বাকা-বেড়ার পাশে কয়েক মিনিট তাদের দাঁড়িয়ে থাকার পর মওলানা ভাসানী বেরিয়ে এলেন। হাতে একটি বদনা। তিনি পুলিশ অফিসারদের উদ্দেশ্য করে কি যেন বলছিলেন। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে

www.pathagar.com

আমিও গিয়ে একপাশে দাঁড়ালাম। আমার দাঁড়ানোর পর মওলানা সাহেবের যে কথা প্রথমে কানে এলো, তা হচ্ছে, 'তোমরা আমাকে বন্দী করেছো এমনভাবে যাতে নিজের ঘরের খেয়ে থাকতে হয়। জেলখানায় রাখলে তো সরকারকে খাওয়ার খরচ দিতে হতো। মুজিবের সরকার জেলখানা ভরে ফেলেছে। সে জন্যে না হয় আমাকে বাড়ীতে বন্দী করে রাখলো। তাই বলে মুসলমানের বাড়ীর রান্নাঘরের দরজায় পুলিশের পাহারা বসিয়েছে এমন বেশরম!' সাদা পোশাকের লোক, পোশাক পরা অফিসার-সেপাই সকলে তখন নির্বাক নিস্তব্ধ। সকলের নিথর অবয়ব চোখ-কান অন্য কোন দিকে নেই। মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশ। শুধু গণগুরুর কণ্ঠনিঃসৃত অমিয় সকলে পান করছে।

বাংলাদেশের মাটি-মানুষ, পরিবেশ, আবেগ, অনুভূতির সৃষ্ট একমাত্র মহানায়ক তখন যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন সারা বাংলাদেশের পথ-প্রান্তর। গৃহবন্দী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ সরকারের বাধা তছনছ করে সাড়ে আট কোটি মানুষের ঘরে ঘরে বিচরণ করছেন। সাধারণ মানুষের পাঁজরের হাড়, নিস্তব্ধ রন্ধনশালা মজলুম জননেতার চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। রক্ষীবাহিনীর বিভৎস অত্যাচারে গ্রামে গ্রামে মায়ের অবরুদ্ধ অশ্রুজল প্রতিরোধের বজ্রধ্বনি হয়ে উঠছে।

সাংবাদিক হিসেবে যেসব প্রশ্ন ধারণ করে সন্তোষের পর্ণ কুটিরের দ্বার-প্রান্তে গিয়েছিলাম সে সব প্রশ্ন ছাপিয়ে সমগ্র বর্তমান-ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট হয়ে গেল। চার্চিলের বৃটেন, ভলটেয়ার রুশোর ফ্রান্স ও আব্রাহাম লিঙ্কনের যুক্তরাষ্ট্র সাত-সমুদ্র পারের সাংবাদিকদের সব প্রশ্ন তোলাও অবকাশ ঘটে নি কখনও এই ব্যক্তিত্বের প্রখরতার সম্মুখে। যে ব্যক্তিত্বের সৌরভে যুগের পর যুগ এক বিশাল জনগোষ্ঠী আন্দোলিত কল্লোলিত হয়েছে, তাঁর কাছে মুহূর্তের সান্নিধ্য যুগ-যুগান্তরের সাধনার ফল বলে গ্রহণ করেছেন।

তৎকালীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসনের দুঃস্বপ্নের চিত্র ও স্বীয় প্রতিক্রিয়া সেদিন সে দুপুরে একজন সাংবাদিকের কাছে গৃহ-বন্দী মওলানা ভাসানী এভাবে তুলে ধরলেন। একটানা পঁয়ত্রিশ মিনিট বক্তব্য রেখে তিনি চোখ তুলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন এসেছো?'

জবাব দিয়ে আরও বললাম, 'হুজুর, আপনার সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না।'

www.pathagar.com

এতক্ষণে ওদের দৃষ্টি পড়ল আমি দাঁড়িয়ে আছি—মওলানা সাহেবের সব বক্তব্য শুনেছি। সবাই মিলে প্রশ্ন করতে লাগলো কিভাবে আমি ওখানে গেছি।

এদিকে মওলানা সাহেব বললেন, 'এরা রান্না ঘরের দরজায় পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। তুমি যাও।'

যে গণগুরুর প্রদীপ্ত চক্ষুযুগলের মধ্য থেকে প্রখর বিচ্ছুরণে মানুষের হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটতো তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎকার সেদিন এভাবে সম্পন্ন হলো।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন

মওলানা ভাসানীকে যেমন দেখেছি

১.

হুজুর মওলানা ভাসানী হজ্জে যাবেন। হজ্জে যাবার পাসপোর্ট করতে হবে। ফরম আনা হল, হুজুরের নামধাম পিতার নাম লেখা হল। পেশা 'রাজনীতি' বলে উল্লেখ করা হল। হুজুর ক্ষেপে গেলেন। বললেন, 'রাজনীতি কি পেশা হয়? লেখ, চাষা।'

হুজুর মওলানা ভাসানী কি চাষা? তিনি কি পীর? মওলানা কে?

একবার সাপ্তাহিক 'টাইমস'-এ ছবি ছাপিয়ে লেখেন 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স'। কেউ লেখেন, 'রেড মওলানা' "কখনও ভারতের দালাল, নয়ত চীনের দালাল বলে তিনি ভূষিত হলেন। কেউ বললেন, জ্বালাও পোড়াও এবং 'ঘেরাও' নেতা। আর্থ-সামাজিক স্থিতি অবস্থাকে যাঁরা অটুট রাখতে চান তাঁরা বলেন, 'মওলানা ভাঙতে জানেন গড়তে জানেন না। তিনি প্রতিক্রিয়াশীল-প্রয়োজনীয় মওলানা।' তিনি কি বিপ্লবী না আপোষকামী? তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি? মওলানা ভাসানীর পরিচয় কি কবি শামসুর রহমানের কবিতার সফেদ পাঞ্জাবী? যে পাঞ্জাবী দিয়ে শুধু ঢেকে দিতে চান বে-আবরু লাশ?

আমার ধারণা অনেক কিছু নিয়েই মওলানা ভাসানী। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের মিলিত সংগ্রামের নাম মওলানা ভাসানী। ধনিক বণিকের স্বার্থ রক্ষাকারী এবং সাম্রাজ্যবাদের দালালদের খবরী কাগজের পৃষ্ঠায় মওলানাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, মওলানাকে খুঁজে পেয়েছিল তাঁরা যাঁরা মওলানাকে একান্ত নিভৃতে পেয়েছিলেন।

একবার জনৈক সাংবাদিক মওলানাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মি, মওলানা, আপনি কি সাম্রাজ্যবাদের সাথে সারা জীবন সংগ্রাম করে যাবেন?

www.pathagar.com

জওয়াবে মওলানা বললেন, 'কবরে মনকীর নকীর ফিরিশ্‌তা এসে যদি জিজ্ঞাসা করে সেখানেও তাদেরকে বলব সাম্রাজ্যবাদ মানিনা, মানিনা, মানিনা।'

মওলানার জন্মস্থান পাবনার সরা ধানগড়া গ্রামে চিরনিদ্রায় যানও গ্রামে। গ্রামের মানুষদের কথা অনেকে বলেন কিন্তু তাদের সংলাপে ক'জন সংহতি আনতে পেরেছেন? কৃষাণের জীবনের সংলাপের সাথে সংহতি স্থাপন করতে না পারলে কৃষাণের জীবনের শরীক হওয়া যায় না।

দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে কেউ কেউ বিরাট শিল্পী হয়ে সে সুবাদে অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন; কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের ছবি শোভাবর্ধন করছে সর্বকালের দুর্ভিক্ষ স্রষ্টা ধনিক-বণিক, ফটকাবাজারী, মুনাফাখোর, কালোবাজারীদের বিলাসখানা। গরীবের গান গেয়ে অনেকে বড়লোক হয়েছেন। গরীবের হাড্‌ডিসার ছবি তুলে অনেকে নামকরা চিত্র পরিচালক হয়ে নিজের গরীবত্ব ঘুচিয়েছেন; কিন্তু এরা কেউ গরীবের সাথে, মেহনতী জনতার সাথে একাত্ম হতে পারেন নি বরং বলা যেতে পারে, নব্য আদম বেপারীর মত এরাও তেমনি গরীব বেপারী। এও এক প্রকার গরীবদরদ ফ্যাশন। আর মওলানা হচ্ছেন গরীব মেহনতী মানুষের জীবনের শরীক, প্রমিথ্যিউশ যেমন সূর্যের করোটি থেকে আগুন ছিনিয়ে এনেছিল, মওলানাও তেমনি পেটের না দেখা ক্ষুধার আগুন ছিনিয়ে এনে নিক্ষেপ করেছিলেন সকলের নিকটে। তাই মওলানা জালিমের আতংক, শোষকের জন্যে নিশার বিভীষিকা। মওলানা রহস্যময় মহাপুরুষ।

২.

আসামের ঘাগমারীতে ঘোড়ায় চড়ে হুজুর একদিন এক বাজারের দিকে ছুটছিলেন। বাজারের নিকটে এলে জনৈক মুরীদ তাঁকে সালাম করে বলল, 'হুজুর, আপনার অমুক মুরীদ রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছে। সে বুঝি আর বাঁচবে না।'

মৃত্যুর মুখোমুখিতে দাঁড়ানো গরীব মুরীদের বাড়ীতে এলেন মওলানা ভাসানী। রোগী তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর।

এক গ্লাস পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীর সম্মুখে গ্লাসটি তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি খাবা?'

'রসগোল্লা হুজুর।'

www.pathagar.com

ভাসানচরের হুজুর (আসামে তিনি সেই নামে পরিচিত—ভাসানচরের মওলানা, পরবর্তীকালে পরিচিত হলেন মওলানা ভাসানীরূপে) দু'টি রসগোল্লা আনালেন। একটি রসগোল্লা অর্ধেক খাওয়ার পর রোগী আর অর্ধেক খেতে পারেনি। এর কিছুক্ষণ পরে সে মারা যায়।

এ গল্প প্রথম শুনি হাজী দানেশের কাছে। আর একদিন শুনি হুজুরের মুখে বাংলার দরিদ্র কৃষকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শুনলাম সে কাহিনী। কাহিনী শেষ হতে হুজুরের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা পানি। হুজুর আবেগজড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'জানি, বাংলার ঘরে ঘরে এমনি বহু বহু দরিদ্র কৃষক রয়েছে, যারা পথে-ঘাটে রসগোল্লা দেখেছে, জীবনে একবারও পুরো একটি রসগোল্লা খেয়ে মরতে পারেনি।'

৩.

সত্তরের মহাপ্রলয়ের ধ্বংস স্তূপে হারিয়ে যাওয়া হাতিয়া দেখা শেষ করে মওলানা ভাসানী নোয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে এসেছেন। হুজুর রোযাদার, কিন্তু আমরা রোযা না রেখেও ক্লান্ত।

সেদিন ছিল জুমাবার। একটি মসজিদে হুজুর নমায আদায় করলেন। নামায শেষে মুসল্লীরা আবদার করল, 'হুজুর, আপনার পাক জবান থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।'

হুজুর বলা শুরু করলেন, 'হক্কুল্লাহ্ আর হক্কুল ইবাদ আমাদের জীবন গাড়ীর দু' চাকা। একটি ছাড়া অপরটি চলে না। হক্কুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র ইবাদত আর হক্কুল ইবাদত তথা মানুষের সেবা ছাড়া হক্কুল্লাহ্ সম্পূর্ণ হতে পারে না, হক্কুল ইবাদ ছাড়া আল্লাহ্ কোন কিছু কবুল করেন না। নামায, রোযা যেমন ফরয, জিহাদও তেমনি ফরয। সব ফরজের আগে জিহাদ ফরয হয়ে এসেছে, তাই আপনারা হক্কুল ইবাদ তথা মানুষের সেবায় শরীক হোন আর জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে জিহাদ তথা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিন।'

নামায শেষে আবার শুরু হল হাঁটা। হুজুর হাঁটছেন, রসিকতা করছেন, 'তোমরা লংমার্চ করবে?' রমনা থেকে পল্টন যেতে যাদের

www.pathagar.com

রিকশা লাগে, তারাই করবে লংমার্চ ?'

জনৈক পথচারী বলল, 'উনি কে ?'

খুব আস্তে উচ্চারণ করলাম, 'মওলানা ভাসানী।'

হুজুর শুনে ফেলেছেন।

আর যায় কোথায়। তিনি ধমক দিলেন, 'তোদের কি আমি দালাল রেখেছি আমাকে জিন্দাবাদ দিতে ? মনে রাখিস, নেতাদের কখনো জিন্দাবাদ দেয়া উচিত নয়—জিন্দাবাদ পেলেই নেতাদের মাথা বিগড়ে যায়। জিন্দাবাদ হবে কর্মসূচী। জিন্দাবাদ হবে দেশের জনগণ। জাতিকে বাঁচাতে হবে......'

হুজুর এক নাগাড়ে বলেই যাচ্ছেন...'ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ অনেক উঁচু। আমার নেতা কোন ব্যক্তি বিশেষ নন, আমার দেশের জনতা, দেশের আপামর জনসাধারণ আমার জীবনের সাথী।'

এ কথা তিনি বহু সভা-সমিতিতে বলেছেন।

তিনি বলতেন, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী, তারা আর যাই হোক, প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।'

হুজুরকে প্রশংসা করলে কখনো তাঁকে উৎফুল্ল হতে দেখিনি। কিন্তু দেখেছি তাঁর সম্মুখে অন্য নেতার কুৎসা করলে তিনি খুব বিরক্তি প্রকাশ করতেন।

মাগরিবের কিছুপূর্বে আমরা মেঘনার ধারে আস্তানা নিয়েছি।

হুজুর বলছেন, 'আমরা এখানে কত এসেছি...বোমা বানিয়েছি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি সময় এক বৃদ্ধ এসে হুজুরকে অবলোকন করছেন। কপালে হাত রেখে চোখকে আড়াল করে ফটোগ্রাফারের মত দেখছেন। বার বার দেখছেন।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুর, আপনার মোকাম শরীফ··· ?'

মওলানা বললেন, 'এ আর বাড়ী ঘর কোথায়—-থাকি টাঙ্গাইল··· ।'

'হুজুরের ইছমে শরীফ ?'

'লোকে নাম টাম জানেনা ভাসানী ভাসানী বলে ... ।'

www.pathagar.com

বৃদ্ধ লোকটি লাফিয়ে উঠে বলল, 'আপনি ভাসানী…মওলানা ভাসানী।' হুজুরকে কদমবুসি করে লোকটি দৌড়ে বাড়ীর দিকে ছুটতে ছুটতে বলছে, 'ওরে ভাসানী এসেছে… !' আর যায় কোথায়! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কয়েক ডজন পানি ভর্তি গ্লাসসহ ছেলে বুড়ো এসে হাজির।

হুজুর একটু ফুঁ দেন …এখানে মহামারী শুরু হয়েছে। লোকটি বলছে,

'আমি একবার ডাকাতির মোকদ্দমায় পড়ে জেলে গিয়েছিলাম জেল-খানায় হুজুরের বায়ত নিই। বায়তের তিন দিন পরে হুজুরের দোয়ায় খালাস পাই।'

'আচ্ছা, এটা কয় বৎসর পূর্বের ঘটনা?'

'আজ থেকে ৩০/৪০ বৎসর পূর্বের ঘটনা।'

৪.

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। ১৯৫৪ সনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পশ্চাতে আবুল হাশিমের অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস, এই যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের অন্যতম স্থপতি নির্বাচনে ফ্রন্টের টিকেট পেলেন না। হাশিম সাহেব অন্ধ মানুষ। অপরের কথা শোনা বা নির্ভর করা খুবই স্বাভাবিক। নানান কান কথা এসে হাশিম সাহেবের কান ভার করে ফেলা হল, রবুবিয়াতের দুই সংগ্রামী সাথী হাশিম ও ভাসানীকে চক্রান্ত করে দুই শিবিরে ঠেলে দেয়া হল। তাই দীর্ঘ-দিন যাবত দুই মনীষীর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না।

মওলানা ভাসানী কামনা করেন যে, আবুল হাশিম তাঁর (ভাসানী) চিন্তা ও বক্তব্যকে তুলে ধরুক। আর অপর দিকে হাশিম সাহেব কামনা করেন, মওলানা তাঁর (হাশিম সাহেবের) চিন্তাকে জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে নিয়ে যাক-জনগণের মাঝে রূপ প্রদান করুক মওলানা ভাসানী।

আল্লামা আজাদ সুবহানী ছিলেন বিভাগ পূর্বকালে মুসলিম লীগের মধ্যকার প্রগতিশীল তরুণ এবং বুদ্ধিজীবীদের নেতা। আল্লামা আজাদ সুবহানী সম্পর্দে ব্যক্তিগত মালিকানাবিরোধী বিপ্লবী আলেম, আল্লামা আবুল হাশিম, শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী) এবং মওলানা ভাসানী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী পূর্বে সব সময় লুঙ্গী পরিধান করতেন না।

আল্লামা আজাদ সুবহানী মওলানা ভাসানীকে ও আবুল হাশিম সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভবিষ্যতে তাঁদের কর্মস্থল কোন্ দেশে হবে?'

উভয়ে জানালেন--বাংলাদেশে।

আজাদ সুবহানী তখন সেই দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মতা অর্জন করবার জন্য লুঙ্গী পরিধানের জন্যে উভয়কে উপদেশ দেন। আবুল হাশিম ও মওলানা ভাসানী সেই থেকে আজীবন লুঙ্গী পরিধান করে জীবন কাটিয়েছেন।

মওলানা ভাসানী একদিন আবুল হাশিম সাহেবকে দাওয়াত করলেন।

দেশ ভাগ হওয়ার পূর্বে এবং পরে ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত মওলানা ভাসানী ও আবুল হাশিমের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর, আর দু'জনেই ত ছিলেন আল্লামা আজাদ সুবহানীর ভাবী শিষ্য।

মওলানা ভাসানী যে হুকুমতে রব্বানীয়ার কথা বলতেন, এই রব্বানী দর্শন প্রথম বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন আল্লামা আজাদ সুবহানী। আল্লামা আজাদ সুবহানীর দর্শন বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌছান আবুল হাশিম ও মওলানা ভাসানী। রব্বানী দর্শনের উপর লেখা আবুল হাশিমের The Creed of Islam পুস্তকটির ভূমিকা লেখেন মওলানা আজাদ সুবহানী। বইটির প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন হাশিম সাহেবের কৃতী সন্তান বদরুদ্দীন উমর। বইটির নাম 'ইসলামের মর্মবাণী'।

আজাদ সুবহানীর বিখ্যাত রচনা হল তাজকেরায়ে মোহাম্মদীয়া ও ফসলফায়ে রব্বানীয়া।

আবুল হাশিম সাহেব যখন ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন, তখন তাঁর উৎসাহে পুস্তকটি অনূদিত হয়। এর বাংলা নাম 'বিপ্লবী নবী'।

'হুকুমতে রব্বানীয়া'র দুই মহাপুরুষ তত্ত্বগতভাবে একই ছিলেন। দু'জন বিপ্লবে গণঅভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় দু'জনে একত্রে গ্রেফতার হন।

মওলানা ভাসানী হাশিম সাহেবকে তাঁর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনের কথা বললেন।

হাশিম সাহেব বললেন, 'স্বাধীন যখন হব তখন পূর্ব পাকিস্তান নাম কেন?

www.pathagar.com

'হুজুর বললেন, নামে কি আসে যায়--স্বাধীনতা স্বাধীনতাই—এতটুকু বরদাস্ত করতে পারবে কিনা দেখুন।'

হাশিম সাহেব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার উপর জোর দিচ্ছিলেন।

হাশিম সাহেব অন্ধ অবস্থায় আরবী ভাষা শেখার একটি চমৎকার পুস্তক রচনা করেছিলেন।

ফিলিস্তিনের জনৈক সংগ্রামী নেতার সম্বর্ধনা সভায় মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন আবুল হাশিম সাহেব।

হাশিম সাহেব বারবার বলছিলেন, 'মওলানা সাহেব, আপনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা কম্পলসারী করবেন।'

মওলানা সাহেব অনেকক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ মুখ খুললেন।

'আচ্ছা হাশিম সাহেব, আপনি পণ্ডিত মানুষ। আপনিই বলুন, ভাষার কি কোন আদর্শ আছে? আরবী ভাষায় কি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কথা বলা যাচ্ছে না? বাংলা ভাষায় কি আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা অসম্ভব? আল্লাহ সামীউল আলীম!'

মওলানা ভাসানীর জওয়াবে হাশিম সাহেব নির্বিকার হয়ে রইলেন। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, মওলানাকে জব্দ করা একটি কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্ন করে বহু দেশী-বিদেশী পণ্ডিত-সাংবাদিক হুজুরের কাছে এমনি-ভাবে জব্দ হয়ে যেত। মওলানা ভাসানীর এই প্রজ্ঞার উৎসব কিতাব নয়—এই প্রজ্ঞার উৎস হচ্ছে জনগণের সাথে প্রকৃতভাবে একাত্ম হওয়া।

৫.

চীন ভ্রমণ করে মওলানা দেশে ফিরে এলেন।

মওলানাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'হুজুর, চীনে আশ্চর্য কি দেখলেন?'

নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত।

হুজুর বললেন, 'চীনের মানুষ হাসতে জানে। ওরা হাসে। ওরা গান গায়। ওরা মাঠে কাজ করার সময় গান গায়। ওদের হাসিটাই আমার কাছে পরম আশ্চর্য।'

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম। আমাদের দেশের মানুষ হাসতে পারে না জন্মের প্রথম কান্নাটিই যেন তার জীবনের কণ্ঠলগ্ন সহচর। যন্ত্রণা নিয়ে

www.pathagar.com

এদেশের মানুষ জন্মগ্রহণ করে। জন্মের সাত নড়ি ভাতের হাঁড়িতে বাঁধা তাই এদের জীবনে কান্নার ইতি নেই। ধান বুনতে গিয়ে এদেশের মানুষ কাঁদে, কাদা মাটি জলে জোঁকে রক্ত চুষে, ধান গোলায় তোলার পূর্বে মহাজন ছোবল মারে। এই কান্না মৃত্যুর পর একমাত্র সম্পদ হিসাবে রেখে যায় তার উত্তরাধিকারিদের নিকট এবং পিতার মৃত্যুর শোক পুত্রের নিকট শক্তি নয় বরং কান্নার নব অভিষেক। এদেশের সর্বহারা মানুষের অকৃপণ বন্ধু এই বৃদ্ধ মানুষটির বলিরেখাক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ ভরসা পেত। মওলানার কাশফুল দাড়ি যেন ঢেকে দিতে পারত দুঃখ বেদনা। বল্লমের মত উঁচুতে উঠা হাতটি দেখা তো প্রত্যাশার সূর্য।

জনৈক রাজনৈতিক নেতা বলল, 'হুজুর, আপনি সরকারী দলের সাথে চীনে গিয়ে আমাদের দালাল বানিয়েছেন।'

হুজুর বললেন, 'রাজনীতি তুমি ঘন্ট বুঝেছ... !'

হুজুর বুড়ো আংগুলটি উঁচিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

'আরে তোমরা ঘর থেকে বের হলে কবে? ছাগলের আড়ালে খড়ের গাদার পাশে অন্ধকার রাত্রে রাত গুজরান করে...ফিস ফিস করে তন্ত্রের দাড়ি কমা ঠিক করলে রাজনীতি হয় না।

'জনগণের কাছে যেতে হবে...প্রকাশ্যভাবে যেতে হবে। আমি তোমাদের ঘর থেকে বের হবার রাস্তা প্রস্তুত করে দিয়েছি।'

হুজুর প্রায় সময় বলতেন, 'জাদিদুন লজিজুন'—নতুন জিনিসের স্বাদই আলাদা, বেটা রাজনীতি কর, প্রেম কর, গান গাও, ব্যবসা কর...যা কিছু করবি নতুন কিছু কর, নতুনভাবে কর, নতুন ঢঙে কর। নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা কর।'

৬.

১৯৭২ সালে আবুজর গিফারী কলেজ থেকে চলে এলাম নিজের থানায় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে।

অনেক দিন হল হুজুরকে ছেড়ে বহু দূরে এসেছি। রমযানের ছুটিতে হুজুরকে দেখতে গেলাম, হুজুর ইফতার করছেন অত্যন্ত সামান্য জিনিষ দিয়ে। মাগরিবের নমাযের পর হুজুরকে বললাম, 'হুজুর, আনোয়ারায় একটি কলেজ করতে গেছি।' হুজুর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এম. এ পাশ যখন করেছিস, লেকচেরার, প্রফেসার, প্রিন্সিপাল ত হবি। সবই গোলামী

www.pathagar.com

গোলামীই—যদি করবি, তবে আমার এখানে করলি না কেন (অর্থাৎ হুজুরের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে) ! মনে রাখিস, গোলামদের দিয়ে গোলামদের মুক্তি হবে না, আজাদীর জন্যে আজাদ মানুষের দরকার, তোরা গোলাম হতে জানিস, আজাদ হতে জানিস না ।'

হুজুরকে কায়দা করে বলতে পারলে হুজুর ছোট শিশুর মত অনেক কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করে ফেলতেন, যে কোন মানুষের প্রতি হুজুরের বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গভীর ।

বজলুস সত্তারের প্রতি হুজুরের ভালবাসা ছিল খুব বেশী। আমার আনোয়ারা গমনকে অন্যরূপ দেওয়ার জন্যে চালাকী করে বললাম, 'হুজুর, আমার বাবা বজলুস সত্তার তো আমাকে ওখানে নিয়ে গেছেন ।'

'জ্বী, ও তোমরা ত একই গ্রামের ।'

'জ্বী হুজুর ..... ।'

'বজলুস সত্তার যখন তোমাকে নিয়েছে তবে ত ভালই হয়েছে !'

সমুদ্রে ঢিল ছুঁড়লে সমুদ্রের পানিতে যেমনি কোন খবর হয় না, তেমনি হুজুরের সমুদ্রের মত মহাহৃদয়ে মিথ্যার ঢিল ছুঁড়ে হুজুরের কোন শব্দ খুঁজে পাইনি বরং নিজেরাই আনন্দিত হয়েছি।

বললাম, 'হুজুর আপনাকে ত বিক্রি করে অনেকে ফায়দা লুটেছে !'

'তাতে তোদের বা আমার ক্ষতি কি ! আমাকে বিক্রি করে যদি কারও লাভ হয় তাও ভাল, তোকে বিক্রি করলে কি লাভ হবে ? তুই কি বাজারে ২ পয়সায় বিক্রি হবি ?'

'হুজুর, আমরা দু'পয়সায় বিক্রি হব না কেন ?'

'আরে তোরা ভীতু কাপুরুষ কাওয়ার্ড, কাপুরুষদের দিয়ে পৃথিবীতে কিছু হয় না ।'

হুজুর বললেন, 'প্র্যাকটিস ছাড়া বিদ্যা বন্ধ্যা গাড়ীর সমান, তোদের বিদ্যা আর টেবিলের উপর রাখা কতিপয় পুস্তকের মধ্যে কোন তফাৎ নেই (একটি উর্দু কবিতার বাংলা অনুবাদ করে হুজুর বললেন ।)

হুজুর অলসতার ঘোরবিরোধী ছিলেন, সন্তোষে আমরা যে কয়েকজন দেরীতে ঘুম থেকে উঠতাম, শেষ পর্যন্ত ভোরে ওঠা শুরু করে দিলাম ।

www.pathagar.com

ভোরে যারা দেরীতে জাগত, তাদের উদ্দেশ্যে হুজুর বলতেন, 'আইল্স্যে, কুঁড়ের বাদশা, আল্লাহু দিন দিয়েছেন কাজের আর রাত দিয়েছেন বিশ্রাম করার জন্যে, আল্লাহর এমন নেয়ামত থেকে ইচ্ছে করে যারা বঞ্চিত, তারা হতভাগ্য ছাড়া আর কি?'

হুজুর খুব ভোরে উঠতেন। নামায সেরে উপলব্ধি করতেন শ্রান্ত ক্লান্ত রাতের শেষে নির্মল বায়ু উন্মুক্ত শুভ্র আলোতে পাখ-পাখালীর কুহুতান। পশু পাখী যাদের আহারের নির্দিষ্ট স্থান নেই, কিন্তু সে পাখ-পাখালী অভুক্ত হয়ে বাসস্থানে ফিরে না অথচ সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ স্বীয় আহার অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফেরে, পরিবার পরিজন নিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর প্রহর গোণে।

ক্ষুধা মানুষকে জন্ম না দিলেও জন্মের পরই ক্ষুধা মানুষের চিরসাথী। এই চিরক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বলতেন, 'আমার সংগ্রাম সেই দিন ফুরাবে, যেদিন কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষ ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাবে।'

আজন্ম সংগ্রামী পুরুষ মওলানা ভাসানী অলসতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন, 'কুঁড়েমী আইল্স্যেমী মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান শত্রু। ভাতের বিকল্প আলু বা রুটি, পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই, পরিশ্রম মানে মুক্তি উন্নতি আর আইল্স্যেমী মানে মৃত্যু।'

হুজুর আর একটি জিনিষকে বড় অপছন্দ করতেন, সেটি হল ধূমপান করা। হুজুর আমাদের সিগেরেট খাওয়া দেখবেন এ ভয়ে আমরা সন্ত্রস্ত থাকতাম। হুজুর সিগোরটকে বলতেন, 'ক্যাপসুল' আর ঠাট্টা করে বলতেন, 'আরে ক্যাপসুল পান করে বিপ্লব হয় না।'

সন্তোষে আমার একবার পেটের অসুখ হল। হুজুর বললেন, 'অনেক অধ্যাপক এখানে এসে থাকবে বলে ওয়াদা করে পরে অসুখের বাহানা দিয়ে চলে যায়। অসুখ ত হবে। এখানে আমলেট মামলেট কোপ্তা বিরানী নেই যে!'

'গ্রামকে ভালবাস, দেখবে গ্রামে অসুখ নেই। অসুখ ত ওই একটি—ক্ষুধা আর ঔষধ হল ভাত।

গ্রামের মানুষকে যদি ভাত দিতে পারিস—দেখবি, গ্রামে ডাক্তারের আর প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

৭.

হুজুর বললেন, 'আমি একবার গান্ধীজীর ওয়ার্দা আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওখানে তিন দিন ছিলাম। ওয়ার্দা আশ্রমে তিন দিন অবস্থান করেও অহিংসা কি বুঝতে পারলাম না। তাই একদিন গান্ধীজীকে জিজ্ঞস করলাম, 'গান্ধীজি, আমার বিবাহিত স্ত্রীকে যদি কেউ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তখন ছিনতাইকারীকে যদি বলি ঃ ওহে তুমি কি করছ? এ যে আমার বিবাহিত স্ত্রী! ছিনতাইকারী কি আমার এই বাক্যে সে তার চরিত্র পরিবর্তন করবে?'

হুজুর এ গল্পটি বহু জনসভায়ও বলছেন এবং গল্পের উপসংহারে একেবারে সাধু ভাষায় হুজুর বললেন, 'এত দিন বলিয়াছি অহিংসা পরম ধর্ম—এইবার বলিতেছি, চুরিকে হিংসা কর, দুর্নীতিকে হিংসা কর, শোষক জালিমকে হিংসা কর, সাম্রাজ্যবাদকে হিংসা কর, সামন্তবাদ পুঁজিবাদকে হিংসা কর। হিংসা কর, হিংসা কর, হিংসা কর।'

বাঘ যখন মানুষকে আক্রমণ করে, তখন বাঘ পশু। আর মানুষ যখন বাঘকে হত্যা করে তখন সে শিকারী। বন্দুক হাতে যারা অহিংসা তত্ত্ব-প্রচার করে, সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাছে মওলানা ভাসানী হলেন প্রফেট অব ভায়োলেন্স—হিংসার অবতার। আমার মনে হয়, তাঁরা হুজুরের বাণীকে আংশিক অনুবাদ করেছে, সত্যিকারভাবে হুজুরের এই 'হিংসা তত্ত্ব' আসলেই উচ্চতর অহিংসা তত্ত্ব বা মানবতাবাদ। ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস এণ্ড ডগস ইংরেজী প্রবচন না জানা লোক এর অনুবাদ করবে, কুকুর বিড়ালের মত বৃষ্টি হচ্ছে। আর ইংরেজী জানা লোক অনুবাদ করবে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্র হুজুরকে হিংসার অবতাররূপে চিহ্নিত করলেও দেখা গেছে, মওলানাই একমাত্র ব্যক্তি পৃথিবীর যেই প্রান্তে হিংসার নাগিনী তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলেছে সেখানে মওলানা উদ্যত ফনার মত হিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ ইরফানুল বারী

পাকিস্তানে মওলানা ভাসানীর শেষ সফর

বিশ্ব মানচিত্রে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বলতে যে অংশটুকু ছিল তাতে মওলানা ভাসানীর শেষ সফর ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে।

তাছাড়া সফরটা ছিল দীর্ঘ ১৩ দিনের। সামনে ছিল নির্বাচন। ইতিমধ্যে পাকশী, সন্তোষ, মহীপুর, টোবাটেকসিং ও রেসকোর্স এই পাঁচটি সম্মেলনে মওলানা সাহেব বামপন্থী রাজনীতিতে যুদ্ধংদেহী ধারা সংযোজন করে দিয়েছেন। জুন আন্দোলনে দুর্নীতিবিরোধী জনমত গঠনের মাধ্যমে মূলত সে লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তৎসঙ্গে ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যখন তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন তথা লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন। ইতিপূর্বে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৭০) লাহোর বিমান বন্দরে আমাদের বন্যা সমস্যা প্রসঙ্গে মওলানা সাহেব সাংবাদিকদের বলে গেছেন, 'পিণ্ডি মহলের করুণার আর দরকার নেই। বাঙ্গালীরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেবে।' এরপর বেশ কিছুদিন দলমত নির্বিশেষে সব কাগজেই মওলানার মন্তব্য সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। এই পটভূমিকায়ই মওলানা ভাসানীর সেদিনের পশ্চিম পাকিস্তানে শেষ সফর। মূলত এই সফরটি টোবাটেকসিং-এর উদ্দীপনাকে চাঙ্গা করার জন্যেই ছিল। মওলানার লক্ষ্য তা থাকলেও ন্যাপ নেতারা তা নির্বাচনীমূলক রাখার প্রয়াস পান।

১০ই অক্টোবর, ১৯৭০। রওনা হবার আগে মওলানা সাহেব স্ত্রীকে ডেকে প্রসবসম্ভবা গাভীটির কথা বললেন, শুধু খাবার যত্নই নয়, রাতেও মাঝে মাঝে যেন গিয়ে দেখে আসেন। খাদেম মুহম্মদকে বললেন, ফুল কপির বাগিচাটিতে পানির যেন কমতি না থাকে। দশম বর্ষীয়া নাতনী

www.pathagar.com

কোহীকে শাসালেন, সন্ধ্যায় হাঁসের খোঁজ নিতে যেন গাফলতি না হয়। আমার হাতে একটা কাগজে মোড়ানো পোটলা দিয়ে বললেন, 'বিসমিল্লাহ্!' বলা বাহুল্য, পোটলাটা আর কিছু ছিল না, তের দিনের সফরে নিকটতম সাথী তাঁর একটি লুঙ্গি ও একটি গামছা।

ঢাকা এয়ারপোর্টের একেবারে কাছাকাছি এসে গাড়ীটা নষ্ট হয়ে গেল। হাঁটলেও মিনিট খানেকের পথ। রিক্সা দেখা যাচ্ছিল না। মওলানা সাহেব হেঁটেই রওনা হলেন। গেট যখন পার হচ্ছিলাম, শুনলাম একজন অপর-জনকে বলছে, 'লোকটার টুপীটা মওলানা ভাসানীর মত।' অপরজন বলল, 'দেখতেও কিন্তু।' আমার মনে পড়ল, সাইক্লোনবিধ্বস্ত রামগতির সৈকতে এক বৃদ্ধ মওলানা সাহেবের সাথে মোসাফাহা সেরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মৌলবী সাব, আপনার দৌলতখানা? আপনারে যে ভাসানীর মওলানার মত লাগে!'

সে যাক। সাংবাদিকদের উৎপাতপর্ব কাটিয়ে আকাশ পথে পৌঁছা গেল। বিমান যাত্রীদের ঔৎসুক্য ও উৎসাহ আবার উৎপাত হয়ে দাঁড়াল। মওলানাকে কত প্রশ্ন! ধৈর্যের সাথে সবাইকে তিনি সন্তুষ্ট করছিলেন। তবে জামাতে ইসলামীর জনৈক কর্মী মওলবী সাহেব অনেক দূর গড়িয়ে গেলেন। প্রসঙ্গত বলতে হয়, একই বিমানে জামাত আমীর অধ্যাপক গোলাম আজমও লাহোর যাচ্ছিলেন। অবশ্য তিনি অগ্রবর্তী শ্রেণীতে ছিলেন বলে মওলানার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। জামাত কর্মী জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা মওলানা সাব, আপনার লেখাপড়া কোথায় কি হয়েছে?' জবাবে তিনি বললেন, 'না, প্রতিষ্ঠানগতভাবে তেমন কিছু লেখাপড়া করিনি। তবে আসামের জলেশ্বরে তৎকালের জবরদস্ত বুযুর্গ শাহ্ নাসিরুদ্দীন বাগ-দাদী আর দেওবন্দের মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সহবতে থেকে কিছু শিখেছি।' এবার মওলবী সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আপনাকে লোকে মওলানা বলে কেন?' হুজুর শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'অক্স-ফোর্ডের গ্রাজুয়েট মওলানা মোহাম্মদ আলী আর মওলানা হাসরত মোহানীকে যে কারণে লোকে মওলানা বলে, আমার ক্ষেত্রেও হয়ত তা-ই হয়ে থাকবে।' মওলানা সাহেবের জবাব কতটুকু অনুধাবন করতে পার-ছিলেন আমার জানা নেই। কিন্তু বেফাঁস হলেও আমার নোট রাখবার মত প্রশ্নোত্তর হচ্ছিল বটে। জামাত কর্মীটি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি রাজনীতি

www.pathagar.com

শিখলেন কেমনে?' মওলানা সাহেব বললেন, 'রাজনীতি শিখতে হয় সাধারণ মানুষ আর পরিবেশ থেকে। তবে আমি রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষায় মওলানা মোহাম্মদ আলী আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নিকট ঋণী বটে।' রাজনৈতিক এদিক সেদিক আলোচনা করে মওলবী সাহেব বললেন, 'তাহলে দেখছি আপনি স্বীকার করছেন আপনাদের সমাজতন্ত্র দিয়ে যে অর্থনৈতিক ইনসাফ কায়েম করা হয় তা ইসলামেও নিহিত। কিন্তু আপনি মহান ইসলামের কথা না বলে সমাজতন্ত্রের কথা কেন বলছেন?' এবারও মওলানা সাহেব কম কথায় সবটা বুঝাতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'দেখুন, ইমাম গাজ্জালী (র.) লিখেছেন, কোন দেশে কিংবা কোন কালে যদি লোকে আযান শুনে নামাযে না আসে অথচ ঢোল-বাদ্যে তা সম্ভব হয় তবে তা-ই কর। আমি তাই করছি।' মওলানা সাহেব কিতাব-টির নাম বলে মূল আরবীটুকুও কোট করলেন। এরপর আর প্রশ্নোত্তর হয় নি।

লাহোর বিমান বন্দরে কর্তৃপক্ষের জন্যে ব্যাপার বড় সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। জামাত কর্মীরা এসেছে তাদের আমীরকে খোশ আমদেদ জানাতে। লাল টুপীওয়ালারা এসেছে এক বিদ্রোহী কন্ঠকে বরণ করে নিতে। শ্লোগান ও লম্ফ-ঝম্ফ কেউ কারো চেয়ে কম নয়। তদুপরি সম্পর্কটাও সাপে নেউলে। একবার প্রায় সংঘর্ষ হয়ে যাচ্ছিল আর কি! আমীর সাহেবকে কর্তৃপক্ষ আগে বিদায় করে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখলেন। মওলানা সাহেবকে সবার আগে মালা পরিয়ে দিলেন মিয়া আরিফ ইফতেখার। সারি বেঁধে দাঁড়ানো প্রবাসী কতক বাঙ্গালীর হাত থেকেও মওলানা মালা নিলেন। বুড়ো গোছের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন কদমবুসি করে বলল, বাড়ী তার সিলেট। কোন্ সালের বন্যায় হুজুর তাকে রিলিফ দিয়ে-ছিলেন তাও আওড়াল।

অনেক শ্লোগানের মধ্যে দুটো বাংলায় শুনছিলাম। একটি—ভাসানী তোমায় ভাসানী তোমায়ঃ লাল সালাম লাল সালাম। অপরটি—জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালোঃ দিকে দিকে আগুন জ্বালো! উনসত্তরের গণ আন্দোলন-কালীন শ্লোগান দু'টি বাংলাদেশে জন্ম নেয়। যদিও 'আগুন জ্বালো'র পরিবেশ আর ছিল না কিন্তু উষ্ণতা তখনো কমেনি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এ দুটো বাংলা শ্লোগান আর লাল টুপি পরবর্তী সকল সম্বর্ধনা ও জনসভায় পেয়েছি।

www.pathagar.com

'পশ্চিম পাকিস্তানে' এগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। নিরপেক্ষ সাংবাদিকরাও তা স্বীকরে করেছেন। মওলানা সাহেব লালটুপির জোয়ার এনেছিলেন সত্তরের প্রথম থেকেই। টোবাটেকসিং-এর সম্মেলনের মাধ্যমে 'পশ্চিম পাকিস্তানে'র কর্মী মহলে তা প্রিয় এবং জনসাধারণে পরিচিত হয়ে ওঠে। আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল, কোয়েটার বিমান বন্দরেও তখন শত শত লালটুপীধারী দেখতে পেয়েছিলাম। প্রায় পক্ষকালীন সফরে আর একটি বিষয় পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ও জনপ্রিয় বলে আমার মনে হয়েছিল। তা হল মওলানা সাহেবের মোক্ষম অস্ত্র ঘেরাও আন্দোলন। কর্মীদের জন্যে ঘেরাও কাজটা ও বিগত আন্দোলনে এর সাফল্যের স্মৃতিটুকু বিশেষভাবে প্রেরণাদয়ক ছিল। ঘেরাওভিত্তিক কিছু শ্লোগানও প্রায় সবখানে শুনেছি। অবশ্যি তা উর্দুতে ছিল।

একুশ নম্বর আইকম্যান রোড। এক পাশের নেমপ্লেটে আজো আছে মিয়া ইফতেখার। আমাদের মেজবান আরিফ সাহেবের পিতা। মওলানা ভাসানীর মুখে মিয়া সাহেবের অনেক তারিফ শুনেছি। কংগ্রেস, মুসলিম লীগের জোয়ারেও মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মওলানা হাসরত মোহানী, পীর পাগারু প্রমুখের ন্যায় মিয়া ইফতেরখারও প্রগতিশীল রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীও। চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও অন্যান্য বিশ্ব নেতার সাথে তাদের সাক্ষাতকারের ছবি ড্রইং রুমের দ্রষ্টব্য বিষয় বটে। আজ মিয়া ইফতেখার নেই। কিন্তু তাঁর সহকর্মী বার্ধক্য বিজয়ী মওলানা ভাসানী মেহমান হয়ে আসলেন।

একই কামরায় আমরা তিনজন। তৃতীয় জন খুলনা ন্যাপের একনিষ্ঠ কর্মী ও সাপ্তাহিক "স্বাধিকার" সম্পাদক মাহমুদুল হক মুকুল। মওলানা সাহেবের উঠাবসার কোন জড়তাই দেখছিলাম না। নিজের বাড়ী ঘরের মতই যেন সব পেয়েছেন যদিও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে আসমান-জমিন ফারাক। ড্রইং রুমে অপেক্ষমান কমপক্ষে ৫০জন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক। বিমান বন্দরে মওলানা সাহেব কোন কথা বলেন নি। তাই পিছু পিছু কেউ এসে পড়েছে। মওলানা সাহেব তাঁদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। বিদেশীদের জন্যে মধ্যস্থতার কাজ করলেন জনাব আরিফ ইফতেখার। বন্যাবিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করে মওলানা সাহেব পূর্ণ

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পুনরুল্লেখ করলেন। নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি হতাশাব্যঞ্জক কথা বললেন। লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের তুরুপটি ইয়াহিয়া খাঁর হাতে রেখে নির্বাচন করতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পরদিন কাগজগুলোতে মওলানা সাহেবের অনেক 'কাঁচি-কাঁটা' কথা হুবহু ছাপা দেখলাম। অথচ এগুলো তিনি ঢাকায়ও বলেন। কিন্তু এখানকার কর্তারা তা এডিট করেন। শুধু লাহোরেই নয়, 'পশ্চিম পাকিস্তান'-র অধিকাংশ পত্রিকায়ই সে সৎসাহসের পরিচয় পেয়েছি। মওলানা সাহেব যা বলেছেন তা-ই তারা ছেপেছে। কিন্তু কোন মহল থেকে তাদের উপর কোন চাপ আসে নি।

লাহোর-করাচীর সাংবাদিকতার জগত ঢাকার তুলনায় অধিক রোমাঞ্চকর। দু'টি কারণে। প্রথমত মালিকরা অঢেল পয়সা খরচ করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। তৎসঙ্গে সাংবাদিকদের জীবনযাত্রার মান বেশ সমুচ্চ বলা চলে। আধুনিক রুচিসম্মত ও কারিগরি সুযোগ-সুবিধা ঢাকার চেয়ে অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত মহিলা সাংবাদিকের ছড়াছড়ি। ইউরোপীয় কায়দাকানুন যে কোন প্রফেশনকে আর কিছু না করুক প্রাণ-চঞ্চল করে তোলে, তা যে কেউ স্বীকার করবেন। মুলতান একটি ডিভিশনাল টাউন হলেও সাংবাদিকতার বেশ আগুয়ান দেখতে পেলাম। দৈনিক সাপ্তাহিক বেশ কয়েকটি কাগজ বের হয়, তাও রোটারী অফসেটে। একেবারে নিষ্প্রাণ হয়ে আছে কোয়েটার সাংাদিকতার জগত। প্রাদেশিক রাজধানী হলে কি হবে, সুপরিকল্পিত উপায়ে বঞ্চিত শহরটিতে তখন পর্যন্ত কোন দৈনিক কাগজ বের হয় নি। কেবল একটি সাপ্তাহিক নড়বড়ে অবস্থায় বের হচ্ছে। এই যা। অবশ্যি সকল কাগজের ও বার্তা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মিলে একটি অচঞ্চল মহল কাজ করে যাচ্ছে বটে। কিন্তু কোয়েটার নিজস্ব বলতে কিছু নেই। তাই তাতে প্রাণ আসে কি করে?

রাতে খাবার টেবিলে এক মজার আলাপ হল। লাহোরে বুদ্ধিজীবী মহলে মওলানা সাহেবের পরিচিতি প্রসঙ্গে আমি আলাপ তুলেছিলাম। তাতেই কথায় কথায় আরিফ ইফতেখার মওলানার সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সে ১৯৫৭ সালের কথা। আরিফ সাহেব তখন ক্যামব্রিজের ছাত্র। লাহোর থেকে তার পিতা চিঠি লিখলেন, 'মওলানা ভাসানী লণ্ডনের অমুক ঠিকানায় আছেন। শিগ্গির সৌজন্য

www.pathagar.com

সাক্ষাত কর।' সেখানে পৌঁছে কম্বলমুড়ি দিয়ে নিশ্চুপ উপবিষ্ট এক বৃদ্ধকে তিনি কার্ড দিয়ে বুঝিয়ে বললেন, জরুরী দারকার। মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন, কার্ডটা যেন ভেতরে তাঁর হাতেই পৌঁছিয়ে দেন। বৃদ্ধ শীতে জড়সড়। উঠে যাচ্ছে না দেখে আরিফ সাহেব এবার একটু রাগত স্বরে অনুরোধ করলেন। বৃদ্ধ নিবকার চিত্তে বললেন, 'বল বেটা, আমিই তোমার পিতার বন্ধু ভাসানী।'

মিয়া পরিবারের এই আলিশান বাড়ীটির কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। এক চতুর্থাংশ শতাব্দীর বহু সুদূরপ্রসারী বৈঠক এ বাড়ীতে হয়েছে। সেগুলোর ফিরিস্তি আরিফ সাহেব দিয়েছিলেন। আজ মনে নেই। তবে একজন লোকের অবস্থানের কথা মনে আছে। কারণ সেটা বিশেষভাবেই ব্যতিক্রম। তা মওলানা হাসরত মোহানীর যোগদান। তিনি কখনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বরদাশত করেন নি। কোন এক বৈঠকে তাঁর আগমন হেতু প্রাসাদোপম বাড়ীতে কোন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে নি, পাখাও ঘোরে নি। মওলানা হাসরত মোহানী বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও সারা জীবন অত্যন্ত সাধাসিধা হালতে কাটিয়ে গেছেন। এজন্যে তাঁর তেজস্বিতা ও ঐশ্বর্যের কমতি ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর মত দেশপ্রেমিক এবং লালা লাজপাতের মত প্রগতিশীল নেতারাও যখন এ উপমহাদেশের ডোমেনিয়ন স্ট্যাটাস দাবী করেই ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন তখনও এই তেজী মানুষটি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন খাড়া করেছিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ১১ই অক্টোবর সকালে মওলানা সাহেবকে খুঁজে পাচ্ছি না। নাশ্তা করতে হবে। আরিফ সাহেব আমাকে বললেন, 'পাশের রুমটায় দেখুন।' দরজা খুলে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম! বিরাট বড় কামরা। অসংখ্য আলমারি আর সবগুলো ভর্তি বই। মওলানা সাহেব এক কোণায় সোফায় বসে একখানা বড় আকারের কিতাব পড়ছেন। কোন ভূমিকা ছাড়াই আমাকে বললেন, 'দেখ, সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুটা কত গৌরবের!' আমি বললাম, 'কেন?' তিনি বললেন, 'অন্য ঘরে নয় বরং লাইব্রেরীর সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, 'স্পেনেরও একজন খলীফা শত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও বই পড়তেন। নাম তাঁর হাকাম।' লাইব্রেরী থেকে থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'কি কি বই এখানে আছে তাও যদি দেখে যাও তবু তোমার অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

দুপুরে খানাপিনার পর গাড়ীর বহর রওনা হল। বিকেলে জনসভা। আরিফ সাহেবের নির্বাচনী এলাকা ওসমানওয়ালাতে। সে লাহোর থেকে ২০/২৫ মাইল দূরে হবে। পথে পথে ট্রাকভর্তি অনেক লোক মিছিলে যোগ দিল। ওসমানওয়ালাতে এসে বুঝলাম পিতার মত মিয়া আরিফও জনপ্রিয়। রং বেরংয়ের শামিয়ানায় ঢাকা সুসজ্জিত মঞ্চে মওলানা সাহেব দাঁড়াতেই এখানকার ন্যায় উৎসাহব্যঞ্জক উত্তেজনা দেখা দিল। কত শ্লোগান! মওলানা সাহেব চোস্ত উর্দুতে বক্তৃতা দিতে পারেন এবং দিলেনও। গরীবদের কথা বলছিলেন। স্থানীয় সমস্যাও আসছিল। ইয়াহিয়া সরকারের কঠোর সমালোচনা শ্রোতাদের বিস্মিত করছিল। কিন্তু তাঁর মূল কথা আসন্ন নির্বাচনের পক্ষে গেল না। আইনগত কাঠামোর আওতায় ইয়াহিয়ার এই নির্বাচন দেশের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। চাষী-মজুরের কল্যাণই জাতির সার্বিক মুক্তি। তাই গ্রামভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে মওলানা সাহেব ভাষণ শেষ করলেন।

এখানে একটা প্রসঙ্গ শেষ করেই রাখি। 'পশ্চিম পাকিস্তান' ন্যাপ আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষেই মওলানা সাহেবের এই সফর আয়োজন করেছিল। ১৩ দিনের এই সফরে মওলানা সাহেব ছোট বড় সর্বমোট ১২টি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং ৪ জায়গায় (লাহোর, মুলতান, কোয়েটা ও করাচী) সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ প্রশ্নে যথাযথ বক্তব্য রাখলেও নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি উপরিউক্ত মতামতই জোরদার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় ন্যাপের কিশওয়ার গারদেজী ও সি. আর. আসলাম সাহেবদ্বয়ই শুধু নির্বাচনে মেতে উঠেন নি, বাকী সবাই সর্বত্র নির্বাচন প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকলেও নির্বাচন-বিরোধী মওলানা সাহেবকে নিয়ে মেতে উঠেছেন। এখানেই নবতিপর বৃদ্ধ মওলানার রাজনৈতিক প্রভাবের মৌলিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ওসমানওয়ালার জনসভার পর মওলানা সাহেব রওনা হলেন চুনিয়ার পথে। প্রায় ৫০/৬০ মাইল যেতে হল। প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপপ্রার্থী সরদার শওকতের এলাকা ওটা। চুনীয়াবাজারে রাত ন'টায় জনসভা হল। বাজার থেকে দূরে সরদারের নিজস্ব মহল্লায় রাত কাটল। খুব ভোরে মওলানা

www.pathagar.com

হাঁটতে বেরুলেন। মহল্লাটিতে মাত্র ২০/২৫টি পরিবারের বাস। তারা সবাই অত্যন্ত গরীব। তাদের জন্যে সরদার সাহেব একখানা পাকা মসজিদ তৈরী করছেন। মওলানা সাহেব তাই তাঁকে বললেন, 'মসজিদটি মাটির করে আর একটি স্কুল এখানে চালু করলে আল্লাহ্ বেশী খুশী হতেন।'

'পশ্চিম পাকিস্তানে' দেখা উল্লেখ্য বিষয়ের মধ্যে প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পানি সেচ ব্যবস্থা বড়ই বিস্ময়কর। আমাদের এখানে তা এক রকম কল্পনাই করা যাবে না। অবশ্য একটু ভুল হয়ে গেছে। বেলুচিস্তানও আমাদের শামিল বটে। এমনও এলাকা গেছে যেখানে ২৫/৩০ মাইলে বিদ্যুৎ কিংবা পানি নেবার মত কোন বসতিই নেই। তারপর গ্রাম কিংবা বাজার দেখা দিলেও স্বল্প বসতির। কিন্তু তবু সরকার বিশেষ করে পাঞ্জাবের খুব কম এলাকাই রেখেছেন যেখানে বিদ্যুৎ ও পানি পৌঁছান নি। আমাদের আলোচ্য এলাকা চুনিয়াও তেমনি একটি বসতি। এর আশে-পাশে অবস্থাপন্ন পরিবার খুবই কম। বাজারটিও ছোট। তদুপরি ২০/২২ মাইল ফাকা কাটানোর পর চুনিয়ার আবির্ভাব। কিন্তু তবু দেখলাম সেচ ব্যবস্থা বেশ আধুনিক। আর বৈদ্যুতিক আয়োজনও চমকপ্রদ।

১২ই অক্টোবর পূর্বাহ্নে মওলানা সাহেব চুনীয়া থেকে রওনা হলেন পাক পত্তন অভিমুখে। সড়ক পথে যাচ্ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে বহু জায়গায় থামতে হল, হাত মিলাতে হল, কিছু বলতেও হলো। পাত্তকী, উকারা ও শাহীওয়ালে মওলানা সাহেবকে জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনা জানানো হল। সবখানেই তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। আমার কাছে মনে হল মওলানা সাহেব ক্রমেই জোশময় হয়ে উঠছেন। কর্মীদের তৎপরতা আর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে বোধ করি ক্লান্তিও ভুলে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে আমার নিকট শুধু স্বর নিরাময়ী সুক্রেটস টেবলেট চাইতেন।

পাক পত্তন খুব পুরানো শহর। ন্যাপ নেতা জনৈক ডাক্তারের বাড়ীতে এসে মওলানা সাহেব উঠলেন। বিকেলে জনসভা। প্রচুর লোক সমাগম হল। সভার মাল্যদান, মানপত্র ইত্যাদি ছাড়াও মওলানা সাহেবকে নানা-বিধ উপঢৌকন দেয়া হল। সভাশেষে গাড়ীতে চেপেই মওলানা সাহেব ড্রাইভারকে বললেন, 'মাজারে চল।' কৌতূহল হল, কোথায় কার মাজার?

www.pathagar.com

মওলানা সাহেব ক্লান্ত। তাই কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তবে তাঁর মুখেই সব জানা হল। অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় মাজার ও মসজিদ। গাড়ী থেকে নেমে শুধু আমি ও মওলানা সাহেব হাঁটছিলাম। তখন যেন মওলানা সাহেব আমার মনের প্রশ্ন বুঝলেন। তিনি বলে চললেন, 'শায়খ ফরিদদ্দীন গঞ্জে শকরের (র.) মাজার। চিশতীয়া তরীকার কামেল ওলী। প্রায় সাত শত বৎসর আগে এখানে ইন্তেকাল করেন। হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) তাঁর পীর ছিলেন। খোদ খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (র.)ও তাঁকে আধ্যাত্মিক ইলম দিয়েছিলেন। খুব গরীবী হালতে জিন্দেগী কাটিয়ে গেছেন।' বলতে বলতে আমরা মাজারের নিকটবর্তী হয়ে পড়লাম। মওলানা সাহেব জিয়ারত করলেন। আমিও অনুসরণ করলাম। বহু পুরুষ ও মহিলাকে দেখলাম আছাড় খেয়ে কান্নাকাটি করছে। জিয়ারত শেষে মওলানা সাহেব সংলগ্ন মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। গাড়ীতে ফিরে আসবার সময় আবার আমাকে বললেন, 'মাজারের একটি দরজা সারা বছর বন্ধ থাকে। শুধু ৫ই মোহরম খোলা হয়। বহুলোক সেদিন এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সবার বিশ্বাস, তাতে জান্নাত মিলবে।'

রাতের খাবার সেরে মওলানা সাহেব আবার কারে চাপলেন। সারা দিনের ঝক্কিতে আমি ও মুকুল ভাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়ার পর আর মনে চাইছিল না, রওনা হই। কিন্তু প্রবীণ মওলানা যখন সোৎসাহে এগিয়ে গেলেন তখন আমরা সে দুর্বলতা কি আর প্রকাশ করতে পারি! পাক পত্তন থেকে মুলতান। চাট্টিখানি কথা নয়! রাত দুটোয় আমরা মুলতান পৌঁছলাম। জনাব কিশওয়ার গারদেজীর বাড়িতে। মাঝরাতে হলে কি হবে? অভ্যর্থনাটা বেশ প্রাণবন্ত হল! কর্মীরা অপেক্ষা করছিল নেতা কখন পৌঁছবেন আর শ্লোগানে শ্লোগানে কম্পিত করে দেবে ঐতিহাসিক নগরীটা! সম্বর্ধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে ধরা পড়ল। 'লাল শাহবাজ কলন্দরে'র যে গানটি দেশের সর্বত্র জনপ্রিয় তারই সুরে সিন্ধি ভাষায় মওলানা সাহেবকে খোশ আমদেদ জানিয়ে রচিত কোরাস গাওয়া হল। গানের অর্থ সে রাতের মত বুঝলাম না ঠিকই কিন্তু সুর ও বাদ্যে ক্লান্ত-ঘুমন্ত দেহটা সত্যি চাঙ্গা হয়ে উঠল।

১৩ই অক্টোবর।

মুলতান শহর সরগরম। বিভাগীয় কর্মস্থল এই শহর। আধুনিকতা ও প্রাচীনের অপূর্ব সমাহার এই শহরে। যেমনি জনসমাজে তেমনি ইটের

www.pathagar.com

গাঁথ নীতে। আসন্ন নির্বাচনে জনাব ভুট্টো আর মুফতি মাহমুদ এখানে লড়ছেন। জনাব গারদেজী মাঠে নামলে আরো জমে উঠতো। কিন্তু মওলানা সাহেবের সফরের প্রাক্কালেই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে দিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ন্যাপের সংবিধান অনুযায়ী তিনি মাত্র ১০০ একর রেখে বাকী শত শত একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিচ্ছেন। এবার ৩৬ হাজার একর জমির মালিক ভুট্টো সাহেব কি করবেন? মুলতানে জনাব ভুট্টোর কুপোকাত হওয়ার জন্য এসব বেশ কাজ করেছিল।

যাহোক, পূর্ব কথায় ফেরা যাক। মুলতান শহর সরগরম। একে তো ঘেরাও নেতা মওলানা ভাসানী শহরে। তদুপরি ন্যাপ নেতৃত্বে সেদিন বিভাগীয় কমিশনারের অফিস ঘেরাও হবে।

এগারোটায় ন্যাপ অফিস থেকে হাজার দশেক লোকের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে বিভাগীয় কমিশনারের অফিস ঘেরাও করল। কর্তৃপক্ষীয় মহলে সত্যি ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে গেল। কতিপয় দাবী আদায়ই ছিল এই 'ঘেরা'ও-এর উদ্দেশ্য। পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠল। সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে এমনি বেআইনী কাজ হতে পারে তা অনেকে ধারণাই করতে পারে নি। মওলানা সাহেব শহরে বর্তমান। তাই কর্তৃপক্ষ পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিল। ঘন্টাখানেক ঘেরাও থাকার পর স্বয়ং বিভাগীয় কমিশনার জনতার সামনে ওয়াদাবদ্ধ হলেন, এক এক করে বললেন, দাবী মানা হল। এবার মিছিলটি ন্যাপ অফিসে ফিরে এল। অপ্রিয় কোন কিছু ঘটে নি। অবশ্য মওলানা সাহেবেরও কড়া নিষেধ ছিল। কারণ হাতের পাঁচ বিকেলের জনসভা তো আছেই। 'ঘেরাও'-এর কৃতকার্যতার খবর শহরে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বিকেলে জনসভাটা জমজমাট হবে দুপুরেই মালুম করা গেল।

হলও তাই। কমপক্ষে আধ মাইল সড়কে সারি বেঁধে দাঁড়ানো জনতার সালাম নিতে নিতে মওলানা সাহেবের গাড়ী এগিয়ে যাচ্ছিল। কোনখানেই শ্লোগানের কমতি ছিল না। মওলানাকে শুধু দেখার জন্যে জনতার আগ্রহ এক রকম অভাবনীয় লাগল। দোকানপাট ও বাড়ীঘরের ছাদে ছাদে ভীড় লেগেছিল, বিশেষ করে চোখে বাজল, মাঠের প্রবেশ পথে শত শত মহিলার সুশৃংখল সারি। এতে বোরকা পরিহিতা মহিলাও ছিলেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা আমাদের সাথে একমত হল—জনসমাবেশ লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। মওলানা

www.pathagar.com

সাহেবও দীর্ঘক্ষণ ভাষণ দিলেন। মুলতান শহরে তাঁর পার্টির কেউ নির্বাচন করছে না। তাই অধিকতর খোলাখুলি ভাষায় ইয়াহিয়ার এল-এফ-ও-ভিত্তিক নির্বাচনী পাঁয়তারার কঠোর সমালোচনা করলেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বন্যা সমস্যার কথা বললেন। হারী ও হুরদের দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করলেন। সিন্ধু ও মুলতানের এমন সব সমস্যা পরিসংখ্যানসহ আলোচনা করলেন যে, মঞ্চেই দৈনিক মাশরিকের রিপোর্টার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসেই কি এসব মুখস্থ করেছেন?' আসল কথা মওলানা সাহেব মানুষকে ভালবাসেন। তাই তাঁর দুঃখ জানবার যেমন আগ্রহ তেমনি সদিচ্ছা তা' ঘুচাবার। তাই যা জানেন হৃদয়ে গেঁথেই রাখেন।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে আমার ধারণা হল সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপই বেশী জোরদার। তন্মধ্য আবার মুলতানের সংগঠন সবচেয়ে বেশী সুঠাম মনে হল। লালটুপীধারী স্বেচ্ছাসেবকদের অনেককেই দেখলাম, যৌবনের উদ্যমই সার নয়—বেশ কিছু লেখাপড়াও আছে। দুনিয়ার হালচাল বুঝে সুঝেই মাঠে নেমেছে। আর প্রবীণ কর্মীদের তো কথাই নেই, যেমনি সুশৃংখল তেমনি পটু। পার্টিগত দরদ, আনুগত্য ও কর্মসূচী সবই আছে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের বড় ব্যতিক্রম ছিল বিভক্ত নেতৃত্বে প্রচণ্ড উদ্দাম।

১৪ই অক্টোবর ভাওয়ালপুরে জনসভা। এটাও একটি বিভাগীয় কর্মস্থল। মুলতান থেকে দুপুরে গাড়ীর বহর রওনা হল। সাংবাদিকদের জন্যেই তিনটি গাড়ী ছিল। ভাওয়ালপুরে মওলানা সাহেবের প্রবেশ দৃশ্য কোনদিন ভুলব না। বাই সাইকেল, মটর সাইকেল, কার আর ট্রাকে চড়ে হাজার খানেক লোক শহর থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে ঝিলাম নদীর বিরাট এক ব্রীজের সামনে মওলানা সাহেবকে জাঁকাল সম্বর্ধনা জানাল। তারপর সব মিলে মস্ত একটি মিছিল হয়ে গেল আর মন্থর গতিতে তা শহর পানে এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে আশেপাশের লোকজন মিছিলে যোগ দিতে লাগল। ঠিক এক ঘন্টায় মিছিলটি মূল শহরে পৌছল। শহরের লোকজন স্বাভাবিকভাবেই সড়কের দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাততালি দিতে লাগল। মওলানা সাহেবকে খোলা জীপে চলে আসতে হয়েছিল। বিজয়ীর মত তিনি শুধু সালাম জানিয়ে যাচ্ছিলেন। এশার নামাযের পর জনসভা শুরু হল। এখানকার নাকি এই-ই রেওয়াজ। অবশ্য কারণটা আব-

www.pathagar.com

হাওয়াগত। বিকেলের রোদেও মাঠ-ঘাট এত গরম থাকে যে, জনসভা অসম্ভব। করাচীতেও তাই হয়েছে। আবার কোয়েটায় আসরের সাথে সাথেই জনসভা শেষ। নয়তো হাড় কাঁপুনি শীতে সব পণ্ড হবে।

ভাওয়ালপুরের জনসভায় একটি ব্যতিক্রম ঘটেছে। তা হল শ্রোতাদের একাংশের উত্তেজনা। রাতের বেলা হলেও বৈদ্যুতিক সুষ্ঠু ব্যবস্থার দরুন জনসভা ভালই জমল। বেশ কয়েকজনের পর মওলানা সাহেব ভাষণ দিচ্ছিলেন। আধ ঘন্টা পর মঞ্চের কাছে কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে উর্দূতে বললেন, 'মওলানা সাহেব, ভাওয়ালপুরকে প্রদেশ করার কথা বলুন।' সভায় তখন চাপা গুঞ্জন উঠল। পর পরই মওলানা সাহেব বললেন, 'ভাওয়াল-পুরকে প্রদেশ করার দাবী যদি জনসাধারণের হয়ে থাকে তবে তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা থাকবে।' কিন্তু যুবকদের এ জবাব মনঃপুত হল না। ভাওয়ালপুরে পৌঁছবার পরই ন্যাপ কর্মীরা মওলানা সাহেবকে এই দাবী সম্পর্কে বলেছিলেন, তাতে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই। বরং এখানকার সাবেক নওয়াব কতিপয় মোসাহেবসহ এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং নেতৃত্ব কিছুতেই সাধারণ্যে ছাড়বার পাত্র তিনি নন। কর্মীদের ব্রীফিংটা কাজে লাগল। মওলানা সাহেব তাই-ই জোরেসোরে বলছিলেন। কিন্তু শতেক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং রীতিমত হৈ-চৈ শুরু করল। মজার ব্যাপার, মওলানা সাহেব মাইক ছাড়লেন না। বরং হৈ চৈ -এর মধ্যে বক্তৃতা দিয়েই চললেন। পাঁচ মিনিট এমনি চলল। মওলানার কথার চেয়ে হৈ-চৈ উচ্চতর ছিল বটে, কিন্তু মওলানা বলেই চলছেন দেখে একে একে যুবকরা শান্ত হল। এবার মওলানা সাহেব তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করলেন, 'ভাওয়ালপুরকে প্রদেশ করার দাবী অমূলক তখনই থাকবে না যখন দেখা যাবে জনসাধারণ এর পুরোধায়। কিন্তু পরিবার বিশেষের জেদাজেদির পর্যায়ে দাবী মাত্রই আন্দোলন নয়। তাই নেতা মহলে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রামে-গঞ্জে এই দাবী নিয়ে সবাই ছড়িয়ে পড়। যদি জনগণ মেনে নেয় তবে নিশ্চয়ই শুধু সমর্থন নয়—প্রত্যক্ষ সহযোগিতার জন্যে ভাওয়ালপুরে আসব।' এসব বলার পর যারা হৈ চৈ করেছিল তারাই দাঁড়িয়ে 'মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ' বলল। এরপর সভা ভালভাবেই শেষ হল। দুপুর রাতে আমরা মুলতান ফিরে এলাম।

মওলানা সাহেবের জনসভায় এমনি সাময়িক উত্তেজনা ও গণ্ডগোল হতে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। সব ক্ষেত্রে একটি বিষয় কমন

www.pathagar.com

পেয়েছি। মওলানা সাহেব মাইক অন্য কথায় হাল ছাড়েন না। বক্তৃতা দিয়েই চলেন কেউ শুনুক বা না শুনুক। তাও স্বর যত উচ্চ করা যায় তাই করেন। আর মাঝে মাঝে স্টেজে ডান পা সজোরে আঘাত করেন। অবশেষে খোদ হৈ চৈ কর্তারাই মওলানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। গণ্ড-গোল দেখা দিলেও কখনো কোন সভা একেবারে পণ্ড হয়ে যেতে আমি দেখি নি। তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এমনটি যে হয় নি, তা নয়। অবশ্য পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার নজিরই বেশী। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে প্রথম জনসভায় মওলানা সাহেব প্রেরিত গুণ্ডাদের শুধু নিরস্তই করেন নি, তাঁর অনুরক্তও করে ফেলেছিলেন।

১৫ই অক্টোবর কর্মসূচী একটু বদল হল। কথা ছিল মুলতান থেকে ট্রেনযোগে মওলানা সাহেব লায়ালপুর পৌঁছবেন। কিন্তু রাতেই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লাহোরের জনৈক ন্যাপ কর্মীকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া হল। পরে যখন জানলাম, লায়ালপুর স্টেশনে উপভোগ করবার মত সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল, মওলানার না হলেও আমাদের খুব আফসোস হয়েছিল। যাহোক, ১৫ই অক্টোবরটি অন্তত আমার জন্যে সুন্দর একটি খোরাক জোগাল।

সকালে শেভের আয়োজন করে কি একটা কাজে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। পরক্ষণেই মওলানা সাহেব ঢুকে পড়লেন। তিনি ফিরে এলে আমি শেভ করতে গিয়ে তো হতচকিত হয়ে পড়লাম। রেজারে দেখলাম সাদা চুল আটকে আছে। আয়নায় দেখে বিশ্বাস হল আমার গোঁফ কালই আছে। মুহূর্তে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল এবং বেরিয়ে এলাম। বাহ্যত আগোছালো নেতা আমার মতো সুন্দর পরিমিত শেভ করে বসে আছেন। গোঁফ তো বটেই এমন কি গণ্ডদেশের যে অংশটুকু চিকন কাটা থাকে তাও নিখুঁত শেভ করেছেন। আসলে খোঁচা খোঁচা গোঁফে মওলানাকে বেশী অসুস্থ লাগছিল। এবার আমার চোখে যেন কমই লাগল। এ দিনটি তিনি কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে খোশ আলাপেই কাটালেন। জনাব গারদেজী অনেকদিন ধরে মওলানার জন্যে রাখা দুটো আম খাওয়ালেন। অকালে বলে তিনিও গরজ করে খেলেন আর শৈশবের ফল চুরির অনেক গল্প পাড়লেন—বিশেষ করে খেজুরের রসের। রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সমাবেশটিকেও মওলানা সাহেব সরস সংলাপে সমাপ্ত করলেন। খাবার খেতে

www.pathagar.com

বসে ছেলেপুলের মত তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। পানির জগটি দেখতে যেমনি সুন্দর কায়দাকানুনে তেমনি অভিনব। গারদেজী সাহেবকে মওলানা সাহেব বললেন, 'এমনি একটি জগ আমাকে দিতে পার?' খুশী হয়েই মেজবান মহোদয় জবাব দিলেন, 'খুব খুব।' জগটি বোধ করি কোন বিদেশী প্রডাকশন হবে। তাই এই ওয়াদাটুকু পরে তার জন্যে মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। সকালে মওলানা সাহেব জগের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন আমরা লায়ালপুর রওনা হচ্ছি। গারদেজী সাহেব বললেন, 'লায়ালপুর থেকেই কিনে নেয়া যাবে।'

১৬ই অক্টোবর কারযোগে আমরা লায়ালপুর পৌঁছলাম। আসবার পথে সেচ ব্যবস্থা দেখে বড়ই বিস্মিত হলাম। বলতে গেলে মরুভূমিতেই ফসল ফলানো হচ্ছে। আরো একটি ব্যাপার বিস্ময়ের ছিল। জনাব গারদেজী এক একজন নওয়াব জমিদারের খাস জমির এলাকা আমাদের দেখাচ্ছিলেন। হাজার হাজার একর জমি একটি পরিবার ভোগ করে। তাতে যাদের আবাস মধ্যযুগের প্রথানুযায়ী ক্রীতদাস বৈ কিছু নয়। এত দীর্ঘ পথ কিন্তু সড়ক বেশ প্রশস্ত ও মাঝের আয়ল্যাণ্ড সর্বত্র ফলে-ফুলে সুশোভিত। সড়কও একেবারে সোজাসুজি। আমাদের হাওড় এলাকার মত—চোখ মেলে তাকালে দিগন্ত ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। গারদেজী সাহেবই ড্রাইভ করছিলেন। কারের গতি বেশীর ভাগ সময়ই ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৮৫ মাইল রাখছিলেন। আমার কাছে একটু আজব ঠেকছিল। সাধারণত বয়স্ক লোকেরা মাত্রাতিরিক্ত গতিটাকে ভয় পায়। আর মওলানা সাহেব দিব্যি বসে আছেন—নির্লিপ্ত উপভোগই তাঁর প্রতিক্রিয়া।

লায়ালপুর জেলা শহর হলেও আয়তনে বড় ও সমৃদ্ধ। জনসাধারণ আধুনিকই বলতে হবে। ন্যাপের জনসভাটা জুৎসই হল বটে। স্থানীয় সাংবাদিকরা আমাকে বললেন, 'ভুট্টোর জনসভায় এত লোক হয় নি।' সন্ধ্যায় গারদেজী সাহেব মওলানার নিকট থেকে বিদায় নিলেন, মুলতান ফিরে আসবেন। মওলানা সাহেব সহাস্যে বললেন, 'লায়ালপুরে জগটা পাওয়া যাবে কি?' তৎক্ষণাৎ গারদেজী সাহেব গাড়ী নিয়ে বের হলেন। কিন্তু বাজারে সে জগ মিলল না। পরদিনই আমরা লাহোর ফিরছি। তাই গারদেজী সাহেব মওলানাকে বললেন, 'ট্রাঙ্কলে আমি আরিফকে বলে দেব জগটি যেন জোগাড় করে দেয়।'

www.pathagar.com

১৭ই অক্‌টোবর আবার আমরা লাহোরের ২১ আইকম্যান রোডস্থ মনোরম ভিলাটিতে ফিরে এলাম। বিকেলে ট্রাঙ্কলে জনাব গারদেজী মওলানা সাহেবের কুশলাদি জানলেন আর মিয়া আরিফ ইফতেখারের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে জগের কথা বললেন। আরিফ সাহেব তখন লাহোর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে নির্বাচনী এলাকায় কাজ করছেন। দুঃখের বিষয়, বাজার থেকে সেক্রেটারী মহোদয় আরদ্ধ জগটি উদ্ধার করতে পারলেন না। রাতে আবার ট্রাঙ্কলে তিনি গারদেজী সাহেবকে স্বীয় অক্ষমতার কথা জানালেন। পরদিন সকালে এর ক্লাইম্যাক্‌স ঘটল।

১৮ তারিখ লাহোর থেকে বিমান যোগে আমরা কোয়েটা রওনা হলাম। বিমানটি মুলতান বিমান বন্দরে আধ ঘন্টার জন্যে ল্যাণ্ড করল। কোয়েটার যাত্রী আরো চাপল। এর মধ্যে গারদেজী সাহেব সেই জগ নিয়ে হাজির। বললেন, 'হুজুর, মনে কিছু নেবেন না। ঘরের পুরানো জগটিই দিলাম। মুলতানের বাজারেও পেলাম না।' 'স্নেহের সে দানে, বহু সম্মানে' মওলানা সাহেব তা গ্রহণ করলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বাবুর মাকে (স্ত্রী) দেবে।' ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল পাক-ফৌজের আগুনে জমাট অঙ্গার হবার পূর্ব পর্যন্ত জগটি মওলানা সাহেবের চৌকির নীচেই ছিল।

অবিশ্বাস করতাম না যদি কেউ বলত আমরা সাহারার উপর দিয়ে চলছি। প্লেনের জানালা পথে নীচে তাকিয়ে দেখলাম মরূভূমি পার হচ্ছি। বিস্তীর্ণ পাহাড়িয়া এলাকাও অতিক্রম করলাম। মরূদ্যান বলতেও কিছু চোখে পড়বে না। সম্রাট অশোকও বিশ্বাস করতেন কি না সন্দেহ—নদীনালা, খাল-বিলের দেশটির সাথে এর রাজনৈতিক সম্পর্কও আছে। এক সময় বেশ শীত বোধ হতে লাগল। অনেক যাত্রীই এয়ার হোস্টেস থেকে কম্বল চেয়ে নিলেন। মওলানা সাহেবের কম্বল লাগবে না জানালেন। পাঞ্জাবীর বুকের বোতামগুলো খোলা ছিল। ঠাণ্ডা লাগলে মুশকিল হবে, আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম। তবু তিনি কম্বল নিলেন না। তাই আমরা দুই যুবক সাথী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা নিলাম না।

সত্যি বুকটা আনন্দে নেচে উঠেছিল যখন দেখলাম আড়াই হাজার মাইল দূরেও সেই একই লালটুপী। এয়ারপোর্টে সম্বর্ধনাটা শুধু জম-জমাটই নয়, বেশ শৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন হল। সুদূর কোয়েটাতেও বাংলা

www.pathagar.com

শ্লোগানটি শুনলাম ঃ ভাসানী তোমায় লাল সালাম। লালটুপীধারী স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীটি দেখতেও তেমনি বটে। কায়দা মাফিক তাদের গার্ড অব অনার দেখে মনে হল 'পূর্ব পাকিস্তানকে' অন্তত এই পদক্ষেপে ছাড়িয়ে গেছে। আগত জনতার উদ্দেশ্যে মওলানা সাহেব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, অন্য দলের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতাও মওলানাকে সম্বর্ধনা জানাতে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। তন্মধ্যে নওয়াব আকবর খান বুগতি, নওয়াব মারী প্রমুখ ছিলেন। মওলানা সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যেই তা তাঁরা করেছিলেন। আগাগোড়া সফরে তাঁরা মওলানার সুখসুবিধার তদারকও করেছেন।

এয়ারপোর্ট থেকে একটি মিছিল হয়ে গেল। মওলানা সাহেবের কারটি মাঝামাঝি ছিল। ড্রাইভ করছিলেন নওয়াব বুগতি। সামনে পিছনে শ্লোগান হচ্ছিল বেলুচ ভাষায়। আমরা নওয়াব সাহেব থেকে অর্থ বুঝে নিচ্ছিলাম। তাতে বেলুচিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, গ্যাস ও কয়লা শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া—এসবও ছিল। নওয়াব সাহেব বললেন, 'বেলুচিস্তানের সাথে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর ভৌগোলিক কোন সম্পর্ক না থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির নিবিড় সামঞ্জস্য রয়েছে। এমতাবস্থায় মওলানা ভাসানী সাহেবকে কখনো ভুলে থাকি না। বরাবরই অভাব বোধ করি।'

এক ঘন্টায় চার মাইল অতিক্রম করে মিছিলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি হোটেলে এসে পৌঁছল। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানেই। এই হোটেলটিই নাকি কোয়েটায় সর্বোত্তম। কিন্তু এমনিতরো হোটেল চট্টগ্রামে তো বটেই এমন কি খুলনা, মোমেনশাহীতেও একাধিক রয়েছে। ঢাকার প্রশ্নই আসে না। ১৯৬১ সালের আদম শুমারী অনুসারে কোয়েটার লোকসংখ্যা মাত্র ৫৫ হাজার। প্রাদেশিক রাজধানী হলেও আধুনিক অর্থে উন্নয়নের কাজ খুবই কম হয়েছে। কোন দৈনিক পত্রিকা তো দূরের কথা, নিয়মিত ও মানমত কোন সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের হয় না। অধিবাসীরা নিতান্তই গরীব। তাদের হালত দেখলে এখানকার দুঃখ ভুলে যাবার উপক্রম হবে।

প্রথম পর্বেই হোটেলে এসে মওলানা সাহেবের সাথে একে একে ডজন খানেক উপজাতীয় নেতা ও গোত্রীয় সরদার সাক্ষাত করলেন। তন্মধ্যে সরদার আচকজাইও ছিলেন। তাঁদের সবাই মওলানার পুরানো সহকর্মী।

www.pathagar.com

সাবেকী কায়দায় তাঁদের সম্ভাষণ আমাদের জন্যে উপভোগ্য ছিল বটে। এঁদের সবাই মওলানা সাহেবের জন্যে নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন। বেলা বারটায় প্রেস কনফারেন্স শুরু হল। বিভিন্ন পত্রিকা ও বার্তা প্রতিষ্ঠানের ২০/২২ জন সাংবাদিক ছিলেন। ঘন্টা খানেকে তা শেষ হয়ে গেল। বিকেলে জনসভায় তাই মওলানা সাহেবও বক্তব্য সংক্ষেপ করলেন। ঘরোয়া আলাপের এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিক ওয়েজ বোর্ড সমর্থন করে কিছু বলতে মওলানাকে অনুরোধ জানালেন। মওলানা সাহেব বললেন, 'সাংবাদিকদের অভাবী থাকাই দরকার। সুখী হলে কলম ভোঁতা হয়ে যায়। আমাদের আবুল কালাম শামসুদ্দীন আর মুজিবুর রহমান খাঁ আজাদ পত্রিকায় ৪০/৫০ টাকা বেতনে চাকরি করত। তখন তারা কি তুখোড়। আজকাল দুই হাজার টাকা বেতন পায়। তাই আলসে হয়ে পড়েছে।'

দুপুরে আমরা মেহমান হলাম নওয়াব আকবর খান বুগতির। একটি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছিল। সকল দলমতের নেতা-কর্মী তাতে শরীক ছিলেন। রকমারি উপাদেয় খাবার পরিবেশিত হচ্ছিল। খেতে খেতে মওলানা সাহেব রসাল কথা বলে সবাইকে আনন্দ দিলেন। কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের এক ধনকুবেরকে বললেন, 'সমাজতন্ত্রের দিন বাকী নেই। মজা করে খেয়ে নিন।' জবাবে তিনি বললেন, 'আমরা তো আর খেতে চাই না। সবারই করে দিন না।' মওলানা বললেন, 'না, তা হয় না। গৃহস্থ মোরগকে খাসী করে কি জন্যে? মোটাতাজা করে খেতে যে বেশী মজা! পুঁজিপতিদের জন্য আমরা সেই সময়টুকুই রাখছি আর কি! নেহেরু আমাকে এই কথাটি ১৯৫৭ সালে বলেছিল। সমাজতন্ত্রের জন্যে এত তাড়াহুড়া করছ কেন? পুঁজিপতিরা কত খাহেশে শিল্প কারখানা করছে! করতে থাকুক। ন্যাশন্যালাইজ করবার মত কিছু হয়ে নিক না। খোপছাপড়া Nationalize করে কি হবে? মোরগগুলোকে মোটাতাজা হতে দাও না।' মওলানা সাহেবের কথায় সবাই খুব এক চোট হাসলেন। খাবার টেবিলের যে ডিশটি আজো আমার চোখে ভাসছে তা হল বেলুচ বেদানার। পশ্চিম পাকিস্তানের আর কোথাও এত বড় লাল বেদানা হয় না।

বেলা তিনটায়ই জনসভা শুরু হয়ে গেল। পাঁচটার পূর্বেই শেষ করতে হবে। তা না হলে ভীষণ শীত পড়ে যাবে। জনসভাটি অনেক দিক দিয়েই

www.pathagar.com

আমার কাছে ব্যতিক্রম ঠেকছিল। জনসভা হওয়া সত্ত্বেও অতিশয় সুশৃঙ্খল। হাজার দশেক শ্রোতা হাজির ছিলেন। সবাইকে আকারে সমান লাগছিল। ছয় ফুটের ঊর্ধ্বেই অধিক হবে। কিশোররাও সাড়ে পাঁচ ফুট। ছোট মাঠটির চারদিকে সাজানা গাছ। পড়ন্ত বিকেলের রোদে শান্ত পরিবেশে সভা চলছিল। কিন্তু মওলানা সাহেবের ভাষণে শ্রোতাদের রক্ত উষ্ণতর হতে লাগল। উত্তেজিত হয়ে গ্যাস ও কয়লা খনির শ্রমিক দল এবং ন্যাপকর্মীরা মাঝে মাঝে শ্লোগান দিচ্ছিলেন। সভার মাঝখানে হঠাৎ এক শ্রোতা দাঁড়িয়ে বেলুচ ভাষায় কী একটা শ্লোগান দিল। সমস্বরে জবাব হল ঃ ভাসানী বাবা ভাসানী বাবা। স্থানীয় জনৈক সাংবাদিক বুঝালেন, শ্লোগানটির মর্ম হল— বেলুচদের ভালবাসে কে ? ভাসানী বাবা, ভাসানী বাবা। মওলানা সাহেব বেলুচিস্তানের বঞ্চনার ইতিহাস ধীরে ধীরে এমনভাবে তুলে ধরছিলেন যে, গণ্ডমূর্খও বুঝতে পারছিল, তাদের পাওনা কি আর পাচ্ছে কি। তৎসঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর অবস্থার কথাও বলছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, বেলু-চিস্তানের নওয়াব ও সর্দারদের জ্বালাময়ী ভাষায় ধোলাই করলেন। তারাই যে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ দুশমন একথা প্রত্যেকটি শ্রোতাকে বুঝাতে চাইলেন যা কোন নেতা নানা কারণে সাহস পান না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারও তাই-ই। নওয়াব সর্দাররাই রাজনীতি-অর্থনীতি আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের কোন উপকার করছে না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে দাবিয়ে রাখছে। মওলানা সাহেব বেলুচিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্বায়ত্তশাসন ও স্থানীয় শোষণের যে চিত্র তুলে ধরলেন, মনে হল বহুকাল এখানে দুর্ভোগ পোহানোর পর আজ সুযোগ পেয়েছেন মনের কথা বলার। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও উৎসাহী কর্মীদের উপহার দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি বেলুচিস্তানে এসে একটানা ছয় মাস থাকব ও কাজ করব। রেষারেষি ও ভেদাভেদ ত্যাগ করে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য কর তবে নওয়াবী, সর্দারী আর সরকারী সকল জুলুম নিপাত করে যেতে পারব।'

সভাশেষে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। স্থানীয় জনৈক সাংবাদিক বললেন, 'মওলানা সাহেব তো চোস্ত উর্দূ বলতে পারেন। অধিকাংশ ফারসী শব্দ ব্যবহার করাতে সাধারণ শ্রোতাও সব বুঝতে পেরেছে কিন্তু শেখ সাহেব দ্বারা তা হয় নি। ভাল উর্দূ বলতে পারেন নি বলে বেলুচরা তাঁর বক্তব্য বোঝেন নি। আর প্রচারের অভাবে কিংবা অন্য কারণেই হোক শেখ সাহেবের সভায় খুব বড় জোর হাজার পাঁচেক লোক হয়েছিল।'

www.pathagar.com

রাতে আমাদের দাওয়াত শহর থেকে দূরে—এক সর্দারের খানকায়। পাঁচ মাইলের চড়াই উৎরাই পার হয়ে সর্দারের বাড়ী পৌঁছা গেল। সম্বর্ধনাটা পারিবারিক হলেও ঢংটা উপভোগ্য ছিল যার বিবরণী সৈয়দ মুজতবা আলী 'দেশে-বিদেশে'তে দিয়েছেন। খোশ আলাপের পর খানা লাগানো হল। আগাগোড়া সব কিছু আমার কাছে এখানকার বনেদী পরিবারের মতই লাগল। ফরাসে দস্তরখানা বিছানো। শরবত পরিবেশন হল। তৎপর চিল্‌মচিতে খামসামারা হাত ধোয়ালো। সকল পাত্রই কারুকার্য খচিত। দস্তরখানাতেও কম খাটুনী যায় নি। বেদানা, চিল্‌মচি ও গ্লাসে রকমারি নকশা আঁকা। তদুপরি মজলিসের আদবও আরবীয়—যা দুনিয়ার সর্বত্র মুসলিম পরিবারে এক সময় কমন ছিল। কত পদের খাবার যে পরিবেশিত হল তার ইয়ত্তা নেই! অঢেল ফলও এল। বাঙ্গালীর মধ্যে আমরা তিনজনই। বাকী ২৫/৩০ জন সামলিয়ে নেয়ার পাত্র। অবশ্য মওলানা সাহেব খুব একটা পেছনে থাকেন নি। আহার পর্ব শেষ হলে ৮/১০ জনের একটি বৈঠক বসল। তাতে নওয়াব মারীও ছিলেন। বৈঠক চলা কালে মওলানা সাহেব আমাদের বললেন, 'তোমরা হোটেলে চলে যাও। আমি রাতে এখানেই থাকব।' অবশিষ্ট আমরা ক'জন শহরে ফিরে এলাম। সে রাতের প্রোগাম সম্পর্কে এর পর আর কিছু জানতে পারি নি।

সকালেই মওলানা সাহেব হোটেলে ফিরে এলেন। মনে হল, রাতে খুব কম ঘুমিয়েছেন কিংবা আদৌ ঘুমান নি। ব্যস্ততার মধ্যে বহু সাক্ষাতকার দিলেন। ছাত্রনেতা ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এলেন। সবারই এক কথা, 'আপনি কোয়েটায় ছয় মাসের জন্য এসে যান। দলমত নির্বিশেষে আমরা আপনার সাথে কাজ করব। তা না হলে পিণ্ডির সরকার আর আমাদের সর্দারদের বিরুদ্ধে আমরা বজ্রকঠিন থাকতে পারছি না।' মওলানা বললেন, 'কাল সভায় কিন্তু আমি কথার কথা বলি নি। বেল্‌চিস্তানে আমি একটানা ছয় মাস কাজ করব। আমার অন্তরের প্রোগ্রাম। তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।' কতজন কতভাবে মওলানাকে নিয়ে ছবি তুললেন! একমাত্র সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ও কবিবর মওলানার মাথায় নকশা করা বেলুচ টুপী চাপিয়ে গ্রুপ স্যাপ নিলেন।

অকৃত্রিম তৃপ্তি নিয়ে এগারটার প্লেনে আমরা করাচী রওনা হলাম। আজই অর্থাৎ ১৯শে অক্টোবর করাচীতে জনসভা। প্লেন থেকেই দেখতে

www.pathagar.com

পেলাম এয়ারপোর্টের একাংশ লালে লাল। কত পতাকা, ফেস্টুন আর প্রত্যেকের মাথায় লালটুপী! লালটুপী পরিহিতা শ্রমিক নেত্রী কানিজ ফাতিমা মওলানা সাহেবকে তাজা ফুলের মালা পরিয়ে দেবার পর অনেকে দিয়ে গেল। আর সে কি শ্লোগান! সামনে একটি খোলা জিপে মওলানাকে নিয়ে সুদীর্ঘ একটি মিছিল বন্দর নগরীর প্রধান সড়কগুলো ঘুরে এল। কানিজ ফাতিমার বাসায় মওলানা সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুকুল ভাই এক আত্মীয়ের বাড়ী উঠলেন। আমি মওলানার সাথে রয়ে গেলাম। কানিজের বাসাটি ছোটখাট। আড়ম্বর তো নেইই—আরামপ্রদও নয়। বছর সাতেকের একমাত্র মেয়ে। মওলানা সাহেবের সে কি ভক্ত! কাবুলিওয়ালার মিনির মত তার গল্প। অবশ্য মওলানা সাহেব কাবুলির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে খুব একটা উস্তাদ নন। তাঁর মত কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে মওলানা বললেন, 'আছে, তবে তোমার মত ভাল নয়। কোহী খুব দুষ্টু।' কোহী কে না জেনেই বালিকাটি চট করে বলল, 'ইস, কী যে বলেন, আমার চেয়ে দুষ্টু হতে পারে না কি! আবার আমার মন্দ কিছু তাকে গিয়ে বলবেন না তো!'

রাত আটটায় জনসভা শুরু হল। কানিজ ফাতিমা, সি. আর. আসলাম ও অন্যান্য বিশিষ্ট ন্যাপ নেতা ভাষণ দিলেন। একজন প্রবাসী বাঙ্গালী বাংলাতে বক্তৃতা শুরু করলে সভায় হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। শ্রোতাদের মধ্যে অন্তত হাজার দশেক বাঙ্গালী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বগুড়া নিবাসী সেই ভদ্রলোক ন্যাপের টিকিটে বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে লড়ছেন। তাঁর অধিকাংশ ভোটারও বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর স্বাধিকার জনসভায় টিকল না। বাধ্য হয়ে তিনি উর্দুতেই ভাষণ পেশ করেন। মওলানা সাহেব দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দিলেন। বক্তব্য পুরাপুরি নির্বাচনবিরোধী ছিল। আইনগত কাঠামো রদকল্পে তিনি সম্মিলিত দাবী উত্থাপনের আহ্বান জানান। সিন্ধুর হারীদের বিভিন্ন সমস্যার সাথে করাচীর শ্রমিকদের দাবীদাওয়া, প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্ভোগ এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে'র অর্থনৈতিক বঞ্চনার খতিয়ান পেশ করলেন। স্বায়ত্ত-শাসনের প্রশ্নে সরকারের ভেল্কিবাজী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

পরদিন (২০-১০-৭০) সকাল থেকেই সাক্ষাতকারের পালা শুরু হল। দেশী-বিদেশী কত সাংবাদিক যে বিশেষ ইন্টারভিউ নিলেন তার হিসেব

www.pathagar.com

নেই! মওলানা সাহেব ক্লান্ত হন না। প্রশ্নোত্তর আর পর্যালোচনায় তিনি যেন গুরুত্বের সাথে অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন মাত্র। অপরাহ্নে বেতার টেলিভিশনের এক দল এলেন বিশেষ ভাষণ নিতে। সব নেতাই নির্বাচন উপলক্ষে যে মওকা পেয়েছিলেন ওটা তারই অন্তর্গত। মওলানার ভাষণ সংগ্রহটি বেতার-টেলিভিশনের জন্যে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ঢাকায় কর্তৃপক্ষ সন্তোষে একবার গিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রধানদের কোন কোন অংশে আপত্তি থাকায় তা এডিট করার অনুমতি নিতে 'প্রাদেশিক' কর্তারা যান। কিন্তু মওলানা সাহেব তার কোন মন্তব্য রদ করতে রাজী হন নি। ২১শে জুলাই ১৯৭০ মানিকগঞ্জে টেলিভিশন ও বেতার ডাইরেক্টর জেনারেলদ্বয় মওলানার সাথে সাক্ষাত করেন। প্রথমে মওলানা সাহেব তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন—সাধারণ একটি ভাষণ সংগ্রহের জন্যে রাষ্ট্রীয় তহবিলের এত গচ্ছা দিতে কে তাঁদেকে অনুমতি দিল? টিভি-র মহাপরিচালক একজন পাঠান। সরল প্রকৃতির বলে মনে হল। সীমান্তের নানা সমস্যা তৎসঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ইত্যাদি মওলানা সাহেব যেভাব ও ভাষায় তাঁদের কাছে তুলে ধরলেন সবাই হতভম্ব হয়ে গেল! তিনি আবেগের সাথে বললেন, 'আপনারা দয়া করে কৃষক মজুরের জিন্দেগীর সঠিক আলেখ্য যা বিশ্ব রাজনীতিকে পর্যন্ত নাড়া দেয় তাই সর্বসমক্ষে তুলে ধরুন। যার মনুষ্যত্ব আছে, সে পুঁজিপতিই হোক আর আর জমিদারই হোক, তার অন্তর দোলা না দিয়ে পারে না। আমরা ঘেরাও-এর রাজনীতি করে অধিকার আদায় করি। আপনারা তৎসঙ্গে অন্তত মানবতার প্রাচীন দাবীটুকু মর্মস্পর্শী চিত্রের মাধ্যমে পেশ করুন।' যাহোক সবশেষে সিদ্ধান্ত হল, করাচীতে মওলানা সাহেবের পুনঃসাক্ষাতকার হবে। আজ সেটা সম্পন্ন হল। সন্ধ্যায় হোটেল জাভীসে আফ্রো-এশিয়ান সোসাইটির পক্ষ থেকে মওলানা সাহেবকে স্বাগত সম্বর্ধনা জানানো হল। করাচীর প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তাতে উপস্থিত ছিলেন। মওলানা সাহেব আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বেশ গোছানো একটি ভাষণ দিলেন।

২১শে অক্টোবর সকাল বেলা এক দল মহিলা সাংবাদিক হাজির। এদের কেউ দৈনিকের, কেউ মহিলা সাপ্তাহিক পত্রিকার। তাঁরা শুধু সাংবাদিকই নয়, মওলানা সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্তও। প্রথমে formal প্রশ্নোত্তর চলল। সওয়ালের ঝুলি শেষ হয়ে এলে তা Informal আলাপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সবাই উপভোগ করছিল। কারণ লুঙ্গীধারী একজন

www.pathagar.com

বৃদ্ধ মওলানা কথার মারপ্যাঁচে অত্যাধুনিকাদের জব্দ করে রাখছিলেন তা উপভোগের বিষয় বৈ কি! আলাপে আলাপে প্রগতি, মুক্তবুদ্ধি—তৎপর দেশের আলেম সমাজ বনাম নারীমুক্তিও আসল। গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে serious আলোচনায় মওলানা সাহেব হঠাৎ রস যোগালেন। শেষোক্ত প্রসঙ্গে জনৈকা মুখরা জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা হুজুর, আপনি কি কখনো বিয়ে শাদীর ফতওয়া দিয়েছেন?' মওলানা বললেন, 'জীবনে একবারই এসব ঝামেলায় গিয়েছিলাম। তাতে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তওবা করেছি। আমাদের বগুড়া জেলার শেরপুরে ব্যাপাটা ঘটেছিল। ইদ্দত শেষে পূর্ব স্বামীর কাছে বিয়ে দিতে তালাকপ্রাপ্তাকে সাময়িকভাবে অন্য একজনের নিকট নিকাহ বসতে হয়। জইফ এক বুড়ার কাছে আমাদের মক্কেলনীকে নিকাহ দিলাম। কিন্তু শর্তমাফিক পরদিন বুড়া আর যুবতীকে তালাক দিল না এতে আমরা বড়ই নাজুক হয়ে পড়লাম। বাধ্য হয়ে পাততাড়ি গুটালাম।' সবাই হো হো করে হাসল। এমনি কি কথায় কথায় শাহনাজ জায়েদীর কেলেঙ্কারীর প্রসঙ্গ উঠল। আমাদের সফরকালীন সকল পত্র-পত্রিকা এই কেলেংকারী নিয়ে হৈ চৈ করছে! মওলানা সাহেব ঔৎসুক্যের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাগজে শুধু ছবি দেখছি। ব্যাপারটা কি ঘটেছে, তোমরা খুলে বল দেখি।' কাহিনীর রস প্রেমীল। তাই সবাই এড়ানোর ভাব দেখাল। কিন্তু অবুঝ মওলানা যখন আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন, করাচীর একটি ইংরাজী সান্ধ্য দৈনিকের বিস্তারিত রিপোর্ট আমি পড়ে শুনালাম। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'আমি আরো ভাবছি শাহনাজ বুঝি লায়লা খালেদের মত কেউ।'

দুপুরে মওলানা সাহেবকে প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের প্রেরিত মাছভাত দেয়া হল। শাক, বেগুন ভর্তা আর টাকি মাছের চাসনীর কথা মওলানাই বলে দিয়েছিলেন। এ তিনটি তাঁর প্রিয় খাদ্যের অন্যতম। কিন্তু টাকি মাছ পাওয়া গেল না বলে চাসনীটি হল না। ১০/১১ দিন পর বাঙ্গালী ঘরের পাক খেয়ে অন্য রকম স্বাদ লাগল বলতে হবে। খাবার সময় কানিজ ফাতিমা বললেন, 'হুজুর, দাদী আর ভাইবোনদের জন্যে কি কি দিয়ে দেব?' মওলানা বললেন, 'কার আর কী লাগবে! তবে শীত আসছে। বাবুর মার (স্ত্রী) জুতা নাই! তা-ই শুধু দিতে পার।' কানিজ বললেন, 'হাঁ, খুব খুশীর সাথে দিচ্ছি। কিন্তু পায়ের মাপ পাব কোথায়?' মওলানা বললেন, 'আমার পায়ের মাপেই তার পা।' আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কানিজ ফাতিমা

www.pathagar.com

পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার জন্যে কি দেয়া যায় ? হুজুর তো আর কিছু বলবেন না !' আমি বললাম, 'যা দিলে কাজে লাগবে তাই দিতে পারেন। সৌখিন কিছু দিয়ে লাভ নেই। কারণ কেউ তা ব্যবহার করতে পারবে না। শীত আসছে। কারো শীতের কাপড় নেই। ওগুলো দিলে বরং দুকূল রক্ষা পাবে।' আমি সবার আনুমানিক ফিরিস্তি দিলাম। কানিজের স্বামীপ্রবর কেনাকাটার ভার নিলেন।

বিকেলে এক মুশকিল দেখা দিল। করাচীর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সমিতির বার্ষিক সভায় মওলানা সাহেব প্রধান অতিথি থাকছেন বলে পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি তাতে অরাজী হবেন না ভেবে ন্যাপ নেতারা সফরসূচীতে তা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। করাচীতে এসে মওলানা জানতে পেরে অমত প্রকাশ করেন। কিন্তু একে তো বহুল প্রচার-প্রস্তুতি মওলানাকে জড়িয়ে হয়ে গেছে। তদুপরি সবাই ধরে নিলেন, শেষে মওলানাকে রাজী করানো যাবে। কিন্তু হিসাবে ভুল হল। সমিতির কর্মকর্তারা অধ্যাপিকা আনিসা গোলাম আলীর (পাক-বেতারে ইংরাজী খবর পাঠিকা) নেতৃত্বে এলেন; সবাই মওলানা সাহেবকে কত অনুরোধ করলেন! কিন্তু তিনি অনড়। কেউ সঠিক ধরতে পারছিলেন না, কেন মওলানা সাহেব এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ছেন। করাচীর তাবৎ শিক্ষাবিদ একত্রে পেয়ে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া কোন রাজনীতিকের ভাগ্যে ঘটে। তদুপরি পূর্বদিনেই আফ্রো-এশীয় সোসাইটির সম্বর্ধনা সভায় তিনি বুদ্ধিজীবী মহলের উদ্দেশ্যে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কত বিশ্বসম্মেলন সামাল দিয়ে এসেছেন। এক্ষেত্রে মওলানার আপত্তির কারণটা কি! আমিও এ সুযোগটা হারাবার পক্ষপাতী ছিলাম না। কানিজ ফাতিমা ও অন্যারা আমাকে অনুরোধ করলেন, মওলানাকে যেভাবেই হোক রাজী করাতে। অনেক ভেবে কিছু কথা সাজালাম। বললাম, 'হুজুর, এই সুধী সমাবেশে আপনার প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা পেশ করলে পত্র-পত্রিকায় কিছু আলোচনা হত। আর এখানকার শিক্ষাবিদদের সাথে ভবিষ্যতে যোগাযোগ করার একটি পটভূমিকা হয়ে থাকত।' উপস্থিত সবাই আমার কথাটা লুফে নিলেন যেন মওলানার একটা দুর্বল দিক পাওয়া গেছে। এবার রাজী হয়ে যেতে পারেন। আমার প্রস্তাবের জবাবেই মওলানা সাহেব মনের কথা বললেন 'দেখ, কোথা থেকে কি ফায়দা কুড়ানো যাবে তা আমি বেশ ভাল বুঝি। কিন্তু আমি মূলত রাজনীতিবিদ যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংস্থা করা আমার অন্যতম

www.pathagar.com

কর্তব্য বলে আমি মনে করি। কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে কখনো আমি তাতে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত থাকি না, বিশেষ করে আসাম ও বাংলায় যত স্কুল কলেজ করেছি শুধু আমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বলে ওগুলো কত বাধার সম্মুখীন হয়েছে! বাড়ীর পথে কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের তদারকীতে বছরে একদিনও তো যাই না। আমি চাই না, যে অন্তত শিক্ষক সমাজ—সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ যা-ই হোক—কোন রাজনীতিবিদ কিংবা দল কর্তৃক প্রভাবান্বিত থাকুক। আজ আমি এই বার্ষিক সভায় যোগ দিলে আগামীতে পাল্টা কিছু করবার জন্যে অন্য দলগুলো লেগে যাবে। এতে শিক্ষক সমাজ অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়বে। ফলাফলটা তোমরা ভুগবে। আমি কিন্তু তার পক্ষপাতী না। এবার কেউ আর কথা বললেন না। সমিতির কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

রাতে করাচীর শহরতলীতে জনসভা হল। শ্রোতাদের অধিকাংশই শ্রমিক ও মজুর। মওলানা সাহেব ৫০ মিনিটের বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পথে তাদের ভূমিকা সহজ কায়দায় বুঝিয়ে দিলেন। বাসায় ফিরলে মওলানা সাহেবকে বড়ই ক্লান্ত লাগছিল। সফর শেষ, ক্লান্তিও নেমে এল।

পরদিন অর্থাৎ ২২শে অক্টোবর সকালে করাচীর ন্যাপ কর্মীদের সাথে মওলানা সাহেব বিশেষভাবে মিলিত হলেন। হায়! তাঁরা কি জানতেন প্রত্যক্ষ নেতা হিসেবে এই তাঁর শেষ মিলন! সংগঠনিক বিষয়াদি আলোচিত হল। চারটার প্লেনে আমরা ঢাকা রওনা হলাম।

ঢাকা এয়ারপোর্টে মওলানা সাহেবকে মোটামুটি ভালই সম্বর্ধনা জানানো হল। লালটুপীধারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছাড়াও কর্মীদের একটি ছোটখাট মিছিল ছিল। বিমান বন্দরের Press Room-এ সাংবাদিকদের সফরের অভিজ্ঞতা বলে মওলানা সাহেব গাড়ীতে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মশিয়ুর এদিককার কি খবর?' ড্রাইভ করতে করতে 'যাদু' তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন।

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, আমরা সন্তোষ পৌঁছে গেলাম। 'পশ্চিম পাকিস্তান' থেকে পাওয়া ও আনা সব কিছু আমি মওলানা সাহেবের স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে মওলানা সাহেব বললেন, 'বাবুর মা! তোমার লাগি জুতাও আনছি।'

www.pathagar.com

ডাঃ নূরুল ইসলাম

অন্তিম শয্যায় মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎকার

[মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শেষ জীবনে বেশ কিছু দিন পি. জি. হাসপাতালে ডাঃ নূরুল ইসলামের চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ সময় ডাঃ নূরুল ইসলাম তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি আমরা এখানে পত্রস্থ করলাম।]

আমি ডাঃ নূরুল ইসলাম পি. জি. হাসপাতাল থেকে বলছি ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গত কয়েক দিন ধরে আমাদের এখানে চিকিৎসার জন্য এসে আমাদের সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছেন। জীবনে বেশ কয়েকবারই তাঁকে চিকিৎসা করার সুযোগ আমার হয়েছে ১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত। আজকে আমাদের সকলের ইচ্ছা তাঁর কাছ থেকে আমরা কয়েকটি কথা শুনব।

মওলানা ভাসানী

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন দেশের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন সময় বিদেশী ডাক্তারদের দ্বারা বহুবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা করিয়েছি। আমার মনে হয় তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ তাঁদের মধ্যে কোন 'টেরিটোরিয়াল বেসিস'-এ অথবা 'লিঙ্গুইস্টিক বেসিস'-এ পেশেন্টকে গ্রহণ করেন না বা চিকিৎসা করেন না। চিকিৎ-সকদের প্রধান আদর্শ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বর্ণ-গোত্র কোন বিচার না করে, দেশের কোন ভেদাভেদ না রেখে, পেশেন্টকে সর্বোতভাবে রোগ হতে মুক্ত করাই হলো তাঁদের জীবনের আদর্শ সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর আমাদের দেশে বহুবার ডাঃ নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে মিটফোর্ড এবং মেডিক্যাল হসপিটাল এবং অন্তরীণ অবস্থায় যখন ছিলাম তখন তাঁর দ্বারা আমি বহুবার চিকিৎসা করিয়েছি এবং

www.pathagar.com

এখানেও পি. জি. হাসপাতালে আমি কয়েকবার ভর্তি হয়েছি এবং তাঁর সান্নিধ্যে চিকিৎসা করেছি এবং কয়েকটি হাসপাতালের অন্য চিকিৎসকও তাঁদের আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে দেখাশুনা করেছেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্যে আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এবং এখনও করছি এবং যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তাঁদের জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দোয়া করবো।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, 'পার্টিশন' হওয়ার পর আমাদের দেশে মানুষের সংখ্যা শুধু বাড়ে নাই, রোগীর সংখ্যা, খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব—এসব কারণে রোগী এত বৃদ্ধি হয়েছে যে, যে ক'টি হাসপাতাল ডিস্ট্রিকট বা হেড কোয়ার্টারে আছে তার দ্বারা চিকিৎসা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সরকারের উচিত অন্যান্য শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট, খাবার পানির ব্যবস্থার প্রতি তারা অবশ্যই দৃষ্টি দেবেন। কিন্তু বিশেষ করে, চিকিৎসার জন্যে তাদের বাজেটের বৃহত্তম অংশ খরচ করা দরকার। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্সের প্রয়োজন, ডাক্তারের প্রয়োজন, আধুনিক যন্ত্রপাতি বা চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং প্রতিটি হসপিটালে যাতে ওষুধ প্রয়োজনানুযায়ী সরবরাহ হয় তার ব্যবস্থা করবেন। সরকারকে এ সম্বন্ধে আমি বহুবার সজাগ করে দিয়েছি যে, স্বাস্থ্যের মঙ্গল যদি না করতে পার, এ দেশের মানুষকে রোগ হতে মুক্ত করতে না পারলে তাদের সামাজিক উন্নতি, অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর নয়। স্বাস্থ্যই হলো উন্নতির মূল ভিত্তি এবং মূল সোপান। আশা করি যে, আমার দেশের ডাক্তাররা, অন্যান্য রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবী যে যেখানে যেভাবে সম্ভব সমাজের খেদমত করে থাকেন তাদের চেয়ে এঁরা আরও বেশী খেদমত করতে পারবেন। এঁদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ করবার কোন কারণ নেই। তবে রোগীরা এবং আমরা অনেক সময় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে 'কমপ্লেন' করে থাকি, অভিযোগ এনে থাকি। সে অভিযোগের মূলে ডাক্তারের স্বল্পতা, নার্সের অভাব, ওষুধের অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব—নানা কারণে তাঁদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও রোগীকে ভালভাবে চিকিৎসা করতে পারেন না।

www.pathagar.com

সরকারের নিকট দাবী জানাই যে, পি. জি. হাসপাতালের উন্নতির জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা এবং সারা দেশে যে সমস্ত হাসপাতাল রয়েছে সেগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্যে ওষুধ, নার্স, ডাক্তার প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্যে আমি আবেদন জানাচ্ছি। ডাক্তার নূরুল ইসলাম সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা—আমার দেশে যারা একেবারেই সর্বহারা যারা পয়সা খরচ করে নিজের অথবা ছেলে-পেলে পরিবারবর্গের কোন রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না, আমি যখন উত্তর বঙ্গে গিয়েছি—রংপুর, দিনাজপুর যে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যে কোন রোগীকে একটা লিপি লিখে ডাঃ নূরুল ইসলামের কাছে পাঠিয়েছি এবং অনুরোধ করেছি ঃ এর পক্ষে নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা করা মোটেই সম্ভবপর নয়, আপনি একে ভালভাবে পরীক্ষা করে যাতে আপনার অধীনে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় না আমার কোন রোগী যাদের আমি এ রকম লিপি লিখে পাঠিয়েছি তারা ফেরত এসে আমার কাছে পুনরায় অভিযোগ করেছে ঃ আপনার চিঠি অনুযায়ী আমাকে ভর্তি করেন নি বা চিকিৎসা করেন নি। এটাই আমার সবচেয়ে গর্ব যে, আমাদের দেশে এখনও বহু চিকিৎসক, বহু দেশপ্রেমিক আছেন যাঁরা মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব বা কর্তব্য শুধু পালন করেন না, আন্তরিক দরদ দিয়ে তাদের রোগ হতে মুক্ত করার জন্যে চেষ্টা করে থাকেন। আমি আশা করি যে, আমার দেশের সুযোগ্য ডাক্তাররা দেশকে সুখী এবং সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলবার পথে দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন যাতে তাঁরা স্বাস্থ্যবান হন এবং তাঁরা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করলে আমি সুখী হব।

ডাঃ নূরুল ইসলাম

দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনার অভিজ্ঞতা দুটো সম্বন্ধেই তুলনামূলকভাবে আপনি আমাদের যা বলেছেন এবং আমরা যা শুনলাম তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারি না। এবার ডাক্তারী বিষয় ছেড়ে অন্য দু'একটা বিষয় সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমি প্রথমেই প্রশ্ন করবো ঃ আপনার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হলো কোন্‌টি ?

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী

আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতের নরনারীকে মুক্ত করা এবং স্বাধীনতা অর্জন করার ব্যাপারে আমরা যে সংগ্রাম করেছি সে সংগ্রামের সময় আমি ভারতের বিভিন্ন 'প্রভিন্স' ভ্রমণ করে যা দেখেছি তাতে আমাদের দেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার যে স্পৃহা-আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি-শ্রদ্ধা বিদ্যমান এ রকম দুনিয়ার আর কোন জাতির মধ্যে আমি কখনও লক্ষ্য করি নি। এই বাংলাদেশের মানুষ কোন প্রকার লোভে জড়িত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নি। শত রকমের নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেও তারা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে এবং আংশিক হলেও আমরা তা সাফল্যমণ্ডিত করেছি। এটাই আমার সর্বপ্রথম স্মরণীয় বিষয় যে, আমাদের মানুষ শুধু বাংলার স্বাধীনতার জন্যে নয়, গোটা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার জন্যে, গোলামীর জিঞ্জির ভাংবার জন্যে যে সংগ্রাম করেছে সে সংগ্রামের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই এবং সেটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

ডাঃ নূরুল ইসলাম

আমরা ডাক্তার এবং নাগরিক হিসেবে ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত সব সময় আপনাকে দেখেছি—জনসাধারণের পক্ষ হয়ে আমাকে যদি বলবার অনুমতি দেন তবে বলবো—বিরোধী দলের নেতৃত্বদান করে এসেছেন। আপনি নিজে শাসনভার কোন সময় হাতে নেন নি কেন ?

মওলানা ভাসানী

মানুষের জীবনে স্বাধীনতা বিভিন্ন প্রকারের (গ্রহণ করতে হয়)। রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী। সামাজিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূল্যও কোন অংশে কম নয়। তাই আমি দেখেছি, আমাদের দেশে জমিদার-মহাজন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিলে অসংখ্য—কোটি কোটি মানুষের রক্ত শোষণ করে যেভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে আগে জনগণের মধ্যে জাগরণ আনা দরকার। রাজনৈতিক চেতনা যদি আমরা জনগণের মধ্যে না আনতে পারি,

www.pathagar.com

জনগণকে যদি আমরা সংগঠিত করতে না পারি, আদর্শবাদী করে গড়ে তুলতে না পারি, জনগণের চরিত্র যদি গঠন করতে না পারি, জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে না পারি, তাহলে শুধু শাসন ক্ষমতার দ্বারা মানুষের মংগল করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই আজ পর্যন্ত আমি জনগণের মধ্যেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বরাবরই তাদের চেতনা জাগাবার চেষ্টা করে আসছি। এখনও আমার সে মিশন বা সংগ্রাম শেষ হয় নি। আমি বিশ্বাস করি, দেশে সমাজতন্ত্র ঐদিন হতে পারে যেদিন সমাজের সকল স্তরের মানুষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে দেশকে শাসন করবে।

সমাজতন্ত্র মানে—যে রাষ্ট্র সমাজ চালায় তাকে বলে সমাজতন্ত্র। একমাত্র রাজার নির্দেশে যে রাষ্ট্র পরিচালনার শাসনক্ষমতা পরিচালিত হয় তাকে বলে রাজতন্ত্র। আর জনগণের দ্বারা যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে বলে গণতন্ত্র। অতএব, আজও জনগণের মধ্যে সেই জাগরণ আমি আনতে পারি নি। আমরা এখনও তাদের রাজনীতির প্রতি কতটা আকৃষ্ট হওয়া দরকার তার চেয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই হল মানব জীবনের মূল লক্ষ্য এবং কামনা। তাই আমি শাসনকামী, একথা বলি নি যে, শাসন ক্ষমতায় কখনও যাব না। যেদিন জনগণকে আমি সংগঠিত করতে পারবো, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চেতনা জাগাতে পারবো, সমাজতন্ত্র—আল্লাহ্‌র তৌহিদে বিশ্বাস রেখে যে সমাজতন্ত্র হয় সে সমাজতন্ত্রকে আমি মনে-প্রাণে কামনা করি। এই মিশন সাকসেসফুল করতে, সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে তা জনগণের দ্বারাই একমাত্র সম্ভবপর। তাই আমি এখনও সেই চেষ্টায় আছি। যদি আল্লাহ্ আমার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরা করেন, যদি জনগণকে আমি সংগঠিত করতে পারি, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চেতনা আনতে পারি, সমাজতন্ত্রের উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দিতে পারি—সেই সময় আমি শাসনক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করবো।

www.pathagar.com

ডাঃ নূরুল ইসলাম

গত কয়েক বছর ধরে আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সেটা প্রতিষ্ঠাও করেছেন যত শীঘ্র সম্ভব দেশীয় ও বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে এটা গড়ে তোলা—ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং আপনার যে সমাজ-তন্ত্রের আহ্বান--দুটোর মধ্যে আপনি কি সামঞ্জস্য দেখতে পান?

মওলানা ভাসানী

ইসলাম বিশ্বজনীন একটা আদর্শ। বিশ্বাস করি, এটা শুধু কোন গোত্রের জন্যে নয়, কোন বর্ণের লোকদের জন্যে নয়, কোন সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যে নয়---এটা ইউনিভার্সাল আদর্শ—বিশ্বজনীন আদর্শ। এ আদর্শকে মানব জীবনে রূপায়িত করতে হলে সকল স্তরের মানুষের মন আকৃষ্ট করতে হবে এ আদর্শের দ্বারা। দুনিয়ার যে কোন বর্ণের, যে কোন ধর্মের মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে ইসলাম সার্বজনীন আদর্শ—এটা শুধু মুসলমানদের কল্যাণের জন্য রব্বুল আলামীন পাঠিয়ে দেন নি। এটা হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-বৌদ্ধ-জৈন-পার্শিক-শিখ পার্বত্য অধিবাসী তথা পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারে, সাংস্কৃতিক মুক্তি এনে দিতে পারে, অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারে, সামাজিক মুক্তি দান করতে পারে। তবেই ইসলামের প্রতি সারা দুনিয়ার মানুষের মন আকৃষ্ট করা সম্ভব-পর হবে। ইসলাম কোনদিন সাম্প্রদায়িক কোন আদর্শ নয়, ইসলাম কোন জাতির প্রতি, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। ইসলাম কোন ভাষার ভিত্তিতে আদর্শ প্রচার করতে মোটেই রাজী নয়। কোন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে, ইসলামের আদর্শ নির্ধারিত হয় নি। ইসলাম আল্লাহ্‌র আদর্শ। আল্লাহ ইউনিভার্সাল তাই ইসলাম ইউনিভার্সাল আদর্শ। অতএব আমি মনে করি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমি এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি যে শিক্ষা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মঙ্গলের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যে শিক্ষায় মানুষকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলবার ক্ষমতা অর্জন করে, সেই শিক্ষার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আশা করি, আমার এবং বিদেশে সমস্ত বিশ্বের মানুষ স্বচক্ষে যখন দেখতে পারবেন যে,

www.pathagar.com

সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, শুধু এশিয়ার জন্যে নয়—ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে, রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম স্থাপনের জন্যে করা হয়েছে। আমি আশা করি, সেদিন আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থের জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। আমার মৃত্যু যদি তার পূর্বেই এসে যায় তো আমি আশা করি এবং দেশবাসী ও সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানাই যে, আমার মৃত্যুর পরেও যেন ইসলামের এই আদর্শ সারা দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেন। এই আদর্শকে আমরা আরবী ভাষায় বলি, রাব্বানী আদর্শ। আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়ে সকল মানুষকে সমানভাবে স্নেহ-মমতা ভালবাসা দান করা।

ডাঃ নূরুল ইসলাম

এবার রাজনীতি থেকে বহুদূরে জনগণের মাঝ থেকে চিকিৎসক হিসেবে আমাদের সবাইকে রেখে আপনাকে আনুরোধ করবো কয়েকটা উপদেশ দিতে।

মওলানা ভাসানী

আমি আশা করি 'চিকিৎসকমণ্ডলী আপনাদের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ সকল ব্যবসায়ীর চেয়ে সবচেয়ে বেশী।'কি গরীব, কি ধনী, কি কৃষক, কি মজুর, কি ভূমিহীন মজুর, কি ফ্যাক্টরীর মজুর, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, পুঁজিপতি—সব শ্রেণীর মানুষ চিকিৎসার জন্যে আপনাদের কাছে যাতায়াত করে। তাদের রোগ চিকিৎসা তো করবেনই, তার সঙ্গে তাদের চরিত্র গঠন করবার প্রয়াসও চালাবেন যাতে তারা সত্যবাদী হয়, ন্যায়পরায়ণ হয়, মিতব্যয়ী হয়। তারা যেন দেশবাসীকে ভালবাসতে শিখে, তারা যেন মানুষের প্রতি অবজ্ঞা না করে, তারা যেন মানুষের রক্ত পান না করে, নিজেদের ভোগ-বিলাস চরিতার্থ না করে এবং আপনারা নিজেরাও ঐ পথের পথিক হবেন। ডাক্তার আনসারীর মতো, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মতো, হেকিম আফজাল খাঁর মতো চিকিৎসক, হারান বিশ্বাস কবিরাজের মত কবিরাজ হবেন। আমাদের দেশে তাঁরা কেবল অর্থের

www.pathagar.com

জন্যেই তাঁদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালান নি। তাঁরা মানুষের অশেষ কল্যাণ করে গেছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর এখনও তাঁদের মিশন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যতকাল পৃথিবী থাকবে, তাঁদের নাম দেশবাসী স্মরণ করবে। আমি আশা করি যে, আপনারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন, কর্তব্য পালন করেন এবং এ সত্ত্বেও সময় পেলে আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ যারা বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তাদের বাঁচাবার জন্যে সুষ্ঠু কোন কর্মপন্থা, কর্মসূচী প্রণয়ন করুন এবং কম ব্যয়ে কি প্রকারে তাদের চিকিৎসা হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা যেমন খারাপ, চিকিৎসার ব্যয়ও পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষার জন্যে এবং চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করাই হলো সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ মরে গেলে তার জন্যে আর চিকিৎসা-শিক্ষার প্রয়োজন হয় না— তার জন্যে কোন জিনিসেরও প্রয়োজন হয় না। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। অতএব, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন। চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ ত্যাগ করে থাকে। শুধু ডাইরিয়া ব্যারামে যে পরিমাণ মানুষ পূর্বে মারা যেতো, যদি সময়োপযোগী চিকিৎসা করা যেতো তাহলে অধিকাংশই আরোগ্য লাভ করতে পারতো। বর্তমানে আমাদের আশার সঞ্চার হয়েছে যে, ম্যালেরিয়া এবং কলেরা প্রভৃতি রোগে আর পূর্বের মতো এতো মারা যায় না। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, স্বল্প ব্যয়ে যাতে এই পাঁচ হাজার ইউনিয়নে এমন কোন চিকিৎসালয় সরকার স্থাপন করতে পারে যাতে কম ব্যয়ে প্রতিটি নারী এবং পুরুষ শিশু-বালক-বালিকা তাতে চিকিৎসা লাভ করতে পারবে।

আমি আশা করি, আপনাদের চিকিৎসকমণ্ডলীর যে সমিতি আছে সেই সমিতি থেকে আপনারা সরকারের নিকট দাবী জানান এবং আমিও সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো যে, চিকিৎসার মঙ্গল করতে হলে শুধু কয়েকটা টাউনে বড় বড় হাসপাতাল করলে চলবে না, পাঁচ হাজার ইউনিয়নে যাতে গ্রাম্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তার ব্যবস্থা এবং এই ডাক্তারদেরকে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে ফ্যার্মাসির ওষুধ-পত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি খরিদ করবার জন্যে সহায়তা করুন। তাহলে আমাদের দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হবে।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ হোসেন

মওলানা ভাসানীর সংসার

মওলানা ভাসানীর সাংসারিক জীবন বিষয়গত দিয়ে যে কোন একজন সংসারী লোকের জীবনের মতই অতি সাধারণ; ভাবগতভাবে অসাধারণ। যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে কেউ বুঝতে পারবেন সংসারে না পাওয়ার বেদনা যেমন তাঁর এই জীবনে চরমভাবে অনুরণিত হয়েছে তেমনি আবার আশা-প্রত্যাশার আনন্দে এই জীবনটিতে সুখের ঢেউ খেলেছে।

মওলানা ভাসানীর সংসার জীবন খুবই সাদাসিধা যে কোন উৎসুক পাঠক বিষয়টি বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে তাঁর দিকে নজর দেন; দেখবেন—তাঁর গায়ে একখানি সাধারণ খদ্দরের পাঞ্জাবী ঃ পরনে গ্রামের আর দশজন মানুষের লুঙ্গির মতই একখানা লুঙ্গি, পায়ে নগণ্য চটি জুতা, মাথায় সাদামাটা একখান তালের আঁশের টুপি। তিনি কি ইচ্ছা করলে এই সাধারণ পোশাকের বদলে অতি মূল্যবান ও দুর্লভ পোশাক পরিধান করিতে পারতেন না? পারতেন। মওলানা ভাসানীর এই সাদামাটা পোশাকে 'নফসানিয়াত' নেই, আছে 'রবুবিয়াত'। সংসারে এমন আর ক'জন নেতা আছেন যাঁরা নফসানিয়াতের উদগ্র চেতনা জলাঞ্জলি দিয়ে রবুবিয়াতকে স্বীয় জীবনে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন?

তাঁর খানাপিনা দেশের সাধারণ মানুষের মতই অতি নগণ্য। মোটা চাউলের ভাত, টাকী মাছের চাস্‌নী, বেগুন ছানা, শাক-ভাজী আর ডাল হলেই তাঁর খাওয়া হয়ে যায়। ভাল খাবারের জন্য তিনি যেমন সর্বদা ব্যাগ্র নন তেমনি আবার নগণ্য খাদ্য গ্রহণেও রুষ্ট নন। তাঁর স্ত্রী বীরনগরের প্রতাপশালী জমিদারের কন্যা আলেমা ভাসানীকে সাদামাটা শাড়ী দিয়ে তাঁর গৃহের যাবতীয় কাজ করতে হয়। তাঁর জন্য কোন চাকর-চাকরানী নেই যেমনি নেই মওলানা সাহেবের নিজের

www.pathagar.com

জন্যও। তাই দুষ্টু নাতি-নাতনীদের তিনি নিজ হাতেই গোসল করান, কাপড় কাচেন, খাওয়ান এবং সময় মত স্কুলে পাঠান। নাত-নাত্নীরা মওলানার গৃহে আর দশটা পরিবারের মতই সাধারণ জীবন যাপনে বাধ্য। সাধারণ পরিবারের মতই নাতি-নাত্নীরা দাদা-দাদীর নিকট তাদের পছন্দমাফিক কোন জিনিসের বায়না ধরে। অনেক সময় হাত খালি থাকার দরুন মওলানা সাহেব তাদের দাবী অপূর্ণ না রেখে পারেন না। আর তখনই মওলানা সাহেব নাতি-নাত্নীদের ম্লান মুখে অশ্রুসিক্ত নয়নে লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবারের অবুঝ শিশুদের করুণ চাহনি দেখতে পান, তাঁর হৃদয় চরম বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

দুঃখ, দৈন্য, হতাশা মওলানা সাহেবকে কোনদিন বিচলিত করতে পারে নি। 'সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ, আল্লাহ্‌র স্নেহ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়ে ঢের বেশী'—এই বলে তিনি চরম বিপদের দিনেও সান্ত্বনার বাণী প্রচার করেন। বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে বিন্যাফৈরের মুসাফিরখানায় ষড়যন্ত্রকারী দালালদের সহায়তায় পাক সেনারা তাঁকে যখন ঘেরাও করেছিল, তাঁর মৃত্যু ছিল বর্বর সেনাদের হাতে অবধারিত। কিন্তু তিনি মোটেই উত্তেজিত হলেন না; শান্তভাবে বললেন, 'আল্লাহ সহায়!' এ বলে তিনি বসে থাকেন নি। তিনি জীবন রক্ষার্থ তৎপর হয়ে ওঠেন এবং বাড়ীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে দ্রুত বের হলেন। নিকটেই সেনারা 'পজিশন' নিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি শান! তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মওলানা সাহেব হিজরত করে হিন্দুস্থান চলে গেলেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা-সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি সকলের প্রতি যেমন স্নেহপরায়ণ আবার শাসনের ক্ষেত্রেও তেমনি কঠোর বাস্তববাদী ভূমিকা পালন করতেন। অন্যায় অবিচারকে তিনি দমন করতেন কঠোর হস্তে। অন্যায়কারীর চরিত্র সংশোধনের জন্য সুযোগ দিতেন। আবার কোন কোন অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন কঠোর হস্তে। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজের মাঠে এক বিরাট মেলা বসে; দু'জন অধ্যাপকের সহায়তায় মেলায় জুয়ার আড্ডা বসানো হয়েছে জেনে মওলানা সাহেব তখনই মেলায় রওনা হন। তাঁর বাসস্থান হতে সামান্য দূরেই মেলা। অকুস্থলে অধ্যাপক দু'জনকে পেলেন। নিজ হাতে অধ্যাপক দু'জনকে বেদম মারপিট করলেন। অধ্যাপক দু'জন মাটিতে

www.pathagar.com

লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ মওলানা ক্ষান্ত ও পরিশ্রান্ত হলেন না। এই মওলানাই আবার অপরিসীম ক্ষমতাশীল যে চক্রান্তকারী দালালের ষড়যন্ত্রে ও সহায়তায় পাক বাহিনীরা মওলানাকে ঘেরাও করেছিল, তাঁর ঘড়বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিলো স্বাধীনতার পর; টাংগাইলের স্বাধীনতা সংগ্রামী কাদের সিদ্দিকী সেই দালালকে ধরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মওলানা সাহেব হিন্দুস্তান হতে ফিরে এলে দালালের সন্তান-সন্ততিরা পিতার অপরাধ মর্জনার জন্য মওলানা সাহেবের দ্বারস্থ হয়। মওলানা সাহেব অম্লান বদনে সেই প্রাণের শত্রুকে ক্ষমা করে দেন। মওলানা সাহেবের নির্দেশে অপরাধী খালাস পায়। আজকের পৃথিবীতে এমন ক'জন নেতা আছেন যাঁরা তাঁদের চরম শত্রুকে এমনভাবে ক্ষমা করতে পারেন?

মওলানা সাহের খাওয়ার পূর্বে বাড়ীর সবাই খেয়েছে কিনা তার খোঁজ নেন। তিনি প্রতিবেশীকে অভুক্ত জেনে কখনও আহার করতেন না। মেহমান বা মুসাফির এলে আগে তাকে আহার করিয়ে পরে তিনি খেতেন। সমাজের সকলের খবর নেন তিনি আপনজনের মত। পবিত্র উরস মোবারক, ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর, আশুরা, মিলাদুন্নবী প্রভৃতি দিবসে তিনি সমাজের সকলকে জেয়াফত দিয়ে পরমাত্মীয়ের মত আহার করান। এ ছাড়া সমাজের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখেন।

'মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, আল্লাহ্‌র চোখে সকল বান্দাই সমান' মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর এই পবিত্র বাণীকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবনেও এটা পরিপূর্ণরূপে মেনে চলেন। মওলানা সাহেবকে আমি কয়েকবার খুবই বিচলিত হতে দেখেছি। চোখ দিয়ে দরদর করে পানিও পড়তে দেখেছি। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন সাইক্লোনে মারা যায় তখন তিনি অসুস্থ শরীরেও উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করতে যান। হাজার হাজার নারী-পুরুষের লাশ, পশুপক্ষীর মৃত দেহ আর ঘর-বাড়ী বৃক্ষ-লতার ধ্বংসস্তুপ দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। এ সময় মওলানা সাহেব সাহায্য সামর্থ্য নিয়ে দৈনিক ১০/১১ মাইল পায়ে হেঁটে সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তখন এই নবতিপর বৃদ্ধ মওলানার মধ্যে যে কর্ম-ব্যস্ততা ও আর্ত লোকের সেবা করার উদ্দীপনা দেখেছি তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই।

www.pathagar.com

মোনায়েম খাঁর আমলে একবার টাঙ্গাইল জেলার চরাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। না খেয়ে শত শত লোক মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ভুখা-নাঙ্গা মানুষ দলে দলে সন্তোষে মওলানা সাহেবের নিকট আসে তাদের বাঁচার দাবী নিয়ে। মওলানা সাহেব তাদেরকে টাঙ্গাইলের তদানীন্তন ডি. সি.-র কাছে তাঁর একখানা অনুরোধ পত্রসহ পাঠান। সারা দিন ডি. সি.-র বাংলোয় বসে থেকে তারা বিফল মনোরথে ফিরে এলে মওলানা সাহেব যারপর নাই দুঃখিত হলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বললেন, 'প্রজার প্রতি জালেম সরকারের কোন দায়িত্ব নাই—আল্লাহ্ তুমি এদের রক্ষা কর।' মওলানা সাহেব ভুখা-নাঙ্গা মানুষের কঙ্কালসার দেহ ও করুণ অসহায় ভাব দেখে কেঁদে ফেললেন। কিন্তু আশু প্রতিকারের পথ না পেয়ে হৃদয়ে বড়ই যাতনা বোধ করলেন। তাদেরকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে বললেন। তারা বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে গেল। মওলানা সাহেব নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। তাঁর চোখের পানি তখন দুই গণ্ড বেয়ে পড়ছিল। তিনি আমাকে বললেন, 'লোকগুলিকে ফিরাইয়া আন—দোকান হইতে মুড়ি-চিড়া আনিয়া খাইতে দাও। পরে দাম দেওয়া যাইবে।' আমি আদেশ মত কাজ করেছিলাম।

মওলানার মাতৃহীন আদরের নাতনী ঢাকায় মারা গেছে। লাশ আসতেই বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। মওলানা সাহেব দুঃখ-শোকে মুহ্যমান। তিনি তাড়াতাড়ি লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন। আমরা সেই মত কাজ করতে লাগলাম। জানাযায় বহু লোক হল। কবরস্থ করার পূর্বে মওলানা সাহেব প্রিয়তমা নাতনীর মুখ শেষ বারের মত দেখতে চাইলেন। কাফনের কাপড়ের অন্তরাল হতে মুখটি বের করা হল। মনে হল একখানা কচি মুখ ঘুমে বিভোর। মওলানা সাহেব করুণ কণ্ঠে বললেন, "বিনা চিকিৎসায় অযত্নে মারা গেছে...আমার কাছে থাকলে অন্তত চিকিৎসা করতে পারতাম, তাও ভাগ্য..." তিনি আর বলতে পারলেন না—কেঁদে ফেললেন। মুহূর্তে যেন দুনিয়ার কোটি কোটি অসহায় পরিবারের বিনা চিকিৎসায় মরা বালক-বালিকার কচি মুখ তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। তিনি অশ্রুসিক্ত চোখ হাত দিয়ে মুছে বলে উঠলেন, 'এমনভাবে কত শিশুর মৃত্যু হচ্ছে—চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই।' এমন আরও অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবন পাতায় করুণ গাঁথার সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

মওলানা সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন এবং অন্যরাও যাতে পড়ে তার জন্য তাকীদ দিতেন। তিনি পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখতেন। শুক্রবার দিন যাতে সমাজের সকল মুসলমান নামাজে শরীক হন তার জন্য দাওয়াত জানান। নামায শেষে দীন ও দুনিয়ার সার্বিক উন্নতির জন্য ভাষণ দেন। মুসলমানদেরকে মসজিদকে মসজিদে নববীর মত করে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। মসজিদ যাতে নিষ্প্রাণ ও শুধু পারলৌকিক কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত না হয় তজ্জন্য মসজিদের তাৎপর্য তিনি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, আত্মিক উন্নতি তৎসহ আর্থিক সদ্‌গতি না হলে মানুষের সংসার জীবন সুন্দর ও সুখের হয় না। এজন্য মসজিদে বসে দীনের উন্নতির জন্য যেমন পরামর্শ করা যায় তেমন আবার দুনিয়ার উন্নতির বিধানগুলোও পর্যালোচনা করা যায়। দীন ও দুনিয়া—এই নিয়েই ইসলামের পূর্ণতা।

মওলানা সাহেব ওলী-আল্লাহ্‌দের মাযার হিফাজত করতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। কাগমারীর হযরত শাহ জামান (র.)-এর মাযারকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তোলেন মসজিদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী ডিগ্রি কলেজ, সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বিন্যাফৈরের হাই স্কুল। আর মহিপুর পাথরঘাটার হযরত নিমাই শাহ (র.)-এর মাযারকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজ, শেরে বাংলা হাসপাতাল, মসজিদ প্রভৃতি। অনুরূপভাবেই কোন না কোন পীর-ওলীর মাযারকে কেন্দ্র করে আসামেও তিনি স্থাপন করেন কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ। মওলানা ভাসানীর জীবনের বিভিন্ন দিক একটিমাত্র নিবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। তাঁর জীবনের এক একটি দিকের উপর এক একখানা বই-ই রচিত হতে পারে। মওলানা ভাসানীর সংসার জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে যেমন নজরে আসে তিনি সংসার জীবনে কঠোর বাস্তববাদীর ভূমিকা পালন করেন, তেমন আবার দৃষ্টিতে পড়ে তিনি সংসার বিরাগীও বটে।

ইসলামে বৈরাগ্য নেই। কিন্তু দুনিয়াদারীর প্রতি মোহগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যও ইসলাম নয়—মওলানা ভাসানী সংসারের হয়েও সংসারী ছিলেন না। কারণ যখনই দেশের কাজে ডাক পড়েছে তখনই তিনি পরিবার-পরিজন রেখে চলে গেছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমন কি বৎসরের পর বৎসর তিনি নির্যাতিত মজলুম মানুষের খেদমতে

www.pathagar.com

নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন। সারা জাহানের নিপীড়িত অসহায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি ব্যাকুল চিত্তে কাজ করেছেন। দেখে মনে হয়েছে সারা বিশ্বের গোটা পরিবারটি নিয়েই যেন তাঁর পরিবার। গোটা দুনিয়ার এই সকল উৎপীড়িত-শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর দায়-দায়িত্ব যেন অপরিসীম! সেই সীমাহীন কর্তব্য ও দায়িত্বের ডাকে তিনি ভুলে গেছেন নিজের পরিজনের কথা। দুনিয়াতে আর এমন কে আছেন যিনি কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানে এবং বিশ্ব মানবতাবোধে এমন উৎসর্গীত?

মওলানা ভাসানী জীবনে ২৪টি বাড়ীতে বসবাস করেছেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে বসতবাটী স্থাপন করেছেন কিন্তু কাজটি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আবার অন্যত্র চলে গেছেন। বাড়ীটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। এই ঘন ঘন বাড়ী পরিবর্তনের জন্য তাঁর স্ত্রীরও কম কষ্ট হয় নি। মাঝে মাঝে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ভীষণ; কিন্তু মওলানা ভাসানী তো শুধু তাঁর পরিবারের জন্যই নন, তিনি গোটা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণকামী, আদর্শিক নেতা—এই কথাটি উপলব্ধি করে পর মুহূর্তেই আবার শান্ত হয়েছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে আবার তা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় কোন স্থানের প্রতিই মওলানা সাহেব মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন নি। এই দৃষ্টিকোণ হতে বাস্তবতার কষ্টি-পাথরে পরখ করলে দেখা যাবে তাঁর সারাটি জীবনই যেন বিরামহীন এক মুসাফিরের জীবন। তিনি যেন সকল দেশের মানুষের সংগে একাত্ম হয়ে বাস করতে চান! সকল মানুষের দুঃখ মোচন করতে চান। এ সংসার জীবনে যেমন তাঁকে কঠোর বাস্তববাদীরূপে দেখা যায় তেমন আবার অন্য দৃষ্টিতে চরম সংসারবিরাগী বলে মনে হয়। দুনিয়াতে এমন আর ক'জন নেতা আছেন একই সঙ্গে বাস্তব ও বৈরাগ্যের দুইটি জীবনই পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন অথচ একটি অপরটি হতে পৃথক হয়ে পড়ে নি? মওলানা ভাসানীর সংসার জীবন এজন্যই অনন্যসাধারণ ও একটি মহাবিশ্বের সমতুল্য।

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমান

ব্যক্তি ভাসানী

মওলানা ভাসানী নামটি মনে মনে স্মরণ করলেই মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয় তা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। যিনি দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা হাতে পেয়েও দরবেশের জীবন যাপন ক'রে, পৃথিবীর আরাম-আয়েশকে হারাম ক'রে আখেরী নবীর দৈনন্দিন জীবন বাস্তবায়িত করলেন, দুনিয়ার লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না, জীবনটাকে বাজি রেখে অন্যায়কে প্রতিরোধ করলেন, তাঁকে আমরা মহামানব ছাড়া আর কি বলতে পারি?

এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৬৮ সালে। তখন আমার নেতৃত্বে ঢাকা শহরের বেবীট্যাক্সী ড্রাইভাররা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে হরতাল চালাচ্ছিল। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল। ঐ সময় মওলানা সাহেব কাপ্তান বাজারের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অফিসে অবস্থান করছিলেন। বেবীট্যাক্সির হরতাল দীর্ঘায়িত করার জন্যে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে তিনি রিকশাসহ অন্যান্য যানবাহনের হরতাল ডেকে দিলেন। ঐদিন ঢাকা শহরে যানবাহনের চাকা বন্ধ হয়ে গেল। মোনেম খান ক্ষিপ্ত হয়ে পিকেটিংরত ব্যক্তিদের উপর গুলী চালালো। এর পরিণতিতে হল কিছু মৃত্যু। বিক্ষোভ চূড়ান্তভাবে দানা বেঁধে উঠলো যার পরিণতিতে আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের মসনদ ছেড়ে দিতে হল। হয়তো অনেকেই জানেন না যে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬৮ সালে, সেই আন্দোলন শেষ হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলার অভ্যুত্থানে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কোন একক দল কৃতিত্বের দাবী করতে পারে

www.pathagar.com

না এবং তা করতে গিয়ে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বর্ষীয়ান নেতা জনগণের আত্মার আত্মা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যদি আওয়ামী লীগ একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করতো তাহলে তখন দেশের গণতন্ত্র হত্যা হতো না, নেতৃবৃন্দকে হত্যার শিকার হতে হতো না।

স্বাধীন বাংলায় মওলানা সাহেবকে আরো কাছে থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে দেশের একমাত্র বিরোধী দল ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। মওলানা সাহেব ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। দেশকাল-পাত্রের উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। পার্থিব সম্পদের সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। সন্তোষের পর্ণ কুটিরে দেশের শতকরা নব্বই জনের পোশাক-পরিচ্ছেদে তিনি বিরাট বিরাট নেতার সাথে মোলাকাত করতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সহজ-সরল জীবন যাপনে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হতো না। মোনাফেকী তাঁর জীবনে ছিল অনুপস্থিত। বক্তৃতায় জনগণের জন্য বড় বড় কথা বলে অনেক নেতাই ধানমণ্ডি ও গুলশানে সুরম্য অট্টালিকা তৈরী করে জমিদারের জীবন যাপন করে গেছেন ; কিন্তু মওলানা ভাসানীর বড় সমালোচকরাও তাঁর বিরুদ্ধে এরূপ কোন উক্তি করতে পারবেন না।

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার নামে ৫৪ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশকে আবার দিল্লীর গাঁটছাড়া করবার প্রচেষ্টা নেওয়া হলো, মৈত্রী চুক্তির নামে। হিন্দুস্তানের সেনাবাহিনী চার হাজার কোটি টাকার পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অস্ত্র তাদের দেশে নিয়ে গেল। অসম বাণিজ্য চুক্তির বলে ভারতীয় পচা মাল আমাদের দেশে রফতানী করলো, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মুসলমান সৈনিকদের খতম করে হিন্দুস্তানী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি হলো। লাল বাহিনী, নীল বাহিনীর অত্যাচারে তখন জনগণের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। রাজাকার ও আল বদরদের নামে ইসলামবেত্তা ব্যক্তিদের দলে দলে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, বিনা বিচারে জেলখানায় তাদের পচিয়ে মারার নীল নকশা তৈরী হচ্ছে—তখনই এই অকুতোভয় মহান নেতা বাংলার মাঠে-ঘাটে-শহর-গ্রামে জনসভা করে জনগণকে হিন্দুস্তান ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের কীর্তিকলাপের মুখোশ খুলে দিলেন। তখনকার রাজনৈতিক পটভূমিকায় তিনি ছাড়া এ দুঃসাহসী কাজটি করার আর কোন নেতাই ছিলেন না।

www.pathagar.com

আমার মত একজন নগণ্য কর্মীর পক্ষে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি'র গুণাবলী অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়! তবুও আজ তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে যদি কোনরূপ ভুল করে ফেলি সুধী পাঠকবৃন্দ তা ক্ষমা করে দেবেন। এখানে আমার একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই মহান নেতা শেখ মুজিবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। স্নেহ করতেন একজন স্নেহশীল পিতার মত, যে ভালবাসা তাঁর আপন ছেলে আবু নাসের খান পান নি। কিন্তু একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, শেখ মুজিব বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে এবং চাটুকারদের মোসাহেবীতে মওলানা সাহেবের উপদেশগুলোকে ভ্রান্ত মনে করেছেন, উপেক্ষা করেছেন তাঁর সাংগঠনিক শক্তি, যে শক্তি তিনি পেয়েছেন কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের কাছ থেকে, যার জন্য তিনি শেখ মুজিবকে বার বার আহ্বান করেছেন রাজসিংহাসন ছেড়ে তাঁর সাথে, জনগণের সাথে থাকতে, গণভবনের চার দেয়ালের বাইরে জনগণের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে, জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ক্ষমতার মোহে শেখ মুজিব ও তাঁর দল তখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে বলেছেন, 'আপনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি আপনি বুঝবেন না। সুতরাং আপনি এখন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করুন।' ১৯৭৪ সালে যখন দেশে দুর্ভিক্ষ তখনও মওলানা সাহেব শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস যে, শেখ মুজিব তাঁর এই অনশনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বই দিলেন না, যার ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল। কত নারী তার ইজ্জত হারালো! মওলানা সাহেব পল্টন ময়দানে ঘোষণা করলেন, 'শেখ মুজিব তুমি আমার সাথে আস, আমি তোমাকে চীন ও আরব দেশের স্বীকৃতি এনে দিচ্ছি। পাকিস্তান থেকে চাল এনে দিচ্ছি।' বিরোধী দলের নেতা হয়েও জাতীয় স্বার্থে সরকারের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার এমন উদাহরণ কার থাকতে পারে? দেশ ও জাতির স্বার্থে যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভবপর। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের যিনি জনক, পাকিস্তানের বহু সরকার যাঁর কৃপাদৃষ্টির জন্য ব্যাকুল থাকতো, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে কত সরকারের উত্থান-পতন হয়েছে, তিনি একটু খায়েশ প্রকাশ করলে সরকারই এগিয়ে আসতেন তাঁর জন্য ধানমণ্ডি, গুলশান কিংবা

www.pathagar.com

বনানীতে একটি সুরম্য অট্টালিকা তৈরী করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ্‌র খাস বান্দা সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র রসুলের পথ ধরে এগিয়ে গেছেন আর তাইতো মৃত্যুর সময় তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মান নিয়ে গেছেন, যা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হিসেবে শেখ মুজিবের ভাগ্যে জোটে নি। একজন মুসলমানের লক্ষ্য হবে ইহকাল ও পরকালের সমন্বয়। এই দুনিয়ার জন্য সব লাভ করলাম; কিন্তু পরকালের জন্য সব ফাঁকা। সুতরাং সবই ফাঁকা। মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গেলে ধৃষ্টতা হয় কিনা তা বুঝতে পারি না। আল্লাহ যাঁকে গ্রহণ করেন দুনিয়াতেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মসজিদের পাশে কবর দিতে যেন তিনি রোজ পাঁচ ওয়াক্ত আযান ধ্বনি শুনতে পান। আল্লাহ্‌ এই নেককার বান্দার ইচ্ছা কি সুন্দর-ভাবে পূরণ করেছেন! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। আজকে যেখানে আফ্রো-এশিয়ার মহান পিতা চিরনিদ্রায় শায়িত জীবনের শেষ দিকে ঐখানেই তিনি হুজরা বানিয়েছিলেন এবং দিন-রাতের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি এই হুজরার মধ্যে কাটাতেন। রাজনৈতিক আলোচনাও সেখান থেকেই হতো। ধর্মীয় চিন্তাধারার বিকাশ সেখান থেকেই ঘটাতেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ঐ জায়গায় তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ধার্মিক এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় ব্যক্তিরা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে এমন সমন্বয় সাধন করে চলেন যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজ-নীতিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে মওলানা ভাসানীকে নাস্তিক কম্যুনিস্ট বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেন নি। তাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা মূর্খ-তার সামিল। সুতরাং তাদের দর্শন হচ্ছে অন্ধদের হাতী দেখানোর সামিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি যখন দেখলেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উচ্ছল জোয়ারে এদেশের মানুষ ভেসে যাচ্ছে, দেশের সার্ব-ভৌতত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে এবং কালক্রমে হিন্দুস্তানী কূটনীতির চক্রান্তে এপার বাংলা ওপর বাংলার সাথে মিশে যাচ্ছে তখনই তিনি আওয়াজ তুললেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। এই বুলন্দ আওয়াজের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন যে, আমরা বাঙ্গালী হলেও ধর্মে আমরা মুসলমান। বাঙ্গালী হিন্দুদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই, এমন কি বাংলা ভাষায়ও নেই। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষা হবে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি এবং এই পার্থক্য বজায় না থাকলে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র স্বাধীনতা হয়ে পড়বে অর্থহীন এবং পরবর্তীকালে আমরা হয়ে পড়বো সিকিম-ভূটান। যে নেতা জাতীয় স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে কোনদিন বড় করে দেখেন নি, তিনি কত বড় মহৎ প্রাণের অধিকারী ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। কর্মীদের প্রতি তাঁর দরদ এত বেশী ছিল যে, নিজের হাতে ভাত বেড়ে তিনি তাদের খাইয়েছেন। নিজে অনাহারে থেকে কর্মীকে খাইয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হুজুরের কথা বলতে গিয়ে যদি তাঁর সহধর্মিণী আলেমা ভাসানীর কথা কিছু না বলা হয় তবে অন্যায় করা হবে। তিনিও আমাদের খুবই ভালবাসতেন। হুজুরের কাজে যাতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেদিকেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন এবং সময়ে অসময়ে আমাদের জন্য খাবার রান্না করতেও তিনি কোনদিন বিরক্তি বোধ করতেন না। উভয়ের ভালবাসাই ছিল সন্তোষের আকর্ষণ।

বিচার ব্যবস্থার প্রতি মওলানার অবস্থান ছিল অবিচল। বিনা বিচারে শাস্তি দেবার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। একবার শেখ মুজিব খুলনায় ঘোষণা করলেন, নকশাল দেখামাত্র তাদের গুলী কর। সঙ্গে সঙ্গে এই অকুতোভয় মহান নেতা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে শেখ মুজিবকে হুঁশিয়ার করে বললেন, 'নকশাল কি কারো গায়ে লেখা আছে যে, দেখামাত্র গুলী করবে? মুজিব, তুমি এখন একটি স্বাধীন দেশের প্রধান মন্ত্রী। এমন কথা বলো না যা হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।' শেখ মুজিবকে এরূপ হুঁশিয়ারীমূলক কথা বলার ক্ষমতা তখন বাংলাদেশে আর কারো ছিলো না। পুলিশের হেফাজতে সিরাজ সিকদারকে কাপুরুষোচিত হত্যায় মওলানা ভাসানী দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন এবং জাতীয় সংসদে এই হত্যার কথা যখন শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করলেন তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন যে, একজন রাষ্ট্রনায়ক একটি সভ্য দেশের জাতীয় সংসদে এরূপ একটি অন্যায় ও গর্হিত কাজ কিভাবে উত্থাপন করতে পারে এবং সার্বভৌম সংসদের সদস্যরা কিভাবে তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে। তখনই এই দূরদর্শী প্রবীণতম নেতা আশংকা করছিলেন যে, ফেরাউন নমরূদের মত মুজিবশাহীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, একদলীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে শেখ মুজিব যখন বাকশাল গঠন করতে চাইলেন তখন তিনি মওলানা সাহেবকে বাকশালের চেয়ারম্যান হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে মওলানা সাহেব টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসকের মারফত শেখ মুজিবকে

www.pathagar.com

জানিয়েছিলেন যে, 'তিনি আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু বাকশালের নয়।' যে গণতন্ত্রের জন্য তিনি আজীবন পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন আর আজ স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র হত্যা করে স্বৈরাচারী সরকার কায়েম হবে এবং তিনি সেই সরকারের নেতৃত্ব দেবেন তা হতে পারে না। সুতরাং তিনি শেখ মুজিবকে এহেন কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ক্ষমতার অহংকারে মওলানার উপদেশ শোনার মত সময় তখন তাঁর কোথায়? একদলের মারফত ক্ষমতা বংশপরম্পরায় কুক্ষিগত করার কি অদ্ভুত প্রচেষ্টা! কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সমস্ত পরিবারের রক্ত দিয়ে শেখ মুজিবকে রাজা বানাবার খেসারত দিতে হলো। কিন্তু মওলানা ভাসানী দেশকে রাহুমুক্ত দেখে সসম্মানে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গেলেন এবং দেশ ও জাতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে আমাদের চলতে হবে এবং ইসলামী হুকুমত কায়েমের মধ্য দিয়ে এদেশের কোটি কোটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার পরিচালনা করতে হবে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা যেভাবেই চালানো হোক না কেন তা চিরস্থায়ী নয়। সেরূপ প্রচেষ্টার মাশুল বুকের রক্ত দিয়েই শোধ করতে হবে। জনগণের মঙ্গলের মধ্য দিয়েই তাদের হৃদয়ে আসন চির-স্থায়ী করে নিতে হবে। তা না হলে তার স্থান হবে আস্তাকুঁড়ে।

www.pathagar.com

আবু নছরত রহমতউল্লাহ

স্মৃতিপটে মওলানা ভাসানী

কবি বলেছেন, 'অতীতকালের কথা কেহ ভোলে কেহ বা ভোলে না।' সত্যই স্মৃতি এমন একটি জিনিস যা সহজে ভোলা যায় না। কৃতিত্ব স্মৃতি হয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে। সেই স্মৃতির পাতা থেকে এখানে দু'একটি কথা বলবো।

মানুষ দুনিয়াতে আসে আবার চলে যায়। এটাই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধান। এই যাওয়া-আসার মাঝে যারা মানব কল্যাণকর কাজ করে যেতে পারে তারাই ধন্য। তাই কবি বলেন ঃ

'ক্ষণিকের ধরার মাঝে পাষাণে
যারা পদচিহ্ন এঁকে
সার্থক তাদের জীবন রেখা
গেছে চিরমধু রেখে।'

কবির কন্ঠের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই স্মৃতির মাঝে যে মানুষটি বেঁচে থাকে তাঁর বেঁচে থাকাটাও তখনই সার্থক হয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ স্মরণ করবে তাঁর মানব কল্যাণকর কর্মকাণ্ড। এ পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজ উন্নয়নে কেউ সঙ্গীত শিল্পে, কেউ বা চিত্র অংকনে, কেউ বা দান খয়রাতে আর কেউ বা রাজনীতিতে। আজ যার কথা বলার জন্য এত কথার অবতারণা তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও মানবদরদী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাই তাঁর তেজস্বী বক্তৃতায়, তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর বিশ্বমানবতা বোধে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ নয় বা কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই ব্যাপক ও একান্তই অপরিসীম।

www.pathagar.com

একজন সাংবাদিক হিসেবে বহু নেতা-উপনেতা, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখার সুযোগ হয়েছে এবং তাঁদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। মওলানা ভাসানীর সাথেও একান্তভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিলো।

মওলানা ভাসানী আসাম থেকে ঢাকা এসে শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের প্রথম মহাসচিব শামসুল হক, ইয়ার মোহাম্মদ খান, ব্যারিস্টার শওকত আলী এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদের নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরবর্তীতে এ নাম সংশোধনী করে আওয়ামী লীগ করা হয়। তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লীগ দলের জনাব নুরুল আমীন। এ সরকার মানব কল্যাণকর কাজ করতে পারে নি। বরং জনসাধারণের উপর জুলুম চালিয়ে গেছেন। তাই তিনি সরকারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন আরমানীটোলা মাঠেই Public meeting (জনসভা) অনুষ্ঠিত হতো। আমার মনে হয় এদেশের মানুষকে সংগ্রামী মনোভাবে গড়ে তোলার পিছনে মওলানা ভাসানীর দান অপরিসীম। সেদিন তাঁর আরমানীটোলা মাঠে তেজস্বী বক্তৃতায় সংগ্রামী বহ্নিশিখা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। আজকে আমরা যে সব সংগ্রাম আন্দোলন দেখছি এর মূলভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মওলানা ভাসানী। একজন সাংবাদিক হিসাবে তাঁর বক্তৃতা লিখতাম এবং বক্তৃতার কিছু অংশ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতাম। বিভিন্ন প্রশ্ন করতাম। তিনি হাসিমুখে উত্তর দিতেন। শিশুর মত সরল ছিল তাঁর মন।

কেউ তাঁর কাছে গেলে তিনি মেহমানকে আপ্যায়ন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং মেহমানের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন।

একবার তাকে বললাম: আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন। তখন আমি যুবক ও নতুন সাংবাদিক। অটোগ্রাফ নেওয়ার প্রতি একটা সখ ছিল। তিনি হেসে বললেন, 'আমার সই চান? দেন খাতা।' আমার ছোট নোটবুকটা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তাঁর নামটা বেশ সুন্দর করে লিখে দিলেন। মওলানা ভাসানী যদিও আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার সেই নোটবুকে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে।

www.pathagar.com

মওলানা সাহেবের সাথে খুঁটি-নাটি এত বহু স্মৃতি আছে যে, সব কথা বলতে গেলে লেখার কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। অনেকবার আওয়ামী লীগ অফিসে গেছি। শেখ সাহেব এবং মওলানা ভাসানীসহ বিভিন্ন নেতাদের সাথে ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করেছি এবং সঙ্গে বসে চা-নাস্তা খেয়েছি। অনেক সময় হাসিঠাট্টাও করেছি। মওলানা সাহেব বেশ রসিকও ছিলেন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলতেন যে না হেসে পারতাম না। তবে আমি একটা জিনিস গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে—তাঁর নীতি ছিল বেশ কঠোর এবং আদর্শে ছিলেন বিশ্বাসী। নীতির সাথে আপোষ করেন নি। যা বলেছেন তা করতে চেষ্টা করেছেন।

আমি দেখেছি মওলানা সাহেব ছিলেন অসীম সাহসী। ভয় কাকে বলে তিনি তা জানতেন না। বিভিন্ন সভাসমিতিতে সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। মিছিলের পুরোভাগে থাকতেন তিনি। মিছিলে পুলিশ বাধা দিতে চেষ্টা করলে তিনি বাধা আগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করতেন। পুলিশ অফিসার অনেক বুঝিয়ে শান্ত করতেন। তাতে একজন সাংবাদিক হিসাবে মিছিলের সাথে আমাকে থাকতে হয়েছে। মতবিরোধের কারণে পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পেরেছিলাম যে, শিক্ষা বিস্তারে তিনি ভীষণ উৎসাহী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এ দেশের মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে, মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে এবং নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল। তিনি শিক্ষা বিস্তারের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মওলানা ভাসানী কৃষক, মজুর ও শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি বলতেন, কৃষক-মজুর-শ্রমিকের যদি উন্নতি হয় তবে দেশের উন্নতি হবেই। তাদের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, দরিদ্রের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করে না—কৃপা প্রদর্শন করে। সাহায্যের হাতে গোলামীর জিঞ্জির লুকায়িত থাকে।

মওলানা ভাসানী ব্যক্তিগত জীবনে খুব সাদাসিদেভাবে চলতেন। তিনি খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, বেতের বুনানো টুপি ও চটি পরিধান করতেন।

www.pathagar.com

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন ধরাবাধা নিয়ম ছিল না। সাধারণ বিছানায় ঘুমাতেন। আমি তাঁকে জীবনে কখনও বিলাসিতার জীবন-যাপন করতে দেখে নি।

একবার মওলানা সাহেবের অসুস্থতার কথা শুনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেবিনে তাঁকে দেখতে যাই। গিয়ে দেখলাম তিনি বেডের মাঝখানে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে উপবিষ্ট অনেক লোকজন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন এবং বসতে বললেন। কিছুক্ষণ বসে তাঁর সাথে দু' চারটি কথা বলে চলে এলাম। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বেশী কথা বলা যাবে না। এটাই ছিল মওলানা সাহেবের সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

www.pathagar.com

আবুল খায়ের আহমদ আলী

মওলানা ভাসানী-সান্নিধ্যে একদিন

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। সন্তোষে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' সম্মেলন। ভাসানীভক্ত মোসলেম উদ্দীন মাস্টারের সাথে রওয়ানা দিলাম সন্তোষে। উদ্দেশ্য কাছে থেকে মওলানাকে দেখা। মজলুম জননেতা, কিংবদন্তীর নায়ক মওলানাকে ১৯৫০ সাল থেকে দেখে আসছি। কোন সময় আরমানিটোলা ময়দানে, কোন সময় পল্টনে তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর 'খামোশ' শব্দটি এখনও আমার কানে বাজে।

অনেকে বলেছেন মওলানা কম্যুনিস্ট। অনেকের কাছে শুনেছি মওলানার মত ভাল লোক হয় না। আমি চকবাজারের এক সূতা ব্যবসায়ীর মুখে শুনেছি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে মওলানার এক আত্মীয়কে সূতার পারমিট দেয়া হয়। তিনি পারমিটটি দশ হাজার টাকা লাভে ঐ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক লাভের পাঁচ হাজার টাকা তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দেন। অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা রয়াল স্টেশনারীর উপর মওলানার কাছে পৌঁছে দেবেন বলে পারমিটটি রেখে দেন। কথামত টাকা নিয়ে ব্যবসায়ী হাযির হন মওলানার কাছে। মাগরিবের নামাযের সময়। মওলানা নামায আদায় করলেন। নামাযের পর ব্যবসায়ীর মুখে সবকথা শুনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে ফোন করলেন। মন্ত্রী পারমিটের কথা স্বীকার করলেন। মওলানা বললেন, 'এ পারমিটের কথা কি আমি তোমাকে বলেছি? সারা জীবন আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। দুর্নীতির জন্যই এবারের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়েছে। আর তোমরা ক্ষমতায় বসেই সেই স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতি শুরু করে দিলে! এ পারমিট বাতিল করো।'

www.pathagar.com

মওলানা ব্যবসায়ীকে টাকাগুলো নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। আরও বললেন, 'পারমিট বাতিল হয়ে গেছে, এতে আপনার কোন কাজ হবে না। বাকী টাকা যাকে দিয়েছেন তার কাছে থেকে আমি নিয়ে রাখবো। আপনি আগামী কাল এসে নিয়ে যাবেন।'

উল্লেখ্য, ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ঢাকার লক্ষীবাজারস্থ জিকো প্রেসে প্যাড, ক্যাশমেমো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাগজ ছাপতে এসে একথাগুলো আমাকে বলেন।

ব্যবসায়ীর কাছে এ কথা যেদিন আমি শুনি সেদিন থেকেই মও-লানার প্রতি আমার অটল শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। আমি তাঁর সান্নিধ্যে এক দিন কাটানোর ইচ্ছা অনেক আগে থেকে মনে মনে পোষণ করতে থাকি। সেদিনটি ছিলো ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ কি ২৭ তারিখ।

আমি এবং মোসলেম উদ্দিন সাহেব সকালে রওয়ানা দিয়ে ১০টার সময় সন্তোষে গিয়ে পেঁৗছি। গিয়ে দেখি মওলানা তাঁর টিনের ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতা চৌকির উপর বসে আছেন। পানের বাটা পাশে রেখে পান খাচ্ছেন আর আগন্তুক লোকজনদের সাথে কথা বলছেন। মোসলেম উদ্দিন সাহেবকে দেখে বললেন, 'কি মোসলেম? মনে পড়েছে? ভাল আছ?' আমি সামনে দাঁড়িয়ে মওলানাকে পরখ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর পিছে পিছে থেকে তাঁর কাজকর্ম আমি দেখতে থাকলাম।

মওলানা জীবনে যত সম্মেলন করেছেন সব সম্মেলনেই মেহমানদারী করেছেন একথা আমি শুনেছি। যেখানে রান্না-বান্নার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সেখানে আমার পরিচিত আজাদ সুলতান এবং আজকের বেঈমান ডাক্তার জাহাঙ্গীর এগুলোর তদারকী করছেন। চাল-ডাল, তরি-তরকারি মওলানার মুরিদানরা বয়ে নিয়ে আসছে। সেগুলো পাক হচ্ছে আর রাখা হচ্ছে ডিঙী নৌকার মধ্যে। খাওয়ার পাত্র কলাপাতা। সম্মেলন শুরু হল। মওলানা সম্মেলনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তৃতা করলেন। মওলানা ঐ সম্মেলনে সেদিন তিনবার বক্তৃতা করেন। ঐ দিনের সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এবং বেগম সুফিয়া কামালের কথা আমার মনে পড়ছে। কারণ ঐ দিন এই তিনজনের তিনটি জিনিস আমার মনে আজও দাগ কেটে আছে।

www.pathagar.com

বেগম সুফিয়া কামাল সম্মেলনের বক্তৃতা প্রসংগে বললেন, 'মওলানা সাহেব সারা জীবন অসম্প্রদায়িক রাজনীতি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখছেন 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।' এ সাম্প্রদায়িক নাম না দিয়ে 'মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদালয়' অথবা 'সন্তোষ বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিলে ভাল হতো।'

এ বক্তব্যের জবাবে মওলানা বললেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হবে। কাজেই ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সন্তোষ বিশ্ববিদ্যাল নাম রাখার প্রশ্নই ওঠে না।'

জানা যায় পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর দিবাগত রাতে অপ্রকাশিত ও অঘোষিত প্রোগ্রাম করে তৎকালীন সরকার প্রধান সন্তোষে যান এবং 'মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়' এই নামে অর্ডিন্যান্স জারীতে সম্মত থাকতে মওলানা ভাসানীকে পীড়াপীড়ি করেন। ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ ঘোষিত ও প্রকাশিত কর্মসূচী নিয়েও যখন তিনি সন্তোষে যান তখনো মওলানা ভাসানী সমীপে একই প্রস্তাব রাখেন। মওলানা ভাসানী বরাবরের মত এক কথায় সব শেষ করে দেন, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আসলে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই। এ আদর্শ ইসলাম……। এতে মওলানা ভাসানীর নাম সংযোজন মানে বিসমিল্লাহ্তে গলদ।'

ড. কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব সেদিন খেজুর পাতার তৈরী টুপি মাথায় দিয়ে এসেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, এ সুন্দর জিনিসটি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন?' তিনি বললেন, 'আমার এক নাতনী তৈরী করে দিয়েছে।' আমি বললাম, 'এ নতুন জিনিস ,আপনি ব্যবহার করছেন?' তিনি বললেন, 'দেশী জিনিস চালু করছি আর কি!'

খাবার সময় আমি ভোজনপ্রিয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর পাশে বসেছিলাম। উদ্দেশ্য তাঁর খাওয়া দেখা। তিনি যে ডাল খানেওয়ালা তাতে কোন সন্দেহ রইলো না। খাবার শেষে তিনি মাস কলাইর ডাল তিন গ্লাস খেলেন। অবাক করা কাণ্ড আর কি!

মওলানা সকাল বেলা বারান্দায় বসেছিলেন, সে সময় পাবনার আওয়াল সাহেবের জামাই সেখানে আসেন। মওলানা জামাইয়ের কাছে শ্বশুরের খবর জানতে চান। কথা প্রসংঙ্গে বললেন, 'কম্যুনিস্টরা যখন বিপদে পড়ে তখনই কেবল আমার কাছে আসে। বিপদ চলে গেলে তারা আমাকে

www.pathagar.com

সম্প্রদায়িক বলে গালাগালি করে। আমি তাদের বলে দিতে চাই, আমি কম্যুনিস্ট না। এতে যদি তোমরা আমার সাথে থাক, ভাল। তা না হলে আমি বলবো, একলা চলো একলা চলোরে।'

লোকের মুখে শুনেছি মওলানা নাকি কম্যুনিস্ট। নামাযের অপেক্ষায় থাকলাম। উদ্দেশ্য মওলানা নামায পড়েন কি না দেখা। যোহরের আযান হলো। মওলানা যথাসময়ে নামায আদায় করলেন। আছরের নামাযও তিনি জামাতের সাথে আদায় করলেন।

আছরের নামাযের পর আমি তাঁর পিছনে পিছন চলছি। এমন সময় এক অন্ধ তাঁর সামনে পড়লো। অন্ধ লোকটি কিছু খাবার চাইছে। মওলানা একটি লোককে ডেকে বললেন, 'এ বেটা, এ অন্ধ লোকটি এখন পর্যন্ত খায় নি। অথচ তোমরা চোখওয়ালারা কয়েকবার খেয়েছো। যাও, এর খাবার দাও।' ঐ দিনের সম্মেলনে বক্তৃতার এক পর্যায়ে পুলিশের জুলুম আর ঘুষ নিয়ে দু'টি ঘটনার উল্লেখ করেন।

মওলানার এক মুরিদ তার মেয়ের বিয়ের পরামর্শ করতে আসেন। জামাই বড় দারোগা। মওলানা মুরিদকে বললেন, 'পুলিশের লোকেরা ঘুষ খায়। এ বিয়ে না দিয়ে দেখ কোন শিক্ষক পাও কিনা।' শেষ পর্যন্ত মুরিদের মেয়ের বিয়ে হয় এক প্রফেসারের সাথে। এক সময় দারোগা এবং প্রফেসার সাহেব পাশাপাশি বসবাস করেন। দারোগার বাসায় বাজার হয় বড় মাছ। প্রফে-সারের বাসায় বাজার হয়ে আসে ছোট ছোট টেংরা মাছ। বাপ গেছে মেয়ে দেখতে। মেয়ে মাছ কুটছিল। টেংরা মাছের কাঁটা হাতে বিঁধে রক্ত ঝরছিল। বাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে মা?' মেয়ে রাগ করে উত্তর দিল, 'আপনার পীর সাহেবের পরামর্শে যে কাজ করেছেন তারই প্রতিফল। দারোগার সাথে যদি আমার বিয়ে হতো তাহলে আর এ অবস্থা হতো না। পাশের বাসায় সে দারোগা থাকেন। তার বাসায় প্রতিদিন আসে বড় বড় মাছ। চাকর-বাকর কাজ করে। আর আমার এখানে ছোট ছোট মাছ। নিজের হাতে সব কাজ করতে হয়। মওলানার পরামর্শে আমার যা সর্বনাশ করেছেন!'

পুলিশের জুলুম সম্পর্কে বলতে নিয়ে তিনি বললেন, 'এই পুলিশ মওলানা মুহাম্মদ আলীর মত সোনার মানুষকে লাঠি চার্জ করে আহত করেছে। ফলে মওলানাকে মেঝেতে গড়াতে আমি দেখেছি। পুলিশ চোর-ডাকাত বদমাশদের কিছু করতে পারে না। ওরা ভাল মানুষ ধরে পেটায়। পুলিশের এই পরাধীন যুগের মনমানসিকতার পরিবর্তন না হলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

www.pathagar.com

মওলানা বক্তৃতাকালে আরও শোনালেন কেমন করে সন্তোষের মহারাজা পীর শাহ জামানের লাখেরাজ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। আবার কেমন করে তিনি করোটিয়ার জমিদার এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করে শাহ জামানের দীঘিতে বাঁশবাড়ী করেন।

মওলানা বক্তৃতাকালে আরও শোনালেন, বিদেশী সাংবাদিক এবং অর্থ-নীতিবিদদের কথা। তাঁরা মওলানার কাছে আসেন অর্থনীতি প্রসংগে প্রশ্ন নিয়ে। মওলানা বলেন, 'তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারী। আমি ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়া। তাঁদের কিতাবী বিদ্যার ধার আমি ধারি না। আমি সোজা কথা বুঝি ইসলামের ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতিই কেবল সারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষকে রক্ষা করতে পারে যা ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম সোসালিজমের দ্বারা সম্ভব নয়।'

এসব কথা শোনার পর আমার ভুল ভাঙলো। এর পরও কি মওলানাকে কম্যুনিস্ট বলা চলে? যদি কেউ বলেই তবে সে দুর্মুখ এবং দুর্জন ছাড়া আর কিছু নয়।

আছরের নামাযের পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে দেখলাম। ফলমূলের গাছে ঢাকা এলাকা। শান্ত-সুনিবিড় এর পরিবেশ। বেশ কয়েকটি পুকুর রয়েছে এর মধ্যে। চাষ-বাস করার জন্যও বেশ কিছু যমীন রয়েছে। এগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ নিজ হাতে কাজ করে থাকেন। আগামী দিনে সাবলম্বী হয়ে গড়ে ওঠার জন্য।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মোসলেম উদ্দিন সাহেবের সাথে ঢাকায় রওয়ানা হলাম। মনে গেঁথে গেলো মওলানা একজন মুসলমান। তিনি একজন মানবতাবাদী। এ যুগের অন্যতম মুজাদ্দিদ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

www.pathagar.com

লুৎফর রহমান জুলফিকার

নির্ভীক নিঃস্বার্থ ভাসানী ঃ কিছু স্মৃতি

১৯৪০ খৃস্টাব্দে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে কলকাতায় আমার প্রথম দেখা হয়। মওলানা সাহেব তখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় বাংলাদেশের মুসলিম লীগ নেতা জনাব এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে আসাম প্রদেশের 'লাইন প্রথা' ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে কলকাতায় আসেন। আমরা তাঁর আগমন উপলক্ষে তৎকালীন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে এক বিরাট ছাত্র-জনতার মিছিল নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সমবেত হই। কিছুক্ষণের মধ্যে আসাম বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনখানি শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছল। আমরা সবাই মিলে মওলানা সাহেবকে ট্রেনের কামরায় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আমরা খুবই অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলাম, অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম মওলানা সাহেব আসাম থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন তিনি অবশ্যই ঐ তারিখে আসাম এক্সপ্রেস ট্রেনে কলকাতা আসবেন, অথচ তিনি এলেন না—এর কারণ কি? আমরা যখন হতাশ হয়ে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ফিরছি তখন চেয়ে দেখি স্টেশনের বাইরে মওলানা সাহেব মাথায় তালের আঁশের টুপি, মুখভরা কাঁচাপাকা দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গি, পায়ে চটি জুতা এমনি বেশে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে বসে আছেন। মওলানা সাহেবকে পেয়ে মিছিল সহকারে শ্লোগান দিতে দিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে নিয়ে এলাম। সেখানে এসে তিনি আসামের 'লাইন প্রথা' ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ভারত বিভাগের পর

www.pathagar.com

১৯৪৮ খৃস্টাব্দ নভেম্বর মাসে আমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নওজোয়ান' পত্রিকার অফিস কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আমি বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আমার নিজের জেলা বরিশালে চলে আসি। বরিশাল থেকে ঢাকায় এসে সাপ্তাহিক 'নতুন দিন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করি। এ সময় বন্ধুবর শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এখানে যোগাযোগ করি এবং তৎকালের বিপ্লবী কর্মী জনাব শামসুল হকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। এ সময় মওলানা ভাসানী ঢাকায় কারকুন বাড়ী লেনে জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। আমি সেখানে মওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে দেখে খুবই খুশী হন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম-লীগ মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে সৃষ্টি হয়, তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্যে এবং 'নতুন দিন' পত্রিকা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। মওলানা সাহেবের সঙ্গে এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে দীর্ঘদিন আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করি। শেখ মুজিব, শামসুল হক ও অন্যান্য বিপ্লবী কর্মী ও ছাত্র সমাজ আওয়ামী লীগের ব্যানারে দেশের কাজে সংঘবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার বিবেচনায় মওলানা ভাসানী একমাত্র নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব যিনি সরকারের নিকট থেকে কোন সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য অথবা সরকারী পদমর্যাদার লোভে কখনও রাজনীতি করেন নি, তিনি চিরদিনই নিজকে সকল স্বার্থের উর্ধ্বে রেখে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যে নিজকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বহু নেতা দেখেছি, বহু রাজনৈতিক আদর্শের বুলি আওড়াতে শুনেছি, কিন্তু মওলানা সাহেবের মতো এমন জনদরদী-ত্যাগী ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয় কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তিনি কখনও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বা সরকারী গদি দখলের ফন্দি-ফিকির আদৌ করেন নি, তিনি জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে যা বিশ্বাস করতেন, তা তিনি উচ্চকণ্ঠে সর্বদাই ঘোষণা করতেন। তিনি নীতির সাথে কখনও কমপ্রোমাইজ করেন নি। এরকম নির্ভীক ও দৃঢ়চরিত্র নেতৃত্ব মুসলমান সমাজে আর একজন খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মওলানা ভাসানী চিরদিনই বঞ্চিত ও অবহেলিত জনতার মুক্তি আন্দোলন করেছেন—এজন্যে তাঁকে সরকার কর্তৃক বহু

www.pathagar.com

নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। বহুবার তিনি জেলে গিয়েছেন, বন্দী জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু তিনি চিরদিনই শির উন্নত করে চলেছেন। কোন শক্তি'র কাছে কখনো মাথা নোয়ান নি। সরকার তাঁকে দমন করার জন্য নানা রকম ছলচাতুরী ও লোভ-লালসার আশ্রয় নিয়েছেন নানা প্রকার অর্থ-সম্পদের প্ররোচনা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সব কিছুকেই উপেক্ষা করে নিঃস্ব নির্যাতিত জনতার কাতারে থেকে সংগ্রাম করে গেছেন. বৃটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত কোন সরকার তাঁকে বশীভূত করতে পারেন নি। জনতার প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ও তাদের মুক্তি'র জন্য যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, তিনি তার সঙ্গে কখনও বেঈমানী করেন নি। এমনিভাবে যখনি যে সরকারের স্টীমরোলার তাঁর উপর চালানো হয়েছে তাকে তিনি উপেক্ষা করে বেপরোয়াভাবে জনগণের অশেষ কল্যাণ কামনায় এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতো সিংহপুরুষ বাঙালী জাতির ভেতরে খুব কমই দেখা গেছে।

জীবনভর নিজের জীবনের সকল সুখ-শান্তিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি মানুষের মুক্তি'র জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, নিজের সমস্ত ত্যাগ ও সংগ্রামের ভিতর তিনি দেশকে এগিয়ে নিতে সমগ্র শক্তি দেশবাসীর জন্য উজাড় করে দিয়েছেন। এই সিংহ-পুরুষের তেজদীপ্ত বক্তৃতা, আদর্শ ও নীতি-নিষ্ঠা আমাদের চিরদিনের সোনালী সূর্যের পথে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। মওলানা ভাসানী শুধু একজন ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশের সর্বহারা মানুষের মুক্তি'র মহাপ্রতিষ্ঠান। আমরা তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা যদি তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে দেশের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি, তাহলে ভবিষ্যত বংশধরেরা মওলানা ভাসানীর আদর্শের নিশানকে উঁচু করে কদম কদম এগিয়ে চলবে এবং জাতির জীবনে এক সোনালী সূর্যকে অভিবাদন জানাবে। আমরা বিশ্বাস করি, এ দেশের অগ-ণিত মানুষের জীবনে মওলানা ভাসানীর আদর্শ, প্রেরণা ও সংগ্রাম এক অনুপম সমৃদ্ধি এনে দেবে।

www.pathagar.com

ফকীর আলমগীর

শতাব্দীর দর্পণ

মওলানা ভাসানী ছিলেন মজলুম জনগণের অবিসংবাদিত মহান নেতা। কবি শামসুর রাহমানের সফেদ পাঞ্জাবীর এই শুভ্র পুরুষ ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের সংহতির কণ্ঠস্বর। স্বাধীন বাংলাদেশের শ্যামল স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীনতার অগ্রণী কণ্ঠস্বর। মওলানা ভাসানী ছিলেন আমাদের কাছে একটি বটবৃক্ষের মতো ঝড়-ঝঞ্ঝায়, বিপদ-আপদে দলমত নির্বিশেষে নির্যাতিত দেশবাসী মওলানা ভাসানীরূপী বিশাল অকুতোভয় বটবৃক্ষের বক্ষপুটে আশ্রয় পেয়েছে। তাঁর ছায়ায় ভরসা পেয়েছে সারা জাতি। তিনি ছিলেন ছোট বড় সবারই শক্তি, সাহস, আর প্রেরণার উৎস।

তাঁর জীবন কৃষক শ্রমিকের স্বাধিকার সংগ্রামের শতাব্দীব্যাপী এক আশ্চর্য আলেখ্য। অন্যায়, অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে বহ্নিমান ঘৃণা এবং বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। তিনি ছিলেন আপোষহীনতার প্রতীক। বৃহত্তম অথচ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার, রক্ত-জবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ! যে কোন রাজনৈতিক সংকটে, জাতীয় জীবনের যে কোন সংকটকালে দলীয় সংকীর্ণতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠে এদেশের একজন মাত্র ব্যক্তিত্বই সাহসের সাথে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই মওলানা ভাসানী। দরিদ্র কৃষক সমাজের দুঃখের সাথী ভাসানী অসহায় মানুষকে যুগিয়েছিলেন শক্তি ও সাহস। জাতীয় স্বাধীনতার তিনি ছিলেন বিরাট একটি স্তম্ভ।

তাঁর ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চের কিংবা জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেই যে হুংকার ছেড়েছিলেন, 'ওরা কেউ আসেনি' বলে সেই স্মরণীয় ঘটনা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। এই শতাব্দী-কালের দর্পণ মজলুম নেতা আমাদের ছেড়ে চলে যান ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর। ৯৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ক্ষতি

www.pathagar.com

কোনদিন পূরণ হবে না। আজ প্রতি মুহূর্তে তাঁর অভাব, তাঁর শূন্যতা সংগ্রামী মানুষ উপলব্ধি করছে। 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ দেয় না।' তেমনি যারা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিরোধিতা করেছে তারাও আজ তাঁর ভীষণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। দলছুট, বিভ্রান্তি, সুবিধাবাদী সর্বোপরি বিশ্বাসঘাতকতা আজ রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন বিরাট নৈরাজ্য আর শূন্যতার সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে বার বার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, ঠিক তখন তাঁর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে সবাই প্রতি নিঃশ্বাসে। তাছাড়া জাতীয় নেতৃত্বের কিংবা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ভাসানীর অভাবে আজ স্বাধীনতা—সার্বভৌমত্বও হুমকীর সম্মুখীন। সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এই অগ্রনায়ক, কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, মুচি, মেথরের একান্ত আপনজন আজ আমাদের মধ্যে নেই বলে অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার মতো আর কেউ রইলো না। মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সৎ, সাহসী ও নির্ভুল নেতৃত্বে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তা বাংলার মানুষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী সাহস ও প্রেরণা জোগাবে।

এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে তাঁকে স্মরণ করবে যেমন স্মরণ করে কিংবদন্তীর পূর্বপুরুষকে যাঁর কাছে হিংস্র ঘাতক নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল। তাঁকে সবাই স্মরণ করবে শ্রমজীবী মানুষের চূড়ান্ত অভিযাত্রার উদ্বেল মিছিলে, শ্রেণী যুদ্ধের অলিন্দে, ইতিহাসের বিচরণের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে। তাঁকে এদেশের বন্যাকবলিত, সংগ্রামক্ষুব্ধ মানুষ স্মরণ করবে ঘনসন্নিবিষ্ট তাম্রলিপির মত শ্যামল-সবুজ বাংলাদেশের জনগণের স্বপক্ষে। তাঁকে স্মরণ করবে সবাই পরম শ্রদ্ধায় এবং জীবন চেতনার আলোকিত উন্মোচনে।

মওলানা ভাসানীর সহজ সরল জীবন যাত্রা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, দলীয় ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে তিনি যে সাধারণ মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা সবার কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে চিরদিন। মওলানা ভাসানী বলতেন, 'দারিদ্রকে শেষ করে দাও, শোষণকে নির্মূল করে দাও। তবেই আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।' তাই একথা আজ বলাই বাহুল্য

www.pathagar.com

যে, দরিদ্রও শেষ হয়নি, শোষণও নির্মূল হয়নি। অতএব মওলানা ভাসানীর প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর সংগ্রামী আদর্শ সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে বার বার। তাইতো সংগ্রাম আর ভাসানী এ দু'টি নাম যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মহাসংগ্রামের ডাক দিয়ে সে সুর আজো ভেসে বেড়ায় বাতাসের ইথারে ইথারে বাংলার মাঠ, ঘাট, প্রান্তরে। ক্ষেতের আলের উপর হুক্কো হাতে বসে থাকা কৃষক কিংবা বৈঠা হাতে নৌকার মাঝি, গাঁয়ের কিষাণ বধু আজো স্মরণ করে তাঁর প্রিয় হুজুরের কথা। আজো গুমরে কেঁদে উঠে তাঁকে স্মরণ করা শত শত সখিনার হৃদয়।

মেঠো সুর বাউলের একতারায় সে কান্না আজও হু হু প্রান্তরে ভেসে বেড়ায়।

ঝড়, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর জলোচ্ছ্বাসের ছন্দে বাঁধা যে দেশের মানুষের জীবন সে দেশের মানুষের কাছে মওলানা ভাসানীর চেয়ে আর কে বেশী আপন হতে পারে? জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকটে তিনি মানুষের পাশে থেকেছেন।

তিনি কখনও নাগরিক চালে আবদ্ধ থাকেন নি। এনা কি বাসসের আগে যিনি পেঁৗছে দিতেন মানুষকে এই বিশাল বাংলার খবর। কোন্ গাঁয়ের কোন্ সখিনা পেটের দায়ে তার ইজ্জত বিক্রি করেছে, কোন্ গাঁয়ের কোন্ রহমত ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে, কোন্ গাঁয়ের কোন্ কৃষক পেটের দায়ে তার সন্তানকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, কোন্ এলাকার লোক জলবন্দী কিংবা কচু গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে আছে এমনি হাজারও খবর আজ যখন সারা দেশব্যাপী এক সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবক্ষয় এবং নৈরাজ্য চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে এই মহান নেতার শূন্যতা সবাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। আজ কে মোছাবে ফিলিস্তিনী ভাইবোনদের চোখের পানি? কে গিয়ে দাঁড়াবে তাদের পাশে? কে হুংকার ছাড়বে তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্য? কে বলবে আজ বানে ভাসা মানুষের কথা? কে মিছিল করবে খরাপীড়িত উত্তর বাংলার মানুষের জন্য? অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে কে আর বলবে 'জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো?' কে বলবে ভূমিহীন কৃষকের জন্য লাঙ্গল যার জমি তার? কে আর বলবে ভোট নামের প্রহসনের পূর্বেই ভাত চাই?

www.pathagar.com

পরনে, লুঙ্গি শাদা পাঞ্জাবী
মুখ ভরা শাদা দাড়ি
যেখানে জুলুম সেখানে কণ্ঠ
গর্জে উঠেছে তারই ॥

খামোশ বলে আর কে গর্জে উঠবে এই জলোচ্ছ্বাসক্ষুব্ধ জনপদে অভাগা মানুষের জন্য ? কে আর সফেদ পাঞ্জাবী গায়ে তর্জনী উঁচিয়ে এশিয়ার বিবেক পাহারা দেবেন ? কে আর সাহসের তরবারী হাতে ছুটবেন দিগ দিগন্তে ?

কে আর সন্তোষের উদাম প্রান্তরে খড়েছাওয়া পর্ণ কুটিরের জায়নামাযে ধ্যানমগ্ন হবেন, আর চাবুক হাতে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর আগ্রাসন-বাদের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়বেন ? কে আর মেঠো মানুষকে খাওয়াবে নৌকা ভরা গরম খিচুড়ি ? কে আর টিয়ার গ্যাস গরম পানি অগ্রাহ্য করে পড়াবে জানাযা শহীদের ? কার ডাকে মানুষ আবার জেলের তালা ভাংগার মতো উন্মাদনায় নৃত্য করবে ?

শিশু-কিশোরদের ভাসানী

মওলানা ভাসানী হুজুর ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর জাতিধর্মবর্ণ নির্বি-শেষে সমস্ত মজলুম জনগণের নেতা। তিনি শুধু যুবক, মধ্যবয়সী কিংবা বৃদ্ধ মানুষের নেতাই ছিলেন না, তিনি শিশু-কিশোরদেরও নেতা ছিলেন। তিনি শিশু-কিশোরদের দারুণ ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, 'ওদের মন কোমল এবং পবিত্র। ওদের মনে কোনরূপ কুটিলতা, পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, মিথ্যাচার স্পর্শ করতে পারে না। ওদের মন দুনিয়ার সমস্ত পাপ পঙ্কিলতার উর্ধ্বে। ওদের মন নীল সমুদ্রের মতো-প্রশান্ত প্রান্তরের মতো উদার, ফুলের মতো সুন্দর, পানির মতো নির্মল।' তাই তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণীর শিশু-কিশোরদের আদর করতেন।

তিনি সব সময় শিশু-কিশোরদের সোহাগ করে কাছে ডাকতেন। খাবার থাকলে তাদের মধ্যে বিতরণ করে, মাথায় হাত বুলিয়ে, আলাদা ধরনের শান্তি পেতেন। শিশু-কিশোরদের মাঝে তিনি এমন আসন করে নিয়েছিলেন সেজন্য তিনি ছিলেন তাদের কাছে 'দাদু ভাসানী'।

www.pathagar.com

শিশু-কিশোরদের মাঝে তিনি বিচরণ করতে পছন্দ করতেন। তাদের জন্য তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'শিশুরাই একদিন বিশ্বমানবমণ্ডলীর ভবিষ্যত স্বপ্নদ্রষ্টা হবে। তাদেরকে তাই আদর স্নেহের মধ্যে দিয়ে আদর্শ চরিত্রবান-রূপে গড়ে তোলা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।'

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণীর শিশুদের ভালোবাসতেন। মজলুম নেতা স্বচক্ষে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তাঁর চোখে অনাথ এতিম শিশুদের দুঃখদুর্দশার ছায়া পড়তো।

হুজুর ১৯৭৬ সালে চিকিৎসার জন্য একবার লণ্ডনে যান। সেখান থেকে চিকিৎসা শেষে প্লেনে উঠতে হঠাৎ করে শিশুদের কথা মনে পড়ায় তাদের জন্য একটি খেলার বলের অর্ডার দেন। তিনি যখন সন্তোষ ফিরলেন তখন শিশুরা 'দাদু ভাসানী' শ্লোগান দিতে দিতে হুজুরকে ঘিরে ধরলো। হুজুর সবার মধ্য থেকে ছোট ছোট শিশুদের কাছে টেনে তাদের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিলেন। হুজুর তাদের মধ্যে লজেন্স, বিস্কুট নিজ হাতে বিতরণ করলেন, তারপর তাদের বললেন, 'এবার তোমাদের জন্য তেমন কিছু আনতে পারি নি। শুধুমাত্র একটি খেলার বল এনেছি। তোমরা শুধু লেখাপড়াই করবে না, নিয়মিত শরীর চর্চাও খেলাধূলা করবে।'

হুজুর বিদ্যালয়ের আঙিনায় কচিকাঁচার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে যেতেন। নানা বিষয়ে আলাপ করতেন, তাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন।

তিনি বলতেন, শিশুরাই একদিন জাতির ভবিষ্যত হবে। তারাই একদিন তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করবে। আজ শিশু-কিশোরদের সেই দাদু ভাসানী নেই। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয় নি। তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদর্শের পথ থেকে একে একে বিদায় নিলেও মজলুম জননেতার প্রয়োজনীয়তা আজ জাতীয় জীবনে সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। এই অবক্ষয়ের মুহূর্তে তাই বলতে ইচ্ছে করছে, শিশু-কিশোর ভাইয়েরা, তোমরা দেখাও সেই রাস্তা। পাপের ধূলায় অন্ধ আমার দুই চোখের পাতা। তবেই কেবল সবার ঘরে ঘরে বস্তি ভিটার পরে হাসি ফুটবে, সুখ আসবে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন মজলুম জনগণের অবিসংবাদিত মহাননেতা। সিংহ-পুরুষ মওলানা ভাসানী ছিলেন শাশ্বত বাংলার বিপ্লবী চেতনার বলিষ্ঠ প্রতিধ্বনি। তিনি ছিলেন অকুতোভয়, আপোষহীন।

www.pathagar.com

প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী নিপীড়কের রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি কোনদিন এই নির্ভীক নেতাকে করতে পারেনি ক্লান্ত, দুর্বল-চিত্ত। জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষার প্রসারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অক্লান্ত। বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীনতার তিনি ছিলেন অগ্রণী কণ্ঠস্বর। মওলানা ভাসানী চিরঞ্জীব, নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ে তাঁর আসন চিরঅম্লান। ভাসানচরের অগ্নিগিরি শতাব্দীর দর্পণ মওলানা ভাসানী তাই আজও আছেন লড়াইয়ের ময়দানে। মুক্তির সন্ধানে।

লোকান্তরিত মওলানা ভাসানী শাশ্বত ভবিষ্যতের জন্য লোক অন্তরে ঠাঁই নিয়েছেন। মৃত্যু জীবনের পাশাপাশি এক দ্বান্দ্বিক চিরসত্য। তাই অন্য সব মানুষের মতই ভাসানী ছিলেন মরণশীল। এতদ্‌সত্বেও তাঁর মৃত্যু এক মহীয়ান মৃত্যু। মরেও তিনি অমর। লোকান্তরিত হয়েও লোক অন্তরে তাঁর আসন চিরঅম্লান থাকবে। ইতিহাসে খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য ঘটে। সংগ্রামী এই মহানায়কের জীবনাসনের মধ্যে আজ নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে অতীত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা। সেই কাছালং, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, ধুবরী, কাছাড়, আর ভাসানচর থেকে যমুনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের চড়াই উৎরাই, সেই অমূল্য জীবনকাহিনী আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। এক সময় গাফফার চৌধুরী লিখেছিলেন, 'দেখি তিনি মানুষের সকলের এমন কি আমাদেরও আশা / নক্ষত্র সংঘের মতো মানুষের জামাতে জামাতে / দেখি তিনি রাখি হাতে/আমাদের মিলিত সংগ্রাম / মওলানা ভাসানীর নাম।' জাতীয় প্রয়োজনে, সংকট উত্তরণে আমাদের মিলিত সংগ্রামের নাম মওলানা ভাসানী। অন্য সময় তিনি থাকেন উপেক্ষিত। মওলানা ভাসানীর কর্মময় জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সেদিন রচিত হবে, যেদিন অনেক অপ্রকাশিত কথা প্রকাশিত হবে। শুধু সেদিনই সম্ভব তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন। নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহের একটি মানুষ কেমন করে কোটি কোটি মানুষের জীবনে আশার আলো দেখিয়েছেন, মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন তার মূল্যায়ন এখন সম্ভব নয়। মওলানা শুধু জানতেন তাঁর ঐ সফেদ পাঞ্জাবী দিয়ে গোটা দেশ ঢেকে দিতে। আর এ কারণেই লক্ষ-কোটি হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো খচিত হয়ে থাকবে মজলুম জননেতা সর্বহারার নয়নমণি মওলানা ভাসানীর নাম। পরিশেষে কিছু স্মৃতি কথা দিয়ে আমি এই নিবন্ধ শেষ করতে চাই।

www.pathagar.com

আমি ফরিদপুরের কোন এক গ্রাম থেকে ১৯৬৬ সনে প্রবেশিকা পাশ করে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হই।

ছোট কাল থেকেই এই দুঃখী মানুষের দরদী নেতার কথা যতটুকুই জেনেছি তাতেই তাঁর প্রতি ভীষণ আগ্রহ জন্মে। আমাদের অঞ্চলে তখন কৃষক সমিতির একজন সাচ্চা কর্মী ছিলেন জনাব জাফর মীর। সম্পর্কে তিনি আমার মামা হন। তিনিই প্রথম আমাকে মওলানা ভাসানীর এই আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করান। তারপর স্বাভাবিকভাবেই আমি ছাত্র রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী সমর্থিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপে যোগ দেই। তারপর থেকে বহু মিছিল আর জনসভায় এই মজলুম জননেতাকে আমি দেখি। প্রথম দেখি আমি তাঁকে পল্টন ময়দানে, তারপর কাপ্তান বাজার ন্যাপ অফিসে। সেই টিপু সুলতান রোডে এডভোকেট জলিল সাহেবের বাসায় কিংবা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে তাঁকে বহুবার দেখেছি। তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি বহুবার--বেতের টুপি মাথায় একজন দরবেশ গরীবের জন্য কত কথা বলতেন তাও শুনেছি কাছ থেকে।

আজ মনে পড়ে সেই শাহ্‌পুর কৃষক সম্মেলনের কথা। লাল টুপি মাথায় দিয়ে হাজার হাজার ছাত্রদের সঙ্গে আমি সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম।

মনে পড়ে সন্তোষের কৃষক সম্মেলনের কথা, যেখানে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কানিজ ফাতেমা, সি. আর. আসলাম, গারদেজীসহ বহু ন্যাপ নেতা যোগ দিয়েছিলেন, নৌকায় নৌকায় খিচুড়ী পাক হয়েছিল। মুর্শিদ মওলানার কাছে কত রঙ বেরঙের মিছিল এসেছিল! আধ্যাত্মিক মওলানার কাছে কতজন এসেছিল রোগ থেকে মুক্তির জন্য পানি হাতে! তাদের বিশ্বাস হুজুর ফুঁ দিলেই তাদের রোগ ভালো হয়ে যাবে। কত মিছিল এসেছিল বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে! লাল নিশান সজ্জিত কত মিছিল নৃত্য করতে করতে সন্তোষের কৃষক সম্মেলন ময়দান আনন্দমুখর করে তুলেছিল! লাঠি খেলা, কবির লড়াই আরও অনেক কথা আজ মনে পড়ে।

মওলানা ভাসানী প্রায় শতবর্ষের দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। আমার দেখা মওলানার জীবনও কম দীর্ঘ নয়। তাঁর কথা-আলোচনা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনার কথা যা শুনেছি এবং দেখেছি সব কিছু সম্পূর্ণ বলা

www.pathagar.com

একেবারে দুঃসাধ্য। কত স্মৃতি কত ঘটনা ভিড় করে আসে মওলানার কথা মনে উঠলে।

একবার উত্তর শাজাহানপুরে ঐ এলাকার ছেলেদের নিয়ে রাতে মওলানা ভাসানীর বাণী দেয়ালে দেয়ালে লিখছিলাম। কিন্তু এলাকার মুরব্বীরা আমাদের চোর ডাকাত বলে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু সকাল হতেই তারা যখন দেখালো আমরা মজলুম জননেতার সংগ্রামের বাণী দেয়ালে দেয়ালে লিখে দিয়েছি তখন তারা আমাদের কাজের জন্য অভিনন্দন জানান, এমন কি উত্তর শাজাহানপুরের মীর সাহেবের সুবিশাল ছাদে মজলুম নেতার উপস্থিতিতে এক বিরাট কর্মীসভাও অনুষ্ঠিত হয় কয়েক দিনের মধ্যে। আড্ডাবাজ বখাটে কত ছেলে ভালো হয়ে গিয়েছিল মজলুম নেতার আগমনের পর! উত্তর শাহাজাহানপুরের বাসায় বাসায় কৃষক সম্মেলনের লাল টুপি বানানো হতো।

সত্যিই, বিশাল বিস্তৃত জীবনের মওলানা ভাসানীকে যতটুকু দেখেছি তা সুশৃংখলভাবে গুছিয়ে বলাটাও কঠিন।

'৭২ সালের শেষ ভাগ। মওলানা ভাসানী সভা করলেন পল্টন ময়দানে। সেখানেই তিনি জাতির সামনে তাঁর দিক-নির্দেশনা তুলে ধরলেন। আজও মনে পড়ে ভাসানীর নির্দেশে '৬৪ সালে পাকিস্তানের সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র সপক্ষে আমরা আমাদের অঞ্চলে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম! আর একবার আমাদের ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠান শেষে সন্তোষে গিয়েছিলাম হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—তিনি আমাদের টাঙ্গাইল থেকে চম্‌চম্‌ এনে আপ্যায়ন করেছিলেন। সস্নেহে তারপর বলেছিলেন অনেক কথা। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা গণসঙ্গীত করো ধানমণ্ডি, গুলশানের শিক্ষিত লোকদের জন্য। তার ভাষা ও সুর দুর্বোধ্য। তোমরা তো রূপবান যাত্রা দেখেছো—তোমরা অমনি যাত্রার মাধ্যমে গরীব দুঃখীর কাহিনী তুলে ধরতে পারো না?

যাহোক মওলানা ভাসানীকে দেখেছি লালদীঘি ময়দানে, দেখেছি পল্টনে, দেখেছি সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে। তিনি বারবার ভাটির মানুষকে ডাক দিয়েছেন উজানে। আজও মনে পড়ে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে গ্রামবাংলা সফর করে মজলুম নেতা অনশন করেছিলেন মতিঝিলে। তখন তাঁকে সেবা করার সুযোগ হয়েছিল। শেখ মুজিবর রহমান

www.pathagar.com

তাঁকে অনশন ভঙ্গ করাতে এলে তিনি তাঁকে গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরতে ধরতে ক্লান্ত দেহে বার বার বলছিলেনঃ 'কচু, ঘেচু, অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে বাংলার মানুষ দিনাতিপাত করছে আর তোমরা মসনদে বসে তাদের কথা ভুলে গেছো।'

মওলানা ভাসানী সেদিন তাঁর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন নি। দেশের গণতান্ত্রিক নেতাদের দুর্বার আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিতে সেদিন অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। আর একবার ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে হুজুর আওয়ামী বাকশালীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। বঙ্গভবনে পিতৃতুল্য হুজুরকে আপ্যায়ন করে কাগজে ছবি ছাপিয়ে মওলানা ভাসানীকে ছোট করার প্রয়াস করেছিলেন। জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তাঁরাই নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ফারাক্কা মিছিলের মতো ঐতিহাসিক মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। সে মিছিল বাংলাদেশ নামক জনপদে মাইল স্টোন হয়ে থাকবে।

হুজুর আমাদের শোকের অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ১৯৭৬ সনের ১৭ই নভেম্বরে ইন্তিকাল করেন। আমার মনে আছে সেদিন পুরানো ঢাকায় ছিলাম। হঠাৎ রেডিও, টেলিভিশনে খবরটি শুনে দ্রুত মেডিক্যাল কলেজের বারান্দায় ছুটে এলাম। যাদু ভাই, জাফর ভাই, মেনন ভাইসহ অনেকে তাঁর লাশের পাশে, অসংখ্য ভক্ত গুণগ্রাহী সুশৃংখলভাবে লাইন দিয়ে তাঁকে শেষ বারের মতো দেখছে। প্রেসিডেন্ট সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। সারা রাত সেখানে দোয়াদরূদ পড়া হচ্ছিল। আমি তখন থাকতাম শহীদুল্লাহ্ হলে, বেশ রাত পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম আর সবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গে। পরের দিন সকালে লাশ জাতীয় পতাকা শোভিত করে শাপলা ফুলে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল টি. এস. সি.তে আর হাজার হাজার মানুষ লাইন দিয়ে শেষবারের মতো তাঁকে দেখছিল। বিভিন্ন দূতাবাস, বাইরের খেলোয়াড় দল, বিভিন্ন দেশের নাগরিক, সর্ব স্তরের মানুষ তাঁর প্রতি শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। সেদিনের সেই শৃংখলাবোধের কথা ঢাকার মানুষের অনেক দিন স্মরণ থাকবে। তাঁর জানাযা হয়েছিল সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সে জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তারপর তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর প্রিয় সন্তোষের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত করে রাখা হলো।

www.pathagar.com

আবদুল খালেক সিদ্দিকী

মওলানা ভাসানী ঃ আমার দাদা হুজুর

লাখো পরিবারের অগণিত শিশুদের মতই আমার শিশুমনকে দাদা হুজুর যাদু করেছিলেন—তাঁর আদর সোহাগ দিয়ে, কামেল মুর্শেদ হিসেবে তাঁর কামিলয়াতের অলৌকিক নিদর্শনাবলী দিয়ে, তত্ত্ব-তথ্যবহুল জ্ঞানগর্ভ ও রসমিশ্রিত অনর্গল কথা বলে আর অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে হাজার হাজার মানুষের নাম-ধাম গোষ্ঠীগত সূত্র-পরিচয় নির্ভুলভাবে গল্পের মতই বলে দিয়ে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বড়দের কাছে ছিলেন—রাজনৈতিক অভিভাবক, ধর্মীয় নেতা, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষক-দার্শনিক, নিপীড়িত জননেতা, দুর্নীতি ও শোষক উচ্ছেদের মহানায়ক, লক্ষ লক্ষ পরিবারের কর্তাব্যক্তি আর ছোটদের দাদা হুজুর।

তিনি ছিলেন আমারও দাদা হুজুর। তাঁর টাঙ্গাইল কেন্দ্রিক কর্মজীবনকে ঘিরে ধন্য হয়েছিল এক ঝাঁক উৎসর্গকৃত পরিবার। দাদা হুজুরের ভক্তগণের মধ্যে পশ্চিম টাঙ্গাইলের নেতৃত্ব দিতেন—তোরাফ ফকির, আদর আলী হাজী, ময়েজউদ্দিন ফকির, কছিম উদ্দিন দেওয়ান; কাগমারী-সন্তোষের শমশের সরকার, হাজী আশেক আলী, রুস্তম আলী ফকির, খাদেম আলী সরকার, মোছলেম সরকার; পূর্ব টাঙ্গাইলের নেতৃত্ব দিতেন মোহাম্মদ হোসেনের বাবা মোঃ মাঈনউদ্দিন আর উত্তর টাঙ্গাইলের নেতৃত্ব দিতেন আমার বাবা মকবুল হোসেন সিদ্দিকী, ইনছান আলী সরকার, আবদুল মালেক ফকির ও জোনাব আলী ফকির।

পঞ্চাশ দশকের কোন এক জোছনাস্নাত সন্ধ্যায় একটি ডিঙ্গি নৌকা এসে ভিড়ল আমাদের বাড়ীর ঘাটে। সাথে সাথেই শুধু আমাদের বাড়ী বা গ্রাম নয়, গোটা এলাকার লোকের জন্য রাতটি হয়ে গেল কর্মব্যস্ত দিনের মত। হাজারো মানুষের ভীড় জমে গেল। কোথা থেকে এত নর-নারী এসে ভীড় জমালো, কে তাঁদেরকে খবর দিল, আমি বলতে পারব না। দাদী

www.pathagar.com

আমাকে কোলে করে ঘাটে নিয়ে দেখালেন—আর বলেছিলেন, 'উনি তোমার দাদা হুজুর।' কল্পনার দাদা হুজুরকে প্রথম দেখলাম স্বচক্ষে। ডিঙ্গি নৌকার ছৈয়ের ভেতর তসবীহ হাতে জোড় আসনে বসে আছেন দাদা হুজুর মওলানা ভাসানী। মুখভর্তি লম্বা দাড়ি, পরনে লম্বা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী, সাদা লুংগী আর মাথায় একটা টোনা। দাদী বললেন, 'ওটা টোনা নয়—তালের আঁশের টুপি।' অগণিত মানুষ আসছে—ভীড় জমে উঠছে। কেউ আসছে মুর্শেদের হাত-কদমবুছা দিয়ে সুরত মোবারক দর্শন করে—প্রাণস্পর্শী আদরের দু'একটা কথা শুন্‌তে, কেউ কেউ আসছে কাঁচা হলুদ, আনারসের সাদা ডগাপাতা, কলার সাদা ডগাপাতা অথবা লকলকে দুর্ব্বাঘাস নিয়ে, অনেক লোক আসছে শিশি, বোতল, ঘটি, গেলাস বা কলসী ভরা পানি নিয়ে। হুজুরের মুখের সামনে ধরছে এসব একে একে আর হুজুর তাতে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছেন। কেউ আসছে জটিল রোগে কংকালসার ছেলেমেয়ে অথবা বাপ বা মাকে কোলে বা কাঁধে করে—হুজুর একটু হাত বুলাচ্ছেন, ফুঁ দিচ্ছেন এবং কি খাওয়াতে হবে বা কিভাবে চলতে হবে বলে দিচ্ছেন। কেউ আসছে সুস্থ-সবল-সুন্দর ছেলে বা মেয়ে অথবা পিতা বা মাতাকে সাথে করে---হুজুরকে সালাম বা কদমবুসি দিতেই তিনি অবলীলাক্রমে নামটি ধরে বলছেন, 'কিরে করম আলী, ভাল হয়ে গেছিস ? বিয়ে করেছিস ? ছেলের নাম কি রেখেছিস ?'

'জ্বী হুজুর, আপনার ওসীলায় জীবন ফিরে পেয়ে সংসার করছি—ছেলের নাম আজো রাখি নি, আপনি রেখে দিন।'

কেউ এসে বলছে, 'হুজুর, জমিদারের লাঠিয়ালরা আমার জমির শস্য, গরুবাছুর সব নিয়ে গেছে।' কেউ বলতো, 'হুজুর, মহাজনের গুণ্ডারা আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে—এই দেখুন হুজুর আমাকে তিন দিন রেখে কি মারটাই না মেরেছ।' মুহূর্তে হুজুরের ভাবমূর্তি ক্ষুধিত সিংহের মত হয়ে পাথর মূর্তির আকার ধারণ করত। মনে হতো সকলের দুঃখ, জ্বালা, বিষ সব তিনি যেন নিজে শুষে নিয়ে তাদেরকে দিতেন সান্ত্বনার দীর্ঘ নিশ্বাস আর তিনি মনে মনে ভাবতেন ঃ জমিদার-মহাজনেরা, তোমরা চরমে উঠেছ। তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে !

দাদীর কোল থেকে বাবার কোল হয়ে কখন থেকে যে হুজুরের কোলের কাছে বসে রয়েছি জানি না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি

www.pathagar.com

দাদীর বিছানায়। দাদীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার দাদা হুজুর কোথায়? তাঁর ডিঙ্গি কোথায়?'

'ফযরের আগেই চলে গেছেন, তুমি তখন ঘুমিয়েছিলে।' প্রথম দেখার এই দাদা হুজুরটির কোন স্মৃতিই কি ভুলবার মতো?

বাবা গল্প করতেন খুব কম। হয়তো বা এলাকার নেতা ছিলেন বলেই তাঁর ভারিক্কি বজায় রাখার জন্যে। দাদা হুজুরের গল্প বলতেন মালেক ফকির, মুইছা ফকির, ইন্‌ছান সরকার, নেছের ফকির ও নূরু ফকির। একদিন বলতে থাকলেন, 'দাদা হুজুর আসাম থেকে নদীপথে সিরাজগঞ্জ হয়ে চাড়াবাড়ী এসে পৌঁছলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পীর শাহ্‌জামান (র.)-এর মাযার যিয়ারত করা। চাড়াবাড়ী থেকে কাগমারী পর্যন্ত কাঁচা সড়ক পথ, কিন্তু কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। রাস্তার শেষের দিকে অতি প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার বাড়ী ছিল। জমিদার বাড়ীর এক অংশকে বলা হতো 'ছয় আনী জমিদার'; আরেক অংশ 'পাঁচ আনী জমিদার'। মুসলমানবিদ্বেষী এই জমিদাররা মুসলমানদের সংগে নির্মম আচরণ করত। তাদেরকে অতি নিঁচু ও ম্লেচ্ছ জাতিরূপেই ভাবত। মুসলমানেরা যাতে উন্নত শিরে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তাদেরকে ব্যবহার করত তাদের অনুগ্রহে আশ্রিত চাষাকুল হিসাবে। পাঁচ আনী—ছয় আনী জমিদারের কোনো জমিখণ্ডের উপর প্রজারা গো-জবেহ্ করতে পারত না—এমন কি কোন জমিতে এক ফোঁটা গো-রক্ত পড়েছে খবর জানতে পারলে জমিদাররা কঠিনতম শাস্তি দিতেন। অথচ এই গরুর গোবর দিয়ে পাক পবিত্র না হলে তাদের খাওয়া ও ধর্মচর্চা সম্পন্ন হতো না।

জমিদার বাড়ীর বহির্ভাগ দিয়েই টাঙ্গাইল চাড়াবাড়ী রাস্তাটি। জমিদারদের কড়া নির্দেশ ছিল জমিদার বাড়ীর এলাকায় কোন মুসলমান জুতা পায়ে বা ছাতা মাথার উপর দিয়ে অথবা ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতে পারবে না। দাদা হুজুরের কাগমারী যাওয়ার জন্য ভক্তবৃন্দ সুন্দর একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করল। দাদা হুজুর হযরত শাহ্‌জামান (র.)-এর মাযারের দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি পায়ে জুতা, মাথায় টুপি ও ছাতা ধরে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন আর ভক্তরা ঘোড়া পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে। জমিদার বাড়ীর সীমানার কাছাকাছি যেতেই জমিদারের গলার স্বর গর্জে উঠলো, সে তার লাঠিয়াল প্রধানকে ডেকে বললো,

www.pathagar.com

'সর্দার! যবনে ছায়া ঠেকেছে আমার সীমানায় আর তুই নাকি ব্যাটা ঝিমুচ্ছিস?'

'জী কর্তা, তাইতো! এতো শুধু যবন নয় কর্তা, যবনতম—পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা ও টুপি; তার উপর আবার ঘোড়ায় চড়ে—এ যে তিন চারটে যবনের অপরাধ একাই করছে—বলেই রে-রে-রে বলে দৌড়ে এসে দাদা হুজুরের পথ রোধ করে দাঁড়ালো সিংহের মত গর্জন করে উঠে। দাদা হুজুরের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে মাথা নীচু করে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে মিনতির সুরে বলল, 'হুজুর, আমাদের জীবন রক্ষার জন্যই দয়া করে জুতা খুলে, ছাতা নামিয়ে, ঘোড়া ছেড়ে জমিদার বাড়ীর সীমানাটুকু হেঁটে যান।' সর্দারের মিনতির প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং নাজুক অবস্থায় মুখোমুখি না হয়ে বরং ধৈর্য ধারণ করে একটু ঘুরে অন্য পথে কাগমারী রওয়ানা দিলেন। সখেদে ছোট্ট মন্তব্য করলেন, 'জমিদার—আমি যবন (তোমাদের ভাষায়) আজ ঘুরে গেলাম—দ্বিতীয় বার যেদিন আমি আসব তোমাদের ঐ প্রসাদের বেদীমূলে আমার ভক্তবৃন্দ নিয়ে গরু জবাই করে রাব্বুল আলামীনের নামে শিরনি করে খাওয়াব আর তোমাদের প্রাসাদের চূড়ায় বেগুন গাছ বুনে সেই বেগুনের ভর্তা দিয়ে আমার প্রিয়জনদের নিয়ে আমি ভাত খাব ইন্‌শাল্লাহ—জেনে রেখো সেদিন খুব দূরে নয়।'

দাদা হুজুর সত্যিই তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন—প্রথম দিন তিনি উনিশটি গরু জবাই করে শিরনি করেছিলেন এবং এক মাসের মধ্যেই নিজ হাতে উৎপাদিত বেগুনের ভর্তা দিয়ে ভাতও খেয়েছিলেন।

হেমন্তের এক সন্ধ্যা রাতে বাবা তাঁর দলবল নিয়ে সন্তোষ থেকে ফিরলেন। শ'দেড়েক ভক্ত নিয়ে আগের দিন তাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মুর্শেদের কাছে। সেখানে সারা দিন জমিদার বাড়ীতে বেগুন ক্ষেত বানানোর দৈহিক কাজে এবং রাতে মুর্শেদের একান্ত পরশে থেকে তাঁর সেবা-যত্ন করে মুর্শিদী-মারেফাতী গানের আসর জমিয়ে আর এসবের মধ্যে দিয়ে ফানা-এ শেখ, ফানা-এ রসুল (স.) ইত্যাদিতে বিভোর থেকে—প্রিয়তমকে ছেড়ে বাড়ী যাওয়ার বিরহে অশ্রুসিক্ত চোখমুখ রাংগা করে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে—কেউ কেউ যার যার বাড়ী চলে গেছেন। বাদবাকী যাদের নেশার ঘোর তখনও কাটেনি তারা জন তিরিশেক বাবার সাথে সাথে আমাদের

www.pathagar.com

বাড়ীর দাওয়ায় খড় পেতে বসে পড়লেন। তাদের জন্য পান, তামাক ও ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে বলেই বাবা ঘরে চলে গেলেন। আমাদের দাওয়া মুখর হয়ে উঠলো—আরো লোক এসে জমা হতে লাগলো। কেউ বলছেন ঃ জমিদার বাড়ীর অনেক দিনের অনাবাদী জমিতে ফসল হবে প্রচুর—কেউ বলছেন ঃ বহুদিন পর মুর্শেদের আদেশ পালন করতে পেরে ও চেহারা মোবারক দেখে প্রাণটা প্রশান্তিতে ভরে গেছে—কেউ বলছেন আহ্! এমন বড় নেতা, এমন জনদরদী আর এত বড় কামেল মুর্শেদ আমরা ভাগ্যের গুণেই পেয়েছি! একজন ফোঁস করে উঠে বললেন, 'আজ থেকে দিনের হিসেব রাখতে হবে—আগামী ১৫ তারিখের (আনুমানিক) শেষ রাতে হুজুর কচুর পাতার উপর দিয়ে সাইকেল চালাবেন এবং ঐ দিন ভোরে সকল কচি কচুর পাতার উপর দিয়ে দুই দিকে দুইটি সাইকেল চলার দাগ দেখা যাবে।' কথার ভীড়ের মাঝেও এ কথাগুলো আমার শ্রবণেন্দ্রিয় ভেদ করে প্রাণে গিয়ে শিহরণ জাগালো। তিনি বলতে থাকলেন, 'এবার বুঝবে, যে ব্যাটারা আমার মুর্শেদের কামেলিয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো তোমরা সবাই ঐদিন কচুর পাতা দেখবে এবং যারা আমাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরকে কচুর পাতার দাগ দেখাবে।' কাজেই আমারও বুকটা সাহসে ও ভরসায় প্রস্তুত হয়ে উঠলো।

দিন যায় ক্ষণ বয়ে যায়—প্রতিটি ভোরে উঠেই বাড়ীর বাইরে ঝোঁপটির পাশে বুনো কচুবনের দিকে তাকাই। সাথে কচুপাতার উপর সাইকেলের চাকার দাগের বদলে দাদা হুজুরের তসবিরটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রতীক্ষিত ভোরের পূর্ব রাতটি যেন ভীষণ বড় হয়ে গেছে—বার বার দাদীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস করি ঃ রাত কত হল? ভোর হতে আর কতক্ষণ বাকী? ভোরে কচুপাতায় দাদা হুজুরের সাইকেলের দাগটি দেখতে পাবো তো? পেতে আমাকে হবেই—নইলে নিন্দুকদের মুখে চুনকালি পড়বে না বরং আমিই যে আর তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। এমনি কত ভাবনায় ভোর হয়ে গেল—মোরগের ডাক শুনেই দরজা খুলেও ভয়ে থেমে গেলাম—পূব আকাশ ফরসা হয়ে যাওয়া মাত্রই এক দৌড়ে কচুবনে গিয়ে কচুপাতায় দাদা হুজুরের তস্বীরের বদলে সাইকেলের চাকার দাগ দেখে—আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাত দুটো বুকে রেখে চোখ দুটো বুজে দাদা হুজুরের চেহারা ধ্যান করে দেখি—তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসছেন। যৌবনে জেনেছি, এই ধ্যানকে তসব্বরে শেখ বলা হয়। ধ্যান কেটে গেলেই

www.pathagar.com

স্বেচ্ছায় মুখ থেকে উচ্চৈঃস্বরে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহু আকবার—দাদা হুজুর জিন্দাবাদ। তাকিয়ে দেখি পতংগের মত সবাই ছুটে আসছে, মুহূর্তে এলাকাটি মুখরিত হয়ে উঠলো—আল্লাহু আকবার, মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ ধ্বনিতে।

টাঙ্গাইলের তিন মাইল পশ্চিমে বিন্যাফৈর, একটি অবহেলিত গ্রাম। দাদা হুজুরের তৃতীয় অবস্থানস্থল। ক'দিনের মধ্যেই অবহেলিত গ্রামটি দাদা হুজুরের পদধূলিতে ধন্য হয়ে শহরের চাইতেও বেশী আলোকিত ও আলোড়িত হয়ে উঠলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এলাকার ছেলে-মেয়েরা সুলভ শিক্ষার আলো পেতে থাকলো। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার সরগরম হয়ে উঠলো। নিভৃত গ্রামটির নাম দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। এ সময় দাদা হুজুরের রাজনৈতিক অংগনে খুব বড় রকমের আলোড়ন চলছিল। হঠাৎ করেই তিনি বাবাকে ডেকে বললেন, 'মকবুল, একটা ঘোড়া নিয়ে আয়। তোদের ছোট বাশালিয়া যাব।' সংগে সংগেই ছুটাছুটি পড়ে গেল। কয়েক বাড়ী দূর থেকে ঘোড়া নিয়ে এসে দেখি দাদা হুজুর রওয়ানা হয়ে গেছেন। ঘোড়ার লাগাম ধরে কয়েকজন দ্রুত বেগে ছুটলাম। সন্ধ্যা রাতের আবছা জোছনায় পথ চলা খুবই কষ্টকর, তার উপর গায়ে পায়ে চলার আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পথ। মাঠ পাড়ি দিয়ে শস্য ক্ষেতের আলপথ, ঐ দূরে ছায়ার মত দেখা যায়—আরো জোরে চলি—এই বুঝি দাদা হুজুরকে পেয়ে গেলাম। কিন্তু না, পরের গ্রামের রাস্তায় অপেক্ষমান পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, তারা হুজুর কেন, কোন মানুষ জন যেতে দেখে নি, তবে একটি ডুলি (পালকি) যেতে দেখেছে। ঘোড়াকে বিদায় দিয়ে আরো দ্রুত হাঁটতে থাকি। প্রশস্ত মাঠে নামতেই বহুদূরে সাদা ধবধবে পোশাক পরিহিত একদল লোকের আবছা আভা দেখা যায়। পরের গ্রামের লোকজনদের রাস্তায় ভীড় দেখে জানতে পারি, এই তো হুজুর গেলেন, সাথে সাথে তাদের অনেকেই গেছেন। গ্রামটি ছিল আমাদেরই পাশের গ্রাম। বাড়ীতে পৌঁছে দেখি একদল নারী-পুরুষবেষ্টিত দাদা হুজুর। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছি। দাদীর ডাকে জেগে দেখি দাদা হুজুর চলে গেছেন। রাতের ঘটনা মনের মধ্যে দোল খাচ্ছিল। বিকেলে দেখি বাবা বিন্যাফৈর থেকে ফিরলেন, সাথে মূসা ঠ্যাটা। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র সাথে তর্ক করতেন, সেই হিসেবে তুলনা করে লোকে মূসাকে মূসা ঠ্যাটা বলত। কারণ তিনিও দাদা হুজুরের সাথে বেয়াদবী না করে তর্ক করতেন। মূসা ভাইকে দাদা হুজুরের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলা

www.pathagar.com

শুরু করলেন, 'শেষ রাতে হুজুরকে বিন্যাফৈরে পৌঁছে দিতে গেলাম আমরা ক'জন। এবারে তিনি চললেন ভিন্ন পথে। এক মাইল পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী, তিনি সেদিকে গেলেন, মনে হল নদীর ধার দিয়ে যাবেন। কিন্তু নদীর তীরে পৌঁছেই দেখলাম একটি ডিঙ্গি নৌকা। আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে নৌকার ছৈয়ের ভেতরে গেলেন। ভাবলাম, হয়তো বা তাহাজ্জদের নামায পড়তে গেলেন। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও তিনি ফিরছেন না দেখে দুশ্চিন্তায় নৌকার ভেতরে গিয়ে দেখি হুজুর নেই। কেউ বলছেন, 'হায় হায় কি হল!' হুজুরের প্রতি যাদের দৃঢ় আস্থা ছিল, তাঁরা বললেন, 'হুজুর চলে গেছেন। চলুন আমরা ঘরে যাই।' মূসা বললেন, 'আমি দেখেই ছাড়ব। আমাকে ফাঁকি দিয়ে উনি কোথায় গেছেন?' বাবাকে নিয়ে তিনি বিন্যাফৈর গিয়ে দেখেন, হুজুর অতি গোপনে দু'জন লোকের সাথে উর্দূতে কথা বলছেন। তাঁদের সাথে কথা শেষ করেই হুজুর বিন্যাফৈর-এর অদূরে ধলেশ্বরী নদীতে এক ডিঙ্গি নৌকায় করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মূসা ভাই বিন্যাফৈরের লোকদের কাছে জানতে পেরেছিলেন সন্ধ্যা রাতে কাটা পোশাকধারী লোক এসে ফিরে গেছে আর শেষ রাতে পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন। গল্প শুনতে শুনতে আর ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ যে পাথরের মত থ হয়েছিলাম আজ আর স্মরণ করতে পারছি না।

পাট নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন তখন তুংগে। হক-ভাসানী শ্লোগান তখন এ দেশের আপামর জনসাধারণের কণ্ঠস্বর। টাঙ্গাইল পার্কে জনসভা হবে। হুজুর নির্দেশ দিয়েছেন, হাটে হাটে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার জন্যে। যে ঢুলিরা ঢোল পিটাতো তারা দেশ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রাম্য চৌকিদার দিয়ে এ কাজ চালানো হয়। আদেশ পেয়ে বাবা চৌকিদারকে ডেকে প্রতি হাটে দু'আনা হিসেবে সাত দিনের সাত হাটে মোট চৌদ্দ আনার পয়সা দিয়ে বলে দিলেন, প্রতি দিন হাটে যাওয়ার আগে বাড়ীতে এসে যেন মুড়ি খেয়ে যায় এবং সাথে তদারকীর লোক নিয়ে যায়।

চৌকিদার হাটে ঢোল পিটায় শুনে হাটের ক্রেতা-লোক হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি ভেঙে পড়ে। সবারই এক প্রশ্ন, কোথায় কবে কি হবে ভাই? চৌকিদার ঢোলের পিটা দেওয়ার ফাঁকে হাঁক ছাড়ছে, 'হক-ভাসানীর জনসভা'—স্থান, তারিখ, দিন, সময় বলে দেয় চৌকিদারের পিছু অনুসরণকারী তদারককারী

www.pathagar.com

দলের ৪/৫ জন লোক। মানুষ উল্লাসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, বিক্রেতা বা দোকানদারেরা দাঁড়িয়ে পড়ে, জিজ্ঞেস করে অন্যদের কাছ থেকে জেনে নেয়। এভাবে চলে আসে প্রতীক্ষিত দিনটির ভোরবেলা। উত্তর টাঙ্গাইল থেকে মানুষের পুরোভাগে বাবা। অতি আবদার ও কান্না-কাটিতে আমাকেও সংগে নিয়েছেন। কখনো হাত ধরে কখনও কারো কোলে বা কাঁধে চড়ে হক-ভাসানী শ্লোগানে শিহরিত হয়ে যাচ্ছি টাঙ্গাইল পার্কের দিকে। মনে হচ্ছিল যেন এক ঝাঁক উত্তেজিত পিপীলিকা, হক-ভাসানী শ্লোগানে পাখা গজিয়ে, প্রজ্জ্বলিত আলোকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। টাঙ্গাইল টাউনের সীমানায় এসেই দেখলাম প্রতিটি রাস্তা মিছিলে শ্লোগানে মুখরিত, মনে হচ্ছিল উত্তেজিত মানুষের ঢল বুঝি প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেও বোধ-শক্তি ফিরে পাবে না যে পর্যন্ত হক-ভাসানীকে সামনে না পাবে।

পার্কের বিরাট ময়দানের মাঝামাঝি এক পাশে তক্তা দিয়ে উঁচু মাচা করে প্যাণ্ডেল তৈরী করা হয়েছে। বিরাট এক মিছিলের আগে ভাগে দাদা হুজুর এসে প্যাণ্ডেলে উঠলেন। ক্ষণিক পরেই মইয়ের মত এক লাঠিতে বগল ভর দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরা একটি লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভীড়ের মাঝে এগিয়ে আসছেন, প্যাণ্ডেলের কাছাকাছি আসতেই ভাসানী জিন্দাবাদ শ্লোগানটি পরিবর্তিত হয়ে হক-ভাসানী শ্লোগানে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে তুলল। হক সাহেব মঞ্চে উঠেই দাদা হুজুরের সাথে কানে কানে কি যেন বললেন। তারপর স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। বক্তৃতার অর্থ না বুঝলেও এই মুহূর্তে লিখতে গিয়েও স্মৃতিচারণে ঝিমানো রক্ত তাজা হয়ে উঠছে, শরীরের পশম ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের লোকের গুঞ্জন শুনলাম, এজন্যই এই হককে সকলে এশিয়ার অগ্নিপুরুষ বলে। কথাটার সাথে অনুভব করলাম সত্যিই তাঁর মুখ থেকে অগ্নি-স্ফুলিংগই বের হচ্ছে। সর্বশেষে তিনি বললেন, 'আপনারা আমাকে আদর করে ভালবেসে নাকি অগ্নিপুরুষ বলে থাকেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমি অগ্নিপুরুষের বাচ্চা।' পাশে আবার গুঞ্জন শুনলাম তিনি ঠিকই বলেছেন, 'ভাসানী প্রতিষ্ঠিত অগ্নিপুরুষ আর হক সাহেব উদীয়মান অগ্নিপুরুষ।'

আমার শিশু-কিশোর জীবনে দাদা হুজুরের বিরাটত্বের কয়েকটা দিক আজও রক্তিম রেখা হয়ে বিরাজ করছে। যখনই তাঁর দিকে তাকিয়েছি

www.pathagar.com

কেন যেন তন্ময় হয়ে থেকেছি। কতদিন হয় তাঁকে হারিয়েছি, আর আমিও জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে যাই যাই করছি। এখনও মাঝে মাঝে স্মৃতিতে তাঁর মুখোমুখি হচ্ছি—জানি না সত্যি সত্যি একদিন তিনি স্মৃতি থেকেও হারিয়ে যাবেন কি না।

ভক্তদেরকে দল বেঁধে জমিদারী আঙ্গিনার ঝোপ-জংগল পরিষ্কার ক'রে মুর্শীদের দরবার ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কাজে নিয়োজিত ক'রে তিনি কাছেই চেয়ারে বসে বসে গল্প করতেন আর তসবীহ পাঠ করতেন অথবা কোন বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করতেন আর তসবী জপ করতেন; তসবী কখনও মন্থর গতিতে, কখনও বিদ্যুৎগতিতে ঘুরতো। এমন মুহূর্তেও দাদা হুজুর উঠে যেতেন রান্না ঘরে চা অথবা খিচুড়ী রান্না কতদূর হল দেখতে। কথা বলা, কথা শোনা ও একই সাথে তসবী তিলাওয়াত করা দেখে আমার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করতো। তাঁর স্মৃতিশক্তি এতো প্রখর ছিল যে, আলোচিত যে কোন কথা পরবর্তী কোন সময়ে টেপ রেকর্ডারের মত তিনি হুবহু বলে দিতেন।

দাদা হুজুর ঘড়ি ব্যবহার করতেন না। কারো কাছে সময় জিজ্ঞেস করতে শুনি নি কোনদিন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় হিসেব করেন নি কখনও।

একবার হুজুর হক-ভাসানীর নৌকা মার্কার নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আমাদের স্কুলের মধ্যে। সভাটি এলাকাভিত্তিক ও ছোট বিধায় প্যাণ্ডেল করা হয় নি।

টেবিলের পাশে চেয়ারে বসেই তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতই সবাই তা শুনছিল আর যখনই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জোরালো ভাবাবেগের মুহূর্ত আসছিল তখনই 'হক-ভাসানীর নৌকা, জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে ফেটে পড়ছিল। হঠাৎ হুজুর বলে উঠলেন, 'টেবিলটি সরাও।' কারণ বুঝতে না পেরে যন্ত্রচালিতের মতই দু'জনে টেবিলটি সরিয়ে নিতেই আযান দেওয়ার আদেশ দিলেন। সবার অলক্ষ্যে কখন যে বেলা গড়িয়ে আছরের নামাযের সময় হয়ে গেছে কেউ খেয়াল করে নি।

মৌলভী ময়েজউদ্দীন সিদ্দীকীর আযান দেওয়া শেষ হলেই হুজুর তাঁকে নামায পড়াতে বললেন। জবাবে বিনয়ের সুরে জনাব মৌলভী সাহেব বললেন, 'হুজুর, আপনি থাকতে আমি নামায পড়াবো তা হয় না।' হুজুর বললেন, 'দেখ জামাই, আমি মহাদেশীয় নিপীড়িত জনগণের বরেণ্য নেতা-মুর্শীদ তথা

www.pathagar.com

আল্লাহ প্রেমের স্কুলের শিক্ষক-মুর্শীদ মওলানা। কিন্তু নামাযের জামাতের ইমামতি করার জন্য তোমার মত মুর্শীদ ইমাম হতে পারি নি। নামায তুমিই পড়াও।' মৌলভী ময়েজউদ্দিন সিদ্দিকী ছিলেন শরীয়তের একান্ত পাবন্দ লোক। তাঁর জীবন চলার বিশেষত্ব ছিল আমাদের নবী করীম (স.)-এর আদব-আখলাক-এর অনুকরণে, তদুপরি তিনি বেগম রোকেয়ার মত 'ঘর-থেকে প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়'—একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যুৎসাহী হিসাবেও ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন। এলাকার সকলে তাঁকে সিদ্দিকী ও সুফী বলে আখ্যায়িত করতেন। দাদা হুজুরকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। হুজুরও তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন না কখনও। মকবুল হোসেন সিদ্দিকীর ভগ্নিপতি হিসাবে তাঁকে জামাই বলেই ডাকতেন।

গ্রামের সরলমনা ধর্মপরায়ণ মানুষগুলো বছরের প্রথম গাছের ফলটি, প্রথম কেটে আনা ধানের নবান্ন মুন্সীজীকে (জুমু'আর ইমাম) না খাইয়ে নিজেরা খেতো না। দাদা হুজুরের ভক্তবৃন্দরাও আগে তাদের মুর্শিদের মুখে নিজ হাতে তুলে দিত তারপর নিজেরা খেতো। হুজুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এসব দৃশ্য দেখিয়ে বলতেন, 'দেখ, তোমরা আমাকে যত রাজ খাবারই খাওয়াও আর যত শ্রদ্ধাই দেখাও না কেন—এদের এই প্রাণস্পর্শী-মায়াময়ী দরদ আমাকে সত্যিকারেই 'ভক্তের অধীন গুরু' বানিয়ে রেখেছে। তোমরা আমাকে রাজ সিংহাসনের লোভ দেখাও; কিন্তু এদের অন্তরের এই সিংহাসনের কাছে তোমাদেরটা যে কত তুচ্ছ--সে তোমরা বুঝবে না। এ সিংহাসন ইহ ও পরকালের জন্য স্থায়ী সিংহাসন আর তোমাদেরটা সকালে আছে তো বিকালে নেই।'

সভাসমিতি, মিছিল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা শিরনী কোন কাজে হুজুর যখন ভক্তদেরকে ডাকতেন, টেলিফোন বা বিদ্যুৎ সংযোগের মতই এ কান থেকে সে কান করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লাখ লাখ ভক্তদের কানে পৌঁছে যেত। খবর আর খবরটা কানে পৌঁছামাত্রই পানি বিন্দু থেকে ঝরণা সৃষ্টি হয়ে তা শত বাধাবিপত্তিকে ভেঙে-চুরে যেমন সাগরের দিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি সবাই ছুটে যেত তাদের আশ্রয় স্থল মুর্শিদের কাছে। যাবার সময় নিজ নিজ পরিবারের এক ওয়াক্তের চা'ল গামছার আচলে বেঁধে নিয়ে যেত--কেউ নিজের মোরগটা নিয়ে, কেউ দু'চার আনা করে চাঁদা তুলে একটা মোরগ বা খাসী কিনে নিয়ে যেত।

www.pathagar.com

একবার ডাক পড়ল--কাগমারীতে হযরত শাহজামান (র.)-এর মাযারে শিন্নি হবে--পাঁচদিনের জন্য সবাইকে যেতে হবে। এই পাঁচদিনে পনের ওয়াক্ত খেতে হবে কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী এক ওয়াক্তের চা'ল নিতে হবে সাথে করে। বাবার অলক্ষ্যে দলের সাথে সাথে আমিও গেলাম জীবনের প্রথম শিন্নি অনুষ্ঠান দেখতে। সবারই গলায় প্যাচানো গামছার আচলে চা'লের পুটলা ঝুলছে--হাতে রান্না করার বা প্যাণ্ডেল করার হাতিয়ার যার যা ছিল নিয়ে এসেছে। ভক্তি আশীর্বাদ বিনিময়ের পর পূর্ব-দক্ষিণ দিকের চারচালা ছনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হুজুর। মসজিদের সামনের স্থানটায় নিজে হেঁটে হেঁটে চার কোণা করে এলাকা নির্ধারণ করে দিয়ে বললেন, 'এটুকুতে চালা করে বেড়া দিয়ে চা'ল রাখবে।' তিনি একটা চাটাই পেতে সকলের চা'ল সেখানে রাখতে বললেন এবং আরেকটা চাটাই দিয়ে নিজ হাতে তা ঢেকে দিয়ে জনাব শমশের (হুজুরের জামাতা পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব শামসুল হকের বাবা) ও জনাব আতোয়ার হাজীকে এই মালখানার রক্ষণকর্তা নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন, 'সাবধান, শিন্নির শেষে আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ ঢাকনা খুলবে না। এ এলাকায় অন্য কাউকে ঢুকতে দেবে না--ওজু ছাড়া ঢুকবে না, জুতা নিয়ে ঢুকবে না। শুধু একদিকে ঢাকনার এক কোণা তুলে চা'ল বের করবে।' হুজুর স্বগতোক্তি করলেন, 'এক লক্ষ লোক তিন দিন থাকবে, খাবে ; হে আল্লাহ্ পরোয়ারদেগার, তুমি রহমত নাজিল কর।'

আমার কচি বোধ শক্তিতে বিদ্যুতাঘাত লাগল--চা'ল যা জমা হল তাতে এক মণের বেশী হবে বলে মনে হলো না--অথচ হুজুর বলছেন কিনা এক লাখ লোক তিন দিন খাবে।

ধীর গতিতে হুজুর অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকে রাস্তা পার হয়ে চার চালা ছনের ঘরে উত্তর পাশের ক্ষেতটিতে আসলেন। জনাব শমশের সরকার, জনাব আতোয়ার হাজী ও কয়েকজন সহযোগী ছাড়া বাকী সবাই হুজুরকে অনুসরণ করছিলেন। পূর্ব প্রান্তের কয়েক কাঠা জুড়ে এলাকা নির্ধারণ করে দিলেন—রান্নার এলাকা, পাশে খিচুড়ী মজুদ এলাকা—এ দুই এলাকার দায়িত্ব দিলেন মকবুল হোসেন ও মালেক ফকীরের উপর ; সাথে কর্মীবাহিনীতে থাকলেন মুইছা ফকির, মেছের ফকির, ইনসান সরকার, আবদুর রহমান, করমালী ফকির, মাঈন সরকার, মজিদ আলী, নুরু ফকির, বাজালী মুন্সী, একাবর

www.pathagar.com

মুন্সী, জালাল মুন্সী, হাসু সেখ, ইয়াদ আলী এবং আরও বহু নিবেদিত প্রাণ যাঁদের নাম আমার মনে নেই।

হুজুর নির্দেশ দিলেন, '(প্রতি এক মণ চা'ল রান্না করা যায়) একটি ডেগে (ডেকচি) পানি দেবে ভর্তি করে আর পাঁচ সের চা'ল দিয়ে নিয়মমত (মুর্শিদের তসর ধ্যান করে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা) রান্না শুরু করবে। শিন্নি দিয়ে নৌকা ভর্তি করে তা ঢেকে রাখবে এবং ঢাকনা না খুলে একদিক থেকে বিতরণ করবে।' জনাব তোরাফ ফকীরকে নির্দেশ দিলেন চা'নের ছাউনি ও রন্ধনশালার যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করতে আর শিন্নি বিতরণ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে। তাঁর সাথে সহযোগিতায় থাকলেন জনাব মারফত আলী (বর্তমানে হুজুরের কনিষ্ঠ ছেলের শ্বশুর), জনাব রুস্তম আলী, জনাব নূরুল ইসলাম মাস্টার, ময়েজ ফকির, হায়দার ফকির ও মঈনউদ্দিন। সবাই যাঁর যাঁর কাজে লেগে গেলেন।

বাবা আমাকে দেখেও এতক্ষণ কিছু বলেন নি—এবারে ডেকে নিয়ে চললেন চারচালা ছনের ঘরে--শরীরটায় শিহরণ লাগল--শুনেছি হুজুরের পরিবারবর্গ আছেন এখানে (ছোট পক্ষের পরিবার)। তার উপর আবার হুজুরের স্ত্রী জমিদার কন্যা। জমিদারদের গর্বকে খর্ব করার জন্যই নাকি হুজুর 'নেংটি ফকির' (জমিদারদের ভাষায়) হয়েও দু'টি জমিদার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। ভক্তদের দ্বারা নতুন তৈরী করা ঘরে, মাটির এবড়ো থ্যাবড়ো মেঝেটিতে ঢুকেই দেখি হুজুর চাটাইতে বসে মুড়ি-চা খাচ্ছেন। পাশে দাঁড়ানো পাতলা গড়নের দীর্ঘ কায়ায় বীরবেশেনী এক মহিলা—আর ফ্রক প্যান্ট পরা একটি ফুটফুটে মেয়ে, পাজামা-কামিজ পরা সহজ সরল একটি ছেলে। লজ্জায় আমি মাথা নত করলাম। কি দুর্ভাগা আমি আর কি সৌভাগ্য এদের! বাবার নির্দেশে দু'জনকে সালাম করলাম। বাবা বললেন, 'সামনে ওর পরীক্ষা ও চলে যাক।' হুজুর অনুমতি দিলেন আর হুজুরের স্ত্রী আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন—চঞ্চলা মেয়েটি বলল, 'মকবুল ভাই, ও কি আপনার ছেলে? আজ থাক না আমাদের সাথে খেলবে!' আমি চলে এলাম স্কুলে।

তৃতীয় দিন—শিন্নির আসল দিন। ক্লাস শেষে মনটা ছটফট করছিল, পেটের অসুখে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। সবাই কাগমারী যাচ্ছে। আমার লজিং মাস্টার রহম আলী আমাকে সাথে নিয়ে চললেন—সম্ভবত

www.pathagar.com

আমার ওসীলায় বিশেষ আদর-খাতির পাবার জন্যে। রন্ধনশালার পাশে তের-চৌদ্দ হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত পাশ, আড়াই হাত গভীর সাতটি নৌকা এনে রাখা হয়েছে পাশের বিল থেকে। প্রতিটি নৌকা খিচুড়ীতে ভর্তি—চাটাই দিয়ে ঢাকা। নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে ক'জন বালতি-গামলা ভরে দিচ্ছে—একদল খালি পাত্র ফেরত দিয়ে ভর্তিটা নিয়ে যাচ্ছে। লম্বা লাইন করে কলাপাতা নিয়ে লোক খেতে বসেছে—কতটি লাইন বা কতজন লোক তা জানার মত অবস্থা আমার ছিল না--তবে বুঝলাম রান্না যেমন থেমে নেই চলছেই—খাওয়াও তেমনি চলছেই! ভাসমান নৌকার তলা দেখছি কত অপরিষ্কার! কিন্তু এ নৌকা ক'টিকে খুবই পরিষ্কার করা হয়েছে; তথাপিও নৌকার খিচুড়ি খাওয়া যায়! আমার যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। মুইছা ফকির আমাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খালেক, তুমি খেয়েছ?' জবাবে আমি বললাম, 'আমার পেটের অসুখ, খিচুড়ি খেতে পারব না।' তিনি বললেন, 'খিচুড়ি নয় শিন্নি, অসুখ ভাল হবার জন্যেই তো শিন্নি খেতে হয়।' তিনি মাটির সানকি ভর্তি করে আমাকে দিলেন। শিন্নি আর খিচুড়ির পার্থক্য সেদিন বুঝিনি আর বুঝিনি কুপথ্য কি করে ওষুধ বা সুপথ্য হতে পারে। আমাকে খেতে দিয়ে তিনি বললেন, 'দাদা-দাদীরা (হুজুরের ছেলেমেয়ে) তোমাকে খুঁজছিলেন।' একদিকে অসুখের ভয় অপরদিকে—অবজ্ঞা করলে যদি কোন ক্ষতি হয়—এমনিতরো ভাবনাতেও আমি খেলাম। ভাবলাম বুঝি এখান থেকে আর ফিরে যেতে পারব না। মনে মনে খুশির কল্পনাও করলাম—বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে ছনের চার চালা ঘরের কোণে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাব এবং দাদার দোয়ায় আর দাদীর যত্ন-আদরে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাব। শিন্নি খাবার পর থেকে সত্যিই ভাল বোধ করতে থাকলাম এবং সন্ধ্যার দিকে বেশ সুস্থ হয়ে কর্মস্থলে ফিরলাম।

জেল বা জেলখানা কাকে বলে তখন তেমনটা বুঝি নি—তবে এটুকু বুঝেছি যে, এটা খারাপ জিনিস ও শাস্তির জিনিস। আমার মনটা একদিন হাহাকার করতে থাকল—যখন জীবনের প্রথম শুনলাম আমার দাদা হুজুরকে পশ্চিমা শাসকরা ধরে নিয়ে জেলে দিয়েছে। অন্য ভক্তদের মনেও হাহাকার ছিল কিনা বুঝি নি—তবে কাউকে দেখলে মনে হয়েছে কেমন যেন একটা গুমোট ভাব, চেহারায় গ্লানির ছায়া। আমার মত হাহকার লক্ষ্য করি নি তাদের মনে—হয়তো বা জেল সম্পর্কে আমার মত ভয়ংকর কিছু তাদের মনে ছিল না। হয়তো দাদা হুজুরের জেল সম্পর্কে তাঁরা আগে

www.pathagar.com

থেকেই জানত। তাদের মুর্শিদকে চাওয়া মাত্রই কাছে পাবে না—এটাই ছিল তাদের মন খারাপের কারণ। কেন জেলে দেওয়া হল—জেল কি—জেলে কি করা হয়? আমার দাদা হুজুরকে সেখানে কি করা হবে? এ সব প্রশ্ন মনে উদয় হলেও কাউকে জিজ্ঞেস করি নি এই ভেবে যে, এমনিতেই আমার মনে যেটুকু ভয়—ভয়ংকরের ছায়া বিরাজ করছে—সব কিছু শোনার পর, জানার পর যদি তা আরও তীব্রতর হয়। যদি তা আমি সইতে না পারি।

সেদিন দুপুরে পাশের গ্রামের এক মজলিশ থেকে বাবা অত্যন্ত ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে ফিরলেন—দাদীকে ডেকে কি যেন শলাপরামর্শ করতে থাকলেন। আমি ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে আড়ি পেতে শুনলাম। বাবা বলছেন, 'মা, হুজুর খবর পাঠিয়েছেন—আমাকে কাল ভোরেই দেখা করতে হবে। মা, হুজুরের জন্য কি নিয়ে যাব?' এ সময়ে দাদা হুজুর যেখানে যে অবস্থাই থাকতেন—তার খবর পৌঁছানোর জন্য 'ছোট বাশালিয়ার মকবুল'—দুই শব্দের ঠিকানাই যথেষ্ট ছিল। দাদী একটু চুপ করে ভাবলেন, তার পর বললেন, 'দুধের পালি (বেশ কয়েকজনের গরুর দুধ একত্র করে পালা ক্রমে বিক্রি করা) এখনও বাজারে যায় নি, তুমি দুইটা পালির দুধ আন আর হাঁটে গিয়ে খেজুরের গুড় আন। রাত্রে দুধের পিঠা (দুধে ভিজানো পিঠা) বানাইয়া দিমু সকালে নিয়া যাইও—শীতের এ সময়টাতে তোমার হুজুর দুধের পিঠা পছন্দ করেন।' বাবা বললেন, 'হুজুর জিওল সিং-মাগুর মাছ নিয়ে যেতে বলেছেন, তা'ছাড়া ওখানে বড় বড় লোক আছে—বড় বড় পুলিশ আছে।' দাদী বললেন, 'তুমি তো আর বড় বড় লোক-পুলিশের কাছে যাইতেছ না—তুমি যাইতেছ তোমার হুজুরের কাছে। কাইনদা মাঝিকে খবর দাও—আমাদের দোফা (নীচু) চড়ার (মাঠ) মান্দা (পাগার/খাদ) থেকে জিওল কই, মাগুর মাইরা (মেরে) দিবে।'

দাদা হুজুরের বিরহে ও তাঁর কষ্টের কল্পনা করেই ব্যাকুল ছিলাম। তার উপর আবার বাবা যাবেন সেখানে শুনে মনের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। ওরা যদি বাবাকেও ধরে জেলে দেয়? আর আসতে না দেয়। দাদা হুজুরকে জেলে দিয়েছে---বাবাকেও হারাবো---উহ্। আমি আর কল্পনাও করতে পারছিলাম না। বাবা চলে গেলেন দাদীর নির্দেশ মত সব কিছুর ব্যবস্থা করতে। আমি থ হয়ে সারা বেলা আকুলি-বিকুলি মনে অনেক কিছু ভাবলাম—কল্পনা করলাম।

www.pathagar.com

বাবাকে কোনমতেই ফেরানো যাবে না। অগত্যা পরাজিতের সান্ত্বনা দিয়ে ভাবলাম বাবাকে তারা ধরে রাখলেও আমার দাদা হুজুরের কাছেই তো থাকবেন; বাবার মরে যাওয়াও সার্থক হবে। আমি এতিম হয়েও দেশের কাছে জাতির কাছে গর্ব করতে পারব; অপর দিকে দাদা হুজুরের কষ্টটাও অনেকটা লাঘব হবে। আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল—যদি বাবাকে দাদা হুজুরের কাছে থাকতে না দেয়? তাছাড়া বাবার অনুপস্থিতিতে আমাদের কি হবে।

রাতে দাদীর বুকে মাথা রেখে ঘুমাবার আগে দাদী কল্পলোকের গল্প শুরু করবেন এই মুহূর্তে আমি বললাম, 'দাদী, আমিও বাবার সাথে দাদা হুজুরের কাছে যাবো।' আমার প্রতি দাদীর স্নেহভরা মন এত দুর্বল ছিল যে, আমার কোন আবদারই দাদী ফেলতে পারতেন না। তিনি বিছানা থেকে নেমে বাবার ঘরের কাছে গিয়ে বাবাকে ডাকলেন, আমি অন্ধকারে লুকিয়ে দাদীর কথা শুনলাম। আমার যাবার কথা বলতেই বাবা বললেন, 'মা, কি বলছ তুমি! হুজুরের সাথে কাউকেই দেখা করতে দেয় না—এমন কি তাঁর ছেলেমেয়েদেরও গভর্নরের পারমিশন নিতে হয়, আর আমি যাইতেছি চুপি চুপি লুকিয়ে—একজনে আমাকে গোপন পথে দেখা করিয়ে দিবে। যদি ধরা পড়ি তবে ওরা আমাকেও ধরে জেলে দিবে।'

দাদী বললেন, 'যা-ই হোক, ওকে নিয়ে যেতে হবে।' বাবার বিমাতা হলেও দাদীর স্নেহের কাছে বাবা এতই দুর্বল ছিলেন যে, দাদীর কথার বাইরে এক কদমও যেতেন না। অন্য কোন ভক্তদেরকে বাবা ব্যাপারটা জানান নি, সবাই বাবার সাথে যেতে চাইবে অথবা দাদা হুজুরের জন্য এটা সেটা দিতে চাইবে যা নিয়ে যাওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না-বিশেষ করে বাবা যাচ্ছেন অতি গোপনে---প্রকাশ হলে বা সাহেবরা জানতে পারলে, বাবারও উপায় থাকবে না। দাদা হুজুরেরও অসুবিধা হতে পারে। ভোর রাতেই আমরা রওয়ানা হলাম—বাবার মাথায় দুধের পিঠার পাতিল আর আমার বড় ভাই মজিদের মাথায় মাছের পাতিল। দুরু দুরু বুকে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমিও চললাম তাদের সাথে। সাড়ে তিন মাইল রাস্তা দক্ষিণ দিকে হেঁটে টাঙ্গাইল বাস স্ট্যাণ্ডে আসতে বেলা ওঠে। মজিদ ভাই পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন।

www.pathagar.com

অবহেলিত নিপীড়িত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুঁজিপতি-মহাজন-মালিকদের উর্ধ্বে তোলার জন্য দাদা হুজুরের প্রোগ্রামসমূহের একটি ছিল টি. জি. টি. (টাঙ্গাইল জেনারেল ট্রেডিং) কোম্পানী।

কৃষক-মজুরদের দশ টাকার শেয়ারে গড়েছিলেন এই টি. জি. টি। যানবাহন ব্যবসায়ে টাঙ্গাইলে এটিই তখন প্রায় একচেটিয়া। লুটেরাদের খপ্পরে পরে টি. জি. টি. শেষ রক্ষা করতে না পারলেও কৃষক-মুজুরের মন-মানসিকতাকে এই যে বিরাটত্ব দান করেছিল তার তুলনা টাকা-পয়সায় হয় না। মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে কৃষক-মজুর অংশীদার হয়েছিল একটি কোম্পানীর। যে লোক মটরগাড়িতে উঠতে ভয় পেতো সেও বলতে শিখেছিল—'এ গাড়ী আমাদের'। অফিস-আদালতের দরজায় যেতে যাদের হৃৎকম্প শুরু হতো---তারাও বুক ফুলিয়ে বলতে শিখেছিল 'এটা আমাদের কোম্পানী'—আর শিখেছিল একটি সভাকক্ষে বা অফিসের চেয়ারে বসে দৃঢ়তার সাথে সাহেববেশী কর্মচারীদের কাছে তাদের সম্পদের হিসাব চাইতে।

মটর গাড়ীতে তখন তিনটি শ্রেণী ছিল---কেবিন, ইন্টার ও থার্ড ক্লাশ। আমার যত দূর মনে পড়ে টাঙ্গাইল---ঢাকা কেবিনের ভাড়া ছিল তিন টাকা, ইন্টারের ভাড়া আড়াই টাকা ও থার্ডক্লাশের ভাড়া দুই টাকা।

গাড়ীর কাছে গিয়েই বাবা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এটা আমাদের কোম্পানীর গাড়ি।' পয়সার স্বল্পতা হেতুই বাবা আমাকে নিয়ে থার্ড ক্লাশে উঠলেন। গামছা দিয়ে মুখঢাকা মাছের পাতিলটি সীটের নীচে দিয়ে সাদা চাদরে মুখ ঢাকা দুধের পিঠার পাতিলটি বাবা কোলের উপর রাখলেন। কন্ডাক্টর ভাড়া নিতে এসে সম্ভবত পরিচিত বলেই, সালাম দিয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন চাচা? পাতিলে কি?' বাবা জবাব দিলেন, 'ঢাকা যাব, পাতিলে পিঠা আর মাছ।' কণ্ডাক্টর সচকিত হয়ে বাবার কানে কানে কি যেন কথা বলল এবং বাবাকে প্রায় জোর করে কেবিনে নিয়ে বসিয়ে দিল। ঢাকা পৌঁছে ড্রাইভার এক রিক্সাওয়ালাকে বলে দিল ধানমণ্ডিতে কোন এক বাঁশের পুলের কাছে আমাদেরকে নামিয়ে দিতে। রিক্সায় যেতে আনন্দে-আশংকায় ভয়ে আমার মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল।

মরা নদীর মত একটি জলাশয়ের উপর একটি বাঁশের সাঁকোর কাছে আমরা পাতিল নিয়ে নামতেই অপেক্ষমান পুলিশ কড়া ধমকের সুরে

www.pathagar.com

সেখান থেকে সেই মুহূর্তে চলে যেতে বলল। সেই এলাকায় নাকি চলাচল করতে দিলেও কাউকে থামতে দেওয়া হয় না। সংগে সংগে জলাশয়ের ওপার থেকে আওয়াজ আসতেই উল্টো আমাদের খাতির দেখিয়ে বলল, 'দেখি, হুজুরের জন্য কি এনেছেন?' তাকিয়ে দেখি, সংকীর্ণ নড়বড়ে একটি লম্বা বাঁশের সাঁকো ওপারের একটি একতলার দোড়গোড়ায় গিয়ে মিলেছে। আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল—দীর্ঘ শ্বাসের সাথে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো---ঐ তো আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে---আমার দাদা হুজুর বারন্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন আর দু'জন পুলিশ বাঁশের সাঁকোতেও যেন দৌড়ে আমাদের দিকেই আসছেন। পুলিশ দু'জন পাতিল দু'টি নিল এবং আমাদেরকেও নিয়ে চলল। সাঁকোতে চড়ার অভ্যাস থাকলেও দাদা হুজুরের কল্পিত দুরবস্থার কথা ভেবেই আমার পা কাঁপতে লাগল।

বিরান ভূমির মতই খাঁ খাঁ করছে এলাকাটি। দেখে মনে হয়েছিল হয়তো বা জংগল ছিল, টিবি-টিলা ছিল, দু'একটা কুঁড়ে ঘর-ছাপড়া-ডেরার স্বাক্ষর তখনও বর্তমান---কিন্তু এসবকে ভেঙে-চুরে বিরান ভূমি করা হচ্ছে। দু'একটা একতলা বাড়ী---সবে মাত্র গড়া হচ্ছে---জলাশয়ের অপর পারে তারই একটির দিকে আমরা যাচ্ছি। পুলটি থেকে আমরা বারান্দায় নামতেই সব পুলিশরা এসে ভিড় জমালো। দাদা হুজুরকে দেখে সংকুচিত হয়ে পাশে চলে গেল। বাবা তাঁর মুর্শেদকে ছল ছল চোখে প্রশান্তির ভক্তি নিবেদন করলেন। আমি সালাম করতেই হুজুর বসলেন, 'তুইও এসেছিস---দাদার জেলখানা দেখতে?' হুজুর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর ধলির খেতের মান্দাটায় মাছ পেয়েছিলি?' বাবা করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জ্বী বাবা, পেয়েছিলাম, মা কয়টা দুধের পিঠাও দিয়েছে।'

হুজুর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আহা বেচারী, তোর বিমাতা হলেও কত ভাল সনাতনী মানুষ!' উৎফুল্ল চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে হুজুর সকলকে ডাকলেন, 'এই পুলিশরা, আরদালীরা, তোমরা কে কোথায় আছ এদিকে আস—দেখে যাও কি মজার জিনিস তোমাদের জন্য এসেছে।' এক পাল ছেলেমেয়ের বাবা হাট থেকে খাবার কিছু কিনে আনলে যেমন সবাই বাবাকে ঘিরে আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকে ঠিক তেমনি সবাই এসে হুজুরকে ঘিরে দাঁড়ালো—হুজুর পাতিলটি সামনে নিয়ে বসে পড়লেন--সবাইকে হাতে হাতে পিঠা দিলেন।

www.pathagar.com

বাবা এগিয়ে এসে এক টুকরা পিঠা দাদা হজুরের মুখে তুলে দিলেন--আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলছিলাম--দুঃখের নয় পরিতৃপ্তির। হজুর শুধু আমাদের মত গুটি কয়েক লোককেই ভালবাসেন না খেটে খাওয়া মানব সন্তান সবাইকে আপন সন্তানের চেয়েও বেশী ভালোবাসেন। হজুরের পরিবারবর্গের সাথেও এমনি নিবিড় সম্পর্কের দৃশ্য কোনদিন দেখি নি। যারা হজুরের শত্রু দলের পক্ষ হয়ে হজুরকে আটকে রাখার কাজে নিয়োজিত তারাই এখানে হজুরের একান্ত আপনজন--তাঁর স্নেহধন্য ছেলের দল। হজুর ঠাট্টা করে বললেন, 'এই জমাদার, তুমি বিনা পারমিশনের বাইরের লোক আনলে তোমাদের তো চাকরি চলে যাবে।' জমাদার বললেন, 'হজুর, কর্তব্য পালন আমরা ঠিকই করছি কোন রাজনৈতিক লোকত উনি নন। আপনাকে আটকে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আর আপনি এখন যা করছেন তা একজন মুর্শিদ হিসাবে। এরপরও যদি চাকরি চলে যায় যাক, আরেকটা যোগাড় করব, অথবা খেটে খাবো। কিন্তু আপনাকে এত কাছে, এত আপন করে তো আর পাব না কোন দিন!' সবাই তার সাথে সুর মিলালো। তবুও হজুর তাড়াহুড়ো করলেন--একজনকে বললেন, 'ওদেরকে খেতে দাও, ওরা এখনই চলে যাবে--সরকারী লোক টহল দিতে আসবে।' হজুর নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন--আর টাঙ্গাইলের পশ্চিম উত্তর পূর্ব এলাকার সবারই নাম ধরে একে একে কুশলাদি জেনে নিলেন।

বিদায় বেলা হজুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'দাদা, আমি জেলে আছি, তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না—তোকে আমি নিয়েই নিতাম। তোর দাদী যা আদর করে—সে বেঁচে থাকতে ছেড়ে দেবে না।' মনে মনে কল্পনা করলাম তাই যেন হয় দাদা, 'আমি যেন তোমার কাছেই আসতে পারি!' হজুর বাবাকে বললেন, 'ওর লেখাপড়ার দিকে খেয়াল রাখবি--বন্ধ করবি না—ওকে এম. এ. পাশ করতে হবে।' তখন কৃষকের ছেলের জন্য এম. এ. টাই সর্বোচ্চ কাঙ্খিত ডিগ্রি ছিল। এরপর যখন জিন্নাহ হলের ছাত্র (বর্তমান সূর্যসেন হল) হয়ে ঢাকা থেকেছি, অনেক দিন খুঁজেছি; কিন্তু ধানমণ্ডির সেই স্থানটি আর খুঁজে পাইনি।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আবদুল খালেক

মেহনতি মানুষের নেতা মওলানা ভাসানীর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এমন এক ব্যক্তি যাঁর নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এদেশের সাধারণ মেহনতী মানুষের অতি প্রিয় নাম, অতি প্রিয় আপনজন। শেরে বাংলার জীবনী লেখার জন্য শেরে বাংলা জাতীয় স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি বলে শেরে বাংলার তথ্যবহুল জীবনের তথ্য সংগ্রহ করছি ও জাতীয় ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। তাই ছুটে যেতে হয়েছে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মওলানা ভাসানী সাহেবের কাছে।

১৯৭৪ সালের কথা। হঠাৎ করে মওলানা ভাসানীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি থাকেন সন্তোষে। মন স্থির করলাম টাঙ্গাইলের সন্তোষে যাবো। এক বন্ধুকে সাথে নিলাম। বেলা এগারোটার দিকে সন্তোষে গিয়ে পৌঁছেছি। এক বিরাট পুকুর। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বী। পুকুর তো নয়—হ্রদের মত। তার উত্তর-পশ্চিম কোণে মওলানার বাড়ী। রিক্সা থেকে নেমে তাঁর বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম। সন্তোষের বিরাট এলাকা জুড়ে মওলানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সব দেখে আমার মন সান্ত্বনায় ভরে উঠলো। মওলানা কোথায় আছেন স্থানীয় দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানালেন যে, তিনি পাটমন্ত্রী আসাদুজ্জামানের সাথে পাটের গোডাউন কোথায় করা হবে, তা পরিদর্শন করতে গেছেন। আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। ঢাকা থেকে এসে তাঁর সাথে কথা না বলে চলে যাবো তা তো হতে পারে না। আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ফিরে দেখলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম পাটমন্ত্রী টাঙ্গাইলের দিকে চলে যাচ্ছেন। ভাবলাম মওলানা ভাসানী কি টাঙ্গাইল যাবেন?

www.pathagar.com

একজনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে, মওলানা এখনই আসবেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে আরো ঘুরে ফিরে সন্তোষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেখছি। ইতিমধ্যে কে যেন তাঁকে বলেছেন তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমরা ঢাকা থেকে তাঁর কাছে এসেছি। তিনি আমাদেরকে খুঁজছেন। পুকুরের উত্তর পাড়ের সড়ক ধরে পূর্ব দিকে যাচ্ছি। পথে তাঁর সাথে দেখা। সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। আমাদেরকে নিয়ে কথা বলতে বলতে পূর্ব দিকে যেতে লাগলেন এবং বললেন, 'আমার শরীরটা আজ ভাল নয়। তোমাদের সাথে আজ কথা বলতে চাই না।' তবে ইতিমধ্যে শেরে বাংলার জীবনী লেখার জন্য সাক্ষাৎ-কার নিতে এসেছি। তা তাঁকে জানালে তিনি বললেন, 'শেরে বাংলার মত মানুষ—মহান নেতা, জন দরদী নেতা, মেহনতী মানুষের নেতা, সর্বভারতীয় নেতা আর আমরা পাবো না। তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সাথে কথা বলবো। তোমাদের আর একদিন কষ্ট করে আসতে হবে।' আমরা সবিনয় মওলানার কথায় রাজী হয়ে বললাম, 'হুজুর, আমরা আবার আসবো তাতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না!' এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে তাঁর বাড়ীর দিকে আসতে লাগলেন এবং সড়কের পাশে এসে আমাদেরকে একটি রিক্সায় তুলে দিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। মওলানার মত এমন মানুষ আর আমরা দেখতে পাবো ? এ কথা আমি আমার বন্ধুকে বললাম। বন্ধুটি বললো, 'প্রশ্নই আসে না।' এরপর টাঙ্গাইল এসে ঢাকা চলে এলাম।

শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী সাহেবের কথামতো এক সপ্তাহ পরে পুনরায় টাঙ্গাইলের সন্তোষে গেলাম। গিয়ে শুনলাম তিনি বাড়ীতে নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে গিয়েছেন। তিনি সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য নিম্ন শ্রেণী থেকে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। আমি পুনরায় উক্ত বন্ধুকে নিয়ে মওলানার খোঁজে পুকুরের উত্তর দিক ধরে পূর্ব দিকে যাচ্ছি। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনি আসছেন। আমি হুজুরকে সালাম করলাম এবং পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানালাম। আমার বন্ধুটিও তাই করলো। আমরা আরও কিছু পূর্বদিকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম যেখানে মওলানার কবর দেওয়া হয়েছে। তার কাছাকাছি একটি গাছের ছায়ায় বসলেন এবং আমাদেরকেও বসতে বললেন। এর মধ্যে এক ছেলেকে

www.pathagar.com

আম আনতে বললেন। আমি কিন্তু শেরে বাংলা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিয়েছি।

আমি প্রথমে জানতে চাইলাম, 'সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শেরে বাংলার কি অবস্থান ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বাঙালী নেতাদের মধ্যে একমাত্র হক সাহেব ছিলেন নিখিল ভারতীয় অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব।' তাঁর সম্পর্কে প্রথমেই বললেন, '১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের সম্মেলনে কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর চেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব তিনি হয়েছিলেন। অথচ তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজমই। মুসলিম লীগের সম্মেলনে 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' একবার বললে 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ' দশবার বলতো। তা হলে এবার বুঝে নাও, হক সাহেব মানুষের কেমন প্রিয় এবং হক সাহেব লক্ষ্ণৌবাসীদের কাছে কত প্রিয় ছিলেন! কেবল তাই নয়—ঐ বছরই লক্ষ্ণৌতে এ. কে. ফজলুল হককে অর্থাৎ হক সাহেবকে 'শেরে বাঙ্গাল' বলে জিন্দাবাদ দিতে থাকে। সেই থেকে হক সাহেব 'শেরে বাংলা' হয়ে গেলেন অর্থাৎ 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত হলেন।'

শ্রদ্ধেয় মওলানা আরও বললেন, '১৯৪০ সালে লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে যে প্রস্তাব শেরে বাংলার দ্বারা রচিত ও উত্থাপিত হয়েছিল এবং পাশ করে নেওয়া হয়েছিল সে প্রস্তাব 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত হয়েছে। ভারতের কংগ্রেসের হিন্দুরা ব্যঙ্গ করে উক্ত প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলতো। উক্ত প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাংশে এবং পশ্চিমাংশে মুসলমান প্রধান অঞ্চলকে আলাদা আলাদা স্টেটস্ করে দেশ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে কায়েদে আজমের নির্দেশে দিল্লীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দ্বারা মুসলিম লীগের কনভেনশনে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে States কথাটি ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাবে States-এর s কেটে দিয়ে State করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কথা প্রস্তাবে যোগ করা হয়। এই প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয়। তাই শেরে বাংলা কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন না, তিনি লাহোর প্রস্তাবের রচয়িতা এবং উত্থাপক ছিলেন।'

মওলানা সাহেব আরও বললেন, '১৯৪০ সালে লাহোরে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিত্ব সর্বভারতীয় বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা

www.pathagar.com

দেখতে পাই। এই সম্মেলনেও কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতিত্ব করলেও শেরে বাংলা কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা আমার কয়েকটি কথায় বুঝতে পারবে।

সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কিছু সময় পর ফজলুল হক সেখানে অর্থাৎ সম্মেলনের প্যাণ্ডেলের গেটে গিয়ে পৌঁছলে সম্মেলনের প্যাণ্ডেলের গেট থেকে মঞ্চ পর্যন্ত শেরে বাংলা ধ্বনির মধ্যে তাঁকে পৌঁছতে আধা ঘন্টা লাগে। সে সময় শেরে বাংলা ছাড়া আর কোন শ্লোগান শোনা যায় নি বা অন্য কোন শ্লোগান দিতে দেখাও যায় নি। যেন শেরে বাংলাই উক্ত সম্মেলনের প্রধান নেতা বা প্রধান আকর্ষণ। এই সময় জিন্নাহ সাহেবকে অনেক বিব্রত অবস্থায় দেখা গেছে।

প্যাণ্ডেলের মঞ্চে গিয়ে হক সাহেব পৌঁছলে এক পর্যায়ে জিন্নাহ সাহেব মাইকের সামনে এসে বলে ফেললেন, 'Now the tiger of Bengal is caged. সম্মেলনের কাজ আরম্ভ করুন।' এই সময় হক সাহেব মাইকের সামনে এসে ঘোষণা করলেন, 'আপনারা আপনাদের আসন গ্রহণ করুন, শান্ত হোন এবং আপনারা যা চান এই সম্মেলনে তাই পাশ হবে।' এ কথা না বলা পর্যন্ত 'শেরে বাঙ্গাল—জিন্দাবাদ' ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে রেখেছিল। এই ছিল আমাদের সর্বভারতীয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিত্ব।'

মেহনতী মানুষের নেতা ভাসানী সাহেবের মুখে এ কথাগুলো ইতিহাসের কন্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে আসা ইতিহাস সেদিন শুনেছিলাম। আজও যেন শুনতে পাচ্ছি শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেবের কন্ঠ থেকে সে কথাগুলো।

১৯৫৪ সালের কথা। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন। শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী সাহেব বলেন, 'মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তুমুল ও দুর্বার আন্দোলন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায় করার জন্য জনগণ এবং বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। হক সাহেবের সাথে আলোচনা করলাম। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে কথা বললাম। হক সাহেব রাজী হলেন না। হক সাহেব বললেন, 'ঐক্যবদ্ধ হলে কি হবে? আমরাই তো আমাদের পায়ে কুঠার মারবো। তাতে জনগণের স্বার্থ বিনষ্ট হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব রাজী।' হক সাহেবের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় বসলাম। শেষে পুরোপুরি

www.pathagar.com

রাজী না হলেও অনেকটা রাজী হলেন। সর্বশেষে তাঁকে আমি রাজী করতে সমর্থ হলাম। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলাম। হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী আমরা তিনজন নেতা হলাম। মূলত হক সাহেবই আমাদের সকলের নেতা। তথাপিও হক-ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী শ্লোগান হবে। তাই ঠিক করা হলো। গ্রাম-বাংলার যেখানেই গেলাম মানুষ, মেহনতী মানুষ ছাড়া আর কিছু আমরা পেলাম না। হক সাহেবের নামে মানুষ যে পাগল, গ্রামবাংলার মানুষ হক সাহেবকে ছাড়া কিছুই বোঝে না— তাই সারাদেশ ঘুরে উপলব্ধি করলাম। কোথাও কোথাও হক সাহেবকে ছাড়া সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও আমি আলাদা আলাদা জনসভা করেছি, ঐ সকল স্থানের জনসভায় জনগণের উপস্থিতি অনেক কম লক্ষ্য করেছি। যাহোক দেশব্যাপী হক সাহেবকে নিয়ে নির্বাচনী জনসভা করেছি। হক সাহেব জনসভায় বেশী কথা বলতেন না। অল্প কথায় জনগণকে হাসাতেন আবার অল্প কথায় কাঁদাতেন। জনগণকে প্রশ্ন করতেন, 'আপনারা আপনাদের অধিকার চান? না, চান না?' উত্তরে সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে হাত তুলতেন। 'আপনারা আপনাদের অধিকার চাইলে আপনাদের যুক্তফ্রন্টের নৌকায় ভোট দিন।' তাই আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী জোয়ার। নির্বাচনে আমরা মেজরিটির জন্য যে সিট দরকার, তার চেয়ে বেশী সিট নিয়ে জিতে গেলাম। আমার দৃষ্টিতে যুক্তফ্রন্টের জয়, জনগণের জয় এবং হক সাহেবের জয়। এই জয় আমাকে অভিভূত করেছিল। রাজনীতিতে তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা, জনগণকে জয় করার কৌশল ছিল চমৎকার এবং তাদের জন্য যে ওয়াদা করা হয়েছে তার বাস্তবতাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

যা হোক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মুখে হক সাহেব সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম। নিজের কথা নিজের মুখে তিনি বললেন না। তবে দেশবাসী জানে হক সাহেবের পরে মওলানা ভাসানীর মত বিরাট মহান নেতা জনগণের কাছে গ্রহণীয় ছিলো। তাই আমরা লক্ষ্য করেছি হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী কথাটা উচ্চারিত হয়েছে। তা ছাড়া যুক্তফ্রন্ট গঠনে মওলানা ভাসানীর অবদান সবচেয়ে বেশী। হক সাহেব তো যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টির মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরাভূত করবেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর দূরদর্শিতার জন্যই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা শেরে বাংলা তেমন শুনতেন না। তাই শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে সম্প্রীতি নির্মাণে ভাসানী সাহেবের বিরাট অবদান, যে অবদান সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবকে পরাভূত করে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই এই ভূখণ্ডের গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় হক সাহেবের মত মওলানা ভাসানীর বিরাট অবদানের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবো। আমাদের মেহনতী আন্দোলনের সর্বধরনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মওলানা ভাসানী ইতিহাসে এক মহান নেতা হিসেবে মাইল স্টোনের মত শতাব্দীর প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

আরও একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। আমগাছের ছায়ায় বসে এত কথা বলার মধ্যে তিনি আমাদেরকে আম নিজে কেটে দিয়েছিলেন। আমি বার বার আমি তাঁর হাত থেকে নিতে চেষ্টা করলাম এবং বললাম, 'আমরা কেটে খাচ্ছি।' তিনি আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা আমার মেহমান, তোমাদেরকে আদর যত্ন করা আমার কর্তব্য।'

শ্রদ্ধেয় মওলানার মুখে এ কথা শুনে বিস্ময়ে সেদিন তাকিয়ে দেখেছিলাম। পুনরায় শাহবাগের পিজিতে শ্রদ্ধেয় মওলানাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে আমাকে দেখেই আমার খোঁজ-খবর নিলেন। তাঁর শরীরের অবস্থার কথা জানলাম। এবারে শরীরটা ভাল হবে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম সন্তোষের জনৈক ব্যক্তিকে চেক কেটে দিচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি অসুস্থ অবস্থায় সন্তোষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করেন, তদারক করেন এবং অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারও দেখেন?' তিনি বললেন, 'আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাই। তাই নিজের হাতে সব করছি।'

দেশের রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি সব কিছুর সাথে সাথে সন্তোষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি দেখছেন দেখেও আমি অভিভূত হলাম। শ্রদ্ধেয় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন যে জনমানুষের কাজে নিবেদিত ছিল তাঁর শেষ প্রমাণও পেয়েছিলাম সেদিন পিজি হাসপাতালে। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেষ করছি।

www.pathagar.com

আহমাদ উল্লাহ

এক কিশোরের চোখে মওলানা ভাসানী

ভারি ভালো লাগতো আমার। যখনই তাঁর কোনো ছবি ছাপা হতো পত্রিকায়, পলকহীন চেয়ে থাকতাম। আলতো করে ছুঁয়ে দিতাম তাঁর সফেদ দাড়ি, আর তালের আঁশের টুপি। কেন যেন মনে হতো এই সাধারণ মানুষটি আমার অনেক দিনের চেনা!

তখন আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। দুরন্ত এক কিশোর। পড়ায় আমার মন বসে না। ঘর মনে হয় বাঁধন। ইচ্ছে করে পালিয়ে যাই। হারিয়ে যাই দূরে, বহু দূরে। আর তখনই ডাক এলো। মিছিল যাবে ফারাক্কায়। ডাক দিল কে? সেই তিনি যিনি আমার দীর্ঘ দিনের চেনা, যাঁকে কাছের থেকে হয় নি দেখা, ছবির মানুষ ডাকলো আমায় আপন করে!

তাঁর ডাক শুনে কেমন করে ঘরে রই? ঘরের মায়া, মনের শেকল, টুটলেন তিনি এক পলকে। সেই তিনি যিনি মাথায় তালের আঁশের টুপি রাখেন সারাক্ষণ। আব্বুকে না। আম্মুকে না। কাউকে না জানিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। কখনো মিছিলের স্রোতে ভেসে, কখনো বাসে চেপে পৌঁছে গেলাম রাজশাহী।

আমার ছবির মানুষের এত ভক্ত জানলাম সেই প্রথম। রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান উপচে পড়ছে লোকে। সূর্য তার রোদের কলস উপুড় করে রেখেছে। কটকটে গ্রীষ্মে জ্বলছে শ্যামল বাংলা। আশ্চর্য! একটি মানুষের নড়ন নেই। চরণ ফেলে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। সবাই আকুল। ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে চোখে-মুখে। কখন ভাষণ দেবেন সেই মানুষ? 'মজলুম-জননেতা'—ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগে করতালিতে মুখর হলো মাদ্রাসা ময়দান। আর তখনই ছবির মানুষ একটি কিশোরের সামনে জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠলেন।

www.pathagar.com

ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র-নেতাদের সঙেগ ছিলাম বলে মিছিলে তাঁর পাশে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। কে জানতো ফারাক্কা মিছিল আমার জীবনে এমন একটি সৌভাগ্য বয়ে আনবে? মিছিল চলছে। আমরা ক'জন হাত দিয়ে শেকল তৈরী করে তাঁকে আগলে রাখলাম। আমি এত কাছে যে, কখনো কখনো তাঁর দাড়ির ছোঁয়া লাগছিল নাকে, মুখে, গালে, কপালে। এত দূরের মানুষ আজ আমার এত কাছে? ভাবতেই শিরায় শিরায় ছুটোছুটি করছিল টগবগে এক ঘোড়া যার দাপাদাপিতে বেসামাল আমি।

মজলুম নেতা তখন ঘেমে-নেয়ে একাকার। কেউ এসে ছাতা ধরছিল তাঁর মাথায়। কেউ পরামর্শ দিচ্ছিল খানিক জিরিয়ে নিতে। তিনি এগুচ্ছিলেন। সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছিলেন। কে জানে, কিসের নেশায় শ্লোগানমুখর মানুষগুলো ছুটছিল! মিছিলে মিছিলে নগরী রাজশাহী এগিয়ে চলছে। জঙ্গী মিছিল। লক্ষ্য ঃ মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ। মিছিলের প্রত্যেকটি মানুষ যেন এক একটি বুলেট! একটু আগুনের ছোঁয়া পেলেই জ্বলে উঠবে। জ্বালিয়ে দেবে পৃথিবী। শ্যামল এ বাংলার সহজ সরল মানুষগলোকে বানালো বুলেট। তাঁরই ডাকে আজ তারা সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দিতে একবাক্যে রাজী। মিছিলের প্রত্যেকটি মানুষের চোখে-মুখে কাঁপছে উত্তেজনা। শ্লোগানে শ্লোগানে ঝরে পড়ছে হৃদয়ের যত আগুন আক্রোশ—'মরণ বাঁধ ফারাক্কা বাঁধ ঃ ভেঙেগ দাও, গুড়িয়ে দাও। আমার নেতা তোমার নেতা ঃ মওলানা ভাসানী! আন্দোলনের অপর নাম ঃ মওলানা ভাসানী!'

এ শহরে সাতাশটি বসন্ত কাটিয়েছি। কম করে হলেও সত্তরটি নেতা আর সাত শ' মিছিল দেখেছি। কই, কোনো মিছিলের হাত, পা, কণ্ঠই তো তেমন লাগেনি! আমার কিশোর বয়সে দেখা সেই মিছিল কি আর কখনো দেখবো? কি করে হবে সেই মিছিল? কে দেবে তার নেতৃত্ব? তেমন নেতাই বা কোথায়? ডোরাকাটা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবী, তালের আঁশের টুপি পরে কে আসবে সাধারণের কাছে সাধারণ হয়ে? আমার নেতার মত সাধারণ নেতা আজকাল কেউ হতে চান না। তাই তেমন অসাধারণ মিছিল এখন কল্পনারও বাইরে।

আমি রাজনীতিবিমুখ। দু'একজন রাজনীতিক শুভাকাঙ্ক্ষী মাঝে মধ্যেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আমার চোখের পাতায় তখনই

www.pathagar.com

ভেসে ওঠে সেই ছবি। সফেদ দাড়ি। তালের আঁশের টুপি দোল খায় স্মৃতির দোলনায়। আমি কার রাজনীতি করবো? কিসের রাজনীতি করবো? কে হবে আমার গুরু? আমায় রাজনীতির দীক্ষা দেবে কে? এ রকম অনেক প্রশ্নই করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অনেক না করা প্রশ্নের মতই এ প্রশ্নও করা হয় না। কাকে প্রশ্ন করবো? ওরা কি জানে কৈশোরে আমি কার ছোঁয়া পেয়েছি? এমন কিছু কিছু স্মৃতি আছে যা হৃদয় কৌঠায় ভরে রাখার, তেমনি আমার জীবনের এ স্মৃতিটিও। যখনই এ শহরের কোনো কাক, শকুন আমায় তাড়া করে, তাদের ভয়ে আমি থেমে যাই। তখনই কে যেন ফিসফিসিয়ে কানে কানে বলে—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কেমন এক ভরসায় ভরে যায় মন! বুক ফুলে ওঠে সাহসে!

যারা তালের আঁশের টুপি বানাতেন তারা হয়ত পেশা পাল্টিয়েছেন। এ টুপি আজকাল কেনে না কেউ। টুপিওয়ালাদের দেখলেই আমার হৃদয়ে সেই কিশোরটি জেগে ওঠে, হাহাকার করে।

ও ভাই টুপিওয়ালা, তালের আঁশের টুপি আনতে পার না? আমার যে একটি তালের আঁশের টুপি দরকার!

আজ এত বছর ধরে একটি তালের আঁশের টুপি খুঁজতে খুঁজতে আমার মনে একটি প্রশ্নই বার বার উঁকি ঝুকি দেয় আমরা কতোটা এগিয়েছি?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নেতা ভাসানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খোন্দকার আবদুল হামিদ

আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কাণ্ডারী মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী জাতির অন্তরে সদা জাগরূক রয়েছেন, থাকবেন। জাগরূক রয়েছেন তিনি দেশের সীমানার বাইরে তাদেরও অন্তরে যারা লাইন-প্রথার শিকার। মওলানা ভাসানীকে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে প্রয়াস পেয়েছে তারা মওলানার ইন্তেকালের আগেই তাঁকে ভুলে গেছে। যারা নিজেদের রাজনৈতিক মতলবে মওলানার নাম এখনও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করে থাকে, সে প্রয়োজনটুকু ফুরিয়ে গেলেই তারাও তাঁর নাম নেওয়া ভুলে যাবে। কিন্তু তাঁকে কোনদিনই ভুলবে না বাংলাদেশের মজলুম জনসাধারণ। কারণ তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বিবেক। তিনি ছিলেন মজলুমের কাতর ফরিয়াদ নয়, মূর্তিমান বিদ্রোহ। তিনি ছিলেন নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। তিনি ছিলেন সেই মুসলিম যাঁর মাথা আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নত হয় নি। শেরে বাংলার মতো মওলানা ভাসানীও জনগণের চেতনা ও অস্তিত্বে, আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। এঁদের ভোলা যায় না!

মওলানাকে ভুলতে পারবে না আরও এক শ্রেণীর মানুষ যারা দিল্লী-মস্কোর সেবাদাস। মওলানা ভাসানী হলেন মস্কোর প্রভাববলয় ও দিল্লীর (ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের) আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিরোধ। তাই উক্ত সেবাদাসরা মওলানার মৃত্যুর পরও তাঁর চরিত্রহননের কমু-সুলভ স্বভাব ছাড়ে নি। লোকান্তরিত মওলানা সম্পর্কে তারা লিখেছেন, 'তিনি (মওলানা ভাসানী) দরিদ্র মানুষের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন, পাশাপাশি ১৯৭২ সালে ভুখা মিছিল নিয়ে গিয়ে গণভবন ঘেরাও করে ভুখা মিছিলকে বাইরে প্রবল বর্ষার মধ্যে রেখে গণভবনে গিয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মরহুম জনাব নজরুল ইসলাম ও মরহুম জনাব তাজুদ্দিনের সাথে স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছিলেন।'

www.pathagar.com

মওলানার রাজনৈতিক চরিত্রে, কারো কারো মতে স্ববিরোধিতা থাকতে পারে, কনসিসটেন্সি বা স্থিরতার অভাব থাকতে পারে। শেরে বাংলা ফজলুল হক সম্পর্কেও এই 'অভিযোগ' রয়েছে। কিন্তু দিল্লী-মস্কোর সেবা-দাসরা ছাড়া অন্য কোন মহলই বলতে পারবেন না যে, মওলানার মধ্যে এতটুকু ভণ্ডামি অথবা চতুরালি ছিল। আমি বহু বছর মওলানা ভাসানীর খুব সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছি। আমি পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সংগে বলতে পারি মওলানা সাহেবের মধ্যে এতটুকু রাজনৈতিক ভণ্ডামি বা মোনাফেকি ছিল না। মুখে একটা মনে আরেকটা ছিল না। যখন যা মনে আসতো পষ্টাপষ্টি তিনি বলে দিতেন। এবং এতে করে অনেক সময় আপদ-বিপদকে আমন্ত্রণ করে নিতেন। '৫৬ সনে কাগমারী সম্মেলন মঞ্চ থেকে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন, 'আস্সালামু আলায়কুম।' সেটা ছিল বঞ্চনার বিরুদ্ধে বঞ্চিতের প্রতিবাদের বুলন্দ আওয়াজ। কবি বলেছেন, 'শির দেগা নাহি দেগা আমামা।' মওলানারও ছিল সেই সোজাসুজি কথা। সেই মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আওয়ামী সরকারের কতিপয় পাণ্ডাই রটিয়েছিল যে, তিনি গণভবনের বাইরে ভুখা-মিছিল দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে নজরুল ইসলাম-তাজুদ্দিনদের সঙ্গে বসে স্যাণ্ডুইচ খেয়েছিলেন। ট্রয়কা-ক্ষুদ্র-মনা প্রচারকারীদের প্রোপাগাণ্ডার ভাবটা যেন এই যে, পান্তা ভাতে অভ্যস্ত মওলানা গণভবনের সরকারী স্যান্ডুইচ দেখে জিবের পানি থামাতে পারেন নি। কমু-বাকশালীদের ধৃষ্টতার এমনি আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যা-ই হোক, আসলে ব্যাপারটা এই ছিল যে, ভুখ-মিছিলকারীদের দাবী সম্পর্কে আলোচনার নাম করে তাঁকে গণভবনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে আওয়ামী মন্ত্রীরা 'হুজুর' 'হুজুর' বলে এক কাপ চা অফার করেন। সৌজন্যের খাতিরে প্রবীণ মওলানা তা ঠেলে দেন নি। এই তাঁর অপরাধ। কুটিল ও ধুরন্ধর আওয়ামী চাইরা গোপনে তাঁর ছবি তুলে রাখে এবং রুচি-সৌজন্য, শালীনতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সেটাই মওলানার চরিত্র হননের মতলবে ব্যবহার করে। এ ধরনের ক্ষুদ্রতা ও হীনমন্যতা ওদেরই পক্ষে সম্ভব। ওদেরই স্বৈরাচারের সাঙাতরা এতদিনেও মরহুম মওলানার বিরুদ্ধে স্যাণ্ডুইচ খাওয়ার কাহিনী প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না।

একেই বলে 'হিটিং বিলো দি বেলট'। মওলানা ভাসানীকে ক্ষুদ্র-চেতাদের কাছ থেকে এরূপ আক্রমণ জীবনে বহুবার সহ্য করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলের শাসকরা তাঁকে বলেছে এ্যান্টিস্টেট। ইস্কান্দার মীর্জা হুমকি দিয়েছেন, 'মওলানা কো গোলী মারেগা।' বাকশালীরা বলেছে, তিনি এ্যানার্কিস্ট। মনি সিং তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার হুমকি দিয়েছেন। বামপন্থীদের মধ্যে কোন কোন মহল বলেছেন, মওলানা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক। আবার কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন, 'প্রফেট অব ডুম এ্যাণ্ড ডেস্ট্রাকশন'—মওলানা ভাসানী ভাঙন ও আলোড়নের পয়গম্বর। কিন্তু মওলানা সাহেব চিরকাল এগুলো উপেক্ষা করেছেন। দু'দিন আগেও যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে নির্জলা মিথ্যা ও জঘন্য কুৎসা রটনা করেছে সেও তাঁর সামনে এলে তিনি তার সংগে সস্নেহে সহাস্যে কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন আক্রোশ ও প্রতিশোধপরায়ণতার উর্ধ্বে। যিনিই তাঁর কাছে যেতেন তাকেই তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণ খুলে দোয়া করতেন। তাঁর এই শিশুসুলভ সারল্যেরও কদর্থ করা হয়েছে। মওলানা সাহেব সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে বলা হয় যে, তিনি প্রকৃতিগত-ভাবেই অপজিশনিস্ট। এটা সত্য যে, সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে প্রায় বরাবরই মওলানা সাহেব এস্টাবলিশমেণ্টের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি প্রকৃতিগতভাবেই বিরুদ্ধবাদী। লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসেই যাঁরা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন এবং জনগণের বিরুদ্ধে দমন নীতি চালিয়েছেন, মওলানা সাহেব তাঁদের সাপোর্ট করতে না পেরে থাকলে সেটা তাঁর দোষ নয়। সাপোর্ট করা যেতো না বলেই তিনি অপোজ করেছেন। ভাসানী সাহেব সানডে-পলিটিশিয়ান ছিলেন না (সানডে পলিটিশিয়ান কথাটা তিনিই 'কয়েন' করেছিলেন)। তিনি ছিলেন ম্যান অব-দি-মাসেজ। তিনি ছিলেন চাষী, মজুর, কামার-কুমার, জেলে-তাঁতীর আপন মানুষ। এক কথায় দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত, সর্ব-হারা জনগণের নেতা। এদের সংগে যারা দুশমনী করেছে তিনি ছিলেন তাদের দুশমন। মজলুমের পক্ষে জালেমের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম। তাঁর রাজনীতি কোন দিনই ক্ষমতার রাজনীতি ছিল না। সেজন্যই তাঁর দলই অটুট বা অখণ্ড থাকে নি। তিনি মহদুদ্দেশ্য নিয়ে জেল-জুলুম সহ্য করে বার বার দল গড়েছেন। তাঁর দলে অনেক লোকও জুটেছে। অল্পদিনেই দেখা গেছে জনকল্যাণের চেয়ে ক্ষমতার লোভই অনেকের বেশী। মওলানা সাহেব এসব সুবিধাবাদের সংগে আপোষ

www.pathagar.com

করতেন না। তাই হয় তিনিই দল ছেড়ে দিতেন, না হয় তাঁর দল ভেঙে সুবিধাবাদীরা বা বিশেষ তন্ত্রমন্ত্রবাদীরা ছিটকে পড়তো।

মওলানা সাহেব বামপন্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন, সেটা সত্য। আশ্রয় পেয়ে কম্যুনিস্টরা তাঁর নাম ভাংগিয়েছে। কখনও কখনও অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বলেছেন, 'যখন তোমাগের আশ্রয়স্থল ছিল না তখন আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি। এখন তোমরা আর আমাকে না জ্বালিয়ে নিজেদের দল গড়। আমাকে কম্যুনিস্ট বানাবার বৃথা চেস্টা করো না। আমার ইসলাম তোমাদের কম্যুনিজমের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক। আমি মুসলিম হিসাবেই মরবো, কখনো কম্যুনিস্ট হব না।' কিন্তু সব কিছুর পরেও এদেশে তিনিই ছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের জনক। কম্যুনিস্ট না হয়েও তিনি ছিলেন মাও সেতুং ও চৌ এন-লাইয়ের চীনের অনুরক্ত। স্নেহাস্পদ 'লুব্ধক' লিখেছেন যে, 'কার্লমার্কস একদা বলেছিলেন, আমি কার্লমার্কস কিন্তু মার্কসবাদী নই।' বর্তমান দেশে দেশে 'কমু' ও মার্কসবাদীদের কাণ্ডকারখানা দেখে কার্ল মার্কস বোধ করি কবরে পাশ ফিরে শুইছেন।

কিন্তু মওলানা ভাসানী কম্যুনিজম বা কোন বিশেষ তন্ত্রমন্ত্রের অনুসারী না হয়েও মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী একজন গণনেতা। স্বাধীনতার পর অথবা তারও পূর্বেই তিনি দিল্লী-মস্কোর আসল উদ্দেশ্য টের পেয়েছিলেন। এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাগ্রে তিনিই বলেছিলেন, 'নব্য স্বাধীন বাংলাদেশকে একনিষ্ঠুর ও নির্মম আধিপত্যবাদ ঘিরে ধরছে। এই আধিপত্যবাদকে সময় থাকতে প্রতিরোধ করতে না পারলে এ স্বাধীনতা টিকবে না, বরং বাংলাদেশ হবে বৃহৎ শক্তির ভূমণ্ডলীয় রাজনীতির দাবার ঘুটি, হয়ত বাংলাদেশ হবে আরেক সিকিম।' তাই বাহাত্তরের মধ্যভাগ থেকেই তাঁর কণ্ঠ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আধিপত্যবাদের অভিশাপ সম্পর্কে তিনি আপামর জনসাধারণকে অবিরাম হুঁশিয়ার করে দিতে থাকেন। তাঁর প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হক কথা' একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা হয়েও এদিক দিয়ে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। নির্ভীক 'হক কথা' আওয়ামী সেবাদাস দল ও তাদের বিদেশী প্রভুদের চরিত্র নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেয়। বৈদেশিক প্রভুদের

www.pathagar.com

ইংগিতে সেবাদাসরা 'হক কথা' বন্ধ করে দিলেও মওলানার 'খোৎবা' মুরীদানের উদ্দেশ্যে 'আরজ' বেরুতেই থাকে। কোন দিক দিয়েই না পেরে আওয়ামীরা তাঁকে অন্তরীণ করে। যে আওয়ামী মুসলিম লীগকে মওলানা ভাসানীই জন্ম দিয়েছিলেন সেই আওয়ামী লীগ সরকারই তাঁকে সন্তোষে গৃহবন্দী করে রাখে, তাঁকে পাহারা দেবার জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ীর সামনে একটা ক্যাম্প বসে যায়। কিন্তু এটা মওলানার রাজনৈতিক জীবনের ট্র্যাজেডি নয়। এ ট্রাজেডি তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগেরই। বস্তুত কমু-আওয়ামীদের ষড়যন্ত্রে মওলানা সাহেবের বন্দীদশা শুরু হয়েছিল একাত্তর সালে ওপারে থাকতেই। আধিপত্যবাদী ও তাদের সেবাদাসদের মতলব মওলানা সাহেব টের পেয়ে গেছেন, তিনি নীরবে বসে থাকবেন না এটা বুঝতে পেরে ওপারেই তাঁকে চিকিৎসার নাম করে অন্তরীণ কর রাখা হয়। মওলানা সাহেব এপারে এসে এতটুকু সময় নষ্ট না করে তাঁর দেশপ্রেমিক সংগ্রামী ভূমিকা শুরু করেন। তিনিই সর্ব প্রথম বেরুবাড়ী সেল আউটের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলেন। তাঁর সুদীর্ঘ ফারাক্কা মিছিল বা লং-মার্চ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী জাতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ। জাতি সেখান থেকেই হেজিমনির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করে। বাংলাদেশী জাতির আজ যে নব আত্মোপলব্ধি তারও সূচনা করে গেছেন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী মওলানা ভাসানীই। আওয়ামী বাকশালী আমলের বেপরওয়া লুট-পাট ও হাজার হাজার কোটি টাকার ধান, চাল, পাট, ত্রাণ সামগ্রী, সোনাদানা ও অন্যান্য সম্পদ পাচারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীই সর্বাগ্রে আওয়াজ তোলেন। আওয়ামীদের সৃষ্ট চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের ওয়ার্নিং মওলানা সাহেব তার অন্তত এক বছর আগেই দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারার্থেই জাতির বিবেক ও কণ্ঠস্বর। এই জাতি মরহুম মওলানা ভাসানীকে কোনদিনই ভুলবে না। তাঁর চরিত্র হননের কোন কমু-বাকশালী অপচেষ্টাকেও জনগণ সফল হতে দেবে না। মওলানা সাহেবের নির্দেশিত পথেই এই জাতি আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। ফারাক্কার একটা সম্মানজনক চুক্তি ইন্দিরা-উত্তর জনতা সরকার ও বাকশালোত্তর জিয়া সরকারের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা দেখবার জন্য ফারাক্কা লং-মার্চের লিজেণ্ডারি লীডার মওলানা ভাসানী আজ আমাদের মধ্যে নেই।

www.pathagar.com

মওলানা সাহেব ছিলেন বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ। কিন্তু তাঁর অন্তর বাঁধা ছিল মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারায়। তিরোধানের মাত্র পাঁচদিন পূর্বে সন্তোষে খোদাই খিদমতদার সমাবেশে বলেছিলেন, 'বার্ধক্য ও দীর্ঘ অসুস্থতা মাথায় লইয়া হয়ত বা শেষ বারের মত খানায়ে কা'বার তওয়াফ ও রসূলের (স.)-এর মাযার শরীফ যিয়ারতের নিয়ত করিয়াছি। আপনাদের সকলের দোয়ার বরকতে আল্লাহ আমার এই এরাদা পূরণ করিবেন এই উম্মিদ রাখি।' কিন্তু সেই এরাদা তাঁর পূর্ণ হয় নি। তার পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁকে উঠিয়ে নেন। কিন্তু খালেস নিয়তের মধ্যেই প্রকৃত পূর্ণতা। মু'মীনের প্রার্থনাই হচ্ছে 'ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'—নিশ্চয় আমার সব প্রার্থনা-উপাসনা, আমার সব সাধনা-কুরবানী, আমার সকল জীবন মরণ সকল বিশ্বের রব আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

মওলানা সাহেবের জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে এটা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় কোন কোন মহল এ নিয়েও বিতর্ক তুলেছে। এর উদ্দেশ্য,—অবয়ব, নামকরণ ও লোকেশন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, ১৯৭৬ সালের ৩১ শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত নয় দিন ধরে মক্কা আল মোকারমায় বাদশাহ আবদুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে (যার অন্যতম প্রধান কার্যনির্বাহী ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ।) ইসলামী শিক্ষার যে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, আমাদের ইসলামী বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় সেই রূপরেখাতেই প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার মতে আরেকটা বড় মাদ্রাসা না বানিয়ে সত্যিকার ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক এবং তাতে ইসলামিয়াত ছাড়াও বিজ্ঞান ও টেকনোলজিকে প্রাধান্য দেয়া হোক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ই হবে মরহুম মওলানা ভাসানীর উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ।

আমার সর্বশেষ কথা, মজলুম জনগণের মহান নেতা মওলানা ভাসানী আজীবন আধিপত্যবাদ, সামজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশী জাতি সেই সংগ্রাম জারী রেখেই মরহুম নেতার স্মৃতিপটে সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতে পারে।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মওলানা আবদুল হামিদ খানের জীবন-দর্শন

সপ্তরঙা রামধনুর মধ্যে মাত্র সাতটি রঙের রয়েছে সমাবেশ। পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিসত্তায় সাত গুণের চেয়েও আরও অনেক গুণ থাকে বিদ্যমান। পূর্ণ বিকশিত ইনসান-ই-কামিল না হলেও মওলানা ভাসানী সর্বসাধারণ সাধারণ মানুষ থেকে ছিলেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের। এজন্য তাঁর মধ্যে অনেক ব্যক্তি-সত্তার একত্র সমাবেশ ছিল পরিলক্ষিত। শরীয়তপন্থী সূফীতত্ত্ববাদী রাজ-নীতিবিদ, দুঃস্থ মানবতার বন্ধু, সর্বময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদকারী এমন কি জিহাদে অবতীর্ণ হতেও প্রস্তুত, এ আধুনিক মওলানার মধ্যে নানা গুণের একত্র সম্মিলনের জন্য কেউবা তাঁকে এভাবে, কেউবা তাঁকে অপরভাবে লক্ষ্য করে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। সেটি হচ্ছে তাঁর জীবন-দর্শন।

কোন মানুষের জীবন-দর্শনের সম্যক পরিচয় পেলে তাঁকে স্পষ্টভাবে বুঝবার চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়। কেননা জীবন দর্শনের আলোকেই আবর্তিত বা বিবর্তিত হয়। এজন্য ভাসানীর মওলানাকে স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য তাঁর জীবন-দর্শনের আলোচনা অপরিহার্য। তিনি এ জগত ও জীবন সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেন, জীবনের পরিণতি বা মূল্য সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কি সম্বন্ধ এবং এ জগতে কার প্রাধান্য বা সার্বভৌমত্ব রয়েছে ইত্যাকার প্রশ্ন তাঁর জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যা থেকে মীমাংসিত হতে পারে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা হলে তাঁর কৃতকর্ম ও গতিবিধি ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা অতি সহজ হয়ে যাবে।

ভাসানীর মওলানা ছিলেন আল্লাহ্‌র একত্ব ও সার্বভৌমত্বে অতিশয় নিষ্ঠাবান প্রত্যয়শীল। সৃষ্টিকর্তা, পালনকারী ও বিবর্তনকারীরূপে আল্লাহ্‌কে ধারণা করে তিনি তাঁকে এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌম শক্তি বলেও স্বীকার

www.pathagar.com

করতেন। মানবাত্মাকে তিনি অমর অব্যয় অক্ষয় বলে ধারণা করে, তাঁকে সেই সার্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন এক শর্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন। কুর-আনুল করীমের মৌলিক সূত্র অনুসারে মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর বিধানকে এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মার লয় হয় না। সে অন্য লোকে সম্পূর্ণ অচেনা ও অভিনব এক নতুন পর্যায়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। তবে তার বিগত জীবনের ক্রিয়াকলাপের ফলের সঙ্গে এ নতুন জীবনের ক্রিয়া-কলাপ পরস্পর বিরোধী নয়। এ সম্বন্ধে ইহলোকেই সে আশ্বাস পান এবং পরলোকে এ জীবনের মূল্যায়নের আলোকে বৃহত্তর জীবনের পথে সে অগ্রসর হয়।

কাজেই এ জীবনে মানুষকে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব তার নিজের প্রতি-নিধিত্ব-এ দুটো নীতির স্বীকৃতির ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে। এ বিশ্বের সকল সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ বলে তার ওপর কোন ব্যক্তির, শ্রেণীর, সমাজের বা রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই। ব্যক্তি মানুষ তার প্রয়োজন মতে এ সম্পদ ভোগ করতে পারে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছুই অপর মানুষের ভোগের ও কল্যাণের জন্য ত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজনেরও সীমা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ইমাম ইবনে হাযম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'মানুষের পক্ষে প্রয়োজন এমন সব খাদ্য যা তার শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে কর্মশক্তি সঞ্চার করে। তার পক্ষে প্রয়োজন এমন সব কাপড়-চোপড় যা তাকে লজ্জা-শরম থেকে যেমন বাঁচিয়ে রাখতে পারে তেমনি শীত-গ্রীষ্মের অত্যাচার থেকেও রক্ষা করতে পারে। কাজেই এরূপ কাপড় ব্যতীত অন্য নানাবিধ কাপড় তার পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। মানুষের পক্ষে এমন সব ঘরবাড়ীর প্রয়োজন যা তাদের সূর্যের উত্তাপ এবং বৃষ্টির অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।' মানুষ এখন তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকাশ পানে অবস্থিত দালান-কোঠার ভোগবিলাসে মত্ত হতে চান।

কাজেই আল্লাহ্‌র রবুবিয়তের সঙ্গে তার সুলতানাতের স্বীকৃতির ফলে মওলানা ভাসানী কোনদিন তাঁর মতবাদের বিপরীত কোন ভোগবিলাসে মত্ত হতে চান নি। তিনি এ বিশ্বের সম্পদকে সব সময়ই আল্লাহ্‌র সম্পদ জ্ঞান করে তা অপর মানুষের সঙ্গে একত্রে বসে ভাগ করার জন্য ছিলেন প্রস্তুত।

www.pathagar.com

তাঁর এ জীবন দর্শনের মধ্যে সমাজবাদের যথেষ্ট উপাদান ছিল বলে সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁকে তাদের মতবাদে বিশ্বাসী বলে দাবী করতেন। তবে তিনি যে নিরীশ্বরবাদী সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন না—এ সত্যটি প্রমাণ করার কোন অপেক্ষা রাখে না। তিনি নামায-রোযার অনুশীলনে ছিলেন প্রত্যয়শীল এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ছিলেন বিশ্বাসী।

তাঁকে সমাজতন্ত্রবাদী না বলে মানবতাবাদী বলাই অধিকতর সঙ্গত। কেননা রবুবিয়তের এ মৌলিক নীতি এ জগতে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভিত্তিভূমি বলে গণ্য হতে পারে। মানবতাবোধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ বিশ্বে মানুষের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, সকল ব্যাপারেই মানুষকে শীর্ষস্থানীয় জ্ঞান করে, মানুষের বিকাশের জন্যেই তাকে এক উপায় হিসেবে গণ্য করার মানসিক অবস্থার নামই মানবতাবাদ। শিল্প, সৌকর্য, স্থপতি, কারুকার্য, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, বিজ্ঞান, দর্শন অর্থাৎ মানব জীবনের কালচারের বিভিন্ন সৃষ্টি মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য। এমন কি ধর্মকেও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা মানবতাবাদের লক্ষ্য। মওলানা ভাসানীও এরূপ মনোভাব দ্বারা সর্বদাই পরিচালিত ছিলেন। তাঁর কাছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের সুস্থ বিকাশের জন্যে এসব বিভিন্ন শাখার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছ।

তিনিই ইসলাম ধর্মকে মানবতাবাদের বিকাশের পক্ষে এক মহান উপায় বলে গণ্য করে তাকে জীবনে রূপায়ণের জন্যে আজীবন সাধনা করেছেন। তবে নানা পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সে আদর্শের রূপায়ণের জন্যে তিনি নানাবিধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন। তার ফলে কোথাও বা আসামের বহিরাগত লোকদের ওপর অহমিয়াদের অত্যাচারকে বন্ধ করার জন্যে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তাকে এক বিশিষ্ট শ্রেণী সংগ্রাম বলা যায়। এ জন্য তাঁকে শ্রেণী সংগ্রামের নেতা বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। আবার বাংলা ভাষাকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে পাঞ্জাবীরা পাকিস্তান আমলে যে ষড়যন্ত্র করেছিলো, তখন তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীর গাজী বলেও অনেকে সম্মান করে থাকেন। আবার কুলি মজদুর প্রভৃতি মেহনতী মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার জন্যে বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন বলে তাঁকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বলে অনেকেই ভুল করেছেন। তিনি সব সময়ই ছিলেন মানবতাবাদী। তারই একটা দিক হিসাবে তাঁর আচরণে

www.pathagar.com

মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার যে অনিবার্য প্রেরণা দেখা দিয়েছে, তাকে সমাজতন্ত্রবাদী, শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী, বাংলা ভাষার জন্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হতে প্রস্তুত এক ব্যক্তি বলে গণ্য করা তাঁর প্রতি অবিচার বৈ আর কিছুই নয়!

আজকের দিনে এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবেই অবহিত হতে হবে। তা না হলে কানাদের হাতী দেখার মত ভাসানীর মওলানাও খণ্ডিত হয়ে ভবিষ্যতের বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে প্রতিভাত হবেন। তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মহামানবকে এভাবে ভবিষ্যতে অপমানিত হওয়ার মহাকলঙ্ক থেকে বাঁচাতে হলে এখন থেকেই এক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

www.pathagar.com

আলহাজ্জ ফজলুস সাত্তার

সমকালীন রাজনীতির অভিভাবক মওলানা ভাসানী

১৮৮০ থেকে ১৯৭৬। প্রায় এক শতাব্দীকাল ব্যাপ্ত একটি সংগ্রামী জীবন ছিল মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর।

শৈশবে মক্তব ও মাদ্রাসায় সামান্য শিক্ষা লাভের পর কৃষি কাজ, ভূমি কর্ষণ, বীজ বপণ, নিড়ানি দেওয়া, পানি সেচ, ফসল কাটা, দিন-মজুরী, মাছ ধরা প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের সব রকম কাজ করার মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর সহজ সরল সাদামাটা জীবনের সূচনা হয়। তিনি প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত শাহ নাসিরুদ্দিন বোগদাদী (র.)-এর সান্নিধ্যেও বহুদিন অতিবাহিত করেন।

তারপর আসে ভ্রমণের পালা। তিনি কিছুকাল 'দেওবন্দে' মওলানা হোসাইন আহমদ মদনীর নিকট কুরআন ও সুন্নাহ্‌র তালিম নেন। দেওবন্দের এই তালিমের তাছির তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। তৎকালীন দেওবন্দের সংগ্রামী ও সার্বজনীন ইসলামী তালিম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে।

কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে যায় মওলানার সংগ্রাম। এর সাথে যুক্ত হয় আসামের বঙ্গাল-খেদা আন্দোলন—আসে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের সংগ্রাম, সিলেটের রেফারেণ্ডাম—একের পর এক সংগ্রামের স্তর।

ইংরেজ ও তাদের এদেশী সহযোগী জমিদার-মহাজনদের চক্রান্তে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে মওলানা ডেরা গাড়েন আসামের দুর্গম জঙ্গলে। সেখানে ৫৬ হাজার হাড্ডিসার, দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন মানুষকে নিয়ে একদিকে বাঘ-ভল্লুক-হাতী প্রভৃতি হিংস্র বন্য জন্তুর এবং অন্যদিকে আরো হিংস্র সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর মরণপণ সংগ্রামের ইতিহাস

www.pathagar.com

আজ পরিণত হয়েছে লোক-গাঁথায়। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে থেকে প্রবল-পরাক্রান্ত সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে এমন নিরাপোষ সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস অন্তত এই উপমহাদেশে নজিরবিহীন। আসাম প্রবাসের আগে ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল এলাকার সন্তোষের জমিদার (সম্রাটজী) তোরাপ ফকির, ময়েজ ফকির প্রমুখের সংগ্রামের ঘটনা যে কোন রোমাঞ্চকর কাহিনীকে হার মানায়। হায়! সে সব ইতিহাস এদেশের মেহনতী নির্যাতিত মানুষের ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাবে কি?

পাকিস্তান কায়েমের পর সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সম্প্রসারণবাদবিরোধী চেতনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। পাকিস্তানের সর্বপ্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে এ বিরোধিতা ক্ষমতা কিংবা বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা নয়, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে শোষণ, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরোধিতা।

উপমহাদেশ বিভাগের সেই অগ্নিময় দিনগুলোতে তিনি বৃহত্তর বাংলার একমাত্র প্রবক্তা না হলেও এ ব্যাপারে ছিলেন সর্বাধিক সক্রিয় ও সোচ্চার। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সাথে তাঁর সম্পর্কের নিবিড়তার কারণে এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু, আবুল হাশিমের ভূমিকার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর ও মুখর ছিল। ১৯৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেও তাঁকে অনেকবার বলতে শুনেছি: 'আমার জীবদ্দশায় না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ওপারের বাংলা ভাষীরা দিল্লীর মুখে পদাঘাত করে এপারের বাঙ্গালীদের সাথে হাতে মিলাবে।'

মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিতে ও বাস্তবে ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বিশ্ব মানবের শান্তি ও মুক্তির সনদ। ইসলামের ইনসাফ কায়েমের জন্যে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে যাতে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সেজন্যে তিনি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। শুধু তাই নয়, তথাকথিত জাতি-ধর্মের বিভেদের শিকার হয়ে মানবতাকে যেভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয় তা চিরতরে খতম করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মীবাহিনী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কায়েম করেন বগুড়ার মহীপুরে হক্কুল এবাদ মিশন।

www.pathagar.com

১৯৫৭ সালে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী চক্রান্তে সুয়েজ আক্রান্ত হলে পাকিস্তান সরকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে চলে যাওয়ায় তিনি গঠন করেন সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও নাস্তিকতাবাদবিরোধী বিংশ শতাব্দীর সব চাইতে সংগ্রামী সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। বিভক্তি সত্ত্বেও ন্যাপের প্রতিটি অংশে আজো মওলানার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইঙ্গিত বহন করছে। ন্যাপের ১৯৬৮-৬৯-এর গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় মওলানার দূরদর্শিতা ও প্রগাঢ় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রজ্ঞার মূর্ত প্রকাশ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি—ঘোষণাকারী মূলত তিনিই। ইতিহাস আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা তার সাক্ষী।

বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের নাগপাশ হতে মুক্ত করার জন্যে মওলানা ভাসানী 'হুকুমতে রব্বানীয়া' কায়েমের মাধ্যমে রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন পাঠ বন্ধ, মাদ্রাসা শিক্ষার বিলোপ প্রচেষ্টা, কলাবোরেট আইনে ৩০ হাজার মানুষকে বিনা বিচারে আটক, ফজলুল হক মুসলিম হল, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেবার বিরুদ্ধে, সমাজে চোরাচালান, লাইসেন্স-পারমিট শিকারী, হাইজ্যাক-লুট-ধর্ষণ প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি পরিচালনা করেন নিরাপোষ সংগ্রাম।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সকল প্রকার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও তিনিই রুখে দাঁড়ান সর্বপ্রথম। একমাত্র প্রচণ্ড ঈমানের তেজ, সুষ্ঠু ও সঠিক রাজনীতি ও দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি মুকাবিলা করেন সীমান্তে দুই-দুইটি সশস্ত্র হামলা ও ফারাক্কা সমস্যার। এই দুই সমস্যার মুকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারকে ও জনগণকে প্রত্যক্ষ-ভাবে পরিচালিত করেন ও প্রেরণা যোগান মওলানা ভাসানী। সীমান্তে সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে কেউ যখন সাহস করে কিছু বলছে না, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ঐ সময় যখন ছিল সব কিছু বিশৃংখল, তখন বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে এই একটি মানুষকে দেখেছি সীমান্তে ছুটে যেতে—বাংলাদেশের নাগরিকগণকে তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে। সেদিন তিনি শুধু একজন মহান দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ নন, শুধু নন জনগণের মহান

www.pathagar.com

দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, নন মুরীদের ধর্মগুরু—সেদিন তাঁকে দেখা গেছে অমিত মনোবলের অধিকারী একজন সিপাহসালার হিসেবে—একটি মানুষ যেন একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাবাহিনী। সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত না থেকেও জাতি ও সরকারকে পরিচালনার এরূপ নজির বর্তমান দুনিয়ায় বিরল।

বাংলাদেশের মানুষের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্যে তিনি গঠন করেন জোয়ান কর্মীশিবির। সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও পরাজয়ের বিরুদ্ধে তিনি বাংলার মুসলমানদেরকে বার বার হুঁশিয়ার করে দেন।

শুধু রাজনীতি নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকেন নি, রবুবিয়াত বা পালনবাদের ভিত্তিতে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান-উপজাতি তথা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণমুখী শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মীবাহিনী সৃষ্টির জন্যে যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মডেল হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়। কুরআন সুন্নাহ্র তালিমসহ বৈজ্ঞানিক, কর্মমুখী স্বনির্ভর শিক্ষা-নীতি প্রবর্তনের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ও ৭ই নভেম্বরের পরিবর্তনের পটভূমিকায় সুন্নাহভিত্তিক সংবিধান রচনার আহ্বানসহ অনগ্রসর অর্থনীতির অভিশাপ-দুষ্ট সমাজে ক্ষমতার রাজনীতি পরিহার করে, সেবা-ধর্মে অনুপ্রাণিত করা, মাঠে-কারখানায় সর্বাধিক উপাদান ও সুষম বন্টন এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামের প্রেরণায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে গঠন করেন তাঁর জীবনের শেষ সংগঠন 'খোদায়ী খিদমতগার'।

মওলানা ভাসানী ছিলেন বাস্তব অর্থে জনগণের নেতা। তিনি বেশ-ভূষায়, কথাবার্তায়, খাওয়া-দাওয়ায়-থাকায় কোন সময়েই জনগণ হতে পৃথক ছিলেন না। জনগণের স্বার্থবিরোধী একটি কাজও জীবনে কখনো করেছেন বলে প্রমাণ নেই। জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাদের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পেরেছেন বলেই তিনি ছিলেন তাদের মুকুটহীন সম্রাট।

কথা ও কাজে এমন ঐক্য ও সর্ববিষয়ে মানব প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা ঈমানদার আর একজন নেতা, বিগত শতাব্দীতে নয়, হাজার বছরেও জন্মায় নি।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ

বাংলা-আসামের জননেতা

আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের অপর নাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এই গুণের জন্যেই অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মওলানা ভাসানী খ্যাতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন। শুধু বাংলাদেশেরই নয়, এমন কি এই উপমহাদেশেরও দু' একজন ছাড়া আর কারো ভাগ্যে এতটা খ্যাতি জোটে নি। কিন্তু এঁদের মধ্যেও মওলানা সাহেবকে নির্দ্বিধায় এক ব্যতিক্রম এ কারণে বলা যেতে পারে যে, তাঁর জন্ম একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এবং নিভৃত পল্লী অঞ্চলে। উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগই তিনি পান নি। খ্যাতির শৃঙ্গদেশে তাঁকে কেউ বসিয়েও দেন নি। প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁকে প্রতিটি সোপান অতিক্রম করতে হয়েছে। পাথেয় ছিল নিরলস সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে জনগণের কল্যাণ সাধনের বজ্রকঠিন সংকল্প। মওলানা সাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর এই দুর্গম যাত্রাপথের চড়াই উৎরাইর অনেক ঘটনা আমাদের অজানা থেকে গেল। কারণ জনাব এ. কে. ফজলুল হক, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব খাজা নাজিমউদ্দিন, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় তিনিও আত্মজীবনী লিখে যান নি। এমন কি তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা যেতে পারে লিখিতভাবে তেমন বিশেষ কোন উপকরণও আমাদের জন্য তিনি রেখে যান নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যুর পূর্ব দিবস সন্ধ্যায় আমার অনুজপ্রতিম মরহুম সাঈদুল হাসানের ইস্কাটনস্থ বাসভবনে কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে আত্মজীবনী রচনার জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানালে কিছুটা ইতস্ততঃ করার পর সম্মতি প্রকাশ করে বলেন,

www.pathagar.com

তিনি নিজে লিখতে পারবেন না, তিনি শুধু বলে যাবেন। একজন লিখে যাবেন যাঁর এ দেশের রাজনীতি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার স্নেহভাজন আনোয়ার জাহিদের নাম করি। মওলানা সাহেব আমার প্রস্তাবের ওপর কোন মন্তব্য না করে আমার কাছ থেকে জানতে চান, 'তাঁরা দু'জন কি একই আদর্শের অনুসারী।'

এর কতদিন পর তা এখন আর মনে পড়ে না। কোন এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্যে আমি সন্তোষ গমন করি। পর দিবস তাঁর পাঁচবিবি যাবার কথা। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, 'তুমিও আমার সাথে চলো। কাল না পার, তিন-চারদিন পর যাও। সেখানে তুমি এক মাস থাকবে। দিনে তুমি ঘুরে বেড়াবে। সন্ধ্যার পর আমরা বসবো। আমি স্মৃতিচারণ করতে থাকবো। তুমি লিখে যাবে।' পাকাপোক্ত কথা দিলাম না। ভাসা ভাসাভাবে বললাম, 'হাঁ যাবো। তবে পাঁচবিবির বাইরে আপনার সাথে কোথাও যাবো না।' আমার যাত্রার তারিখ অতঃপর তাঁকে বলে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। নির্দিষ্ট দিন প্রাতে সংবাদ-পত্রের পাতা খুলতেই নজরে পড়লো তাঁর সফরসূচী। সংবাদে বলা হয়েছিল, মওলানা পূর্বদিন কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলা সফরের উদ্দেশ্যে পাঁচবিবি ত্যাগ করেছেন। বলা অনাবশ্যক, আমাকে আর পাঁচবিবি যেতে হয় নি এবং আত্মজীবনী লেখার প্রশ্নটাও এরপর আমি পুনরায় উত্থাপন করি নি।

মওলানা সাহেবের মৃত্যুর পরক্ষণেই মনে হয়েছে তাঁকে এভাবে যেতে দেয়া আমাদের পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বছর। এত দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন কোন বাঙ্গালী মুসলমান পান নি। দীর্ঘায়ুর দিক দিয়ে ভাগ্যবান জনাব ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন ছিল অর্ধ শতাব্দীরও কিছু কম। কিন্তু মওলানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের তিন চতুর্থাংশ কেটেছে গ্রামঞ্চলে। এ দিক দিয়েও তিনি শুধু বাংলা ও আসামেই নন, সমগ্র উপমহাদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মওলানাকে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে দেখা যেত। অন্ততপক্ষে একবার আমি নিজেও তা প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গাই নামক এক এলাকায়। নব প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'ফাতেহা দোয়াজ দহম উপলক্ষে' আয়োজিত বিরাট

www.pathagar.com

এক সভা থেকে আমরা ফিরছিলাম। পায়ে হাঁটার এই দীর্ঘ পথে তিনি ছাড়া আমরা সবাই রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর ও আমাদের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি পশ্চাৎমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পুনর্মিলনের পর আবার হাঁটা শুরু হতো।

অতীতের কোন কোন স্মৃতিমন্থন উপলক্ষে মওলানা সাহেব এক রাত তেজপুরে আহারের সময় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তিনি যখন নৌকা থেকে ভাসান চরে অবতরণ করেন তখন তাঁর সাথে ছিল নেহাৎ গরীব চারজন লোক। এদের কারো কাছে টাকা-কড়ি বলতে কিছু ছিল না। এরা সাথে করে এনেছিল কয়েক সের চা'ল, কিছু চিড়া ও খেজুড়ের গুড়। নদীর পাড়িতে সব কিছুই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তারা যে গৃহস্থ বাড়ীতে উঠলেন সেই গৃহস্বামীরও অবস্থা ভাল ছিল না। তাকে ডেকে তিনটা টাকা দিয়ে তিনি বললেন, তাঁদের জন্যে যেন দু'বেলা আহারের ব্যবস্থা করা হয়। দু'বেলার স্থলে তাঁরা তিনদিন এই বাড়ীতে অবস্থান করেন। মওলানা সাহেব আমাকে বলেছেন যে, পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন, এই গৃহস্বামী তার একটা গাভী বিক্রি করে তাঁদেরকে তিন দিন খাইয়েছিলেন। এর আদি নিবাস ছিল রংপুর জেলায়।

মওলানা সাহেব বলতেন, নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে সেকালে কেউ কালাজ্বর, ডেঙ্গু জ্বর ও ঝাড়-জঙ্গলের দেশ আসামে যেত না। বাংলায় নিজেদের জেলায় জমিদারদের অত্যাচারে জর্জরিত এবং মহাজনের শোষণে নিঃস্ব হয়ে নিছক কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্যেই যারা আসাম উপত্যকায় আশ্রয় নিত তাদের মধ্যে একের প্রতি অপরের মমত্ববোধ ছিল অনুকরণীয়। বাংলার যে কোন স্থান থেকে কেউ সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তার আদর আপ্যায়নের জন্যে ছোট বড় সবাই ব্যাকুল হয়ে পড়তো। অজানা-অচেনা আগন্তুকের প্রতি এদের এই সহৃদয়তায় তিনি যে শুধু অভিভূত হয়ে পড়তেন তাই নয়, উপরন্তু বিস্ময় সহকারে ভাবতেন, এই গরীব ও অশিক্ষিত মানুষগুলো কত সরল এবং হৃদয়বান। অথচ এরাই হয় জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের প্রথম এবং সহজ শিকার।

মওলানা সাহেবের পীড়াপীড়িতে একবার আমি হামিদাবাদ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও সেবা সংস্থাগুলো দেখতে যাই। সারা রাত আমাদের

www.pathagar.com

মধ্যে নানা বিষয়ের উপর আলোচনা চলে। আলোচনার এক পর্যায়ে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মওলানা সাহেব বলেন, টাঙ্গাইল ও তরাসের দুটো গ্রেফতারী পরোয়ানা এড়িয়ে চলার জন্যেই তিনি আসামে পালিয়ে আসেন। এখানে বসবাসের কোন ইচ্ছা সে সময় তাঁর মনে জাগে নি। টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জে অবস্থানের সময় তিনি সময় সময় লোক মুখে আসামে বিশেষ করে গোয়ালপাড়ায় বহিরাগতদের ওপর নানা নির্যাতনের কথা শুনতেন কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু এখানে আসার পর তাঁর ভুল ভেঙে যায়। তিনি দেখতে এবং বুঝতে পারেন, বহিরাগত এই নিঃস্ব এবং অবলম্বনহীন চাষী মজুরদের ওপর সরকার ও আসামীয়রা সমান চটা। স্থানীয় মুসলমানদেরও একাংশ এদেরকে ভাল নজরে দেখতো না। এদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে তিনি স্থির করেন, এদের মধ্যেই তিনি থেকে যাবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা সমগ্র গোয়ালপাড়া এবং দরং জেলায় ছড়িয়ে পড়ায় সাথে সাথে প্রত্যহ তাঁর বাসস্থলে বহু লোকের সমাগম হতে থাকে। এদের নানা অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং দেন-দরবার করতে থাকেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেত না। কাজেই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে একটা সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে তিনি উদ্যোগ নেন। এই সংগঠনের নাম দেয়া হয়েছিল 'আসাম চাষী মজুর সমিতি'। এর সভাপতি ছিলেন তিনি এবং সম্পাদক ছিলেন নূরুল হক নামে এক বহিরাগত ব্যক্তি।

মওলানা সাহেব বলেন, সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাঁর কোন সময় আকর্ষণ ছিল না। সেজন্যে বেশ ক'বছর তিনি তা থেকে দূরে ছিলেন। তবে উপরিউক্ত দুই জেলা থেকে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রাগ্‌ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) আমলে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা তাঁর সমর্থন-পুষ্ট ছিলেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু-ই ছিলেন। এই পর্যায়ে আমার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আসাম ছিল তখন এক বিরাট পরিবর্তনের মুখে। সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষিত হবার সাথে সাথে নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্যে সর্বস্তরের লোক তাঁকে অনুরোধ জানাতে থাকে। এমন কি স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ্ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে পত্র পাঠান। পত্রে বলা হয়েছিল, তিনি প্রার্থী না হলে তাঁর নির্বাচনী এলাকা থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর জয় অনেকটা সুনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হন।

www.pathagar.com

আইন পরিষদের সদস্যপদ লাভের পূর্বেই পুনর্গঠিত মুসলিম লীগে তাঁর যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা তিনি আসাম প্রাদেশিক লীগের সংগঠক জনাব আবদুল মতিন চৌধুরীকে জানান। এ সংবাদ প্রচারিত হবার পর হিন্দুরা তাঁর অরাজনৈতিক সংগঠন থেকেও খসে পড়তে থাকে এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন, 'জালেমের কোন ধর্ম ও জাত নেই। জালেম মুসলমান হলে কি তার বিরোধিতা করা যাবে না? আমাদের ধর্মে তা বলে না। আমাদের হযরত (স.) মিসরের জালেম সম্রাট ফেরাউনের নিন্দা এবং পারস্য সম্রাট নওশের ওয়ানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন। অথচ এঁরা দু'জন-ই ছিলেন অমুসলমান। জালেম মুসলমান হোক কি হিন্দু হোক তার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম চলবে।'

আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে রাজনীতিবিদ ছাড়াও শিক্ষানুরাগী ও বিদ্রোৎসাহী বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আমাকে যেতে হয়েছে। কিন্তু মওলানা সাহেব ছিলেন এক্ষেত্রেও অনন্য। মওলানা সাহেব তাঁর দীর্ঘ জীবনে আসাম ও বাংলায় কয়েক হাজার সম্মেলন, সভা, ঘরোয়া বৈঠক ও মজলিস করে গেছেন। এসব উপলক্ষে যখনই তিনি কোথাও যেতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে স্থানীয় অন্যান্য সমস্যার সাথে শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা জানার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, অশিক্ষাই এদেশের বহুবিধ সমস্যার উৎস। এই উৎসের মুখ বন্ধের জন্যেই আসাম ও বাংলাদেশে পাঁচ শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই সংখ্যার মধ্যে কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যেই অজস্র অর্থ খরচ করতে হয়েছে। মওলানা সাহেব বলেছেন, অর্থের যোগান নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি। উদ্দেশ্য মহৎ হলে টাকার অভাব হয় না। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তিনি বলেন, গোয়ালপাড়ায় এক স্থানে ওয়াজ-মাহফিলে যোগদানের পর তিনি জানতে পারেন, বহিরাগত মুসলমানদের দানে নির্মিত একটি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মক্তবটা রাত্রির অন্ধকারে কে বা কারা পুড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাভাবে তারা নতুন করে সেটা নির্মাণ করতে পারছে না। প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর তিনি ঘোষণা করলেন, আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি এখানে ঢেউ টিনের ছাউনী-যুক্ত একটা মসজিদ ও মক্তব নির্মিত হয়েছে দেখতে চান। এই ঘোষণা

www.pathagar.com

বাতাসের বেগে পার্শ্ববর্তী আরো দুটো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য পশ্চিম আকাশে গড়িয়ে না পড়তেই তিনি দেখতে পান দলে দলে লোক সেদিকে আসছে। কারো মাথায় টিন, কারো কাঁধে বাঁশ, বেত, কারো মাথায় চা'ল-ডাল, লাউ-কুমড়া এবং কেউ কেউ জোট বেঁধে খুঁটি ইত্যাদি নিয়ে আসছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এত প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী এসে গেল যে, তিনি অবাক দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। অনেক হাঁস-মুরগী ছাড়াও দুটো গরু এবং পাঁচটা খাসীও আনা হয়েছিলো। এশার নামাযের পর মসজিদ ও মক্তব নির্মাণের কাজে লেগে যায় আড়াইশ' থেকে তিনশ' লোক। তারাই ঘোষণা করলো, ফযরের নামায তারা এই মসজিদে পড়বে এবং মক্তবের মওলবী সাহেব সকাল সাতটার সময় ছাত্রদেরকে পাঠ দেবেন। এই ঘোষণার ব্যতিক্রম ঘটে নি। দশটার সময় যখন তিনি সে স্থান ত্যাগ করেন তখন নাকি দু' সহস্রাধিক লোকের মুখমণ্ডল আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত ছিল। এসব কারণেই সাধারণত মওলানা সাহেবকে কেন্দ্র করে আসামে বহু কিংবদন্তী রচিত ও প্রচারিত ছিল। মওলানা সাহেবকে আমি কিন্তু কোন সময় অলৌকিক ক্ষমতার দাবী করতে দেখি নি।

মওলানা ভাসানীর আদর্শ পুরুষ ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আলী। তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন যে, তিনি এই মহান নেতার অনুচর হবার সুযোগ পান নি। তবে তিনি তাঁর স্মৃতি ধরে রাখবেন। সন্তোষের অদূরবর্তী কাগমারীতে প্রতিষ্ঠিত মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ উক্ত সংকল্পের সফল বাস্তবায়ন। আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে এবং আহার-বিহারে তিনি যেমন সরল ও সাদাসিধে ছিলেন তাঁর অন্তরটিও ছিল তেমনি কোমল এবং খোলামেলা। এতে সবারই ঠাঁই ছিল। গুণী, সৎ ও জনদরদী ব্যক্তিদের জাতিধর্ম, মতাদর্শ প্রভৃতি বিচার না করে তিনি তাঁদের প্রশংসায় মেতে উঠতেন। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত যোগ করছি। মওলানা আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘকাল কলকাতা গড়ের মাঠে ঈদের নামাযে ইমামতি করেছেন। তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর বিরোধিতা করতে থাকলে কলকাতার মুসলমানরা তাঁকে ইমামতির পদ থেকে অপসারিত করে তদস্থলে যুক্ত প্রদেশের মওলানা আজাদ সোব-হানীকে নিযুক্ত করেন। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর পর ১৯৪৩ সালে

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনের সময় এ্যাংলো-এরাবিক কলেজ প্রাঙ্গণে ডেলিগেটদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনার এক পর্যায়ে মওলানা সাহেব কলকাতার মুসলমান এবং মুসলিম লীগের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আবুল কালাম আজাদের স্থলে মওলানা আজাদ সোবহানীকে ইমাম নিযুক্ত না করে লীগ প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ সাহেবকেই নিযুক্ত করা উচিত।' মওলানার এই মন্তব্যে সমগ্র কলেজ প্রাঙ্গণ অট্টহাসিতে মুখর হয়ে ওঠে। সেই সময় জিন্নাহ সাহেবের ন্যায় ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করার মত সৎ সাহস একমাত্র মওলানা ভাসানীরই ছিল।

সত্যপ্রিয় নির্ভীক মওলানাকে জনগণের সত্যিকার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আসামে ও বাংলাদেশে বহুবার জীবনের ঝুঁকি নিতে দেখা গেছে। তিনি প্রয়াশ বলতেন, 'খাঁটি মুসলমানের মৃত্যু হয় মাত্র একবার এবং সেটা কখন, কোথায় কি অবস্থায় হবে তা শুধু আল্লাহ্‌তা'আলাই জানেন।' হোঁচট খেয়েও লোক মরতে দেখা যায়। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক লক্ষীন্দরের উল্লেখ করে তিনি বলতেন, 'লোহার সিন্দুকে থেকেও কি তিনি সর্প দংশন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন?'

স্পষ্টবাদিতার জন্যে মওলানা ভাসানী কোন কোন ব্যক্তি ও মহলের বিশেষ বিরাগভাজন ছিলেন। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হবার আসল কারণও ছিল এটা। আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর মতবিরোধের উল্লেখ করে করিমগঞ্জের এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই এবং লীগ প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য শুধু টুপির। একজন টুপি পরেন না, অপরজন পরেন। এজন্যে যদি স্যার সাদুল্লাহ্‌কে নিঃশর্ত সমর্থন জানাতে হয় তাহলে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করবেন।' মওলানা নিজেই টেলিগ্রামযোগে এই সভার বিবরণী সংবাদ সংস্থা ওরিয়েন্ট প্রেস অব ইণ্ডিয়ার কলিকাতা অফিসে পাঠিয়েছিলেন। আমি তা সমগ্র ভারতে প্রচার করি। এই মন্তব্যের জন্যে লীগ সেক্রেটারী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী মওলানা সাহেবকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠির বিষয়বস্তু তিনি কাউকে জানতে দেন নি।

এই সংগ্রামী জননায়কের সাথে দু'বার আমি সরকারী নির্দেশ অমান্যের সুযোগ গ্রহণ করি। প্রথম বার ১৯৪৪ সালে ধুবড়ীতে।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে পুলিশের লোকজন শোভাযাত্রায় বাধা দিতে এসে পরে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যান। পর দিবস সমগ্র এলাকা থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়। দ্বিতীয় দফার ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররমে। পূর্ব দিবস সন্ধ্যায় মওলানা সাহেব ঘোষণা করেন, পুলিশের গুলীতে নীলক্ষেতে নিহতদের আত্মার মাগফেরাতের জন্যে পর দিবস যোহরের নামাযের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা পাঠ এবং সে স্থান থেকে শোভাযাত্রা সহকারে হাই কোর্টের অদূরবর্তী জাতীয় সমাধি ক্ষেত্রে যাওয়া হবে।

৮ই ডিসেম্বর সকালে সারা শহরে প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, সরকার মিছিল বের করতে দেবেন না। আমরাও স্থির করি যে, মিছিল বের করবোই। তদনুসারে গায়েবানা জানাজার পর মসজিদের সোপানে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মিছিলের পুরোভাগে থাকবেন মওলানা সাহেব। তাঁর পশ্চাতে দু'জনের প্রথম সারিতে থাকবো আমি ও জনাব মশিয়ুর রহমান। এর পরের সারিগুলোতে থাকবেন ন্যাপের অন্যান্য কর্মী। আমরা যাত্রা করবো ঠিক এমন সময় পাঞ্জাবের মিয়া আরিফ ইফতেখার মিছিলে অংশ গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসলে আমরা তাঁকে প্রথম সারি ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় সারিতে স্থান গ্রহণ করি। মিছিল কয়েক গজ অগ্রসর না হতেই পুলিশ ও মিলিটারী আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সম্ভব হয় না। পরদিন দেখা হতেই তিনি মন্তব্য করলেন, 'খবরের কাগজগুলোর এতটা অধঃপতন ঘটলো কেন? দৈনিক সংবাদ ছাড়া অপর কোন কাগজে গায়েবানা জানাজা ও মিছিলের খবরটা যথাযোগ্যভাবে ছাপেনি।' সংবাদ মিছিলের ছবিটাও ছেপেছে। এটা প্রসঙ্গে তিনি সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন চৌধুরীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দীর্ঘ আলাপ ও আলোচনার সময় মওলানা সাহেব তাঁর পরিজন-বর্গের কোন উল্লেখ করতেন না। তাই গায়ে পড়ে শিলংয়ে একবার আমি প্রশ্ন করে জানতে চাই তিনি তাদের নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করেন কি? মওলানা সাহেব হেসে হেসে বললেন, 'আসামে পরপর চারটি সরকার এলো ও গেলো। কিন্তু কোন সরকারই আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি— বর্তমান সরকারও দিচ্ছে না।' কারো প্রশংসায় তিনি যেমন পঞ্চমুখ হতেন তেমনি কারো সমালোচনায় তিনি রেখে ঢেকে কিছু বলতেন না।

www.pathagar.com

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী শুধুমাত্র মজলুম জননেতা ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন মজলুম। আসাম প্রদেশে তাঁর জীবনের ১৩ বৎসর কেটেছে। এর মধ্যে আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য ছিলেন তিনি ১১ বছর। তাঁর সঙ্গে ৯ জন বাঙ্গালীও আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তাঁরই পার্টি ক্ষমতায় ছিল বহু বছর। তা সত্ত্বেও আসামের কারাগারে মওলানা ভাসানী কাটিয়েছেন ৮ বৎসর। মজলুম নির্যাতিত মানুষের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করতে গিয়ে তাঁকে নির্যাতিত হতে হয়েছে। তিনি গৃহবন্দী হয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন, ঘরবাড়ী হতে বিতাড়িত হয়েছেন বহুবার। দেশী আর বিলাতী শাসক কেউই তাদের গদী এবং সমর্থকদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে মওলানাকে কষ্ট দিতে বা কারারুদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি জেল খেটেছেন বৃটিশ-ভারতে, পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে একই কারণে। তাই দেশের নেতাদের মধ্যে মজলুম বিশেষণটি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানী সমকালীন ইতিহাসের এক বিরল, ব্যতিক্রমধর্মী অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর যেমন আছে লক্ষ লক্ষ অন্ধ ভক্ত ও অনুসারী তেমনি রয়েছে বহু সংখ্যক অন্ধবিরোধী ও নির্দয় সমালোচক। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে জাতির নিকট যা তিনি পেয়েছেন তার চেয়ে দিয়েছেন শত গুণ বেশী। জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় যাঁরা শুধু দিতেই আসে, নিতে নয়। মওলানা ভাসানী ছিলেন তেমন এক নিবেদিত প্রাণ আত্মত্যাগী নেতা। দেওয়া ছাড়া তাঁর চাওয়ার কিছুই ছিল না।

www.pathagar.com

রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া, আত্মীয়স্বজন বা পার্টি সমর্থকদেরকে ভাল চাকরি-বাকরি ও বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া বা গাড়ী-বাড়ী সম্পদ অর্জন কিছুই এ মানুষটির লক্ষ্য ছিল না। অসাধারণ মানবপ্রীতি এবং একনিষ্ঠ দেশসেবা ছিল এই অলোক-সামান্য মহান ত্যাগী নেতার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দুঃখী মানুষের দুঃখ মনে হয় এদেশের নেতাদের মধ্যে তাঁর মতো গভীরভাবে অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি।

মওলানা ভাসানী শুধুমাত্র তাঁর পার্টির সদস্যদের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংগালী জাতির সার্বজনীন নেতা। মওলানা ভাসানী ছিলেন এ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এবং সারা জাতির সম্পদ। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক পার্টি ছিল, রাজনৈতিক সংগী ছিল। তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল। তা সত্ত্বেও মনে হতো যেন এ মানুষটি সারা দেশ-বাসীর। তাঁকে নিয়ে গৌরব এবং গর্ব করার লোকেরা শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়। তাঁর অভাববোধ শুধু তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নয়, সারা দেশবাসীর। তিনি ছিলেন তাঁর নিজ পার্টি, বিরুদ্ধ পার্টি, যে কোন পার্টিরই সমর্থক নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত সর্বাহারা শ্রেণীর নেতা। কোন দুঃখী মানুষ তাঁর সাহায্য কামনা করলে, তাঁর মনে কখনও স্থান পায় নি যে, এ ব্যক্তি তো অপর এলাকার বা কোন বিশেষ পার্টির সদস্য। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আলোচনার আসর ছিল সকল দলের নেতা, উপ-নেতা, সকলের জন্যে অবারিত দ্বার। মওলানা ভাসানীর নিকট যত ভিন্ন এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দ বুদ্ধি পরামর্শ এবং শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন, এরূপ বোধ হয় বাংলাদেশের অন্য কোন নেতার নিকট যেতেন না।

মওলানা ভাসানী ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি পার্টিস্বার্থ, কোটারী স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সত্যিকার জাতীয় নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিরুদ্ধ পার্টির নেতা এবং কর্মীরা বাংলাদেশের যে নেতাকে সবচেয়ে কম খারাপ জানে এবং যাঁকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে, তিনি হলেন মওলানা ভাসানী।

মওলানা ভাসানী খাঁটি মুসলিম ছিলেন আর ছিলেন খাঁটি মানুষ। তাঁর সম্প্রদায় ছিল দরিদ্র কৃষক প্রজা। তারা হিন্দু হোক, মুসলমান

www.pathagar.com

হোক, তিনি ছিলেন তাদের মানুষ। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ছিল গৌণ, মনুষত্বই ছিল মুখ্য। সেজন্যে হিন্দু, মুসলিম, নাস্তিক—নির্বিশেষে সকলেই এই মহান অসাম্প্রদায়িক মানুষের সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ এবং প্রভাবিত হতো। সুখেন্দু দস্তিদার, চিন্ময় মুৎসুদ্দি, নির্মল সেন—কেউই তাঁর কাছে এসেও তার ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে নি। মওলানার মত অত উদার হলে ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মহীনদেরও ক্ষোভের কোন কারণ থাকে না।

জন্ম ঃ ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত ধানগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। শিশু আবদুল হামিদ ওরফে চেগা মিয়া ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহারা এবং এগার বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। আবদুল হামিদের দুই ভাই ও এক বোন ছিল। এর মধ্যেই তাঁর বড় ভাই আমীর আলী এবং ছোট ভাই মোহাম্মদ ইসমাইল মারা যান। ছোট বোন কুলসুম খাতুনসহ তিনি পিতৃব্য হাজী মোহাম্মদ ইবরাহিমের সংসারে পালিত হন। এগার বৎসর বয়সের মধ্যে মা, বাবা ভাইদের হারাবার বিরহ ব্যথাই হয়ত তাঁকে দুঃখী মানুষের দুঃখ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সাহায্য করেছিল।

জনাব ফিরোজ আল মুজাহিদ তাঁর রচিত 'মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন' শীর্ষক পুস্তক লিখেছেন যে, মওলানা ভাসানী 'এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে' জন্মগ্রহণ করেন। (পৃ. ১৬)। জনাব আরেফিন বাদল তাঁর সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানী' শীর্ষক পুস্তকে লিখেছেন, 'গ্রাম-বাংলার এক সাধারণ কৃষকের ঘরে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম' এবং তিনি ছিলেন. 'পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে উদ্ভূত একজন কৃষক গণতন্ত্রী' (পৃ. ১১)। মওলানা ভাসানী যে একজন সাধারণ কৃষক সন্তান ছিলেন এ ধারণা অনেকটা সার্বজনীন। কিন্তু ধারণাটি মনে হয় সত্য নয়। জনাব মাহবুবুল্লাহ তাঁর 'পুরোগামী জননেতা' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, মওলানার জন্ম হয়েছিল 'এক মাঝারী কৃষক পরিবারে।' জনাব মাহফুজুল্লাহ 'নিঃসংগ বিতর্কিত মওলানা ভাসানী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অতি সাধারণ পরিবার হতে মওলানা (ভাসানী) উঠে এসেছেন এবং গোটা পরিবারের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম তিনি।' জনাব বদরুদ্দিন উমর তাঁর 'কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী'

www.pathagar.com

শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, 'তিনি ছিলেন পেটি বুর্জোয়া কৃষক শ্রেণী হতে উদ্ভূত।'

সত্যিই কি মওলানা ভাসানী এক কৃষক সন্তান ছিলেন? মওলানা ভাসানী নিজের সম্বন্ধে এত কম আলোচনা করতেন যে, তাঁর চালচলন দেখে আধুনিক শিক্ষিতদের অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন একজন কৃষক সন্তান। এক সময় সমবায় সংগঠনের সাথে ছিলাম। তখনকার একটি ঘটনা মনে পড়ে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্যোগে ভূমিহীন এবং বিত্তহীনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে বিত্তহীন সমবায় সমিতি সংগঠিত হয়। কোন একটি বিত্তহীন সমবায় সমিতিতে এমন একজন সদস্য ছিলেন যাঁর পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নামে কয়েক শত একর জমি আছে। বিষয়টি সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের নজরে আসার পরে উক্ত বিত্তহীন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি অত্যন্ত জোরের সংগে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছেন, যতদিন তার কয়েক শত বিঘা জমির মালিক পিতা জীবিত আছেন ততদিন তিনি অবশ্যই বিত্তহীন। কারণ তার নামে এক ছটাক জমিও নেই। তার রসিকতায় হেসেছিলাম। চাষের জমির মালিক যে অর্থে চাষী মওলানা ভাসানীও সে অর্থে কৃষক সন্তান ছিলেন। শহরের চাকরিজীবীদের মধ্যে যারা চাষের জমি কামলা রেখে চাষাবাদ করেন তাদেরকে এক অর্থে কৃষক এবং তাদের সন্তানদেরকেও আমরা কৃষক সন্তানই বলতে পারি।

ভাসানীর পিতা শরাফত আলী খান মধ্যবিত্ত ছিলেন। যাঁদের পারিবারিক টাইটেল খান, তাঁরা এদেশে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কৃষক নন। শরাফত আলী খান সাহেব দরিদ্র খান ছিলেন না, সংগতিপন্ন খানই ছিলেন এবং তাঁর উনবিংশ শতাব্দীতে হজ্জে যাওয়ার মত সংগতিপন্ন অবস্থা ছিল। সিরাজগঞ্জ শহরে তাঁর একটি পৈতৃক জুতার দোকানও ছিল। তাঁর ভাই ও পিতাও হজ্জে গিয়েছিলেন।

আত্মীয়স্বজনকে রাজনৈতিক অংগনে না হলেও, চাকরি-বাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে দেওয়ার আগ্রহ মধ্যবিত্ত সমাজের সহজাত প্রবণতা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা ভাসানী এবং শহীদ জিয়াউর রহমান ছিলেন এর ব্যতিক্রম। যেহেতু মওলানা ভাসানীর কোন আত্মীয়-স্বজনকে রাজনৈতিক জীবনে কাছে রাখেন নি বা তাদের সুখ-সুবিধার

www.pathagar.com

জন্যে কোন চেষ্টাই করেন নি। তাই অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সকলেই বোধ হয় কৃষকই ছিলেন।

সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা শুধু পিতৃ পরিচয় দিয়ে নির্ণীত হয় না, শ্বশুরকুলের অবস্থা কেমন ছিল তাও অনেক ক্ষেত্রে প্রাসংগিক হয়। তথাকথিত কৃষক সন্তান ভাসানী কিন্তু বিয়ে করেন পাঁচবিবি পরগণার জমিদার সামিরউদ্দীন চৌধুরীর কন্যাকে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনীতির ধাপে ধাপে তাঁদের পরিবারগত সামাজিক পরিবেশ এবং পরিমণ্ডল উন্নততর হয়। কৃষক শ্রেণীতে যাঁর জন্ম তাঁর দ্বিতীয় জেনারেশন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়। যিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে উদ্ভূত তিনি জীবদ্দশায় মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এমন কি উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে উত্তরণ করেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বোধ হয় তাঁর পরিবার পরিজনদের জীবনযাত্রার মানই এদেশের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কাছে ছিল। মধ্যবিত্ত খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি পারিবারিক জীবনযাত্রার মান তো বাড়ান নি বরং সাধারণ মানুষের আরও কাছে চলে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী আলীমা চৌধুরী পাঁচবিবি পরগণার প্রভাবশালী জমিদার তনয়া হয়েও ভাসানীর সংসারে সাধারণ কৃষক কুলবধুর চেয়ে বেশী আরাম আয়েশ কখনও পান নি।

এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা ভাসানীই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি সামাজিক বিবর্তনে ক্রমশ উর্ধ্বে না উঠে যাদের দুঃখে তিনি দুঃখিত এবং যাদের ব্যথা বেদনার কথা আজীবন বলেছেন, তাদের সাথে মিশে গেছেন। তিনি তাদের সাথে এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে তাদের থেকে আলাদা মনে হতো না।

কৃষক প্রজার জন্যে ভাসানীর দুঃখ এবং কান্না কোন মেকি কান্না ছিল না। এ কান্না তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হতো। তাই মধ্যবিত্ত হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শয্যায় শুয়ে রাজনীতি না করে চাষীর কাঁথায় শুয়েছেন, তাদের থালে ভাত খেয়েছেন।

মওলানা ভাসানীর চালচলন, জীবনযাত্রার মান দেখেই অনেকে তাঁকে কৃষক সন্তান মনে করতেন, এমন কি তাঁর জীবনী লেখকদের

www.pathagar.com

অনেকেরই তাই ধারণা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে উদ্ভূত হয়ে যাঁরা কৃষক শ্রমিকের রাজনীতি করেন তাঁদের সচেতন মনে না হলেও অবচেতন মনে যাদের কথা সুস্পষ্ট থাকে, তিনি বলেছেন তিনি তাদের কেউ নন; তাদের সংগে তাঁর সম্পর্ক রাজনীতির। কিন্তু ভাসানী পল্লী-বাংলার মাটি এবং চাষীর এত কাছকাছি ছিলেন যে, তাঁর জীবনী লেখকগণও কৃষক প্রজার এই অকৃত্রিম বন্ধুর মধ্যে এবং কৃষকদের মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পান নি। এটি আমার মতে ভাসানী চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা জীবন ঃ ছোটবেলা ধানগড়া প্রাইমারী স্কুলে শিশু আবদুল হামিদ কিছুকাল লেখাপড়া করেন। কিন্তু বাঁধাধরা লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ ছিল খুবই কম। বরং বয়সে বড় ছেলেদের সংগে মিশে কুস্তি করা এবং লাঠি খেলা শেখার মধ্যেই ছিল তাঁর বেশী আনন্দ। তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুবই ভালো। লাঠি খেলা, কুস্তি ইত্যাদিতে তাঁর দেহ ছোটবেলা থেকেই সুঠাম ও সুগঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করার পূর্বেই আবদুল হামিদ স্কুল ছাড়েন।

কবিগানে কিশোর আবদুল হামিদের আগ্রহ ছিল প্রচুর। কবি-গান শুনতে শুনতে তরুণ কিশোর আবদুল হামিদ নিজেই গায়ক হয়ে ওঠেন। বয়স্ক কবিদের অনুকরণে তিনিও মঞ্চে পায়চারী করে গান ভাজতে পারতেন। ক্ষুদে কবিয়াল হিসাবে হাততালিও পেতেন খুব। ইতিমধ্যে গ্রামে এলো যাত্রার দল। যাত্রা শুনতে শুনতে তিনি যাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শরীর ভালো। গলাও ভালো। যাত্রা দলের নায়ক তাঁকে অভিনয় করার সুযোগ করে দেয়। যাত্রার অভিনয়ও তিনি ভালো করতেন। লেখাপড়া ছেড়ে আবদুল হামিদ এবার যাত্রায় মেতে উঠলেন। যাত্রাদলের সংগে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এর মধ্যে তাঁর চাচা হাজী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খবর নিয়ে তাঁকে যাত্রা দল থেকে ছাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে এলেন। মানুষ করার জন্যে ভর্তি করে দিলেন সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায়।

সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন মওলানা আবদুল বাকী। সর্বজনশ্রদ্ধেয় আদর্শপ্রবণ মানুষ তিনি। মা-বাবা মরা ভাতিজাটার দিকে একটু নজর রাখার জন্যে চাচারা মওলানা সাহেবকে অনেক অনুনয়বিনয়

www.pathagar.com

করলেন। মওলানা আবদুল বাকী সাহেব নজর ঠিকই দিলেন ; কিন্তু বনের পাখী পোষ মানাতে পারলেন না। মাদ্রাসার বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে কিছুতেই আবদুল হামিদের মন চাইত না। মওলানা বাকী দীর্ঘকাল তাঁকে মাদ্রাসায় রাখতে পারলেন না। কিন্তু ঘরছাড়া উদ্ভ্রান্ত এতিমের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং দরদের প্রভাবও দুর্দান্ত কিশোর ভাসানী এড়াতে পারলেন না। মাদ্রাসা ছাড়লেও সে মওলানা আবদুল বাকীকে ছাড়তে পারলেন না। তাঁর স্নেহের আকর্ষণে বার বার মওলানা আবদুল বাকীর বকাবকি শোনার জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের কাছে ফিরে আসতে হতো। এ সময় কিশোর ভাসানী নানা ধরনের শারীরিক কার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কখনও তিনি হলেন মুটে, কখনও কামলা, কখনও বাসার চাকর। কখনও বাবুর্চি। কোন প্রকার পরিশ্রমের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল না। শ্রমজীবীর কাজ করার ফলেই হয়ত তিনি শ্রমজীবীদের ব্যথা বেদনার চিরসাথী হতে পেরেছিলেন।

দেওবন্দ মাদ্রাসায় মওলানা ভাসানী ঃ তরুণ আবদুল হামিদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার লক্ষণ মওলানা আবদুল বাকী দেখেছিলেন। তাই যদিও তাঁকে নিজের মাদ্রাসায় ধরে রাখতে পারলেন না, কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওবন্দে পাঠিয়ে দিলেন। ভাবলেন দেওবন্দের বৃহত্তর এবং উন্নততর পরিবেশে এই দুর্দান্ত কিশোর জীবনের দিশা খুঁজে পাবে। দেওবন্দে না এলে হয়তো মওলানার জীবনধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হতো।

সংগ্রামী জীবনের শুরু ঃ দেওবন্দ হতে ফিরে এসে আবদুল হামিদ কিছুকাল কাগমারী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এ সময় কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে জমিদারের নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির সংগে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। ঋণভারগ্রস্ত কৃষক, কুমার, তাঁতীদের পক্ষ হয়ে তিনি সুদ মাফের জন্যে শুরু করেন মহাজনদের সংগে দেন-দরবার। মহাজন, নায়েব, গোমস্তারা মওলানা ভাসানীকে ঘরের খেয়ে অন্যের মোষ তাড়াবার ফজুল কাজ বাদ দিয়ে নিজের কাজ করার জন্যে উপদেশ দিলেন। কিন্তু কার উপদেশ কে শোনে? পরের কাজ করার জন্যেই জন্ম হয়েছে আবদুল হামিদের। সারাটা জীবনই তিনি নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অন্য মানুষের দুঃখে কেঁদেছেন, তাদের হয়ে সংগ্রাম করেছেন।

www.pathagar.com

জমিদারের নায়েব, আমলা এবং মহাজনরা নিজেদের এবং তাদের শিকার দরিদ্র নিরন্ন চাষী, মজুর ও খাতকদের মাঝখানে কোত্থেকে উড়ে আসা আপদ মওলানা আবদুল হামিদকে সরাবার জন্যে তাদের সনাতনী পন্থা অবলম্বন করলো। রুজু হলো মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক মিথ্যা মামলা। জারী হলো মওলানার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট। এ সমস্ত মামলার সাক্ষী যোগাড় করাও খুব কষ্টকর ছিল না। যাদের দুঃখে তিনি কাঁদছেন তাদেরকেই ফাঁদে ফেলে, ভয় দেখিয়ে, বশীভূত করে সাজানো হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। এ জাতীয় সাজানো মামলায় সরকারী প্রভাবের সূত্রে সাজানো সাক্ষীর সাক্ষ্যই হাকিম বিশ্বাস করতে বাধ্য হন।

অবস্থা বেগতিক দেখে মওলানার শুভাকাঙ্ক্ষী উস্তাদ মওলানা আবদুল বাকী কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ময়মনসিংহের গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে হালুয়াঘাটের নিকটস্থ কলা গ্রামে। এ গ্রামে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সূফী সাধক শাহ আবদ-আল নাসের আলী বোগদাদী সাহেব স্থাপন করেছিলেন একটি মাদ্রাসা। আবদুল হামিদ প্রথমে পরিচয় গোপন করে এ মাদ্রাসার হলেন ছাত্র। কিন্তু জীবন এবং দেশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এতো বেশী যে কিছুকালের মধ্যে তাঁর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল। দেওবন্দে লেখাপড়া করেছেন জানতে পেরে ছাত্ররা তাঁকে মওলানা টাইটেল দিয়ে দিল। ছাত্রদের দাবীর ফলে তিনি উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

হালুয়াঘাটে থাকাকালে তিনি শুনতে পান আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত জলেশ্বরে আস্তানা স্থাপনকারী সূফী দরবেশ শাহ আবদ-আল নাসের আলী বোগদাদী সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তীমূলক উপাখ্যান। তাঁর কেরামতি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে তিনি চলে যান শাহ সাহেবের আস্তানায় আসামের জলেশ্বরে। এখানে কিছুকাল পীর সাহেবকে প্রত্যক্ষ দর্শনের পর তিনি তাঁর মুরীদ হন এবং পরবর্তী ৩-৪ বৎসর পীর সাহেবের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেন। পীর সাহেবের নামানুসরেই তিনি তাঁর প্রথম পুত্রের নাম নাসের রাখেন। ১৩১১ বাংলা সনে ২৪ বৎসর বয়সে মওলানা সর্বপ্রথম আসামে পদার্পণ করেছিলেন, পীরের সান্নিধ্যে থাকার জন্য মুরীদ হিসাবে। আসাম ত্যাগ করেন তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের পীর হিসাবে।

www.pathagar.com

খেলাফত আন্দোলন ঃ ১৯১৯ সালে শুরু হয় অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলন। পীর সাহেবের দোয়া নিয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ উপলক্ষে তিনি ভারতের বহু স্থান সফর করেন। খেলাফত আন্দোলন তাঁর সম্মুখে এক অজানা ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দেয়। এ আন্দোলন চলাকালে আবদুল হামিদ খান সান্নিধ্যে আসেন মওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী, ওবায়দুল্লা সিন্ধী, আজাদ সুবাহানী, আবুল কালাম আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, সুভাষ বোস প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতবৃন্দের। তাঁদেরকে তিনি অতি নিকট হতে দেখার সুযোগ পান। তাঁদের সংগে আলাপ-আলোচনায় মওলানা আবদুল হামিদের চিন্তার পরিধি প্রসারিত হয় এবং কল্পনার নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

চৌরিচেরায় পুলিশ হত্যার কারণে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ করে প্রত্যাহার করলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম হতেই ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ত্যাগ এবং লেখাপড়া ছাড়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি তখন ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য। অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। কংগ্রেস অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন এবং ছাত্রদের স্কুল কলেজ ত্যাগ সম্পর্কীয় প্রস্তাবের ভোটাভুটিকালে হাজার হাজার ডেলিগেটদের মধ্যে মাত্র একটি হাত প্রস্তাবের বিপক্ষে উঠেছিল। সে হাতটি ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র। অসহযোগ আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার ডেলিগেট তখন নানারূপ ব্যঙ্গ চিৎকার করে জিন্নাহ্‌র উদ্যত হস্ত উত্তোলনের প্রতিবাদ করে-ছিলেন। কিন্তু গভীর আত্মপ্রত্যয়ী জিন্নাহ হাজার হাজার ডেলিগেটদের সম্মুখে নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছিলেন ঃ ইতিহাসই প্রমাণ করবে আপনারা সকলেই ভুল করছেন আর একমাত্র আমার বিবেচনাই সঠিক। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং আন্দোলন প্রত্যাহারের মাধ্যমে জিন্নাহ্‌র ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়। জিন্নাহ তখন বিক্ষুব্ধ চিত্তে ভারত ত্যাগ করে লণ্ডনে বসবাস করছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, ওটা ছিল তাঁর জীবনের হিমালয়স্বরূপ ভ্রান্তি।

ভারতের মুসলমানগণ মওলানা মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু তুরস্কে কামাল আতার্তুক খেলাফত বিলোপ করে এ আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এ অবস্থায়

www.pathagar.com

মওলানা মুহাম্মদ আলী হলেন হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি অসহযোগ আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলন কর্মসূচী হিসাবে মুসলমান ছেলেদেরকে স্কুল-কলেজ ছাড়তে বলেছিলেন। গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ও তাঁর নেতৃত্বে পরিকল্পিত খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তিনি আর সংগে সংগে নতুন কথা বলতে পারলেন না। অন্যদিকে জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ এবং অন্যান্য হিন্দু নেতাদের আন্দোলন এবং প্রচেষ্টায় হিন্দু ছেলেরা স্কুল-কলেজে ফিরে গেল। কিন্তু মুসলমান তরুণদেরকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ হযম করে, চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে আবার ইংরেজের স্কুলে ফিরে যেতে দিকনির্দেশ দেওয়ার মতো সর্বভারতীয় অপর কোন মুসলমান নেতা ছিলেন না। ফলে মুসলিম ছাত্রদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজে ফিরে গেল না। আর যেজন্য মুসলমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জেনারেশন পেছনে পড়ে গেল।

বাহাদুরাবাদ স্টিমার ঘাট মসজিদে ইমামতি ঃ খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর অন্য কোন দিক-নির্দেশনা না পেয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু নীরবে ঘরে বসে থাকার মত লোক তিনি ছিলেন না। করার মত কিছু না পেয়ে বাহাদুরাবাদ স্টিমার ঘাট মসজিদের ইমামের চাকরি গ্রহণ করেন। ইমামতির চেয়ে স্টিমার ঘাটে আগত এবং বিশ্রাম গ্রহণকারী যাত্রীদের সংগে আলাপ-আলোচনা এবং সংযোগ রক্ষা করার দিকেই ছিল তাঁর বেশী আগ্রহ। আবদুল হামিদ ছোটবেলা হতেই ছিলেন দরবারী মানুষ। লোকজন কাছে না থাকলে, কথাবার্তা না বলতে পারলে অস্বস্তি অনুভব করতেন। বাহাদুরাবাদ স্টিমার ঘাট মসজিদের ইমামতি তাঁর গণসংযোগ রক্ষায় বিশেষ সহায়ক ছিল। তোরাবগঞ্জের তোরাব ফকির, ধলেশ্বরীর চরের সম্রাট কইসসা দেওয়ান (কসিমুদ্দিন দেওয়ান) এবং পরবর্তী জীবনের বহু সাগরেদ মুরীদ এবং পরম বিশ্বস্ত মুজাহিদ কর্মীদের সংগে তাঁর আজীবন বন্ধুত্বের শুরু বাহাদুরাবাদ ঘাট মসজিদে ইমামতি কালেই। কসিমুদ্দিন দেওয়ান ১৯৭১ সালে শাহাদত বরণ করেন।

উত্তরবঙ্গের ভয়ঙ্কর বন্যা ঃ মওলানা ভাসানী বাহাদুরাবাদ ঘাট মসজিদে ইমামতি দীর্ঘদিন করতে পারেন নি। এ সময়ে সমস্ত উত্তর বঙ্গে

www.pathagar.com

ভয়ংকর বন্যা দেখা দেয়। দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়ার বিরাট অংশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বন্যা ও প্লাবনের ফলে গৃহহারা হয়। এ সময় মসজিদে ইমামতি করা মওলানার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মওলানা আবদুল হামিদ দুর্গত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বহু ত্রাণ শিবির খোলা হয়। একটি ত্রাণ শিবিরের নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। মওলানা আবদুল হামিদ নেতাজী সুভাষ বোসের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্গত মানবতার সেবায় লেগে গেলেন। এ সময় ত্রাণ কর্ম উপলক্ষে এবং নেতাজী সুভাষ বোসের ব্যক্তিত্বের আক-র্ষণে বহু সংখ্যক সচেতন রাজনৈতিক কর্মী একত্র হন। স্বাভাবিকভাবে এখানে রাজনৈতিক এবং দেশের আজাদী বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। সরকার আঁচ পেয়ে এই ত্রাণ শিবির রাজনীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে মওলানা আবদুল হামিদসহ বহুজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন। ফলে মওলানাকে গা ঢাকা দিয়ে অন্যত্র গমন করতে হলো।

শাদী মুবারকঃ বগুড়া জেলায় ত্রাণ কর্ম পরিচালনাকালে মওলানা ভাসানী পাঁচবিবি থানার বীর নগরের প্রভাবশালী জমিদার সামিরউদ্দীন চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সহকর্মী ভগবান দাসসহ আত্মগোপন করার একটি নিরাপদ স্থান তিনি পেলেন সামিরউদ্দীন চৌধুরীর বাড়ীতে। কিছু-দিন পর গ্রেফতারের আশংকা কিছুটা কমলো। মওলানা বাইরে চলাফেরা শুরু করলেন। বিনা কাজে জমিদার বাড়ীতে আর কয়দিনই বা থাকা যায়। তিনি জমিদার বাড়ীর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় জমিদার কন্যা আলীমা খাতুনকে তিনি পড়াতেন। জমিদার তাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা, সাংগঠনিক শক্তি, বাগ্মিতা ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন বরাবরই জমিদারবিরোধী। পাঁচবিবি বীর-নগরের জমিদার সামিরউদ্দীন চৌধুরী ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি জমিদার হয়েও জনগণের স্বার্থে জমিদারী পরিচালনা করতেন। মওলানা এখানেও কৃষক প্রজার পক্ষ হয়ে জমিদারের সংগে দেন-দরবার শুরু করেন।

সামিরউদ্দীন চৌধুরী তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, প্রজার স্বার্থেই তিনি জমিদারী পরিচালনা করেন এবং জমিদারী এবং প্রজার স্বার্থ

www.pathagar.com

রক্ষার খাতিরেই তাঁকে হয়ত এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে হয় যা প্রজাগণ পছন্দ করে না, যেমন পুত্রের স্বার্থে গৃহীত পিতার অনেক পদক্ষেপও পুত্রের পছন্দ হয় না। তাঁর চিন্তাধারার যথার্থতা প্রমাণের জন্যে জমিদারী স্টেট দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রজাকুলের মংগল সাধনের জন্যে তিনি মওলানাকে আহ্বান জানান। জমিদারী পরিচালনার কাজ মওলানার কিছুদিন ভালই লাগলো। জমিদার সামিরউদ্দীন তাঁর কল্যাণধর্মী জমিদারী পরিচালনার গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজের ১৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা আলীমা বেগমকে আবদুল হামিদ খানের সংগে বিয়ে দেন। ভাসানীর বয়স তখন ৩৫ বৎসর।

পত্নী আলীমা চৌধুরীর গর্ভে জন্ম হয় তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে। তাঁরা হলেন রিযিয়া বেগম, আবু নাসের খান, গোলাম কিবরিয়া খান এবং কনিষ্ঠা কন্যা মাহমুদা বেগম। মওলানার ছেলেমেয়েরা থাকত তাঁর থেকে বহুদূর। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জরিত কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা থাকতো সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে। বড় মেয়ে রিযিয়া বেগমের বিয়ে হয় পাবনার আইনজীবী জনাব আবদুস সবুর সরকারের সংগে এবং কনিষ্ঠা কন্যা মাহমুদা বেগমের বিয়ে হয় টাংগাইলের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শামসুল হকের সংগে। আবদুস সবুর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. ও এল. এল. বি. ডিগ্রী লাভ করেন। টাংগাইলস্থ মওলানার দ্বিতীয়া স্ত্রী বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই মারা যান। রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে মওলানা যে বিয়ে করেন, সে স্ত্রীর গর্ভের সন্তান আবু বকর ভাসানী, আনোয়ারা খাতুন এবং মনোয়ারা খাতুন। আনোয়ারা খাতুনের বিয়ে হয় মোতাহার হোসেনের সংগে। তিনি পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

পাঁচবিবির জমিদারীর কাজকর্ম এবং মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করার জন্যে প্রায়ই আবদুল হামিদকে কলকাতা যেতে হতো। কলকাতা গেলে মামলা দেখাশোনা বা জমিদারীর কাজকর্ম করা অপেক্ষা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংগে আলাপ আলোচনায়ই তাঁর সময় বেশী যেতো, জমিদারীর কাজকর্ম খুবই কম হতো। দীর্ঘকাল আবদুল হামিদ খান পাঁচবিবির জমিদারী পরিচালনা করেন নি। জমিদার হওয়া ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জমিদারী রক্ষা করতে হলে সরকারকে সময় মতো

www.pathagar.com

খাজনা দিতে হতো। সরকারী ট্রেজারিতে নিয়ম মতো নির্দিষ্ট তারিখে খাজনা জমা দিতে হলে প্রজার নিকট হতেও খাজনা আদায় করতে হতো। কিন্তু এ কাজে মওলানা ছিলেন অপারগ। খাজনা আদায় অপেক্ষা খাজনা মওকুফেই তিনি ছিলেন অধিকতর উৎসাহী। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই জমিদারী লাটে ওঠার আশংকা দেখা দেয়।

কাগমারীতে মওলানা ভাসানী ঃ এদিকে পাঁচবিবিতে প্রজারা মওলানা আবদুল হামিদের সহৃদয় পরিচালনায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করলেও সন্তোষের মহারাজার অন্যায় অত্যাচারে তথাকার প্রজাদের গণজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সন্তোষ এবং কাগমারী পরগণা হতে বহু সংখ্যক নিপীড়িত প্রজা মওলানাকে কাগমারী এসে তাদের জন্যে কিছু করতে অনুরোধ জানাতে থাকে। খাজনার অতিরিক্ত অন্যায় লেভী দিতে অতিষ্ঠ প্রজাকুল মওলানার সাহায্য কামনা করে। মওলানা এরূপ ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে খাজনা না দেওয়ার জন্যে প্রজাদেরকে উদ্বুদ্ধ এবং উত্তেজিত করতেন। কাগমারীর প্রজাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে পাঁচবিবির জমিদারী পরিচালনা ত্যাগ করে মওলানা কাগমারী আগমন করেন এবং সন্তোষের মহারাজার বিরুদ্ধে প্রজাদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। মওলানার সংগঠনী প্রচেষ্টা এবং সভা-সমিতির ফলে সন্তোষের মহারাজের বহুবিধ অন্যায় দাবী আদায়ের চেষ্টা ব্যাহত হয়।

সন্তোষের মহারাজা অগত্যা বৃটিশ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হন। মহারাজার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন বাংলার গভর্নর। সরকার একটি সহজ উপায় এবং কারণ পেয়ে গেলেন। যেহেতু মওলানা টাংগাইলের অধিবাসী নন এবং টাংগাইলে তাঁর কোন জায়গা জমি নেই, তাই সরকারের দৃষ্টিতে টাংগাইল থাকার কোন কারণ এবং প্রয়োজন নেই। ৭২ ঘন্টার মধ্যে টাংগাইল পরিত্যাগের জন্যে মওলানার প্রতি সরকারী নির্দেশ জারী হয়।

মওলানা আবদুল হামিদের প্রতি টাংগাইল ত্যাগের সরকারী নির্দেশ শুনে স্থানীয় কৃষককুলের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। তারা মওলানার অনুপ্রেরণা এবং আশ্রয়ের আশায় জমিদারেরর সংগে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন এবং জমিদারবিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। এখন তাদের উপর নেমে আসবে নানান অত্যাচার আর নিপীড়ন। মওলানা

www.pathagar.com

টাংগাইল ত্যাগের সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল তাঁর ভক্তদের করুণ কান্না ততই করুণতর হতে লাগলো।

টাংগাইল থাকার তিনি একটি অতি সহজ উপায় বের করে ফেললেন। তাঁরই গুণমুগ্ধ এক কৃষকের অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী কন্যাকে তিনি বিয়ে করে ফেললেন এবং স্ত্রীর চিকিৎসা এবং শ্বশুরের সম্পত্তি দেখাশুনার কারণে তাঁর টাংগাইল থাকার প্রয়োজন আছে বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আর্জি পেশ করলেন। ময়মনসিংহয়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মওলানার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে হাসলেন এবং তাঁর টাংগাইল পরিত্যাগের নির্দেশ প্রত্যাহার করলেন।

৭২ ঘন্টার মধ্যে টাংগাইল ত্যাগের সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহৃত হলেও মওলানা টাংগাইলে থাকতে পারলেন না। জমিদারের নায়েব, গোমস্তরা প্রজাদেরকে টাকা দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মওলানার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা রুজু করালো এবং একই সংগে অনেকগুলো গ্রেফতারী পরোয়ানা বের করালো। এবার ভক্তেরা মওলানাকে রক্ষা করার মানসে এখানে সেখানে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পুলিশের ইনফরমারদের বদৌলতে কোথাও টিকতে পারলেন না। তাই অবশেষে বাধ্য হয়ে কাগমারী ত্যাগ করেন। এদিকে তাঁর অসুস্থা দ্বিতীয় স্ত্রী বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

হজ্জ পালনঃ মওলানা ভাসানী জীবনে বহু বার হজ্জ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সংগে একত্রে হজ্জ সম্পাদনের জন্য মক্কায় গমন করেন। ঐ বৎসর বাদশাহ্ আবদুল আজীজ হাজীদের উপর সর্বপ্রথম ট্যাক্স বসান। তৎকালীন ভারতীয় টাকায় এই ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ৬০ টাকা। ১৯৮৩ সালে হজ্জের ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল বাংলাদেশী টাকায় ৪৭০০ টাকা। বহু হাজী ১৯৩৯ সালে এই ট্যাক্স আদায় করেন। কিন্তু বাংলা-আসামের ১৩৫ জন হাজী ট্যাক্স আদায় করতে না পারায় কারারুদ্ধ হন। এদের কারা-মুক্তির জন্যে মওলানা ভাসানী আন্দোলন শুরু করেন। এক পর্যায়ে বাদশাহ্ আবদুল আজিজের নিকট মওলানা ভাসানীকে নেওয়া হয়। বাদশাহ্ বললেন, ‘যাদের সংগতি আছে তারাই শুধু হজ্জ করতে আসবে। যারা হজ্জের ব্যয় বহন করতে না পারে ত'রা হজ্জ করতে আসে কেন ?’

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী বাদশাহ্‌র সংগে উর্দুতে কথা বলছিলেন। তাঁর সংগে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বজলুস সাত্তার। মওলানা ভাসানীর কথা বাদশাহ্‌কে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে একজন হিন্দুস্থানী অনুবাদক ছিল। তখন আরবে হিন্দুস্থানীদের বেশ প্রভাব ছিল এবং রাজ দরবারে একাধিক হিন্দুস্থানী অনুবাদকের কাজ করতেন। মওলানা ভাসানী বাদশাহ্‌র যুক্তি মানতে রাজী হলেন না। তাঁর যুক্তি, যাদের হৃদয়ে আরজু আছে, তাদের সংগতি না থাকলেও তারা যদি কষ্ট করে হজ্জ পালন করতে চায়, তবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র ঘর যেয়ারতে বাধা দেওয়া কারো উচিত নয়।

নতুন ট্যাক্স সম্বন্ধে মওলানা ভাসানী বললেন, 'বিনা নোটিশে এরূপ ট্যাক্স ধার্য করা বাদশাহ্‌র অন্যায়। কারণ বাংলা-আসামের বহু হাজী ছয় মাস, এক বৎসর পূর্বে বাড়ী হতে পদব্রজে রওয়ানা হয়ে আরবে পৌঁছেছে। কেউ বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছে জাহাজে জেদ্দা পৌঁছেছে। তারা আরবে প্রবেশ করার পূর্বে জানত না যে, তাদের ব্যক্তিগত খরচের উপরেও বাদশাহ্‌কে হজ্জের জন্যে ট্যাক্স দিতে হবে। তাদের উপর হঠাৎ করে ট্যাক্স ধার্য করা অন্যায় এবং অযৌক্তিক।' মওলানা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং তেজোদীপ্ত ভাষায় নির্ভয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন এবং অনেক টানা-হেঁচড়ার পর হাজীদের মুক্ত করেন। হজ্জ সমাপনের পর মওলানা বাদশাহ্‌র প্রাসাদে খানাপিনার দাওয়াত পান। তাঁকে এবং বজলুস সাত্তারকে একটি পুরা দুম্বা খেতে দেওয়া হয়। তিনি শুনতে পান যে, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ফেলে দেওয়া হবে। এতেও মওলানা ভাসানী বিক্ষুব্ধ হয়ে সেখানেই মেহমানদারীতে এরূপ অপচয়ের প্রতিবাদ করেন।

আসামে আবদুল হামিদ খান ঃ বেশী দিন আগের কথা নয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই গাছগাছড়া, বন-জংগলে ভরা, সাপ-সিংহ, বাঘ-ভল্লুক অধ্যুষিত ছিল আসাম প্রদেশের বিপুল অংশ। প্রদেশ বড়, জনসংখ্যা কম, রাজস্বও কম। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে। বন-জংগল কেটে আসাম প্রদেশ আবাদ করার জন্যে প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষকের। আসামের প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের উৎপাদন এবং রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হতে কৃষক শ্রমিককে আসামে যেতে উৎসাহিত করতেন। ময়মনসিংহ, টাংগাইল, পাবনা জেলার বহু জমিদার ও নায়েব-গোমস্তা কর্তৃক বিতাড়িত নিঃস্ব কৃষক জীবিকার

www.pathagar.com

সন্ধানে চলে যেতেন জংলাকীর্ণ আসামে। বন্য জন্তু-জানোয়ারের সংগে সংগ্রাম করে তারা আসামের বিস্তৃত ভূমি আবাদ করেন।

কাগমারী, সিরাজগঞ্জে মওলানা ভাসানী দেখেছেন কৃষকদের অসহায় দুর্দশা। তাঁর সংবেদনশীল মন কেঁদে উঠলেও জমিদারদের অত্যাচারে তিনি টাংগাইল থাকতে পারলেন না, এলেন জংগলাকীর্ণ আসামে। এখানেও সেই অবস্থা, উৎপীড়ন-লাঞ্ছনার শিকার গরীব সহায়হীন মানুষ। তবে শোষকের পরিচয় স্বতন্ত্র কিন্তু জাতিসত্তা এক।

আল্লাহ্‌র যমিনে আল্লাহ্‌র বান্দা মাথা গুঁজবার ঠাঁই চায়। চায় জীবনধারণের জন্যে একটুখানি জমি। কিন্তু জমি প্রচুর পড়ে আছে অনাবাদী। অথচ দুঃখী মানুষের ভোগের অধিকার নেই। আসামের বাস্তুহারাদের নিকট মওলানা ভাসানী আবির্ভূত হলেন ত্রাণকর্তারূপে।

টাংগাইলের এস. ডি. ও. ফারুকী সাহেবের ইস্যু করা গ্রেফতারী এড়াবার জন্যে আবদুল হামিদ খান ১৯২৮ সালে আসামের ঘাগমারার গভীর জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে জংগল কেটে এক টাকা চৌদ্দ আনা ব্যয়ে তিনি একটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী আলীমা খাতুন পাঁচবিবির জমিদার বাড়ী ছেড়ে স্বামীর সংগে এই কুঁড়ে ঘরে মিলিত হন।

ঘাগমারার জংগলে মওলানা ভাসানীর প্রধান কাজই হলো জংগল কেটে আবাদযোগ্য ভূমি বৃদ্ধি করে নতুন বসতি স্থাপন করা। স্থানীয় জনসাধারণ অবসর সময়ে মওলানার নেতৃত্বে জংগল পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেলো। টাংগাইলের নিপীড়িত প্রজারা এসে ঘাগমারীর জংগল কেটে নতুন বসতি স্থাপন করতে লাগলো। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মওলানা আবদুল হামিদের নেতৃত্বে ঘাগমারায় বৃহৎ জনপদ স্থাপিত হলো।

কৃষক কিষাণীর কথাবার্তা, তরুণ কিশোরদের হাস্যোচ্ছাস, যুবক লাঠিয়ালদের হাঁক-ডাক, ছেলেমেয়েদের কলকাকলীতে ঘাগমারা একটি সুখী জনপদে পরিণত হলো। মওলানা আবদুল হামিদ শুধু কৃষকের জন্যে জমির ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং উন্নতির জন্যে তিনি এখানে স্থাপন করলেন প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, মাদ্রাসা এবং

www.pathagar.com

ইসলামিয়া কলেজ, পশু চিকিৎসালয় ইত্যাদি। মওলানার অনুসারী ভক্তগণ এ অঞ্চলটির নাম বদলিয়ে নতুন নামকরণ করল হামিদাবাদ। হামিদাবাদে তাঁর করণীয় কাজগুলো শেষ করে তথাকার ভক্তদেরকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার নসিহত করে তাঁর নিজের যা কিছু ছিল সবই স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে মওলানা নতুন কর্মস্থল গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যস্থ ভাসান চরে চলে গেলেন।

ভাসান চরে আবদুল হামিদঃ এই চরের সমস্যা ছিল ঘাগমারার অরণ্য হতে ভিন্ন ধরনের। চরটি ছিল একটি ভাসমান দ্বীপের মতো। বর্ষাকালে এর বেশীর ভাগই ডুবে যেতো। ফলে অধিবাসীদেরকে ঘর-বাড়ী ছেড়ে প্রাণরক্ষার জন্যে উঁচু অংশে দ্রুত আশ্রয় নিতে হতো। মওলানা হুজুরকে এ চরের অধিবাসীরা এখানে নিয়ে আসে এক মহফিলে তাদের চর যেন ডুবে না যায় সেজন্যে দোয়া করতে। এ চরের দরিদ্র অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি তাদের মধ্যে থেকে যেতে রাজী হলেন। কিন্তু মওলানার স্ত্রী ঘাগমারার জংগলে বাঘ-ভল্লুকের ভয়ে দীর্ঘদিন ভীত-কম্পিত জীবন যাপন করে নতুন করে আবার সাপ আর কুমীরের প্রতিবেশী হয়ে চরে থাকতে চাইলেন না। ঘাগমারার জংগল পরিত্যাগের সুযোগে তিনি পাঁচবিবিতে চলে এলেন। কিন্তু মওলানাকে আনতে পারলেন না। তিনি চরবাসীদের মধ্যে থেকে গেলেন। এখানে শুরু হলো মওলানার নতুন জীবন ও কাজ।

ঘাগমারার জংগল পরিষ্কার করে মওলানা আবাদযোগ্য ভূমি প্রসারের নির্দেশ দিতেন। এখানে বালু চরে মাটি কেটে বাঁধ দিয়ে বসতি রক্ষার দাওয়াই দিলেন। মওলানার নেতৃত্বে মাটি কেটে বাঁধ নির্মাণের কাজে স্থানীয় জনগণ লেগে গেল। এক এক বৎসর এক এক এলাকায় বাঁধ নির্মাণ শুরু করে সে এলাকা প্লাবন হতে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। এখানে একটি কিংবদন্তী আছে যে, এ চরে যেখানে মওলানা হুজুর দোয়া করেছেন এবং দীর্ঘদিন থেকেছেন সে এলাকা আর পানিতে না ডুবে ভাসমানই থেকে যেতো। মওলানার কাজই ছিল ডুবন্ত চর ভাসান। তাই মওলানার নাম হলো ভাসানী এবং চরের নাম হলো ভাসানীর চর। ভাসান চরে মওলানা হুজুরকে স্থানীয় জনসাধারণ মওলানা

www.pathagar.com

ভাসানী নামে অভিহিত করতো আর এ নামেই তিনি স্বনামধন্য হয়েছেন। ১৯৭১ সালে মওলানা শেষ বারের মত ভাসান চরে যান, তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল-মাদ্রাসাগুলো বিলীন হয়ে গেছে। মাদ্রাসা যেখানে ছিল তারই কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানহারা পিতার ন্যায় কেঁদেছিলেন তিনি।

লাইন প্রথা ঃ ইউরোপের বর্ধিত জনসংখ্যা আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া দু'টি মহাদেশে নতুন বসতি স্থাপন করে। তাদেরকে এ দু'টি মহাদেশ হতে উৎখাতের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু আসাম প্রদেশের বাংগালী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অসমীয়ারা আসাম প্রদেশে বাংলাদেশীদের বসতি স্থাপনে আপত্তি করে বসে। যদিও ভারত শাসন আইনের ৮৯ ধারা মতে এক প্রদেশের অধিবাসীদের অন্য প্রদেশে বসতি স্থাপনের আইনগত অধিকার ছিল, আসাম সরকার আইন করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাংগালীরা একটি নির্দিষ্ট লাইনের উপরে নতুন বসতি স্থাপন করতে পারবে না এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের পরে যারা আসামে প্রবেশ করেছে তাদের আসাম থাকার অধিকার থাকবে না। কিন্তু বাংগালীদেরকে আসামে থাকার জন্যে যে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল অতি অপর্যাপ্ত। তদুপরি যে লাইন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তার ভিতরেও লক্ষ লক্ষ বাংগালী বহু পূর্বেই বসতি স্থাপন করেছিল। এ সমস্ত বাংগালীকে আসাম থেকে বহিষ্কারের জন্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় আসামীদের মধ্যে বাংগাল খেদাও আন্দোলন। বন-জংগল পরিষ্কার করে বাংগালীদের আবাদ করা জমি দখল করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

আসামের নঁওগা, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, কাছালং, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, কাছাড় নো ম্যান্স ল্যাণ্ড এলাকায় হাড়ভাংগা পরিশ্রম করে বিস্তৃত এলাকা আবাদ করেছিলেন বাংগালী কৃষক। কিন্তু সরকার এ সমস্ত এলাকা হতে মুসলমানদের উৎখাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশীদের উপর শুরু হয় নানারূপ নির্যাতন। হাতী দিয়ে তাদের বাড়ী ভেঙে দেওয়া হতো, মাড়িয়ে শস্য নষ্ট করে দেওয়া হতো, পাহাড়িয়ারা যে বিষাক্ত তীর দিয়ে বাঘ-ভল্লুক শিকার করতো, তাই নিক্ষেপ করে হত্যা করতো বাংগালীদেরকে।

বাংগাল খেদাও আন্দোলন প্রতিরোধ এবং লাইন প্রথা লংঘন আন্দোলনের সময় বাস্তুহারা বাংগালী কৃষকদের উপর আসামের জমিদারদের

www.pathagar.com

নানারূপ বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সুসাহিত্যিক প্রমথেশ বড়ুয়ার পিতা ছিলেন গোয়ালপাড়া স্টেটের জমিদার। তিনি হুকুম জারী করেন যে, তার জমিদারীতে কেউ গরু জবাই করতে পারবে না। জমিদারের এ অন্যায় প্রতিহত করার জন্যে মওলানা ভাসানী গরু জবাই সম্মেলন আহ্বান করে গোয়ালপাড়ায় ওরশ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯৩৬ সাল হতে প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত লাইন প্রথা-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন মওলানা ভাসানী। আসামের উচ্ছেদকৃত বাস্তুহারা কৃষকদের নিকট মওলানা ভাসানী আবিষ্কৃত হয়েছিলেন ত্রাণকর্তারূপে। এ সমস্ত কৃষকদের চরম দুর্দশার দিনগুলোতে সুদূর বাংলা হতে কোন বড় নেতা তাদের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করতে আসাম যান নি।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আসামের বাংগালী কৃষকগণ লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হয় এবং লাইন প্রথা ভঙ্গ করে। ভগ্নপ্রায় হীনবল কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং সংগ্রামের অগ্নি প্রজ্বলিত করার উদ্দেশ্যে ভাসানী বিরাট বিরাট কৃষক সম্মেলন আহ্বান করতেন।

তেজপুর জেলার মংগলদই এলাকায় আসাম সরকারের নির্দেশে পুলিশ হাতী বাহিনী দিয়ে বাংগালীদের এলাকায় নির্মম এবং বর্বর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে। হাতী বাহিনী দ্বারা কৃষকদের ঘরবাড়ী ভেঙে দিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। গৃহের আসবাবপত্র সরাবার সুযোগও দেওয়া হয় নি। এ এলাকায় হাতী দিয়ে মাড়িয়ে শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এই বর্বরোচিত নাটকের অভিনয়ের কেন্দ্রস্থল মংগলদইতে মওলানা ভাসানী আহ্বান করেন আসাম প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন। এরূপ এক সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তাঁর মতে মংগলদইতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে কৃষকদের সংখ্যা কোন প্রকারে দু'লাখের কম হবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণকে মংগলদই-এর কৃষকদের উপর কিরূপ

www.pathagar.com

অত্যাচার হয়েছে তা প্রদর্শন এবং কৃষকদেরকে আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনে উৎসাহী এবং সংহত করার উদ্দেশ্যে এই নারকীয় হত্যানুষ্ঠানের কেন্দ্রভূমিতে মওলানা ভাসানী প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন।

১৩৪২ সালে লাইন প্রথা ভাঙার প্রদীপ্ত শপথ নিয়ে মওলানা ভাসানী ভাসান চরে আহ্বান করেন এক ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলন শুধু সারা আসাম নয়, সারা উপমহাদেশে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। আসাম প্রদেশে মওলানা ভাসানীর সাফল্যে কোন দিক দিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার মহাত্মা গান্ধীর সাফল্য হতে কম ছিল না, বরং বহুক্ষেত্রেই অধিকতর সফল ও রোমাঞ্চকর।

টাংগাইলের বন্যা ঃ ১৯৩৭ সালে ময়মনসিংহ, পাবনা, রংপুর অঞ্চলে বিরাট বন্যা হয়। ঘরবাড়ী ভেসে যায় বন্যার স্রোতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় গৃহহারা। যদিও লাইন প্রথা এবং বাংগাল খেদাওবিরোধী আন্দোলনে মওলানা ভাসানী ছিলেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কিন্তু টাংগাইলের বন্যার সংবাদে তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। প্রচুর রিলিফ দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে তিনি এলেন টাংগাইলে। বন্যার সময়ে জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে বিতরণ করলেন যৎসামান্য যা তিনি আসাম হতে এনেছিলেন এবং স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন।

সন্তোষে মসজিদ নির্মাণ ঃ বন্যার প্রকোপ কমে যাওয়ার পর কাগমারীস্থ হযরত শাহ জামানের মাযারে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন মওলানা ভাসানী। কিন্তু সন্তোষের জমিদার মসজিদ নির্মাণেও দিল বাধা। কিন্তু মওলানা ভাসানী এ বাধায় নিরস্ত হওয়ার লোক নন। তিনি জনগণের নিকট থেকে মসজিদ নির্মাণের চাঁদা সংগ্রহ করতে লাগলেন। জনগণও তাদের বিভিন্ন সুখ-দুঃখের কাহিনী মওলানাকে জানাতে লাগল—বিশেষ করে জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচার অবিচারের কথা। মওলানা ভাসানী জমিদারের খাজনা ব্যতীত অন্য যে কোন দাবী না পূরণের জন্যে জনগণকে নির্দেশ দিলেন। জমিদার তাঁকে পুনরায় সন্তোষ হতে বিতাড়নের পাঁয়তারা করতে লাগলেন। সক্ষমও হয়েছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি জনগণের পক্ষ হতে সন্তোষের জমিদারীর অধিকার জনগণের দাবী করে বসলেন এবং জমিদারকে জমিদারী হস্তান্তর করে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি জনগণকে

www.pathagar.com

অবহিত করলেন কাগমারী পরগণার অতীত ইতিহাস। হযরত শাহ জামান (র.) সমগ্র কাগমারী পরগণা, (পূর্ব নাম খোশনাথপুর) তামার পাতে লেখা সনদের মাধ্যমে পেয়েছিলেন সম্রাট আওরংগজেব হতে দীন ইসলাম প্রচার এবং জনসেবার উদ্দেশ্যে। বর্তমান জমিদারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন এই শাহ জামানের পরিত্যক্ত জনগণের সেবায় প্রদত্ত লাখেরাজ সম্পত্তির নায়েব। শাহ জামান নিঃসন্তান ছিলেন। বাটলা গ্রামের চন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর হাতে মুসলমান হন এবং তার নতুন নাম দেওয়া হয় এনায়েতউল্লাহ চৌধুরী। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মাযারের খাদেম শাহ্ এনায়েতুউল্লাহ্ চৌধুরীকে হত্যা করে নায়েব কন্যা কমলা। নায়েব হলেন নতুন জমিদার। সন্তোষের জমিদারগণ নায়েব কন্যা কমলার বংশধর। সন্তোষের জমিদারীতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় গণচেতনা সৃষ্টি করলেও মওলানা ভাসানী দীর্ঘদিন কাগমারী বা সন্তোষে থাকতে পারলেন না। এম. ডি. ও. ফারুকী সাহেবের জারিকৃত নির্দেশে বহিষ্কৃত হলেন টাংগাইল থেকে।

সিরাজগঞ্জ ঃ ১৯৩৭ সালে টাংগাইল হতে বহিষ্কৃত হয়ে মওলানা ভাসানী গেলেন সিরাজগঞ্জে। সেখানেও জনগণের পক্ষ হয়ে ঋণভারে জর্জরিত প্রজা-দের মুক্তির জন্যে তিনি মহাজনদের মধ্যে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের অবসানের দাবীতে আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৩৭ সালে সিরাজগঞ্জে আহ্বান করলেন বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি। ডেপুটি কমিশনার এস. দাস জমিদারদের অনুরোধে তাঁকে সিরাজগঞ্জ হতে বহিষ্কার আদেশ জারী করলেন। খাজা মইজমুদ্দিন এবং খান বাহাদুর আবদুল মোমেনের সহায়তায় গভর্নরের সাক্ষাত করলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ রদ হলো না। কোন স্থান হতে বহিষ্কৃত হলে মওলানা ভাসানী মোটেই হতাশ হতেন না। সারা দেশব্যাপী বিরাজ করছিল জনগণের দুঃখ-দুর্দশা। তাই যেখানে তিনি যেতেন সেখানে তিনি নয়া উদ্যমে কাজ শুরু করতেন।

রংপুর ঃ ১৯৩৭ সালে পর পর টাংগাইল এবং সিরাজগঞ্জ হতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর মওলানা ভাসানী রংপুর গেলেন এবং গাইবান্ধায় ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করলেন। কিন্তু এখান হতে সরকারী নির্দেশে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি আবার আসামের দুঃখী মানুষের মধ্যে ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

কৃষক আন্দোলন ঃ মওলানার কৃষকভিত্তিক আন্দোলনের স্বাভাবিক কারণ ছিল। এদেশের সামন্তবাদী জমিদারগণ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এবং শোষণের হাতিয়ার। সামন্তবাদ ছিল বৃটিশ শাসনের ভিত্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ ছিল স্বাভাবিকভাবে সামন্তবাদী জমিদারদের সংরক্ষক। জমিদার, মহাজন ও মুৎসুদ্দিদের শোষণে বাংলার গণজীবন বৃটিশ আমল হতেই ছিল দুর্বিষহ। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিপীড়িত মানবতার নিতান্ত আপনজন মওলানা ভাসানীর কৃষক নেতা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একই সংগে বৃটিশবিরোধী এবং সামন্তবাদবিরোধী। যদিও পরবর্তীকালে বহু জমিদার আজাদী সংগ্রামে যোগ দিয়ে জাতীয় নেতার আসন অলংকৃত করেছিলেন, কিন্তু মওলানা তাদের বন্ধু হতে পারেন নি এবং কৃষকদের পক্ষ হতে সারা জীবন তাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছিলেন।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ছিল কৃষক সমর্থনপুষ্ট এবং কৃষকভিত্তিক। বামপন্থী রাজনীতি যেহেতু রাশিয়া এবং ইউরোপের অধিকতর শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল হতে ধার করা, তাই এদেশের বামপন্থী আন্দোলন ছিল অনেকটা শিল্প শ্রমিক এবং ছাত্রভিত্তিক। কিন্তু মওলানা ছিলেন এদিক দিয়ে মৌলিক রাজনীতিক যাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল এদেশের মাটি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে উদ্ভূত।

১৯৫৬ সালে মওলানা ভাসানী কাগমারীতে ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৫৬ সালেই গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি। ১৯৬৯ সালে গঠন করেন কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

মুসলিম লীগ ঃ মওলানা ভাসানী খেলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় তিনি ছিলেন ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য। ১৯৩৫ সালের শেষদিকে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লণ্ডন হতে দেশে ফিরে এসে মুসলিম লীগ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা ভাসানী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র আহ্বানে মুসলিম লীগে যোগদান করেন ১৯৩৬-৩৭ সালে। তখনও তিনি ছিলেন ভাসানীর চরে।

মুসলিম লীগে যোগদানের পর মওলানা অনায়াসেই নেতৃত্বের প্রথম কাতারে চলে আসেন। তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা তখন আসামে কেউ ছিলো

www.pathagar.com

না। অসাধারণ জনপ্রিয়তা, সংগ্রামী নেতৃত্ব, দুর্গত মানবতার প্রতি অকৃত্রিম দরদ ইত্যাদি কারণে মওলানা মুসলিম লীগের অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং দেশ বিভাগের পর পর্যন্ত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি থাকেন।

বড়পেটা সম্মেলন ঃ আসামের বাংগালী অধিবাসীদের স্বার্থ নিয়ে মওলানা বহু আন্দোলন করেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্যার মুহাম্মদ সাদুল্লাহ। তাঁর সংগে মওলানা ভাসানীর বনিবনা ছিল খুবই কম।

মওলানা ভাসানী এবং স্যার সাদুল্লাহর পারস্পরিক বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৩৭ সালে মওলানা কর্তৃক আহূত কামরূপ জেলার অন্তর্গত বড়পেটায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে। বড়পেটা মুসলিম লীগ সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত সভাপতি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ স্যার সাদুল্লাহ বনাম মওলানা ভাসানী বিরোধ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই দু'জনের মধ্যে মিটমাট করে দেওয়ার জন্যে সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ হতে প্রেরিত হন বেলুচিস্তানের কাজী মুহাম্মদ ঈসা এবং পাঞ্জাবের মামদোতের নওয়াব খান ইফতেখার হোসেন খান।

সম্মেলনের মূল মঞ্চ হতে মওলানা ভাসানী সাদুল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ প্রকাশ্য তুলে ধরেন। মঞ্চে উপবিষ্ট স্যার সাদুল্লাহ্ খুবই অপ্রতিভ, বিব্রত এবং নাজেহাল হলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু উত্তেজিত জনগণের তা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না। তাই তিনি বক্তব্য অসমাপ্ত রেখেই মঞ্চ ত্যাগ করেন। ঠিক হলো সন্ধ্যার পর ডাকবাংলোয় এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ঘরোয়া বৈঠক হবে। কিন্তু স্যার সাদুল্লাহ বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না বা থাকলেন না। কারণ স্যার সাদুল্লাহকে জরুরী পরামর্শের জন্যে গভর্নর ডেকে পাঠান। তাঁর পক্ষ হতে শালিশ আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্যে রইলেন মন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী। কিন্তু দু'পক্ষে কোন আপোষ হলো না।

স্যার সাদুল্লাহর বিরুদ্ধে মওলানার প্রথম অভিযোগ, স্যার সাদুল্লাহ বাংগালীবিরোধী। তিনি লাইন প্রথা সমর্থন করেন। লাইন প্রথার প্রতিক্রিয়া ছিল মুসলিম কৃষকের উপরই। তা সত্ত্বেও আসাম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গোপীনাথ বরদলুই লাইন প্রথায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের স্বপক্ষে বক্তব্য

www.pathagar.com

রেখেছিলেন। কিন্তু স্যার সাদুল্লাহ ছিলেন অসমীয়দের স্বপক্ষে। ভাসানীর সাথে মতবিরোধ থাকলে স্যার সাদুল্লাহর পক্ষে বাংগালী মুসলিম এবং কৃষক প্রজাকুলের সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি আপন রাজনৈতিক শক্তির ভিত তৈরী করেন অসময়ীদের সমর্থনের উপর। স্যার সাদুল্লাহ জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের তেমন কোন প্রচেষ্টা করেন নি। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী আসামে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। যা-ই হোক, স্যার সাদুল্লাহ এবং মওলানা ভাসানীর মধ্যে আপোষ আর হলো না। বিরোধ রয়েই গেল। পরিণামে আসামে মুসলিম স্বার্থ ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ হলো।

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ঃ মওলানা ভাসানী শুধু আসাম মুসলিম লীগেরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন না, তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরই একজন প্রভাবশালী গণনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন।

মওলানা ভাসানী আসাম মুসলিম লীগের নেতা হলেও বাংলাদেশে তাঁর প্রভাব কম ছিল না। বরং তিনি ছিলেন একমাত্র নেতা যাঁর এ দু'টি প্রদেশেই সমপ্রভাব ছিল। মুসলিম লীগের অন্য নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হতো। কৃষক, শ্রমিক ও প্রজা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁর সংগে প্রায়ই মুসলিম লীগের সামন্তবাদী জমিদার এবং বুর্জোয়া নেতৃত্বের সংঘর্ষ হতো। তিনি ছিলেন জোতদার, জমিদার নেতাদের থেকে স্বতন্ত্র। মুসলিম লীগে কৃষক, মজুর, শ্রমিক স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন মওলানা ভাসানী।

মুসলিম লীগে থেকে পাকিস্তানের জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করা সত্ত্বেও আসাম প্রদেশের একমাত্র সিলেট জেলা ছাড়া অন্য কোন অংশ ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ই জুলাই-এর গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের অংশ হয় নি। মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের এই উপেক্ষা মওলানা ভাসানী কখনও ক্ষমা করতে পারেন নি। কাছাড় জেলা, করিমগঞ্জ এবং আসামের আরও বহু পার্বত্য অঞ্চলও ছিল যেখানে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে জনসাধারণ পাকিস্তানের সপক্ষেই ভোট দিত। কিন্তু ভাসানী-সাদুল্লাহ ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে যৌথ কর্মসূচী এবং সম্মিলিত আন্দোলনের অভাবে তা সম্ভব হয় নি। স্যার সাদুল্লাহ ও মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত শত্রুতা এত বেশী ছিল যে,

www.pathagar.com

তাঁরা এক সভায় প্রয়োজনীয় সময় আলাপ-আলোচনায় থাকতে পারতেন না। যেহেতু মওলানা ভাসানী পাকিস্তান সমর্থন করেন, তাই স্যার সাদুল্লাহ হিন্দুস্থান সমর্থন করতেন। পরবর্তীতে যখন স্যার সাদুল্লাহকে মুসলিম সদস্যগণ পাকিস্তানে চলে আসার চাপ দিতে থাকেন, স্যার সাদুল্লাহ কৌতুক করে জবাব দিয়েছিলেন, যেখানে মওলানা ভাসানী আছেন সেখানে আমার প্রয়োজন নেই। একটি পাকিস্তান কেন, তিন তিনটি পাকিস্তানের জন্যে এক ভাসানীই যথেষ্ট। স্যার সাদুল্লাহ ও মওলানা ভাসানীর রেষারেষি যদি এত বেশী না হতো তবে হয়ত আসামের আরও কিছু অংশ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হতো।

মওলানা ভাসানী অপেক্ষা স্যার সাদুল্লাহ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র অধিকতর আস্থাভাজন ছিলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন অত্যন্ত শীতলপ্রাণ যুক্তিবাদী নেতা। রাজনীতিতে ভাবালুতা তাঁর না-পছন্দ ছিল। ভাসানীর চরিত্র ছিল ভিন্নরূপ। এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী তাঁর লিখিত "কায়েদে আজম এণ্ড আই' নামক ইংরেজি পুস্তকে কায়দে আজমের সঙ্গে ১৯৪৬ সালে আসাম মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎ-কারের চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাং-গঠনিক সফরে আসাম আসেন। মওলানা ভাসানী বাংগালী কৃষকদের উপর কিরূপ জুলুম অত্যাচার হয়, তার করুণ বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগের প্রাবল্যে অশ্রুতে শ্মশ্রু সিক্ত করে ফেলেন। জনগণের দুঃখে তাঁর সহৃদয় কান্নায় ইস্পাহানী অত্যধিক প্রভাবিত হন। সাক্ষাৎকার শেষে মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবের পর ইস্পাহানী মওলানার প্রশংসা করে বলেন যে, তাদের কত বড় সৌভাগ্য যে, মওলানার মত অনুভূতিশীল দরদী মানুষ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। জিন্নাহ সাহেব মন্তব্য করলেন, ওটাইতো মুসলিম লীগের দুর্ভাগ্য। ভিন্ন খাত এবং প্রকৃতির মানুষ জিন্নাহ ভাসানীর কান্নায় তো মোটেই প্রভাবিত হলেন না বরং দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁর মতে আবেগ-প্রবণ ব্যক্তি রাজনৈতিক কর্মী হতে পারে কিন্তু নেতা হওয়ার অযোগ্য। কারণ ভাবালু ও অনুভূতিশীল নেতারা আবেগাচ্ছন্ন থাকে বলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অথচ নেতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সঠিক নীতি নির্ধারণ ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। জিন্নাহ দুঃখ করে বলেছেন যে, এ

www.pathagar.com

ধরনের শিশুসুলভ আবেগপ্রবণ নেতারাই নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে যেজন্যে তাঁদের পক্ষে সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। মওলানা ভাসানী ছিলেন মানবদরদী জননেতা, জনগণের প্রতি অকৃত্রিম মাতৃসুলভ ভালোবাসাই ছিল তাঁর নেতৃত্ব এবং সংগ্রামের প্রেরণা।

সিলেট গণভোটের পর এবং ভারত বিভাগের সময় মওলানা ভাসানী ছিলেন গোয়ালপাড়া জেলায়। তখনও তিনি কৃষকদেরই সংঘবদ্ধ করার কাজে ছিলেন নিরত। ভারত বিভক্তির কিছুদিন পরই আসামের কংগ্রেসী গোপীনাথ বরদলুই সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এ শর্তে যে, তাঁকে আসাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। মওলানা ভাসানী ১৯৪৮ সালের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান আসেন। টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, মহীপুর ইত্যাদি স্থানের পুরনো কৃষক কর্মী এবং নেতাদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করে তিনি ঢাকায় আসেন।

আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা ভাসানী ঃ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চাপে ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাব এবং বেঙ্গল বিভক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম লীগ সদস্যগণ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বাংলা বিভক্ত হবে না। যেহেতু পরিষদে মুসলমান সদস্যগণ মেজরিটি ছিলেন তাই কংগ্রেসী সদস্যবৃন্দ তাদের সঙ্গে এক অধিবেশনে মিলিত হলেন না। মহাত্মা গান্ধী ও নেহেরুর নির্দেশে তারা পৃথক অধিবেশনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বাংলা বিভক্ত হবে। অথচ তাঁরাই ১৯১১ খৃস্টাব্দে আন্দোলন করে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ ভঙ্গ করেছিলেন। পৃথক অধিবেশনে বসে তারা প্রমাণ করেছিলেন প্রাদেশিক পরিষদ বিভক্ত হয়েই গেছে। বাংলা' পাঞ্জাব বিভাগ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ১৯৪৭ সালের ২৭ জুন এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ঢাকা হবে নব বিভক্ত পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী। বেঙ্গল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যগণ ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্ট এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনকে ৭৫-৩৯ ভোটে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত করেন। ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আল্লামা আবুল হাশিম ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আল্লামা আবুল হাশিম ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় মুসলিম লীগের

www.pathagar.com

এবং মুসলিম ছাত্রলীগের প্রগতিশীল কর্মীরা মুরব্বীশূন্য হয়ে পড়েন। তারা মওলানাকে পেয়ে কিছুটা আশার আলো দেখলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ইস্ট হাউজের দক্ষিণ দিকের মাঠে মওলানাকে এনে তারা ভাষণ শুনলো, কিছুটা অনুপ্রেরণা পেলো। এটাই ছিল ঢাকায় তাঁর প্রথম জনসভা। এতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। কিন্তু শহরে নেতৃত্বের চেয়ে কৃষক মজুরদেরকে সংগঠিত করার দিকেই ছিল তাঁর খেয়াল বেশী।

দেশ বিভক্তির পর বেংগল প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যবর্গ এবং আসামের সিলেট জেলার সদস্যদেরকে নিয়ে পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ বঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠিত করলেন। কিন্তু মওলানা আকরাম খাঁ'র নেতৃত্বাধীন এই কমিটিতে আসাম প্রদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি মওলানা ভাসানীকে রাখা হলো না।

মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ যাতে শক্তিশালী হতে না পারে, তাই মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ ১৫০ নম্বর মোগলটুলিস্থ পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগ শিবিরের তরুণ নেতৃবৃন্দকে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ রশিদ বই পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেন। আতাউর রহমান খান এবং আমেনা বেগম করাচী গিয়ে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সংগে দেনদরবার করেও সদস্য সংগ্রহ রশিদ বই পান নি।

প্রাদেশিক সংসদের দক্ষিণ টাংগাইল নির্বাচনী কেন্দ্রের আসনটি সংসদ সদস্যের মৃত্যুর ফলে খালি হয়। মওলানা ভাসানী এই নির্বাচনী এলাকার উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী এবং করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী এবং অপর দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনী ত্রুটির অপরাধে গভর্নরের এক আদেশে মওলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নী এবং অন্যান্য প্রার্থী ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হন।

কিন্তু শূন্য আসন পূর্ণ করার জন্যে ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল উক্ত আসনে উপ-নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। মজার ব্যাপার এই যে, মুসলিম

www.pathagar.com

লীগ সরকার খুররম খান পন্নীর পূর্বঘোষিত অযোগ্যতা আদেশ বাতিল করে তাঁকে পুনরায় একই আসন হতে নির্বাচনের সুযোগ করে দেন।

মওলানা ভাসানীর আসাম ত্যাগের শর্তে বরদুলই সরকার ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে কারামুক্তি দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী ১৯৪৮ সালে পুনরায় আসামে প্রবেশ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, আসাম ত্যাগের পর আর কখনও আসামে ঢুকতে পারবেন না মুক্তিনামায় এরূপ কোন শর্ত ছিল না। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আসামে কংগ্রেসী সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে ধুবড়ী কারাগারে কারারুদ্ধ করেন।

টাংগাইলের উপ-নির্বাচনে তরুণ ছাত্রনেতা এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক মুসলিম লীগের খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হন। মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকারী সুযোগ সুবিধা, খুররম খান পন্নীর অর্থ এবং করটিয়ার জমিদারদের সমাজ-সেবার ঐতিহ্য, মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্বত্যাগী আদর্শপ্রবণ এবং অসাধারণ ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় তরুণ নেতা শামসুল হক খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে সংসদে আসন গ্রহণ করতে দেয় নি। বিচার-পতি আমিনুদ্দীন, জেলা জজ এনায়েতুর রহমান ও সহরুদ্দীন সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল অতি তুচ্ছ কারণে শামসুল হকের নির্বাচন বাতিল করে দেন।

ছাত্রনেতা হযরত আলী ধুবড়ী কারাগারে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শামসুল হকের সপক্ষে ভোট দানের জন্যে মওলানা ভাসানীর নিকট হতে একটি আবেদন আনয়ন করেন। কিন্তু উক্ত আবেদনপত্রে ধুবড়ী কারাগারের কোন সীলমোহর ছিল না। এই অজুহাতে নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল এই আবেদন-পত্রটি জাল গণ্য করে শামসুল হকের নির্বাচন বাতিল করে দেন। এর পর নূরুল আমীন সরকার ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ৩৫টি শূন্য আসনে কোন নির্বাচন দেন নি।

১৯৪৭ সালের ২৭শে রমযান লালবাগ পুলিশ হত্যার ঘটনায় তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি মওলানা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এলে রাষ্ট্রভাষা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং অন্যান্য প্রশ্নে

www.pathagar.com

বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ২৭শে নভেম্বর ১৯৪৮, প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম আযম পঠিত মানপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানানো হয়। প্রধান মন্ত্রী মান-পত্রের জবাব দেওয়া কালে এ প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।

নানা কারণে বিক্ষুব্ধ মুসলিম লীগ কর্মিগণ ১৯৪৯ সালের ২৩শে এবং ২৪শে জুন ঢাকায় এক মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং জনাব ইয়ার মুহাম্মদ খানকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হলো। কিন্তু সরকারী মুসলিম লীগের দাপট ও প্রভাবে সভা করার মত কোন একটি পাবলিক হল প্রদানে কোন হল কর্তৃপক্ষকেই সম্মত করানো সম্ভব হয় নি।

অগত্যা কে. এম. বশীর সাহেবের কে. এম. দাস লেনের বাসভবন রোজ গার্ডেনের হল কামরায় মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব কে. এম. বশীর সাহেব সাহস এবং সহৃদয়তার সংগে তাঁর বাসভবনে এরূপ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সুযোগ না দিলে হয়ত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন বিলম্বিত হতো।

মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে ২৫০-৩০০ জন ডেলিগেট যোগ দেন। প্রথমেই অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা আবদুল হামিদ খানের লিখিত ভাষণ পড়ে শুনানো হয়। অতঃপর মূল সভাপতি আতাউর রহমান খান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষে ২৪শে জুন ১৯৪৯ অপরাহ্নে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আর্মানীটোলা ময়দানে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম পাবলিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে জুন ১৯৪৯ রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে সরকারী মুসলিম লীগের একটি বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ জন্মলাভ করে। চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট অর্গানাইজিং কমিটিতে সহ-সভাপতি ছিলেন জনাব আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াৎ হোসেন এবং আলী আহমদ খান। শেখ মুজিবুর রহমান যদিও কারাগারে থাকার কারণে সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি, কিন্তু ছাত্র কর্মীদের প্রস্তাবে তাঁকে এবং খন্দকার মুশতাক আহমদকে যুগ্ম-সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

www.pathagar.com

তখনকার দিনে মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ ও সরকারের ব্যর্থতা এবং অপকীর্তি সত্ত্বেও জনমত মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় নি। তাই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ শব্দ দু'টি ঠিক রেখে এর সংগে 'আওয়ামী' এই বিশেষণ শব্দটি যোগ করে পার্টি গঠন করা ভাল মনে করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মুহাম্মদ খানের ১৮/এ, কারকুন বাড়ী লেনস্থ বাড়িতেই নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস স্থাপিত হয়। মওলানা ভাসানী ইয়ার মুহাম্মদ খানের বাড়িতেই থাকতেন এবং মুরুব্বি হিসেবে তার পত্নীর সেবাযত্ন ভোগ করতেন। মওলানা ভাসানীর প্রতি ইয়ার মুহাম্মদ পরিবারের যত্ন ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল অকল্পনীয়।

১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর মওলানা ভাসানী আর্মানীটোলা ময়দানে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা করেন। সভাশেষে তিনি অনাহার, উপবাসক্লিষ্ট মানুষের একটি ভুখা মিছিল সহকারে সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মিছিল পুলিশী হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং আরো অনেকে গ্রেফতার হন। জেলে থাকা-কালে অনশন ধর্মঘট করে ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী জেল হতে মুক্তি লাভ করেন।

পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং মামদোতের নওয়াব ইফতেখার হোসেন খান জিন্নাহ মুসলিম লীগ নামে একটি পার্টি গঠন করেন। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তার সঙ্গে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একটি সমঝোতা হয়। সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে জিন্নাহ মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন নামকরণ করা হয়। পাঞ্জাবের ১৯৫১-এর নির্বাচনে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৭টি আসনের মধ্যে ৩২টি আসনে জয়লাভ করেন।

সীমান্ত প্রদেশে মানকী শরীফের পীর সাহেবের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী শব্দের অর্থ হলো গণ বা জনগণ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার আগে করাচী হতে শহীদ

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় আসেন এবং নবগঠিত পার্টির নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ রাখার উপদেশ দেন।

নিখিল পাকিস্তান রূপদানের জন্যে ১৯৫৩ সালে লাহোরে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে যোগদান করেন। নীতিগত প্রশ্নে প্রবল মতদ্বৈততা সৃষ্টি হলে জিন্নাহ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক মামদোতের নওয়াব খান ইফতেখার হোসেন খান নিজের তৈরী সংগঠন হতে বহিষ্কৃত হন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

মওলানা ভাসানী ব্যক্তিগত অসুস্থতার কারণ ভিন্ন আওয়ামী লীগের সভায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব এড়াতেন না। ১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল ১৮/এ কারকুন বাড়ি লেনে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যকরী সংসদের সভায় শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে প্রচার সম্পাদক আবদুর রহমানকে বহিষ্কার করে অলি আহাদকে প্রচার সচিব নির্বাচিত করা হয়।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর মুকুল সিনেমা হলে যুবফ্রন্টের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের কিছু মন্তব্য করেন, যাতে অনুমতি হয় যে, তিনি উক্ত চুক্তিবিরোধী নন।

কংগ্রেস ছেড়ে মওলানা ভাসানীর মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার একটি প্রধান কারণই ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামন্তবাদী চরিত্র। বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু এবং প্রজা ছিল মুসলমান। মুসলিম লীগ মুসলমান প্রজাদের স্বার্থের কথা বলতো, তাই ভাসানী কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে আসলেন। ভাবলেন, মুসলিম লীগ থেকে তিনি প্রজাদের অধিকার আদায় করবেন। কিন্তু যখন দেখলেন মুসলিম লীগের সামন্তবাদী নেতাদের দৌরাত্ম্যে তা করা সম্ভব নয়, তাই তিনি মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী (গণ) মুসলিম লীগ গঠন করেন।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠাতা ভাসানীঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দিনগুলোতে পত্র-পত্রিকাতে বিরোধী দলের খবর খুব কমই প্রকাশিত হতো। নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরার জন্যে নিজ নামে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশের ডিক্লারেশন নিলেন। ইত্তেফাক নামটি তাঁরই দেওয়া। এর অর্থ ঐক্য এবং সংহতি। খোন্দকার আবদুল হামিদ মনোনীত হলেন এ পত্রিকার সম্পাদক এবং নারায়ণগঞ্জের শামসুদ্দিন আহমদ হলেন ম্যানেজার। খোন্দকার আবদুল হামিদ তখন ছিলেন কম্যুনিস্ট ঘেঁষা। শামসুদ্দিন আহমদকে ম্যানেজার নিয়োগের সময় মওলানা ভাসানী তাঁকে বলেন, 'কিস্তি টুপির হুলের দরকার হয় না, তেমনি সাপ্তাহিকেরও ম্যানেজারের দরকার নেই। তবুও তোমাকে ম্য নেজার করলাম খোন্দকার হামিদকে পাহারা দেওয়ার জন্যে যাতে পত্রিকাটি কম্যুনিস্টদের পত্রিকা না হয়ে পড়ে।

পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি পেলেন বটে, কিন্তু কোন মুদ্রণালয়ই পত্রিকাটি ছাপতে রাজী হলো না। অনেক চেষ্টা তদবিরের পর, প্যারামাউন্ট প্রেস পত্রিকাটি ছাপতে রাজী হলো। তাই সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের মুদ্রণালয় পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো। পত্রিকাটি পুনরায় ডিক্লারেশনকালে মওলানা ভাসানীর স্থলে ইয়ার মুহাম্মদ খান হলেন প্রকাশক ও মুদ্রাকর এবং মওলানা ভাসানী রইলেন এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। এই পরিচয়েই সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হতে থাকে।

জনাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলকাতা হতে ঢাকা আগমনের পর মওলানা ভাসানী এবং ইয়ার মুহাম্মদ খানের সংগে ইত্তেফাক প্রকাশনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি কলকাতায় ইত্তেহাদ পত্রিকায় চাকরি করতেন এবং সাংবাদিকতায় তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ইত্তেফাকের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মওলানা ভাসানী খুশী হলেন। কারণ তিনি খোন্দকার হামিদ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। মওলানা ভাসানী প্রথম কিস্তিতে কাজ শুরু করার জন্যে জনাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে তের শত টাকা দেন।

ইয়ার মুহাম্মদ খান সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি লিখিতভাবে জনাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে ১৫ই আগস্ট, ১৯৫১ সালে সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

'ইত্তেফাক' সম্পাদনার দায়িত্ব দান করেন। খোন্দকার আবদুল হামিদের পরিবর্তে তোফাজ্জল হোসেন 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক হলেন। নতুন ব্যবস্থা-পনায় মওলানা ভাসানী রইলেন এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, ইয়ার মুহাম্মদ খান থাকলেন প্রকাশক এবং মুদ্রাকর হিসেবে এবং তোফাজ্জল হোসেন হলেন এর সম্পাদক। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং অন্যান্য অনেকের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এটা একটি অতি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বেই বিরোধী দল একটি দৈনিক পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করে এবং সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক'কে দৈনিকে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর হতে তোফাজ্জল হোসেনের সম্পাদনায় দৈনিক ইত্তেফাক আত্মপ্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকেও পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদক, ইয়ার মুহাম্মদ খান প্রকাশক এবং মুদ্রাকর এবং মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠাতা—এই পরিচয় অব্যাহত থাকে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর দৈনিক ইত্তেফাকে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার মন্তব্য এবং খবর প্রকাশিত হতে থাকে। জনাব ইয়ার মুহাম্মদ খান এই অশুভ তৎপরতায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন এবং জনাব তোফাজ্জাল হোসেন সাহেবকে এর বিহিত করতে বলেন। অবশেষে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রীত্ব থাকাকালে হয়ত তাঁরই নির্দেশে বা জ্ঞাতসারে ঢাকা জেলার তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জনাব ইয়াহিয়া চৌধুরীর নির্দেশে ১৪ই মে, ১৯৫৪ সাল হতে জনাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে প্রকাশক এবং মুদ্রাকর করে ইত্তেফাক পত্রিকার নতুন ডিক্লারেশন নেওয়া হয়। এর পর মওলানা ভাসানীর নাম ইত্তেফাকের শিরোভাগে 'প্রতিষ্ঠাতা'-এর পরিবর্তে 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে শোভা পেতে থাকে। পরবর্তীতে পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও মওলানার নামটি বাদ পড়ে।

সাংবাদিকদের সাথে সম্পর্ক ঃ সাংবাদিকদেরকে সকলেই সমীহ করে চলে এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত হিসেব করে কথা বলে। সাংবাদিকদের সংগে আলোচনাকালে সাবধান বা সতর্ক হওয়ার কোন বালাই মওলানা ভাসানীর ছিল না। অনর্গল কথা বলে যেতেন তিনি। সাংবাদিকগণ তাঁর হাজার কথার মধ্যে যা পছন্দ করতেন টুকে নিতেন। তিনি কি বললেন এবং সাংবাদিকগণ কি বুঝলেন তা খোঁজ করার কোন আগ্রহ বা খেয়ালই

www.pathagar.com

মওলানার কোনদিন ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, মওলানা যা বুঝাতে চেয়েছেন কোন সাংবাদিক ঠিক তার উল্টোটা বুঝে তাই লিখে দিলেন। কিন্তু মওলানা এতে বিচলিত হতেন না এবং পত্রিকায় কনট্রাডিক্‌শান বা প্রতিবাদ জানাতে কখনই আগ্রহী ছিলেন না। মওলানা ভাসানী সাপ্তাহিক 'হক কথা'র সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার পর 'হক কথা' প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। তিনি বহু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দৈনিক সংবাদ, দৈনিক আওয়াজ, সাপ্তাহিক গণশক্তি, প্রাচ্যবার্তা ইত্যাদি পত্রিকা তিনি উদ্বোধন করেন। সাপ্তাহিক গণশক্তি উদ্বোধনকলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি জীবনে ৪৯টি পত্রিকা উদ্বোধন করি। কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস! সব ক'টি পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে লিখেছে।'

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা ভাসানী ঃ বিকাশ এবং অগ্রগতির সময় কোন রাজনৈতিক পার্টির চরিত্র এবং ভূমিকা থাকে প্রগতিশীল, কিন্তু অবক্ষয় এবং অধঃপতনের সময় ঐ পার্টিই হয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল। আল্লামা আবুল হাশিমের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগ ছিল একটি অতি প্রগতিশীল সংগঠন। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার আকর্ষণে বহু যুবক মুসলিম লীগের দিকে আকৃষ্ট হয়। ক্ষমতার মসনদে আরোহণের দেড় বৎসরের মধ্যে মুসলিম লীগ হয়ে পড়ে রক্ষণশীল। তেমনিভাবে ক্ষমতায় আসার দেড় বৎসরের মধ্যেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা নীতি গৃহীত হয় যার জন্যে মওলানাকে দল ছাড়তে হলো। মুসলিম লীগের সংকীর্ণ নীতির জন্যে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ বা জনগণের মুসিলম লীগ শুরু করেন। আওয়ামী লীগের সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা নীতি সমর্থন করতে না পেরে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। বস্তুত মওলানা ভাসানী ছিলেন আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির স্রষ্টা বা জনক। তা ছাড়া তিনি কিছুকাল কংগ্রেসে ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পূর্বে আজাদ পাকিস্তান পার্টি নামে একটি পার্টির সংগেও তিনি কিছুটা যুক্ত ছিলেন। মওলানার সর্বশেষে পার্টি ছিল হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতি।

'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলাম কেন?' শীর্ষক বক্তব্যে ১৯৫৭ সালে মওলানা বলেছিলেন, 'আজ আমি বলিতে চাই যে, সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষণ ও শোষিতের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের

www.pathagar.com

লড়াই, ধর্ম ও অধর্মের লড়াই বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হয়েছে তাতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশ গ্রহণ করতেন, তার ত্যাগ, কোরবানী ও নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই কতটা সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে, এর নজির বিশ্বনবী ও সাহাবাদের জীবনে ও বর্তমান নবীন চীনের মুক্তির ও উন্নতির ইতিহাসে আমাদের সম্মুখে মওজুত।' তাঁর এ বক্তব্যের মধ্যে তাঁর চরিত্রের ইসলাম ও প্রতিবাদী চেতনার দু'টি ধারাই পরিস্ফুট হয়েছে।

১৯৫৭ সালে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্ফার খান, আসাফ জাই ও আবদুল মজিদ সিন্ধি মওলানার রাজনৈতিক সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু কালের প্রবাহে তাঁরা সকলেই মওলানার রাজনৈতিক ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

স্বাধীনতায় প্রবক্তা ভাসানী ঃ মওলানা ভাসানী আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত নেতা। এর কারণ যারা বিতর্ক করে তারা নয়, মওলানা ভাসানী নিজেকে বিতর্কিত রাখার মধ্যেই হয়ত আনন্দ পেতেন। হয়তো বা বিতর্কিত ইস্যুর মধ্যে তিনি ছিলেন সমন্বয়ী ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের প্রেক্ষা-পটে এবং অসহনশীল সমাজে বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী চিন্তাধারা এবং কর্মসূচীতে অসহনশীল বিরুদ্ধবাদীদের তিনি ছিলেন সেতুবন্ধ। তাই হয়তো যাঁরা তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আসতেন তাঁরা যতটুকু ভাসানী থেকে আশা করতেন ততটুকু পেতেন না, তাই অহেতুক তাঁর সমালোচনা করে তাঁকে বিতর্কিত নেতার পর্যায়ে পরিণত করেছিলেন।

বিতর্কিত হওয়ার মধ্যে অপরের অন্যায় সমালোচনা অপেক্ষা স্বীয় অব-দানই হয়তো বেশী ছিল। সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখলে সকল স্ববিরো-ধিতার মধ্যেও কিছুটা সমন্বয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার বহু আগেই তিনি পাকিস্তান যে এক থাকতে পারবে না, সে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান সকল পার্টি এবং নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করেন গোলটেবিল বৈঠকে। মওলানা ভাসানী সে বৈঠকে যোগ দেন নি। কারণ তিনি এর ব্যর্থতা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার গুণে বুঝতে পেরেছিলেন।

১৯৫৭ সালে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি 'আস্‌সালামু আলায়কুম' জানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন। টোবাটেক সিংহে তিনি বাংলাদেশের কৃষক সম্মেলনের আংগিকে এক ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন করেন। লাহোর থেকে কোয়েটা পর্যন্ত অঞ্চলে ১৩ দিনে তিনি ১২টি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ঐ সফরের সময় তিনি বহু জনসভায় পাকিস্তানের ঐক্য এবং সংহতির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তখনকার জনপ্রিয় ঘোষণা ছিল, 'কেয়ামত তক্ পাকিস্তান এক রাহেংগা।' কিন্তু ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষা এবং নিষ্ক্রিয়তায় তিনি এত বেশী ব্যথিত হয়েছিলেন যে, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুর্গতদের সীমাহীন দুঃখের কথা বর্ণনা কালে ঘোষণা করেন, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান না দেখার পূর্বে আমার মৃত্যু নাই।' দু'মাসের কম সময়ের ব্যবধান এরূপ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রাখার জন্যে তিনি সমালোচিত এবং বিতর্কিত। তবে দু'টি বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। ১৯৭০ সনের নভেম্বরের প্রলয়ংকরী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুঃখে ব্যথিত মানুষের নেতা ভাসানী বাংলার মানুষের এত বড় বিপদে যারা নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন থাকতে পারেন তাদের সংগে এক রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত থাকার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

তাঁর এ বক্তব্য সম্বন্ধে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রীয় ঐক্য একটি আদর্শ। ঐ আদর্শ অপেক্ষা রাষ্ট্রের মানুষ বড়। মানবতা যেখানে লাঞ্ছিত হয়, রাষ্ট্রীয় সংহতির আদর্শ সেখানে অবাঞ্ছিত।' মওলানা ভাসানীর জীবন দর্শনে যে কোন রাজনৈতিক আদর্শ বা নীতি অপেক্ষা মানুষ এবং মানবতার আদর্শই ছিল মুখ্য, পার্টি বা রাজনৈতিক আদর্শ ছিল গৌণ। কারণ তাঁর রাজনীতি ছিল মানুষকেন্দ্রিক।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে মওলানা ভাসানী আজাদীর চেতনায় ও দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের উত্তাল দিনগুলোতে আমাদের সংগ্রামে যাতে কোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বা উৎসাহ আমাদের স্বাধিকারের সংগ্রামকে জটিল এবং সার্বভৌমত্ব যেন বিপন্ন না করে সে বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন যার জন্যেই হয়তো তাঁকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারত সরকার নজরবন্দী করে রাখেন।

www.pathagar.com

মওলানা যাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ভারতের বাইরে না যেতে পারেন সেটাও হয়ত তাঁকে নজরবন্দী করার আর একটি কারণ হতে পারে।

১৯৭১ সালে তিনি ভারতে যেতে চান নি। কারণ ভারতের রাজনৈতিক অভিসন্ধি সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তবুও অবস্থার চাপে তাঁকে ভারতে যেতে হয়েছিল। তিনি ভয় করেছিলেন সুভাষ বোসকে জাপান সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে কঠোর পাহারার মধ্যে রেখেছিলেন। মওলানা ভাসানী ভারত যাওয়ার পূর্বেই বলেছিলেন যে, সুভাষ বোসের মতই হয়ত তাঁকে ভারতের মাটিতে কারারুদ্ধ বা গৃহবন্দী থাকতে হবে। হয়েছিলও তাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতের সকল সাহায্য-সহযোগিতা সত্ত্বেও ভারত যে কখনও বাংলাদেশের স্থায়ী মিত্র হবে না, তা সবার আগে মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বৈদেশিক ক্ষেত্রে মোড়লীপনা ও বশ্যতামূলক মিত্রতার বিরুদ্ধে সবার আগেই বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন।

১৯৭৩ সালে মওলানা ভাসানী জনগণ ও সেনাবাহিনীর মিলিত সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে একদেশ একদল আন্দোলনকে কাঁদামাটির 'মওয়ালা' দৈত্য বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন এবং ছয় মাসের মধ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

বামপন্থী নেতা মওলানা ভাসানী ঃ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে থাকা কালে কম্যুনিস্ট কর্মীদের সংগে মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। মোহাম্মদ তোয়াহা, মোজাফফর আহমদ এবং অন্যান্য কর্মী তাঁকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য, মজলুম মানবতার মুক্তি সাধনে কম্যুনিজমের সাফল্যের সম্ভাবনা এবং কারণ ব্যাখ্যা করেন। মার্কসবাদ, লেনিনবাদের তাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে তিনি এ সময় সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে কম্যুনিজম সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। জেল থেকে বের হয়ে আসার পর কম্যুনিস্ট কর্মীদের সংগে তাঁর সংযোগ এবং আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থাকে। কম্যুনিস্টগণও মওলানার মত একজন জননেতাকে তাঁদের একজন হিসেবে পাওয়ার সুযোগ হারাতে চান নি।

মওলানা ভাসানীকে ইসলামপন্থীরা ব্যবহার করতে চায় নি। তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করতে বহু ইসলামপন্থীর অনীহা ছিল। উলামায়ে কেরাম

www.pathagar.com

মওলানাকে আলিম বলে স্বীকার করতে চান নি। মাদ্রাসা পাস করা আলিমগণ তাই তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না এবং তাঁরা তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। মওলানাকে তাঁদের অনেকে মুন্‌শী ভাসানী বলে অবজ্ঞা করতেন। অথচ মওলানার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, গণমুখী চিন্তাধারা, সংগ্রামী চেতনা ইত্যাদির জন্য মওলানা বামপন্থীদের কাছে অধিকতর সমাদৃত হয়েছিলেন। ফলে মওলানা ভাসানী তাঁর চিন্তাধারায় মওলানাদের ইসলামী জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই নির্বাচনের পর আণ্ডারগ্রাউণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টি যা 'ইউ জি' নামে পরিচিত ছিল, মওলানার ব্যাপারে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং মওলানাকে তাদের শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে মওলানা ভাসানীকে আদমজী জুটমিল মজদুর ইউনিয়ন এবং ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ শ্রমিক লীগের সভাপতি করা হয়। মোহাম্মদ তোয়াহা ছিলেন আদমজী জুটমিল মজদুর ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং রেল-ওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের ঢাকা জোনের প্রেসিডেন্ট। মোহাম্মদ তোয়াহা কাছে কাছে থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে মওলানা ভাসানীকে দীক্ষিত করতে থাকেন।

১৯৫৪ সালের ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি উপলক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ঢাকায় পল্টন ময়দানে এবং নারায়ণগঞ্জে দু'টি বৃহৎ শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশ দু'টিতে মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। নারয়ণগঞ্জে সমাবেশের পর খান বাহাদুর ওসমান আলীর বাড়িতে মোহাম্মদ তোয়াহা এবং মওলানা ভাসানী একই কক্ষে নিশি যাপন করেন এবং বিশ্বব্যাপী মেহনতি মানুষের আন্দোলনে পূর্ণভাবে শরীক হওয়ার জন্যে মওলানার প্রতি আহ্বান জানান। তাঁকে বুঝান হয়, বিচ্ছিন্ন-ভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্দোলন অতীতে কিছু করতে পারেন নি, ভবিষ্যতেও হয়ত কিছু করতে পারবেন না। এ রাতেই মওলানা কম্যুনিস্টদের সংগে একাত্ম হয়ে কাজ করে সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অধিকতর নিশ্চিত হন।

কম্যুনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৪ সালে মওলানাকে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতিরও সভাপতি করা হয়। কিছুদিন পর মওলানা

www.pathagar.com

কম্যুনিস্টদের পরিচালিত আন্তর্জাতিক শান্তি কমিটির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি মনোনীত হন। পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভাপতি হিসেবে তাঁকে পাঠান হয় ১৯৫৪ সালে স্টকহল্‌মে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে ৯২(ক) ধারা জারি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন সামরিক শাসনকর্তা ইস্কান্দার মির্জা ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলে মওলানা ভাসানীকে গুলী করা হবে।

৯২(ক) ধারা চলা কালে মওলানা ভাসানী ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন। এ সময় তাঁর সফরসংগী ছিলেন খন্দকার মুহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি ভাসানীর এ সফরকে ভিত্তি করে 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটি ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

মওলানা ভাসানী বহুবার দেশ ভ্রমণ করেন এবং দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ধারা প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়নের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। মওলানার সংগে স্বদেশে দেশ-বিদেশের বহু নেতা, রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রপতি সাক্ষাৎ করেছেন। এ সমস্ত সাক্ষাৎকারে কোন ফর্মালিটি ছিলো না। আনুষ্ঠানিক খোশ আমদেদ বা বিদায় সম্ভাষণ বলে কিছু থাকতো না। নিতান্ত অনানুষ্ঠানিক ঘরোয়া ভংগিতে তিনি মেহমানদের খোশ আমদেদ জানাতেন। বিষয়সূচী বা আলোচ্যসূচী ধরে কখনও আলোচনা করতেন না। তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে আসতো তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সাবলীলভাবে আলাপ করতেন। এমনও হতো যে, আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা-কালে, যে বিষয় আলোচনা করা আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন, তাই বাদ পড়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের মধ্যে মওলানাকে একাত্ম করে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁকে হযম করতে পারে নি। কম্যুনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত না মেনে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন। কম্যুনিস্ট পার্টির তাবেদারী করতে তিনি কখনও সম্মত ছিলেন না। তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর বিভেদ হতো। মওলানাকে আত্মস্থ করতে না পেরে এক পর্যায়ে মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মওলানার রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। মওলানা কিন্তু এতে মোটেই দমে যান নি বরং তাঁর অন্তর্নিহিত

www.pathagar.com

শক্তি প্রদর্শনের জন্যে তিনি ১৯৭০ সালে পাবনার শাহপুরে কৃষকদের লাল টুপি সম্মেলন আহ্বান করেন। কম্যুনিস্ট পার্টির অসহযোগিতা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ কৃষক উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হন। শাহপুরের সম্মেলনের সাফল্য দেখে মওলানা ভাসানী ১৯৭১ সালের ১৯শে জানুয়ারী সন্তোষেও কৃষকদের লাল টুপি সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁর আহূত সম্মেলনের মাধ্যমেই লাল টুপি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদের মওলানার সংগে সংযোগ ছিল এবং এ নিয়ে মওলানার সংগে তাঁর মাঝে মাঝে দেখা হতো।

মওলানা ভাসানীকে কথা প্রসংগে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি একজন খাঁটি মুসলমান। আপনি পীর। কিন্তু রাজনীতিতে আপনার সমাজ, ওঠা-বসা, সম্পর্ক ইসলামী চেতনাসম্পন্ন নেতা এবং কর্মীদের সংগে নয়। সমাজতন্ত্রীরাই আপনার সংগী। বামপন্থী ছাত্র নেতাদেরকে আপনি ঘাড়ে করে বহন করেন। যতদিন তাদের দরকার হয় তারা আপনার কাঁধে চড়ে বেড়ায়। পাখা গজালেই তারা আপনাকে পদাঘাত করে উড়ে চলে যায়। এ আপনার কোন্ খেলা, বুঝতে পারি না।'

মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'এখানেই তো তোমাদের দোষ। তোমরা এক চোখ দিয়ে দেখো বলে সবটুকু দেখতে পাও না। তাই প্রায়ই তোমরা খাদে পড়, আর রাস্তার দোষ দেও। খোলা মন দিয়ে দেখতে শিখ। ঠিক দেখতে পারবে।'

সাক্ষাৎকারী বললেন, 'দেখার ইচ্ছা তো আছে, চোখও আছে যথা স্থানেই। কিন্তু দেখতে যখন পারলাম না চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিন।'

মওলানা ভাসানী বললেন, 'তাহলে শোন। বামপন্থীদেরকে আমি ঘাড়ে করে বেড়াই না; তাদের ঘাড়ে চড়েই আমি বেড়াই। সেটাই তো তোমরা দেখতে পাও না।' সাক্ষাৎকারী বললেন, 'শানে নযুল দিয়ে একটু তফসির করুন।' মওলানা ভাসানী বললেন, 'শোন তাহলে আমার আদি ইতিহাস। আমি ছিলাম বাহাদুরাবাদ স্টীমার ঘাটের মসজিদের ইমাম। মাসিক বেতন ছিল দুই টাকা। আমার গুণ ছিল তিনটা। কথা বলতে পারতাম। হাঁটতে পারতাম। আর পারতাম খাইতে। এক শবে কদরে আমি ৪০টি দাওয়াত

www.pathagar.com

খেয়েছি। আরও খেতে পারতাম। কিন্তু ৪০ সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পর আর দাওয়াত নিলাম না।'

'সেই স্টীমার ঘাট মসজিদের ইমাম কারী আবদুল হামিদ আজ জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আল্লাহ্ আমাকে যতটুকু জ্ঞান, বুদ্ধি দিয়েছেন তার সবটুকুর সদ্ব্যবহার আমি করেছি। তোমাদেরকে যতটুকু দিয়েছেন তার কতটুকু তোমরা ব্যবহার করছ?'

'আজ দেশী-বিদেশী নেতা, রাষ্ট্রদূত আমার ছনের ঘরের সামনে এসে বসে থাকে। এই সেদিনও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ফারলেণ্ড আমার এখানে এসেছিলেন। এই চেয়ার ঐ চেয়ার বদল করেছে। তুমি যে হাতভাংগা চেয়ারটায় বসে আছ, এটাতেও বসেছিল। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের রাষ্ট্রদূত। তারা ঘড়ি ধরে মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। দরকারী কথা সেরে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ফিরে যায়। আমার এখানে এসে বসে থাকে। সময়ের হিসেব করে না। আমাকে দেখতে আসে, আমার কথা শুনতে আসে, আর আসে আমাকে ওজন করতে।'

'কেন আসে আমার কাছে বলতে পার? আসে আমার কাছে ওরা আছে বলেই। আমি সন্তোষ থেকে হুংকার ছাড়ি, শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া দশ তারিখের মধ্যে না মানলে আগামী সোমবার চাকা বন্ধ থাকবে। চাকা বন্ধ করে কে? আমি কি চাকা বন্ধ করতে টংগিতে যাই? মেনন, জাফর ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদেরকে বুঝিয়ে উত্তেজিত করে কলকারখানার চাকা বন্ধ রাখে। আমার হুংকারে চাকা বন্ধ না হলে, রাস্তায় লোক না নামলে, জিন্দাবাদ-মুর্দাবাদ শ্লোগান না হলে, জ্বালাও-পোড়াও না হলে, ইট পাটকেল ছুঁড়াছুঁড়ি না হলে আমার শক্তির প্রমাণ হয় না এবং তা না হলে ফারলেণ্ড সাহেবেরা আমার কাছে আসবে না। বামপন্থীদের সাথে আমার সম্পর্ক এবং স্বার্থটা পারস্পরিক। তাদেরও আমার প্রয়োজন আছে। আমারও তাদের প্রয়োজন আছে। এবার নিজ গুণে বুঝে নাও।'

এ পর্যায়ে উক্ত সাক্ষাৎকারী পুনরায় বললেন, 'আপনার এ রাজনৈতিক খেলার সাথী-সংগীদের তো আপনি ধরে রাখতে পারছেন না। আপনি রাজনৈতিক জীবনে সংগী পাচ্ছেন না।' মওলানা ভাসানী বললেন, 'হলে ভাল হতো। যারা জীবনভর আমার সংগে থাকতে পারত, তারা তো তোমাদের মত দূরে দাঁড়িয়ে থেকে আমার সমালোচনা করে।

www.pathagar.com

আমার কি দোষ, আমি কি করতে পারি নাই তার হিসাব নিকাশ করে। তারা আমার আমলনামা লেখে। কিন্তু জাফর, মেননরা আমার কমতি দোষ, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।'

'তাদের যতদিন প্রয়োজন তারা থাকবে। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে চলে যাবে। যেমন চলে গেছে শেখ মুজিব, মোজাফফর আহমদ, তোয়াহা, আরও অনেকে। তাদের বয়স কম থাকা কালে তাদের একটা ছায়ার দরকার হয়। যখন তাদের পরিচিতি যথেষ্ট হয়, নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ সৃষ্টি হয়, স্বাবলম্বী হয়, তারা চলে যায়।

এজন্যে তাদেরকে আমি ঘৃণা করি না। তাদের দোষও দেই না। কেউ আমাকে ছেড়ে গেলে তাদেরকে রেজুলেশন করে তাদের হাজারটা দোষ দেখিয়ে আমি বহিষ্কার করি না। চলে গেলেও তাদেরকে আমি সন্তানের মত স্নেহ করি। তারাও আমাকে শ্রদ্ধা করে।

তাদের নতুন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে আমার সংগে পরামর্শ করতে এবং উপদেশ নিতে অসে। কাজী জাফর এখন যাই যাই করছে। সে হয়তো চলে যাবে। মেনন হয়তো আরও কিছুদিন থাকবে। সেও রাজনৈতিক সাবালক হয়ে চলে যাবে। কিন্তু আবার নতুন লোক আসবে। আসা-যাওয়ার এই রাজনৈতিক খেলা চলতেই থাকবে। হতে পারে তোমাদের দৃষ্টিতে এটা ভুল। কিন্তু আমার বোধ হয় এর চেয়ে বড় বেশী কিছু করার শক্তি নাই।'

আলোচনার এক পর্যায়ে মওলানা সাহেব সাক্ষাৎকারীকে তাঁর সংগে এক সাথে কাজ করার দাওয়াত দিলেন। সাক্ষাৎকারী জানালেন, 'চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করি। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষাগত, বড় জোর সাংস্কৃতিক কিছু কাজ করতে হয়ত পারি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে যতটুকু সম্ভব খাটতে পারি, কিন্তু তার বেশী নয়।'

মওলানা ভাসানী অনুযোগ করে সাক্ষাৎকারীকে বললেন, 'কতকাল চাকরি করবা। চাকরি ছেড়ে চলে আস। চাকরি তো হলো চাকরের কাজ। রাজনৈতিক কর্মীরা হলো জনগণের সন্তান। সংসার চাকর ছাড়া চলে না। কিন্তু চাকর কখনও পুত্রের কাজ করতে পারে না। চাকরিটা ছেড়ে জনগণের সন্তান হও। আমি তোমার কাঁধে চড়ব। আমার কাঁধে চড়িয়ে তোমাকে বড় করব। ছোট লোভ ছেড়ে বড় চিন্তা করতে শেখ। দেশেরও ভাল হবে তোমারও ভাল হবে।'

www.pathagar.com

'ছোট লোভটা অনেকের এত বেশী যে, তারা বড় কাজ করতে পারে না। তাই তারা চাকরই থেকে যায়।'

এর কয়েক মাস পর ১৯৬৯ সালের দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সাক্ষাৎকারী আবার মওলানা ভাসানীর সংগে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মওলানা ভাসানী তাঁকে বললেন, 'তুমি তো পারবে না তোমার চাকরি ছাড়তে। আচ্ছা একটা কাজ কর। আমার একটা কাজ করে দিতে পার কিনা দেখ। এই যে তমদ্দুন মজলিস একটা ছিল। তারা তো এক সময় খুব ভালো কাজ করেছিল। তারা ভাষা আন্দোলন শুরু করেছিল। তারপর চুপচাপ। তাদের কথা তারা ছাড়া আর কেউ বলে না। চুপচাপ থাকলে অন্যেরা বলবেই বা কেন? কিন্তু কিছু লোকতো ছিল ভালো। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, শাহেদ আলী। এরা বড় ভালো মানুষ। এদেরকে আমার কাছে একটু নিয়ে আসতে পার?'

খবর পেয়ে তমদ্দুন মজলিসের এককালীন সম্পাদক শাহেদ আলী মওলানা ভাসানীর দরবারে গেলেন। তিনি তাঁকে খুব ভালো করে চেনেন। এখন কিছু করেন না বলে কিছুক্ষণ বকলেন। তমদ্দুন মজলিসের লোকেরা ভাসানীর নেতৃত্বে কাজ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হলো। তবে কাজের অসুবিধা হওয়ার তো কথা নয়। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো মওলানা ভাসানী একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলন ডাকবেন। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের অনুরূপ। তবে এটা হবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এতে তাঁর মুরিদরাও আসবে ডাল চা'ল নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণও আসবেন।

মওলানা ভাসানী বললেন, 'আমি লোক একত্র করে দেব। আমার ডাকে সারা দেশ হতে বুদ্ধিজীবীরা কথা বলতে আসবে। সাধারণ মানুষ আসবে শুনতে ও দেখতে। তোমরা ঢাকা বসে সম্মেলন করে যে কয়জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাস্টার পাবে, আমি সন্তোষে বসে তার থেকে বেশী পাব। আমি লোক একত্র করে দেই। তোমরা জাল পেতে শিকার ধর। তাদেরকে হেদায়েত করতে চেষ্টা করো। আলাপ-আলোচনা, ওয়াজবক্তৃতার মাধ্যমে রব্বানী দর্শন প্রচার কর। টাকা-পয়সাও আল্লাহ্ মিলিয়ে দেবেন।'

মওলানা ভাসানী আহূত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হলো। সভাপতি মওলানা ভাসানী নিজে। সহ-সভাপতি দু'জন।

www.pathagar.com

আল্লামা আবুল হাশিম এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আর সম্পাদক অধ্যাপক শাহেদআলী। তমদ্দুন মজলিসের পুরনো লোকেরা খুব বেশী উৎসাহ বোধ করল না। কারণ মওলানা ভাসানী কোথা হতে কি করেন তার হাদিস পাওয়া কঠিন। তাঁর রাজনীতি বড় জটিল, সাধারণের বোধগম্যের উর্ধ্বে। তবে তিনি আন্দাজী কোন কাম করতেন না। তাঁর নিজস্ব একটা হিসেব আছে।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজকর্ম তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা তেমন কিছু করল না। ভূতের মত কোথা হতে কে এসে যে কাজ করে দিয়ে গেল বোঝা গেল না। কিন্তু কাজ হয়ে গেল। তবে ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনের মত জাঁক-জমকের সাথে নয়। সম্মেলন খুব সাফল্যের সংগে সমাপ্ত হলো। বিপুল জন সমাগম হলো। তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা মওলানা ভাসানীর চারদিকে ঘিরছে এই খবর পেয়ে বামপন্থী কর্মীদের যারা যাই যাই করছিল তারা ফিরে এলো। কারণ তারা ভেবেছে মওলানা তমদ্দুনীদের হাতে পড়ে আবার কাঠমোল্লা না হয়ে যায়। তমুদ্দুনীরা অনেকটা উদার এবং প্রগতিশীল। কিন্তু হাজার হলেও মুসলমান তো—তাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। তাদের খপ্পর হতে মওলানাকে মুক্ত রাখতে হবে। বামপন্থীদের যারা মওলানার সাথে সংযুক্ত হয়ে কোন বৈজ্ঞানিক আন্দোলন সম্ভব নয় বলে তার সমালোচনা করেছিল তারা আবার মওলানার চারপাশে ভীড় জমাতে লাগল।

কয়েক মাস পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপলক্ষে উক্ত সাক্ষাৎকারী মওলানার সংগে আবার দেখা করতে গেলেন। মওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন তমদ্দুন মজলিসকে শক্তিশালী করা এবং এর নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে। মওলানা খানিকটা উপেক্ষার স্বরে বললেন, 'তমদ্দুন মজলিস! মানুষ আছে তাদের সাথে? সর্বসাকুল্য পৌনে এক গণ্ডা মানুষ। কই, কাজ করার জন্যে কোন কর্মী তো দেখলাম না!'

'তাদের তো আছে বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক। এরা তো আকামিলা। শুধু কথার ফানুস উড়ায়। এদেরকে এমনিতেই পাওয়া যায়। সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী পাওয়ার জন্যে সংগঠনের দরকার কি? সংগঠনের জন্য তো কর্মী দরকার। তমদ্দুন মজলিসের কর্মী কোথায়?'

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী যেখানে যাঁদের সাথে ছিলেন, সেখানেই থেকে গেলেন। তাঁকে তমদ্দুন মজলিসের নেতা হতে হলো না। বামপন্থীদের যারা তাঁর কাছে থেকে সরে যাচ্ছিল, তাদেরকে তিনি বললেন, 'যা তোরা যা, আমার কোন ক্ষতি নাই। তমদ্দুন মজলিসের ছেলেরা আমার কাছে এসেছে। তারাই ভালো। তোরা তো আর আমার আদর্শ সেকেলে ইসলাম গ্রহণ করবি না। তোদের চেয়ে তমদ্দুন মজলিসের ছেলেরাই ভালো। তারা আমার আদর্শে বিশ্বাস করে।'

তমদ্দুন মজলিসের জুজু দেখিয়ে মওলানা ভাসানী বামপন্থীদেরকে আবার ফিরে পেলেন। সাংস্কৃতিক সম্মেলন দ্বারা আর যা হোক তাঁর প্রয়োজন যতটুকু ছিলো ততটুকু সাধিত হলো। সত্যই মওলানা ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন নেতা। তাঁর খেলা অন্যদের পক্ষে বোঝা বড় কঠিন ছিল।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রবুবিয়াতে বিশ্বাসী তওহিদী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক স্ট্রেটেজী হিসেবে বামপন্থীদের কাঁধে চড়েছেন আর বামপন্থীরাও স্ট্রেটেজী হিসেবে তাঁর ছত্রছায়ায় অগ্রসর হয়েছে। মৃত্যুর সাথে সাথে পরস্পরের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। এখন মওলানা ভাসানী যাদের সন্তান ছিলেন, যাদের মানুষ ছিলেন, তাদের মধ্যেই আসবেন।

রবুবিয়াতে বিশ্বাসী মওলানা ভাসানী ঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যে একজন ঈমানদার মুসলমান ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল—গরীবের প্রতি মমত্ববোধ। কিন্তু এ জিনিসটির চরম অভাব তিনি রাজনৈতিক জীবনে ইসলামপন্থীদের মধ্যে দেখেছেন। বামপন্থী নেতা এবং কর্মীবৃন্দ কৃষক মজুরের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ছিল অধিকতর সহানুভূতিশীল।

মওলানা ভাসানী ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জীবন-দর্শন সম্বন্ধে তেমন অবহিত ছিলেন না। তিনি একজন বড় আলেম ছিলেন না। ইসলাম যে মানব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কিভাবে যে সমাধান দেয়, তা তিনি অবহিত ছিলেন না। অন্যদিকে বামপন্থী কর্মী এবং নেতাগণ তাঁর মত জনপ্রিয় নেতাকে অবলম্বন করে জনগণের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করে।

নিজের চেহারা সুরাতে সনাতন পন্থী হয়েও স্যার সৈয়দ আহমদ যেরূপ পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন দ্বারা মোহিত হয়ে ইসলামকে পাশ্চাত্যায়ন করতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন, মওলানা ভাসানীও চালচলনে সনাতন পন্থী হয়ে মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সমাজতন্ত্র এবং ইসলামের সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

মওলানা ভাসানীর হৃদ্যতা এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল কম্যুনিস্টদের সংগে। কিন্তু কস্মিনকালেও তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন না। কম্যুনিস্টদের সংগে দহরম মহরমের জন্যে তিনি ছিলেন ইসলামপন্থীদের নিকট সমালোচিত। আর কম্যুনিস্ট না হওয়ার জন্যে কম্যুনিস্টদের নিকট ছিলেন সমালোচিত।

মওলানা ভাসানী ছিলেন খালেস তৌহিদবাদী। কিন্তু তিনি নেতৃত্ব দিতেন সমাজতন্ত্রী শিবিরের। চীন সফর শেষে এসে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি আমার দেশে সমাজতন্ত্র না দেখে মরব না।' আমাদের দেশের ভুখা-নাংগা অনাহারক্লিষ্টদের অবস্থা কল্পনা করে তিনি হয়ত ভাবতেন, সমাজতন্ত্র ভিন্ন এদের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্র নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র ছিল না। সমাজতন্ত্রের কথা বলার জন্যে তিনি ইসলামপন্থীদের শত্রু হলেন। কিন্তু ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হওয়ার কারণে সমাজ-তন্ত্রীদের আপন হতে পারলেন না।

মওলানা ভাসানীর অর্থনৈতিক দর্শন সমাজতন্ত্র ছিল না। তাঁর দর্শন ছিল রবুবিয়াত। ঐ দর্শনে তাঁর এবং আল্লামা আবুল হাশিমের গুরু ছিলেন মওলানা আজাদ সুবহানী। রবুবিয়াত শব্দের কোন সঠিক ইংরেজি বা বাংলা প্রতিশব্দ নেই, 'রাষ্ট্রীয় প্রতিপালনবাদ' বললে এর কিছুটা কাছাকাছি অর্থ হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্ব এবং সকল জীবের প্রতিপালক। তিনি সকল জীবের জন্যে প্রয়োজনীয় মৌলিক সম্পদ সৃষ্টি করেছেন এবং তা ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন সামগ্রিক জীবন বিধান ইসলাম, যার একটি বিশেষ এবং অর্থনৈতিক দিক হলো রবুবিয়াত। এই রবুবিয়াত সমাজে প্রতিষ্ঠা করবে খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র। তাই খিলাফত এবং তার কর্ণধার খলীফা রাষ্ট্রের শুধু সকল মানুষ নয়, সকল জীবের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ জন্যেই হযরত উমর (রা.)-কে বলতে হয়েছে, 'ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে উমরকেই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র এবং খলীফা যদি রাষ্ট্রের প্রত্যেক মানুষের জীবিকা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলাম এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে তফাত কিছুটা কমে যায়। রবুবিয়াতে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও মওলানা ভাসানী রবুবিয়াত কায়েমের জন্যে সমাজতন্ত্রকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন। রবুবিয়াত এবং সমাজতন্ত্র যে পরস্পরবিরোধী এবং অসংগতিপূর্ণ তা অনুধাবন করার মতো সুস্থ ইসলামী ধারণা হয়ত তাঁর ছিল না অথবা তাঁর সমকালে এই পার্থক্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি।

যারা রবুবিয়াতে বিশ্বাস করে তাদেরকে বলা হয় রব্বানী। আল্ কুরআনে আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন রব্বানী হয়ে যেতে। প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন রব্বানীদের ইমাম। ইসলামের ইতিহাসের বড় বড় বুজুর্গকে মাহবুব-ই-রাব্বানী বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। রব্বানীদের ইমাম হিসেবে মহানবী (সা.)-এর সীরাত বিশ্লেষণ করেছেন মওলানা আজাদ সুবহানী তাঁর 'তাজকিরাতে মুহাম্মদী' গ্রন্থে যা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 'বিপ্লবী নবী' নামে অনুবাদ করেছেন। রবুবিয়াত ব্যাখ্যা করে আজাদ সুবহানী বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন।

মওলানা ভাসানী এবং আল্লামা আজাদ সুবহানীর মধ্যে রবুবিয়াত নিয়ে একাধিকবার আলাপ হয়েছে। মওলানা আজাদ সুবহানী ছিলেন একটু ব্যতিক্রমধর্মী আলিম। অসাধারণ প্রতিভাধর এ মওলানার কর্মকাণ্ড ছিল অদ্ভুত এবং রহস্যজনক।

ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা রাজনৈতিক পার্টিসমূহ কর্তৃক রবুবিয়াতকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়ে মওলানা রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে এক সময় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ তারাই তাঁর মতে রবুবিয়াত বা রাষ্ট্রীয় প্রতিপালনবাদকে কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র নামে বাস্তবায়িত করতে আগ্রহী।

রবুবিয়াত দর্শনে মওলানা ভাসানীকে আজাদ সুবহানী শেষ দীক্ষা দেন ১৯৪৬ সালে গৌহাটিতে। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল করে ভাসানী ফিরেছেন গৌহাটিতে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বৃদ্ধ আজাদ সুবহানী এসেছেন ভাসানীর সংগে সাক্ষাৎ মানসে। খুব সম্ভব ঐটাই ছিল গুরুর সংগে শিষ্যের শেষ সাক্ষাৎ।

www.pathagar.com

ক্ষেপাটে মওলানা আজাদ সুবহানী একটানা সিগারেট টানতেন। রাতের বেলা শিষ্যকে নিয়ে বসেছেন। সম্মুখে ধূমায়িত এ্যাস-ট্রে। ভাসানীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে এ্যাস-ট্রে'র উপরে চেপে ধরে বললেন, 'মনে কর এটাই কা'বা শরীফ। এই কা'বা শরীফ ছুঁয়ে তুমি আমার কাছে অংগীকার কর যে, সারা জীবন রবুবিয়াত কায়েমের সংগ্রাম করবে।' অংগীকার মওলানা ভাসানী করেছিলেন আর সে অংগীকার প্রতিপালনে সারা জীবন সাধনা করেছেন। যে ব্যথা ও অভিমানে রব্বানী মওলানা আজাদ সুবহানী কম্যুনিস্ট না হয়েও কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, একই কারণে মওলানা ভাসানীও এদেশের সমাজতন্ত্রী কর্মীদেরকে কাছে টেনে নিতেন। কারণ ইসলাম ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার, ব্যথা বেদনার কথা না বলে দামেস্কী, বাগদাদী, মোগলাই ইসলামের বাদশাহী ঐতিহ্যকে মূলধন করে আসর গরম করে রাখেন। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের রবুবিয়াত কায়েমের সংগ্রাম সাধনার কথা খুব কমই বলে থাকেন। রবুবিয়াত কায়েমের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বশেষ রাজনৈতিক সংগঠন হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি। যদিও রবুবিয়াত-এর কথা মওলানা ভাসানী সব সময় বলতেন, কিন্তু হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি জীবনের শুরুতে না করে কেন তিনি জীবন সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে শুরু করেছিলেন—এ আর এক জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো তিনিই জানতেন।

চীনপন্থী নেতা মওলানা ভাসানী ঃ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মওলানা ভাবতেন যে, ভারত অপেক্ষা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনই আমাদের ঘনিষ্ঠতর মিত্র হতে পারে। অনেক ইসলামপন্থীর দৃষ্টিতে ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী চীন অপেক্ষা ভারতের সাথে বিভিন্ন কারণে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়া স্বাভাবিক। চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে তিনি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে সমর্থন করতেন। কেউ কেউ বলেন যে, চীনের সাথে পকিস্তানের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক সৃষ্টিতে তাঁর কিছুটা অবদান ছিল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একবার সরকারী দলের নেতা হিসেবে চীন সফরে যান। মওলানা ভাসানীর চীন সফরের অভিজ্ঞতা সাপ্তাহিক জনতা পত্রিকায় এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'মাও সেতুং-এর দেশে' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর সঙ্গে আলোচনার আর একটি দিক যা চাপা পড়ে গিয়েছিল তা এখানে কিছুটা তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ্‌র রাসুল (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্যে দরকার হলে চীন দেশে যাও।' সামাজিক কল্যাণ এবং সম্পদের সুবন্টন এবং অন্যান্য সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অবস্থা অবগত হওয়ার জন্যে তিনি চীন দেশ ভ্রমণ করেন।

এ ভ্রমণের সময় মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর সংগে মওলানা ভাসানী কয়েক দফা সাক্ষাৎ করেন। মওলানা ভাসানীর নিকট এদেশের বামপন্থী বহু তরুণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হাসেল করেছে এবং সাবালক হয়ে রাজনৈতিক গগনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে নিয়েছে বটে, মওলানা ভাসানী কিন্তু নিজে কম্যুনিস্ট বা বামপন্থী ছিলেন না।

মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামী আদর্শ এবং রবুবিয়াত দর্শন কম্যুনিজম হতে হাজার গুণ ভালো। তাই চীন দেশে গিয়ে বহু নেতার মতো চীন দেশের অপার মহিমা কীর্তন না করে ইসলামের জয়গানই গেয়েছেন।

চেয়ারম্যান মাওকে তিনি সাক্ষাতের সময় কুরআনের একখানা তরজমা উপহার দেন। চেয়ারম্যান মাও তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কিতাবের মূল বক্তব্য কি কি?' মওলানা ভাসানী মানব কল্যাণে আল-কুরআনের বহুমুখী শিক্ষা, মানব ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের উল্লেখ করে মওলানা জানান, 'সকল মানুষ ভাই ভাই। সমগ্র মানব এক জাতি। দেহের এক অংগ আহত হলে যেমন সারা অংগে তা অনুভূত হয়, মানব সমাজও তাই।'

'আল-কুরআনে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত না করে। এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না করে যাতে সম্পদ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে।'

'মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে হবে। একটি মুহূর্ত অপচয় করার এবং অলস থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই। সকলকেই কাজ করতে হবে, খেটে খেতে হবে।'

'পরিশ্রমের উপর নির্ভর না করে বেঁচে থাকার অধিকার আল্লাহ্ নবীদের-কেও দেন নি। তাদেরকেও কায়িক পরিশ্রম করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করতে হতো। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে এবং রোজগার করতে না পারলে পেটে পাথর বেঁধে থাকতে হতো, তবুও অন্যের শ্রমের ফল তাঁরা ভোগ করতেন না।'

'একজনের শ্রমের ফল অন্যজন ভোগ করলে তা' হবে জুলুম। সকল প্রকার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জুলুমের বিরুদ্ধে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে, নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ। জুলুমের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।'

'এ বিশ্বে যা কিছু সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র উলুহিয়াত-এর যেমন কোন শরীকানা হতে পারে না, কেউ আল্লাহ্কে ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়ে নিজের জন্যেও তাঁর পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে নিজে ক্ষুদ্র ইলাহ হয়ে বসতে পারে না, তেমনি সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করেও কোন ব্যক্তি নিজে ক্ষুদে মালিক হয়ে বসতে পারে না। কারণ তা হবে শেরেকী প্রবণতা, যা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনুরূপ।'

'আল্লাহ্ শুধু মানুষই সৃষ্টি করেছেন তা নয়। তিনি সকলের বাঁচবার উপযোগী সম্পদও সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিমালিকানা কায়েম করে কিছু কিছু লোক আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ কুক্ষিগত করে আল্লাহ্র অপর বান্দাকে তা হতে বঞ্চিত করতে পারে না।...'

মওলানা ভাসানীর মুখে আল-কুরআনের সারমর্ম শুনে চেয়ারম্যান মাও সেতুং জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'মওলানা! তোমরা মুসলমানরা এ কিতাব নিয়ে কি করো ?'

মওলানা ভাসানী বললেন, 'এটা আল্লাহ্র নিজস্ব কালাম। এর ইজ্জতের জন্যে আমরা আমাদের জানমাল কোরবান করতে পারি। আমরা এর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষর স্মরণশক্তি প্রখর হলে হেফজ করি। সকাল-বেলা আল্লাহ্র এই পাক কালাম তেলাওয়াত করে আমরা দিবসের কাজ শুরু করি। বিশ্বের মধ্যে এটা হলো সবচেয়ে বেশী পঠিত কেতাব।'

শুনে চেয়ারম্যান মাও সেতুং মন্তব্য করেন, 'তোমাদের কুরআনের মহা-মূল্যবান বাণী তোমরা তিলাওয়াত কর আর আমরা তা প্রাকটিস করি। এখানেই তোমাদের সমাজ এবং আমাদের সমাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।'

www.pathagar.com

একাধিকবার মওলানা ভাসানী চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিবারেই তিনি তাঁকে হেদায়েত করার চেষ্টা করেন। চেয়ারম্যান মাও সেতুং তাঁকে বলেন, 'আল-কুরআনের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক অনুশাসন তো তারাই মুসলমান রাষ্ট্রগুলো হতে বেশী অনুসরণ করছেন, তাই তাদেরকেই মুসলিম দেশগুলোর অনুসরণ করা উচিত।'

মাও সেতুং মওলানা ভাসানীর নিকট জানতে চান যে, চীন দেশে অনেক মুসলিমকে মসজিদ হতে গ্লাস হাতে করে বের হয়ে আসতে দেখেছেন। এর তাৎপর্য কি? মওলানা ভাসানী জানান যে, ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ রোগে-শোকে আল্লাহ্‌র কালাম পড়া পানি মসজিদের ইমামের নিকট হতে গ্লাসে করে নিয়ে আসেন। এটা শুধু চীন দেশে নয়, সারা বিশ্বের মুসলমানই করে থাকে।

শুনে চেয়ারম্যান মাও সেতুং মওলানাকে বলেন, 'তোমরা বড় বেকুব জাত! তাই অতি অল্পে তুষ্ট থাক। তোমাদের আল-কুরআন তো একটি সমুদ্র। এখান থেকে বিপ্লবের নদী প্রবাহিত করে তোমরা সারাটা দেশ প্লাবিত করে ফেলতে পার। তা না করে সেখান থেকে তোমরা শুধু গ্লাসে করে পানি পড়া নিচ্ছ।'

এক সাক্ষাৎকারে চেয়ারম্যান মাও মওলানাকে বলেন, 'মওলানা, তোমাদের সমাজে যদি আমার জন্ম হতো আমার সংগ্রাম অতি সহজে সাফল্যমণ্ডিত হতো। তোমরা বিপ্লব যে কেন করতে পার না তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হই! তোমাদের সমাজে বিপ্লবের ক্ষেত তো তৈরী হয়েই আছে—এতে শুধু বীজ বপন করলেই বিপ্লব সম্ভব হতে পারে।'

চেয়ারম্যান আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেন, 'বিপ্লবী সাধনায় তার সবচেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়েছিল সংস্কারমূলক কথা শোনাবার জন্যে লোকজন একত্র করতে। দশ-পনর জনের একটি ক্ষুদ্র মিটিং করতে, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কমিটি করার জন্যে লোক একত্র করতে প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও কখনও তার মাসাধিক কালের পরিশ্রম দরকার হতো। এক মিটিং হলেই তো হলো না, তার ফলো-আপ হতো না। মনোনীত নিযুক্ত প্রতিনিধির ডাকে লোক সাড়া দিত না।

বিপ্লবী আদর্শ আলোচনা এবং বিপ্লবের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্যে লোক যোগাড় করাই ছিল বিপ্লবী কর্মী বাহিনীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। লোক

www.pathagar.com

একত্র করতে পারলে বুঝাতে এতো অসুবিধা হতো না। কিন্তু বুঝে গিয়ে কোন কথাকে নিজের কনভিকশন-এ পরিণত করার জন্যে প্রয়োজন হতো একই কথার পুনরুক্তি এবং আলোচনা-পর্যালোচনা। তাই একই বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার জন্যে বার বার মিটিং-এর প্রয়োজন পড়তো।'

চেয়ারম্যান বললেন যে, 'লোক সমবেত করার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম তার বিপ্লবী কর্মীদেরকে করতে হয়েছে, চীন দেশের লোকেরা অন্য ধর্মাবলম্বী না হয়ে মুসলিম হলে তার সাধনা অতি সহজে সফল হতো। কারণ এ সমাজে লোক বিনা নোটিশে সপ্তাহে একবার নয়, দিনে পাঁচবার মসজিদে একত্র হয়। নেতার (ইমামের) হুকুমে পূর্ণ আনুগত্য এবং শ্রদ্ধার সংগে ওঠা বসা করে। নামাযে এদের শৃংখলাবোধ দেখে মনে হয় এরা যেন ধাতু নির্মিত হাতিয়ার। বারুদ দিলেই এরা কামানের মত গর্জে উঠবে।'

'তোমাদের সমাজে একজন বিপ্লবী কর্মী একদিনে পাঁচটি মসজিদে জনতার মধ্যে নামাযের শেষে বিপ্লবের বাণী পৌঁছাতে পারে, পার্টির কর্মসূচী জানিয়ে দিতে পারে। এমন সমাজে তোমরা কেন যে বিপ্লব সংঘটিত করতে পার না তাই আমার বিস্ময়!'

মওলানা এক আলোচনায় জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহ্ তাদের কি ক্ষতি করেছেন যে, তারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার এবং মানুষের মন থেকে উৎখাত করার জন্যে অমন খড়্গ হস্ত হয়ে কোমর বেঁধে লেগেছে!' মাও সেতুং জবাব দেন যে, উপমহাদেশে দেবদেবী ও ঈশ্বরের যে দুর্দান্ত প্রতাপ এবং প্রভাব, চীন দেশে সেরূপ নেই, কারণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টা সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে মহাপ্রভুর প্রতিনিধিত্বকারী প্রভুরা।

স্রষ্টাকে চোখ, কান, নাক, ত্বকের সাহায্যে অনুভব করা যায় না। তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর আহার, নিদ্রা, বাসস্থান, বিলাসিতা এবং সেবার প্রয়োজন হয় না। তাঁর আনুগত্যে বা সেবার জন্যে কোন জড় বস্তুর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সনদধারী পীর-পুরোহিত তারই আনুগত্য স্বীকারকারী খোদা পরস্ত জোতদার, মুৎসুদ্দি, আমলা, শাসক, শোষকগণ দুনিয়ার খোদার দেয়া তথাকথিত ধর্মবিধি নিজেদের সুবিধামত ব্যাখ্যা এবং অবলম্বন করে নিজেরাই এক একজন ক্ষুদে খোদা হয়ে বসে আছে। লক্ষ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস তারা লুটেপুটে

www.pathagar.com

খাচ্ছে। এই সমস্ত শোষকদের বিরুদ্ধে, তার দেশে যারা সংগ্রাম করছে তাদের নেতৃত্বদানের আহ্বান মাও সেতুং জানান।

মাও সেতুং বলেন, 'খোদা মানুষের আনুগত্য, রুকু, সিজদা, যাকাত ইত্যাদি পেলে খুশী হন। যাকাতের অর্থ নিজে নেন না। দুর্গত মানবতার সেবাই ব্যয় হয়। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী এবং তাঁরই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত সমাজে আমলা, জোতদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি খোদারা গরীব, নিঃস্ব, অসহায় মানুষের শুধু রক্ত নয়, হাড়মাংস চিবিয়ে চুষে খাচ্ছে।'

'সমস্ত শোষক শ্রেণীকেই জনগণ খোদার প্রতিভূ স্বীকার করে নিয়েছে এবং তাঁর শরীকদের শোষণ জালে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে আছে যে তাদের হৃদয় হতে খোদাকে উৎখাত করা ছাড়া তাঁর শরীক এবং সমস্ত ক্ষুদে খোদাদের উৎখাতের অন্য কোন পন্থা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না।'

'তোমরা যদি জোতদার আমলা, পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, পীর-পুরোহিত—এই সমস্ত ক্ষুদে খোদাকে নির্মূল করে এক লা-শরীক রাজত্ব কায়েম করতে পারো এবং মদীনার ন্যায় শোষণহীন সমাজের ব্যবস্থা কায়েম করতে পার তবে সেদিন তোমাদের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের অবসান হবে।'

মাও সেতুং এবং মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার রাষ্ট্রীয় প্রোটকল অনুযায়ী সময় এবং কথা মেপে মেপে হয় নি। দু'জনই দু'জনকে হেদায়েত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কে কতটুকু সফল হয়েছিলেন একমাত্র অন্তর্যামীই ভালো জানেন। তবে চেয়ারম্যান মাও সেতুংকে কুরআনী দর্শনের প্রতি সহানুভূতিশীলই মনে হয়েছিল।

রাজনৈতিক বাগ্মী ভাসানী ঃ মওলানার বক্তৃতার ভংগী ছিল তাঁর নিজস্ব এবং মৌলিক। বিশ্লেষণ করে তাঁর সেই ভংগীকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। বক্তৃতার মধ্যে সভার কোন অংশে কেউ হৈচৈ শুরু করলে বা কেউ কথা বললে মওলানা গর্জে উঠতেন তাঁর একটি অতি প্রিয় ধমকের শব্দ ব্যবহার করে। শব্দটি ছিল 'খামোশ'। একই বক্তৃতায় একাধিকবার তিনি এ শব্দটি ব্যবহার করতেন। বড় বড় বৈঠকে আলোচনার সময়, সোহরাওয়ার্দী বা শেরে বাংলা ফজলুল হকের ন্যায় জাতীয় নেতার

www.pathagar.com

উপস্থিতিতে যদি তাঁর কথা বলার সময় কেউ সাইড টক করত, তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ 'খামোশ' শব্দে সভায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনতেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন মুনাজাত দিয়ে। শুরু করতেন 'ভাইয়ো' বলে। আইয়ুব-ইয়াহিয়ার মার্শাল ল'-এর আমলে তিনি সভা করতেন। সভার নাম হতো মিলাদ মহফিল। রাজনৈতিক মাঠে মিলাদ মহফিল ডেকে মিলাদ শেষে লম্বা মুনাজাত করতেন। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমতাসীনদের জুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাতেন। মুনাজাত-এ সুদীর্ঘ ফরিয়াদেই মওলানার বক্তব্য এবং মনের কথা সকলে অবহিত হোত।

মওলানা ভাসানী কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ হতে ডিগ্রী নেন নি। শুদ্ধ ভাষায় কথাও বলতেন না। কিন্তু তিনি যে শুধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে লোকজনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন তা নয়, নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে স্বল্প সংখ্যক লোকের মাঝেও তাঁকে মনে হতো কথার রাজা। তাঁর আলাপ আলোচনায় ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি—কোন বিষয়ই বাদ থাকত না। যে কোন বিষয়ের উপর তিনি চিত্তাকর্ষক এবং মৌলিক বক্তব্য রাখতে পারতেন। তাই তাঁর সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে কেউ ক্লান্তি অনুভব করতেন না। তাঁর কথাবার্তায় গুরুগম্ভীর বক্তব্য যেমন থাকত, তেমনি তরল হাস্যরস, পরিহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ-অনুরাগ, দরদ-ঘৃণা ইত্যাদি মানবীয় অনুভূতি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি ছিল তাঁর বক্তৃতায়।

মওলানা ভাসানীর অনর্গল জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও যাদুময়ী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শ্রোতাগণ মোহাবিষ্ট হয়ে থাকত। অনর্গল ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করতেন তিনি। বক্তৃতার ভাব ছিল তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর কণ্ঠে নিজেদের সমস্যার কথা তন্ময় হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতো। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকত সৌম্যকান্তি ও সাদা দাড়ির প্রতি। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর বিশাল জনসমুদ্রকে ঘন্টার পর ঘন্টা তন্ময় এবং মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো।

মওলানা ভাসানীর চিন্তা শুধু অতীত বা বর্তমানে নিবদ্ধ ছিল না, তিনি এদেশের জেলে, চাষী, শ্রমিক মজুরের সুন্দর ভবিষ্যত কল্পনা করতেন। তাঁর কর্মকাণ্ড দুঃখী মানুষের সুন্দর ভবিষ্যত রচনার লক্ষ্যে প্রণীত

www.pathagar.com

হতো। তাই অনেক সময় তাঁর উক্তি এবং কর্মসূচী বর্তমানের দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বেখাপ্পা ঠেকেছে। কিন্তু বর্তমান যখন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে তখনই প্রমাণিত হয়েছে মওলানার দূরদর্শিতা। তবে ভবিষ্যতের রংগীন স্বপ্ন দেখতেন বলে মওলানা কিন্তু বাস্তববোধ বিবর্জিত বা অপরিণামদর্শী ছিলেন না। জনমতের অনুকূলে নীতি গ্রহণ করার ফলে তিনি কখনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারেন নি। ফলে সারা জীবনে কঠোর এবং আপোষহীন সংগ্রামী হওয়া সত্ত্বেও তার দৃশ্যত সাফল্য ছিল খুবই কম।

মওলানা ভাসানী জীবনে আন্দোলন করেছেন বহু। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার নামে তিনি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন এবং আন্দোলনকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য পানে নিয়ে গেছেন।

ঘেরাও আন্দোলন ঃ মওলানা ভাসানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে প্রতিপক্ষকে হতবাক এবং বিস্মিত করে ফেলতেন। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের শুরুতে তিনি জন্ম দেন এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের যা রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ঘেরাও আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৯৬৮ সনের আগে ঘেরাও করে দাবী আদায়ের এরূপ কোন কৌশল প্রচলিত ছিল না। মওলানা ভাসানী সৃষ্ট ঘেরাও আন্দোলন তখন থেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সার্থক রাজনৈতিক কৌশলের রূপ পরিগ্রহ এবং মজলুম শ্রমিক জনতার দাবী আদায়ের এক অতি মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

শ্লোগান ঃ বিভিন্ন কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী জনপ্রিয় শ্লোগানের সৃষ্টি করতেন। নিজেই তিনি মঞ্চ হতে শ্লোগান তুলতেন। তাঁর তৈরী শ্লোগানগুলো জনগণের বুঝতে সুবিধা হতো। তাঁর বিপ্লবী শ্লোগান-গুলোর মধ্যে ছিল ঃ 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো', 'ভোটের আগে ভাত চাই—নইলে এবার রক্ষা নাই', 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না', 'গাছতলায় আর পাঁচ তলায়, চলবে না চলবে না'।

মজলুম মানুষ তাদের দুঃখবেদনার কথা ভাসানীর কণ্ঠে শুনতো। সভায় উপস্থিতি ছাড়া বহু নেতার ভূমিকা থাকে গৌণ। কিন্তু মওলানা নির্যা-তিত মজলুম জনতাকে তাঁর সমান সাথী করে নিতেন সংগ্রামের মিছিলে।

www.pathagar.com

জনসভায় বজ্র কণ্ঠে তুর্যনিনাদ তুলেই সংগ্রামী জননেতা ভাসানী শান্ত থাকতেন না, তাদেরকে নিয়ে নেমে পড়তেন রাজপথে সংগ্রামের মিছিলে। মওলানা ভাসানী জীবনে হাজার হাজার মিছিলে নেতৃত্ব দান করেছেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ মিছিল হলো ১৯৭৬ সালের ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল।

মজলুম জনতার নেতা মওলানা ভাসানীকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁকে হিন্দুস্থানের দালাল, চীনের দালাল, কম্যুনিস্টদের দালাল, আইয়ুবের দালাল, বিদেশী চর ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করতে অনেকে দ্বিধা করেন নি। এ সমস্ত সমালোচনার জবাবে মওলানা এক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি শুধু মজলুম মানুষের দালালী করি, করব। আর কারও দালালী কখনও করি নাই, করব না।'

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, বামপন্থী আন্দোলন, জ্বালাময়ী ভাষণ, জ্বালাও পোড়াও আহ্বান, শ্রমিক মজুরের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ইত্যাদি কারণে দেশী বিদেশী বহু পত্রিকায় তিনি 'রেড মওলানা অব দি ইস্ট', 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' ইত্যাদি শ্রুতিমধুর খেতাবে ভূষিত হন। জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনের মাধ্যমে মওলানা কখনও মানুষ জ্বালাতে চান নি। শোষণজুলুম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শোষণ জুলুমের অবসান ঘটানই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

শিক্ষা বিস্তার ঃ মওলানা ভাসানী ছিলেন মূলত রাজনৈতিক। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা এবং কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি কখনও অনবহিত ছিলেন না। আসামে স্যার সাদুল্লাহ মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তুষ্টির একটি প্রধান কারণই ছিল, তাঁর মতে শিক্ষা প্রসারের প্রতি স্যার সাদুল্লাহ্‌র অনীহা। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও যদি তিনি আসামে প্রায় ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন, তবে স্যার সাদুল্লাহ্ প্রধান মন্ত্রী হয়েও তিনটি প্রতিষ্ঠান কেন স্থাপন করতে পারেন নাই!

পাঁচবিবিতে তিনি স্থাপন করেন নজরুল ইসলাম কলেজ, কাগমারীতে স্থাপন করেন মওলানা মুহাম্মদ আলী কলেজ, সন্তোষে স্থাপন করেন টেকনিক্যাল কলেজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষায়তন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর সংগে সাক্ষাৎ করতে সন্তোষ যান। তাঁর খিদমত করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে প্রধান মন্ত্রী মওলানার প্রতি আবেদন জানান। মওলানা বললেন, 'তুমি আমার আর কি খেদমত করবা। আমার খেদমতের দরকার নাই। কলেজটি চালাতে আমার অসুবিধা হতেছে। তুমি এটাকে নিয়ে নাও।'

প্রধান মন্ত্রী জানালেন যে, কলেজটি সরকারী করতে তিনি রাজী আছেন তবে এক শর্তে। শর্তটা হলো কলেজটির নামকরণ হতে হবে 'মওলানা ভাসানী কলেজ'। মওলানা জানতে চাইলেন 'মুহাম্মদ আলী নামটা কি দোষ করছে?' প্রধান মন্ত্রী বললেন, 'এ নামটা পশ্চিমা।' মওলানা বললেন, 'মুজিব! আমি তোমার শর্তটা মানতে রাজী আছি। তবে আমারও একটা শর্ত আছে। দেখা যায়, পশ্চিমা হলেই দোষের হয় তোমার মতে। আমার নবীও যে ছিলেন পশ্চিমা! তুমি যদি আমাকে একটি পূরবা নবী দিতে পার, আমি তোমার শর্তে রাজী।' মওলানার এই জবাব শুনে প্রধান মন্ত্রী লা-জবাব। অগত্যা মওলানা মুহাম্মদ আলী কলেজ নামেই এই কলেজটি সরকারীকরণ হয়।

মওলানাকে নিয়ে কবিতা ঃ মওলানা ভাসানীকে নিয়ে রচিত হয়েছে বহু প্রবন্ধ, তাঁর সম্বন্ধে প্রদত্ত হয়েছে বহু বক্তৃতা, রচিত হয়েছে ছড়া, কবিতা। ১৯৭০ সনে কবি শামসুর রাহমান মওলানার উপর লিখেন তাঁর অন্যতম সার্থক কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবী'। আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছিলেন একটি সুন্দর ভাবদীপ্ত কবিতা 'আমাদের মিলিত সংগ্রাম মওলানা ভাসানীর নাম'। এছাড়া বহু কবি, কথাশিল্পী মওলানা সম্বন্ধে রচনা করেন বহু কবিতা ও ছড়া।

সাত্ত্বিক নেতা ভাসানী ঃ হাজার গুণের সমাহার তাঁর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও মওলানা ছিলেন আমাদের ইতিহাসের একজন বিতর্কিত নেতৃত্ব। বহু ত্রুটি ছিল, ব্যর্থতা ছিল তাঁর। কিন্তু এমন সব গুণাবলী ছিল যা অসাধারণ। মানুষের তিনটি বড় দুর্বলতা থাকে। এই তিনটি দুর্বলতা যদি কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে তাঁকে অসাধারণ বলা যায়। এ তিনটি দুর্বলতা হলো কাম, কাঞ্চন এবং ক্ষমতালিপ্সা। প্রথমটি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা আলোচনা করা বা খুঁজতে যাওয়া কুরুচি। মওলানা ভাসানীর মধ্যে ক্ষমতার লোভ ছিল না। অনেকে অবশ্য বলেন যে, যোগ্যতাও

www.pathagar.com

ছিল না। নেতৃত্বের লড়াইয়ে তিনি অন্যদেরকে সহজে পরাজিত করতে পেরেছেন। ক্ষমতায় যেতে চাইলে তিনি হয়ত যেতে পারতেন। ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন কি পারতেন না, তা স্বতন্ত্র। যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত হয়ে ক্ষমতার মসনদে বসেছেন বা ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন তারাই বা এদেশের জনগণের কি উপকার করেছেন! বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দকে দেশ পরিচালনা, বিশেষ করে অর্থনীতি পরিচালনার যে দায়িত্ব এবং সুযোগ দিয়েছিলেন অনুন্নত বিশ্ব এবং এমন কি উন্নত বিশ্বের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। বাংলাদেশ প্লানিং কমিশনে তাঁর সময়ে সচিব পর্যায়ের ১২ জন বুদ্ধিজীবী কর্মকর্তা ছিলেন।

সঞ্চয় প্রবণতাহীনতা ঃ মজলুম মানুষের নেতা বলে তিনি যে কোন শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের প্রতি ত্রাসস্বরূপ ছিলেন না। তাঁর দরবারে বিভিন্ন ধরনের লোকেরা যেত। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনৈতিক নেতা অনেকেই। তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে উদারভাবে মেহমানদারী করতেন। যারা তাঁর আদর-স্নেহ পেয়েছে, তারা তাঁর নিকট যাওয়ার সময় কমলা, আংগুর, আপেল নিয়ে যেতেন। সময় সময় এত আপেল জমা হতো যে, কাছে যারা থাকত, তারা ভাত না খেয়ে আপেল খেয়েই পেট ভরাতে পারত। কিন্তু এই আপেল ভোজন নিত্যনৈমিত্তিক ছিল না। আবার এমন সময় গেছে যে, তাঁর সংগী সাথী এবং কর্মীদেরকে শুধুমাত্র ডাটা খেয়েও থাকতে হয়েছে। দু' এক বেলা ভাত না খেয়ে থাকার পর খেতের ডাটা বিক্রয় করে চা'ল কিনতে হয়েছে।

সুস্বাদু ফল মিষ্টি যা তাঁর জন্যে লোকেরা নিয়ে যেত, তা বার বার বা পরে খাওয়ার জন্যে রেখে দেওয়া হতো না। আগামী কাল কোন বড় নেতা আসবে তার জন্যে আগের দিন অন্যদেরকে না দিয়ে কোন ফলমূল সংরক্ষণের কোন বিধান ছিল না। তাঁর জন্যে উপহার উপঢৌকন যা আসতো, তা প্রায় সেদিনই যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হতো। সঞ্চয় বা জমা করে রাখার কোন আদতই মওলানার ছিল না।

অর্থলিপ্সাহীনতা ঃ এদেশের কৃষক, মজুর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের অধিকার চেতনা সৃষ্টি ও ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টির

www.pathagar.com

জন্যে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতি বছরই বিরাট বিরাট সম্মেলন, কনফারেন্স করেছেন। মওলানা ভাসানীই এককভাবে এদেশে যতগুলো কৃষক-মজুর, জেলে-তাঁতী, কামার-কুমার সম্মেলন করেছেন অন্য সব নেতাদের সকলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সংখ্যা বোধ হয় তত বেশী হবে না। লক্ষ লক্ষ লোক এ সমস্ত কনফারেন্সে কয়েক ঘন্টা নয়, একদিন দু'দিন নয়, দিনের পর দিন থেকেছেন, খেয়েছেন। এ সমস্ত কনফারেন্স করতে তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ টাকা তিনি দান অনুদান হিসাবে পেয়েছেন। কিন্তু এ টাকা দিয়ে কি তিনি নিজের পরিবারের জন্যে কিছু করেছেন? মওলানা ভাসানীর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীরা মধ্যবিত্ত সমাজের ন্যূনতম জীবিকা বা লেখাপড়ার জন্যে যা দরকার তার দশমাংশও পায় নি। মওলানা ভাসানী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব কোন আবাস ছিল না। তিনি যে ছনের ঘরে থাকতেন, তা পাকবাহিনী ১৯৭১ সনে পুড়িয়ে দেয়। ঐ ঘরে কোনদিন বৈদ্যুতিক ফ্যান ছিল না। তাঁর ইন্তিকালের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁর স্ত্রীর থাকার জন্যে ১৫০০ বর্গফুটের একটি গৃহ নির্মাণ করে দেয়।

সন্তোষের জমিদার বাড়ী তিনি দখল করেছেন। কিন্তু তা কি নিজের জন্যে? সন্তোষের জমিদার কাগমারীর শাহ জামান (র.)-এর ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছলে-বলে-কৌশলে দখলে নিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী তাই পুনর্দখল করতে চেয়েছেন শাহ জামানের নামেই। পাঁচবিবি মনিপুরে শ্বশুর-কুল হতে পাওয়া সম্পত্তি এখন হক্কুল এবাদ মিশনের নামে। সন্তোষের সমস্ত সম্পত্তি এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে অর্থলিপ্সা ছিল কি ছিল না, কতটুকু ছিল, এ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন যাঁরা তাঁর অতি নিকটে ছিলেন। চাঁদা, দান, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত টাকা ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুদ খান।

মোহাম্মদ মাসুদ খান ছিলেন সিলেট এম. এম. কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল এবং সিলেট বারের সম্মানিত এডভোকেট। সিলেট শহরে ১৯৬৬ সালে তাঁকে দেখেছি নিজের প্রাইভেট গাড়ীতে চলাফেরা করতে।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর আসর পড়ল তাঁর উপর। তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সকল বাধানিষেধ উপেক্ষা করে ভাসানীর খিদমতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে হাজির হলেন। মজুরী ঠিক হলো তাঁর নিজের স্ত্রীর এবং ছেলের অন্ন-বস্ত্র। মওলানা ভাসানীর নিজের পরিবারের জন্যে যে ব্যবস্থা, তাঁর জন্যেও হবে সে ব্যবস্থা। তদুপরি পকেট খরচ পাবেন মাসিক মাত্র ৪০ টাকা। এ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মোহাম্মদ মাসুদ খান মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে, কলেজে, শিক্ষকতা শুরু করলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে যখন যা দরকার তা করতেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের জন্যে টাকা দরকার। মওলানা ভাসানী তখন পিজি হাসপাতালে। মাসুদ খান মওলানাকে জানালেন টাকার প্রয়োজনের কথা। মওলানা বললেন, 'সোমবার এসো, টাকার ব্যবস্থা হবে। বিরাট টাকাওয়ালা এক অবাংগালী ব্যবসায়ী এসেছিল। তার কাছে টাকা চেয়েছি। সে সোমবারে টাকা নিয়ে আসবে। এগারটার সময় উপস্থিত থেকে টাকা নিয়ে যেও।'

মোহাম্মদ মাসুদ খান সন্তোষ থেকে টাংগাল এসে ঢাকাগামী প্রথম বাস ফেল করলেন। ভাবলেন প্রথম বাসটা যখন ফেল করলামই, দ্বিতীয়-টায় না গিয়ে তৃতীয় বাসে যাব। সকালবেলার খাবারটা বাড়ীতে খেয়েই যাই। তিনটার দিকে মাসুদ খান টাকা নেওয়ার জন্যে পিজি হাসপাতালে এসে উপস্থিত। কিন্তু টাকা কোথায়!

মওলানা বললেন, 'তোমাকে বলেছি এগারটার মধ্যে আসতে, তুমি এসেছ তিনটায়। টাকা কি করে পাবে?' 'টাকা ঐ অবাংগালী ব্যবসায়ী দেয় নি তাহলে?' মওলানা বললেন, 'না, টাকা দিয়েছিল। কিন্তু অমুক ব্যক্তি তো টাকা নিয়ে গেছে। তার কি যেন সম্মেলন হবে। অনেক টাকার দরকার। সে এসে বলল, টাকা দিতে হবে। টাকা আমার বালিশের নীচে থাকতে তাকে আমি না দেই কিভাবে! তাই দিয়ে দিলাম।'

মাসুদ খান বললেন, 'তা অর্ধেক টাকা দিলেই তো পারতেন, আর আমার জন্যে অর্ধেক রাখতে পারতেন।' মওলানা ভাসানী বললেন, 'কিন্তু ওতো বললো তার অনেক টাকার দরকার। আমি তো দিতে চাইনি। সে বলল, আমার কাছে যা আছে তাই দিতে। তাই দিয়ে দিলাম।'

www.pathagar.com

মাসুদ খান জানতে চাইলেন, 'কত টাকা ছিল, কত টাকা ঐ বিশেষ ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে।' মওলানা বললেন, 'টাকা আমি গণি নাকি? ছিলতো মনে হয় অনেক টাকা। বিরাট ব্যাণ্ডেল তো দেখালাম। হবে কিছু একটা।'

নিরুপায় হয়ে মাসুদ খান উক্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে অনুযোগ করলেন, 'আমার জন্যে নেয়া টাকা আপনি নিয়ে এসেছেন। এ টাকার ভাগ আমাকে কিছু দিন। আমার রয়েছে জরুরী কাজ।' উক্ত ব্যক্তি বললেন, 'স্কুল-কলেজের জরুরী কাজ পরে করলেও তো চলবে। কিন্তু আমার সম্মেলন নির্ধারিত তারিখে করতে হবে। আমার আরও টাকার দরকার। পারলে আপনি আমাকে আরও কিছু টাকা যোগাড় করে দিন। যদি তা না পারেন, এই মেহেরবানীটুকু অন্তত করেন সম্মেলনের আগে আর আপনি মওলানার কাছে টাকা চাইতে যাবেন না। এখন যা আসবে তা সম্মেলনের কাজে ব্যয় হবে।'

অগত্যা মাসুদ খান জানতে চাইলেন কত টাকা তিনি নিয়েছেন। তিনি জানালেন, গুণে পেয়েছেন আঠার হাজার টাকা।

টাকার অংক শুনেতো মাসুদ খানের চোখ ছানাবড়া! এতগুলো টাকা মওলানা না গুণেই দিয়ে দিলেন! তাঁর একটু জানতেও ইচ্ছা হলো না কত টাকা দিলেন!

টাকার প্রতি মোহ কার না আছে? নিজের কাজে খরচ না করলেও অন্তত হিসাব করার, গণনা করে দেখার এবং কত টাকা কাকে দিলাম তা বলার লোভ থাকে। কিন্তু মওলানা ভাসানী ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। তাঁর কাছে ৫০০ টাকার বাণ্ডেল আর ১০,০০০ টাকার ব্যাণ্ডেলের মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। টাকা তাঁর হাতে আসছে, চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোন হিসেবই নেই। হিসেব নেওয়ার আগ্রহ নেই। যাদেরকে টাকা দিচ্ছেন, তাদের কাছ থেকেও কোন দিন হিসেব নিচ্ছেন না বা বলছেন না ঃ এত টাকা তোকে দিলাম কি করলি! মুদ্রার প্রতি এরূপ উদাসীন কতজন মানুষ সারা বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে? এদিক দিয়ে মওলানা ভাসানী সত্যিই ছিলেন অসাধারণ।

www.pathagar.com

সমমমত্ববোধ ঃ ১৯৬৯ সালে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ঐ সময় তাঁর বক্তৃতার একটি মূল বিষয় ছিল, 'কেয়ামত তক পাকিস্তান এক রহেগা।' এই সফরকালে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানে বহু বস্ত্র কারখানায় বক্তৃতা করেন। যারা কাজ করে তাদের প্রতি রহম করার জন্যে মালিকদেরকে হেদায়েত করেন। বস্ত্র মিলের মালিকগণ তাঁকে বহু শাড়ী কাপড় উপহার দেন।

এসব শাড়ী মওলানা ভাসানীর সচিব দেশে নিয়ে আসেন। বাড়ী আনার পর হলো এক সমস্যা। মওলানা ভাসানী বললেন, কেউ একটার বেশী শাড়ী পাবে না। তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধু, কন্যারা চান প্রতি জনে দুটো করে শাড়ী। কিন্তু মওলানা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, 'এবার একটা করে নাও। এরপর আবার যাচ্ছি। কত শাড়ী পাওয়া যাবে। কারোরই দুটো করে নেওয়ার দরকার নাই।' শেষ পর্যন্ত মওলানার রায়ই বহাল রইল।

শাড়ী বিতরণের সময় নির্ধারিত হলো। পাড়া-পড়শী অনেকেই শাড়ী নিতে এলো। শাড়ী মওলানা নিজ হাতেই বিতরণ করছেন। বিতরণের নীতিমালা একটাই। যার ভাগে মওলানার হাতে যেটা উঠে। মওলানা নিজের মেয়ে বা পাড়ার ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করলেন না। সিল্কের এক বেনারসী শাড়ী দিয়ে দিলেন গ্রামের এমন এক মেয়েকে যে জীবনে সাবান ব্যবহার করে নি। সিল্কের শাড়ীর যত্নও কোনদিন শিখে নি। হয়ত এ শাড়ী পরেই পুকুরে নাইতে নামবে বা পাতিলের কালি উঠাবার জন্যে সোডাই ব্যবহার করবে। এই যে নিজের মেয়ে এবং পাড়ার মেয়ের প্রতি সমান ব্যবহার, তা আমাদের দেশের ক'জন নেতা করতে পারবেন?

মওলানা কখনো সাত-পাঁচ হিসেবে করে দান করতেন না। সিল্কের শাড়ী একটি জেলে মেয়েকে দেওয়ার সময় তাঁর মনে এ খেয়াল হয় নি যে, এ মেয়ে তো জেলের মেয়ে। এ শাড়ীর যত্ন তো সে করতে জানবে না। এত সব দুনিয়াদারী হিসেব মওলানার মাথায় আসতো না।

এরূপ উদার মহামানবের সান্নিধ্য পেয়েই তৎকালীন পয়গামের সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ ইরফানুল বারী আজও মওলানার মাযারকে আঁকড়ে ধরে সন্তোষের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। মওলানার রূহানিয়াতের তীব্র আকর্ষণই তাঁকে স্বাধীনতার পর দেড় দশক পর্যন্ত বিয়ে-শাদী করে সংসার ধর্ম যাপনে নিরুৎসাহী করে রেখেছিল।

www.pathagar.com

পীর ভাসানী ঃ মওলানা ভাসানী সুঠাম এবং সুগঠিত দেহের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার জন্যে সাধনা করছেন। পীরের সান্নিধ্যে থেকে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে অসীম মনোবল নিয়ে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে যে আত্মিক উন্নতি দরকার হয় সে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন সুফী দরবেশ নাসিরুদ্দিন বোগদাদীর নিকট।

মওলানর মুরীদ, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ভক্ত সকলেই মওলানাকে সম্বোধন করতেন 'হুজুর' বলে। মওলানা সম্বন্ধে আলোচনাকালেও তাঁর ভক্তগণ 'হুজুর বলেছেন', 'হুজুর নির্দেশ দিয়েছেন', 'হুজুর আসবেন' ইত্যাদি বলতেন। ভাব প্রকাশকালে তাঁরা মওলানাকে হুজুর বলেই উল্লেখ করতেন। তাঁর সমবয়স্ক সাথিগণ তাঁকে মওলানা বলে সম্বোধন করতেন। মওলানা ভাসানী তাঁর মুরীদদেরকে পানি পড়া দিতেন, তাবিজ দিতেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ওরা বিশ্বাস করে আমার কাছে আসে। তাদের বিশ্বাসের গুণেই আমার পানি পড়ায় তাদের উপকার হয়। মানুষের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নাই। আমি শুধু পানি পড়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে তাদেরকে বলি না। আমি তাদেরকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলি। দোওয়া এবং দাওয়া—দুটোই আমাদের নবীর সুন্নাত।'

মুরীদদের দান অনুদান ঃ মওলানার মুরীদদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। তাঁর অধিকাংশ মুরীদান ছিল আসামের পার্বত্য জংগলে। মওলানা পেশাগতভাবে মুরীদ করতেন না এবং পীর সাহেবগণ মুরীদদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যে যে সব ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকতেন তেমন কোন জিকিরের কোর্স দিতেন না।

যারা মওলানার কল্যাণে নায়েব, গোমস্তা, টাউট, বাটপারদের শোষণমুক্ত হয়েছে, তার প্রচেষ্টায় যাদের কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তারা স্বইচ্ছায় মওলানার মুরীদ হতেন। মুরীদ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে মওলানার কোন খলীফা ছিল না।

মওলানার মুরীদরা তাদের আহার্য, খাদ্য-দ্রব্য মওলানার জন্যে নিয়ে আসতো। মওলানা পরম আগ্রহের সংগে তা গ্রহণ করতেন এবং সকলকে নিয়ে তা খেতেন। যারা তাঁর হাতে টাকা পয়সা দিত তা তিনি সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং সম্মুখে যে উপলক্ষ আসতো তাতেই তা খরচ করতেন। মওলানা সালামী, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ কখনও সঞ্চয় করতেন না। যে যা দিত, তা কিভাবে ব্যয় হচ্ছে, একটু খেয়াল

www.pathagar.com

করলেই যে কেউ তা ধরতে পারত। বেশীর ভাগ অর্থই মুরীদদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাদের এলাকার স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, সম্মেলন-কনফারেন্স বা বিপন্ন মুরীদদের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করতেন। মওলানার বহু মুরীদ যা ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের মাধ্যমে ব্যয় করতে চাইতেন, তার অনেকটাই তাঁর হাতে দিতেন এবং মওলানার মাধ্যমে তা আমালুস সালেহ্ বা কল্যাণ-মূলক কাজে ব্যবহার হতো।

কৃষক-প্রজা সম্মেলনের ব্যয়ঃ মওলানা ভাসানী যে লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মেলন সমাবেশ করতেন, কয়েকদিন ব্যাপী তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এ ব্যয়ভার কিভাবে এবং কে বহন করত? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে। কেউ কেউ বলতেন, শিল্পপতিরা তাঁর সমাজতন্ত্রী কর্মীবাহিনীর ভয়ে যা চাইতেন তাই দিয়ে দিতেন। কেউ কেউ বলতেন, সমাজতন্ত্রী বা সাম্রাজ্যবাদীরা এ টাকার যোগান দিত। তাঁর অনেক অশিক্ষিত দরিদ্র ভক্ত বিশ্বাস করত যে, ফেরেস্তারা নাকি টাকার ব্যবস্থা করে দিত। আসলে যারা সম্মেলনে আসতো তারাই এ ব্যয়ভার বহন করত। কেন তারা মওলানার সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করত, কিন্তু অন্য পার্টি বা নেতা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করত না? এর একটি অতি সংগত কারণ আছে।

মওলানার সম্মেলন এবং রাজনীতি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে ছিল না। রাজনীতি বা সম্মেলন করে তিনি সরকারী ক্ষমতা দখল করতে চান, এটা কেউ বিশ্বাস করত না। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি বা সম্মেলন করে নিজের কোন আর্থিক সুবিধা লাভ হোক এরূপ উদ্দেশ্যও মওলানার ছিল না।

অনেকে দেশে উরস; ইসালে সওয়াব, মহফিল এবং রাজনৈতিক সম্মেলন করে থাকেন। রাজনৈতিক সম্মেলনের টাকা জোর করে ভয় দেখিয়েও আদায় করা হয়। সম্মেলন শেষে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের হাতে কিছু টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়। মওলানার সম্মেলন কিন্তু তাঁর বার্ষিক আয়ের উৎস ছিল না। সম্মেলন করে কিছু উদ্বৃত্ত রেখে এই উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে সারা বছর রাজনীতি করার ব্যয় নির্বাহ করবেন এরূপ কোন পলিসি মওলানার ছিল না।

সম্মেলনে যে লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানী হতো, তা সম্মেলনেই খরচ হয়ে যেতো। তাই সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী তাঁর মুরীদান এবং অন্যরা

www.pathagar.com

নিজেদের তিনদিন থাকা-খাওয়ার টাকা দানের উপরও কিছু টাকা দিতেন, যা দিয়ে, যারা দিতেন না, তাদের ব্যয়ও হয়ে যেতো। তাঁর মুরীদান বা অনুদানকারীরা জানত যে, তাদের টাকা দিয়ে মওলানার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হতো না বা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পেতো না। তাই যারা বিশ্বাস করতো যে, মওলানা তাদের কল্যাণের জন্যই এই সব মহাসম্মেলন আহ্বান করে থাকেন। তাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে মহাসম্মেলনের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয়ে যেতো। মওলানার আর্থিক সততার উপর তাঁর ভক্ত এবং জনগণের যে গভীর আস্থা ছিল এরূপ আস্থা খুব কম জননেতার উপরই জনগণ স্থাপন করতে পারে।

প্রাণীর জন্যে দরদ ঃ মওলানা ভাসানী একজন দরদী মানুষ ছিলেন। তাঁর দরদ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শুধু মানুষের জন্যেই সংরক্ষিত ছিল না বরং মূক প্রাণীর প্রতিও প্রসারিত ছিল। তিনি গরু, ছাগল, কবুতর ইত্যাদি পালতেন। ঈদুল আয্‌হা উপলক্ষে গরুর খাবার ঈদের আগের দিনই নির্দিষ্ট করে রাখার কড়া নির্দেশ ছিল তাঁর। ঈদের দিন সকাল বেলা প্রথমেই তাঁর গরুকে গোসল করিয়ে আগের দিনের নির্দিষ্ট তাজা ঘাস ও খৈল ইত্যাদি দিতে হতো। তিনি গরুর পিঠে হাত বুলাতেন এবং নিজের গামছা দিয়ে গরুর পিঠের মাছি-মশা তাড়াতেন।

কঠোর পরিশ্রমী ঃ সমকালীন রাজনৈতিকদের মধ্যে মওলানা ভাসানী ছিলেন অত্যধিক কঠোর পরিশ্রমী এক ব্যক্তিত্ব। শৈশব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিরলস সংগ্রামী। কৈশোর, প্রৌঢ়, যৌবন, বার্ধক্য জীবনের কোন অবস্থাতেই তাঁকে ক্লান্ত মনে হয় নি। যাঁরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, কাউকে তিনি বলেন নি ঃ আমি এখন ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম নিতে চাই। তোমরা এখন যাও। বরং যাঁরা তাঁর কাছে গেছে, তাঁরাই ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁরুণ্য একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চিরযুবক এই নেতা সারা জীবনই ছিলেন এক অবিশ্রান্ত কর্মী। শুধুমাত্র বাগ্মী নয়, বিরামহীন কর্ম-সাধনার ফলেই তিনি ছিলেন তাঁর কর্মীদের প্রেরণার উৎস।

মওলানার পোশাক ঃ মওলানার অতি প্রিয় পোশাক ছিল সাধারণ লুংগী, সফেদ পাঞ্জাবী আর তালের আঁশের টুপি। লুংগী, পাঞ্জাবী আর তালের আঁশের টুপি নিয়ে তিনি দেশবিদেশের বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। রাজা, মহারাজা, বাদশাহ, সুলতান, প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, স্বৈরাচারী, গণতন্ত্রী—সব রকম নেতার সংগে সাক্ষাৎকালেই ভাসানীর পোশাক ছিল সাধারণ লুংগী এবং সফেদ পাঞ্জাবী। শীতের দেশ এবং বিশেষ সময় ব্যতীত অন্য কোন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধানের প্রয়োজন মওলানা অনুভব করেন নি।

সাধারণ মানুষের নেতা ভাসানী ঃ মওলানা ভাসানী সাধারণ মানুষের মনের কথা ও ভাষা যত গভীরভাবে অনুভব করতেন, খুব কম নেতাই ততটুকু পারতেন। মওলানা তাদের কথা বুঝতেন, তারাও তাঁর কথা বুঝতেন এবং উভয়েই একাত্ম হয়ে যেতেন। মওলানা সাধারণ মানুষের সংগে বলতেন তাদের গরু, বাছুর, চাষ, বীজের কথা, তাদের হাঁস-মুরগীর কথা, নামায-রোযার কথা। ফল-ফসল, হাঁস-মুরগীর কথা বলতে বলতেই তিনি তাদেরকে রাজনীতির অংগনে টেনে নিয়ে আসতেন, তাদেরকে বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী এবং সংগ্রামী করে তুলতেন। সাধারণ মানুষের সংগে আলোচনার সময় মওলানা কদাচিৎ গঠনতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকারের রূপ ইত্যাদি প্রসংগ তুলতেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিকার চেতনা এবং রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে মওলানা ভাসানীর অবদান অনস্বীকার্য।

এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব এবং শাসন আমাদের সমাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই শোষণ-মূলক ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে এবং সহ্য করতে তিনি জীবনে কোনদিনই পারেন নি বরং এই শোষণ-জুলুমের ফলেই কিশোর বয়স হতেই তাঁর মধ্যে আজীবন সংগ্রামী সত্তার উন্মেষ ঘটে। জীবন-প্রভাতে অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকগণের উপর জমিদারের নায়েব, গোমস্তাদের জুলুমই তাঁকে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং সংগ্রামমুখর করে তুলেছিল। মজলুমের জন্যে দরদ এবং ভালবাসাই ছিল মওলানার নেতৃত্বের ভিত্তি।

ইন্তিকাল ঃ ১৯৭৬ সনে মওলানা ভাসানী সন্তোষে এক স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনের আহ্বান করেন। ১৯৭৬ সনের ১৪ই নভেম্বর-এ ইন্তিকালের তিনদিন আগে আহূত সম্মেলনটি ছিল তাঁর জীবনের আহূত সর্বশেষ সম্মেলন। সন্তোষে অনুষ্ঠিত খোদাই খেদমতগারদের সম্মেলনে মওলানা ভাসানী জীবনের সর্বশেষ ভাষণ দেন।

www.pathagar.com

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৭ সনে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন আহ্বানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে তিনি বিশ্ব মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীকে নিয়ে মুসলিম দেশসমূহে সফরে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুর শীতল হস্ত তাঁর দেহ ১৯৭৬ সনের ১৭ই নভেম্বর চিরশীতল করে দেয়। তবে মেহনতি মানুষের এই অবিসম্বাদিত নেতার মৃত্যুতে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ হবার নয়। বাংলাদেশের মানুষ তাদের এক প্রাণপ্রিয় নেতাকে হারিয়েছেন, যিনি সারাটি জীবন শুধু তাদের কল্যাণ চিন্তাই করেছেন—নিজের জন্যে কিছু চান নি।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জানাযায় শরীক হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর প্রথম জানাযা। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সংরক্ষিত তাঁর সৌম্যদর্শন চেহারা শেষ বারের মতো দেখার জন্যে হাজার হাজার লোক লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। টাংগাইলে যখন তাঁর মৃতুদেহ হেলিকপটারযোগে নেওয়া হয়, তখন মানুষের কাফেলা তাঁকে ঘিরে থাকত। মৃত্যুর খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের নেতাকে এক নজর দেখার জন্যে মানুষের ঢল নেমেছিল। শৃংখলা রক্ষার জন্যে টাংগাইল শহর হতে কাগমারী পর্যন্ত কয়েক মাইল রাস্তার দু'পাশে সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে অনেক যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের এই বীর সিপাহশালারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ কোটি মেহনতি মানুষ শোকাভিভূত শতাব্দীর এ মহান নেতার মহাপ্রয়াণে দুঃখ করেছে, অশ্রু ফেলেছে।

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে বহু নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। সাময়িক ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির পর বহু নক্ষত্র হারিয়ে গেছে। কিন্তু মওলানা ভাসানী ছিলেন চিরজ্যোতিষ্মান। তার একটি কারণ এই যে, তিনি সময়ের গতিধারা বুঝতে পেরে সবার আগেই যুগোপযোগী ঘোষণা দিতে পারতেন।

মওলানা ভাসানী সবার চেয়ে ভালভাবে জনমতের জোয়ারভাঁটা নির্ণয় করতে পারতেন এবং সর্বদাই জনতার মিছিলের অগ্রভাগে থাকতেন। রাজনৈতিক নেতাদের জীবনে যেরূপ উত্থান-পতন হয়, জনগণ কর্তৃক একজন নেতা কখনও সমাদৃত হন এবং কখনও চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত

www.pathagar.com

হন। জনগণের প্রাণের নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪৬ সালে যেরূপ জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন মওলানা ভাসানীর তেমন কোন দুর্ভাগ্য হয় নি। তিনি সারা জীবনই জনপ্রিয় ছিলেন এবং জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার মতো কোন কাজ এবং নীতি অবলম্বন করেন নি।

মওলানা ভাসানী শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন শেরে বাংলারই ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতেন। বহু চেষ্টা সাধনায় কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু মওলানা ভাসানীর নামই একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ করতো। কোন একটি শক্তিশালী সংগঠনের শত শত ব্যক্তি সকলের মিলিত ভাবমূর্তি নিয়ে যে কাজ করতে পারতো, মওলানা ভাসানী একাই সে কাজ করতে পারতেন। এ দেশের সব বাম বা ডানপন্থী নেতা কৃষক সম্মেলন আহ্বান করলে যত প্রচার পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয়ে যে সংখ্যক কৃষক সমবেত হওয়ার কথা, মওলানা ভাসানীর একক আহ্বানে অনেক বেশী কৃষক জনতা সমবেত হতো

www.pathagar.com

আখতার-উল-আলম

মওলানা ভাসানীর নাম ঃ সংগ্রাম

ভাসানী। মওলানা ভাসানী। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনে এক ঃ একে তিন। একটি নাম ঃ একটি ইতিহাস। সে নাম এ দেশের সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত-ধন; সে ইতিহাস এ দেশের সংগ্রামী জনতার জীবনবোধের এক বাঙ্‌ময় স্বাক্ষর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে সব জীবন অমরত্ব লাভ করে থাকে, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর তেমনি একটি সফল ও সার্থক জীবন। জীবনে যা-ই হোক, ঈমানী চেতনা নিয়ে পরপারের ডাকে সাড়া দেওয়ার মৃত্যুই মুমিনের একান্ত কাম্য। সে রকম ঈমানী মৃত্যুতেই সমাজের বুকে আলোড়ন জাগে; সর্বত্র শোকের মাতম শুরু হয়; এবং সেই মর্দে-মুমিনকে বুক পেতে গ্রহণ করে স্বয়ং মৃত্যু পর্যন্ত হয় ধন্য। উল্লেখ্য যে, 'জারী-জঙ্গনামা' রচনা করতে বসে প্রাচীন এক পুঁথিকার লিখেছিলেন, 'অধীন গরীব ভণে ইমামের-গম। শোকেতে কাগজে আর না চলে কলম।' আমরা যারা মওলানা ভাসানীর যুগের মানুষ, তাদের নিকট তো বটেই; দূর ভবিষ্যতের বুকে বসেও যারা মওলানা ভাসানীর এই মহিমান্বিত জীবন ও মৃত্যুর কথা ও কাহিনী লিখতে চাইবেন, তাদের নিকটও প্রাচীন পুঁথিকারের সেই অনবদ্য পয়ারের অর্থ নতুন করে ধরা পড়বে।

ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়

বস্তুত মওলানা ভাসানীর জীবন ও মৃত্যুর সাথে কারবালার জারী মর্সিয়ার তুলনা নবতর প্রতীকী অর্থেই সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এ দেশের মরণ-ফাঁদ ফারাক্কার প্রতিই ইঙ্গিত দিয়ে এ কথাটাই বিশেষভাবে বলতে চাই। সবাই জানেন, ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার ব্যাপারে এ দেশের প্রতিবাদী চেতনা মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে শুধু সোচ্চার নয়, বলতে গেলে বজ্র গর্জনে ফেটে

www.pathagar.com

পড়েছিল। ফারাক্কা বাঁধের সাথে ঐতিহাসিক কারবালার সেই পানি-বিহনে শুকিয়ে মারার ঘটনার কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই দেশটি যেন এজিদ সেনাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইমাম-শিবির। শত্রু-সেনারা ফোরাতের কূল অবরোধ করে রেখেছে। এক আঁজলা পানি দিতেও তারা নারাজ। আর মওলানা ভাসানী ফোরাত-গঙ্গার সেই শত্রুব্যূহ ফারাক্কা ভেঙ্গে শিবিরবাসীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে জান কবুল এক জিহাদে লিপ্ত। ...

একথা সত্য যে, কারবালা প্রান্তরে সেদিন সত্যের সেনাদের বিজয় অর্জন সম্ভব হয় নাই। মওলানার জীবদ্দশাতেও যেমন, এখনো তেমনি এ দেশবাসী ফারাক্কা বাঁধ তথা শত্রুব্যূহ ভেদ করতে পারে নাই। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধতো একটা প্রতীকমাত্র। পঁচাত্তরের পূর্বেকার সেই অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মওলানা ভাসানী 'হক কথা' নামে যে সাপ্তাহিকটিকে নিজের বজ্র কণ্ঠ হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন, তার একটি সংখ্যার হেডিং ছিল, 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাদ।'—মওলানা ভাসানী জানতেন, কারবালার এ রকম অসম-যুদ্ধ যুগে যুগেই মুসলিম উম্মাহ্‌কে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চালাবেই। তাই একদা 'মুক্ত স্বদেশে মুক্ত ইসলাম'-এর জন্য তিনি এই উপমহাদেশের অগ্নিপুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আলীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, পরবর্তীকালে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের কণ্ঠে কণ্ঠ রেখেই তিনি বাংলাদেশের দশ কোটি তওহীদবাদী মানুষের জন্য নতুনভাবে এ কথাটাই আবার নতুন তাৎপর্যে উচ্চারণ করে গেছেন। এই দেশে একজন তওহীদবাদী মানুষও যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন মওলানা ভাসানীর এই চেতনার নির্বাণ ঘটবে না। শুধু কি তাই? সকল রকম সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, ইসলামের নাম নিশানা মিটানোর জন্য লাল, কালো, শ্বেত, পীত, বাদামী, গেরুয়া—যত রকম কূটচক্র ও ছড়জালের পয় তারা যতদিন চলবে, ততদিন এ দেশের প্রত্যেক মানুষ এক একজন মওলানা ভাসানী হয়েই তাঁর প্রতিবাদী চেতনাকে জাগ্রত রাখবেই। তাদের জন্য জীবনের-সাধনার জানকবুল-জিহাদের প্রেরণা জোগাবেই। প্রয়োজনে আকাশ থেকে বজ্র ছিনিয়ে আনবে, ঝড় থেকে সংগ্রহ করবে তার প্রবলতা; এবং সমুদ্র থেকে কেড়ে নিয়ে আসবে তার সমস্ত গর্জন। এবং সর্বোপরি কারবালার সেই বীর-শহীদানের আঁজলা ভরে আনা প্রাণের প্রেরণায় অক্ষুণ্ণ রাখবে এ দেশের স্বাধীনতা; সমুন্নত রাখবে তার সার্বভৌমত্বের তওহিদী ঝাণ্ডা।

www.pathagar.com

সংগ্রাম কেন, কার জন্য

একথা সত্য যে, মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সাধনা ও ফারাক্কা সংগ্রামের তাৎপর্য—তাঁর জীবদ্দশায় এক একজন একেকভাবে খুঁজেছেন। ভবিষ্যতেও এই বিতর্ক হয়ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এসব সংগ্রাম যে মওলানার নিজের জন্য ছিল না, সে কথা তাঁর অতি বড় কোন বিরোধীও স্বীকার না করে পারেন নাই। দিন যতই যাবে, ততই বরং এটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে যে, মওলানার কোন সংগ্রামই তাঁর নিজের জন্য ছিল না। পাবনা সিরাজগঞ্জের সেই বারো বছরের বালক 'চেগা মিয়া' যেদিন জন্মস্থান ত্যাগ করে টাংগাইলে গমন করেছিলেন সেদিনই তিনি অলক্ষ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন বৃহত্তর এক সাধনা ও সংগ্রামের সংগে। তারপর ছিয়ানব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবনে মওলানা ভাসানী নানাভাবে নানা প্রেক্ষিতে সেই বৃহত্তর আয়োজন ও আন্দোলনে, সাধনা ও সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। আসামে থাকাকালে কিছুকাল তিনি আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। জীবনে তিনি কোন দিন ক্ষমতা বা গদির লোভ করেন নাই। নিজেকে তিনি অতি সাধারণ মানুষ হিসাবেই ভাবতেন। থাকতেনও অতি সাধারণভাবে। তাঁর সেই তহবন, পাঞ্জাবী আর তালের আঁশের টুপি উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক নবতর মাত্রার সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। বস্তুত যাদের জন্য কেউ কোন দিন ভাবে না, যাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা কেউ বলে না, বললেও সেখানে হৃদয়ের সত্যিকার উপলব্ধি থাকে অনুপস্থিত, মওলানা ভাসানী আজীবন তাদের হয়ে তাদের কথাই ভেবেছেন। তাদের সংগে নিয়ে তাদের কথাই বলে গেছেন। এই উপমহাদেশের যে কয়জন নেতা অবহেলিত, উপেক্ষিত, সর্বহারা ও নির্যাতিত জনগণের অধিকার ও দাবীর ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন, মওলানা ভাসানী তাঁদের মধ্যেও ছিলেন সম্পূর্ণরূপে এক ব্যতিক্রমী একক। অনন্য তো বটেই; একদিকের বিচারে তিনি এ বিষয়ে বোধ করি শ্রেষ্ঠও ছিলেন।

ভাসানী বনাম ভাসানীপন্থী

মওলানা ভাসানীর চিন্তায় বামপন্থী রাজনীতির ভাবধারা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল—এ ধরনের অভিযোগ কেউ কেউ করে থাকেন। আমার মতে, এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য। কেননা মজলুম জনগণের সম্পর্কে কথা বলা, নির্যাতিত, নিপীড়িত, সর্বহারা মানুষের দাবী ও অধিকারের কথা উচ্চকণ্ঠে

www.pathagar.com

উচ্চারণ করা এবং সর্বোপরি বিশ্বের সকল রকম আগ্রাসন ও শোষণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখাটাকে আধুনিক যুগ বামপন্থী ভাবধারা হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছে। সে অর্থে মওলানা ভাসানী নিঃসন্দেহে 'বামপন্থী' ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সেই অর্থেই—কথাটার ব্যাখ্যায় পরে আসছি। উপস্থিত ক্ষেত্রে একটা কথা বলে নিতে চাই যে, মওলানা ভাসানীর এই বামপন্থী ভাবাদর্শের সুযোগ নিয়ে একদল লোক নিজেদের 'ভাসানীপন্থী' বলে চিহ্নিত করে নিতে ছাড়েন না। এবং এদেশে অতীতে যেমন, আজো তেমনি 'ভাসানীপন্থী রাজনীতি'র ভূমিকা আগাগোড়াই উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে।

কিন্তু সঠিক অর্থে মওলানা ভাসানী নিজে কোন সময়ই 'ভাসানীপন্থী' ছিলেন না। মার্কস যেমন একবার বলেছিলেন, 'আমি কার্ল মার্কস ; কিন্তু আমি মার্কসবাদী নই।' ভাসানী সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর পরিচয়ও অনেকটা সেই রকমই। আসলে মওলানা ভাসানী নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখতেন, তাদের দাবী ও অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতেন—তা ছিল তাঁর শিক্ষা, ভাবাদর্শ, ঐতিহ্যগত ধর্মীয় চেতনা ও সাধনার অনিবার্য পরিণতি। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, 'রবুবিয়ত' দর্শনের প্রবক্তা মওলানা আজাদ সোবহানীর সাথে মওলানা ভাসানীর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। মওলানা সাহেব নিজেও বলে গেছেন, একদা এক বোটের মধ্যে জ্বলন্ত এক ছাইদান সামনে রেখে মওলানা সোবহানী তাঁকে বলেছিলেন, 'ধরে নিন এইটা পবিত্র কাবাগৃহ। এইখানে হাত রেখে শপথ নিন,—জীবনে যা-ই করুন—'রবুবিয়াত' প্রতিষ্ঠার সাধনা ও সংগ্রামের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হবেন না।' বস্তুত মওলানা ভাসানীর তাঁর সকল আন্দোলন ও সমস্ত সংগ্রামের ভূমিকা, হুকুমতে রব্বানী ও হক্কুল এবাদ প্রতিষ্ঠার ডাক এবং খোদায়ী খেদমতগার নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা—সব কিছুর পিছনেই ছিল মওলানা আজাদ সোবহানীর উপরোক্ত 'রবুবিয়াত দর্শন'-এরই সক্রিয় প্রেরণা।

রবুবিয়াত দর্শন : বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগী

রবুবিয়াত দর্শনের মর্মবাণী সম্পর্কে যাঁরা অনবহিত, তাঁদের নিকট কথাটা হয়ত—হঠাৎ করে বেখাপ্পা শোনাবে। কিন্তু ওয়াকেফহাল যাঁরা, তাঁরা স্বীকার না করে পারবেন না যে, ইসলামী আদর্শের সার কথাই হচ্ছে রবুবিয়াত দর্শনের মূল সুর। ইসলাম হলো বিপ্লবের ধর্ম। মানবতার সেবায়

www.pathagar.com

ইসলামের যে বিপ্লবী ভূমিকা তা যে কোন দেশের যে কোন কালের যে কোন ধরনের বামপন্থী বা বিপ্লবী ভাবাদর্শের চাইতে অনেক বেশী গভীর, অনেক বেশী উদার এবং অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী। 'রবুবিয়াত দর্শন'-এর মূল কথা হলো ঃ আল্লাহ্ সকলের রব বা প্রতিপালনকারী। মানুষ হলো এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় আল্লাহ্র রবুবিয়াত বা প্রতিপালনবাদ কায়েম করাটাই হচ্ছে মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠতম ইবাদত বা কর্তব্য। আল্লাহ্র এই প্রতিপালনকারী রূপের স্বরূপ হলো—কবির কথায়, 'আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান; সব ঘরে ঝরে এক সমান' (নতুন চাঁদ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম) অর্থাৎ প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামত প্রদানে যেমন দেশ-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের ভেদাভেদ রাখেন না, আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র বিধান কায়েমের ব্যাপারে স্বীয় ভূমিকা পালনে মানুষকে সেই একই আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়ায় যে নির্দেশ ইসলামে রয়েছে, তারও তাৎপর্য এটাই এবং এটাই ইসলামের বিশ্বজনীন বিপ্লবী দৃষ্টিভংগী।

দুনিয়ার মজলুম এক হও

রবুবিয়াতের এই দৃষ্টিভংগী দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হলে গাছতলা আর পাঁচতলার মধ্যে কোন ব্যবধান গড়ে উঠতে পারে না। গড়ে উঠতে পারে না মানুষে মানুষে কোন বিভেদ-বিবাদ-বিসম্বাদও। কেননা এই রবুবিয়াতের বক্তব্যের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে সেই বিপ্লবী শ্লোগানের চিরায়ত ভাবধারা—যেখানে বলা হয় ঃ 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না।' এই রবুবিয়াতেরই বাণী হচ্ছে, 'দুনিয়ার মজলুম এক হও!'—এই রবুবিয়াত দর্শনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই উচ্চকিত বক্তব্য ঃ 'ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে। তৃষ্ণাতুরের হিস্সা আছে ও পেয়ালাতে।' 'এবং তাহাদের ধন-সম্পদে হক রহিয়াছে অভাবী ও বঞ্চিত-দের' —(কুরআন)। এই একই দৃষ্টিভংগীতে জালিম বা অত্যাচারীমাত্রই সীমালংঘনকারী; আর মজলুম বা নির্যাতিতরা হলো আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত। এই রবুবিয়াত-দর্শন আরো শিক্ষা দেয় যে, শোষক ও উৎপীড়ক যে নামের যে চেহারায়ই হোক, তারা মানবতাবিরোধী তথা আল্লাহ্-বিরোধী। এক মানুষ আরেক মানুষের প্রভু হতে পারে না ঃ একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষের প্রভু

www.pathagar.com

এবং সকল মানুষ সেই আল্লাহ্‌রই বান্দা বা দাস। এই দর্শন এক গালে থাপ্পড় খেলে আরেক গাল পেতে দেওয়ার নির্দেশ দেয় না, বরং দাদ্‌ বা প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্ণ অধিকার দেয় মানুষকে। এই রবুবিয়াত দর্শন ধর্মকে 'আখের ফানা' হিসাবে দেখে না; বরং স্পষ্ট ভাষায় এই শিক্ষাই দেয় যে, দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেকের যে অংশ—হক—ন্যায্য পাওনা রয়েছে, তা যেন কোন মানুষ না ভোলে (কুরআন)। চৌদ্দশত বছর আগে ইসলামের আবির্ভাব বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে গিয়েছিল—তা ছিল বস্তুত এই রবুবিয়াত দর্শন ও দৃষ্টিভংগীরই সফল ও সার্থক প্রয়োগ-পরিণতি।

সেকাল ও একাল

আজ যে কোন কারণেই হোক, মুসলমানরা ইসলামের সেই আদি ও অকৃত্রিম বৈপ্লবিক দৃষ্টিভংগী হারিয়ে ফেলেছে। বরং যে সব রীতি ও নীতি বাতিল আদর্শের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ইসলামের জিহাদ—আজ মুসলমানদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সেই বাতিল আদর্শ, কায়েমী স্বার্থের ধ্যান-ধারণা, মানবতাবিরোধী যতসব রীতি ও নীতির গলদ ঢুকে পড়েছে। আর তার ফলেই মজলুমের সহায়তা করা, গরীব-দুঃখী, আতুর ও সর্বহারা জনগণের পক্ষ অবলম্বন করা এবং একই সংগে শোষণ ও বঞ্চনা, প্রভুত্ববাদ ও আগ্রসনের বিরোধিতা করার বিষয়টাকে তথাকথিত 'বামপন্থী'দের এক-চেটিয়া কাজ হিসাবে ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছে। না ঠিক বসেও নাই,—নিজেদের মধ্যকার হানাহানি, অনৈক্য ও মতবিরোধ নিয়েই রয়েছে সদা-ব্যস্ত। মওলানা ভাসানী তাঁর আজীবনের চিন্তায় ও কর্মে, আন্দোলনে ও সংগ্রামে, রাজনীতি সংগঠনে ইসলামের সেই আদি ও অকৃত্রিম রবুবিয়াত দর্শনের ঠিক প্রতিফলন ঘটাবার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। তাঁর কর্মের বহিরঙ্গে 'বামপন্থী' কার্যকলাপের মিল-মিছিল দেখতে পেয়ে তথাকথিত বামপন্থীরা তাঁর চারদিকে জড়ো হতো বটে; কিন্তু মওলানা ভাসানীর মূল রবুবিয়াত-দৃষ্টিভংগীর সংগে খোদ-গরজের কারণেই তারা কোন সময়ে একাত্মতা বোধ করতে পারে নাই। এ কারণেই নিজেদের তারা 'ভাসানী-পন্থী' বলে চিহ্নিত করত অথচ তাদের কেউই কখনো মওলানা ভাসানীর 'বিশ্বস্ত অনুসারী' হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নাই। বরং মওলানা ভাসানীর এই রবুবিয়াত-দৃষ্টিভংগী যখন তার সঠিক স্বরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে,

www.pathagar.com

তখনই সেই সব বামপন্থী বা ভাসানপন্থী খড়কুটার মত কোথায় ভেসে গেছে!

মওলানার মূল্যায়ন

বস্তুত মওলানা ভাসানীর মূল্যায়ন করতে হলে সবার আগে রবুবিয়াত দর্শনের মূল্যায়ন প্রয়োজন। আজকের দিনে এই রবুবিয়াত দর্শন তথা মওলানা ভাসানীর ভূমিকার মূল্যায়নের প্রয়োজন একদিক দিয়ে আরো অনেক বেশী। ইসলামকে আজ পীরবাদ, হুজরাবাদ, মাজারবাদ যেভাবে ঘিরে ধরেছে, তেমনি নানা বিষয়ে পিছনমুখী প্রবণতা, স্বৈরতার সহযোগিতা, বুর্জোয়াভাবধারা, আমিরবাদী ও পুঁজিবাদী মনোভাব ইসলামের আলখেল্লা পরে দিব্যি সমাজের বুকে জাঁকিয়ে বসেছে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টরা যেমন মওলানা ভাসানীকে 'প্রোফেট অব ভায়োলেন্স' হিসাবে বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় ভীতিকর বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে, তেমনি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নিপীড়িত জনগণের স্বঘোষিত সোল এজেন্ট-রাও মওলানাকে 'বামপন্থী', 'কম্যুনিস্ট' প্রভৃতি মিথ্যা শিরোপায় তাঁর আসল স্বরূপ ঢেকে রাখার প্রয়াস পেয়েছে। আর এহেন দ্বিবিধ বিভ্রান্তির বেড়াজালে পড়ে এবং ইসলামের মূল বিপ্লবী ভাবাদর্শের পথ-বিচ্যুতির কারণেও— স্বজাতির অপরাপর আলিম এবং ধর্মপরায়ণ বলে কথিত অনেকেই মওলা-নাকে ভুল বুঝেছেন। তাঁর রাজনীতিকে ভয়ের চক্ষে দেখেছেন। তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রামকে 'ধর্মহীন' মনে করে সযত্নে দূরে সরে থেকেছেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে শুধু 'পীর' হিসাবে মান্য করে ভয়ে না হলেও ভক্তিতে তাঁকে আকাশে উড়িয়ে ছেড়েছেন। এ সব কিছুই তাঁর মূল্যায়নের পথে বাধা হয়ে বিরাজ করছে। সত্যের স্বার্থেই এই বিভ্রান্তি কাটাতে হবে। বস্তুত মওলানা ভাসানীর আজীবনের সাধনা ও সংগ্রামের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে আজ ইসলামের বিপ্লবী রবুবিয়াত-দর্শনের মাপকাঠি দিয়েই। ইসলামের এই আদি ও অকৃত্রিম স্বরূপের মাপকাঠিতে যেদিন মওলানা ভাসানীর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে, সেদিন শুধু বাংলাদেশের নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের আলেম তথা ইসলামী সমাজ তাঁকে তাঁর যুগে শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ ও সংস্কারক হিসাবে গ্রহণ না করে পারবেন না।

www.pathagar.com

এ যুগের আবুজর

মওলানা ভাসানীর কথা মনে হলে আরেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কথা আমার বড় বেশী মনে হয়। তিনি হলেন হযরত আবুজর গিফফারী (রা.)। সুবিখ্যাত এই নবীসহচর চিরটাকাল সাধারণ মানুষের কথা বলে গেছেন। তাদের হক, তাদের অধিকার, তাদের দাবী ও আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। 'অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ'—ইসলামের এই বিপ্লবী প্রেরণায় বিশ্বস্ত থেকে হযরত আবুজর (রা.) আজীবন সমাজ বিপ্লব ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ডাক দিয়ে গেছেনঃ পরিচালনা করে গেছেন রাজনৈতিক সংগ্রাম। তাঁর সেই সাধনার পথে সেই বিপ্লবী সাহাবীকে কত দুঃখ, কত নির্যাতনই না বরণ করতে হয়েছে! অন্তরীণ থেকেছেন বহুবার। এবং বিপ্লবী নবী (স.)-এর এই ঘনিষ্ঠ সহচর নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু বিপ্লবী ইসলামের সংগ্রামী-সত্যের পথ থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হন নাই। দামেশ্‌কের দুর্ধর্ষ শাসক আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর জনবিরোধী ও পুঁজিবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেই হযরত আবুজর ক্ষান্ত থাকেন নাই, কুরআনের বাণীকে সত্য জেনেই নবী (স.)-এর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেনঃ আর ইসলামের সেই আদর্শই তাঁকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে কুরআনী বিপ্লবী মতবাদের সংগ্রামী প্রবক্তা হিসাবে ভূমিকা পালনে জুগিয়েছে সাবিক প্রেরণা। রবুবিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী ও রব্বানী-দর্শন এভাবেই যুগে যুগে বহু সংগ্রামী সাধক ও বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছেঃ মওলানা ভাসানী ছিলেন তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসাধক।

সেই বিপ্লবী সংগ্রামী চেতনা

মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরাই জানেন, সাধারণ মানুষের প্রতি কি অপরিসীম দরদ ও মমতায় তাঁর বক্তব্য কিভাবে বেদনায় আপ্লুত হতো; আবার কখনো কিভাবে প্রতিবাদী চেতনার বিক্ষুব্ধ রোষ বহ্নিজ্বালা নিয়ে ফেটে পড়ত! ঢাকার 'আবুজর গিফারী কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছেন, তাঁদের নগণ্য এক সহযোগী হিসাবে কিছুটা কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই সুবাদে আবুজর গিফারী কলেজের এক আলোচনা সভায় মওলানা ভাসানীকে গভীরভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। আমার নিকট স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল—হযরত আবুজর (রা.)-এর সেই বিপ্লবী সংগ্রামী-চেতনা চৌদ্দ শত বছর পরেও

www.pathagar.com

এ দেশের একজন আলেমকে কি গভীরভাবেই না সত্যের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল! বস্তুত মওলানা ভাসানী সম্পর্কে যিনি যা-ই বলুন, তাঁর সেই বিপ্লবী দৃষ্টিভংগীর চেতনা, আদর্শের স্বচ্ছতা, ইসলামী মানবতাবাদ ও রবুবিয়াত দর্শনের গভীরতা সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। এ কথাও আমি আজ জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আধুনিক যুগে ইসলামকে তার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য ও গণমুখী ভূমিকা নিয়ে টিকে থাকতে হলে—তাকে তার আদি ও অকৃত্রিম স্বরূপ নিয়েই টিকে থাকতে হবে। আর তা হলেই পবিত্র কুরআনের বাণীর আলোকে নবী করিম (স.)-এর মহান জীবনাদর্শের ধারায় হযরত আবুজর গিফারী (রা.)-এর রব্বানী অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর কেবলমাত্র তখনই অবকাশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী, গণমুখী ও বিপ্লবী ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়নের।

উপসংহার

দেশীয় প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানীর রাজনীতি সম্পর্কে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে;—থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা রজনীতির জন্য তিনি কখনো রাজনীতি করেন নাই। তাঁর রাজনীতি ছিল তাঁর রব্বানী দর্শন প্রতিষ্ঠার একটা উপায় বা মাধ্যমমাত্র। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মাধ্যমটিকে তিনি যখন যেভাবে পেরেছেন ব্যবহার করে গেছেন। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেই পাকিস্তানী আমলে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের বুলন্দ আওয়াজ একমাত্র মওলানা ভাসানীর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল সর্ব প্রথম। শেষ বয়সে মওলানা ভাসানী রাজনীতি থেকে দূরে সরে না গিয়েও একান্ত নিজস্ব রবুবিয়াত দর্শনের আলোকে মর্দে-মু'মিন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে সর্বোতভাবে নিয়োগ করে-ছিলেন। সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সেই সাধনার ধন। আগেই বলেছি ভাসানীপন্থী হওয়াটাই মওলানা ভাসানীর রবুবিয়াত-দর্শনের সহমর্মিতার একমাত্র পরিচয় নয়। সুতরাং নিছক ভাসানীপন্থীদের হাতে মওলানা ভাসানীর বিপ্লবী জীবনাদর্শ ও গণমুখী সংগ্রামী চেতনার ধারা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে ভুল ছাড়া আর কিছুই হবে না। বস্তুত রবুবিয়াত-দর্শনের অন্তরংগ আলোকেই আজ নতুনভাবে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম ও সাধনার মূল্যায়ন করতে হবে; এবং সেই মোতাবেক তাঁর আরদ্ধ কর্ম ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পূর্ণতা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও সম্মান প্রদর্শনের এটাই হলো সর্বোত্তম পন্থা।

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবদুল গফুর

মওলানা ভাসানী এক মহান বিপ্লবী নেতা

অনন্য মুক্তি-সংগ্রামী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন বাংলা তথা উপমহাদেশীয় রাজনীতির এক অনন্য রহস্য-পুরুষ। রাজনীতির গতানুগতিক মাপকাঠিতে তাঁকে বিচার করতে গেলে তাঁর স্বরূপ পরিমাপ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর নামের সাথে একটা 'মওলানা' লকব ছিল, কিন্তু তবুও মৌলবী-মওলানা বলতে সাধারণত যাঁদের বোঝানো হয়ে থাকে, তিনি তাঁদের একজন ছিলেন না। তিনি 'মজলুম জননেতা' হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। অথচ আমাদের দেশে মজলুম বা নিপীড়িত মানবতার 'রাজনীতি' যাঁরা করেন, তাঁদের অধিকাংশের সংগেই তাঁর চিন্তার ও কর্মধারার মিল ছিল না। অনেকের চোখেই তাঁর প্রধান পরিচিতি ছিল বামপন্থী রাজনীতিক হিসাবে। কিন্তু বামপন্থীদের সংগে তাঁর চিন্তাধারার ছিল দুস্তর ব্যবধান। তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সুদীর্ঘকাল অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাজনীতিকের ন্যায় তিনি কখনও গতানুগতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি মূলত রাজনীতিবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, অথচ তিনি রাজনীতির বাইরে শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রেও অমূল্য অবদান রেখে যান। রাজনীতিক ছাড়াও তাঁর আরেক পরিচয় ছিল 'পীর' হিসেবে। এই সুবাদে বাংলা ও আসামে তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদও ছিল। কিন্তু তাঁর এই পীরত্বও ছিল অভিনব ধরনের, যার সংগে সমাজে প্রচলিত সাধারণ পীর প্রথার কোন মিল ছিল না।

তবে তিনি কি ছিলেন? মওলানা ভাসানী কি ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেয়া আদপেই সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন এক মহাসমুদ্রের ন্যায়, মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের অসংখ্য স্রোতধারা যেখানে এসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর একবার এক পত্রিকায়

www.pathagar.com

মরহুম মওলানার উপর একটি ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে দেখানো হয়েছিল—সন্তোষে মওলানা ভাসানী একটি মুদী দোকান খুলেছেন, আর সে দোকান থেকে মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানী দালাল, আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পুঁজিপতি-সর্বহারা, ন্যাপ-হকুমতে রব্বানিয়া, কম্যুনিস্ট পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ—নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সব ধরনের রাজনীতিকদের নিকট তিনি সওদা বিক্রয় করছেন। মওলানা সাহেবের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর রাজনীতিকরা কীভাবে ভীড় জমাতো, তা দেখানোর জন্যই এ ব্যঙ্গ চিত্রের অবতারণা করা হয়েছিল। ব্যঙ্গ চিত্রটির উদ্দেশ্য খুব মহৎ না থাকলেও এর মধ্যে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভংগীর একটা ব্যাপক সার্বজনীনতা কার্টুনিস্ট তাঁর নিজের অজান্তেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন এক বিশাল মহীরুহের মত, যার ছায়াতলে অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারত আপাতসংঘাতরত সব মত ও পথের মানুষ।

তবে কি মওলানা ভাসানীর মত ও পথের কোন স্থিরতা ছিল না? মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় ও বামপন্থী, ইসলামী ও সমাজতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিক, আপাতদৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক, জিহাদী ও অধ্যাত্মবাদী, গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক—নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকায় অনেকে এমনটি ভেবে থাকেন। তিনি জীবনে অসংখ্য সংগঠন গড়েছেন ভেঙেছেন, একাধিক দলের সংগে সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন ও সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন (বাংলাদেশে এ ব্যাপারে তাঁর তুলনা খানিকটা চলত একমাত্র শেরে বাংলার সংগে)। এসব কারণেও অনেকে মওলানা ভাসানীর চিন্তা ও কর্মধারার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা খুঁজে পেতেন। তাঁর মধ্যে এই যে পরস্পরবিরোধিতা আবিষ্কার, প্রকৃতপক্ষে এর মূলে ছিল তাঁর বিশালতা পরিমাপে সমালোচকদের অক্ষমতা, তাঁর নিজের পরস্পরবিরোধিতা নয়।

আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন স্থান-কালের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানবতার মুক্তিকামী এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, যাঁর কল্যাণদৃষ্টি থেকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কেউই বঞ্চিত থাকত না। তিনি মূলতই ছিলেন মানবতার এক মহান মুক্তি সৈনিক এবং তাঁর কর্মজীবনের সমস্ত আপাতবৈপরীত্য ও বাহ্যিক পরস্পরবিরোধিতার আড়ালে তাঁর এ মূল পরিচয়টা খুঁজে পেতে যে কোন নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানীর বেগ পাবার কথা নয়। তবুও

www.pathagar.com

যে আমরা অনেকে ভাসানীকে ভুল বুঝি, তার কারণ আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ও অগভীরতা। বলতে গেলে আমরা অনেকেই সাত অন্ধের হাতী দেখার মত ভাসানীর খণ্ড-পরিচয়কেই পূর্ণ পরিচয় ধরে নিয়ে আমাদের নিজেদের ব্যর্থতার কারণে ভাসানীর 'পরস্পরবিরোধী রূপ' নিয়ে এক অর্থহীন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি।

মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ জীবনের দিকে তাকালে এ সত্য উপলব্ধি করতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে, তিনি আজীবন মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের সাধনা করেছেন। এই মুক্তিপথের সন্ধানেই একদা কিশোর ভাসানী, সেদিনের 'চেগা মিয়া', পিতৃগৃহের বন্ধন ছিন্ন করে অজানার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তরুণ বয়সে জলন্ধরীর পীর সৈয়দ নাসিরুদ্দিন বোগদাদীর শিষ্যত্ব গ্রহণ, পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় ও ধর্মকেন্দ্রে ইসলামী ইল্‌ম অর্জনের সাধনার পিছনেও তাঁর একই মুক্তি কামনা ক্রিয়াশীল ছিল। পরবর্তীকালে খিলাফত আন্দোলন, কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনে ভাসানীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ছিল এদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সময়োপযোগী ভূমিকা পালনের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর।

সাতচল্লিশের পূর্বে ভাসানীর কর্মজীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত হয় আসামে। আসামে বাংলাদেশ থেকে বহু বছর ধরে যেসব কৃষক গিয়ে জংগল কেটে আবাদ করে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কূটকৌশলে একদিন তাদের উপরই নেমে এলো জুলুম-নির্যাতনের স্টীমরোলার। কুখ্যাত লাইন প্রথার মাধ্যমে এসব কৃষকদেরকে তাদের গায়ের রক্ত পানি করা আবাদী জমি থেকে উৎখাত করার অভিযান শুরু হলে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষ হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন মওলানা ভাসানী। এ সময়ে তিনি একই সাথে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও কৃষক আন্দোলনের বীজ বপন করেন। ঠিক একই সময়ে সমগ্র উপমহাদেশে শুরু হয়েছিল মুসলমানদের 'বাঁচ ও বাঁচতে দাও' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলন। মানবতার মুক্তি কামনার স্বাভাবিক প্রেরণায়ই ভাসানী সেদিন যোগ দিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে।

বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ফলে অবশেষে উনিশ শো সাতচল্লিশে কায়েম হলো পাকিস্তান। পাকিস্তান কায়েমের পূর্ব মুহূর্তেও ভাসানী মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা ভাষাভাষী সিলেটকে পূর্ব বাংলার অন্তর্গত করার লক্ষ্যে

www.pathagar.com

সিলেট রেফারেণ্ডামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান কায়েমের পর তিনি পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় এলেন, কিন্তু পাকিস্তানের যে চেহারা তিনি দেখলেন, তাতে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। শুরু হলো ভাসানী জীবনের নতুন সংগ্রামী অধ্যায়।

সাতচল্লিশের পর থেকেই এদেশের মানুষদের মাতৃভাষার সংগ্রাম, বৈষম্য-বিরোধী সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং একই সংগে কৃষক শ্রমিক ও অন্যান্য নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন মওলানা ভাসানী। তার ফলে তাঁর জীবনে শাসকচক্রের পক্ষ থেকে নেমে আসতে লাগল জেল-জুলুমের পালা, এমন কি কখনও কখনও জীবন নাশের হুমকি। কিন্তু মুক্তিকামী জনতার সংগ্রামী মহানায়ক ভাসানীকে এভাবে স্তব্ধ করা সম্ভব হলো না।

সাতচল্লিশ পর্যন্ত যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য মওলানা ভাসানী আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, তাকে গুটিকতক শোষকের ভোগের শারাবখানায় পরিণত হতে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে তিনি সৃষ্টি করলেন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী মুসলিম লীগ, যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় আওয়ামী লীগে। বঞ্চিত মানুষের দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যেই ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট মোর্চা গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা নেতৃত্বের প্রভাব বেড়ে গেলে তিনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে বামপন্থীদের সহযোগিতায় গঠন করলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। তিনি আগাগোড়া বিরোধী দলীয় রাজনীতি করলেও ১৯৬৫ সালে যখন ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শক্তির আগ্রাসী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল সেদিন তিনি জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সরকারী প্রচেষ্টার সংগে সহযোগিতা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এমনিভাবে একদিকে নিপীড়িত জনতার মুক্তি আন্দোলন, অন্যদিকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা, অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর শোষক পুঁজিপতি ও রাজনীতিকের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের বাঁচার আন্দোলনে একইভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে মওলানা ভাসানী রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অনন্য ধারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

www.pathagar.com

শুধু জাতীয় রাজনীতিতেই নয়, বিশ্ব রাজনীতিতেও ভাসানী নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভাসানী চিরকালই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসাবে প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে উপমহাদেশের বিশেষ আধিপত্যবাদী শক্তির সংগে সোভিয়েত রাশিয়ার গাঁটছড়া বাঁধা এবং অন্যান্য বহুতর ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা যখন প্রকট হয়ে ওঠে, তখন ভাসানী তার বিরোধিতা করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। এমন কি এই একই প্রশ্নে তাঁর নিজের সৃষ্ট ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দ্বিধাবিভক্তিকে তিনি স্বীকার করে নিতেও দ্বিধা করেন নি।

পাকিস্তানের অন্যতম স্থপতি হওয়া সত্ত্বেও যখন এক শ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব দেখতে পান, তখন সেই ১৯৫৬ সালেই তিনি এই অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ঘোষণা করেছিলেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে একদিন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আস-সালামো আলায়কুম' জানাতে বাধ্য হবে। মওলানার আশংকা পরবর্তীকালে যখন বাস্তবে প্রমাণিত হয় তখন ১৯৭০ সালে মওলানা ভাসানীই প্রথম 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা অনেকেই তখনও স্বাধীনতার আওয়াজ তোলেন নি বা তুলবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি। এভাবেই দেখা যায়, একদা যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর বিরাট অবদান ছিল, যে পাকিস্তানের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ষাটের দশকেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল, জনগণের মুক্তির বৃহত্তর প্রয়োজনে একদিন তিনি সেই পাকিস্তান থেকেই পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার আহ্বান জানালেন।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চে টিক্কা খানের বর্বর ধ্বংসাভিযানের পর তাঁর সম্পর্কে ভারতের কর্তৃপক্ষের মনোভাব জেনেও তিনি দেশত্যাগ করে ভারতে যান এবং যথারীতি আটক হন। নিজের জীবনের উপর এই হুমকি নিয়েও সেদিন তিনি মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে নিজের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করতে বিস্মৃত হন নি। বলা বাহুল্য এ সবই ছিল জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর কুণ্ঠাহীন বিশ্বস্ততার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি।

একাত্তরের শেষ ভাগে বাংলাদেশ-এর উদ্ভব হলে এই নবজাত রাষ্ট্রের শৈশবেই এর গলায় আধিপত্যবাদী শক্তির শৃংখল পরিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে কাগুজে স্বাধীনতায় পর্যবসিত করবার ষড়যন্ত্র শুরু হলো, তখন স্বাধীনতার আজীবন সাধক এই মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা সংগ্রামের নবতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই নবতিপর জননেতা একাত্তর পরবর্তীকালে এমন কি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, অসুস্থ দেহেও যে সংগ্রাম চালিয়ে যান তা এক কথায় নজীরবিহীন।

মওলানা ভাসানীর কর্মবহুল সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর অনেক ভূমিকাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতো, কিন্তু সব কিছু একটু তলিয়ে বিচার করলেই বোঝা যায়, ভাসানীর নিজস্ব দৃষ্টিভংগীতে পরস্পরবিরোধিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। অনেকেই ভাসানী সম্পর্কে অভিযোগ করেন, একই সাথে তিনি ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন কি করে? জীবন কালে অনেকে তাঁকে ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট বলেও সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি যে কম্যুনিস্ট ছিলেন না, তা সবচাইতে ভাল জানত স্বয়ং কম্যুনিস্টরা। কম্যুনিজমে বিশ্বাসী না হলেও তিনি কায়েমী স্বার্থবিরোধী সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের সংগে সহযোগিতা সমর্থন করতেন। তিনি বলতেন, ইসলামের কলেমার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা'—যার মধ্যে সব রকমের নকল খোদা বা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছে। সংগ্রামের ধ্বংসাত্মক এই পর্যায়ে তিনি কম্যুনিস্টদের সহযোগিতা নিতে রাজী থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি কলেমার বাকী অংশ তথা 'ইল্লাল্লাহ' বাস্তবায়নে বিপ্লবী ইসলামপন্থীদের সংঘবদ্ধ করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন, রসূল করীম (স.) প্রবর্তিত ও প্রথম যুগের খলীফাদের অনুসৃত ইসলামের অর্থনীতি কম্যুনিজমের অর্থনীতির চাইতেও ঢের বেশী বিপ্লবাত্মক, সুতরাং কম্যুনিজমের সংস্পর্শে প্রকৃত ইসলামপন্থীদের ভয় করবার কিছু নেই।

তিনি অনেক সময় সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, কারণ ইসলামের প্রকৃত রূপের প্রচার বহুদিন অবহেলিত হওয়ায় আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা সমাজতন্ত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করতে অধিক অভ্যস্ত

www.pathagar.com

বিধায় তাদেরকে সমাজতন্ত্রের নামে মুক্তি সংগ্রামে ডাকা অধিক কার্যকরী হবে বলে তিনি লক্ষ্য করতেন, তবে সংগে সংগে তিনি একথা বলতেন, সৎ মানুষ সৃষ্টি ছাড়া 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, আর আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস ছাড়া সৎ ও দায়িত্বশীল মানুষ তৈরীও সম্ভব নয়। তিনি দাবী করতেন, সমাজতন্ত্র মানুষের চিন্তাপ্রসূত মতবাদ বলে এর ব্যাখ্যা দেবার অধিকার সব মানুষেরই আছে—মার্কসের দেয়া ব্যাখ্যাই যে সকলকে মেনে নিতে হবে, তার মানে নেই।

মওলানা ভাসানীকে একই সাথে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক ভাবা হতো। এর মধ্যেও একইরূপ বিভ্রান্তি বর্তমান। তিনি খাঁটি ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রকৃত ইসলাম বিশ্বজনীনতা শিক্ষা দেয় বলে তিনি আদপেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলে মুসলিম সমাজের ন্যায্য অধিকার অন্যের কাছে বিকিয়ে দেয়া বা অন্যদের মতলবপ্রসূত বাহ্‌বার লোভে মুসলমানদের উপর জুলুম ও অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে যাবার মত হীনমন্যতাগ্রস্ত তিনি ছিলেন না। একইভাবে তিনি আন্তর্জাতিক শান্তির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশের সংগে সহযোগিতার পক্ষপাতী থেকেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতের আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করতে কখনও রাজী ছিলেন না। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর লোক তাঁর বিরুদ্ধে কখনও সাম্প্রদায়িকতা, কখনও ভারত-বিদ্বেষের অপবাদ দিত, কিন্তু সকলেই জানেন, ভাসানী সাম্প্রদায়িক তো ছিলেনই না, এমন কি ভারতবিদ্বেষীও ছিলেন না, তবে মওলানা ভাসানী অবশ্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নিরাপোষ ছিলেন এবং এ ব্যাপারে ভাসানীর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতার অন্তরেরই প্রতিধ্বনি।

মওলানা ভাসানী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যেমন করতেন, তেমনি প্রয়োজনে আন্দোলনের অন্য ধারাকেও তিনি 'হারাম' মনে করতেন না। মওলানা ভাসানী শোষণসর্বস্ব এ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া জনগণের মুক্তি অসম্ভব মনে করতেন বলে বাস্তব ক্ষেত্রে শোষণের এ অচলায়তন ভাঙতে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের নীতিতেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত অপ্রয়োজনীয় হলে রসূলে করিম (স.)-এর মত মহত্তম ব্যক্তিকে এত সব রক্তক্ষয়ী জিহাদে অংশ নিতে হতো না।

www.pathagar.com

রক্তাক্ত বিপ্লব বা জেহাদের নীতিতে বিশ্বাসী থেকেও মওলানা ভাসানী মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমেই মানুষ রব্বুল আলামীনের উদ্দীষ্ট আদর্শ চরিত্র অর্জনে সক্ষম হয়। মওলানা ভাসানী আধ্যাত্মিক সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদ-ভক্তের পীর। কিন্তু তাঁর মুরীদদের তিনি অন্য অনেকের মত ঘুম-পাড়ানিয়া মন্ত্র শিক্ষা দিতেন না। দিতেন আধ্যাত্মিকতার সংগে সংগে জেহাদী জিন্দেগী অবলম্বনের শিক্ষা। এখানেও মওলানা ভাসানীর প্রধান পরিচয় একজন মুক্তিসাধকরূপে, 'ব্যবসায়ী পীর' হিসাবে নয়।

মওলানা ভাসানী একদিকে যেমন আপোষহীন সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন (যে কারণে তাঁকে 'হিংসার অবতার' বা 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' বলা হয়েছে), তেমনি আবার তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী। জীবনে কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না যেয়ে বাংলা ও আসামে কোন রাজনীতি-কই বোধ হয় তাঁর মত এত স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা, ডিস্পেনসারী, হাসপাতাল, এতিমখানা, মসজিদ, কারিগরি বিদ্যালয়, এমন কি একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মত গঠনমূলক সমাজসেবার দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারেন নি। আদর্শ সমাজ কবে কায়েম হবে তার জন্য বসে না থেকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে আশু কিছু অবদান রাখাই যে ছিল তাঁর এসব গঠনমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্য, তা কাউকে বুঝিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বহুতর রাজনীতিক ও বিপ্লবীর তুলনায় স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

মওলানা ভাসানী আজীবন নানা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব তাঁর সংস্পর্শে আসেন, আবার তাঁর সংগে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেন। সম্পর্ক ছেদের পর তাঁদের অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যও রেখেছেন পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু এসব ব্যাপার কখনও তাঁদের সম্পর্কে তাঁর মনকে বিদ্বিষ্ট করত না, বরং কোনক্রমে পুনরায় এঁদের কারও কারও সংগে দেখা হলে তিনি এসব প্রসংগে একটুও না গিয়ে সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে তাঁদের সৎ পরামর্শ দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

মওলানা ভাসানীর সমগ্র জীবনে সংগ্রামশীলতা ও বিশ্বজনীনতা একই-রূপে ক্রিয়াশীল ছিল। ক্ষুদ্রতা যেমন তাঁকে কখনও স্পর্শ করত না, নীতির

www.pathagar.com

প্রশ্নেও তিনি তেমনি কখনও আপোষ করতেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কথা সকলেই জানেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর কাগমারীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের যখন অর্থনৈতিক অবস্থা খুব করুণ তখন 'পশ্চিমা' মওলানা মোহাম্মদ আলীর নাম বদলে একে 'ভাসানী কলেজ' করার শর্তে এর সরকারীকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তদানীন্তন উচ্চ পর্যায়ের এক রাষ্ট্রনেতা। ক্রোধভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মওলানা জবাব দিয়ে বলে-ছিলেন, 'পশ্চিমের প্রতি এত অন্ধ বিদ্বেষ থাকলে পাকিস্তানের চেয়ে আরও পশ্চিমের নবীকে বদলিয়ে একজন বাঙালী নবী বানিয়ে নিলেই পার তোমরা।' মুসলমানদের ইতিহাসে মওলানা মোহাম্মদ আলীর অমূল্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মওলানা ভাসানীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত সেই নামেই উক্ত কলেজ সরকারীকরণ করা হয়।

মওলানা ভাসানী ছিলেন আজীবন অনন্য মুক্তি সংগ্রামী। যে কোন সার্থক মুক্তি সংগ্রামীর জন্য যে দু'টি গুণ একেবারে অপরিহার্য তা হলো তাঁর জন-সংলগ্নতা এবং কাল-সংলগ্নতা। এর জন্য বাড়তি আরেকটি গুণ যেটা অপরিহার্য, তা হলো ইতিহাস-চেতনা। অনেকেই জানেন মওলানা ভাসানী ইতিহাস সম্বন্ধে অদ্ভুত সচেতন ছিলেন। তিনি আজীবন মাটির মানুষের অতি কাছাকাছি থেকেছেন, একথাও আমরা সবাই জানি। কিন্তু তিনি যে কতটা অসাধারণ কাল-সংলগ্ন নেতৃপুরুষ ছিলেন, তা আমরা হয়ত অনেকেই ভেবে দেখি নি। আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসেই এমন কৃতী রাজনীতি-বিদের কথা আমরা জানি, যারা হয় অল্প দিনের জীবদ্দশায় জনপ্রিয় শহীদের মৃত্যুবরণ করেন অথবা জীবনের একটি পর্যায়ে রাজনৈতিক খ্যাতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেও মৃত্যুর পূর্বে জাতির কাছে কখনও চরম ধিকৃত, বা অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছেন, কখনও বা বড়জোর ক্রমহ্রাসমান ভক্ত-মণ্ডলীর প্রিয় স্মৃতিতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ ছিয়ানব্বই বছর বেঁচে যাবার পরও মৃত্যুর সময় জাতির নিকট ভাসানীর রেলেভেন্স (Relevance) এবং অপরিহার্য সময়োপযোগিতা এতটুকু নষ্ট হয় নি। সেদিনও মনে হয়েছে, যেমন আজও গোটা জাতি মনে করে, ভাসানীর মত ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে এবং ভাসানী বিহনে বাংলাদেশ অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মুসলিম শিক্ষা ও মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে একদা বর্তমান শতকের প্রথম দশকে নবাব সলিমুল্লাহ্ মুসলিম বাংলার

www.pathagar.com

অবিসংবাদিত নেতা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনীতি ছিল মূলত বৃটিশ সরকারের সংগে সহযোগিতার মাধ্যমে জাতির লক্ষ্য অর্জনের রাজনীতি। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী বৃটিশ-বিরোধী রাজনীতির তাকিদ যেদিন অনুভূত হলো তিনি রাজনীতিতে নবধারার সূচনা করতে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে শেরে বাংলা ফজলুল হক যুগের এই অভাব পূরণ করে আড়াই দশক ধরে মুসলিম-বাংলার রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু পাকি-স্তান সংগ্রামের মধ্যপথে সেই যে তিনি রাজনীতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্যুত হলেন, ১৯৫৩-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি থাকলেন জীবন্মৃত। যুক্তফ্রন্টকে কেন্দ্র করে বাতি নিভে যাবার আগে জ্বলে উঠে ১৯৫৬ সালেই আবার তিনি নিভে গেলেন চিরতরে। এরপর দৈহিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জাতির কাছে শুধুমাত্র একটি প্রিয় স্মৃতিতে পরিণত হয়ে থাকলেন। আকরম খাঁ ও নাজিমুদ্দিন সম্পর্কেও কম বেশী একই কথা খাটে। হোসেন শহীদ সোহরা-ওয়ার্দী বাংলার রাজনীতির অন্যতম কৃতী পুরুষ। ১৯৩৭ সালে বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রীয় মঞ্চে তিনি আবির্ভূত হন শেরে বাংলার পর দুই নম্বর আসনে এবং শেরে বাংলার লীগ ত্যাগের পর বাংলাদেশের পাকিস্তান সংগ্রামে আবুল হাশিম ও অন্যদের সহযোগিতায় তিনি থাকলেন মূল চালিকাশক্তি। সাতচল্লিশের পর তিনি কিছুদিন এদেশের তদানীন্তন রাজনীতির অঙ্গনে অনুপস্থিত থাকলেও এদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে পরবর্তীকালে তিনি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর প্রয়োজন তাঁর মৃত্যুকালেও তীব্রভাবে অনুভূত হতো। তবুও চিরকাল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অভ্যস্ত সোহরা-ওয়ার্দী স্বয়ং মৃত্যুর পূর্বে মরহুম মানিক মিয়ার কাছে লিখিত এক পত্রে স্বীকার করেছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর বেঁচে থাকার আর অর্থ হয় না। আইউব খানের সামরিক আইন জারীর পর নতুন পরিস্থিতি মুকাবিলায় তাঁর অসামর্থ্যই তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এসব রাজনীতিকের তুলনায় মওলানা ভাসানীর দিকে তাকালে আমরা দেখি তাঁর তরুণ বয়সে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও টাং-গাইলে কৃষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ থেকে শুরু করে আসামের লাইন

www.pathagar.com

প্রথা-বিরোধী আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার সময় থেকেই মওলানা ভাসানী 'জনগণের নয়নমণি'তে পরিণত হন এবং পাকিস্তান আমলে তিনি 'মজলুম জননেতা' হিসেবে বিরোধী দলের নিরা-পোষ নেতা হিসাবে এবং জাতীয় স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে এবং সর্বশেষে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতা হিসাবে ঐতি-হাসিক ভূমিকা পালন করে যান। বাংলাদেশ আমলে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের নবতর পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্ব-ভৌমত্বের বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মজলুম মানবতা ও মুক্তিকামী মানবগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসাবে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল সব সময় সময়োপযোগী। তাঁর তুলনায় বহু অল্পবয়স্ক নেতাও যখন জনগণের চোখে উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে সময়োপযোগী প্রতিভাত হতে পারেন নি, সেখানে মওলানা ভাসানী তাঁর সমগ্র জীবনেই গণ-সংলগ্ন থেকেছন এবং গণ-সংলগ্ন থেকে জনগণের বাড়ীর খবর আঁচ করে তাদের মুক্তির লক্ষ্যে অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকাটি শেষ দিন পর্যন্ত পালন করে গেছেন। প্রধানত এ কারণেই মুক্তি সংগ্রামী হিসাবে ভাসানী অমর, ভাসানী অনন্য, ভাসানী তুলনাহীন।

অনাগত যুগের স্বাপ্নিক

এমনিতে লোকে তাঁকে একজন রাজনীতিবিদ বলে জানতো। কিন্তু আর দশজন রাজনীতিকের তুলনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। রাজনীতি করে লোকে ক্ষমতায় যাবার জন্যে, কিন্তু তিনি কোনদিন ক্ষমতায় যেতে চান নি। এমন কি ক্ষমতা যখন তাঁর মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তখনো অন্যদের ক্ষমতায় দিয়ে তিনি থেকেছেন বাইরে, জনগণকে নিয়ে।

তিনি ছিলেন একজন ধর্মনেতা ও আলেম। এমন কি একজন পীর! অথচ আর আর ধর্মনেতার সাথে তাঁর ছিল আসমান-জমীন ফারাক। আর পীর হয়ে ভক্তদের টাকায় আরাম-আয়েশে থাকবেন না—এমন দৃশ্য আমাদের দেশে তো একটা দুর্লভ ব্যাপার। অথচ তিনি লাখ লাখ ভক্ত-মুরীদের 'পীর', 'হুজুর' হয়েও থাকতেন কুঁড়ে ঘরে—একেবারে সাধারণ মানুষের মত। পোশাক-আশাকেও অন্যান্য পীর বা হুজুরদের থেকে তিনি কতো না পৃথক ছিলেন!

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী অথচ আর আর বিপ্লবী ও বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর মত ও পথের ছিল দুস্তর ব্যবধান। বিপ্লবীদের দেখা যায় শুধু ভাঙ্গার গান গাইতে। তিনিও ভাঙ্গার গান গেয়েছেন প্রচুর, যার ফলে 'ধ্বংসের নকীব' (প্রফেট অব ভায়োলেন্স) উপাধি লাভ এদেশে একমাত্র তাঁর কপালেই জুটেছে। তবুও গড়ার বেলাতেই বা তাঁর দান তুচ্ছ কোথায়? কোন বিপ্লবী বা বামপন্থীর সঙ্গে তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। সমাজসেবা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে তুলনীয় এদেশের একমাত্র ব্যক্তিত্ব তো শেরে বাংলা যিনি আজীবন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে থেকে অসংখ্যবার মন্ত্রীত্বের আসনে হয়েছেন সমাসীন।

মওলানা তাসানী তাহলে কি ছিলেন? কি পরিচয়ে তাঁকে আমরা ডাকব? এ এক জটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, তিনি রাজনীতিবিদ, আলেম, পীর, বিপ্লবী, বামপন্থী সব কিছু থেকেও আসলে ছিলেন সব কিছুর উর্ধ্বে। যুগের কোন প্রচলিত মানদণ্ডেই তাঁকে পরিমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ সব পরিচয়ের উর্ধ্বেই তাঁর ছিল এক অনন্য স্বতন্ত্র। ভাসানী ছিলেন একান্তই ভাসানী।

আসলে ভাসানীকে বিচার করতে হবে তাঁর মানদণ্ডেই। সে মানদণ্ড প্রচলিত মানদণ্ড থেকে আলাদা নিশ্চয়ই। আলাদা বলেই তা আমাদের যুগের দৃষ্টিতে কিছুটা বেমানান লাগতো। যুগের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই অমিলের ব্যাপারটাকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত তাঁর পশ্চাৎমুখীনতা বলে। কিন্তু তারা নিজেরাও জানত ভাসানী রক্ষণশীল ছিলেন না। ধর্মে গভীর বিশ্বাসী হয়েও পশ্চাৎমুখীনতা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। ঐতিহ্যের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রগতিশীল। আসলে তিনি অতীতমুখী তো নয়ই, শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনাসর্বস্ব বর্তমানেও ছিলেন তিনি সমান বিক্ষুব্ধ, সমান আস্থাহীন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন অনাগত যুগের এক নয়া সমাজের শোষণহীন এক নয়া বিশ্ব সংস্থার। তাঁর সে স্বপ্ন প্রচলিত কোন আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা সম্ভব নয় বলেই সেদিন তাঁকে ভুল বোঝাটা হয়ে উঠেছিল একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন এক মহাবিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ ছিল তাঁর প্রচলিত সব কিছুর বিরুদ্ধেই। আর এ বিদ্রোহের হাতেখড়ি তাঁর

www.pathagar.com

হয়েছিল শৈশবেই। ছ'বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে এবং এগার বছরে মা ও ভাই-বোনকে হারিয়ে কৈশোরেই ভাসানী দুনিয়াটাকে কঠিনভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আরামে পড়াশোনা করা তাঁর কপালে কখনো হয়ে ওঠে নি। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ভাসানী বেরিয়ে পড়েন আসামে। নতুন জীবন শুরু হয় পীরের সান্নিধ্যে। কিন্তু পীরের মুরীদ হয়েও ভাসানী ছিলেন ভাসানীই। পীরের নির্দেশে বহু দুর্ধর্ষ কাজ সম্পাদন করেন তিনি। অথচ এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া নিয়ে ভাসানীর মতানৈক্য হয়ে গেল তাঁর পীরের সঙ্গেই।

পীর যাঁকে সম্পূর্ণ বশ করতে পারেন নি, তাঁকে বশ করবে কে? তাই বলছিলাম ভাসানী ছিলেন মহাবিদ্রোহী। আর সে যুগটাও যেন ছিল এর জন্যে অত্যন্ত উপযোগী। অন্তত ভাসানীর জীবনে যুগের প্রতিফলন ঘটেছিল এভাবেই। সতেরো বছর বয়সে সুদূর আসামে পাড়ি জমালেন তিনি। গৃহের বন্ধন তিনি আগেই কাটিয়েছিলেন। এবার কাটালেন জন্মভূমির মায়া। আসামের বন-জঙ্গল কেটে আবাদ করছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কৃষকরা। তরুণ ভাসানী, সেদিনের আবদুল হামিদ মুনশী মিশে গেলেন তাদের সঙ্গে। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা-আরবী শেখাতেন। মৌলুদ পড়াতেন তাদের পালা-পার্বণে। তাদের কাছে তাঁর পরিচয় হলো মৌলবী হিসেবে। কিন্তু ভাসানী তো ছিলেন না আর দশজন মৌলবীর মত। সরকারের কাছ থেকে যখন বাঙালীদের ওপর আঘাত এলো, তখন মৌলবী আবদুল হামিদ রুখে দাঁড়ালেন। সকলকে রুখে দাঁড়াতে ডাক দিলেন। শুরু হলো ভাসানীর আদি পরিচয়।

ভাসানী সেদিন যাদের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের পরিচয় তারা বাঙালী কৃষক। ভাসানী আসামে বাঙালী কৃষকদের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু এদের আরেক পরিচয় ছিল। তাঁরা মুসলমান। হিন্দু জমিদার হুকুম জারি করলেন, গরু জবেহ চলবে না তার জমিদারীতে। ভাসানী বললেন, 'না, জমিদারের চোখ রাঙানী চলবে না।' বাঙালীর অধিকার কৃষকের অধিকারের সাথে যুক্ত হলো মুসলমানিত্বের অধিকারের সংগ্রাম। আসলে ভাসানীর সংগ্রামী জীবনে দেশের দাবী, নির্যাতিত মানবতার দাবী আর ধর্মের এ দাবীই স্থান পেয়েছিল শেষ দিন পর্যন্ত।

এ তিন রকমের দাবীর মধ্যে যাঁরা সংঘাত দেখতেন শুধু তাঁরাই ভাসানীর মধ্যে আবিষ্কার করছেন পরস্পরবিরোধিতা, তাঁদেরই কেউ কেউ ভাসানীর

www.pathagar.com

মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও জানতেন এ অপবাদ কত মিথ্যা, কত অসত্য! ভাসানী যেখানেই জুলুম-অবিচার দেখেছেন, তার প্রতিবাদ করেছেন। মজলুম বাঙালীর, মজলুম কৃষকের ওপর জুলুমের প্রতিবাদ সঙ্গত হবে, আর মজলুম মুসলমানের ওপর জুলুমের প্রতিবাদ হবে সাম্প্রদায়িকতা। এমন হীনমন্যতায় ভুগতেন না ভাসানী। শতাব্দীর ইতিহাস তাঁর চোখের সামনে ছিল খোলা। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক সেবাদাস ভুঁইফোড় বুদ্ধিজীবীর মত বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে উট পাখী সাজবার চেষ্টাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন ভাসানী। যেমন তিনি ঘৃণা করতেন ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে।

আগেই বলেছি ভাসামী রাজনীতি করলেও তাঁর রাজনীতি ছিল অন্য সবার রাজনীতি থেকে আলাদা। তাঁর রাজনীতি ব্যক্তি বা দলের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কুঠরীতে আবদ্ধ ছিল না, এ কারণেই আসামে থাকাকালীন এক সাথে মুসলিম লীগ করলেও স্যার সাদুল্লার সঙ্গে তাঁর রাজনীতির কোনদিন বনিবনাও হয় নি। যেমন হয় নি একই সাথে আওয়ামী লীগ করেও সোহ্‌রা-ওয়ার্দী বা শেখ মুজিবের সঙ্গে। শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে সরকার বা মন্ত্রী বদল করে জনগণের কোন মঙ্গল হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাসই করতেন না।

এখানেই ছিল বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাযুজ্য। দেশ বিভাগের অল্প কিছুদিন পর থেকেই বামপন্থীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নিবিড় সান্নিধ্যে চলে যান। এ পর্যায়ের পূর্বে ও পরে তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন অকৃপণ হাতে। এসব সত্ত্বেও ভাসানী কোনদিন কম্যুনিস্ট ছিলেন না। এর প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ ধারণা। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল প্রকৃত ইসলাম কম্যুনিজমের চাইতেও ঢের বেশী বিপ্লবী। এ বিশ্বাস তাঁর এত প্রবল ছিল যে, তিনি মাও সেতুঙ-এর সঙ্গে আলোচনায়ও তাঁর এ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন নির্দ্বিধায়।

নিজে কম্যুনিস্ট না হয়েও তিনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে দ্বিধাহীন চিত্তে কাজ করেছেন, সহযোগিতা দিয়েছেন তাদের দীর্ঘদিন ধরে। কারণ কম্যুনিস্টদের মধ্যে সেদিন তিনি দেখেছিলেন নির্যাতিত মানুষের জন্যে মমত্ববোধ, দেখেছিলেন আদর্শের জন্যে আত্মত্যাগের অদ্ভুত প্রবণতা। কিন্তু

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়ে এ ব্যাপারেই তাঁর মোহভঙ্গ হলো চরমভাবে। ইসলামের নামে পাকিস্তানে যারা রাজনীতি করতো তাদের অধিকাংশ গোষ্ঠীর প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ক্রোধ। কারণ তারা ধর্মের নামে ব্যবসা করত। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নিকট সান্নিধ্যে যেয়ে তিনি দেখলেন এখানেও এক শ্রেণীর লোক সমাজতন্ত্রের নামে নতুন ব্যবসায় প্রয়াসী। বাস্তব জীবনে যারা চরম বুর্জোয়া ও বিলাসী, মানুষের প্রতি মমত্বহীন, তারাই সমাজতন্ত্রের নামে বিপ্লবী সেজে এক নতুন রাজনীতির ব্যবসা চালাতে তৎপর। মওলানা ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় এসব নকল বিপ্লবীদের নির্মমভাবে সমালোচনা করতেন।

কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হলো আরেকটি কারণেও। এক শ্রেণীর কম্যুনিস্টের মধ্যে তিনি দেখলেন তারা স্বদেশের (সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশের) চাইতেও ভারতের স্বার্থ রক্ষায় বেশী উদগ্রীব। তিনি বেদনার সাথে আরো লক্ষ্য করলেন, কম্যুনিজমের পিতৃভূমি সোভিয়েত রাশিয়া তাদের এ বিচ্যুতিতে মদদ জোগাচ্ছে। এ পটভূমিতেই মনি সিং-চক্রের সঙ্গে ভাসানীর বিচ্ছেদ ঘটলো চূড়ান্তভাবে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি বেঈমানীর কারণে ভাসানী শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগেরও বিরোধিতা করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। বাংলাদেশের জনগণকে হুঁশিয়ার করে গেছেন ভারতের আধিপত্যবাদী ভূমিকা সম্পর্কে। তবে সে অন্য কথা।

কম্যুনিস্টদের আরেক কারণে তিনি সমালোচনা করতেন। সেটা তাদের অতি তাত্ত্বিকতা। রুশপন্থী কম্যুনিস্টদের তিনি বিশেষভাবে অপছন্দ করতেন তাদের মস্কোর তালে তালে নাচতে হয় বলে। চীনকে ভাসানী পছন্দ করতেন চীনের গোঁড়ামীমুক্ত ও সম্প্রসারণবাদবিরোধী ভূমিকার কারণে।

ভাসানী 'মওলানা' ছিলেন অথচ ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল প্রচলিত ধারণা থেকে একেবারেই পৃথক। তিনি এক নতুন ইসলামে বিশ্বাস করতেন তাও নয়। তিনি বরং মনে করতেন, রসূলে করীম (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বিপ্লবী ইসলামকে কবরচাপা দিয়ে আজ রাজা-বাদশা ও শোষকদের এক নতুন ইসলাম চালু করা হয়েছে দুনিয়ায়। এই নকল ইসলাম তিনি মানতেন না। বহু আলেম-ওলামার মত কম্যুনিজমের দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হবে বলে তিনি বিশ্বাসই করতেন না। তিনি মনে করতেন, কম্যুনিজমের পরবর্তী স্তরেই দুনিয়ায় আবার ফিরে আসবে আদি অকৃত্রিম ও

www.pathagar.com

বিপ্লবী ইসলাম এবং এ ইসলামের আগমনের জন্যে কম্যুনিজমের আবির্ভাব ও তার ব্যর্থতার দরকার আছে। কম্যুনিজমের এ ব্যর্থতার কারণস্বরূপ তিনি বলতেন তাদের আখেরাতে অবিশ্বাসের কথা। তিনি মাও সেতুঙকেও নাকি বলে এসেছেন তাঁর প্রত্যয়ের কথাঃ আখেরাতে বিশ্বাস না করে কেউ প্রকৃত সমাজতন্ত্রী, প্রকৃত মানুষ হতে পারে না।

মওলানার এসব প্রত্যয় ও অসাধারণ বিশ্বাসের মূলে কাজ করেছে তাঁর সেই বিপ্লবী দর্শন যা তিনি লাভ করেছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক আল্লামা আজাদ সুবহানীর কাছ থেকে। এ দর্শন রবুবিয়তের দর্শন যার মূল কথাঃ বিশ্বপালক যেমন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বিশ্বমানবতাকে পালন করেন মানুষেরও কর্তব্য দুনিয়ায় সেই সার্বজনীন প্রতিপালন ব্যবস্থা কায়েম করা। মওলানা এ দর্শনে তাঁর দীক্ষার কথা স্মরণ করেছেন এভাবেঃ

'১৯৪৬ সাল। আসন্ন নির্বাচনে নমিনেশন পেপার সাবমিট করে গৌহাটিতে আটকে পড়লাম। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আল্লামা আজাদ সুবহানী সেখানে এসে হাজির। রাতে দু'জনের দেখা। কথা হলো অনেক। সামনে ধূমায়িত একটা এ্যাসট্রের মধ্যে আমার আঙ্গুল চেপে ধরে আল্লামা সুবহানী বললেনঃ মনে কর এটাই কা'বা শরীফ। এটাকে ছুঁয়ে তুমি ওয়াদা কর যে, তুমি রবুবিয়ত কায়েম করবে।'

সেই থেকে মওলানা ভাসানী বহু পথ ঘুরেছেন, সংগ্রাম করেছেন দেশের পথে প্রান্তরে। বহু আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন; কিন্তু তার মূল লক্ষ্য তিনি বিস্মৃত হন নি কখনও। প্রথম দিকে কৃষক সম্মেলনে তাঁর ডায়াসের পেছনে টাঙ্গানো থাকতো একটা লালসালু যাতে লেখা থাকতো—'হুকুমতে রাব্বানিয়া--আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম হোক।' শেষ দিকে প্রকাশ্যই বলতেনঃ 'রবুবিয়ত কায়েম ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই।'

www.pathagar.com

সানাউল্লাহ নূরী

মওলানা ভাসানী ঃ কবর থেকে যিনি নেতৃত্ব দেবেন

এক কোটি মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তাঁকে আলাদাভাবে চেনা সম্ভব ছিল। অথচ চেহারায়, চাল-চলনে কিংবা পোশাকে রাজকীয় তো নয়ই সাধারণ অভিজাত্যেরও কোনো লক্ষণ ছিল না তাঁর মধ্যে। গ্রামের একজন গেরস্তের মতো দেখতে অবিকল। গায়ে সব সময় থাকতো সাদা খদ্দরের একটি পাঞ্জাবী, পরনে সাদা লুংগী এবং মাথায় গোলাকার একটি তালের আঁশের টুপি। শীতের দিনে পরতেন খদ্দরের মোটা চাদর। জমিতে কৃষকদের সাথে কাজ করার সময় কোমরে পেঁচিয়ে নিতেন একখানা খোঁপ-খোঁপ গামছা। ওটা দিয়ে ঘাম মুছতেন শরীরের।

বাংলাদেশের মাটির মতন তামাটে ছিল শরীরের রং। মুখে ঝাঁকড়া দাড়ি। কিন্তু ইস্পাতের মতন শক্ত, সবল গাঁথুনি ছিল দোহারা গড়নের দেহ-টির। প্রকাণ্ড বুকের ছাতি। অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ দুই বিশাল চোখের দৃষ্টি। যখন তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, এই চোখ থেকে ঠিকরে পড়তো আগুন। যখন কথা বলতেন, প্রতি শব্দ স্পষ্ট অবয়ব নিয়ে গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলতো বাতাসে। যখন জনসমুদ্রের মাঝখানে এসে দাঁড়াতেন মনে হতো এক্ষুণি ঝড় উঠবে। এবং একটি উত্তাল তরঙ্গ শত-সহস্র তরঙ্গ হয়ে ভয়ংকর এক আক্রোশে ফেটে পড়বে তীরের মাটিতে।

যখন তিনি লাঞ্ছিত মানুষের পক্ষে এবং শোষক-উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন, মনে হতো বজ্র থেকে বুঝি ধ্বনি কেড়ে নিয়েছেন তিনি। তাঁর তীব্র-তীক্ষ্ণ স্বর খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়তো ইথারে। কোটি কোটি বঞ্চিত-শোষিত, উৎপীড়িত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একত্র হয়ে অনল বর্ষণ করতো তাঁর বজ্র কণ্ঠ থেকে। মনে হতো, তিনি স্বয়ং একটি আগ্নেয়গিরি। মাইল দু-তিন দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও শোনা যেতো লাউড-স্পীকার ছাপিয়ে আসা তাঁর বজ্রনির্ঘোষ হুংকার এবং সাবধানবাণী! তাঁর সাথে সায় দিয়ে তাঁর সভার শ্রোতারাও কখনো গর্জে উঠতো, উল্লাসধ্বনি তুলতো কখনো।

www.pathagar.com

মানুষের ওপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ছিল তাঁর। হাতের সমান্য একটা ইশারায় মুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারতেন তিনি উত্তেজিত একটি জনসমুদ্রকে। গলা চড়িয়ে যখন তিনি শুধু 'খামুশ' শব্দটি উচ্চারণ করতেন, অমনি বন্ধ হয়ে যেতো সমস্ত চিৎকার এবং কোলাহল। কায়েমী স্বার্থবাদীদের আসন টলে উঠতো যখন তিনি বাঘের মতন গর্জে উঠতেন 'হুঁশিয়ার' কথাটি উচ্চারণ করে।

এখানেই ছিল অন্য সবার থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য। অতি সাধারণ হয়েও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর অনন্যতার রহস্য এখানে। রাজনীতিতে আবির্ভাবের সূচনা-পর্ব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি চলেছেন ঝড়ের গতিতে। তিনি কখনো ক্লান্ত হন নি। তাঁর দুর্দমনীয় গতিবেগ এবং অপরাজেয় প্রাণশক্তি'র ওপর এতটুকু ছায়াপাত করতে পারে নি বার্ধক্য। তিনি ছিলেন জন্মবিদ্রোহী। এই বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করেই তাঁর রাজনীতির শুরু উনিশ শতকের সূর্যাস্তকালে। শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই যুবক আবদুল হামিদ খানের নাম ছড়িয়ে পড়লো উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের ঘরে ঘরে।

দেওবন্দ থেকে কেবল দেশে ফিরেছেন আবদুল হামিদ খান। মুখে চাপ-দাড়ি, মাথায় সাদা গোল টুপি, গায়ে লম্বা পিরহান। মাত্র যৌবনে পা দিয়েছেন। লেখাপড়া দেওবন্দের বিখ্যাত মাদ্রাসায়। ধর্মগ্রন্থের বাইরে আর কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এই নবীন যুবা, তা কারোরই তেমন জানা ছিল না। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখলো, আর দশজন মাদ্রাসা-শিক্ষিতের মতো নয় এই ছেলে। কথায় কথায় ফতোয়া দেয় না। শরা-শরিয়ত নিয়ে বাহাস করে না অন্য আলেমদের সাথে। তবে হ্যাঁ, দেওবন্দ থেকে এসেই একটা ফতোয়া সে দিয়েছিলো। স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল ঃ ইংরেজদের শাসন অবৈধ শাসন। জুলুমবাজের হুকুমত। তারা জবরদখল করে নিয়েছে এই দেশটা। সুতরাং তাদের গোলামী করা হারাম। ইংরেজরা বেঈমানি করে, আইন অমান্য করে রাজত্ব কায়েম করছে এদেশে। অতএব ইংরেজের আইন হলো বেইন-সাফের আইন। এ আইন মানার অর্থ অন্যায়কে মেনে নেয়া এবং ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করা।

যুবকটি আরো বললো ঃ ইংরেজশাসিত এই দেশ আইনের দিক থেকে একটি 'দারুল-হরব' অর্থাৎ বিজাতীয় শাসন। সুতরাং একে উচ্ছেদ করে

www.pathagar.com

নিজস্ব স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং আইনগত হক রয়েছে জনগণের। এর জন্যে দরকার সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। দরকার বিদেশী সাম্রাজ্য-উপনিবেশবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক জেহাদী মোর্চা গড়ে তোলার।

আবদুল হামিদ খান এই কথাগুলো প্রথমে বললেন তাঁর গ্রামের মসজিদে। গ্রামের ওয়াজের সভায়। ভয়ে চুপসে গেলেন জমিদার-তালুকদার এবং মাতব্বর শ্রেণীর লোকেরা। কী সাংঘাতিক এই বাচ্চা মওলানা! এ যে দেখি আগুন জ্বালাবে দেশে!

কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিরাপদ দূরত্বে গিয়েই কেবল সরে দাঁড়ালো না, কোমর বেঁধে ষড়যন্ত্রও শুরু করলো তরুণ মওলানাকে বৃটিশ সরকারের কোপানলে ফেলবার জন্যে। কিন্তু জীবন্ত একটি আগ্নেয়গিরিকে কি নির্বাপিত করা সম্ভব ছাই চাপা দিয়ে? বাধার মুখে আরো তেজ বাড়লো আগুনের। প্রচণ্ড গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন মওলানা। কৃষক সমাবেশ ডাকলেন।

আবদুল হামিদ খান লক্ষ্য করেছেন, গ্রামের এই সরলপ্রাণ মানুষগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই অপ্রতিরোধ্য শক্তি যা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো একদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অন্যায়-অনাচারের সব জটাজাল। তাদের ভেতরকার আগুনটাকে শুধু একবার জাগিয়ে দিতে পারলেই হলো। তিনি তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়লেন। প্রশ্ন রাখলেন : মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আসূর্যাস্ত শ্রম করে যাচ্ছো তোমরা। আবাদ করছো পদ্মা-যমুনার চরের কঠিন মাটি। ফসল ফলছে তোমাদের রক্তে এবং ঘামে। কিন্তু সেই ফসল কেন তোমরা নিজেদের গোলায় তুলতে পারছো না? গদিতে বসে যারা গোঁফে তা দিয়ে বেড়ায় তাদের কি অধিকার আছে তোমাদের ফসলে ভাগ বসানোর? কে এই অধিকার দিয়েছে ভুড়িওয়ালা লোকগুলোকে?

বললেন : নিজের পুকুরে তোমরা মাছ চাষ করছো। জমিদারের হুকুম ছাড়া কেন সেই মাছ তোমরা ধরতে পারবে না? জমিদারের লোক কিসের অধিকারে লুটে নিয়ে যাবে তোমাদের পুকুরের মাছ, বাগানের ফল? এ যে কত বড়ো জুলুম, কখনো কি কথাটা ভেবে দেখেছো তোমরা? নিজের চাষের জমির কেন তোমরা মালিক হতে পারবে না? কেন ভিটা মাটির ওপরও তোমাদের হক্ থাকবে না? কেন জমিদারের গদিতে মাসে মাসে এত

www.pathagar.com

নজরানা দিতে হবে তোমাদের ? খাজনার দায়ে কেন তোমাদের ভিটামাটিতে ঘুঘু চরাবে জমিদার ? তোমাদের মাথা ফাটাবে কেন জমিদারের লাঠিয়াল, পাইক বরকন্দাজের দল ? মহাজনের দেনার দায়ে কেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পথে এসে দাঁড়াবে তোমরা ?

সহজ সরল ভাষায় আবদুল হামিদ খান কৃষকদের মনের কথাগুলো তুলে ধরলেন তাদের সামনে। সেটা ছিল এক অন্ধকার যুগ। জমিদাররা ভূমিদাসের স্তরে নামিয়ে এনেছিল আমাদের বিশাল কৃষক সমাজটাকে। ইতর প্রাণীর মতো মনে করতো তারা এই আবাদকার মেহনতি মানুষ-গুলোকে। কৃষকের ছেলে লেখাপড়া শিখে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে—এটা স্বপ্নেও কল্পনা করা যেতো না ! গ্রামে স্কুল গড়তে চাইলে বাধা আসতো জমিদার মাতব্বরদের কাছ থেকে। তারা ভাবতো, ছোট-লোকের ছেলেদের চোখ ফুটবে যদি তারা একবার লেখা পড়ার সুযোগ পায়। ওরা চেয়ার পেলে জমিদারের মান থাকবে কোথায় ? এমন কি ওদের দাপটে জমিদারিও খতম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ওদের চিরকালের জন্যে মূর্খ এবং হাবা-বোকা বানিয়ে রাখতে হবে। লেখা-পড়ার প্রসার হলে গ্রামের মাতব্বরদেরও খোয়াতে হবে মাতব্বরি। ফলে, একদিকে যেমন চললো পাইকারি জুলুম এবং অনাচার-আত্যাচার, অন্য দিকে তেমনি শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করে রাখা হলো নানা রকম ষড়যন্ত্র আর অপকৌশলের সাহায্যে ।

কৃষক সমাবেশ ডেকে আবদুল হামিদ খান বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাকে কেউ গোলাম এবং মূর্খ বানিয়ে রাখতে পারে না। নিজের জমি আর ফসলের ওপর তার যেমন একশো ভাগ অধিকার আছে, তেমনি অধিকার আছে তার লেখাপড়া শেখার। এটা তার মৌলিক অধিকার। পৃথিবীর কোনো শক্তির সাধ্য নেই এসব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত রাখার। যারা এই অধিকার হরণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ। এটি একটি জেহাদ। কুরআনে এই জেহাদের কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের অনুভূতি ধরে নাড়া দিলেন আবদুল হামিদ খান। তারা দেখলো, এই প্রথম একজন মানুষ তাদের সামনে আশার আলো তুলে ধরছেন। মুক্তির পথে ডাকছেন তাদের। কী সাহস মানুষটার ! একাই

www.pathagar.com

যেন এক লাখ! এমন একজন নেতার জন্যেই তো এতদিন ধরে তারা অপেক্ষা করছিল! কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারলো না। ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে দলে দলে লোক ছুটলো আবদুল হামিদ খানের পেছনে।

কৃষকরা লাঙল-জোয়াল রেখে মাঠে-ময়দানে জমায়েত হতে লাগলো তরুণ মওলানার কথা শোনার জন্যে। গ্রাম থেকে গ্রামে ছোটেন মওলানা। পেছনে তাঁর মানুষের মিছিল। সভা-সমাবেশের বিরাম নেই। যেখানেই মওলানার সভা, হাজার হাজার লোকের ভিড় সেখানে। উল্কার বেগে ছুটলেন তিনি সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া। বগুড়া থেকে রংপুর। সেখান থেকে দিনাজপুর, রাজশাহী। টাংগাইলে এলেন। ছুটলেন ময়মনসিংহের শেরপুরে। সেখান থেকে শাহ্‌জাদপুরে। সব জায়গায় বিক্ষোভ, কৃষকদের বিরাট বিরাট সমাবেশ। এতকাল যারা নির্যাতনের ভয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা এখন বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। জেগে উঠছে। শুরু করেছে সংঘবদ্ধ হতে।

কৃষক সম্মেলন ডাকলেন মওলানা। তিনদিন ধরে সম্মেলন চলবে। লাখ লাখ মানুষ একত্র হবে। কিন্তু তারা খাবে কোথায়? তিনি বললেন, 'তোমরা সাথে করে নিয়ে এসো চা'ল, ডাল আর লাকড়ি। লাউ-কুমড়া তো ঘরেই আছে তোমাদের। আসবার সময় নিয়ে এসো কিছু।'

সম্মেলন হয়ে গেলো বিনা চাঁদায়। বড়ো লোকদের কাছে হাত পাততে হলো না। কৃষকরাই সব কিছু করলো। গামছায় বেঁধে তারা দু-চার সের করে চাল আনলো। কেউ মাথায় বয়ে আনলো লাউ-কুমড়া। কেউ নিয়ে এলো জ্বালানি কাঠ। সম্মেলন শেষে বাড়তি থাকলো প্রচুর জিনিস।

এটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো কৃষকদের মধ্যে। কোনো কৃষক সমাবেশ হলে তার সমস্ত আয়োজন করবে কৃষকরা। মওলানা বললেনঃ 'তোমরা সর্বহারা একথা ঠিক। কিন্তু তোমাদের ক্ষমতা অসীম।'

'সবাই মিলে যদি তোমরা কাজ করো, কারো মুখাপেক্ষী কখনো তোমাদের হতে হবে না। অন্যের সাহায্য নিয়ে সভা সমাবেশ করলে তোমরা কি করে সংগ্রাম করবে? কেমন করে খতম করবে অন্যায় আর জুলুম?'

সারা জীবন মওলানা কৃষকদের খরচেই করেছেন কৃষক সম্মেলন। মাথা পিছু সামান্য খরচ যোগাতে তাদের গায়ে লাগতো না। এতে তারা বরং

www.pathagar.com

পরিতৃপ্তি বোধ করতো। এক বিরাট কাজে শরিক হতে পেরেছে বলে বোধ করতো আনন্দ এবং গৌরব। কৃষক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ও আসামে এভাবেই মওলানা কৃষকদের শত শত সমাবেশ করেছেন। সকলের হৃদয়ে নিজের আসন করে নিয়েছেন। কৃষকরা শুধু তাঁকে তাদের নেতা আর মুক্তিদূত হিসাবেই গণ্য করে নি, তাদের পীর বা ধর্মীয় পথপ্রদর্শক বলেও মনে করতো। এভাবে সারা দেশে অসংখ্য কৃষক হয়েছে তাঁর শিষ্য।

বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে রাজনীতি এবং ধর্মের এমন আশ্চর্য সমন্বয় এক অনন্য ঘটনা। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষেই। সর্বহারার মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন বলে তাঁকে নিয়ে দেশে-বিদেশে রক্ষণশীল শিবিরে অনেক কথা উঠেছে। বিতর্ক, ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা হয়েছে তাঁর মতাদর্শ নিয়ে। কেউ কেউ মনে করতেন তিনি একজন কট্টর সাম্যবাদী। তিনি যখন ষাটের দশকে ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে সেখানেও কম ঝড় সৃষ্টি হয় নি। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলো তাঁকে ‘রেড মওলানা অব দি ইস্ট’ নামে আখ্যায়িত করেছে। অথচ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন ইসলামের শান্তি এবং মানবিক মূল্যবোধের আদর্শে। তিনি হক্কুল ইবাদের কথা বলতেন। কথাটির অর্থ বান্দা তথা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। অত্যাচার-নিপীড়ন এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনতা আর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদানই ইসলামের মৌল জীবনাদর্শ।

এই আদর্শে মওলানা ভাসানী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে। এই মাদ্রাসার অধ্যাপকের সকলেই ছিলেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের চিন্তানায়ক মওলানা ফজলে-হক খয়রাবাদীর ভাবশিষ্য। মওলানা খয়রাবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন স্বাধীনতা এবং মানব মুক্তির মহান আদর্শ সামনে রেখেই। ইংরেজরা তাঁকে নির্বাসন দিয়েছিল আন্দামানে। নির্বাসিত জীবনে কাফনের কাপড়ের ওপর তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ‘বিদ্রোহী হিন্দুস্তান’। এই গ্রন্থে তিনি বিদেশী প্রভাবমুক্ত একটি শোষণমুক্ত, একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র উপায়—এ ঘোষণাও তিনি রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

ফজলে হক খয়রাবাদী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আন্দামানে বন্দীদশায়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন এই মহান বিপ্লবীরই প্রকৃত একজন ভাবশিষ্য।

উত্তরাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন কালে মওলানা ঘোষণা করলেন, 'জমির মালিকানা না পেলে কৃষকরা খাজনা বন্ধ করবে।' তিনি বললেন, 'কোনো মধ্যস্বত্ব থাকবে না। সরকার এবং কৃষকদের মাঝখানে অন্য কারো কর্তৃত্ব অবৈধ। জমি যারা চাষ করে সেই কৃষকরাই হবে জমির সরাসরি মালিক। এই মলিকানা পাওয়ার পরই কৃষকরা জমির খাজনা দেবে তার আগে নয়।' তিনি কৃষকদের জমিদারের শেরেস্তায় খাজনা দিতে নিষেধ করলেন। কৃষকরা তাঁর নির্দেশে খাজনা দেয়া বন্ধ করলো। জ্বলে উঠলো দাবানল। জমিদাররা সরকারের কাছে ধর্ণা দিয়ে বললো, এই বিপজ্জনক লোকটাকে শায়েস্তা না করলে দেশ উৎসন্নে যাবে। দেশে কোনো আইন-কানুন থাকবে না। সরকারও অচল হয়ে পড়বে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরাও মওলানাকে নিয়ে বিপাকে পড়লেন। পুলিশ পাঠানো হলো তাঁর সভা পণ্ড করার জন্যে। কিন্তু লাখ লাখ মানুষকে দমন করা তাদের সাধ্যে কুলালো না। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হলোঃ মওলানার শিষ্যদের ওপর গুলী চালানো হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

সুতরাং হুকুম হলো, মওলানাকে বহিষ্কার করো। মওলানা যেখানেই সভা করতে যান সেখানেই তাঁর ওপর জারি হয় বহিষ্কার আদেশ। প্রতিটি জেলায় নিষিদ্ধ করা হলো তাঁর গতিবিধি। মওলানাকে নিয়ে বৃটিশ সর-কারের এই ভীতি জনগণের কাছে তাঁকে আরো প্রিয় করে তুললো। তিনি হলেন তাদের অবিসংবাদী নেতা।

এই পরিস্থিতিতে ১৯০৪ সালে আসাম গেলেন মওলানা। সেখানে বাংলা-দেশের নদীভাঙ্গা কৃষকরা দুর্গম জংগল কেটে আবাদ করে মাটি। তিনি তাদের মধ্যে কাজ শুরু করলেন। সেখানেও জমিদার ভূস্বামীদের বাধা। তাদের প্ররোচনায় আসাম সরকার বাঙ্গালী কৃষকদের বিরুদ্ধে চালু করলো কুখ্যাত 'লাইন প্রথা'। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন মওলানা ভাসানী। তাঁকে কারাবন্দী করা হলো। এক লাখ কৃষক সশস্ত্র হয়ে জেল ভেঙ্গে তাঁকে মুক্ত করে আনলো। আসামে তিনি জেলে গিয়েছিলেন আটবার। আসামের 'ভাসান চরে' কৃষক সংগ্রামের সূচনা

www.pathagar.com

করার সময় থেকেই তাঁর নামের সংগে ভাসানী কথাটি যোগ হয়েছে। 'ভাসান চরের মওলানা' নামে আসামের মানুষের কাছে খ্যাত হলেন তিনি। আসামে আইন সভার সদস্য হয়েছিলেন কয়েকবার। প্রতিবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। জীবনে কেউ তাঁর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহস পায় নি।

আসাম থেকে আবার বাংলাদেশ। ১৯৪৮ সালে আসেন তিনি ঢাকায়। এখানে আবার নতুন সংগ্রামের শুরু। মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে খাড়া করলেন তিনি পাকিস্তানের প্রথম গণতান্ত্রিক বিরোধী দল। ১৯৪৯ সালে এভাবে জন্ম হলো আওয়ামী মুসলিম লীগের। ১৯৫৪ সালে সম্মিলিত বিরোধী দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট তাঁরই সংগঠনী প্রতিভার ফসল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে। এর অর্থ ছিল, 'বাংলাদেশকে ন্যায্য হিস্‌সা না দিলে তোমাদের সাথে আমাদের বিদায়। আমরা আলাদা হয়ে যাবো।' এভাবে তিনিই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইংগিত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৬৯ সালে আরো স্পষ্ট করে বললেন ঃ 'বাংলাদেশের দাবি—এক দফা এবং সেটা স্বাধীনতার দাবী।'

তাঁর সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং সাধনাই বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তায় অনুরণিত। সুদীর্ঘ ৮০ বছর তিনি রাজনীতি করেছেন। এই আশি বছরই জনগণ ছিল তাঁর সাথে। তিনি ছিলেন জনগণের লোক। তাঁর কবরের পার্শ্বেও জমায়েত হয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। এখনো প্রতিদিন তাঁর মাযারে ভিড় অগণিত মানুষের। কবর থেকেই তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাতিকে। চিরকালই থাকবেন জনগণের পাশে।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আবু তালিব

মওলানা ভাসানী

হ্যাঁ, এই নামেই তিনি পরিচিত।

সে অনেকদিন আগের কথা। পাবনা জেলার একজন অখ্যাতনামা মৌলবী সাহেব, না ঠিক মৌলবী নয়, বলা যেতে পারে মুন্‌শী সাহেব সাবেক আসাম প্রদেশের (বর্তমান ভারতে) এক সদ্যজাগা চর এলাকায় (পরে নাম হয় চর ভাসান) দীনী ইল্‌ম শিক্ষা দানের ব্রত নিয়ে মক্তব বা মাদ্রাসা খুলে বসেন। এই ভাসানের চরের সেই অখ্যাতনামা মৌলবী সাহেবই আজ বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী নামে পরিচত হয়েছেন।

মওলানা সাহেবের অন্যতম ভক্ত শিষ্য মরহুম মশিয়ূর রহমান সাহেব কথাটি বলেছেন এভাবে—'পদ্মার এক চরে আট আনা মাসিক বেতনে মওলানা ছোট এক মসজিদে নামায পড়াতেন, আর সকাল বেলায় মক্তবে বসতেন ছেলেদের নিয়ে। অন্ধকার গ্রাম্য জীবন, গ্রামের লোকদের নানা কুসংস্কার, জমিদারদের শোষণ অত্যাচার—এই ছিল তাঁর তখনকার পরিবেশ। এখান থেকেই তাঁর শুরু। সিরাজগঞ্জ, সন্তোষ, বগুড়া, আসাম, ভুরুঙ্গামারি—বিভিন্ন এলাকায় তিনি কাটিয়েছেন। কৃষকদের জীবন দেখেছেন। তাদেরকে নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আর দীর্ঘদিনের এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই এক অচেনা মৌলবী রূপান্তরিত হয়েছেন মওলানা ভাসানী নামক খ্যাতিমান এক বিরাট ব্যক্তিত্বে। সর্বভারতীয় পরিসরে আর কোন নাম আমার মনে আসে না যাঁর ইতিহাস এভাবে দিনের পর দিন সাধারণ কৃষক জনতার মাঝখানে গড়ে উঠেছে।'

তাই মওলানা ভাসানীর নাম শুনলেই স্বপ্নময় রূপকথার মানুষ আমাদের মনের কোণে এসে ভীড় জমায়। মনে পড়ে সেই কিশোরকালের কথা।

আসামে তখন বড়দলৈ মন্ত্রীসভার রাজত্বকাল। বলাবাহুল্য, তখনও পাক-ভারত-বাংলাদেশে স্বাধীনতার আলো জ্বলে নি। খবরের কাগজে সচিত্র

www.pathagar.com

প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। তাতে দেখা গেল সেই সুদূর আসাম প্রদেশ থেকে প্রবাসী বাঙালীদের উৎখাত করার জন্য হাতীর সাহায্যে ঘর-বাড়ী ভেঙে দেয়া হচ্ছে। দেখে মনে বড় ব্যথা পেলাম। খবরের কাগজের বিবরণ পড়ে আরও জানলাম, এই বাঙালেরা আসলে সাবেক পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ। যাঁরা প্রায় দুই তিন পুরুষ ধরে সেখানে গিয়ে সেখানকার ঝাড়-জঙ্গল সাফ করে বসবাস করে আসছিল, শুধুমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালী বলে তাদেরকেই তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের অপরাধ? অপরাধ আর কিছু নয়—অপরাধ তারা বিদেশী। যারা একদিন শরীরের রক্ত পানি করে, ডেঙ্গু জ্বর, বন্য শ্বাপদের আক্রমণ উপেক্ষা করে, ঝাড়-জঙ্গল সাফ করে বন্ধ্যা জমির বুকে ফসলের স্বপ্ন রচনা করেছিল, তাদের নাকি আর প্রয়োজন ছিল না; তাই তাদের চিরতরে উৎখাতের জন্য আসাম সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তখন জানতে পারি নি, পরে জেনেছিলাম, এই নির্যাতিত মজলুম প্রবাসী বাঙালীদের মুক্তির জন্য যিনি সর্বপ্রথম প্রাণপণ করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে মজলুম জননেতা ভাসানী নামে পরিচিত হন। তাঁর আসল নাম আবদুল হামিদ খান। ভাসানী তাঁর নিসবৎ।

আজ আর আসাম স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু তবু কেন জানি নে, সে দেশের পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী মানুষের প্রতি নির্যাতন বন্ধ হয় নি! বর্তমান ভারত সরকারের কাঁটাতারের বেড়া নাকি সেই প্রবাসী বাংলাদেশী উত্তরাধিকারদের উপর প্রসারিত হয়েছে। সে অন্য কথা। মওলানা ভাসানী যে এই প্রবাসী বাঙ্গালীদের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেকালের জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এ কথা ভাবলেও আনন্দে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। এই সঙ্গে আরও মনে পড়ে, সাবেক পূর্ববঙ্গ যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সম্পূর্ণ আসাম পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে থেকে যায়। অথচ এই প্রদেশ পাকিস্তানের আন্দোলনের নীতি অনুসারে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনকারীদের দাবী অনুযায়ী আসামের সিলেট নামক উপবিভাগটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলাবাহুল্য, এই অন্তর্ভুক্তির জন্য যে আন্দোলন হয়, তার মূলে মওলানা ভাসানীর অবদান ছিল অধিক। একথা যে সত্যি তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল সিলেটের গণভোটের সময়। সিলেটের মানুষ সেদিন মওলানা সাহেবের আবেদনে দলে দলে সাড়া দিয়েছিল। উল্লেখ্য, এই গণভোটে সেদিন জয়লাভ না

www.pathagar.com

করতে পারলে সিলেটের ভাগ্যও চিরদিনের মত ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

নিজে রাজনীতিবিদ নই, তাই ভাসানী সাহেবের রাজনীতির গুণাগুণ ব্যাখ্যার কোনো চেষ্টা করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু চোখে দেখা মানুষ ভাসানী ও তাঁর সম্পর্কে আমার সাধারণ উপলব্ধির কথা সংক্ষেপে পেশ করার চেষ্টা করব মাত্র।

ভাসানী সাহেব রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু এ কোন্ ধরনের রাজনীতি? তাঁর রাজনীতির সঙ্গে কোনো দেশের রাজনীতির মিল ছিল না। প্রতিটি দেশের রাজনীতির লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে মনের মত রাষ্ট্র শাসন করা। কিন্তু ভাসানী সাহেবের কোনোদিন ক্ষমতার লোভ ছিল না। রাজনীতি তাঁকে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার সুযোগ বহুবার এনে দিয়েছে। কিন্তু তিনি কোনোদিন ক্ষমতায় যান নি। তিনি চেয়েছেন রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থেকে ক্ষমতাবানদের নিয়ন্ত্রিত করে রাষ্ট্রের কল্যাণ করতে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার লাঘব করতে। কিন্তু তা কি তিনি করতে পেরেছেন, না করা সম্ভব?

উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের কথা বলা যায়। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শক্তিশালী নেতা হিসেবে তাঁর নাম কে না জানে? বলতে গেলে তিনি ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রাণ। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ দলও তাই মনে করত। আমরা তখন মুসলিম লীগ দলের সঙ্গে ঘুরলেও আসলে সকলেই যুক্তফ্রন্টের সমর্থক ছিলাম। বলতে কি, যুক্তফ্রন্টের তিন প্রধানের নাম (হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী) প্রচারিত হলেও ভাসানী সাহেবের নামই বেশী প্রচারিত হত এবং জনগণ ভাসানী সাহেবেরই সমর্থক ছিল। কোথাও বা হক সাহেব, মানে ফজলুল হক সাহেবের নাম শোনা যেত। জনদরদী নেতা হিসেবে অবশ্য হক সাহেবের নামই সবার উপরে ছিল; কিন্তু ভাসানী সাহেবকে আপামর জনসাধারণ ভালোবাসত, মান্য করত। স্বয়ং হক সাহেবও ভাসানী সাহেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখনও বড় নেতা হিসেবে পরিচিত হন নি। বেশ মনে আছে, নির্বাচন তখন কাছেই এসে গেছে। নির্বাচনী প্রচারণাও তুঙ্গে, এমন সময় শোনা গেল, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় অবশ্যম্ভাবী। এ জয় ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। ব্যাপার কি?

www.pathagar.com

কারণ সারাদেশে নাকি মওলানা হুজুরের দাড়ি মোবারক পাওয়া যাচ্ছে। ভক্তেরা তাদের নিত্যপঠিত পবিত্র কুরআন শরীফের মধ্যে নাকি পেয়েছেন। কোনো দুষ্টুবুদ্ধির লোক রটিয়েছে নিশ্চয়ই, বিশেষ করে এটি নির্বাচনী প্রচারণার একটি বিশেষ কায়দাও হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য! সারা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে।

শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের জয়ও হলো।

অনেকেই আশা করেছিলেন, এবার ভাসানী সাহেবসহ তিন প্রধানই মন্ত্রীসভায় যোগদান করবেন, কিন্ত ভাসানী সাহেব অনড় রইলেন। ক্ষমতায় তিনি যাবেনই না। পল্টন ময়দানে নবগঠিত মন্ত্রীসভার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ নিয়ে রসিকতাও কম হলো না। মওলানা সাহেব চাবুক উঁচিয়ে ক্ষমতাধারীদের সাবধান করে দিলেন। স্বয়ং হক সাহেবও হুজুরের চাবুক চেয়ে নিয়ে নিজের গায়ে বুলিয়েও নিলেন। কিন্তু দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো কি? অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের শাসন-ক্ষমতার পতন হল।

ভাসানী সাহেব আবার নতুন করে দল গঠনে লেগে গেলেন। দল তিনি গড়েছেন। যখন যেমন মনে হয়েছে দল গড়েছেন। আবার বিরক্ত হয়ে নির্মমভাবে নিজের গড়া দলকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছেন। আবার নতুন দল গড়েছেন। দল গড়ার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলন চালিয়েছেন। আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তিনি মুসলিম লীগের নেতাদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

মুসলিম লীগ থেকে সরে তিনি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গড়েছেন। আবার প্রয়োজনবোধে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন করে 'আওয়ামী লীগ' নাম রেখেছেন। আবার আওয়ামী লীগ বর্জন করে—ন্যাপ (National Awwami Party) গড়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো নেতা, উপনেতা, হাফ-নেতাদের দেশপ্রেমে তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি। তাই তিনি সব সময়ে দল ও মতের উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু পেরেছেন কি? অবশ্য তিনি যা-ই করুন না কেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটি আকর্ষণ ছিল যে, দেশের জনমত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর মতের আনুকূল্য করেছে। অন্তত

www.pathagar.com

এ কথা তারা ভেবেছে যে, না মওলানা সাহেব আর যা-ই করুন, দেশের প্রতি বেঈমানী করবেন না। এমন কি তাঁর কাগমারী সম্মেলনে (৭, ৮, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭) তাঁর দেশদ্রোহমূলক পশ্চিম পাকিস্তানকে বিদায়ী সালাম দেওয়াকে মনে মনে সমর্থন দিতে না পারলেও বাহ্যত তেমন জোরে-শোরে প্রতিবাদও করে নি। আজ এ কথা কী অস্বীকার করা যায় যে, সেই বিদায়ী সালামের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত ও মঞ্জরিত হতে সাহায্য করেছিল? এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে, মওলানা ভাসানীই প্রথমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছেন?

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে নিজের মত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এ কথা কি বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় যে, ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাসানী, কম্যুনিস্ট নাস্তিকদের সাহায্যে ইসলামী আদর্শ কায়েম করার স্বপ্ন দেখেছেন? অথচ কার্যক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছে।

প্রয়োজন বোধে তিনি সব শ্রেণীর মানুষের সাহায্য নিয়েছেন এবং তাদের জন্য কাজও করেছেন। মোট কথা, মওলানা ভাসানী ছিলেন বাংলাদেশের একজন দেশগত, জাতিগত প্রাণ। তিনি যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন। এবং এই ভাবনাকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে কোনো দল বা ব্যক্তির সাহায্য নিতে ইতস্ততঃ করেন নি।

আর উনসত্তরের গণ আন্দোলনের কথা?

সেদিন মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে যে অসাধারণ গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেই লাট-ভবনসহ অন্যান্য সরকারী ভবন ঘেরাও হয়েছিল, সেদিনের কথা এখনও আমাদের চিত্তে জ্বলজ্বল করছে। সেদিন যদি ভাসানী সাহেব এই নেতৃত্ব না দিতেন, আমাদের এই স্বাধীন বাংলার জন্ম এতো ত্বরান্বিত হতে পারত কি?

আমি আগেই বলেছি, ভাসানী সাহেবের রাজনীতি আমার পসন্দ ছিল না কিন্তু তাঁর প্রতি আমার একটি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তাই তাঁর সব

www.pathagar.com

কাজের প্রতিই একটি পরোক্ষ সমর্থন যেন কার্যকর হত। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যাক, যেখানে মওলানা সাহেবর প্রকৃত মানসিকতার পরিচয় মেলে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি. ভি. গিরি বাংলাদেশ ভ্রমণে এলে তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিব তাঁকে কাপ্তাই বাঁধ দেখাতে নিয়ে যান। মওলানা সাহেব নাকি এ ব্যাপারে আলাপচ্ছলে শেখ সাহেবকে অনুযোগের সুরে বলেন—'মুজিব, তুমি ভি. ভি. গিরিকে দেশের সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য কাপ্তাই নিয়া গিয়াছ। কিন্তু ভুল করিয়াছ। আমি হইলে তাঁহাকে লইয়া যাইতাম চাঁদপুরের কাছে। যেখানে দু'টি নদীর স্রোতধারা একত্র হইয়াও এক সঙ্গে মিশে নাই।' কথাটি বলেছেন জনাব মাহফুজউল্লাহ। বলাবাহুল্য, এ থেকে মওলানা ভাসানীর প্রকৃত মানসিকতার পরিচয় মেলে।

দুনিয়ায় কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতির বাস নয়—এক ও অভিন্ন মানব জাতির বাস। এটি পবিত্র কুরআনেরও বাণী—"আন্‌নাসু উমযতান ওয়াহি-দাতান', মানে, মানব জাতি এক ও অভিন্ন। এক আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি তারা। তাই বলে তারা একে অন্যের পরে অত্যাচার করবে বা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তা চলতে পারে না, আল্লাহতা'আলার বিশ্ববিধানেরও এটি খিলাফ।

মওলানা সাহেবও বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আইনই চলবে, মানুষের গড়া আইন চলতে পারে, তাই বলে আল্লাহ্‌র আইনকে ডিঙ্গিয়ে বা পদদলিত করে নয়। ভি. ভি. গিরিকে চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার সঙ্গম স্থল দেখাবার তাকিদও তাই তিনি বেশী করে অনুভব করেন। অথচ এই ভাসানীকেও ভারত সরকারের দালাল বলা হতো। একবার তো তাঁকে গুলী করে মারার আস্ফালনও দেখিয়েছিলেন পাক-আমলের জনৈক শক্তিশালী গভর্নর (ইসকান্দার মির্জা সাহেব)। স্বয়ং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী সাহেবও একদিন তাঁর আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসার পথও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। এবং তাঁকে গুলী করা তো দূরের কথা, যাঁরা গুলী করতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও আজ বাংলা থেকে উৎখাত হয়েছেন। এবার শেষ করা যাক।

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে রাজশাহী শহরের মাদ্রাসা ময়দানে তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলাম (১৬ই মে, ১৯৭৬)। সে কি তেজোদৃপ্ত ভাষণ!

www.pathagar.com

সেদিন তিনি ভারত সরকারের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ক্ষতিকর নীতির প্রতিবাদে বিখ্যাত লঙ মার্চে স্বয়ং নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। হাজার হাজার মানুষ সারা দেশ থেকে এই মিছিলে অংশ নিয়েছিল।

বর্তমান লেখকও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নওয়াবগঞ্জে কানসার্ট কলেজ প্রাঙ্গণেও ভাসানীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত কথা বলার সুযোগ ছিল না। শুধু চোখ মেলে সেই বিরাট জনসমুদ্র দেখার ছিল। তাই দেখেছিলাম, আর ভেবেছিলাম। কী অদ্ভুত সংগঠন শক্তি আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিল! ভাসানী সাহেবের বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমার বহুবারই হয়েছিল। বলেছি, ভাষণে তাঁর 'জ্বালাও-পোড়াও', 'ঘেরাও করো' ইত্যাদি কথাগুলো আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নি। তবে লোকটিকে ভালোবাসতাম। মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে সেটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল। রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে তিনি তদানীন্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—'শেখ মুজিব, তুমি কি দেখো নি, যুক্তফ্রন্টের ভোটের সময়, বুড়ো ভাসানী আর বুড়ো শেরে বাংলা ২১ দফার ওয়াদা করে রণ জয় করেছিল। কিন্তু একটি ওয়াদাও পূরণ করতে পারে নি। তাই তুমি আর ওয়াদা করো না, কাজ করো।'

'দেশের জনসাধারণ বুড়ো লোকের মানের খাতিরে গলায় গামছা দেয় নি। কিন্তু তুমি তো বুড়ো নও, তোমাকে তারা সে খাতির নাও করতে পারে। এবার ওয়াদা খেলাফ করলে, শুধু গলায় গামছা নয়, গলা একেবারে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে।' বলাবাহুল্য, অল্পদিন পরেই শেখ মুজিবের সেই পরিণামই ঘটেছিল। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাকও তিনিই দিয়েছিলেন। এটি ভালো হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল, সে বিচার করবে ইতিহাস। আমরা শুধু স্মরণ করছি। মওলানা সাহেব আজ নেই। দুনিয়াবী স্বার্থ—পরার্থের দাবী আছে এবং থাকবেও। কিন্তু মওলানা সাহেবের মত মানুষের প্রয়োজন আজও যে কত অধিক, তা যেন দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

দোষে-গুণে মানুষ, সেই হিসেবে মওলানা সাহেবেরও দোষগুণ ছিল, ভুল-ত্রুটিও ছিল। কিন্তু দুনিয়ায় এমন মানুষ কি খুব বেশী এসেছে? আমরা মওলানা সাহেবের বিদেহী রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আমিন!

www.pathagar.com

ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ভূমিকা

মওলানা ভাসানী চীনে গিয়েছিলেন ১৯৬৩-তে। চীন ভ্রমণের উপর ছোট একটি বই আছে তাঁর, 'মাও সে তুঙের দেশে'। সে বইতে মওলানা লিখেছেন, 'মাও সেতুঙের দেশে আমাকে সব থেকে মুগ্ধ করেছে কি—এ প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন।' তাঁর মতে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া একদিক দিয়ে অত্যন্ত দুরূহ অপর দিকে অত্যন্ত সহজ। সহজ করেই জবাব দিয়েছেন তিনি, অল্প কথায়, এক কথায়। বলেছেন, 'হাসি'। হ্যাঁ, হাসিই আমাকে সব থেকে বেশী মুগ্ধ করেছে। চীনের মানুষ আজ হাসতে পারে। যে হাসিতে কান্না ঝরে না, যে হাসি অনশনক্লিষ্ট মুখে কুঞ্চন সৃষ্টি করে মুখব্যাদানের কারণ হয় না, যে হাসিতে আছে প্রাণের প্রাচুর্য আর জীবনের উচ্ছ্বাস।' মওলানা লিখেছেন। আরো বলেছেন তিনি, 'তখন বুঝিনি এমন করে যে হাসির অভাব কত নিষ্ঠুর! দেশে এসে আজ মিলিয়ে দেখছি আমার দেশের কৃষকের মুখের সাথে চীনের কৃষকের মুখ। আমার দেশের কোটি কোটি মানুষের মুখ দেখছি। কিন্তু হাসি খুঁজে পাচ্ছি না তো?'

'আমরা কি হাসির উৎসের সন্ধান পাবো না?' মওলানার এই ব্যাকুল প্রশ্ন বুকের মধ্যে এসে সরাসরি লাগে, বইটি পড়তে গেলে। আর তখনি মনে পড়ে যে, মওলানা ভাসানী সারা জীবন ব্যস্তসমস্ত ছিলেন ঐ উৎসের সন্ধানে। পণ ছিল জীবনে খুঁজে বের করবেন সেই উৎস, আর সেই উৎসমুখে জমা আছে যে ভীষণ বঞ্চনা ও অতি নিষ্ঠুর নিপীড়নের প্রকাণ্ড পাথর, তাদের সরিয়ে দেবেন, মুক্ত করবেন নদীকে, হাসি আনবেন মানুষের জীবনে, জীবন্ত করবেন জীবনকে। মওলানা আজ নেই, তিনি চলে গেছেন। কিন্তু কি রেখে গেছেন পেছনে? কোন গ্রন্থ নয়, কোন সংগঠন নয়, বিশেষ কোন উত্তরসাধক নয়। মওলানা রেখে গেছেন তাঁর জীবন। দেশের কাছে, ইতিহাসের কাছে।

www.pathagar.com

যদি প্রশ্ন করা যায় সে জীবনের মূল কথাটা কি, প্রধান সত্য কি তার? মনে হবে কঠিন সেই প্রশ্ন। ছিয়ানব্বই বছর বেঁচেছিলেন তিনি। একটি মহাদেশের মত বিস্তৃত ছিল তাঁর জীবন সেখানে পর্বত আছে, আছে সমতল ভূমি কোথাও শীত বা সেখানে কোথাও গ্রীষ্ম। বিচিত্র ও বহুবিধ ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র ও কর্মধারা। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আবার ঐ প্রশ্নের জবাব দেওয়া অত্যন্ত সহজ। এক কথায়ই জাবাব দেওয়া যায় যেমন মওলানা দিয়েছেন চীন সম্পর্কে। তাঁর জীবনের মূল কথা প্রধান সত্য হচ্ছে সংগ্রাম। এক-টানা নিরবচ্ছিন্ন আপোষহীন সংগ্রাম।

কিসের জন্য সংগ্রাম? কোন্ লক্ষ্যে? কোন্ অভিপ্রায়ে? এ প্রশ্নের জবাবও এক কথাতেই দেওয়া যায় অত্যন্ত সহজে। সংগ্রাম ছিল মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। উৎস খুঁজেছিলেন তিনি হাসির। প্রায় অবলুপ্ত উৎস। যেন রূপকথার রাজপুত্র একজন, আহার নেই, বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই, খুঁজছেন, খুঁজছেন সেই নরশত্রু দৈত্যকে অথবা সেই ভীষণ স্বভাব খল প্রকৃতির প্রতারক যাদুকরকে পাথর চাপিয়ে রেখেছে যে ঝর্ণার উৎসমুখে। নদী গেছে শুকিয়ে। রাজপুত্র বাঁচাবেন সেই নদীকে। আনবেন হাসি, তিনি আনবেনই কৃষকের, শ্রমিকের, মেহনতি মানুষের অনাহারক্লিষ্ট মুখে। সংগ্রাম সেই লক্ষ্যেই।

মানুষের মুখে হাসি ফোটাবো—এই কথাটা কতজনে বলেছে কতবার কত সময়ে বলেছে এই দেশে। বায়ুমণ্ডলে যদি কান পেতে শুনি, শুনবো কত গম্ভীর সমন্ত্র মস্ত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত সেই প্রতিশ্রুতি। যদি সত্যি সত্যি ব্যবস্থা থাকত এই শব্দ প্রতিশব্দ সংরক্ষণের তবে আমাদেরকে পাগল করে দিত তার প্রবলতা, তার প্রচণ্ডতা তার সার্বক্ষণিকতা। হাসি আনব দেশের গরীব দুঃখীর মুখে। এ কথা কতজনে বলেছেন, বলতে বলতে ক্ষমতার উচ্চাসনে উঠে গেছেন। উঠে গিয়ে তিনিই হাসছেন শুধু জোরে জোরে হাসছেন, নতুন করে কেঁদেছে সমগ্র দেশ।

না, হাসতে পারে নি মানুষ। অনশনক্লিষ্ট মুখে হাসি আসে নি, কুঞ্চনের রেখাগুলোই শুধু গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। মওলানা ভাসানী দেখেছেন তা, ব্যথিত হয়েছেন। সেই ব্যথা বুকে নিয়ে আবার ছুটেছেন তিনি অপ্রতি-রোধ্য উৎসাহে ও সাহসে।

কিন্তু আমি ভুল বলেছি। শত্রুকে সেই নরশত্রু দৈত্য ও প্রতারক যাদু-কর উভয়কে তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছিল জীবনের প্রথমেই। মওলানা শত্রুকে

www.pathagar.com

প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন তারপর মিত্রকে। এইখানে পৃথক তিনি অন্য সব রাজনীতিকের কাছ থেকে। অন্যেরা মিত্রই খোঁজেন শুধু শত্রুকে বাদ দিয়ে। উদ্দেশ্যটা সরল, মিত্রের সঙ্গে মৈত্রী করবেন সুযোগ-সুবিধা যা পাওয়া যায় নেবেন। মিত্রকে ধরে উঠাবেন।

মওলানা কখনো উঠতে চান নি। সঙ্গে ছিলেন তিনি, পাশেই ছিলেন জনসাধারণের। গ্রামেই থাকতেন অধিকাংশ সময়। শহরে আসতেন প্রয়োজন-বোধে। যেমন গ্রামের মানুষও আসে কখনো সখনো। কিন্তু যে অস্ত্র হাতে ছিল তাঁর সেটা অলৌকিক নয়, নয় আধিদৈবিক। সে অস্ত্র জনসাধারণের সংগঠিত শক্তি। জনসাধারণের শক্তি দিয়েই তিনি আক্রমণ করেছেন দৈত্য ও যাদুকরকে। আঘাত করেছেন বারবার।

কে সেই শত্রু, কে সেই দৈত্য ও যাদুকর? মওলানা ভাসানী চিনতে ভুল করেন নি। তারা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ। কোন্‌টি দৈত্য কোন্‌টি যাদুকর সে প্রশ্ন অবান্তর। কেননা দৈত্যও যাদু জানে এবং যাদুকরও দৈত্যই আসলে স্বভাবে-চরিত্রে আচারে আচরণে।

প্রত্যক্ষভাবে সামনাসামনি সামন্তবাদের সঙ্গে লড়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর লড়াই একজন জমিদারের বিরুদ্ধে ছিল না, দু'জন জমিদারের বিরুদ্ধে নয়, দশ জন একশো জন জমিদারের বিরুদ্ধেও নয়; জমিদারের বিরুদ্ধে শুধু লড়ছিলেন না—তিনি আসলে লড়ছিলেন জমিদার জমিদারীর বিরুদ্ধে। উপলক্ষ ঢেকে দিতে পারে নি লক্ষ্যকে। এইখানেই স্বতন্ত্র তিনি। জমিদারটি ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন অর্থহীন, জমিদারী প্রথার অবসান চেয়েছেন তিনি, অবসান চেয়েছেন সেই ঘৃণ্য অমানবিক ব্যবস্থার যা জমিদারদের জন্ম দেয় ও রক্ষা করে যা নির্দয়ভাবে শোষণ করে। তিনি জানতেন কোন একজন বিশেষ জমিদারকে বা এমন কি দেশের সমস্ত জমিদারকেও যদি এক বিশেষ মুহূর্তে পরাভূত করা যায় তবু কৃষকের মুক্তি আসবে না যদি না জমিদারী ব্যবস্থা শেষ হয়। জমিদার যাবে জমিদার আসবে কিন্তু ব্যবস্থাটায় সামন্ত শোষণের বন্দোবস্তটি থাকছে কি থাকছে না জিজ্ঞাসা সেটিই।' সেই বন্দোবস্ত থাকলে জমিদারের অভাব হবে না শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যাবে এক নিমেষে। আজ যিনি কৃষক নেতা লড়ছেন স্থানীয় জমিদারের বিরুদ্ধে তিনিই হয়তো আগামীকাল জমিদার হয়ে বসবেন যদি স্থানীয় জমিদার চলে যান বাণপ্রস্থে বৈরাগী হয়ে। তাঁর আন্দোলন তাই ছিল সামন্তবাদের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

এও তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে জানতেন যে সামন্তবাদের পেছনে আছে দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি, রাষ্ট্রীয় শক্তির পেছনে আছে সাম্রাজ্যবাদ। সেইজন্য সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয় কোনমতেই এবং সে যুদ্ধ অতি অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী।

সকলে বোঝেন নি এই সত্য বুঝতে চান নি কেউ কেউ। গ্রামে যাঁরা কাজ করেছেন মানুষের উপকারের জন্য, তাঁরা অনেকেই ভেবেছেন একটা নাইট স্কুল, দুটো টিউবয়েল বা একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতে পারলেই মানুষের মুক্তি এসে গেল। অনেক সময় স্থানীয় জমিদারও চাঁদা দিয়েছেন এসব কাজে, কেননা হয়তো বা নিজের অজান্তেই জমিদার জেনে নিয়েছে মানুষকে ঠাণ্ডা রাখার ঐ একটা উপায়, ঠাণ্ডা রাখতে হলে নাইট স্কুলের, দাতব্য চিকিৎসালয়ের, টিউবয়েলের পানি অত্যন্ত উপযোগী। মওলানা ভাসানী সেই পথের পথিক ছিলেন না। গ্রামে থাকতেন কিন্তু গ্রাম্য বিচ্ছিন্নতা ছিলো না তাঁর চেতনায়। তিনি তাদের এক জন নন যাঁরা বলেন আমাদের কাজ মানুষের উপকার করা, আমরা খোদার কসম বলছি আমরা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি নিরপেক্ষ। মওলানা কোন কালেই কোন অবস্থাতেই রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন না। কৃষকের মুক্তি দেশের রাজনীতির বাইরে যে কখনো সম্ভবপর নয় এ সত্যটি বই পড়ে শেখেন নি তিনি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে নিজে নিজেই লাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনবার জন্য যে প্রয়োজন বাংলাদেশের কৃষককে ষাট বাষট্টি হাজার গ্রামকে সংগঠিত করা মুহূর্তের জন্যও তা বিস্মৃত হন নি তিনি। চেষ্টা করেছেন বুঝিয়ে দিতে অন্য সবাইকে। তিনি সংস্কারক ছিলেন না। বিপ্লবী ছিলেন।

ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা নিয়ে জ্ঞানী বলে বিখ্যাত অনেকে হাসি-ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন, সন্তোষে বসে মওলানা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন তাঁর কাছে অলৌকিক কোন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আছে কি? লুকিয়ে রেখেছেন কি সেই আমোঘ অস্ত্র তিনি তাঁর দোচালা ঘরে মাচানের নীচে! সাম্রাজ্যবাদকে পাবেন কোথায়? সে কি বসবাস করে সন্তোষের বনে-জঙ্গলে? এরা, এই পরিহাসকারীরা হয় মূর্খ নয়তো প্রতারক। হয় তারা সাম্রাজ্যবাদকে চেনেন না, লক্ষণ ও কারণের মধ্যে ভেদাভেদ নির্ণয় করতে পারেন না নয়তো তারা জেনেও মিথ্যা কথা বলেন প্রতারণার অভিলাষে। মওলানা জানতেন সাম্রাজ্যবাদের চেলা-চামুণ্ডা, এজেন্ট, চাকর-নফর দেশের সর্বত্র আছে।

www.pathagar.com

শাসকদের পেছনেও সাম্রাজ্যবাদীরা আছে। কৃষকের দুর্দশা যে নিরানন্দ দশা, উৎপাদনের অনগ্রসরতা জীর্ণ স্বাস্থ্য, তার কারণও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা। এবং সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট এলাকা যে নেই তাও জানতেন তিনি। কোন প্রাঙ্গণ বা প্রান্তর নেই ঘেরাও করা লাল নিশান টানানো যেখানে সাম্রাজ্যবাদের সংগে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রই যুদ্ধক্ষেত্র। সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যথার্থ যে যুদ্ধ সে যুদ্ধের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী না হয়ে কোন উপায় নেই। আর অস্ত্র! সে অলৌকিক নয় যান্ত্রিকও নয়, অস্ত্র হচ্ছে সংগঠিত জনশক্তি অর্থাৎ গণ-আন্দোলন যার নায়ক ছিলেন মওলানা ভাসানী।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে গ্রাম্য, সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন এলাকাভিত্তিক করে রাখার যে অভিপ্রায় তা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যায়। সেইজন্য সাম্রাজ্য-বাদ চায়, চক্রান্ত করে কৃষককে দেশের বৃহত্তর রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখতে। ঐ বইতে 'মাও সেতুঙের দেশে'তে মওলানা লিখেছেন, 'সমাজ জীবনকে কলুষিত, অনটন জর্জরিত এবং দুর্নীতির পঙ্কে ডুবিয়ে রাখা সাম্রাজ্যবাদীদের একটি কৌশল। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে যদি কেবল অসহায় ও দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করার কাজে ব্যাপৃত রাখা যায় তবে তারা আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পাবে না। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কৃষক শ্রমিকদের উদাসীন রাখা গেলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখা সহজ ও সম্ভব হয়। কারণ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী যদি পারিপার্শ্বিক বঞ্চনা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও দেশীয় তল্পীবাহকদের শাসন ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। আমাদের আজিকার দুর্বিসহ অবস্থার মূল এখানেই।' এই বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করবে কে, মূর্খ ও প্রতারক ছাড়া?

মওলানা ভাসানী গণ-আন্দোলনের নায়ক ছিলেন, রাজনীতিক ছিলেন না তিনি প্রচলিত অর্থে। এই কথাটা জিন্নাহ সাহেবও নাকি বলেছিলেন এম. এইচ. ইস্পাহানীকে—যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। 'কায়েদে আজম ঃ অ্যাজ আই নিউ হিম' বইতে উল্লেখ আছে সেই ঘটনার।

১৯৪৭ সালে জিন্নাহ সাহেব আসামে এসেছিলেন। সিলেট এসে মওলানা ভাসানী দেখা করেন তাঁর সংগে। মওলানা তখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। আসামের মুসলমানদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান

www.pathagar.com

আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিলেন তিনি, সেই সংগে বর্ণনা দিলেন মুসলমানদের উপর অকথ্য, অতি ঘৃণ্য অত্যাচারের। বলতে বলতে এক পর্যায়ে সুতীব্র বেদনায় মওলানা কেঁদেই ফেললেন, সকলের সামনে। ইস্পাহানী লিখেছেন, 'মওলানার গভীর আন্তরিকতা আমাকে অভিভূত করল, আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল অশ্রু সম্বরণ করা।'

'পরে, ডিনারের আগে মওলানার কথা তুললাম আমি কায়েদে আজমের কাছে' ইস্পাহানী বলেছেন। ইস্পাহানী প্রশংসা করছিলেন মওলানার। জিন্নাহ সাহেব কিন্তু বললেন ভিন্ন কথা। বললেন, 'মওলানার মত লোকেরা নেতা হওয়ার যোগ্য নয় মোটেই। রাজনীতিতে বাজে ভাবালুতা ও আবেগের কোন স্থান নেই। ... ... বুঝলে হে রাজনীতি হল দাবার খেলা ... তার জন্য প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম, সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। —জিন্নাহ সাহেবের মত।'

এই যে পার্থক্য মওলানাতে জিন্নাহতে এতো শুধু দু'জন লোকের মধ্যকার দূরত্ব নয়, ব্যবধান নয় কেবল পোশাকের অথবা ভাষার। পার্থক্য দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জীবন পদ্ধতির। দ্বন্দ্ব দু'টি বিপরীত জীবন দৃষ্টির তথা আদর্শের।

মওলানার কাছে রাজনীতি মোটেই দাবা খেলা ছিল না। কোন খেলাই ছিল না। দাবাড়ু নন তিনি, আন্দোলনকারী; রাজনীতি তাঁর কাছে যেমন দেশের কৃষক-শ্রমিকের কাছে বাঁচা-মরার সংগ্রাম। হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন তিনি মানুষের মুখে, সেই জন্যই তো প্রকাশ্যে অমন করে কেঁদেছিলেন তিনি সেদিন। তাঁর রাজনীতি খেলার রাজনীতি নয়। সে রাজনীতির অবস্থান নয় বড় লোকদের, নবাব নাইট উকিল-ব্যারিস্টারদের বসবার ঘরে। তাঁর রাজনীতি অবস্থান করে মাঠে, রাজপথে মিছিলে, ঘেরাওয়ে। রাজনীতিকে তিনি টেনে বের করে এনেছিলেন প্রকাশ্যে, উন্মুক্ত ময়দানে।

আর পরিশ্রম, সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথাই যদি বলি তবে দাবা খেলায় এসব গুণের কি প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন খেলোয়াড়রাই বলতে পারবেন ভালো, কিন্তু মওলানার মধ্যে এ সকল গুণের, পরিশ্রমের, সাহসের ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিন্দুমাত্র অভাব যে ছিল না সে কথা তাঁর শত্রুপক্ষই বরঞ্চ বেশী করে স্বীকার করবেন। কেননা এই ব্যক্তিটি যদি আরো কিছু কম পরিশ্রমী, কিছুটা কম সাহসী, কিছু পরিমাণে শিথিলচিত্ত হতেন তবে তাঁরা নিশ্চিন্তে থাকবার সুযোগ পেতেন আরো বেশী। মওলানার

www.pathagar.com

পরিশ্রম, সাহস ও প্রতিজ্ঞার উৎস বলাই বাহুল্য, খেলায় জেতার খেলোয়াড়ী ইচ্ছার মধ্যে ছিল না সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার কঠিন অভিপ্রায় অর্থাৎ উৎসটা নৈতিক, আবেগের দ্বারা তা স্পন্দিত।

রাজনীতির ঐ দুই ধারা। একটি দাবা খেলার মত ব্যাপার, সে বুদ্ধির, চালের কৌশলের। অপরটি সংগ্রামের সাধনার, জেলের জুলুমের, অনশন ধর্মঘটের। জিন্নাহ সাহেব বলেছেন, মুসলিম লীগে মওলানার মত নেতার কোন স্থান নেই। এত বড় সত্য কথা একদিকে মুসলিম লীগ এবং অন্যদিকে মওলানা সম্বন্ধে আর হয় না। মওলানা সেদিন সভাপতি ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগে তিনি আর থাকেন নি, থাকতে পারেন নি, সম্ভব ছিল না থাকা। কেননা মুসলিম লীগ যেমন মুসলিম লীগই মওলানাও তেমনি মওলানাই। দুই বিরোধী ধারার প্রতিনিধি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে মিলন নেই, বিরোধ আছে।

এ কথাতেও এক কণা মিথ্যে নেই যে, মওলানার রাজনীতিতে আবেগের ও অনুভতির অভাব কোনদিন হয় নি! বরঞ্চ এটাই তো সত্য কথা যে, তিনি এদেশের আবেগের প্রতিনিধি। আবেগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আবেগকে সংগঠিত করে রূপ দিয়েছেন রাজনীতিতে।

অন্যরা তা চান নি। তাঁরা খোঁজ করেন নি আবেগের। উল্টো তাঁরা উপেক্ষা করেছেন আবেগকে, অবদমিত শৃংখলিত করতে চেয়েছেন তার প্রবাহকে। এর কারণ আছে। কারণ বঞ্চিত মানুষের আবেগ স্বভাবতই ক্ষমতার শত্রু, স্বাভাবিক নিয়মেই তা বিদ্রোহী। মওলানা সমগ্র জীবনভর বিদ্রোহী ছিলেন, যেমন বিদ্রোহী ছিলেন নজরুল ইসলাম। একজন রাজনীতিতে, অপরজন সাহিত্যে। মানুষের বঞ্চনা তাঁরা উভয়ে দেখেছেন। ক্ষমতা ছিল না উপলব্ধিকে অবদমিত করেন। তাই আবেগের উদ্বেলিত শক্তিকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তাঁরা অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের পটভূমিতে ও প্রস্তুতিতে অকিঞ্চিৎকরতা ছিল। স্বাভাবিক ছিল তাঁদের পক্ষে সংখ্যাহীন মানুষের স্রোতে একটি সংখ্যা হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। তাঁরা তা হন নি। আবেগ তাঁদেরকে অসামান্য করল, করল সাহসী, বিদ্রোহী, করল বিপ্লবী।

চীন ভ্রমণ সংক্রান্ত ঐ ছোট্ট বইটিতেই মওলানা লিখেছেন, চীনে মাও সেতুঙের যে সকল বাণীর জনপ্রিয়তা তিনি লক্ষ্য করেছেন তার একটি হলো, 'চূড়ান্ত বিচারে মার্কসবাদের আগমন সত্যকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা

www.pathagar.com

যেতে পারে—'বিদ্রোহ ন্যায়সংগত'। মওলানাও তাই বলেন। তাঁর সমগ্র জীবনধারা তাই বলে, বিদ্রোহ ন্যায়সংগত, যদিও তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না একজন।

রাজনীতির মত মধ্যবিত্ত সাহিত্যও আবেগকে ভয় করে। তাইতো মধ্যবিত্ত সাহিত্যে একাকীত্বের কথা, হতাশার কথা, আত্মকরুণার বিলাপ এত বেশী করে শুনি। আবেগকে ভয় পায়, তাকে পাশ কাটিয়ে যায় বলেই সে সাহিত্যের এমন ভীষণ দুর্গতি। তার নিজের মধ্যেই প্রাণ নেই, অন্যকে সে প্রাণবন্ত করবে কেমন করে! অথচ আবেগ তো অসামান্য এক পুঁজি, সে অপ্রযুক্ত অব্যবহৃত পড়ে আছে, আর সেইজন্যেই তো আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা নৈতিক অগ্রগতি অদ্যাবধি এমনভাবে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত।

আবেগের নিজস্ব একটা ভাষাও আছে। সে ভাষা নজরুল ইসলাম জানতেন, জানতেন মওলানা ভাসানী। খুব কম লেখক ও রাজনীতিক জেনেছেন সেই ভাষা। আয়ত্ত করতে পেরেছেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রে। সেখানে তাঁদের আরেক ব্যর্থতা।

মওলানা প্রতীক ছিলেন তারুণ্যের। প্রতীক ছিলেন আশার। তারুণ্য সব সময় বয়সনির্ভর নয়। এদেশের সমাজ ব্যবস্থা এমনই নিষ্ঠুর যে তারুণ্যের কাছ থেকে সে অল্প সময়েই কেড়ে নেয় তরুণের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তার তারুণ্য। মওলানার তারুণ্য কোনদিন নষ্ট হয় নি। সেইজন্য তরুণের কাছে তাঁর অবদান ছিল অবিনশ্বর। মওলানা আশারও প্রতীক, কেননা তাঁর জীবনের মূল কথা, প্রধান সত্য হচ্ছে সংগ্রাম।

মওলানা ভাসানী চলে গেছেন। পেছনে রেখে গেছেন মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের এক অসামান্য জীবনকে, একটা বড় আন্দোলনের অংশ তিনি। সে আন্দোলন যত এগুবে ততই তাৎপর্যপূর্ণ হবে তাঁর জীবনস্মৃতি।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মসউদ খান

সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিক মওলানা ভাসানী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ব্যক্তিত্ব যেমন ছিল বিরাট ঠিক তেমনি বৈচিত্র্যময়। প্রায় শতাব্দী দীর্ঘ জীবনের ৭৫ বছরই ছিলেন তিনি এ উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংগনে এক শক্তিমান পুরুষ। তাঁর অন্ধ অনুসারীর যেমন অন্ত নেই, তেমনি অন্ত নেই তাঁর অন্ধ বিরুদ্ধ-বাদীরও। জীবনে তিনি ছিলেন বিতর্কিত, রহস্যময়, মরণের পরও তাই থেকে গেছেন। তাঁকে বোঝার চেয়ে ভুল বোঝাই হয়েছে বেশী।

মওলানা ভাসানীর জীবনের সাতষট্টি বছর কেটেছে বৃটিশ-ভারতের নাগরিক হিসেবে। পরবর্তী চব্বিশ বছর তিনি ছিলেন পাকিস্তানের বাসিন্দা এবং শেষ পাঁচ বছর কাটিয়েছেন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রবীণতম রাজ-নীতিবিদ হিসেবে। পরাধীন ভারত থেকে স্বাধীন পাকিস্তান—স্বাধীন পাকিস্তান থেকে সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ দীর্ঘ পথযাত্রায় ভাসানী ছিলেন বরাবরই জনতার কাফেলার পুরোভাগে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম কাতারের নেতা মওলানা ভাসানী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম প্রতি-ষ্ঠাতা এবং সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। পঁচাত্তর বছরের রাজনৈতিক জীবনে প্রায় ত্রিশ বছরই তাঁর কেটেছে জেলে অথবা অন্তরীণ অবস্থায়।

১৮৮০ সালে বৃটিশ-ভারতের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ধান-গড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছিল হাজী শরাফত আলী খান। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই ও এক বোন। ছ'বছর বয়সেই তিনি পিতাকে হারান এবং এগার বছর বয়সের মধ্যেই একে একে তাঁর সব ভাই-বোন মারা যান। মা পরে আরো কয়েক বছর বেঁচেছিলেন। ইয়াতীম আবদুল হামিদ খানের লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে তাঁর চাচাদের উপর। চাচারা তাঁকে সিরাজগঞ্জের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু পড়াশুনায় অমনোযোগী দুরন্ত আবদুল হামিদ খানকে

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত পীর সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর সাহচর্যে চলে যেতে হয়। বোগদাদী সাহেবের মাযার আসামের জলেশ্বরে। যতটুকু মনে হয় আবদুল হামিদ খানের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক উপাদান ঐ পীর সাহেবের খান-কাতেই সংগৃহীত হয়েছিল। পীর বোগদাদীর সাথে সম্পর্ক থাকাবস্থায়ই তিনি উত্তর ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় চলে যান এবং সেখানে অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা মওলানা মাহমুদুল হাসান ও মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর সাহচর্যে অবস্থান করেন। ঐ সময়ে তিনি দিল্লীতে মওলানা মোহাম্মদ আলীর সংস্পর্শেও আসেন। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাহচর্য ও অভিজ্ঞতা আবদুল হামিদ খানের জীবনে বিস্তৃততর দিগন্ত উন্মোচনের সহায়ক হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর এদেশে বৃটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের অন্যতম ধারা হিসেবে হক্কানী ওলামা ও পীর-দরবেশরা জাতীয় অস্তিত্বের শেষ অবলম্বনটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য স্থানে স্থানে ধর্ম-প্রচার, শিক্ষা ও জনকল্যাণের মিশন গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁদের কর্মপ্রয়াস শুধু ধর্ম প্রচার ও সংস্কারমূলক তৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না—সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনেও তাঁরা প্রয়াসী থাকতেন। এমন কি সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার, শোষণ ও জুলুমের অবসানকল্পে অস্ত্র ধারণ করতেও তাঁরা পিছ-পা হতেন না। ফকির মজনু শাহ, হাজী শরিয়তুল্লাহ, পীর বাদশা মিয়া, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীও ছিলেন এ ধারারই সাধক।

বৃটিশ-ভারত ছিল এক ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী সমাজ। জমিদারী প্রথা, সুদখোরী ও মহাজনী ব্যবসা এদেশের গ্রামীণ সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপেছিলো। শোষণ আর দমন নীতির যাঁতাকলে জনজীবন ছিল পিষ্ট! এ হেন পরিস্থিতিতে পীর-দরবেশরাই ছিলেন শোষিত অবদমিত সর্বহারা মানুষের আশা-ভরসার স্থল। সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর যোগ্য শিষ্য আবদুল হামিদ খান সে ঐতিহ্যের ধারায়ই মানুষের আত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

মওলানা ভাসানীর গোটা জীবনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়ঃ

১. কর্ম-জীবনের শুরু থেকেই তিনি সামাজিক জুলুম, অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক দমননীতির বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তাই আমরা

www.pathagar.com

তাঁকে কখনো দেখতে পেয়েছি বাংলা-আসামের স্থানে স্থানে জমিদার, সুদখোর শোষক মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, কখনো বা উপনিবেশবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায়, খিলাফত আন্দোলনে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

২. পাকিস্তান যুগে আমরা তাঁকে দেখেছি জনগণের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাতারে, মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের সংগ্রামে। পরিশেষে আমরা তাঁকে দেখেছি সবার আগে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী তুলতে।

৩. মওলানা ভাসানীকে আমরা আরো দেখেছি মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে প্রয়াসী তৎপরতায় ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিচরণ করতে। স্টকহল্ম ও হাভানা শান্তি সম্মেলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কন্ঠরূপে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের এক নম্বরের দুশমনরূপে।

৪. বাংলাদেশ আমলে এ দেশের মানুষের ধর্ম ও তাহজীব-তমদ্দুনবিরোধী আগ্রাসনের মুকাবিলায় মওলানা ভাসানীই ছিলেন প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ— জানবাদ মুজাহিদ। তাঁকে দেখেছি স্বৈরতন্ত্রের এক নম্বরের শত্রুরূপে নব্য আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে জনগণের জঙ্গী কাফেলা ফারাক্কা মিছিলের অগ্রনায়করূপে।

৫. সর্বোপরি আমরা তাঁকে দেখেছি আজীবন অটল বিশ্বাসী মুমিন, জাহেদ-মুজাহিদের জীবন যাপন করতে। সংসারে থেকেও ষোল আনা সংসার বিরাগীরূপে। ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি, দেনা-পাওনার তোয়াক্কা না করে মুমিন মুসাফিরের জীবন যাপন করে যেতে।

মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের কর্তব্য দ্বিবিধ ঃ হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা।

১. ঈমান ও এখলাসের সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করার নামই হক্কুল্লাহ আদায় করা। যথা ঃ সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, তসবীহ তেলাওয়াত ইত্যাদি।

২. আল্লাহ্‌তে ঈমান মানুষের উপর সকল সৃষ্টির প্রতি কতিপয় কর্তব্য বর্তায়। যথা ঃ নির্ভয়ে হক কথা বলা, দুঃস্থ-দরিদ্রের সেবা করা, জুলুম,

www.pathagar.com

শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতেল ও জুলুম অবসানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। এ সবের নামই হক্কুল এবাদ আদায় করা।

মওলানা ভাসানী সারা জীবন অত্যন্ত সচেতনভাবে উপরিউক্ত নীতিমালা অনুশীলন করার চেষ্টা করেছেন। হক্কুল এবাদ আদায়ের লক্ষ্যে তিনি ঃ

১. বিজ্ঞপ্তি, বুলেটিন, পত্র-পত্রিকা, সম্মেলন, সভাসমিতির মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও হক কথা প্রচারের চেষ্টা করেছেন।

২. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জুলুম-শোষণ অবসানের জন্য তিনি আজীবন সামাজিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীসমূহ কৃষক, শ্রমিক, মেথর, মুচি, জেলে, তাঁতী ও দিন মজুরদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

৩. উপরিউক্ত আন্দোলনমূলক তৎপরতার পাশাপাশি যখনি যেখানে সুযোগ পেয়েছেন মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, মুসাফিরখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, পশু হাসপাতাল, খাল-পুকুর খনন, সমবায় সমিতি গঠন প্রভৃতি সার্বজনীন কল্যাণমূলক কাজ করার চেষ্টা করেছেন। আসামের ঘাগমারী, বগুড়ার মহিপুর, রংপুরের ভুরুঙ্গামারী এবং টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রভৃতি এলাকা এ সমস্ত কাজের স্বাক্ষর বহন করছে।

তাঁর রেখে যাওয়া কর্মধারা অব্যাহত রাখা এবং এ সমস্তকে বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য মওলানা ভাসানী জীবন-সায়াহ্নে সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং খোদাই খিদমতগার সংগঠন রেখে গেছেন।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চেতনাভিত্তিক কর্মসূচীর উর্ধ্বে মওলানা ভাসানীর কি কোন বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল? ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্বাস এবং সে অনুযায়ী কিছু তৎপরতা সে তো অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা। এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজে থেকে দিতে পারবো না। চেষ্টাও করবো না। ১৯৭৪ সালে হুকুমতে রব্বানীয়া সমিতি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে 'রবুবিয়াতের ভূমিকা'

www.pathagar.com

শিরোনামযুক্ত পুস্তিকায় মওলানা ভাসানী নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন ঃ

'সে ১৯৪৬ সালের কথা। রাত তখন বারটা। বিপ্লবী দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানী ধুবড়ীর (আসাম) একটি ঘরে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিতেছেন। আমি নিশ্চুপ হইয়া তাঁহারই সামনে বসিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ তিনি আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও আমার ডান হাতখানা সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্রটির উপর রাখিয়া বলিলেন, মনে কর ইহাই কাবা। আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু এই দার্শনিকের উন্মাদনা আমার জানা ছিল। তাই বলিলাম, হাঁ, ইহাই কাবা ঘর। আল্লামা বলিলেন, তবে আজ ওয়াদা কর--তুমি রাজনৈতিক জীবনে যত কলাকৌশলই লও না কেন মূলত হুকুমতে রব্বানীয়া কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম করিয়া যাইবা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা হাসরত মোহানী, মওলানা ওবায়দীর কথা। আমার মনে পড়িল খিলাফত আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর সাহচর্যের কথা। আমি দেখিলাম, যৌবনের উচ্ছ্বাস শেষে যে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম আজ প্রৌঢ় জীবনে সেই রাজনৈতিক দর্শনের দাওয়াতই আসিয়াছে। আমি তাই ইতস্ততঃ করিলাম না। মওলানা আজাদ সোবহানীর হাতের উপর আমার হাত ছিল। তাঁহার কল্পনায় আমাদের হাত কাবাতে নিবদ্ধ ছিল। আমি বলিলাম, হাঁ, ওয়াদা করিলাম, রাজনীতিতে যা কিছুই করি হুকুমতে রব্বানিয়া হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইব না।

দীর্ঘ ২৭টি বছর কাটিয়া গিয়াছে। আজ আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে চাই না কিভাবে আমি ধাপে ধাপে হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের পথে চলিয়া আসিয়াছি। অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন কোন ভাষ্যকার যদি আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে দেখিবেন ১৯২১ সাল হইতে আমি এই পথ ধরিয়াছি। কখনো কোথাও আমি কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি। কোথাও আবার নেতৃত্ব দান করিয়াছি। আজ আমি পরিষ্কার ভঙ্গিমায় শুরু করিয়াছি হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের প্রস্তুতি। তাই গত ৮ই এপ্রিল (৭৪) সন্তোষে হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সবারই মনে প্রশ্ন জাগে, এতদিনে কেন? আমি বিশ্বাস করি, সব কথা ও কাজের একটি মৌসুম আছে। যদি তাহা মৌসুম মাফিক মানুষের নিকট পেশ করা না হয় তবে অতীব

www.pathagar.com

কল্যাণকর বিষয়ও অর্থহীন এবং গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) বলিয়াছেনঃ যদি কোথাও আজান দ্বারা মানুষকে নামাযের দিকে না আনা যায় তবে ঢোল-সহরতই বাজাও। বাংলাদেশের মানুষ বস্তুত ঘুমাইয়াছে। এতদিন ঢোল-সহরতে ঘুম ভাঙ্গিত। আজ আযানেই ভাঙ্গিবার অভ্যাস হইয়াছে। তাই আমি হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্যে আহ্বান জানাইতেছি আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম।

হুকুমতে রব্বানিয়ার মূলকথা—আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন। এই সমিতি সমাজতন্ত্রবাদীদের মত কেবল লা-ইলাহা-ই কায়েম করিবে না, সেখানে ইল্লাল্লাহ্‌র বীজ বপন করিবে। তাহাদের কোন কাজে আত্মতুষ্টি অর্থাৎ নফসানিয়া যখন থাকিবে না ঠিক তেমনি অহেতুক বৈরাগ্য অর্থাৎ রাহবানিয়াতও থাকিবে না। এই সমিতি যেমন হক্কুল্লাহ আদায় করিবে, ঠিক তেমনি হক্কুল এবাদও করিয়া যাইবে। সৃষ্টিকে ভালবাসিয়া, সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিয়া তাহারা রবের ঐশী পালনবাদকে পার্থিব ভঙ্গিমা দান করিবে। তাই এই সমিতি মানুষের যেমন বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইবে সংগে সংগে তেমনি আত্মিক শক্তির বিকাশও ঘটাইবে। তাহারা একই সঙ্গে জাহের ও বাতেনের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া জীবনকে প্রাণময় করিয়া তুলিবে। তাহারা একই সঙ্গে জাহেদ ও সালেবেতর সালেকের রূপরস লাভ করিয়া আবাদিয়াতের হক পূর্ণ করিবে।

সকল সমস্যার সমাধান হইবে মানব জাতি যদি রবুবিয়াতের অর্থাৎ স্রষ্টার পালনবাদের আদর্শ হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েম করিতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-পরা ইত্যাদির প্রশ্নে স্রষ্টার নিকট যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান ইত্যাদি পরিচয়ের কোন বালাই নাই—মানুষের দৈহিক ও আত্মিক চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন ভেদাভেদ নাই ঠিক তেমনি হুকুমতে রব্বানিয়ায় সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া হইবে। আজ আর কোন সন্দেহ নাই—একমাত্র রবুবিয়াতের আদর্শই মানুষে মানুষে শাসন, শোষণ ও হানাহানি বন্ধ করিয়া মানব জাতিকে সুখী করিতে পারে।’

মওলানা ভাসানী সারা জীবন হক্কুল্লাহ্‌র সাথে সাথে হক্কুল এবাদ আদায় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলগত লক্ষ্য ছিল হুকুমতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে সন্তোষ থেকে প্রকাশিত আল-কুরআনের আয়াত 'তোমরা রব্বানী হইয়া যাও' শিরোনামযুক্ত পুস্তিকায় মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনব্যাপী রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার নির্যাস এভাবে রেখে গেছেন ঃ 'আমার বিগত ৭৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার হাতবদল কখনও বা অতি নিকট হইতে কখনো কিঞ্চিৎ দূর হইতে অবলোকন করিয়াছি। এই পর্যায়ক্রমিক পট পরিবর্তনের ধারায় আমি নিজেও সাধ্যমত সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছি। কিন্তু যে কৃষক, মজুর, কামার-কুমার, জেলে-তাঁতী-মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আবাল্য দেখিয়াছি এবং সেজন্য সংগ্রাম করিয়াছি তাহা আজও সুদূরপরাহত রহিয়া গিয়াছে। ....বাংলাদেশ যুগে আমার মর্মভেদী অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কেমন করিয়া রক্তের সাগর সাঁতরাইয়া এবং আগুনের পাহাড় ডিঙ্গাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া একটি জাতি ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্বের দোষে মাত্র তিন বছরের মধ্যে দুঃখ ও দুর্দশার অতলে তলাইয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা আমার চিন্তায় ও চেতনায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি আদর্শবোধবর্জিত শ্লোগানধর্মী ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠন মানুষের সাবিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে না। গভীর আদর্শবোধসম্পন্ন, দৃঢ় চরিত্রবান এবং আপোষহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ সুগম করিতে পারেন। চরিত্র গড়িয়া উঠে আদর্শ চেতনা ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে। একমাত্র আদর্শভিত্তিক সংগঠন ও কর্মসুচীর মাধ্যমেই চরিত্রবান নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি হইতে পারে। মুহূর্তের উত্তেজনায় মানুষ চরম আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে হয়তো, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া ধন-দৌলত হাতের মুঠায় পাইয়া তাহারাই শুধু ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার পথে অটল থাকিতে পারিবে যাহারা সঠিক আদর্শবোধ ও উহার দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারিয়াছে।' তিনি আরো বলেছেন, 'রাজনীতির অর্থ ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নানা ভাওতা ও শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি দ্বারা অতি সহজে বিশ্বাসপ্রবণ দরিদ্র জনগণকে ভুলাইয়া ক্ষমতা দখল করিয়া নিজের ও আপন জন ও সাঙ্গপাঙ্গদের আখের গুছাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাহারা রাজনীতি করে না। নফসানিয়াত (আত্মস্বার্থের) পূজা করে ইহা তাহাদেরই ধর্ম। অপরপক্ষে যাহারা রব্বানিয়াতের অনুসারী

www.pathagar.com

তাহাদের রাজনীতি হইতেছে এমন একটি মহৎ কর্মপ্রয়াস যাহার লক্ষ্য সমাজ হইতে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা। সমাজে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা তথা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা।'

মওলানা ভাসানী রাজনীতি করতেন। কিন্তু সে রাজনীতির উৎস ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। রাজনীতিকে তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত জ্ঞান করতেন। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে সকল প্রকার নকল প্রভুর বিভ্রান্তি ও জুলুম-শোষণ থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন ন্যায়নীতি ও সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য। এরই নাম রব্বানী রাজনীতি। তাই দেশে-বিদেশে যখনই যেখানে শোষণ, জুলুম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে বজ্রকন্ঠে আওয়াজ তুলেছেন।

একটা নতুন সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতিতে যাঁরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজমান অনাচার, অবিচার, শোষণ-জুলুমের অবসান কল্পে প্রচেষ্ট থাকেন তাঁরাই তো সমাজ-সংস্কারক। মওলানা ভাসানী আজীবন সে চেষ্টাই করে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিক ও সমাজ-সংস্কারক।

www.pathagar.com

মওলানা আবদুল মতীন

অপরাজেয় মওলানা ভাসানী

আফ্রো-এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকা তথা এই উপমহাদেশের কৃষক-শ্রমিক, মুটে-মজুর, কামার-কুমার, জেলে তথা সর্বহারা মজলুম মানুষের মহান নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ঘটনাবহুল সংগ্রামী জীবন তথা একটি শতাব্দীর ইতিহাসের মূল্যায়ন করা আমার মত হুজুরের একজন নগণ্য খাদেমের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আমি আমার দৃষ্টিতে তাঁকে যেভাবে দেখেছি, তারই কিছু সারসংক্ষেপ নিবন্ধে উদ্ধৃত করতে চাই।

আমার মনে হয় রাজনৈতিক জীবনে তিনি মূলত নিজের উপর এবং প্রথমত জনগণের উপরই নির্ভর করতেন। এজন্যেই তিনি রাজনীতিবিদদের স্বভাবসিদ্ধ প্রথাগত বৈঠক, প্রস্তাব গ্রহণ, শলাপরামর্শ ইত্যাদিতে ব্যস্ত না রেখে দেশ ও জাতির সংকটকালে সাধারণ সংগঠক হিসেবে শহর, বন্দর, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। কারুর জন্যে অপেক্ষা না করেই জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনকে ভরসা করে রাজপথে নামতেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁকে প্রায়শই ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হলেও অভাবনীয় রাজনৈতিক সফলতা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিইঃ ডিআইটির কাছ থেকে বঙ্গ ভবনের রাস্তা ছিল জনসাধারণের জন্যে নিষিদ্ধ। উনসত্তরের গণআন্দোলনের এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী বায়তুল মুকাররম থেকে ঘোষণা দিয়েই জনতার ঢল নিয়ে হেঁটে গেলেন বঙ্গভবনের সামনে দিয়ে।

দু'পাশে কাঁটাতারের ব্যারিকেড, সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা কোন কিছুই এই সংগ্রামী বর্ষীয়ান নেতা ও জনতার ঢলকে আটকাতে পারল না। মওলানা ভাসানীকে এ কাজ থেকে বিরত করার কোন সাহস বা ঔদ্ধত্য সেদিন কারো হয় নি। আর সেই থেকে অঘোষিতভাবেই বঙ্গভবনের সামনের রাস্তা জনসাধারণের চলাচলের জন্য চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর ৯৬ বছর বয়সে মৃত্যু-বরণ করেন। তাঁর ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবন উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সংগ্রামী, আবার সাথে সাথে বিতর্কিত অধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন এদেশের ভুখা-নাংগা, শোষিত, সর্বহারা মেহনতি মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তি তথা প্রত্যেকটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে স্বাধীনতার স্বাদ ঘরে ঘরে পৌঁছানোর স্বার্থেই করা দরকার। উপমহাদেশের বিভিন্ন বৃটিশবিরোধী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, আসামের বাঙালী কৃষক মজদুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য সংগ্রাম ১৯৪৮ সালের পর থেকে তদানীন্তন পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধী দল গঠন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উত্তরণ ও স্বাধীনতা উত্তরকালের সর্বস্তরের জনগণের আওয়ামী-বাকশালী আমলের স্বৈরাচার, দুর্নীতি-অপশাসনবিরোধী, বিশেষ করে মার্কিন সামাজ্যবাদ এবং সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ও সম্প্রসারণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ও নেতৃত্ব, তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুকে মুক্ত মন নিয়ে সঠিকভাবে বিচার করতে হবে।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন পীর, একজন ধর্মীয় নেতা, মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল সর্বহারা মাটির মানুষের নেতা। ওফাতের আগে শেষদিকে যখন মস্কোপন্থী, পিকিংপন্থী, নকশালপন্থী সকল বামপন্থী কম্যুনিস্ট হুজুরকে ছেড়ে চলে গেছে, তখন ন্যাপকে বাদ দিয়ে রবুবিয়াত তথা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার রাজত্ব কায়েম, খোদায়ী খিদমতগার নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। কিন্তু মওলানা ভাসানীর কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। তিনি প্রথম থেকেই যা বলে এসেছেন, তারই ধারাবাহিক পরিক্রমার চূড়ান্ত পর্যায়। কম্যুনিস্ট না হওয়া সত্ত্বেও কেন কম্যুনিস্টরা তাঁর সাথে ছিল এবং কিভাবে তাঁর আশ্রয়ে থেকে অগ্রসর হতো কিংবা তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছে তার আলোচনা এ নিবন্ধে করতে চাই না।

সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এদেশের অন্যান্য পীর

www.pathagar.com

মওলানা, ধর্মব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতিকদের সাথে তাঁর সুস্পষ্ট পার্থক্য কোথায় ?

ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল জালেম ও জুলুমের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী, অকুতোভয় ন্যায় ও সত্যের সৈনিক মওলানা ভাসানী প্রায়শই বলতেন ঃ খাঁটি মুসলমানের মৃত্যু হয় মাত্র একবার। আর সেটা কখন, কোথায়, কি অবস্থায় হবে তা শুধু আল্লাহ্‌তা'আলাই জানেন।

এই প্রসংগে একটা কথা শুধু উল্লেখ করতে চাই। যদিও পরিণত বয়সেই হুজুরের ওফাত ঘটেছে, তবুও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল কিনা সে নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে যার জবাব আজ পর্যন্ত কেউই দেয় নি। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সময় এখনো আসে নি, আমি শুধু প্রশ্নটিই রেখে গেলাম।

অন্যান্য আলোচনার আগে মওলানা ভাসানীর উপর লিখিত খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের বহুল আলোচিত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি দিতে হয়, এই উদ্ধৃতি হুজুরের সার্বিক জীবনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

দেশপ্রেমিকদের সাথে তিনি যেদিন বৃটিশ শাসকদের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন সেদিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন ইসলামের লেবেল আঁটা যে কতিপয় ব্যক্তি খেলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিকে বিঘ্নিত করেছে এবং সরাসরি আজাদী পাগল জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রয়াস পান, তাঁরাই পুরস্কারস্বরূপ রাতারাতি নবাব, নাইট, খান বাহাদুর হয়ে গেছেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে ওরা তখন এক একজন বিরাট স্তম্ভ। বিদেশী শাসকদের এইসব বিশ্বস্ত ভৃত্যদেরকে অন্যান্য দেশ-প্রেমিকদের সংগে সংগে মওলানা ভাসানীও ঘৃণা করতে থাকেন মনেপ্রাণে। সেদিন যেমন তিনি তাঁদেরকে চিনলেন, তাঁরাও চিনলেন এই তরুণ মুক্তিসেনাকে। তাঁরা করতেন মওলানা ভাসানীকে ভয়, আর তিনি করতেন তাদের ঘৃণা আর অবজ্ঞা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মওলানা ভাসানী আরেকবার অবাক হলেন, তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, একদা যাঁরা বৃটিশের গোলামী মজবুত করার

www.pathagar.com

জন্যে নানাবিধ ষড়যন্ত্র চালিয়েছিলেন, বুকেপিঠে দাসত্বের তকমা আঁটা সেই সব নবাব-নাইট, খান বাহাদুরদের অনেকে বুকে ইসলামের লেবেল লাগিয়ে পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসে আছেন।

একদা যাঁদের হাতে স্বাধীনতা আন্দোলন লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের হাতে স্বাধীনতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে কিরূপে? তাঁর প্রশ্ন যে অমূলক নয়, সে প্রমাণ ধীরে ধীরে পাওয়া গেল। দেশের সর্বস্তরের মানুষের ঘরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসে পেঁছুতে পারল না, তদুপরি প্রশ্ন উঠল, পাকিস্তান স্রষ্টা কায়েদ আজমের রহস্যজনক মৃত্যু এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অনুষ্ঠান এবং দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে যাঁরা অপারগ তাঁদের শাসনে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য কোথায়?

এমনি করেই আজাদীর স্বাদ ঘরে ঘরে পেঁছিয়ে দিতে যাঁরা ব্যর্থ হলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের উৎখাতের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মওলানা ভাসানী সামিল হলেন দেশপ্রেমিকদের সংগ্রামী কাফেলায়। মানুষের আজাদী ঘরে ঘরে পেঁছে দেয়ার অংগীকার মওলানা ভাসানীরও। পাকিস্তানের শাসকরা ৭০ বছরের এই নেতাকে অর্থ, ক্ষমতা, পদ মর্যাদা কোন প্রলোভনেই এক ইঞ্চি হেলাতে পারে নি। কারাগারে বার বার নিক্ষেপ করেও তাঁরা দেখেছেন এই পুরুষ সিংহ হিমালয় পর্বতের ন্যায় যেমন অনড় তেমনি অটল। তাঁকে নাড়া দিতে গিয়ে পাকিস্তানের অনেক নেতা নিজেরাই নড়েছেন। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে অনেকে সমূলে উৎপাটিত হয়েছেন রাজনীতির অঙ্গন থেকে।

তদানীন্তনকালে ৭০ বছরের যে মানুষটি জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে, তাঁকে নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে কাবু করা যাবে—এ ধরনের আশা পাকিস্তানের শাসকদের ছিল না। কাজেই ভিন্ন পথে তাঁরা পা বাড়িয়েছেন। কানের কাছে বারবার মিথ্যা কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করে বললে মানুষ নাকি শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সেই মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেয়। থিওরিটি দাঁড় করিয়েছেন হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবল্‌স।

পাকিস্তানের গণ দুশমনরা খবরের কাগজে সভা-সমিতিতে এবং পুস্তক-বিজ্ঞাপন মারফত অনেকদিন অপচেষ্টা চালালেন মওলানা ভাসানীকে অপবাদ দিতে। কেউ বলেন, তিনি কম্যুনিস্ট। কেউ বলেন, ধর্মান্ধ মোল্লা।

www.pathagar.com

এসব অপপ্রচারের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি কখনও। একই গ্রন্থ থেকে তার হুবহু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি ঃ

'ইউরোপের সংবাদ-পত্রে তুমুল বিতর্ক মওলানা ভাসানীকে নিয়ে— কেউ বললেন ঃ 'মিস্টার মুলানা একজন অগ্নিবর্ষী নেতা। তাঁর বক্তৃতায় হলকা বের হয়, আর কেউ বললেন ঃ পূর্ব আকাশের তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। সংগ্রামী জনতার আশা আকাংক্ষার মূর্ত প্রতীক। পুঁজি-পতিরা বললেন, মুলানা 'কম্যুনিস্ট' সাম্যবাদে বিশ্বাসী, কেউ কেউ বলেন, তিনি ইসলামী সাম্যবাদের এক নতুন প্রেরণা, এক নয়া বার্তাবাহক।

তাই লণ্ডনে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন বর্তমান পৃথিবীর মনীষীরা 'মিস্টার মুলানাকে' জানতে। এলেন এটলী। এলেন বিভান। আর এলেন হারবার্ট মরিসন, মরগান ফিলিপস। আর সেই সংগে এলেন নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত দার্শনিক লর্ড রাসেল। আর এলেন বর্তমান ইংল্যাণ্ড-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী 'নিউ স্টেটসম্যান এ্যাণ্ড নেশন' পত্রিকার সম্পাদক কিংসলে মার্টিন। আরো এলেন চিলির বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদা, সোভিয়েত রাশিয়ার কালজয়ী ঔপন্যাসিক ইলিয়া ইরেন বুর্গ। তুরস্কের দার্শনিক কবি নাজিম হিকমত। তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, পাকিস্তানের মাটির মানুষের নেতাকে আগে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, প্রথম দেখলাম।

বিভিন্ন মহলে গবেষণা। কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা প্রচুর। ইতি-হাসের পাতা উল্টে কেউ কেউ প্রচেষ্টা চালালেন মওলানা ভাসানীকে একজন জাতীয়তাবাদী নেতারূপে প্রমাণ করতে। তাঁরা চীনের ডাঃ সান, ইয়াৎ সেন ভারতের মুজাহিদ আন্দোলনের সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, করম চাঁদ গান্ধী, মিসরের জগলুল পাশা, আফগানিস্তানের জামালউদ্দীন আফগানী, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক প্রমুখের সাথে দাঁড় করালেন মওলানা ভাসানীকে। কিন্তু দেখলেন তাঁদের সাথে বিস্তর ব্যবধান। আর পার্থক্যটা মৌলিক। তারপরে টানলেন রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও সেতুং আর ভিয়েতনামের হোচি মিনকে। কিন্তু তবুও ব্যবধান। তাঁদের সংগে মিল নেই পুরোপুরি।

বিলাতের এক কম্যুনিস্ট নেতা মওলানা ভাসানীকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তা'হলে কি চান? মওলানা উত্তর দিলেন ঃ সাম্য-মৈত্রী-

www.pathagar.com

স্বাধীনতা। এ বিষয়ে ব্যাখা দিতে গিয়ে তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র দুনিয়ায় সকল মানুষের সমান অধিকার। আল্লাহ্র নিয়ামত পৃথিবীর ধনভাণ্ডার, জগতের ঐশ্বর্য আল্লাহ্র সৃষ্টির জন্যেই উৎসর্গিত। মানুষ রাজা হয়েছে। মানুষ বিত্তশালী হয়েছে। কিন্তু সেতো অপর মানুষকে শোষণ ও প্রবঞ্চিত করে। মানুষে মানুষে এই যে কৃত্রিম অসাম্য তার জন্য দায়ী যে বিধান আর সমাজ ব্যবস্থা তার উৎপাদন আল্লাহ্রই নির্দেশ। কাজেই অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আল্লাহ্রই হুকুম। তারপর মৈত্রী?

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি। এর চেয়ে বড় সম্মান আর হতে পারে না। কিন্তু সে সম্মানের অবমাননা মানুষ নিজেই করেছে যুগে যুগে। হিটলার মুসেলিনী সে অপমানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তারা শেষ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রেতআত্মারা আজো দুনিয়ার বুকে বিভীষিকা সৃষ্টির অপচেষ্টায় বিভোর। ঐশ্বর্যের ঝলসানি আর প্রতাপের দম্ভে ফ্যাসিস্ট শক্তি দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে আজ জোটের সংগে বেঁধে নিয়ে আবার সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মানুষ আর তার সভ্যতার বিরুদ্ধে যে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ! তারপর স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে মহান অধিকার কারো করা বা দান নয়—সে অধিকার আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন। তাকে হরণ করার স্পর্ধা মানুষ রাখে সত্য। কিন্তু এই স্পর্ধিত মানুষকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতাও আছে মানুষের। তার সাক্ষ্য জর্জ ওয়াশিংটন, লেনিন, মাও-সেতুং প্রভৃতি। আর সাক্ষ্য অগণিত জনতা যাঁরা জুগিয়েছিলেন তাঁদের শক্তি বুকের রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে।

আগন্তুক কম্যুনিস্ট নেতাকে উদ্দেশ্য করে পরিশেষে মওলানা ভাসানী বলেনঃ আমার চিন্তা ও জীবনাদর্শের সাথে আপনাদের মানে কম্যুনিস্টদের যদি মিলে যায় তবে দুঃখিত বা আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। আপনারাও যদি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শত্রুদের সংগে হাত মিলান, তবে আমার হাতে আপনাদেরও রেহাই নেই। কারো নেই। আর আমার আদর্শের সাথে যদি অন্য কারো আদর্শ মিলে যায় এবং আমার সংগ্রামে কেউ যদি শরিক হতে চান গভীর আনন্দে আমি তাঁকে আলিঙ্গন করে নেব।

www.pathagar.com

ফজলুর রহমান খাঁ

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঃ শতাব্দীর নায়ক

মওলানা ভাসানী ছিলেন শতাব্দীর মহীরুহ, মজলুম মানুষের মুক্তি সংগ্রামের নায়ক ও ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ একজন বীর মুজাহিদ। সারা জীবন তিনি অকুতোভয়ে অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। লড়াই করে গেছেন ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও আজাদীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এদেশের মজলুম জনগণের সার্বিক মুক্তির উদ্‌গাতা ও মহানায়ক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও মানবতার মূর্ত প্রতীক। জীবনে অনেকগুলো রাজনৈতিক সংগঠন এবং কৃষক, শ্রমিক, কৃষ্টি, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিরূপে তিনি সকল অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করে গেছেন অক্লান্তভাবে। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের কথা ভুলে দূরে সরে যান নি কোন অবস্থাতেই। তিনি নীতিতে অটল থেকে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য জেল খেটেছেন, গৃহবন্দী রয়েছেন। পালিয়ে থাকতে হয়েছে তবুও নীতিচ্যুত হন নি মওলানা ভাসানী। একজন খাঁটি মুসলমানরূপে তিনি যে কোন অবস্থায় নামায আদায় করতেন পাঁচ ওয়াক্ত। এমন কি দাবী আদায়ের জন্য অনশনরত মওলানা ভাসানীকে গৃহে বা হাসপাতালে শয্যাশায়ী থেকে চরম দুর্বল অবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করতে দেখা গেছে। সভায় বক্তৃতার সময় নামাযের সময় হলে বক্তৃতা থামিয়ে নামায পড়তেন তিনি। দেখা গেছে জ্বরে শয্যাশায়ী, তবুও তিনি রোযা ভঙ্গ করেন নি।

রাজনীতিতে ভিন্নদলের অনুসারী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতাদের প্রতি মওলানা ভাসানীর ব্যবহার ছিল মধুর ও বন্ধুবৎসল, শ্রদ্ধাভক্তিতে অতুলনীয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, চৌধুরী খালেকুজ্জামান, মাহমুদাবাদের রাজা আমীর আহমদ খান, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক,

www.pathagar.com

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মি. সি. আর. দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। অবশ্য কোন না কোন সময়ে এঁদের প্রত্যেকের সাথে মওলানা ভাসানী কাজ করেছেন। উৎকট রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সময়ও তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে মধুর সম্পর্ক রাখতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মওলানা আকরাম খাঁ, ফজলুল হক, চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা ও খবরাদি নিতেন। মুসলিম-ভারতের অতীত কর্মকাণ্ডের উপর তিনি মজলিশে বসে অবসর সময়ে সুন্দর রসালাপ করতেন। এরূপ খোশ মেজাজে মনমাতানো রসালাপ করা অনেক প্রবীণ নেতার চরিত্রেই দেখা যেতো না। একান্ত আলাপে বা জনসভায় বক্তৃতার সময় মওলানা ভাসানী কায়েদে আযম জিন্নাহ সম্পর্কে যেরূপ শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম দেখিয়ে থাকতেন, সমসাময়িক অনেক বিরোধী নেতাই কিন্তু এরূপ সংযম, শালীনতা দেখাতে পারতেন না।

রাজনীতিতে প্রবল মতবিরোধ, দু'জনের অবস্থান দুই বিন্দুতে, তবুও খবরের কাগজে প্রকাশ পেলো কাদিয়ানীবিরোধী দাঙ্গার নেতৃত্ব দানের অপরাধে, অপরাধী সাব্যস্ত করে লাহোরের সামরিক আদালতে, জামাতে ইসলামী নেতা মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ও মজলিস-ই-আরহর নেতা মওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াজী প্রমুখকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দিয়েছে। তখন এই সংবাদ পেয়ে সংগ্রামী নেতা মওলানা ভাসানী নীরব থাকতে পারলেন না। দাবী উঠালেন এসব দণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে। পরবর্তী শুক্রবার তিনি সারা পূর্ব পাকিস্তানে মওদুদী ও কাদিয়ানীবিরোধী অন্য বন্দীদের মুক্তির দাবীতে 'মওদুদী মুক্তি দিবস' পালনের আহ্‌বান জানান।

১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা করার সাথে সাথেই কেন্দ্রের নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন। এর উদ্দেশ্য আরও একটি ছিল, তা হলো জনসংখ্যার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের পূর্ব বঙ্গীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়া।

যেদিন গোলাম মোহাম্মদ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করলেন, সেদিন চলছিল ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা। পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যা বেগম আনোয়ারা খাতুন আনুমানিক বিকেল

www.pathagar.com

তিনটায় সভাস্থলে এসে এই বরখাস্তের খবরটি পেঁছালেন। তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতায় মুসলিম লীগ নেতা প্রধান মন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের শাহাদতের পর প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক লোহার চাদর ঘেরা বেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমালোচনা করছিলেন। এ সময় নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার এ হেন পতনের খবরে সভায় হাসির রোল উঠল। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন মওলানা ভাসানী।

সভাপতির আসন থেকে ত্বরিৎ উঠে এসে তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে, আবেগ-ময়ী ভাষায় ঘোষণা করলেন, 'আধা মরহুম গোলাম মোহাম্মদের এ কাজ অগণতান্ত্রিক। আমি কঠোর ভাষায় এ কাজের নিন্দা করছি ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের আজ করাচি যাবার কথা, তাঁর কাছে আমি আবেদন করছি, যাত্রার কর্মসূচী বাতিল করে আপনি এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আমি আমার আওয়ামী লীগের সকল সাংগঠনিক কাজ বন্ধ রেখে আপনার সাথে স্বৈরতন্ত্র খতমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব।' জনাব নূরুল আমীন ও অন্য লীগ নেতারা মওলানা ভাসানীর এই ডাকে তখন সাড়া দেন নি। সাড়া দিলে হয়তো আজকের পাকিস্তানের ইতিহাস অন্য ধারাতে প্রবাহিত হতো। এতে পাকিস্তানে তখনকার স্বৈরতন্ত্র কায়েম হওয়ার পরিবর্তে গণতন্ত্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার পথই সুগম হতো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও অখণ্ড ভারতপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাহীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলনের ফলশ্রুতি হচ্ছে, বিশাল ভারত দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে বিভক্ত হওয়া। পরবর্তীতে গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরতন্ত্র কায়েম, সংখ্যালঘু অঞ্চল কর্তৃক সংখ্যাগুরু অঞ্চলে নির্যাতন এবং সামরিক একনায়কত্ব পাকাপোক্ত হওয়ার পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কনভেনসন প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রভাবে শুধু ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানেই নয়, সারা বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও হতো এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বাল্যকালেই খবরের কাগজে তাঁর মহতী কাজের সংবাদ পাঠ করে আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। সে যুগটা ছিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আসামের লাইন প্রথার নামে বাঙ্গাল খেদার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়।

www.pathagar.com

বৃটিশ শাসনামলে ভারতের পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী জাতিগুলোর জমা-জমি, বাসস্থানের সীমারেখা নির্দেশ করে সংরক্ষিত এলাকাকে রিজার্ভ ভূমি-রূপে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা হতো। তদানীন্তন আসামের আসাম ও সুরমা উপত্যাকার স্বল্প পরিমিত আবাদী জমি বাদে আর সব উচ্চ ও নিম্ন ভূমিকে রিজার্ভ ভূমিরূপে পার্বত্য জাতিগুলোর জন্য সংরক্ষিত করাকেই লাইন প্রথা বলা হতো। আবাদযোগ্য ও বনাঞ্চল এরূপ উভয় প্রকার ভূমিই রিজার্ভ ভূমিরূপে আইনের নামে সংরক্ষিত করে বাঙ্গালী ও সমতল ভূমির লোকজনকে সেখানে আবাদ করতে দেয়া হতো না। অথচ তারাই বনবাদাড় কেটে ম্যালিরিয়া কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে, হিংস্র জীবজন্তু জোঁক, পোকা-মাকড়ের কামড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আজকের কৃষিসমৃদ্ধ এই আসামকে আবাদভূমিতে পরিণত করেছিল।

বাংলার মুসলমান কৃষকগণ, কিছু নিম্নশ্রেণীর তফসিলী হিন্দুও অবশ্য মুসলমানদের সাথে এই জংলী জায়গা আবাদে অংশ গ্রহণ করেছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

এক সময় আসাম বাংলাদেশের অংশরূপেই পরিগণিত হতো। বৃটিশ সরকার খৃস্ট ধর্ম বিস্তারের উর্বর ভূমিরূপে আসামকে দেখতে পেল। সাবেক বৃহত্তম আসামে দু'টি সমতল ভূমি—আসাম ও সুর্মা উপত্যকা বাদে সমগ্র অঞ্চল ছিল পাহাড় পর্বতময়। মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বিবিধ জাতি-গোত্রের সাথে এসব অধিবাসীদের অন্তর্বিবাদ, মারামারি, হত্যাকাণ্ড অহরহ লেগেই থাকত। এতে মিশনারীদের স্বীয় কায়দায় ধর্ম প্রচার সরকারী আনুকূল্যে বেশ কার্যকর হয়ে উঠে। যা-ই ঘটুক, খাদ্য যোগানোর প্রয়োজনে পতিত জমীন আবাদের দরকার। তাই ভূমি আবাদের কাজ শুরু হলে দলে দলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সেখানে বাংলাদেশের কৃষকদের আগমন ঘটে।

আমরা বাল্যকালেই সংবাদপত্রে আসামে ভাসানীর নেতৃত্বে বাঙ্গাল খেদা-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পাঠ করে মুগ্ধ বিস্মিত হয়েছি। তখনকার দুর্দিনে মুসলমানদের বহুল প্রচারিত দু'টি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। একটি মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সম্পাদিত সাপ্তাহিক মুহাম্মদী, অন্যটি চৌধুরী শামসুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক হানাফী। এসব কাগজে তখন ফলাও করে প্রচারিত দু'টি সংবাদ বিশেষভাবে বাংলার মুসলমানের হৃদয়

www.pathagar.com

স্পর্শ করত। তার একটি কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিজয়। অন্যটি আসামে বাঙ্গাল খেদাবিরোধী আন্দোলন। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে সরকারের বাঙ্গাল খেদানীতি ও লাইন প্রথার দরুন নির্যাতিত নিপীড়িত আবাদী প্রজাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক পরিষদের যে নির্বাচন '৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়, তা কংগ্রেসীরা বর্জন করেছিল; কাজেই সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত উপজাতি ও তফসিলীদের সহযোগিতায় স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ্ মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তখন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানীর লাইন প্রথার বাঙ্গাল খেদানীতির প্রশ্নে সাদুল্লাহ্ সরকারের সাথে সংঘাত শুরু হয়। সাদুল্লাহ্ সরকার লাইন প্রথা বহাল রাখতে কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করেন। সংগ্রামী নেতা ভাসানী বাঙ্গাল খেদাবিরোধী আন্দোলনে সে সময় সারা ভারতের মুসলমান নেতাদের সমর্থন ও মুসলিম জনতার অন্তর জয় করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল আসামকে খৃস্টান রাজ্যে পরিণত করা। হিন্দুরা এতে তেমন বাধা দেয় নি তাই বাঙালী হিন্দুদের বসবাসে আপত্তি ছিল না। যত আপত্তি মুসলমানদের বেলায়। ভবিষ্যতে আসাম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হবে, এই আশঙ্কায় ভারতের হিন্দু কংগ্রেসী নেতারা এই নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া নীরবতাই পালন করতেন।

মওলানা ভাসানী বাঙ্গাল খেদাবিরোধী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের প্রশ্রয় দেন নি যদিও লাইন প্রথায় নির্যাতিত বাঙ্গালীদের শতকরা ৯০ জনই ছিল মুসলমান।

এখানে খৃস্টান মিশনারীদের সাথে সাদুল্লাহ্ পরবর্তীকালে গোপীনাথ বড়দুলই সরকারের একটি বৈরিতামূলক ঘটনার উল্লেখ করছি। আসামে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকরী না করা পর্যন্ত চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশের মর্যাদায় শাসিত হতো। চীফ কমিশনার পার্বত্য জেলাগুলোকে আসাম ও সুর্মা উপত্যকা হতে পৃথকভাবে শাসন করতেন। তখন পার্বত্যাঞ্চলের খৃস্টান মিশনারীদের প্রধান ছিলেন রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর একজন ভক্ত বন্ধু ছিলেন। একদিন মাইকেল স্কট দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার কর্তৃক ভারতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে গান্ধীর সাথে একত্রে আন্দোলন

www.pathagar.com

করেছিলেন। কাজেই তিনি কংগ্রেসীদের নিকট ছিলেন 'ভারতবন্ধু'-রূপে সম্মানিত।

স্বাধীনতার পূর্বে যে মাইকেল স্কট বিশ্বব্যাপী ভারতীয় কংগ্রেসীদের মহিমা কীর্তন করেছেন, সেই বৃদ্ধ ধর্মযাজক স্কটকে আসামে উপজাতীয় লোকদেরকে স্বাধীন করার পক্ষে উস্কানীদাতারূপে চিত্রিত করে স্বাধীন ভারতবর্ষ হতে বহিষ্কৃত করা হয়।

উপরতলার পাদ্রী সাহেবরা ভারত-বন্ধু সেজে কংগ্রেসের গুণ-কীর্তন করলেও সাধারণ উপজাতীয় খৃস্টানরা আবাদী প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ চীফ কমিশনার, লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও সাদুল্লাহ্, গোপীনাথ বড়দলুই সরকারের লাইন প্রথা ও বাঙ্গাল খেদা চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন মওলানা ভাসানী।

মওলানা ভাসানী আসামের কৃষক ও মুরীদানের মধ্যে কাজ করবার সময় দীর্ঘদিন ভাসানীর চরে অবস্থান করেছেন। চরাঞ্চলের চলাচলের প্রধান উপায় নৌকা। ভাসানী উপাধি পরবর্তীতে যেমন তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেরূপ জীবনের শেষ পর্যন্ত বর্ষাকালের অধিকাংশ সময় তিনি নৌকায় চলাচল ও বাস করেছেন।

কোন সভায় বা মাহফিলে যাবার কথা দিলে রেল-নৌকা, গরুর গাড়ী, সাইকেল বা ঘোড়ায় চড়ে যথাসময়ে জলসায় তিনি উপস্থিত হতেন। ঘোড়ায় চড়া ও সাইকেল চালনা এবং পায়ে হাঁটা সব কিছুতেই তিনি পটু ছিলেন।

বৃটিশ সরকারের উপজাতীয় লোকদের খৃস্টান করার মানসেই যে লাইন প্রথায় রিজার্ভ ভূমির সৃষ্টি করেছিল এর প্রমাণ মিলে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রেরিত ক্রিপস মিশনের অন্যতম সদস্য স্যার রিগল্যাণ্ড কুপল্যাণ্ড কর্তৃক আসামের খৃস্টান পার্বত্যাঞ্চলগুলোর নিরাপত্তার গ্যারান্টি চাওয়ার দাবীর মধ্যে দিয়ে। ভারতের কংগ্রেসী সরকার প্রথমে বৃটিশ সরকারের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও এখন আসামকে ছয় সাতটি ভাগে বিভক্ত করেও স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করতে পারছেন না কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার।

ইংরেজরা কংগ্রেসী হিন্দু নেতাদের খুশী করার জন্যই বিভাগকালীন বাটোয়ারার জন্য গঠিত স্যার সিরিল রেডক্লিফকে গোয়ালপাড়া ধুবড়ীতে হাত দিতে দেয় নি, বর্তমানে আসামের মধ্যে এ দু'টি জেলাতেই মুসলমানরা অধিক

www.pathagar.com

সংখ্যায় বাস করে। তখন ভাসানীর দাবী মত ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়ায় রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা হলে, এ দু'টি জেলা অথবা এর বিরাট অংশ **পাকিস্তান-ভুক্ত** হতো। আর তা আজ হতো স্বাধীন বাংলাদেশেরই এলাকা। মওলানা ভাসানী কেবল আসামেই নয়, সারা বাংলা বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহের কৃষকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বৃটিশ যুগে বহুবার প্রবল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বৃটিশ-ভারতে ময়মনসিংহ ছিল লোক সংখ্যায় বৃহত্তম জেলা। আবার বাংলাদেশের মধ্যে প্রবল প্রভাবান্বিত জমিদারের সংখ্যাও ছিল ময়মনসিংহ জেলাতেই বেশী। ফলে জমিদারদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়েছে এ জেলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী।

মুক্তাগাছা, সন্তোষ, গৌরীপুর ইত্যাদি মহালের জমিদারিগুলো ছিল খুবই বিরাট। মুক্তাগাছার পরই ছিল সন্তোষের জমিদারী। সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার উর্ধ্বতন আইন সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট।

বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট সন্তোষের মহারাজার রাজবাড়ী ছিল সেখানে অবস্থিত যে স্থানটিতে অতীতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর একটি মসজিদ ছিল। পুরাতন কাগজ-পত্র বের করে এই প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের বিরুদ্ধে একদিকে মামলা দায়ের অন্যদিকে তীব্র প্রজা আন্দোলন শুরু করেন মওলানা ভাসানী, শেষ পর্যন্ত মওলানা সাহেবেরই জয় হয়। রাজাদের বসতবাড়ির সেই পুরাতন ওয়াকফ জমিনের উপরই আজ গড়ে উঠেছে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মওলানা ভাসানীর দরিদ্র জনগণের শিক্ষা বিস্তারের এই আকুতি দেখে পরবর্তীতে অনেক হিন্দু জমিদার-জোতদার পর্যন্ত তাদের জমি স্বেচ্ছায় দান করে দিয়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় জমিদারিবিরোধী আন্দোলনকারী মওলানা একজন খাঁটি মুসলমান নেতা হলেও তাঁর আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন, তিনি জনসেবায় সকলের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রবল পরাক্রমশালী সন্তোষের জমিদারের বিরুদ্ধে মওলানার এই সংগ্রাম বৃটিশ-শাসনের প্রথম যুগের ফকির মজনু শা'র সংগ্রামের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফকির মজনু শাহও ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার রায়-চৌধুরীদেরকে বগুড়া হতে বিতাড়িত করেন। তারপর বৃটিশ সরকার এই অত্যাচারী জমিদার গোষ্ঠীকে বগুড়া হতে অনেক দূরে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ছাড়িয়ে গৌরীপুরে এনে জমিদারী দিয়ে পুনর্বাসন করে মজনু শাহ্‌র ভয়ে।

www.pathagar.com

মওলানা সন্তোষের সে স্থানটি যা ওয়াকফ করা ছিল, সেই পীরের মাজার ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল; সেখানে শেষ পর্যন্ত আইনসঙ্গতভাবে তাঁর সাধের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কৃতকার্য হন। মুরিদান কর্তৃক দেয় ও বিভিন্ন দান সূত্রে পাওয়া বিপুল অর্থ তখন মওলানার হাতে এসেছে। প্রাপ্ত এই অর্থ অনেক বিলাসী ব্যক্তি যেভাবে খরচ করেন বা শহরে-বন্দরে দালান কোঠা, হুজরা বালাখানা তৈরী করেন, মওলানা ভাসানীর মোটেই সেরূপ লোভ অনুরাগ ছিল না।

সন্তোষে রাজবাড়ী পেয়েও ফকিরের ন্যায় ছনের তৈরী কুঁড়ে ঘরেই তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বাস করে গেছেন।

আসাম ও উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলন মওলানা ভাসানী ত্রিশ দশকের প্রথম হতেই শুরু করেন। আসাম আন্দোলনের সময় তাঁর বাসস্থান ধুবড়ীর ভাসানীর চরে হওয়াতেই তাঁর নামের শেষে ভাসানী কথাটি স্বাক্ষরের সময় তিনি লিখতেন। তিনি পাবনা, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, আসামের ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, দরং, কামরূপ জেলা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রজা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

মওলানা ভাসানী নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজাপার্টিরও সদস্য ছিলেন। যে প্রজা পার্টির সভাপতি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও মওলানা আবদুল্লা-হেল বাকী ছিলেন এর সহসভাপতি। কুষ্টিয়ার মওলবী শামছুদ্দীন ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক। তবে উত্তরবঙ্গ ও আসামে ভাসানী যে কৃষক আন্দোলন শুরু করেন তাতে না ছিল কোন জমিদার নন্দন না কোন বিলাসবহুল রাজনীতিক প্রজাদরদী উকিল ব্যারিস্টার। ছিল গরীব কৃষক, তাঁতী, জোলা, জেলে এবং টঙ্ক জিরাতি বর্গাচাষী ও ভূমিহীন কৃষকরা। দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার তাগিদে ভাসানীর নেতৃত্বে এরা সংগ্রামে মেতে উঠেছিল। তখন অধিকাংশ জমিদার যেমন ছিল হিন্দু, তেমনি প্রায় সকল প্রজাই ছিল মুসলমান ও কিছু সংখ্যক নমশূদ্র তফশিলী হিন্দু। ইংরেজ সরকারের বড় বড় সব অফিসারও ছিল হিন্দু। তাই বলে মওলানার কৃষক আন্দোলনে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল না। গরীব হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাই ছিল মওলানার আন্দোলনের সৈনিক।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী প্রজা আন্দোলনের সাথে সাথে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান সংগ্রামে আসামে তাঁর সহযোগী ছিলেন জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী, মাইনকার চরের আবদুল কাসেম, জনাব মাহ্‌মুদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরবর্তীতে জনাব মাহমুদ আলী পূর্ব পাকিস্তানে নানা পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে মওলানা সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছেন।

১৯৪৮ সালে মওলানা ভাসানী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁ পূর্ববঙ্গ টেক্সট বুক বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হলে এই আসনটি শূন্য হয়। ভাসানী তাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচিত হবার অল্পদিন পর আসামের ধুবড়ী এলাকায় মুরিদানদের অবস্থা দেখতে যেয়ে তথাকার কংগ্রেসী সরকারের কোপানলে পড়ে যান তিনি। অভি-যোগ—সেখানে তিনি পুনরায় বাঙ্গাল খেদাবিরোধী আন্দোলনে উস্‌কানী দিতে এসেছেন। এই অজুহাতে তাঁকে কারাগারে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। ফলে সময় মত রিটার্ন না দিতে পারায় তাঁর পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী যখন ধুবড়ীতে বন্দী তখনি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল টাঙ্গাইলের ঐতিহাসিক উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক। শামসুল হক বিপুল ভোটের ব্যবধানে লীগদলীয় প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করার ফলে প্রমাণিত হলো, পাকিস্তান সংগ্রামে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত মুসলিম লীগ সরকারের জন সমর্থনহীনতার কথা। দেখা গেল '৪৬ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ী পার্টি মুসলিম লীগ '৪৮ সালের ভাষার প্রশ্নে সৃষ্ট বিরোধে অত্যল্পকাল পরই জনসমর্থনহীন হয়ে পড়েছে। শামসুল হক তখনই মওলানার সাথে ধুবড়ী জেলে সাক্ষাত করে তাঁর পরিষদ সদস্যের বকেয়া বেতনের টাকা উঠাবার অনুমতি লাভ করে সেই টাকা নির্বাচনী কাজে ব্যয় করেন।

মওলানা ভাসানী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ সদস্য থাকাকালীন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, ডাক্তার আবদুল মুত্তালিব মালিক প্রমুখের সহ-যোগিতায় পরিষদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করবার প্রয়াস নেন। ডাক্তার মালিকের মন্ত্রীত্ব, মোহাম্মদ আলীর বার্মার হাই কমিশনার ও ধুবড়ীতে মওলার আটক হওয়ার কারণে বিরোধী দল গঠনের সেই প্রয়াস

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়ে যায়। এর কিছু কাল পরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন।

মওলানা সাহেব ধুবড়ী জেল হতে মুক্তি লাভ করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে।

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত লীগ কর্মী সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণ দান কালে তিনি লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। সম্মেলনের অত্যল্পকাল পূর্বে ভারত ত্যাগ করে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। মাঝে তিনি ঢাকায় আসলে প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে তাঁকে বিমান বন্দর হতেই করাচীতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীর এই বহিষ্কারের তীব্র প্রতিবাদ জানান ভাসানী সাহেব। জনাব শামসুল হক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য '৪৯ সালের মধ্যভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম ছাত্র লীগের দপ্তর ১৫০ নং চক মোগলটুলিত। মুসলিম লীগ কর্মীদের পক্ষ হতে জনাব শওকত আলী এই সভা আহ্বান করেন। সভাপতিত্ব করেন জনাব আতাউর রহমান খান।

আলোচনায় সম্বর্ধনা সভাকেই একই কর্মী সম্মেলনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঠিক হয় এতে সভাপতিত্ব করবেন মওলানা ভাসানী। কয়েক জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য যেমন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব খয়রাত হোসেন, বেগম আনোয়ারা খাতুনও এই সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সরকারী বিধিনিষেধের আশঙ্কা ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য সম্মেলনের স্থান নিয়ে একটি বিরাট ঝামেলা দেখা দেয়। অবশেষে সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের বন্ধু ঢাকা প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরীর মালিক কাজী মোহাম্মদ বশীরের বাসভবন রোজ গার্ডেন বা রশীদ মঞ্জিলেই এই মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এই সম্মেলনেই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবুল মুনসুর আহমদ, জনাব আবদুস সালাম খাঁ।

www.pathagar.com

(সম্ভবত) যবখীর পীর মওলানা আবদুল খায়েরও এর সহ-সভাপতি হয়েছিলেন এবং জনাব শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও শেখ মুজিবর রহমান হন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক।

নবগঠিত দলের নামকরণের সময় শামসুল হক এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'জনগণের মুসলিম লীগ' রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' রাখার পক্ষে রায় দেন। কারণ এর পূর্বে সীমান্ত প্রদেশের মানকী শরীফের পীর সাহেব, প্রাদেশিক সরকারের প্রধান খান আবদুল কায়ুম খানের সঙ্গে নীতির প্রশ্নে মতভেদ হওয়ায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে সেখানে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। মওলানা ভাসানীর যুক্তি এখানে আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ে উঠলে সর্ব পাকিস্তানী রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে সুবিধা হবে। জনাব আবদুল সালাম খাঁ, জনাব আতাউর রহমান খান মওলানার এই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার অল্পদিন পরই করাচী হতে জনাব সোহরাওয়ার্দী লাহোরে পাঞ্জাবের পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী মামদুতের নবাব ইফতেখার হোসেন খানের প্রোডা মামলায় আসামীর (মামদুতের) পক্ষে মামলা করতে যান। কেন্দ্রের লীগ সরকার কর্তৃক মামদুত পদচ্যুত হবার পর তিনি গঠন করেন জিন্নাহ মুসলিম লীগ। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সর্ব পাকিস্তানী রূপ দিয়ে নতুনভাবে গঠন করা হয় জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ। জনাব সোহ-রাওয়ার্দী হন নব গঠিত এই সংগঠনের আহ্বায়ক। এর বৎসরাধিক কাল পর লাহোরে আওয়ামী লীগের এক সভায় সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হন সারা পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক। তবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র স্টেটাসের এতে কোন পরিবর্তন হয় নি। এর প্রমাণ হলো ঢাকা মুকুল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে মুসলিম শব্দ বাদ দেবার বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দীর আপত্তি, মওলানা ভাসানী, সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান ও সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমানের সমর্থনক্রমে তা অগ্রাহ্য করেন এই যুক্তিতে যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাজে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেই।

৫২-র ভাষা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের

www.pathagar.com

চুক্তির প্রশ্ন তুলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিব তখন ঢাকা জেলে বন্দী।

মওলানা সাহেব ৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছিলেন না। তিনি রংপুর জেলার ভুরুঙ্গামারীতে ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি ভুরুঙ্গামারী হতে ঢাকায় ফিরে আসেন। সেদিন ঢাকার অবস্থা খুবই গুরুতর ছিল। আন্দোলনকারীরা ভিকটোরিয়া পার্কের দক্ষিণে অবস্থিত মর্নিং নিউজ অফিস পুড়িয়ে দেয়। অপরদিকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানের গণপরিষদকে অনুরোধ জানিয়ে আইন পাস করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মওলানা ভাসানী সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদেরকে সমর্থন জানিয়ে সংবাদপত্রে জোরালো বিবৃতি দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের প্রতিবাদ সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সমর্থন না করায় শামসুল হককে বক্তৃতা দিতে দেয় নি। তখন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ঢাকার কলতাবাজার করিম প্রিন্টিং প্রেস হতে বের করা হতো। মওলানা সাহেব সাপ্তাহিক ইত্তেফাককে আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিতে বলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানী গ্রেফতার হয়ে যান। তখন জেলখানায় মওলানা সাহেবের সাথে যাঁদের অন্তরঙ্গতা বেশী হয়, এঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব আবুল হাশিম, হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (ম্যাক সাহেব) প্রমুখ।

যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর মওলানা সাহেব প্রাদেশিক পরিষদের নির্বা-চনে মোজাফফর সাহেবকে নমিনেশন দেবার জন্য তাঁকে (ম্যাক সাহেব) সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানিয়ে জনাব শেখ মুজিবর রহমান, সিরাজউদ্দীন আহমদ ও আমাকে প্রেরণ করেন। নামের ভুলের জন্য আমরা ঢাকা কলেজের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-এর শান্তিনগরের বাসায় যেয়ে উপস্থিত হই। প্রভাষক মোজাফফরও তখন বাসায় ছিলেন না। আমরা মোজাফফর সাহেবকে মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করার সংবাদ দিয়ে গেলে পরদিন সকালে ১৪ নং কারকুন বাড়ী লেনে মোজাফফর আহমদ তাঁর বড় ভাই এবং তাঁর পিতা যেয়ে মওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঘটনার জের গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মওলানা সাহেবের সুপারিশক্রমে অধ্যাপক মোজাফফর যুক্তফ্রন্টের আওয়ামী কোটা হতে নমিনেশন পান।

৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর হতেই পূর্ব বঙ্গ (তখন পর্যন্ত সরকারী কাগজ-পত্রে পূর্ব পাকিস্তান নাম লেখা শুরু হয় নি) ব্যবস্থা পরিষদের জন্য নতুন

www.pathagar.com

নির্বাচনের দাবী প্রবলভাবে উত্থাপিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গণদাবীর মুখে '৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়।

নির্বাচনী আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ার সময়ে ১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরা, জনাব কফিলউদ্দীন চৌধুরী, জনাব আবদুস সাত্তার (প্রেসিডেন্ট সাত্তার), জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস (সেক্রেটারী), জনাব তফাজ্জল হোসেন ছিলেন নবগঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রথম কাতারের নেতা। আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী বিরোধী দলরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও শেরে বাংলার অতুলনীয় জনপ্রিয়তা কৃষক প্রজা পার্টিকেও রাজনীতির অঙ্গনে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

এ সময় একদিন খেলাফতে রাব্বানী পার্টিপ্রধান, পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম কর্মবীর জনাব আবুল হাশিম ১৮ নং কারকুন বাড়ী লেনে যেয়ে মওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাবিত যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলে তাঁকে (মওলানাকে) পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার অনুরোধ জানালে জওয়াবে মওলানা সাহেব তাঁর পূর্ববর্তী ঘোষণা 'কোন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না' এই মতে অটল থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

অবশ্য নির্বাচনে রাব্বানী পার্টির বিশিষ্ট নেতা, ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জনাব আবুল কাসেম যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন, রাব্বানী পার্টির অধ্যাপক শাহেদ আলীও পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নেজামে ইসলাম-প্রধান মওলানা আতাহার আলী, সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন প্রমুখ বেশ কয়েক জন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী রূপে নির্বাচিত হয়ে পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন। মূলত আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলেও আওয়ামী লীগের তরুণ সদস্যদের আপত্তি উপেক্ষা করে হক-ভাসানীর উদার মনোভাবের জন্যই ভিন্ন দলের নেতারা পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এমন কি মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। নিম্নে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিস্ময়কর সাফল্যের অধিকারী যুক্তফ্রন্ট গঠনের নেপথ্য কাহিনীর কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হলো।

'৫৩ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলা (আঞ্চলিক) কমিউনিস্ট পার্টির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খোকা রায় (আজিজ ভাই) আওয়ামী লীগের অন্যতম

www.pathagar.com

সহ-সভাপতি জনাব আবুল মনসুর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি নির্বাচনী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার ব্যাপারে মওলানা ভাসানী যাতে উদ্যোগী হন তার জন্য প্রয়াস নিতে অনুরোধ জানান।

মনসুর সাহেব সেই মতে একমত হয়ে তাঁর আত্মীয় ও সাংবাদিক সহকর্মী খোন্দকার আবদুল হামিদকে কাজ করার অনুরোধ জানান। হামিদ সাহেবের সাথে তখন মওলানা ভাসানীর খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল। এরপর জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীর মিল্লাত কাগজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়েছিলেন খোন্দকার আবদুল হামিদ। যুক্তফ্রন্ট গঠন করার ব্যাপারে পাঞ্জাবের আজাদ পাকিস্তান পার্টির মিয়া ইফতেখার উদ্দীন খুবই উৎসাহী ছিলেন। এজন্য তিনি একাধিকবার ঢাকা এসে মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এই আজাদ পাকিস্তান পার্টির পূর্ব পাকিস্তানে সহযোগী পার্টি ছিল পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল। হাজী দানেশ সভাপতি ও মাহমুদ আলী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। তাঁরাও যুক্তফ্রন্ট গঠনে খুবই উৎসাহী ছিলেন। খোকা রায়ের স্ত্রী জুঁইফুল রায় এজন্য নেতাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছেন। জুঁইফুল রায়, খোকা রায় একাধিকবার আত্মগোপন অবস্থাতে ১৮ নং কারকুন বাড়ী লেনে এসে আমাকে ও আমার সহযোগিতায় জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানকে মওলানা সাহেবের দ্বারা যুক্তফ্রন্ট গঠন করবার তাগিদ দিতেন।

মওলানা ভাসানী তখন জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের ১৮ নং কারকুন বাড়ী লেনের বাড়ীতে থাকতেন তিন তলায়। আর আমরা ছিলাম দোতলার ভাড়াটিয়ে। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক তখন এখান হতে বের করা হতো। এ সময় মওলানা ভাসানী জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক বের করার দায়িত্ব দেন জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। তবে একটি কথা আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করতে হয়, রাজনৈতিক জটিলতার মুখে তিনি বহুবার তাঁর নামে খবরের কাগজে মতামত দিয়ে বিবৃতি দেয়ার ভার আমাকে দিয়েছেন। এসব কথায় পড়ে আসা যাবে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন করার সূচনার এক পর্যায়ে আমাকে একটি গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। বৈঠকের স্থান ঠিক হয় তখনকার সাপ্তাহিক 'যুগের দাবী' সম্পাদক খন্দকার ইলিয়াসের গেণ্ডারিয়ার বাসায়। এ বাসার পাশেই রয়েছে গোয়েন্দা অফিসারদের বাসা। তাই কঠোর গোপনীয়তা ও

www.pathagar.com

সতর্কতার প্রয়োজন। কিভাবে বৈঠক হবে, কারা উপস্থিত থাকবেন, এর প্রাথমিক আলোচনা হয় মওলানা সাহেবের সাথে নবাবপুর জুবিলী ফার্মেসীর উপর তলায় উকিল জনাব মমীনুল হক চৌধুরীর ঘরে। তাতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দপ্তর সম্পাদক মীর্জা সামাদ।

নির্দিষ্ট তারিখেই রাত্রি ১১টায় খন্দকার ইলিয়াসের বাসায় মওলানা সাহেব ও মিয়া ইফতিখার উদ্দীনকে নিয়ে উপস্থিত হই। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হতে খোকা রায় ঢাকার বাইরে থাকায় আসেন মি. মনিসিং (আজাদ ভাই) ও বারিন দত্ত (সালাম ভাই)। মওলানা সাহেব প্রস্তুতি বৈঠকেই বলেছিলেন, 'ফ্রন্ট গঠনের পূর্বে তোমাদের সাথে আমার বোঝাপড়ার কয়েকটা শর্ত আছে। তা হলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই করতে আমি রাজী নই। কারণ এই বিশ্ব জগতের সব কিছুর মালিকই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।' এ কথায় বামপন্থীরা কোন ওজর আপত্তি করবে না এটা ঠিক করেই তিনি খন্দকার ইলিয়াসের বাসায় বৈঠকে বসতে রাজী হন।

বৈঠকে মওলানা সাহেব শুরুতেই মনি সিংকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'মনিবাবু, আপনারা বস্তুবাদী কমিউনিস্ট, আমি মুসলমান। আমি বিশ্বাস করি এই দুনিয়ার বিষয়-আসয় সব কিছুর মালিক আল্লাহ্। কাজেই ইসলামে শোষণের কোন স্থান নেই, থাকতে পারে না। তাই সকল জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের জন্য কাজ করা আমার অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি।' তিনি বিস্মিল্লাহ্ বলে প্রথম কথা বলতে শুরু করেন। মওলানা সাহেব বাংলা ও উর্দূতে মনি সিং ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে এবং মিয়া ইফতিখার উদ্দীন ইংরেজি ও উর্দূতে কথা বলেন। আমি ও বারিন বাবু ছিলাম নীরব শ্রোতা।

এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করার। এর কিছুদিন পূর্বেই হক সাহেবের নেতৃত্বে কৃষকশ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। ঠিক হয়—নানা সমস্যা এড়াবার জন্য কৃষকপ্রজা পার্টির প্রধান হক সাহেব ও আওয়ামী লীগ প্রধান মওলানা ভাসানী ফ্রন্টের মূল দলীলে সই করবেন। শেখ মুজিবর রহমান এবং আরো কেউ কেউ সোহরাওয়ার্দীর করাচী হতে আসার জন্য স্বাক্ষর বিলম্ব করতে চাপ দেন। কিন্তু ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ও জনাব আতাউর রহমান খানের উৎসাহে এই আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। যাঁরা দ্রুত ঐক্যফ্রন্ট করার পক্ষে, তাঁদের যুক্তি মুসলিম লীগ চেষ্টা করছে হক সাহেব যাতে ঐক্যফ্রন্টে না আসেন। তাই দেরী করা চলবে না।

www.pathagar.com

তখন হক সাহেব ও ভাসানী সাহেবের স্বাক্ষর নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণার সময় হক-ভাসানী শব্দটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, সাধারণ পল্লীবাসী ও কৃষকরা তখন মনে করত হক-ভাসানী একই ব্যক্তি।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা রচিত হয় কৃষকশ্রমিক পার্টির সহ-সভাপতি জনাব কফিলউদ্দীন চৌধুরীর বংশাল রোডস্থ বাসভবনে। ২১ দফা রচনার মুখ্য ভূমিকা নেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ। লেখেন যুক্তফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক জনাব কমরউদ্দীন আহমদ। **২১শে ফেব্রুয়ারী, ১লা বৈশাখ, শহীদ মিনার** এই তিনটি দফা কর্মসূচীতে দেয়ার বিষয়টি মনসুর সাহেবই খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন। অবশ্য সর্বসম্মতিক্রমেই এই তিনটি দফা ২১ দফায় সন্নিবেশিত করা হয়।

'৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বিপুল ভোটে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হবার পর প্রাদেশিক গভর্নর যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রীসভা গঠন করার আহ্বান জানান। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মুসলিম লীগ ও খেলাফত আন্দোলনের নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান। নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় হলে গণ-তন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি চীফ সেক্রেটারী হামিদ আলীর নিকট দায়িত্ব দিয়ে তখনই পদত্যাগ করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে একদিন টেলি-ফোনে যোগাযোগ করে মওলানা সাহেব আমাকে নিয়ে গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) যান চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রিক্শায় চড়ে গভর্নর হাউসের গেটের সামনে উপস্থিত হলে সেখানে কর্মরত পুলিশ সার্জেন্ট সরাসরি রিক্শাসহ ভেতরে যেতে মওলানাকে অনুরোধ করেন। গভর্নরের মিলিটারী এটাচী সঙ্গে সঙ্গে এসে মওলানা সাহেবকে 'খোশ আমদেদ' জানিয়ে লাট সাহেবের সামনে নিয়ে যায়। দেখা হবার সাথে সাথে দুই বন্ধু সাশ্রুনয়নে পরস্পর কোলাকুলি করে আলোচনায় বসেন। তাঁদের আলোচনা অবশ্য ব্যক্তিগত কুশলাদি ও অরাজনৈতিক ছিল। এ দেশের ভবিষ্যত অগ্রগতি নিয়ে কথাবার্তা বলা ও অতীত স্মৃতিচারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আলো-চনার বিষয়বস্তু। হক সহেবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হবার এক মাসের মধ্যেই কেন্দ্রের সাথে গুরুতর মতভেদ সৃষ্টি হয়। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী নামে প্রধান মন্ত্রী থাকলেও কার্যত ক্ষমতা ছিল ইস্কান্দার মীর্জা ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর (সেক্রেটারী জেনারেল) হাতে।

www.pathagar.com

মাস খানেক ক্ষমতায় থাকার পরই ৯৩-ক ধারার বলে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভাকে বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এর ফলে পাকিস্তানী শাসনে আর একটি অনভিপ্রেত ও অশুভ চক্রান্ত জয়ী হয়ে গণতন্ত্রের উপর নতুনভাবে আঘাত হানে। তবে সতর্কতার সাথে চেষ্টা করলে এই অন্যায় কাজ পরিহার করা তখন সম্ভব হতো।

প্রায় এক বছর পর ৯৩-ক ধারা প্রত্যাহার করে নতুনভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পুনঃবহাল করা হলেও যুক্তফ্রন্টের মধ্যেকার প্রধান শরীক দু'টি দল আওয়ামী লীগ ও কে. এস. পি.-র মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়ায় ভোটাভুটির অনেক ঘাপলার পর হক সাহেবকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে জনাব আবু হোসেন সরকার হন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী এবং হক সাহেব হন পাকিস্তানের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। আতাউর রহমান খান তখন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতা।

হক সাহেবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণ পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, (সম্ভবত জনাব আতাউর রহমান খানও) জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান, মোজাফফর আহমদ, খন্দকার ইলিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে মওলানা সাহেব সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য রওনা হয়ে যান।

শান্তি সম্মেলনে যাওয়ার প্রাক্কালেই কেন্দ্রের নির্দেশে পুলিশ মওলানা সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। এয়ার-পোর্ট যাবার সময় পথিমধ্যে পুলিশ খন্দকার ইলিয়াসকে গ্রেফতার করার জন্য উদ্যত হলে মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হকের (নান্না মিয়া) হস্তক্ষেপে সকলে গ্রেফতার এড়িয়ে বিমানারোহণে সক্ষম হন। এরপর মওলানা সাহেবের দেশে প্রত্যাবর্তনে বিধিনিষেধ আরোপিত হলে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনে বৎসরাধিককাল বিলম্বিত হয়। তখন তিনি লণ্ডন, কলকাতা ও ধুবড়ীতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করেন। যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার পক্ষ হতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেন্দ্র এই বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারে বিরত থেকে যায়। অতঃপর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সাথে 'বিশেষ আলোচনা'য় সোহ্‌রাওয়ার্দী

www.pathagar.com

সাহেব মওলানা সাহেবকে কলকাতা হতে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা আসেন সরাসরি বিমানে।

মওলানা ভাসানীর বিদেশ যাত্রার পর পরই যুক্তফ্রন্ট ভাঙার গোপন প্রয়াস শুরু হয়। তখন দৈনিক মিল্লাত অফিস হতে কলকাতা টাওয়ার হোটেলে অবস্থানরত মওলানা সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতামত চেয়ে ফোনে আলাপ করেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ। মওলানা সাহেব যুক্তফ্রন্ট না ভাঙার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান সকলকে। মনসুর সাহেবকে অনুরোধ করেন মওলানা সাহেবের পক্ষ হতে ঐক্য রক্ষার জন্য একটি বিবৃতি দিতে এবং সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাতে। খবরটি ইত্তেফাক ছাড়া মিল্লাত, আজাদ, সংবাদ, অবজারভারে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। ফ্রন্টের ঐক্য রক্ষায় মওলানা সাহেবের নির্দেশ ও সঠিক মতামত জানার জন্য যুক্তফ্রন্টের তরফ হতে এম. পি. এ. ও ঢাকা জুবিলী হাইস্কুলের হেডমাস্টার জনাব কামরুজ্জা-মানকে কলকাতায় এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে আসামের ধুবড়ীতে পাঠান হয়েছিল। সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের মতামত কি হবে তা জানার জন্য সিকান্দার আবু জাফর ধুবড়ীতে যান। বিভিন্ন লোকের নিকট হতে পরস্পরবিরোধী খবর পেয়ে মওলানা সাহেব স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত দেশের রাজনীতি সম্পর্কে মতামত দিতে তখন কিছুটা অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে অবস্থার বিপাকে মওলানা সাহেব উপলব্ধি করেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্রমেই ক্ষমতার রাজনীতিতে মিশে যাচ্ছে। মওলানা সাহেব বিদেশে থাকা কালীন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে সরকার গঠনে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দীপন্থী একটি অংশের সাথে মওলানা সাহেবের বিরোধ পরবর্তীতে সংঘাতের সৃষ্টি হয় কাগমারীর শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। দৈনিক ইত্তেফাক কাগজে তখনো প্রতিষ্ঠাতা পরি-চালকরূপে মওলানা সাহেবের নাম ছাপা হতো। আর প্রকাশকের নাম ছাপা হতো ইয়ার মোহাম্মদ খান।

মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে কাগমারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কঠোর সমালোচনা ইত্তেফাকে ছাপা হলে কাগজটি হতে ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রিন্টার পাবলিশার নাম প্রত্যাহার করেন, এর মালিকানা সাব্যস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার ছাপা বন্ধ করে দেয়ার জন্য ঢাকার ডিসি বরাবর দরখাস্ত করেন। তখন

www.pathagar.com

জনাব আতাউর রহমান খান ও সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়ার প্রচেষ্টায় ডিসির পক্ষ হতে কোর্টে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কাগজ প্রকাশনায় অন্তবর্তী-কালীন অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ব্যাক একাউন্টে মানিক মিয়ার প্রোপাই-টার নামে একাউন্ট থাকায় তাঁর নামে ডিক্লারেশন চালু রাখার অনুমতি পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান মওলানা সাহেবের প্রতি মোটামুটি তখনো আস্থাশীল ছিলেন। তখন মুজিবর রহমান সোহরাওয়ার্দীকে রাজী করিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহীরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে ঢাকা হতে নতুনভাবে দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ইত্তেহাদের সম্পাদক হন জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন। উল্লেখ্য যে, কলকাতা হতে মওলানা সাহেবের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশনার ভার ইয়ার মোহাম্মদ খান নিয়ে নেন। সে সময় স্বল্পকালের জন্য সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সম্পাদনার ভার ছিল আবু জাফর শামসুদ্দীনের উপর। মওলানা সাহেব দেশে ফেরার পর সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশনার দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁর সঙ্গে সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত জনাব মোজাফ্ফর আহমদকে।

দৈনিক ইত্তেহাদ বের করার পর অত্যন্ত কড়া ও অশালীন ভাষায় দৈনিক ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদের লেখার মধ্যে গালাগাল পূর্ণ লেখা শুরু হয়। কাগমারী সম্মেলনের মত পার্থক্য ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে মওলানা সাহেব গভীরভাবে মর্মাহত হন। তখন দৈনিক আজাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে বিরূপ মন্তব্য লেখা হতো।

যে আওয়ামী লীগ গড়তে জেল-জুলুম-নির্যাতন কোন কিছুতেই মওলানা পিছ-পা হন নি, সেই তাঁর সাধের আওয়ামী লীগ যে তাঁর পক্ষে আর বেশী দিন করা সম্ভব নয়, একথা তিনি অন্তরঙ্গ মহলের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তখনি। এ সময় প্রায়শই তিনি ঢাকা না থেকে রংপুর জেলার ভুরুঙ্গামারীর বাড়ী ও বগুড়ার মহীপুরের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। অল্প দিন পর ১৮ নম্বর কারকুন বাড়ী লেনের ইয়ার মোহামদ খানের বাসা হতে ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের লিয়াকত এভিনিউর বাসায় তিনি ঢাকার অবস্থান স্থানান্তরিত করেন।

এ সময় পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি তখনকার সময়েই হয়েছিল। মওলানা সাহেব

www.pathagar.com

রংপুরের ভুরুঙ্গামারী হতে একটি পোস্টকার্ডে পত্র লিখে কড়া ভাষায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির নিন্দা করে তাঁর নামে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেবার জন্য আমাকে বলেন। তাঁর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি-বিরোধী বিবৃতি আমি বাংলায় লিখি। এর ইংরেজি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব কে. জি. মোস্তফা। খন্দকার আবদুল হামিদ ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রচার দপ্তরের ডাইরেক্টর সৈয়দ সাদেকুর রহমান এই বিবৃতিটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য বিশেষভাবে সহায়তা করন। কারণ মওলানা সাহেব তখন ঢাকার বাইরে অবস্থান করছেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় 'চীফ' জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈদেশিক নীতিতে গোড়া মার্কিন সমর্থক ছিলেন। জনাব আতাউর রহমান খান মধ্যপন্থী হলেও শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ বৈদেশিক নীতিতে তখন প্রবলভাবে সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করতেন। কাজেই ভয় হলো মওলানার বিবৃতি প্রেসে যোগাযোগ করে ছাপায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হতে পারে। আওয়ামী লীগ অফিস তখনো ১৮ নম্বর কারকুন বাড়ী লেনেই ছিল। আমিও তখন একই বাড়ীতে বাস করি। তাই আওয়ামী লীগ অফিসের টাইপিস্ট আবুল হোসেন ইংরেজি বিবৃতি আওয়ামী লীগের প্যাডে ইংরেজিতে টাইপ করে এবং বাংলা বিবৃতিটি হাতে লিখে অফিসের সিলমোহর দিয়ে তাঁর দ্বারাই কাগজে পাঠান হয়। জনাব মোহাম্মদউল্লাহ্ তখন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক। তিনি মওলানা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও এই বিবৃতিটি তাঁর পক্ষে প্রেসে পাঠান সম্ভব হতো না। তবে তখন তিনি রেগুলার অফিসেও আসতেন না। তাঁর কাজ আবুল মিয়াই করতেন। দৈনিক আজাদের সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সংবাদের সম্পাদক জনাব খায়রুল কবির ও মর্নিং নিউজের সম্পাদক জনাব বদরুদ্দীন আহমদ এবং অবজারভার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর চেষ্টায় এসব কাগজে ফলাও করে বিবৃতিটি ছাপা হয়। ইত্তেফাকের বিবৃতিটি একদিন পরে পাঠান হলে অগত্যা তা ভেতরের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল দু'দিন পরে।

এই বিবৃতি দেবার পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর ব্যবধান আরো প্রকটতা লাভ করে। যে মতভেদ কাগমারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল, তাই ক্রমে পরস্পরকে বিচ্ছিন্নতার পথেই এগিয়ে নিয়ে যায়। কিছুকাল পর ঢাকা শাবিস্তান সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল অধিবেশন হয়, খুব সম্ভব মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

এটাই শেষ কাউন্সিল বৈঠক। অতঃপর সদরঘাট রূপমহল সিনেমা হলে আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল ও আরো কতিপয় সমমনা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংক্ষেপে ন্যাপ নামে একটি নতুন দল হয়। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান, বেলুচ গান্ধী খান আবদুস সামাদ আসফ জাঈ, সিন্ধুর মৌলবী আবদুল মজিদ সিন্ধি, মিয়া ইফতিখার উদ্দীন শাহ, পাঞ্জাব এবং সীমান্তের জেনারেল আকবর খান, খান গোলাম মোহাম্মদ খান, লুন্দঘোর করানীর মাহমুদুল হক উসমানী প্রমুখ সারা পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বামপন্থী বিশেষ করে কম্যুনিস্ট উপদলগুলো ন্যাপ গঠনে উৎসাহ উদ্দীপনায় অংশ গ্রহণ করলেও তখন হতেই মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মওলানার আওয়ামী লীগ ত্যাগের প্রশ্নে মতভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাসানীর গতিশীল কর্মতৎপরতায় প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও তখন মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের সমর্থনের পাল্লা মওলানা অপেক্ষা সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবের প্রতি বেশী ছিল। মস্কো-পিকিং দ্বন্দ্ব তখন পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্টদেরকেও দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেছে। এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি অচিরেই একটি বিশেষ কাউন্সিল ডেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে আলাদা আর একটি ন্যাপের জন্ম দেয়।

বিভক্তিপূর্ব ন্যাপের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলাকালেই আইয়ূব খানের মার্শাল-ল জারীর কারণে মওলানা ভাসানীসহ এদেশের আরো অনেকেই কারারুদ্ধ হবার দরুণ, তখকার মত রাজনৈতিক তৎপরতা একরূপ স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

আইয়ূব শাসনের শেষ পর্যায়ে মওলানা ভাসানী কারামুক্তি লাভ করেন। এ সময়ই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে নূরুল আমীনসহ নয় নেতার ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী যখন কারাগার হতে বের হয়ে আসেন, তখন গভর্নর ছিলেন মোনায়েম খান। কার্যত গৃহনির্মাণ, শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে ইরি ধানের চাষ এ সময়ই প্রবর্তিত হয়।

মওলানা সাহেব আইয়ূব সরকারের সম্মতিতে চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীনের কমিউন ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পোন্নতি স্বচক্ষে দেখার জন্য সেখানে সফরে যান। তখন ন্যাপের দুই শিবিরে তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

চীনের প্রতি মওলানার এই দ্ব্যর্থহীন সমর্থন, তাঁর প্রতি মস্কোপন্থীদের বিরাগ ভাব ক্রমেই বৈরিতার দিকে নিয়ে যায়।

মস্কোপন্থীরা আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিলে মওলানা সাহেব কিছুটা অসুবিধায় পড়েন। এই সময় মওলানা সাহেব ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের লিয়াকত এভিনিউর বাসভবনে অবস্থান করতেন। প্রথমে মওলানা সাহেব সেক্রেটারীরূপে কোন একজনকে নিয়ে মস্কো যাবার মনস্থ করেছিলেন। শেষে শওকত আলী খানকে সেক্রেটারী এবং ডাঃ ফজলুল করীমকে চিকিৎসকরূপে ঠিক করে তাঁদের সমভিব্যাহারে চীন সফরে যান।

এ সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে ঢাকাসহ সারা দেশে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর আয় বৃদ্ধির জন্য নগর শুল্ক ধার্য করা হয়। আমরা কয়েকজন এই নগর শুল্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করি। নগর শুল্কবিরোধী কমিটিতে আমাকে কনভেনর ও মমীনুল হক চৌধুরী এডভোকেটকে করা হয় জয়েন্ট কনভেনর। মওলানা ভাসানী নগর শুল্কবিরোধী আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব দেবার অঙ্গীকার করেন। আন্দোলন ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করে।

মওলানা সাহেব চীন সফরে যাত্রার তিনদিন পূর্বে ঢাকার পল্টন ময়দানে নগর শুল্কবিরোধী এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। অবিলম্বে নগর শুল্ক প্রত্যাহার করা না হলে চীন হতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন বলে কর্মসূচী ঘোষণা করেন। মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট সহযোগীদের চরম অসহযোগিতার প্রতি সায় না দিয়ে তাঁর চীন সফরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা কয়েকজন যেমন, এডভোকেট মুজীবর রহমান, মমীনুল হক চৌধুরী, মিজানুর রহমান মোক্তার, মতি সর্দার প্রমুখ ঢাকা কাচারীর সম্মুখস্থ হোটেল সাকেরিয়ায় একটি সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা করি। এতে তিনি দেশের অবস্থার বিশ্লেষণ করে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

চীন সফরের সময় মওলানা সাহেব আমাদের নিকট চীনের অবস্থা এবং এখানকার সকলের কুশলাদি কামনা করে দু'টি পত্র লেখেন যার একটি দৈনিক সংবাদে ব্লক করে হুবহু ছাপানো হয়। এর শিরোনাম ছিল 'জহুর হুসেন চৌধুরী, ফজলুর রহমান খাঁ, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, সিরাজ গয়রহ।' এই দীর্ঘ পত্রে আইন অমান্য না করে দেশের গঠনমূলক কাজ করার তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যের কথাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

চীন হতে প্রেরিত দ্বিতীয় পত্রটি ছিল মওলানা আকরাম খাঁ ও আমাদের অন্য সকলের কুশল কামনা করে লেখা।

প্রথম পত্রে তিনি দেশে ফিরে গঠনমূলক কাজ করার যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন দেশে ফিরে সে মতে কাজও শুরু করে দেন। বগুড়া জেলার মহীপুরে তিনি একটি কৃষি খামারের প্রতিষ্ঠা করেন চীনের বিশেষ সাহায্যে। হাজারীবাগ টেনারী ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডকটর মফিজউদ্দীন হন এর সেক্রেটারী।

ধীরে ধীরে মওলানা সাহেব রাজনৈতিক কর্মসূচী অপেক্ষা শিক্ষা বিস্তার ও সেবার কাজে অধিকতর আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ এখন দেশের অন্যতম বৃহত্তম কলেজে পরিণত হয়েছে। সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে মওলানা সাহেব জীবনের একটি ব্রত হিসেবেই তখন গ্রহণ করেছিলেন।

দরিদ্র মানুষের সেবা, কৃষক শ্রমিকের জন্য কাজ করার ইচ্ছায় তো তিনি জীবনই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীকে নিয়ে গঠন করেন খোদাই খেদমতগার দল। এই খোদাই খিদমতগার দল কিন্তু সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফ্ফার খানের ধর্ম নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবক দলের ব্লুপ্রিন্ট ছিল না। এ ছিল ইসলামের শান্তি নীতির অনুসারী মহতী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান।

মওলানা ভাসানী নির্যাতিত জনগণের যেমন প্রিয় ছিলেন, সেরূপ মানুষকেও তিনি ভালবাসতেন। উজিরে আজম, গভর্নর, প্রধান মন্ত্রী, জজ সাহেব, নেতা, শ্রমিক যিনি তাঁর পর্ণকুটিরে উপস্থিত হতেন তাকেই কিছু না খাইয়ে ছাড়েতন না। তাঁর কাছে বসিয়ে খাওয়ানোর এই আনন্দদায়ক সেবাতে ধনী-গরীব সবাই তৃপ্তির সাথে খেয়ে শান্তির স্বস্তি ভোগ করতেন।

মজলুম জননেতা ভাসানী জনগণের মুখপত্ররূপে অনেকগুলো সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' ও 'হক কথা'ই ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী নির্ভীক কাগজ। ৫০ দশকের প্রথমার্ধের সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' ও আশি দশকের 'হক কথা' নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বাণী নিয়েই বলিষ্ঠ ভাষায় জনগণের সমস্যা ও দুঃখকষ্টের কথা প্রচার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিশারীরূপে কাজ করেছিল। মওলানা সাহেব উত্তর বঙ্গ ও আসাম থেকেও কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তবে সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' ও 'হক কথা' তখনকার সমস্যাগুলো সঠিকভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছিল।

www.pathagar.com

এক সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মোহাম্মদ আলী সরকারের পক্ষ হতে প্রস্তাব আসে দৈনিক ইত্তেফাকের ডিক্লারেশনের একটি কপি সংগ্রহ করে সরকারের নিকট দেয়ার যাতে করে কাগজটি পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় মওলানা ভাসানীর হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায়। তিনি তখন একদিন আমাকে এবং কৃষক সমিতির সম্পাদক টাঙ্গাইলের জনাব হাতেম আলী খাঁকে ডিক্লারেশনটির খোঁজ নিতে বলেন। পরদিনই পুনরায় আমাকে ডেকে তিনি বলেন, 'মানিক, দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনামের নীচ হতে প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক থেকে আমার নাম মুছে ফেলেছে, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কাগজটি থাকুক, আরো ভালোভাবে চালু হোক, এটাই আমি চাই। ইত্তেফাক নামটি আমার বড়ই প্রিয়। আমি সরকারের কথায় কাগজটি ধ্বংস করতে চাই না। ডিক্লারেশনের কপির কোন প্রয়োজন নেই এবং আমি তা চাই না। তোমরা এজন্য কোন চেষ্টা করো না।'

১৯৭১ সালের সংগ্রামের সময় তিনি ভারতে চলে যাবার পর সেখানে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। এক সময় ন্যাপের সেক্রেটারী জনাব মশীয়ূর রহমান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু নাসের খান (বাবু)-সহ মওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যান। পশ্চিম বঙ্গের রাজস্ব মন্ত্রী মি. হরেকৃষ্ণ কুণ্ডার চেষ্টা করেছিলেন এঁদের সাথে যাতে মওলানার সাক্ষাৎ হয়। কুণ্ডারের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও ভারত সরকার তাঁদের সাথে মওলানা সাহেবের সাক্ষাতের অনুমতি দেন নি। এতে পরিষ্কার হয়ে পড়েছিল অন্য-দের অবাধে কাজ করার তুলনায় মওলানা সাহেবকে কিরূপ কঠোর নিরাপত্তায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

পাকিস্তান হতে শেখ মুজিবর রহমান দেশে ফিরে ক্ষমতায় বসার পরই কেবলমাত্র তাঁকে বন্দী বিনিময়ের কায়দায় বাংলাদেশে পাঠান হয়।

মওলানা সাহেবের ভারত হতে প্রত্যাবর্তনের পরই আমরা যেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তমুদ্দন মজলিসের অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক এমদাদ আলীসহ একদল কর্মীও সেদিন মওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য সন্তোষ গিয়েছিলেন, সেদিন সন্তোষে বার্ষিক ওরসও ছিল। মুসলমানদের জন্য খিচুড়ী বিরিয়ানী এবং হিন্দুর জন্য দই চিড়ার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন ভাসানী সাহেব ওরসের সময়।

আমরা যখন মওলানা সাহেবের সাথে আলাপরত মশীয়ূর রহমান (যাদু মিয়া) তখন যেয়েই মওলানা সাহেবের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব রাখেন ঃ 'হুজুর

www.pathagar.com

আমি একটি প্রস্তাব আপনার নিকট পেশ করার জন্য এসেছি। প্রস্তাবটি হলো আপনাকে আমাদের এই নতুন স্বাধীন দেশের উন্নতিকল্পে বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতার সাথে এদেশের জনগণের স্বার্থে দু'বছর (তাঁর সাথে) সহযোগিতা করতে হবে। এটাই আমার অনুরোধ ও তাঁরও ইচ্ছা।' প্রস্তাবটি শুনে আমি ও অপর কয়েকজন হৈ চৈ করে উঠলে মওলানা সাহেব বললেন, 'দিল্লীতে আমি গৃহবন্দী ছিলাম, ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট আবেদন করায় তাঁর সঙ্গে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়। প্রথমবার সাক্ষাতেই আমি চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন লাই-এর নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি চীনের সমর্থন কামনা করে পত্র লেখার অনুমতি চাই। প্রথম সাক্ষাতের সময় এই অনুমতি দানে তিনি অসম্মতি জানান। এরপর দ্বিতীয়বার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন অনুমতিদানে তিনি রাজী হয়ে বলেন, 'মওলানা সাহেব, এবার আপনি পত্র দিতে পারেন, আমরা বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য অভিযান চালাতে প্রস্তুতি নিয়েছি। কারণ এতদিন চীন জাতিসংঘের সদস্য ছিল না। এখন জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য হয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া '৬৫ সালের মত এবার আর চীন পাকিস্তানের পক্ষে বেপরোয়া আক্রমণ চালাতে পারবে না। আর জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব হলেই রাশিয়া ভেটো দেবে। কাজেই চীন সদস্য হওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহস পাবে না। এই সুযোগ আমরা হারাব না। আপনি লিখুন, আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করব।' এর পরই আমি মাও-সেতুং ও চৌ-এন লাই-এর নিকট পত্র লিখি। অবশ্য কোন জবাব আসে নি। এর কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

শেখ মুজিবের সাথে দু'বছরের সহযোগিতার প্রস্তাবের উত্তরে তিনি বলেন, 'ইন্দিরা গান্ধী আমার কপালে তিলক লাগিয়ে দিতে পারে নি। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লড়াই করে যাব। অন্য প্রসঙ্গে আলাপ কর।' এরপর জনাব মশীয়ুর রহমান ওরস উপলক্ষে মুরীদান কর্তৃক আনীত অতি বিরাট খাসির একটি রান মওলানা সাহেবের নিকট হতে আদায় করে হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে ঢাকা ফিরে আসেন। অল্পক্ষণ পরে আমরাও বিদায় নেই।

মওলানা সাহেব জীবনে খেলাফত কমিটি, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি (সি. আর. দাসের সময়), আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি,

www.pathagar.com

কৃষক সমিতি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, শান্তি কংগ্রেস প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও কর্মকর্তারূপে কাজ করেছেন।

তিনি বৃটিশ যুগ থেকেই কৃষক আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কৃষক শ্রমিকের মুক্তি সংগ্রামে তিনি অগ্রনায়কের ভূমিকায় কাজ করে গেছেন। উত্তর বঙ্গ ও আসামে কৃষক সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, পরে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মতো সংগঠন তাঁর নিজ হাতে গড়া। '৬৭ সালে তিনি কিউবার রাজধানী হ্যাভানা যান শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে। সাবেক মন্ত্রী এ. টি. এম. মুস্তফা গিয়েছিলেন প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারী হিসেবে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মুস্তফা সাহেব হ্যাভানাতেই ইন্তিকাল করেন।

মওলানা সাহেব রাজনৈতিক দল কৃষক সমিতির ন্যায় শ্রমিক সংগঠনের প্রধানরূপেও কাজ করেছেন। ১৯৫৪ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় তিনি আদমজী পাটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পূর্বে ছিলেন জনাব মাহমুদ আলী এর সভাপতি। মওলানা সাহেবের পর জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তারপর মৌলবী ফরিদ আহমদ হন এই ইউনিয়নের সভাপতি। মওলানা সাহেব শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া ও শেখ মুজিবর রহমান, জনাব অলী আহাদ, জনাব মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী, মি. ননী চৌধুরী ও অন্যান্যসহ আমাদেরকে নিয়ে আদমজী মিলে যেয়ে উপস্থিত হন এবং দাঙ্গা বন্ধের জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিজি হাসপাতালে রোগে শয্যাশায়ী থেকে একটি সাচ্চা শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তিনি জনাব মিছির আহমদ ভুঁইয়া ও আমাকে বলেন। নানা কারণে আমার পক্ষে উক্ত শ্রমিক সংগঠনে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও জনাব আবু নাসের খানকে সভাপতি ও জনাব মিছির আহমদ ভূঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে তখন একটি নতুন শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। এর পূর্বে '৭২ সালে ১৫ই মার্চ টাঙ্গাইলে সড়ক পরিবহণ শ্রমিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন তিনি। কতিপয় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নেতার আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে আমার এবং টাঙ্গাইলের শ্রমিক নেতা হাবিবুর রহমান খানের অনুরোধে অসুস্থতা নিয়েও সম্মেলনে উপস্থিত হন তিনি।

www.pathagar.com

মওলানা সাহেব বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন সত্য তবু রাজনৈতিক আন্দোলন হতে দূরে সরে যান নি। তখন তাঁর সাপ্তাহিক 'হক কথা' একদলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিল। বাকশাল প্রতিরোধে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বায়তুল মুকাররমে একদলীয় ব্যবস্থাবিরোধী সমাবেশ করতে যেয়ে জনাব মশীয়ূর রহমান ও জনাব অলী আহাদ গ্রেফতার হন। ভাসানী সাহেবকে পুলিশ টাঙ্গাইল নিয়ে সেখানে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর মোশতাক সরকারের আমলে তিনি নজরবন্দী হতে ছাড়া পান। সমাবেশ হতে জনাব আতাউর রহমান খানকে পুলিশ কর্তৃক তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে নিয়ে রেখে দেয়া হয়।

বাকশাল গঠিত হবার পর একদলীয় ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে তাঁর সাহায্য কামনা করে তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোগী বামপন্থীরা বিশেষ করে জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ আমার মারফত যোগাযোগ করেন। এতে আমার সাথে সহযোগিতা করেন আত্মগোপনকারী সাংবাদিক জনাব হাবিবুর রহমান। তোয়াহা সাহেবদের সাথে গোপনে দেখা করার জন্য মওলানা সাহেব জনাব গোলাম কবির প্রকাশিত দৈনিক বঙ্গবার্তা উদ্বোধন করার নামে ঢাকায় এসে মতিঝিল ন্যাপ অফিসে (জনাব ফয়জুর রহমানের 'মুখপত্র' কাগজের অফিস), অবস্থান করেন। তবে গোপন আন্দোলনের নেতা জনাব শান্তি সেন প্রমুখরা রটিয়ে দেয় মওলানা সাহেব 'সাম্প্রদায়িক'। তাই তাঁর সাথে কম্যুনিস্ট নেতাদের দেখা করা উচিত হবে না। আমি উত্তেজিতভাবে কম্যুনিস্ট নেতাদের কাজের প্রতিবাদ করায় রাত্রে গোপন আস্তানা থেকে বের হয়ে এসে তোয়াহা সাহেব টাঙ্গাইল যেয়ে মওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন বলে চলে যান। তবে এই সাক্ষাৎ আর আদৌ হয় নি। আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য মোহাম্মদ তোয়াহাদের সাথে বৈঠক না হওয়ায় মওলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে কাগজটির উদ্বোধন না করেই সন্তোষ চলে যান। অবশ্য যাবার সময় বলে যান, 'ফজলু, তুমি তোয়াহাকে বলো সে যদি সন্তোষ আসে তবে তার নিরাপদে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার।' নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, মোহাম্মদ তোয়াহা আর সন্তোষ গেলেন না। তোয়াহাদের সেদিনের আন্দোলনবিমুখতা দেখে মওলানা সাহেব বলেছিলেন, 'কম্যুনিস্টরা বস্তুবাদী হিসেবে অসুবিধায়

www.pathagar.com

পড়বে এই ভয়ে আমার নিকট হতে দূরে থাকতে চাচ্ছে, মনে হয় মনি সিং শান্তি সেনের সাথে মিতালীর জন্য তোয়াহাও এই পথই ধরেছে। আচ্ছা ভাল কথা।' এর পরই মওলানার সাথে নতুনভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তরুণ বিপ্লবী জনাব সিরাজ শিকদারের। সিরাজ শিকদার দলবল নিয়ে সন্তোষ যেয়ে মওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১৬ই ডিসেম্বরে।

শেখ মুজিবর রহমান বাকশাল দলীয় ব্যবস্থা ঘোষণা করলে যাতে জনাব আতাউর রহমান খান এতে যোগ না দেন সে সম্পর্কে মওলানা সাহেব দ্বারা প্রভাব বিস্তার করবার জন্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অনুরোধে আমি টাঙ্গাইল যেয়ে মওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জনাব আতাউর রহমান সাহেবের নিকট পত্র লিখতে অনুরোধ করি। চিঠি না দিয়ে তাঁর পক্ষ হয়ে আমাকে জনাব আতাউর রহমান খান যাতে বাকশালে যোগ না দেন সেজন্য অনুরোধ করতে বলেন।

মওলানা সাহেবের নির্দেশমত আমি জনাব মিছির আহমদ ভূঁইয়া ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী নেতা রুহুল আমিনসহ সাক্ষাৎ করি জনাব আতাউর রহমান খানের সঙ্গে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বোঝা গেল, জনাব আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগ দেবার মনস্থির করে ফেলেছেন। তাঁর সাথে কথা বলার সময়ই অন্য ঘর থেকে এসে তাঁর নাতি খবর দিলো, এইমাত্র টেলিভিশনে খবর এসেছে শেখ সাহেবের পিতা শেখ লুৎফুর রহমান টুঙ্গিপাড়ার বাড়ীতে ইন্‌তিকাল করেছেন। অবস্থা বিবেচনা করে আমরাও জনাব আতাউর রহমানের বাসভবন থেকে চলে এলাম।

অল্পদিন যেতে না যেতেই দৈনিক ইত্তেফাকে একই দিনে মওলানা ভাসানী ও জনাব আতাউর রহমান খানের দু'টি বিবৃতি পাশাপাশি প্রকাশিত হলো। ভাসানী সাহেব বললেন, আজীবন অপজিনিস্ট হয়ে কেন আমি বাকশালে যোগদান করিলাম না .....অন্যদিকে বাকশালে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করে জনাব আতাউর রহমান খান বিবৃতি দেন।

মওলানা ভাসানীর জীবন সায়াহ্নের ঐতিহাসিক ঘটনা ফারাক্কা লংমার্চের মিছিল। পিজি হাসপাতালে রোগশয্যায় থাকা অবস্থায় ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি এই দীর্ঘ দেড়শত মাইলের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মওলানা সাহেব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা লাভের প্রয়োজনে জরুরী সহায়তা কামনাকল্পে পিজি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জাতিসংঘ ও আমেরিকা সফরের বাসনা করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

অবশ্য পরপারের ডাক আসায় তাঁর আর জাতিসংঘ ও আমেরিকা সফর হয়ে উঠল না। তবে বাংলাদেশ যতদিন দুনিয়ার বুকে থাকবে, ততদিন মওলানা ভাসানীর দেশ-জাতি ও মজলুম মানুষের সেবা জনগণের নিকট আদর্শ ও প্রেরণার উৎসব হিসেবে অনির্বাণ শিখারূপে দীপ্তিময় আলোর দিশারীর মতো কাজ করবে। তিনি হয়ে থাকবেন ইসলাম, মানবতা ও বাংলাদেশী জাতীয়তার নির্ভীক সেনানীর প্রতীক। আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশ্ত নসীব করুন।

www.pathagar.com

এস. মুজিবউল্লাহ্

মওলানা ভাসানী : হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদ

মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন অতি বিচিত্র। কোনো একজন মানুষের জীবনে এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল, এখনও আছে। সেজন্য অনেকে তাঁকে বলতেন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, এখনও বলেন। তাঁর রাজনৈতিক অনুসারী ও আধ্যাত্মিক ভক্তদের কাছে তিনি যেমন ছিলেন নয়নের মণি তেমনিই বিরোধীদের চোখের শূল।

১৯৭৬ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁর ইন্তিকালের মাত্র ৪ দিন পূর্বে সন্তোষস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খোদায়ী খিদমতগার সমাবেশে তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে যে বক্তব্য পেশ করেন তা নানা কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং তাঁর বিগত ৭৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সারসংকলনও বটে। খোদায়ী খিদমতগার সংগঠন ছিল তাঁর জীবনের শেষ অরাজনৈতিক অথচ বিপ্লবী সংগঠন। এ সংগঠন অরাজনৈতিক এজন্য যে, চিরাচরিত নিয়মে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এর উদ্দেশ্য ছিল না। আবার এ সংগঠনকে বিপ্লবী বলা হয় এজন্য যে, এই সংগঠন সমাজে বসবাসকারী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মেহনতি মানুষের উপর চেপে থাকা শোষণের অবসান দাবী করে। খোদায়ী খিদমতগার সমাবেশে মওলানা ভাসানী বলেন, 'আমার বিগত ৭৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার হাতবদল কখনো বা অতি নিকট হইতে কখনো বা কিঞ্চিৎ দূর হইতে অবলোকন করিয়াছি। এই পর্যায়-ক্রমিক পট পরিবর্তনের ধারায় আমি নিজেও সাধ্যমত সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছি। কিন্তু যে কৃষক, মজদুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আবাল্য দেখিয়াছি ও সেজন্য সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা আজও সুদূরপরাহত রহিয়া গিয়াছে। তাই আমার

www.pathagar.com

সংগ্রামের শেষ নাই। এই সংগ্রাম আজীবন চলিবে। আমার মৃত্যুর পর এই সংগ্রামের উত্তরাধিকার তাহাদের উপর বর্তাইবে যাহারা এক আল্লাহ্কে প্রভু জানিয়া এবং তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে খেদমত আলোক অর্থাৎ মানব জাতি তথা সমগ্র সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। জীবন সায়াহ্নে উপনীত হইয়া খোদায়ী খিদমতগাররা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে। মদিনার নবীর আসহাবে সুফফার জীবনই হইবে তাহাদের আদর্শ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও জাগতিক দেনা-পাওনাকে তাহারা এড়াইয়া চলিবে ঘৃণাভরে। মানুষের শাসনবাদকে উৎখাত করিয়া আল্লাহ্‌র শাসনবাদ কায়েম করাই হইবে খোদায়ী খিদমতগারদের লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতি তাহারা সর্বাবস্থায় পরিহার করিয়া চলিবে। সেবা ও সংগ্রামের পথই খোদায়ী খিদমতগারদের পথ। হক্কুল ইবাদ আদায় করাই হইবে তাহাদের সকল কর্ম প্রয়াসের মূলমন্ত্র এবং ইহাই হইবে আমার রাজনীতিসহ সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তিমূল।'

প্রকৃতপক্ষে 'হক্কুল ইবাদ'-এর প্রসঙ্গ মওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৩ই নভেম্বরই প্রথম উত্থাপন করলেন তা নয়। সারা জীবন ধরেই তিনি হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ মানুষের হক বা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি একাধারে যেমন আদর্শ নমুনা-স্বরূপ বগুড়ার মহিপুরে বিভিন্ন স্তরের মেহনতি মানুষের সমবেত শ্রমের সমবণ্টনভিত্তিক হক্কুল ইবাদ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনিই সারা দেশের অধিকারহারা মানুষকে একটা সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করেন। মওলানা ভাসানী তাঁর শেষ ভাষণে আরও বলেন, 'বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তেমন আশাব্যঞ্জক নয়, সারা দুনিয়া আজ কতিপয় পরস্পর-বিরোধী জোটে বিভক্ত। ফলে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতাগর্বিত মানুষ পরস্পরকে নিধনের মতলবে বিরামহীন মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ইহারই পরিণতিতে সমগ্র পৃথিবী একটি মারাত্মক অস্ত্রাগারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ছোট-বড়, গরীব-ধনী—সকল রাষ্ট্রই এই আত্মঘাতী মাতলামীতে নিমগ্ন। অথচ আজও বিশ্বের প্রায় তিন চতুর্থাংশ মানুষ নিদারুণ দারিদ্র্য-কবলিত এবং এই বিশ্বগ্রাসী সমস্যা ও সংকটের মূল উৎস সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ পরিহার

www.pathagar.com

করিয়া সকলে সার্বজনীন কল্যাণ প্রয়াসে আত্মনিয়োগে করিলে অভাবিত-রূপে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী হইতে দুঃখ-দারিদ্র্য মুছিয়া ফেলা যাইবে। কিন্তু এই আশা ততদিন পর্যন্ত দুরাশাই থাকিয়া যাইবে যতদিন না মানব জাতি এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার স্বীকার করিয়া লইবে। পারস্পরিক পালনবাদী সম্পর্কই হইবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি। ইহারই নাম রব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদ। এইদিক হইতে নবজাগ্রত মুসলিম বিশ্বেরও সবিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকেই হইতে হইবে রব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারক ও বাহক। আন্তর্জাতিক পরিসরে এই আদর্শের প্রচার ও প্রসার সাধন করাই খোদায়ী খিদমতগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।’

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলো। তবু আজীবন বিতর্কিত মওলানা ভাসানীর জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে তাঁর শেষ ভাষণের উদ্ধৃত অংশটুকু বিশেষ উপযোগী হবে বলেই মনে হয়। দেশের হাক্কানী আলেম সমাজের অনেকে তাঁকে পছন্দ করতেন না। ইবাদত-বন্দেগী ও সাধ্যমত ইসলাম প্রচারের মধ্যে আপন কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি ইসলামী দর্শনভিত্তিক রাজনৈতিক আইনের প্রথম কাতারের ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন বলেই নয়, তাঁর রাজনৈতিক অনুসারীদের প্রায় সবই ছিলেন জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাস্য। নাস্তিক এবং পরলোক বিলোপ-বাদীদের দ্বারা যে মওলানা সব সময় পরিবেষ্টিত থাকেন তিনি কি করে রসূলুল্লাহ (স.)-এর উম্মত হতে পারেন এবং কি করেই বা হতে পারেন আল্লাহ্‌র নেক বান্দা এটা বিশ্বাসের বিষয় বৈকি!

মওলানা ভাসানীকে নাস্তিক, কম্যুনিস্ট ইত্যাকার বিশেষণে ভূষিত হতে দেখে বিস্মিত হতে হয়। এসব অভিযোগ যে মওলানা ভাসানীর কান পর্যন্ত আসতো না তা নয়, কিন্তু তিনি কোনদিন এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন বলে শুনি নি। কপালের চামড়ায় একটুও ভাঁজ না ফেলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লেখা সমুদয় সমালোচনামূলক খবর বা নিবন্ধ পাঠ করতে পারতেন। এবং পড়া হলে কাগজটা বা বইটা এক পাশে সরিয়ে রেখে আবার

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেতে পারতেন, যেতেনও। ইসলামী চিন্তাবিদ মনীষী আল্লামা আবুল হাশিমের সংগে এক ঘরোয়া আলাপে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ঘরে যখন আগুন লাগে তখন পানির বালতি নিয়ে দৌড়ানোই কি অধিকতর জরুরী কর্তব্য নয়? এক মুঠো ভাতের অভাবে যখন দেশের মা-বোনের ইজ্জত রাস্তা ঘাটে বিলিয়ে যাচ্ছে, কাফনের অভাবে কলাপাতায় ঢেকে যখন দাফন করা হচ্ছে কৃষক মজুরের লাশ, তখনও যারা জেহাদে না নেমে ঘরে বসে আল্লাহ আল্লাহ্ করছেন তাদের বাদ দিয়ে যারা দৃশ্যত আল্লাহ মানে না অথচ জেহাদ করতে চায়, আমি যদি তাদের সংগেই থাকি তাহলে কি অন্যায় হয়? অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদকারীর জাতবিচার করবো আমি কি এতই মূঢ়!'

শেষ জীবনে কম্যুনিস্ট বামপন্থীদের আচরণে তিনি খুবই হতাশ হন এবং তাঁরাও হতাশ হয়ে মওলানা ভাসানীর সাহচর্য বা সান্নিধ্য ত্যাগ করে দূরে সরে যান। উভয় পক্ষ পরস্পরকে কেন ত্যাগ করলেন, বর্তমান প্রসংগে সে আলোচনা অবান্তর। তবে এটুকু বলা দরকার যে, এদেশের কম্যুনিস্ট বামপন্থীরা শেষ পর্যন্ত যখন মার্কসের শ্রেণীতত্ত্বের দ্বারা মওলানা ভাসানীকে কব্জা করতে ব্যর্থ হলেন তখনই তারা সরে দাঁড়ালেন। মওলানা ভাসানী দেশী বিদেশী সমুদয় শোষণ থেকে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এ বিষয়ে তাঁর আর্দশ ছিল হক্কুল ইবাদ। হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক এবং হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র হক সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর নিজস্ব একটা চিন্তাধারা ছিল। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে এই দুটি হক-এর মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। বান্দার হক যথাবিহিত আদায় করলেই আল্লাহ্র হকও আদায় হয়ে যায়। মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, 'আল্লাহ সর্ববিষয়ে যেহেতু অভাবহীন, কাজেই কোন কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রকৃত বিচারে এই দু'টি হকই অভিন্ন। হক্কুল ইবাদ সম্পর্কে উদাসীন থেকে আল্লাহ্র হক আদায় করার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র।' এ বিষয়ে আল্লামা আবুল হাশিমের বিশ্লেষণ মওলানা ভাসানীর সংগে আশ্চর্যরকম মিলে যায়। 'রব্বানী দৃষ্টিতে' গ্রন্থে হক্কুল ইবাদ প্রসঙ্গে মনীষী আবুল হাশিম লিখেছেন, 'রবুবিয়াত'-এর 'খলিফা' হিসাবে মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব দ্বিবিধ। তা হলো: নিজের প্রতি কর্তব্য ও অপরের প্রতি কর্তব্য। সাধারণ ভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় হক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্র প্রাপ্য (হক) এবং দ্বিতীয়টিকে

www.pathagar.com

বলা হয়, হক্‌কুল ইবাদ বা আল্লাহ্‌র দাসদের প্রাপ্য। হক্‌কুল্লাহ্‌ আসলে হলো 'হক্‌কুল নফস' অর্থাৎ নিজের জন্য প্রাপ্য, কেননা আল্লাহ্‌ সকল অভাব-অনটনের উর্ধ্বে এবং তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন। বিশ্বাসী বান্দা 'সালাত'-এ তাঁর সামনে ভূলুন্ঠিত হয়ে বা রমযানের সিয়াম সাধনা করে তাঁর কোন উপকার সাধন করে না। নিজেরই কল্যাণ হাসিল করে। আল্লাহ্‌র হক (হক্‌কুল্লাহ্‌) সম্পর্কীয় প্রচলিত ধারণাও সৃষ্টতার মানবীয়তা আরোপমূলক আরেকটি ধারণা এবং সেহেতু ইসলামের শিক্ষার বিকৃতিমাত্র মানুষের এমন কোন কাজ করবার অধিকার নেই যা তার নিজের বা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর। নিজের, নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।'

প্রকৃতপক্ষে মানুষের পক্ষে হক্‌কুল ইবাদ পালন একটি অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ। এটিকে বাদ দিয়ে কিংবা এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা বাতুলতামাত্র।

বস্তুত হক্‌কুল ইবাদ বলতে মানুষের হকই বোঝায় না। এর অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সমুদয় মানুষ ছাড়াও সমুদয় জীবের 'হক্ক'-ও এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন, 'ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায় ইসলামের খলীফা হিসাবে আমি তার জন্য দায়ী।' আধুনিক যুগের শাসকদের মুখে এ ধরনের কথা কল্পনাও করা যায় না। হযরত উমর (রা.)-এর এ বক্তব্যকে আধুনিক যুগের মানুষ বাগাড়ম্বর মনে করতে পারেন কিন্তু ওয়াকিবহাল সবাই জানেন, এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষেই এত দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন যে গৃহদ্বারে একটি কুকুরকে উপবাসী রেখেও পূর্ণ আহার গ্রহণ মুসলমানের জন্য নাজায়েয।

মনীষী আবুল হাশিম হক্‌কুল ইবাদ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, 'নিজের সম্পত্তি শুধু নিজে ভোগ-সুখ বা নিজ পরিবারের আরাম আয়েসের জন্য ব্যয়ের অধিকার কোন মুসলমানকে দেয়া হয় নি বরং তার প্রতিবেশীদের হক রয়েছে তার সম্পদ থেকে ফায়দা গ্রহণের। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ যারা এতিমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন সে সকল উপাসনা-কারী অভিশপ্ত' (রব্বানী দৃষ্টিতে—পৃ. ৬৮)। আল কুরআনে আরও বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো পুণ্য নেই, বরং তা রয়েছে আল্লাহ, শেষ বিচারের দিন, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবীদের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্র প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও প্রার্থীজনের সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে।

মওলানা ভাসানী 'হক্কুল ইবাদ' তথা বান্দার হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। দেশের নানা স্তরের সর্বাহারা মেহনতি ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করতেন বলেই দেশের কম্যুনিস্ট বামপন্থীরা মনে করেছিলেন মওলানা ভাসানীকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজে লাগানো যাবে। তারা সেই উদ্দেশ্যেই মওলানা ভাসানীর দলে এসেছিলেন। তাঁর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও তার অঙ্গ সংগঠন কৃষক সমিতির এক সময় সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশের দু'জন কম্যুনিস্ট নেতা। তাঁর দলে প্রবীণ কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও আলহাজ্জ বজলুল সাত্তারের মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও ছিলেন, নিখিল পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির শেষ জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন হয় সন্তোষে ; একজন কম্যুনিস্ট পাঠান শ্লোগান তোলেন, 'মজলুম জনতার লিডার মওলানা ভাসানী, পূর্ব পাকিস্তানকা লিডার মওলানা ভাসানী, পাকিস্তানকা লিডার মওলানা ভাসানী, এশিয়াকা লিডার মওলানা ভাসানী, এশিয়া আফ্রিকা আওর লাতিন আমেরিকা কা লিডার মওলানা ভাসানী, দুনিয়াকা লিডার মওলানা ভাসানী।'

মওলানা ভাসানী কৃষক শ্রমিকসহ নানা স্তরের বৃত্তিজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন তাঁর মূল লক্ষ্য হক্কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যেই। তাই বলে মার্কস উদ্ভাবিত শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে যে কারণেই হোক এই বিশ্বাস তাঁর জন্মেছিল হক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মেহনতি জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসা দরকার। তিনি বলতেনও, যতদিন দেশে কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির রাজ প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন হক্কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। গণচীনের নেতা মাও সেতুং সোভিয়েত রাশিয়াকে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে

www.pathagar.com

অভিহিত করেন। এদেশের কম্যুনিস্টরাও রুশপন্থী ও চীনাপন্থী এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী যদিও কম্যুনিস্ট ছিলেন না তবু তাঁকে চীনাপন্থী মওলানা নামে অভিহিত করা হতো।

একথা সর্বস্বীকৃত যে, আজকের দিনে মহান আল্লাহ্‌র দান প্রাকৃতিক সম্পদের সিংহভাগ ব্যয়িত হচ্ছে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে হানাহানি আর সমরসজ্জায়। এক হিসেবে জানা গেছে, প্রতি মিনিটে এই ব্যয়ের পরিমাণ দুই কোটি ডলার। যদি এই বিপুল সম্পদ পরস্পর হানাহানি ও সমরসজ্জায় অপচয় না করা হতো তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষের কোন সমস্যা থাকতো না। আজ সারা বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ চরম দারিদ্র দশায় মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিদিন বিশ্বের হাজার হাজার আদম সন্তান এক মুঠো খাবারের অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। অপুষ্টিতে ধুকে ধুকে মরছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। অন্যদিকে জীবনের ভোগের প্রসাধন উপচে পড়ছে কানায় কানায়। বিশ্বব্যাপী মানব জীবনের এই চরম বৈপরীত্যকে মরহুম মওলানা ভাসানী বলতেন, শয়তানের কাণ্ডকারখানা। বিশ্বব্যাপী হক্‌কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সিংহহৃদয় মওলানা ভাসানী ইন্‌তিকাল করেছেন ভগ্নহৃদয়ে। ইন্‌তিকালের পূর্বে তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আহ্‌বান জানিয়েছিলেন, 'তোমরা সব রববানী হইয়া যাও।'

আসুন, আমরা মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পদাংক অনুসরণ করে এবং তাঁর আদর্শকে কাজে লাগিয়ে হক্‌কুল ইবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং মনে মনে এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠি যে, হক্‌কুল ইবাদ একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই—কারণ মহান আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার তাঁর বান্দাদের হক আদায়ের সংগ্রামে তিনি অবশ্যই মদদ যোগাবেন।

www.pathagar.com

আজাদ সুলতান

জীবিত ভাসানীর চেয়ে মৃত ভাসানী অনেক শক্তিশালী

'জীবিত ভাসানীর চেয়ে মৃত ভাসানী অনেক শক্তিশালী।' আফ্রো-এশিয়ার একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, কৃষক শ্রমিক মেহনতি সর্বহারা মানুষের নয়নমণি, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের চরম বিরোধী, আপোষহীন সংগ্রামী জননেতা, ধর্মপ্রাণ, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যু ও তার পরবর্তী দেশ ও দেশান্তরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই একথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ মহান মনীষীর সহচর হিসাবে কিছুদিন সান্নিধ্যে আসার ও থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন মানুষ পৃথিবীতে আছে কিনা জানি না। মওলানা ভাসানীর সাহচর্যে থেকে যে সকল গুণাবলীর সমন্বয় আমি তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি, তা হলো ১. দেশের গরীব-ভুখা-নাংগা, সর্বহারা, কৃষক-মজুর, মেহনতি মানুষের প্রতি গভীর মর্ম-বেদনা ও অনুভূতি; ২. সাধারণ মানুষের মন-মানসিকতা, দেশের গতি-প্রকৃতি বুঝবার বিচক্ষণতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি; ৩. দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম, আবেগপূর্ণ ভালবাসা; ৪. অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপিত করার জন্য যাদুকরী প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা; ৫. সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবেশের মধ্যে থেকে পরিস্থিতি অনুকূলে আনবার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ও ঝুঁকি-পূর্ণ পদক্ষেপ নেয়ার মত সাহস ও দৃঢ়তা; ৬. সত্য ও ন্যায়ের পথে আল্লাহ্‌র নামে জীবন উৎসর্গ করার মত মনোবল; ৭. সাধারণ মানুষকে সমাজ ও শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তোলার অপূর্ব দক্ষতা; ৮. অর্থের ও ক্ষমতার মোহ কোনদিন গণআন্দোলনের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা কর্মতৎপরতা থেকে বিরত করতে পারে নি এবং জনগণের কল্যাণের জন্য মানবতার কাজই ছিল তাঁর প্রকৃত ধর্ম। আমার মনে হয়

www.pathagar.com

এই সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীই মওলানা ভাসানীকে মহান থেকে মহীয়ান করে তুলেছিল।

মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় রাজনৈতিক বা স্বার্থের কারণে তিনি হয়তো কারো কারো কাছে বিতর্কিত, রহস্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু এই মহান নেতার তিরোধানের পর সেই সব কঠোর সমালোচক নিন্দুকের কাছেও তিনি মহান সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। মওলানা ভাসানীর কথাগুলো ও উক্তিগুলো যারা একদিন খুবই তিক্ত মনে করতো তাদের কেউ কেউ মওলানার কথা আর শুনতে পাচ্ছে না বলে আফসোস করতে দেখা যাচ্ছে।

মওলানা ভাসানীর নিতান্ত নিকটের মানুষ হিসাবে তাঁর অনেক কথা অনেক সময় গতানুগতিক, হালকা, বাত্‌কা বাত্‌ বলে মনে করতাম—এখন যেন প্রতিটি মুহূর্তে মওলানার সেই কথা ও উক্তিগুলো কত গভীর কত বাস্তব, কত কঠোর ছিল তা মনে মনে উপলব্ধি করছি আর বড়ই অসহায় বোধ করছি—এখন যেন তেমনি আর কোন নেতার কণ্ঠ সোচ্চার হচ্ছে না—অত্যাচার, শোষণ, জুলুমের বিরুদ্ধে, ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে, লুটপাটের বিরুদ্ধে, অভাব অনটনের বিরুদ্ধে, দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে, দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে আর যেন কোন নেতার মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা-পীড়িত অসহায় মানবতাকে রক্ষার জন্য সে রকম আকুলতা ও ব্যাকুলতা। আর যেন কোন নেতার কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে না শোষক-শাসক গোষ্ঠীর বেড়াজাল, স্ট্রীম রোলার ভেংগে ফেলার মত বজ্রের আওয়াজ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদী শক্তির উপর কেউ যেন আর তেমন মরণ আঘাত হানছে না, দেশী-বিদেশী শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কোন বলিষ্ঠ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। তাই যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততই যেন মওলানা ভাসানীর অভাব গভীরভাবে অনুভব করছে দেশের আপামর জনসাধারণ।

আমার বিশ্বাস, যতদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরংকুশ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে, জনগণের উপর থেকে শোষণ ও জুলুম বন্ধ না হবে, কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মজলুম জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মোচন না হবে, মেহনতি মানুষ জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড

www.pathagar.com

কৃষক সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সাধন না হবে, ততদিন মওলানা ভাসানীর কথা ভোলা যাবে না। সূফীর মিশনের কামিয়াবী ঘটে তার তিরোধানের পর, তাই আমি মনে করি—আমাদের দেশের অনাগত ভবিষ্যতের জন্য মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর দিকদর্শন ও উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মজলুম জনগণের প্রকৃত মুক্তি। এই কারণেই আমি মনে করি—'জীবিত মওলানা ভাসানীর চেয়ে মৃত মওলানা ভাসানী অনেক শক্তিশালী।'

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের ঘটনাপঞ্জী

১৮৮০ ঃ জন্ম ঃ ১২ ডিসেম্বর, গ্রাম ঃ ধানগড়া, সিরাজগঞ্জ। পিতা ঃ হাজী শরাফত আলী খান। ৬ বৎসরে পিতৃহীন, ১১ বৎসরে মাতৃহীন।

১৮৯৭ ঃ পীরের সাথে আসাম গমন। মওলানার পীর সাহেবের নাম হযরত সৈয়দ নাসিরউদ্দিন বোগদাদী (রহ.)।

১৯০৩ ঃ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান।

১৯১৯ ঃ কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান। মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, গোখলে, সি. আর. দাস, গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সহকর্মী ছিলেন। জীবনে সর্বপ্রথম কারাবরণ ১০ মাস।

১৯২৪ ঃ আসামের ভাসানচরে ঐতিহাসিক সম্মেলন। এই সম্মেলনেই মওলানা আবদুল হামিদ খানকে 'ভাসানীর মওলানা' বলে জনসাধারণ সম্বোধন করতে থাকেন।

১৯২৫ ঃ প্রথম বিবাহ বীরনগর, পাঁচবিবি, বগুড়া। এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে মওলানা আরও দু'বার দার গ্রহণ করেন। একটি টাংগাইল আর একটি রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে। প্রথম স্ত্রী ছাড়া কেউ আর জীবিত নেই। মওলানার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে এক ভগ্নি এখন জীবিত আছেন।

১৯২৬ ঃ আসামে কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

১৯২৮ ঃ আসামের ঘাগমারীতে নিজ হাতে কুঁড়েঘর তৈরী এবং অবস্থান। পরে এই ঘাগমারীর আর এক নাম 'হামিদাবাদ' রাখা হয়। আসামে মওলানা আট বার কারাবরণ করেন।

www.pathagar.com

১৯২৯ ঃ ঐতিহাসিক ভাসানচর (আসাম) সম্মেলন।

১৯৩০ ঃ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান।

১৯৩১ ঃ সন্তোষের কাগমারীতে আগমন। সন্তোষ মহারাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠন। মহারাজার পক্ষে সরকারী কর্তৃপক্ষ টাংগাইল থেকে মওলানা ভাসানীকে বহিষ্কৃত করে দেন।

১৯৩২ ঃ সিরাজগঞ্জে ঐতিহাসিক কাওয়াখোলা কৃষক সম্মেলন।

১৯৩৪ ঃ বন্যার্তদের সাহায্যার্থে নওগাঁতে কৃষক সম্মেলন আহ্বান।

১৯৩৫ ঃ বাংগাল খেদা আন্দোলন শুরু এবং গ্রেফতার।

১৯৩৭ ঃ আসামে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু। এই সময় মওলানা সাহেব আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন আর স্যার সাদুল্লাহ্ আসামের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মতবিরোধ শুরু এবং বড়পেটা সম্মেলন আহ্বান।

১৯৩৮ ঃ রংপুরের গাইবান্ধায় কৃষক সম্মেলন আহ্বান।

১৯৪০ ঃ ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যোগদান।

১৯৪৬ ঃ সিলেটের গণভোটে নেতৃত্ব দান। সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের ভাগে রাখতে সফল হন।

১৯৪৭ ঃ আসামে ৩রা ও ৪ঠা মার্চে বেংগল আসাম মোজাহিদ সম্মেলন, ন্যাশনাল গার্ডস সম্মেলন, নওজোয়ান সম্মেলন ও লিটারারী কনফারেন্স করেন।

১৯৪৮ ঃ ভারতীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে তৎকালীন পূর্ববাংলায় আগমন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু। এই সালে প্রথম মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন করেন। এই সময় কলিকাতা থেকে ফিরে এসে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মওলানা ভাসানীর সাথে যোগদান করেন।

১৯৪৯ ঃ এই সালের ১১ অক্টোবর বিকালে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আরমানিটোলা ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠান। ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তানে এলে তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকাতে ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দান।

১৯৫০ ঃ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট।

১৯৫২ ঃ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কারাবরণ।

www.pathagar.com

১৯৫৪ ঃ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বার্লিন যাত্রা। ঐ সময় ৫ মাস লণ্ডনে অবস্থান। স্টকহল্মে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান। একই সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়। ঐ বৎসরেই ৯২-ক ধারা জারী। তৎকালীন গভর্নর ইস্কান্দার মীর্যা কর্তৃক ভাসানীকে দেখা মাত্র গুলী করার নির্দেশ দান।

১৯৫৬ ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন আহ্বান। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কৃষক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন।

১৯৫৭ ঃ ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। এই বছরের ২৭ জুলাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী-দের প্রতি 'আস্সালামু আলায়কুম' জানান এবং সীমান্ত গান্ধী গাফফার খান, আচকজাই, আবদুল মজিদ সিন্ধী, মিয়া ইফতেখারকে নিয়ে একটি প্রগতিশীল পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির নাম 'পাকিস্তান ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি'। উল্লেখ্য যে, মওলানা ভাসানী প্রথমে কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে, মুসলিম লীগ থেকে আজাদ পাকিস্তান পার্টিতে কাজ করেন, তারপর আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ, সর্বশেষ দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। তিনি ১১ বৎসর আসাম আইন সভার সদস্য ছিলেন। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে ফুলছড়িতে কৃষক সম্মেলন আহ্বান।

১৯৫৮ ঃ আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ, সামরিক আইন জারি। মীর্জাপুর হাসপাতাল থেকে আইয়ুব সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার। ঢাকায় ৪ বৎসর ১০ মাস অন্তরীণ।

১৯৬২ ঃ অক্টোবর মাসে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। এর পর নৌকাযোগে বন্যাপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ।

www.pathagar.com

১৯৬৩ ঃ মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে সাক্ষাৎকার, গণচীনের জাতীয় দিবসে যোগদান। এই সময় তিনি চেয়ারম্যান মাও সেতুং এবং প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন লাই-এর সাথে সাক্ষাত করেন।

১৯৬৪ ঃ এই সালের জানুয়ারী মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী-শিবির' গঠন। ১৯ জানুয়ারী 'সার্বজনীন ভোটাধিকার দিবস' আহ্‌বান। এর পরে জাপানের টোকিওতে বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান। পুনরায় নয়াচীন গমন।

১৯৬৫ ঃ কিউবার রাজধানী হাভানায় আফ্রো-এশিয়া সংহতি সম্মেলনে যোগদান। এই সালে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন। আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নাম প্রস্তাব।

১৯৬৭ ঃ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব রাজনীতিতে বিভক্তির কারণে ন্যাপের মধ্যে ভাংগন। মওলানা সাহেবের বামপন্থী ন্যাপের নেতৃত্ব গ্রহণ। ২৯ নভেম্বর কৃষক সমিতি ও ৩০ নভেম্বর রংপুরে ন্যাপ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান।

১৯৬৮ ঃ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। ঐতিহাসিক 'ঘেরাও' আন্দোলন প্রবর্তন।

১৯৬৯ ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণদান। এই সভায় শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে দেশে 'ফরাসী বিপ্লব' করার হুমকি দান। সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাযা পাঠ। ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ এবং শেখ মুজিবের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। ৮ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান সফর। শাহীওয়ালে মওলানার উপর গুণ্ডাদের হামলা। ৯ মার্চ মওলানা ভাসানী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা ও চুক্তি। ঐতিহাসিক ঘেরাও আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান। পাকশী—শাহাপুর ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশ। এই বছরের ২৭ অক্টোবর 'ভোটের আগে ভাত চাই' পুস্তিকা প্রকাশ। আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠক বর্জন।

১৯৭০ ঃ এই সালের অক্টোবরে পশ্চিম পাকিস্তান সফর। ১৩ দিনের এই সফরে ১২টি জনসভায় উর্দু-ফারসী ও হিন্দিতে ভাষণ দান।

www.pathagar.com

এই সালের ২ অক্টোবর ঢাকাতে পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক সমাবেশ ও গণ মিছিলে নেতৃত্ব দান। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রথম 'স্বাধীন বাংলাদেশ-এর দাবী উত্থাপন। এই সময় তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু। এই সময় তিনি বলেন—স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান না দেখে আমার মৃত্যু নাই। সন্তোষ, টোবাটেকসিং (পাকিস্তান) ও পাঁচ-বিবির মহিপুরে সম্মেলন। দুর্নীতিবিরোধী জুন আন্দোলন। এই বছরের ২৩ মার্চ ইসলামী সমাজতন্ত্রের দাবী উত্থাপন।

১৯৭১ : এই বছরের ৯ জানুয়ারী সন্তোষে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন' আহ্বান। এই সময়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা, দেশ ত্যাগ।

১৯৭২ : ২২ জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। 'সাপ্তাহিক হক কথা' প্রকাশ। এই বছরের ১৯ অক্টোবর সন্তোষে কৃষক সমিতির সাংগঠনিক কমিটির সভায় ভাষণদান।

১৯৭৩ : ১২ ডিসেম্বর সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান। এই বছরের ১৫ মে খাদ্যের দাবীতে অনশন। সেপ্টেম্বরে মওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'দৈনিক বঙ্গবার্তা' প্রকাশ।

১৯৭৪ : সকল প্রকার দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য 'হুকুমতে রাব্বানিয়া' সমিতি গঠন। ভারতীয় পণ্য বর্জন আন্দোলনের ডাক। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে খাদ্যের দাবীতে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন। মধ্যপ্রাচ্য দিবসে হরতাল আহ্বান। মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে জুনের আইন অমান্য আন্দোলন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। সন্তোষে গৃহবন্দী।

১৯৭৬ : এই সালের মে মাসে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলে নেতৃত্ব দান। জানুয়ারীতে প্রথম সীমান্ত সফর। ফেব্রুয়ারীতে দ্বিতীয় সীমান্ত সফর। ২৭ ফেব্রুয়ারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৩ নভেম্বর খোদাই খিদমতগার সম্মেলনে ভাষণ দান। পুনরায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৭ নভেম্বর বুধবার রাত ৮টা

www.pathagar.com

২০ মিনিটের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

শিক্ষার আলো বিস্তারে মওলানা ভাসানী

- o মওলানা ভাসানী আসামের ঘাগমারী হামিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে মক্তব, স্কুল, মাদ্রাসা, হাফিজিয়া মাদ্রাসাসহ ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে স্থাপন করেন।
- o তিনি রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে জুনিয়ার মাদ্রাসা, স্কুল, মহিলা বিদ্যালয়, মক্তব, মাদ্রাসা, হুজরাখানা স্থাপন করেন।
- o তিনি পাঁচবিবিতে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ, একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
- o তিনি বীরনগরের মহিপুরে হাজী মুহম্মদ মুহসিন কলেজ, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়সহ কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।
- o তিনি টাংগাইলের কাগমারীতে মওলানা মুহাম্মদ আলী কলেজ স্থাপন করেন।
- o তিনি সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ, নার্সারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাফিজিয়া মাদ্রাসা, পাঠাগার, মসজিদসহ অনেকগুলো শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।
- o তিনি টাংগাইলের বিন্নাফৈরে একটি স্কুল, একটি মাদ্রাসা এবং একটি হুজরাখানা স্থাপন করেন।
- o মওলানা সাহেবের হিসাব মতে তাঁর ৯ লক্ষ মুরীদান রয়েছেন।

মহান নেতা ভাসানীর অমরবাণী

১. 'বিশ্বের সর্বত্র আলজিরিয়া হইতে লাটিন আমেরিকা পর্যন্ত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ জেল, ফাঁসি ও স্বৈরাচারীদের গুলী বুক পাতিয়া নিয়া শহীদ হইতেছেন। স্বাধীনতা ছাড়া যেমন গণতন্ত্র সম্ভব নয় তেমনি গণতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। গণতন্ত্র মানুষের হৃদপিণ্ড। এই হৃদপিণ্ড ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না, যেমন পানি ছাড়া মাছ বাঁচিতে পারে না।' (১৯৬২)

www.pathagar.com

২. জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রামই আমার সংগ্রাম। আজ হোক আর কাল হোক, এই দেশে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ও কৃষক মজুররাজ অবশ্যই কায়েম হবে।

৩. দরিদ্রতাকে শেষ করে দাও, শোষণকে নির্মূল করে দাও, সবার মুখে হাসি ফুটতে দাও, আমার কাজ তখনই ফুরাবে।

৪. জালেমের সাথে মজলুমের, শোষকের সাথে শোষিতের, নির্যাতকের সাথে নির্যাতিতের, ধনীর সাথে গরীবের, জোঁকের সাথে মানুষের কোন আপোষ বা বন্ধুত্ব হতে পারে না। যেমন হতে পারেনা ক্ষুধার্ত বাঘের সাথে ছাগলের কোন আপোষ বা বন্ধুত্ব।

৫. পশ্চিমের শূকর সাদা হতে পারে, আর পূর্বের শূকর কালো হতে পারে, সব শূকরই হারাম। শোষণ ছাড়া শোষকের কোন ধর্ম নাই, কোন জাত নাই।

৬. ইসলামী সমাজতন্ত্রই বিশ্বের সর্বহারা মানুষের সার্বিক মুক্তির একমাত্র পথ।

৭. নিপীড়িত মানুষের শত্রু সাম্রাজ্যবাদকে যতদিন খতম করতে না পারব ততদিন আমার সংগ্রামের বিরাম নাই।

৮. আমি বেঁচে থাকি, বা না থাকি তোমরা যারা থাকবে নোট করে রাখো, আমি বলছি ঃ আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর ও পশ্চিম বাংলা অবশ্যই দিল্লীর জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বাধীন হবেই হবে।

৯. তোমরা ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে উঠিয়া কাজ করিয়া যাও। আমি চাই তোমরা তিতুমীর হও, ক্ষুদিরাম হও, সূর্যসেন হও, বাঘা যতীন হও। মনে রাখিও শ্লোগানে বিপ্লব হয় না, উহার জন্য চাই ত্যাগ ও সাধনা।

১০. বিজলী বাতির চকমকে রোশনাই দেখে ৬২ হাজার গ্রামের কথা ভুলে যেও না। গ্রাম-বাংলাই এদেশের মেরুদণ্ড। গ্রাম-বাংলাকে জাগাতে হবে।

১১. দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ না করে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না, দুর্নীতির কবলে পড়ে জাতি পংগু হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

১২. আমি দেখেছি, যে মানুষ কাঁদিতেছে সেই বিদ্রোহ করিতেছে। আমি দেখিয়াছি, যে মানুষ নিচুতলার আঁধারে পচিতেছে, তাহারাই বুলেটের মুখে আত্মাহুতি দিতেছে।

১৩. দেশের এই চরম দুরবস্থার কথা দুনিয়ার মানুষকে জানাইতে হইবে। ইহার প্রতিকারের জন্য দেশের মানুষকে সজাগ, সচেতন করিতে হইবে এবং সংঘবদ্ধ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

১৪. উর্পর হইতে চাপাইয়া দেয়া 'স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র' বা শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। (১৯৬২)।

১৫. অবিশ্বাস যে রাজনীতির ভিত্তি সেখান সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে না। জনসাধারণের উপর আস্থাহীন সরকার কোন সময় স্থিতিশীল হইতে পারে না। (১৯৬২)।

১৬. চুরি ডাকাতি, খুন-খারাপী, বদমাইশী করিলে আমাদের দেশের আদালতে বিচার হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আটক করিলে তাহাকে কেন প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে না? বিনা বিচারে আটক রাখা আল্লাহ্র বিধানের খেলাফ এবং মানবতাবিরোধী। দুর্বলচিত্ত সরকার রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখে।

১৭. সুযোগ-সন্ধানী, সুবিধাবাদী, আদর্শহীন, নীতিহীন মানুষকে সচেতন জনসাধারণ চিরকালই ঘৃণা করিবে। (১৯৬২)

১৮. আদর্শের চেয়ে মানুষ বড়।

১৯. নিজেকে জয় কর জগৎ পদানত হইবে। দুনিয়ার পিছনে ঘুরিওনা, দুনিয়াই তোমার পশ্চাতে ঘুরিবে।

২০. সকল সৃষ্টির হক নিঃস্বার্থভাবে আদায় করিয়া দেওয়াই হইল 'হুকুমতে রব্বানিয়ার' প্রথম শর্ত।

২১. অন্যায়ের প্রতিবাদ করো। জুলুমকে রুখিয়া দাঁড়াও, যদি কাহাকেও শাসাইতে হয় তাহার সম্মুখে বীরের মত বল। ভীরু কাপুরুষের মত অজ্ঞাতে কিছু বলিও না।

২২. আল্লাহ্ পাহাড়ে জংগলে থাকে না, আল্লাহ্র অবস্থান মানুষের অন্তরে। মানুষকে ভালবাস। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য

www.pathagar.com

অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাও, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সাহায্য ও বিজয় সুনিশ্চিত।

২৩. রূহানী তাকত ছাড়া সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না।

২৪. ইসলামের স্তম্ভঃ ১. শরিয়ত, ২. তরিকত ৩. হকিকত ৪. মারেফত ও ৫. জেহাদ।

২৫. আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন।

২৬. জালিমের অত্যাচারে ভীত হইও না, জালেমের ধ্বংস অনিবার্য, মনে রাখিও, হক পথে খোদায় রাজী।

২৭. মিথ্যাকে পরিত্যাগ কর, অন্যায়কে ঘৃণা কর, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভালবাস, তবেই তোমার অভিষ্টকে পাইবে।

২৮. বিপদে নিরাশ হইও না, আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

২৯. সূফীর মিশনের কামীয়াবী ঘটে তার তিরোধানের পর।

৩০. ক্ষুধা লইয়া যাহারা রাজনীতি করেন, তাহারা ক্ষুধার্ত হইতে চাহে না। ক্ষুধার্তের মত পরিশ্রমও করিতে চাহেন না। ইহাই পরিহাস।

৩১. আমার নেতা ব্যক্তি বিশেষ নয়। আমার নেতা দেশের জনগণ, দেশের অধিবাসী। আপামর জনসাধারণ।

৩২. আমাদের সংগ্রাম দুইমুখী হইতে হইবে। একটি প্রত্যক্ষ আর একটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষটিতে থাকিবে বিদ্রোহ, পরোক্ষটিতে থাকিবে সংগঠন ও আন্দোলন। দুই দিকই যদি একতালে চালাইয়া যাইতে পারি, তবেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁীছিতে পারিব।

৩৩. জনগণের সচেতনতা দুনিয়ার সকল অশুভ সকল শক্তিকে ব্যর্থ করিবেই।

৩৪. বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, আন্তরিকতার মাধ্যমেই জনগণের হৃদয় জয় করিতে হয়।

৩৫. অস্ত্রের দ্বারা যে দেশ জয় হয় তা ক্ষণস্থায়ী। বন্ধুত্ব ও আদর্শের দ্বারা যে দেশ জয় করা হয় তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘ।

www.pathagar.com

৩৬. ইসলামের যে শ্রেণী সংগ্রাম তাহা হইল শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম। শোষকের বিরুদ্ধে ইসলামের আপোষহীন সংগ্রাম।

৩৭. জাতি হিসাবে বাংগালীর বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি আছে। অধিকার আছে। সম্পদশালী ঐতিহ্যই তাহার চলার পথের শ্রেষ্ঠতম পাথেয়। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের স্বার্থপরতা জাতীয় প্রগতি ব্যাহত করিতে পারে সত্য, কিন্তু উহার মাশুল একদিন দিতে হইবে তাহাকে কড়ায় গণ্ডায়। সুদে-আসলে বাংগালী তাহার প্রতিশোধ নিবেই।

৩৮. ইসলাম আমার ধর্ম। বাংগালী আমার জাতিত্ব। ভৌগোলিক অবস্থান আমার বাংলাদেশ। বাংলা আমার সংস্কৃতি। বাংলা আমার মুখের ভাষা। বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাংগালী হিসাবে আমার আছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বাংগালী জাতির আছে এক বিরাট ঐতিহ্য।

৩৯. দেশসেবার একচ্ছত্র অধিকার কাহারো নাই। কাজের মধ্যে দেশ-প্রেমিকের পরিচয় হয়। ভাল কাজের মধ্য দিয়া নেতারা জিন্দাবাদ ধ্বনি লাভ করেন। কিন্তু খারাপ কাজ করিয়াও কি নেতারা জিন্দাবাদ পাইতে চাহেন?

৪০. নেতৃবৃন্দকে কখনই জিন্দাবাদ দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে তাহাদের মাথা খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে। জিন্দাবাদের একমাত্র অধি-কারী কর্মসূচী। জিন্দাবাদ হইবেন দেশের জনসাধারণ। জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। আর বাঁচাইতে হইবে তাহার প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীকে। দেশবাসীকে প্রদত্ত কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সঠিক জবাব দেশবাসীই দিবেন।

৪১. অলস হইও না, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ কর। মনকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখ। মনে রাখিও, কাপুরুষ, ভীরু, ক্লীবরাই অলস জীবন যাপন করে। অলস লোকের প্রতি খোদা নারাজ।

৪২. যুদ্ধে করার চেয়ে নিজেকে জয় করা আরো কঠিন।

৪৩. অত্যাচারী হইও না। কাহারও উপর জুলুম করিও না। খোদার খোদায়ত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া ফেরাউন নমরুদের অনুসারী হইও না। তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

৪৪. সত্যকে জানিয়াই স্তব্ধ হইও না। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া দিও না। ইহার পরেও কোন মহাসত্য থাকিতে পারে, তাহাকে জানার চেষ্টা কর, মহাসত্যের পরেও আবার কোন অমর জীবনের অনন্ত স্বাদ থাকিতে পারে তাহার প্রতি অগ্রসর হও।

ক্ষমতা থাকিতেও যিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না, সম্পদ থাকিতেও যিনি বিনয়ী থাকেন তিনিই দীনের উপযোগী।

৪৬. মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হইও না, সকল প্রকার প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ পাক। মাটির মানুষের প্রশংসিত হওয়া সাজে না। যখন কেহ তোমার প্রশংসা করে তখন তোমার নিজের অপ্রকাশিত দোষগুলির কথা চিন্তা করিও, তবেই এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

৪৭. ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিও না। ঝগড়া করা কুকুরের স্বভাব, এক কুকুর আর এক কুকুরকে দেখিতে পারে না।

৪৮. আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিও না। তোষামোদকারী হইও না। তোষা-মোদকারীর জন্য আত্মসম্মান নাই।

৪৯. যাহারা তোমার সম্মুখে একরূপ, আবার পশ্চাতে অন্যরূপ কথা বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহারই মোনাফেক। মোনাফেক লোক আল্লাহ্র দুশমন, আল্লাহ্র রসূলের দুশমন তথা মানব জাতির দুশমন।

৫০. কোন জিনিসকেই নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিও না। নিকৃষ্ট হইতেই নিকৃষ্টের আবির্ভাব ঘটিতে পারে।

৫১. মহৎ লোকের সম্মান কর, তাহা হইলে তুমিও সম্মান পাইবে।

৫২. পাকিস্তানের 'পাঞ্জাবী' আর হিন্দুস্থানের 'মাড়োয়ারী' শোষকদের কবল থেকে বাংগালীদের মুক্ত কর।

৫৩. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাৎকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদে বিজয় লাভ করিতে আল্লাহ্র কালাম যে-কোন অস্ত্রের চাইতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

৫৪. আমার ধর্ম হচ্ছে বিপ্লবী ধর্ম এবং আমি একজন ধার্মিক লোক। অতএব, আমার ধর্ম হচ্ছে সকল প্রকার অন্যায় আর অসত্যের প্রতিবাদ।

www.pathagar.com

৫৫. আমি নাস্তিকতা ছাড়া চীনের সব কিছুকেই মনেপ্রাণে সমর্থন করি।

৫৬. ৭ কোটি বাংগালী ভারত বা অন্য কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে মেনে নেবে না এবং প্রয়োজন হলে তারা তাদের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

৫৭. দেশের উন্নতি বলতে আমি বিশ্বাস করি—আমি বুঝি কৃষকের উন্নতি— কৃষির উন্নতি। কারণ কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড। এজন্যই আমি কৃষকের দাবী নিয়ে আন্দোলন করে থাকি।

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন আহমদ

মওলানা ভাসানী ও শাহপুর কৃষক সম্মেলন

মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই উপমহাদেশের একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননেতা ছিলেন। অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ না করেও তিনি কেবল অধ্যবসায়, সংগ্রাম ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করেছিলেন। কিশোর বয়সেই তিনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং নিজ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় লাইনে শিক্ষা লাভ করেন। উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর যা দখল ছিল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির তা ছিল না, তাঁকে আরবী ভাষায় আলাপ আলোচনা চালাতে দেখেছি ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে। ইংরেজিতেও তাঁর সাধারণ দখল ছিল। সিরাজগঞ্জের ধানগড়া ইউনিয়নে তাঁর জন্ম। কিন্তু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করেন আসামে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এই উপমহাদেশে যত কৃষক সংগ্রাম ও জাতীয় আন্দোলন হয়েছে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী অনেক সংগ্রাম নিজে সংগঠিত ও পরিচালিত করেছেন। তিনি মূলত কৃষক নেতা ছিলেন। কৃষকদের সাধারণ সমস্যা তাঁর নখদর্পণে ছিল। কৃষকের কোন্ সমস্যায় কখন হাত দিলে তাদের মধ্যে সাড়া পড়বে তা তিনি খুব ভাল করে জান-তেন। তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষক সম্প্রদায়। সারা জীবন তিনি জমিদার, জোতদার ও মহাজনের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং সরকারের রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন।

তিনি ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছেন এবং ধর্মীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও জীবনের একটা সুদীর্ঘ সময় কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কাজ করেছেন। পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন এবং এই উপমহাদেশে সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় শান্তি স্থাপনে

www.pathagar.com

উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। শুধু সাম্প্রদায়িকতা নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার থেকেছে। তাঁর জীবদ্দশায় সকল প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে নানা প্রকার কুৎসিত আক্রমণ চলেছে এবং সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে অনেক সময় নিঃসঙ্গ হয়েও পড়েছেন, তথাপি কখনও হাল ছেড়ে দেন নি। কঠোর পরিশ্রমী এই বিতর্কিত জননেতা নিজের ধর্ম, অধ্যবসায় ও প্রজ্ঞার ফলে আবার নতুন সঙ্গী জড় করেছেন, সঠিক মুহূর্তে আবার সামনের কাতারে এসে হাজির হয়েছেন।

ঋণসালিশী বোর্ড থেকে আরম্ভ করে এদেশে কৃষকদের মঙ্গল মানসে যত সংস্কারমূলক আইন পাস হয়েছে তা কৃষক আন্দোলনের ফলেই হয়েছে এবং এসব আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর অবদান রয়েছে। এ অঞ্চলের পুরানো কৃষক ও কৃষক নেতারা এখনও ত্রিশ দশকে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রজা সম্মেলনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

এই সম্মেলনে কত জমায়েত হয়েছিল তার অনুমান করা যায় কেবল আঞ্জামের কথা শুনে। দুই মাইল লম্বা দীর্ঘ চৌকায় খিঁচুড়ি পাকানো হয়েছিল, কৃষকের ঋণ মওকুফের দরখাস্ত হয়েছিল গরুর গাড়ীর ১৬ গাড়ী, আর সম্মেলন শেষে চাল ডাল বেঁচে গিয়েছিল ১৯ হাজার মণ। আজগুবি কাণ্ডকারখানা!

এই সম্মেলনের পরেই ঋণসালিশী বোর্ড আইন পাস করা হয় মরহুম জনাব এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের আমলে।

স্কুল জীবনে আমি ‘লড়কে লেংগে পাকিস্তান’-এর একজন কর্মী ছিলাম। মওলানা ভাসানী তখন আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি। তৎকালীন ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমি চমৎকৃত হতাম। ধর্মীয় পরিবারে আমার জন্ম। ধর্মীয় নেতাদের নীতিহীনতা, শোষণের ফলে আমি তাদের প্রতি সাধারণত বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। কিন্তু মওলানা ভাসানী তার ব্যতিক্রম ছিলেন। ১৯৫১ সালে সর্বপ্রথম তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। পাবনার টাউন হল ময়দানে। তখন আমি পাবনা কলেজের ছাত্র। ছাত্র সমাজের মধ্যে তখন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব চলছে, আবহাওয়া গরম। পুলিশ ও মুসলিম লীগের গুণ্ডা বাহিনীর দাপট চরমে। ভীত-সন্ত্রস্ত আবহাওয়ার মধ্যে জনসভা। ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

কারো মুখে এমন আগুন ঝরা বক্তৃতা কখনও শুনি নি। ঐদিনই মনে মনে মওলানা ভাসানীর অনুসারী হয়ে গেলাম।

ছাত্রজীবন শেষ হবার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগে যোগদান করি। আওয়ামী মুসলিম লীগ পরে আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই সংগঠনের প্রধান সংগঠক মওলানা ভাসানীই ছিলেন। আমরা আওয়ামী লীগের ভেতরে মওলানা ভাসানীকেই নেতা মেনে চলতাম। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম হয় বৈদেশিক প্রশ্নে। জোট নিরপেক্ষ নীতি ছিল আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের এক অংশ এই নীতি পরিহার করার ফলে ন্যাপের জন্ম হয়।

ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের পর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে এই প্রশ্নে দুই লাইনের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। ন্যাপের জন্মের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৫৬ সালে পাবনার শাহপুর গ্রামে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিরুদ্ধ নেতৃত্বের কেউ উপস্থিত হন নি। এর পরেই হয় পাবনার শাহজাদপুরে, এরপর দেশব্যাপী জনসভা করে মওলানা আলোড়ন সৃষ্টি ও মতামত প্রচার করেন। এই সময়ে মওলানার প্রধান অবলম্বন ছিল প্রগতিশীল কর্মীরা। প্রায় সকল জনসভায় আওয়ামী লীগের গুণ্ডা বাহিনী হামলা চালাতো আর তাদের দৈনিক পত্রিকায় লেখা হতো 'জনগণের রুদ্ররোষে ভাসানীর সভা পণ্ড'। মন্ত্রী-মেম্বার হবার জন্যে যারা মওলানার পাশে জড়ো হয়েছে স্বার্থ হাসিলের পরই তারা মওলানার বিরুদ্ধে কুৎসিত আক্রমণ চালাতে পিছ পা হয় নি। মওলানা এসব স্বার্থবাদী মহলের কুৎসিত আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন তখন যখন তিনি তাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রতিক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণের সমালোচনা করেছেন। তিনি দল ত্যাগ করেছেন তখনই যখন তিনি তাঁর দলীয় মন্ত্রী-মেম্বরদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মূলত নিজের ওপর এবং প্রধানত জনগণের ওপরই নির্ভর করতেন। যে কোন সংকটকালে সাধারণ সংগঠক হিসাবে তিনি শহর-বন্দর, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে দেখেছি। যানবাহনের অভাবে বৃদ্ধ বয়সে সাইকেল চালিয়েও

www.pathagar.com

জনসভায় উপস্থিত হতে দেখেছি। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়ে তিনি সারা রোযার মাস গরুর গাড়ী চেপে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন কৃষকদের সংগঠিত করার জন্যে। সারা দেশে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে কৃষক সংগঠন ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে তিনি প্রধানত আমাদের ওপর নির্ভর করতেন। এজন্যে প্রায়ই কৃষক নেতা আবদুল মতিন ও আমার ডাক পড়তো সন্তোষে। আইয়ুব আমলের শেষের দিক। মওলানা ঢাকায় জনসভা করে ফিরে এসেছেন সন্তোষে। জনগণের উত্তাল জোয়ার—জনগণ আক্রমণমুখী। ঢাকায় গুলী চলেছে। মওলানার জরুরী তার পেয়ে সন্তোষে এলাম। রোযার দিন। তিনি বসে আছেন একাই। ভক্তের দেয়া অনেক খাদ্যসামগ্রী। আমাকে বললেন, 'খাও, তোমরা তো রোযা থাকবে না।'

উত্তরে বললাম, 'মুসাফিরের জন্যে রোযা নিষেধ।' তিনি হাসলেন এবং বললেন, 'সন্ধ্যায় ইফতারের সময় হাজির থাকবে আর ভাল করে সেহেরী খেয়ে নেবে। দিনে খাবার পাবে না কোথাও, পেলেও খাওয়া উচিত নয়।'

রাজনৈতিক কথাবার্তা শেষে ফিরে এলাম। তিনি আভাস দিলেন, 'আয়ুবের পতন হতে যাচ্ছে। সর্বস্তরে আন্দোলন জোরদার করো। কৃষকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল করো।' এ সময়ের যতো কৃষক জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তার মোদ্দা কথা ছিল ঃ হিংসা প্রজ্বলিত করো, আয়ুবের সমাজতন্ত্র টুকরো টুকরো করো...জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো।'

পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারহীন অন্ধকার যুগে মওলানা ভাসানী একক পরিশ্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলেন। এ কাজে প্রগতিশীলরা তাঁর সহযোগী হিসেবেই কাজ করেছে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মওলানা ভাসানী। ৯২(ক) ধারা জারি করে এই সরকার বাতিল করা হয়। মওলানা ভাসানী তখন শান্তি সম্মেলনে দেশের বাইরে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট 'লৌহ মানব' জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা মওলানাকে দেশে ফিরে এলে গুলী করে হত্যা করার প্রকাশ্য হুমকি দেন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় সারা দেশে প্রগতিশীল কর্মী শিবির গড়ে উঠেছিল। মওলানা এই কর্মী শিবির নির্বাচনের পরেও সংগঠন হিসেবে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের বিরোধিতার ফলেই এই কর্মী শিবির বাতিল করে দিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী।

৯২(ক) ধারা জারি করার পর দেশদ্রোহিতার অভিযোগে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের বিচারের হুমকি দেয় পাকিস্তান সরকার। ভুল করেছি বলে একজন প্রথমেই মাফ চান। ৯২(ক) ধারার শেষে ইস্কান্দার মীর্জা যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শলাপরামর্শের জন্যে আসেন তখন যুক্তফ্রন্টের নেতাদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়, কে প্রথম তাঁকে ফুলের মালা দেবে। এসব তথাকথিত জাতীয় নেতার সম্পর্কে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বলতেন, 'এরা হচ্ছে ইঁদুর। এক টুকরা মাংসের লোভে খাঁচায় গিয়ে পড়ে।'

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের তাঁর নীতি ও একুশ দফার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর মওলানা উপলব্ধি করেন শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলার। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৫৫ সালে সন্তোষে কৃষক-মজদুর কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষক সমিতি দাঁড় করানো। এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রগতিশীল কর্মী ও নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান মওলানাকে অনুরোধ করলেন কৃষক সমিতি গঠন না করার জন্যে। আওয়ামী লীগই কৃষকের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবে—এ মর্মে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, মনি সিং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টিও এ মর্মে সম্মেলনে নোট পাঠান যে, এখন কৃষক সমিতি করলে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি হবে। পাবনার গাঁড়াদহের কমরেড বাবর আলী এ মর্মে সম্মেলনে বক্তৃতা দিলেন—বাধ্য হয়ে মওলানা কৃষক সমিতি গঠন করা থেকে বিরত হলেন। আমরা নিরাশ হয়ে এলাম। আওয়ামী লীগ বিভক্ত হবার পর ১৯৫৭ সালে ফুলছড়ি ঘাটের বিন্নাফৈর-এ প্রথম কৃষক সমিতি গঠিত হলো মওলানার নেতৃত্বে। পাকিস্তান হবার পর প্রথম কৃষক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি। এরপর শত শত সভা সারা দেশে। এর প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল সন্তোষ ও পাঁচবিবি। কৃষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হয়েছে রংপুরে পীরগাছায়, পাবনায় লাহিড়ী মোহনপুরে, ঢাকার রায়পুরায় ও সিলেটের কুলাউড়ায়। পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি সর্বশেষ সম্মেলন করেছেন টোবাটেকসিং-এ।

www.pathagar.com

আইয়ুবের সামরিক শাসনামলে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৬২ সালে মুক্তি পাবার পর আমাকে ডেকে পাঠান। সিরাজগঞ্জে নৌকায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বললেনঃ এ সরকার বহুদূর যাবে। চীনের সঙ্গে অনেক চুক্তি হবে। অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করবে এ সরকার। তোমরা কৃষক সংগঠন গড়ে তোল। নৌকার মধ্যে দেখলাম মার্কসবাদী সাহিত্যের কয়েক-খানা পুস্তক। বোধ হয় তিনি এ সম্পর্কেও পড়াশোনা করতেন।

সবাই জানেন যে, তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মহান চীনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এ সময় পার্টি চালু না করে শুধু গণতন্ত্রের আন্দোলন করার নীতি গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে প্রগতিশী-শীলদের একটা অংশ (আজকে যারা মস্কোপন্থী নামে পরিচিত) এই নীতি সমর্থন করেন। আমরা এই নীতির বিরোধিতা করি। কারণ এ নীতিতে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী বিমূর্ততায় আচ্ছন্ন হয়। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী ভোতা করে দেবার এটা বড় হাতিয়ার। মওলানা আমাদের সমর্থন করেন এবং কৃষক সমিতি ও ন্যাপ চালু করেন। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে ভারত যুদ্ধ, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের শাসক শ্রেণীর মূল্যায়ন, ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণ, জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে প্রগতিশীলদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ন্যাপ ও কৃষক সমিতিতে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনে। মনি-মোজাফফরের নেতৃত্বে প্রগতিশীলদের একাংশ বের হয়ে আলাদাভাবে কাজ করতে থাকে। মওলানা আমাদের সমর্থন করেন এবং আমরা তাঁর নেতৃত্বেই কাজ করতে থাকি।

১৯৬৫ সালে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণের সময় মওলানা সারা দেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। প্রতিটি জেলার জনসভাতে তাঁর সঙ্গে কমরেড মতিন ও আমি থেকেছি।

আইয়ুবের পতনের ক্ষেত্রে মওলানা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এর মাস তিনেক পর তিনি ঢাকায় আমাদের ডেকে পাঠান। ঢাকায় শহীদ সাঈদুল হাসান সাহেবের বাসভবনে কমরেড আবদুল মতিন ও আমি দেখা করি। বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ন্যাপ ও কৃষক নেতারা এখানে উপস্থিত

www.pathagar.com

ছিলেন। এখানেই সিদ্ধান্ত হয় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে পাঁচ-বিবিতে কৃষক কর্মী সম্মেলন করার। মওলানা আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'চা'ল, ডাল, তরিতরকারি নিয়ে যতো বেশী পারো কর্মী হাজির করবে। মহিলা কর্মীও যেন হাজির হয়।'

নির্ধারিত দিনে তরিতরকারি, মহিলা কর্মীসহ আমরা দু'শতাধিক কর্মী হাজির হলাম। উপস্থিত হয়ে দেখি মওলানা বাইরের ঘরে অনেক লোকজন নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। অতীতের অনেক ইতিহাস আছে তার মধ্যে; কিন্তু বেশীর ভাগই কম্যুনিস্টদের সমালোচনা এবং তা গালি-গালাজের নামান্তর। অনেক নেতৃস্থানীয় কমরেড সেখানে আছেন; কিন্তু কেউ কিছু বলছেন না। হয়তো কিছু বলে লাভ নেই বলে তারা মনে করেছিলেন।

পরদিন সকালের অধিবেশন শুরু হলে আমি এই ঘটনার প্রতিবাদ করি, 'আপনি শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা। কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভেদ আছে, তাদের লাইনে অনেক ভুল হয়তো তারা করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা গালিগালা-জের পাত্র নয়। আপনার নিকট থেকে এটা আমরা আশা করি না। আপনি যেমন তাঁদের কাজের পরিপূরক তেমনি তাঁরাও আপনার কাজের পরিপূরক। আপনার সংগ্রামী কর্মসূচী তাঁরা ছাড়া কার্যকরী করার কেউ নেই।' আমার মনে হলো মওলানা যেন থ' হয়ে গেলেন।

প্রথম অধিবেশন শেষে কমরেড মতিন ও আমার ডাক পড়লো নিরালায়। তিনি বললেন, 'দেখ, বকাবকি তো এমনি করি না। তোমরা শত ভাগ। এখন এই সংকট মুহূর্তে কি করি বল?'

আমরা বললাম, 'ভাগ হয়েছে, থাকবে, এটা বাস্তব। বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলো কি ভাগ হয় নি? ওতে বেশী এসে যাবে না। কৃষক সংগ্রামমুখী। জঙ্গী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। কৃষকদের যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠেছে তার সম্মেলন করুন।'

মওলানা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন এবং স্থান নির্বাচনের ভার দিলেন আমাদের ওপর। আমরা প্রথমে স্থান নির্বাচন করি পাকশীতে। পরে নানা অসুবিধার জন্যে এ সম্মেলন আমার নিজ গ্রাম শাহপুরে করার সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে মওলানা এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন এবং লাঙ্গল

www.pathagar.com

মার্কা লাল টুপি ও বাঁশের লাঠি হাতে কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মেলনে হাজির হতে আহ্বান জানালেন। ঐ দিনই তিনি ইশতেহার ড্রাফট করে দিলেন প্রেসে দেবার জন্যে। এই সম্মেলন উপলক্ষে যতো প্রচারপত্র ও ইশতেহার ছাপা হয়েছিল তা সবই মওলানার নিজস্ব ড্রাফট এবং তাঁর নামেই প্রচার হয়েছিল।

এ দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের ধারণা আছে মওলানা একজন 'গণ্ড মূর্খ' লোক, তিনি নিজে কিছু করেন না, লাল মার্কা লোকেরা তাঁকে দিয়ে সব করিয়ে নেয়। এটা একটা অপপ্রচার এবং ভুল ধারণা।

ইশতেহার বিবৃতির সকল ড্রাফট মওলানা মুখে মুখে বলে যেতেন। আমরা লিখে নিতাম। সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হলে তিনি দেখে দিতেন। বিশ্বাসী লোক হলে এবং যেখানে সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে অনেক সময় সাদা কাগজে সই করে দিতেন। [আমার বাড়ীঘর ধ্বংস হওয়ায় এসব প্রচারপত্র ও মওলানার অনেক মূল্যবান চিঠিপত্র নষ্ট হয়েছে।]

এর কয়েকদিন পরেই মওলানা শাহপুরে আসেন অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করার জন্যে। পাবনার ন্যাপ নেতা আবদুল আওয়ালকে সভাপতি ও আমাকে সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মহিলা ফ্রন্টের প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন কমরেড আম্বিয়া বেগম। পরে যে কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়েছিল তার প্রধান ছিলেন মওলানা নিজে এবং সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে কমরেড আবদুল মতিন ও আমি। মহিলা কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধানা নিযুক্ত হয়েছিলেন যথাক্রমে কমরেড আম্বিয়া ও কমরেড মনিকা বেগম।

এই সম্মেলন উপলক্ষে দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে অসংখ্য সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে (ইয়াহিয়া খানের ৫৮ ধারা মেনে)। এই সভা ও বহু হাটবাজারে মওলানা নিজে উপস্থিত থেকেছেন। আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। আশ্বিনের লাগাতার বৃষ্টি ও ঝাপটা। মওলানা ভিজে পুড়ে কর্মীসভায় হাজির হতেন। দেশের প্রগতিশীল মহলে তখন চারু মজুমদারের ভুল লাইনের জোয়ার। গণআন্দোলন ও গণসংগঠন ত্যাগ করার এই ভুল লাইন গ্রহণকারী প্রগতিশীলদের একটা অংশ এই সম্মেলন সফল করার জন্যে কোনরূপ সক্রিয় সহযোগিতা করেন নি। মওলানা ও আমাদের একক প্রচেষ্টায় এই

www.pathagar.com

সম্মেলন সফল করতে হয়েছিল। বাধা কম ছিল না। আওয়ামী লীগ, জামাত ও সরকারের একটা অংশ নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে কসুর করে নি।

সম্মেলনের দিন সাতেক পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মওলানার নিকট একটা নোট পাঠান। মওলানা তখন কর্মীসম্মেলন উপলক্ষে রাজশাহীর নবাবগঞ্জে। জরুরী তার পেয়ে কাজ ফেলে দেখা করতে গেলাম। মওলানা নোটটা দেখালেন। সরকার সম্মেলন না করার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে এবং দাবীদাওয়া বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন ও সম্মেলন উপলক্ষে আইন-শৃংখলার অবনতির আশংকা প্রকাশ করেছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় রেডিওতে খাজনা আদায়ের তারিখও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে পিছিয়ে দেবার ঘোষণা করা হয়। আবহাওয়া ও সরকারী মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে দিতে চাইলেন। প্রগতিশীলদের একাংশের অসহযোগিতা ও আবহাওয়ার কারণে বোধ হয় তিনি সম্মেলনের আশানুরূপ সফলতা সম্পর্কে কিছুটা দোদুল্যচিত্ত হয়েছিলেন। তারিখ পেছানোর ব্যাপারে আমি দ্বিমত পোষণ করে বললাম, 'সরকারের নমনীয়তা সময় নেয়ার একটা কৌশলমাত্র। আজ পর্যন্ত কৃষক সমাজের কোন দাবী-দাওয়াই মানা হয় নি। তাছাড়া সব প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। এখন তারিখ পিছিয়ে দিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।' 'ঠিক আছে, তোমারা যদি পার তবে আমি পারবো না কেন?' পরদিনই তিনি শাহপুরে চলে এলেন সম্মেলন তদারকের জন্যে এবং সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার বাড়ীতে ছিলেন। এ বাড়ীতে এই তাঁর শেষ অবস্থান। মওলানা নেই, সে বাড়ী-ঘরও নেই।

সরকারী ভয়-ভীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে শাহপুরের কৃষক কর্মী ও কৃষক সাধারণ দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করেছিলেন সম্মেলন সফল করার জন্যে। কৃষক জনগণ সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন। এই গ্রামের তিনদিকে তিনটি সামরিক ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। প্রতি দিনই সামরিক হেলিকপ্টার উড়ে যেত সম্মেলনের বিরাট প্যাণ্ডেলের ওপর দিয়ে এবং খুবই নীচু দিয়ে। সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো বোধ হয় এর উদ্দেশ্য ছিল। মওলানা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় চাটাই পেতে বসে কাজের তদারক করতেন আর মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন এমনি সময়ে হেলিকপ্টারের আনাগোনায় তিনি হেসে উঠতেন।

www.pathagar.com

সম্মেলনের দু'দিন আগে আজকের এন. এস. আই. প্রধান জনাব আলী সাবদার সাহেব ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আমার বাড়ীতে হাজির হলেন। মওলানা অবশ্য আগেই আমাকে বলেছিলেন তিনি নাকি তাঁদের দাওয়াত করেছিলেন চা পানের জন্যে।

মওলানার সঙ্গে বৈঠকখানায় তাঁদের কথাবার্তার পরে আমার ডাক পড়লো। মওলানা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাবদার সাহেব আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গেলেন কিছু কথা আছে বলে।

আমাদের কথাবার্তা নিম্নরূপ ঃ

প্রঃ আচ্ছা, সম্মেলনে কি হবে আলাউদ্দিন সাহেব ?

উঃ আমি কিছুই জানি না। মওলানা সাহেব জানেন।

প্রঃ আপনিই তো অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক, কৃষক সমিতিরও সাংগঠনিক সম্পাদক !

উঃ আমার ওপর জায়গা ঘেরাও, ডেকচি কড়াই জোগাড় ও রান্নার বন্দোবস্ত করার ভার আছে। এর বেশী নয়।

প্রঃ আচ্ছা মিছিল হবে না ?

উঃ না, তেমন কোন কথা নেই। তবে মানুষ দল ধরে আসবে—যেমন, মানুষ হাটে যায় কিংবা হাট থেকে বাড়ী ফেরে।

প্রঃ কোন শ্লোগান হবে না ?

উঃ তেমন কোন নির্দেশ নেই, তবে মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ, স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন সফল হোক—স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটুকু হতে পারে।

প্রঃ এতেও তো সামরিক আইন ভঙ্গ করা হোল ?

উঃ সরকার সম্মেলন যখন দিচ্ছেন তখন এটুকুন তার আনুষঙ্গিক।

প্রঃ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন আছে কি ?

উঃ আপনার কথা বুঝতে পারলাম না সাবদার সাহেব।

প্রঃ ধরুন, আওয়ামী লীগ, জামাত যদি গণ্ডগোল করে ?

উঃ এখানে সেসব বালাই নেই। আর কেউ যদি সে চেষ্টা করেও তা হলে তা ঠাণ্ডা করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকরাই যথেষ্ট।

সম্মেলনে একদিন আগে রাশেদ খান মেনন হাজির হয়েছিলেন। আমাদের সাহায্য করার জন্যে কর্মী আসা এই প্রথম। সম্মেলনের

www.pathagar.com

আগের দিন দুপুর বেলা থেকেই লাঙ্গল মার্কা লাল টুপি মাথায় বাঁশের লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকরা দলে দলে পৌঁছতে থাকে। রাত্রিতেই সমস্ত প্যাণ্ডেল ও গ্রামের অন্যান্য থাকার জায়গা ভর্তি হয়ে যায়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা, কমরেড আবদুল হক, কমরেড সরদিন্দু দস্তিদার, ন্যাপ নেতা আনোয়ার জাহিদ, আবদুল করিম খান প্রমুখ হাজির হয়েছিলেন আগের দিন সন্ধ্যায়। পরদিন সমস্ত দিন লাল নিশানে লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। আর দু'দিন ভর মুখরিত ছিল মজুরের নানা রকম দাবী-দাওয়ার শ্লোগান আর শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধর, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর—এই আওয়াজে।

সম্মেলন দু'দিন হবার কথা ছিল। কিন্তু নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার জন্যে মওলানা একদিন সম্মেলন হবে এই ঘোষণা দিলেন। কিন্তু পরদিন পুনরায় ভাষণ দিতে বাধ্য হন। আমাকে পরে তিনি বললেন, 'সম্মেলন দু'দিন না করে ভুল করেছি।'

পাকিস্তান হবার পর এই প্রথম জঙ্গী কৃষক সম্মেলন। এই প্রথম কৃষক সম্মেলন যেখানে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিতভাবে অংশ গ্রহণ করে। আইয়ুবের সামরিক শাসন প্রথম ভেঙ্গেছিল ছাত্র সমাজ কিন্তু ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন প্রথম ভাঙ্গেন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। পরবর্তী গণ-আন্দোলনের যাত্রা শুরু মওলানা এখান থেকেই করেছিলেন। এসব কারণে এই সম্মেলন শত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অতীব গুরুত্ব বহন করে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে 'মুক্তির ডাক' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলাম তাতে মওলানার আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ দাখিল করেছিলাম। মওলানার মূল্যায়নে এই পুস্তিকায় অতিশয়োক্তি আছে বলে কোন কোন মহল সেই সময় মন্তব্য করেছিলেন। এর কোন কপি আজকে আমার কাছে নেই।

এর পরবর্তী সম্মেলন হয় পাঁচবিবিতে। এখানকার জামায়াতের প্রধান সংগঠক আমারই ছিলাম। তৃতীয় সম্মেলন হয় সন্তোষে। এখান-কার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন রাশেদ খান মেননের ওপর। এই সম্মে-লনেও উত্তর বঙ্গ থেকে প্রায় বিশ সহস্রাধিক কৃষক লাহিড়ী-মোহনপুর হয়ে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হন। চতুর্থ সম্মেলন হয় ঢাকায়। এর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ন্যাপ নেতারা। এই সব সম্মেলনই লাল টুপি সম্মেলন নামে খ্যাত। 'লাল টুপি' সম্মেলনের প্রভাব কৃষক ও মেহনতি জণগণের

www.pathagar.com

মধ্যে এমনভাবে পড়েছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান এর ফলশ্রুতি বান্‌চালের জন্য তাঁর গুণ্ডা বাহিনীর মাথায় লাল টুপি পরিয়ে একটা ফ্যাসিস্ট সংগঠন খাড়া করেছিল। সবাই জানেন এর নাম শেখ মুজিবের 'লাল বাহিনী'। এদের কাজ ছিল প্রধানত প্রগতিশীলদের দমন করা, হত্যা করা ও জনগণের সম্পদ লুটপাট করা।

মওলানার নেতৃত্বে এসব সম্মেলনের প্রধান শ্লোগান ছিল ঃ ভোটের আগে ভাত চাই, নির্বাচন নির্বাচন—বর্জন বর্জন ; শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধর, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর।

ইয়াহিয়া খানের প্রবর্তিত এল.এফ.ও মেনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী পাকিস্তানপন্থীরা এসব সম্মেলনে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। প্রকৃত স্বাধীনতার লড়াইয়ে এসব সম্মেলনের অবদান অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

সঈফ-উদ-দাহার

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনাবসান হয়েছে। মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশ এবং আসামের প্রধানত কৃষক জনগণের অসংখ্য সংগ্রামের নেতৃত্বে দিয়েছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী প্রতিটি সংগ্রামের সঙ্গেই মওলানা ভাসানী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, পরবর্তীকালে বাঙ্গালী জাতির স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের সংগ্রাম, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে রুশ-ভারত চক্রের হামলার এবং ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গা নদীর পানির প্রশ্নে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম, এর কয়েকটি সংগ্রামেই মওলানা ভাসানী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। ঠিক এই কারণেই এই সমস্ত সংগ্রামের সাফল্য এবং অসাফল্য সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাকে দায়ী করার একটি ভ্রান্ত প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে দেখা যায়। বিশেষ অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট আন্দোলন অথবা সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা কখনও কখনও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে থাকে, একথা সত্য। তাই বলে ব্যক্তি কোনক্ষেত্রেই নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করে না।

ব্যক্তি-জীবনে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরের সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি-জীবনকে বিচার করতে গেলে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটিকে সামনে রেখেই বিচার করতে হবে। সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনীতি থেকেই নির্দিষ্ট রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। মওলানা ভাসানীও আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের স্রষ্টা; এবং তাঁর জীবনের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের ভেতর আমরা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন দেখতে পাই। এই কারণে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনকে বুঝবার জন্য আমাদের দেশের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের স্তরটিকে অনুধাবন করতে হবে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম হয়েছে ১৮৮০ সালে। আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিকাশের এই যুগটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় চেতনা এবং সংগ্রামের বিকাশের যুগ। এই যুগের সূচনায় আমরা দেখেছি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং তৎপরবর্তীকালে বাংলার সংগ্রামী কৃষক জনগণের নীল বিদ্রোহের যুগ। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের সংগ্রামী ঐতিহ্য নিয়ে দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিকাশের যুগে প্রবেশ করেছে।

আন্তর্জাতিক যুগ থেকে এই সময় হচ্ছে বিশেষ করে ১৮৭০-৭১ সালের অর্থনৈতিক সংকটের সময়, যে সংকট ঐতিহাসিক প্যারী কমিউন সৃষ্টি করেছে, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের যুগ। পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলোতে এই সময় থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করেছে বৃহদাকার একচেটিয়া শিল্প এবং লগ্নী পুঁজিপতি গোষ্ঠী। এই সঙ্গে প্রসারিত হয়েছে একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী শিল্প এবং লগ্নী পুঁজির কার্টেল, সিণ্ডিকেট এবং ট্রাস্টসমূহ। সেই সঙ্গে বেড়েছে উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শিল্প এবং লগ্নী পুঁজির প্রখর রপ্তানী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বর্তমান বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই গোটা পৃথিবীর পুঁজিবাদী বাজার এবং ঔপনিবেশিক দখলসমূহ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলোর ভেতর ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে। এর ফলে বিংশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে একটি বিশ্বযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ঔপনিবেশিক বাজার এবং দখলের পুনর্বন্টনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ভেতর তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা।

www.pathagar.com

অপরদিকে উপনিবেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শিল্প এবং লগ্নী পুঁজি রপ্তানীর ফলে এই সময় উপনিবেশগুলোতে আধুনিক শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের সাথে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশও হয় তরান্বিত। উপনিবেশগুলোতে জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশ এই সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী চেতনার এবং আন্দোলনেরও বিকাশ ঘটায়। ভারতবর্ষে তুলনামূলকভাবে শিল্প বিকাশের প্রসারতা এখানে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনেরও দ্রুত বৃদ্ধির কারণ হিসাবে কাজ করেছে।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী এবং জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগ্রামের বিকাশের এই যুগেই মওলানা ভাসানীর জন্ম। স্বভাবতই শৈশব থেকেই পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশের শর্ত হিসেবে কাজ করেছে। একটি সাধারণ মধ্য-কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ভাসানী শৈশবেই মাতাপিতাকে হারিয়েছেন। ছয় বছর বয়সেই ভাসানীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় মাদ্রাসা শিক্ষার ভেতর দিয়ে। মাদ্রাসার শিক্ষা জীবনেই ভাসানী পীর সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সঙ্গেই ভারতের যুক্তপ্রদেশে চলে যান। এই ধর্মীয় শিক্ষাই ভাসানীর সংস্কৃতিগত জীবন গড়ে তোলার ভিত্তি। পীর নাসিরুদ্দীনের মুরীদ হিসেবে মওলানা ভাসানীও পরবর্তী জীবনে একজন পীর ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে গড়ে উঠেছেন। ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনেও তাই ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতগত প্রভাব চির-কালই রয়ে গেছে। মওলানাকে তাই আমরা দেখতে পাই একাধারে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতারূপে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের অনুসারীদের ভেতর এক ব্যাপক অংশ হচ্ছে তার ধর্মীয় নেতৃত্বেরও অধীন।

কৃষক পরিবারের ছেলে মওলানা ভাসানী, বৃটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের নিকট জমি হারানো বাংলার কৃষকের হৃত জমির মালিকানা স্বত্ব ফিরে পাবার সংগ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তরাধি-কার স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়েছেন। মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের সময় ভাসানী জমিদারী জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের কৃষকদের সংগ্রামের সংস্পর্শে আসেন এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেন। এভাবে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সংগ্রামী জীবন গড়ে ওঠে। যুক্তপ্রদেশে থাকাকালীন মওলানা ভাসানী ১৯০৫-৭ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় জাতীয়

www.pathagar.com

আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং গান্ধী, নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সংগে পরিচিত হন। এঁদের প্রভাবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা গড়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে ১৯২০-২১ সালের কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলনের সময় মওলানা ভাসানী আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মওলানা আজাদ সোবহানী প্রমুখের নেতৃত্বাধীন মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে পরিচিত হন এবং এই সমস্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে এবং নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবে মওলানা ভাসানী একদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এবং অপর দিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ভাবধারার মিশ্র চিন্তা-চেতনা নিয়ে গড়ে ওঠেন। তাঁর নিজের শ্রেণীগত কৃষক পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীসুলভ চিন্তা-চেতনা ভাসানীর পক্ষে একজন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক হিসেবে গড়ে উঠবার ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৩০-৩৫ সালে মওলানা ভাসানী আসামের 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। এই 'লাইন প্রথা'র বিরোধী আন্দোলনই প্রকৃতপক্ষে মওলানা ভাসানীকে একজন মুসলিম জাতীয়তাবাদী হিসেবে গড়ে তোলে। এই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় মিশে থাকে অতীতের কংগ্রেস আন্দোলনের প্রভাবে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা।

এখানে বিশেষ করে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে, মওলানা ভাসানীর নিজস্ব শ্রেণীগত অবস্থান এবং যে বিশেষ পরিবেশ এবং আন্দোলনের প্রভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে তার রূপ-চরিত্র। ভাসানীর নিজস্ব শ্রেণী হচ্ছে, কৃষক পেটি বুর্জোয়া এবং তাঁর গোটা রাজনৈতিক জীবনের বেশীর ভাগ ও মূল অংশটাই গড়ে উঠেছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর বর্তমানে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন সফল নেতৃত্ব দেবার ভূমিকা নেই। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ের যুগে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী-কালে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ী সাফল্যের

www.pathagar.com

পরে ঔপনিবেশিক দেশগুলোর জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার ভূমিকা নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আতংক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিপ্লবের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের আতংক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষমুখীন করে তোলে। শুধুমাত্র জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অপর অংশের অর্থাৎ প্রধানত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে বিপ্লবী সহযোগীর ভূমিকা রয়েছে। সহজেই বোঝা যায় যে, কৃষক পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর থেকে আগত এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার প্রভাবাধীন মওলানা ভাসানীর পক্ষে ঔপনিবেশিক দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে কোন সফল নেতৃত্ব প্রদানের ইতিহাস নির্দেশিত ভূমিকা ছিল না। তাই আমরা মওলানা ভাসানীকে প্রধানত কৃষক শ্রেণীর আংশিক সংগ্রামের একজন দৃঢ়চেতা সংগ্রামী নেতা হিসেবেই দেখতে পেয়েছি। তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যেই মওলানা ভাসানীর পক্ষে কোন চূড়ান্ত বিপ্লবী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয় নি। শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তির অভাবে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন ও সংগ্রামের সংগে মওলানা ভাসানী জড়িত ছিলেন, সেগুলো সত্যিকার বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে পারে নি, মূলত এবং প্রধানত কৃষক শ্রেণীর আংশিক দাবীর সংগ্রামের ভেতরই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর সর্বপ্রথম ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ভাসানীর শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও তার বিপ্লবী তত্ত্ব ও চেতনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই সময়েই চীনের সফল বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে ভাসানীর চীন সফরের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ভাবধারার একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে গড়ে তোলে। এই সময়েই ভাসানীর পক্ষে তাঁর ইতিহাস নির্ধারিত শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীর ভূমিকা পালনের যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে সহযোগীর ভূমিকার বদলে বারবারই তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বিপ্লবের নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করেছে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম বলতে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ও জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের দাবীর আন্দোলনই উল্লেখ-যোগ্য। বাঙ্গালী জাতির স্বায়ত্তশাসনের দাবীর আন্দোলন ১৯৭১ সালে গৃহযুদ্ধের রূপলাভ করে, যার পরিণতিতে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে আজকের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান একটি নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হবার দরুন পাকিস্তানের জনগণের মুক্তি বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সর্বশ্রেণীর জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বই বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্বের ভূমিকা নেবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। সাম্রাজ্য-বাদ ও তার দেশীয় সহযোগীদের সঙ্গে জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে হওয়াই সম্ভব ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ছাড়া জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণের অবসান হয় না। কারণ সাম্রাজ্যবাদই মূল নিপীড়ক ও শোষক। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান করে না। কারণ ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া হবার দরুন বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অসংখ্য অর্থনৈতিক যোগসূত্রে আবদ্ধ। কোন নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অপর সাম্রাজ্যবাদী শোষকের উপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা দেখায়। এর ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পরিণতিতে জনগণের উপর এক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বদলে অপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রাধান্য ঘটে এবং কার্যক্ষেত্রে কোন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের অবসান হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা এমনটি ঘটতে দেখেছি। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশের জনগণের উপর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান হয় নি। নতুন করে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের ডেকে আনা হয়েছে এবং জনগণের উপর শোষণের মাত্রা বহু গুণ বেড়ে গেছে।

বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সংগ্রাম-সমূহে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরের অংশই নেতৃত্ব দিতে পারে, কৃষক অথবা পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী এই সমস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের আসনে থাকতে পারে না, যদিও বহু ক্ষেত্রে সংগ্রামের শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষক পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আগত এবং তদানুযায়ী

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণাপুষ্ট মওলানা ভাসানী বহু রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করলেও শেষ পর্যন্ত তার নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির অনুপস্থিতিতে আমাদের দেশের সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামসমূহের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি-সমূহের হাতেই থেকে গেছে। এবং সমস্ত সংগ্রামই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপোষ এবং আজকের দিনে মার্কিন ও সোভিয়েত এই দুই পরাশক্তির আধিপত্যবাদের এবং প্রতিযোগিতার পটভূমিতে এদের কোনও একটির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর রুশ-ভারত হামলা প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া পার্টিসমূহকে জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের বিপ্লবী শক্তির বদলে অপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীলতার ও রাজনৈতিক দেউলেপনার নজির স্থাপন করতে দেখতে পাচ্ছি। দেশের সর্বশ্রেণীর জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই জনগণের পক্ষে বুর্জোয়া পার্টিসমূহের রাজনৈতিক দেউলেপনার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

এখানে আমাদের দেশের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে মওলানা ভাসানীকে বিপ্লবের যোগ্য সহযোগীর ভূমিকা পালনের বদলে নেতৃত্ব দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেন করতে হয়েছে সে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হলেও কিছুটা আলোচনা করা দরকার। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন এবং তার পরবর্তী সময়ে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে মওলানা ভাসানী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। বিশ্বব্যাপী সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি বিশেষ করে চীন বিপ্লবের সাফল্য মওলানা ভাসানীকে এই সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে, শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের সাফল্যই কৃষকের মুক্তির পথ। এই কারণেই আমরা দেখেছি যে, এই সময় থেকেই মওলানা ভাসানী শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত সমর্থকের ভূমিকা পালন করতে চেয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংশোধনের প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এবং আন্দোলন আকণ্ঠ সংশোধনবাদ ও বিলোপবাদের পাঁকে নিমজ্জিত থাকবার ফলে আমাদের দেশের কম্যুনিস্টদের পক্ষে কোন বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। শ্রমিক শ্রেণী ও

www.pathagar.com

জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম বিকশিত হতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী নেতৃত্বে। কিন্তু আমাদের দেশের কম্যুনিস্টরা বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলবার পথ হিসেবে বেছে নেন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মতো বুর্জোয়া পার্টি গড়ে তোলার কাজকে। এর পরিষ্কার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে কে? পার্টির নেতা মওলানা ভাসানী না কম্যুনিস্টরা? এর ফলে একদিকে আমরা দেখেছি প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরিহার্য; অথচ নিজস্ব শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অপর দিকে পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী ও কম্যুনিস্টদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বটি পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মতো বুর্জোয়া পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্ন মওলানা ভাসানী ও কম্যুনিস্টদের ভেতর সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং জনগণের সামনে মূল শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের বদলে তার সহযোগী পাকিস্তানের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী প্রতিভাত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে জনগণের চেতনার নীচু স্তরের জন্য বন্ধুর মুখোশে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের সমর্থক সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ লাভ করে এবং ১৯৭১ সালের জনগণের সংগ্রামের এক পর্যায়ে এক সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বদলে অপর সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শোষকদের প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সর্বশেষে মওলানা ভাসানীর গোটা রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাই, তা' হচ্ছে ঃ

১. শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন কৃষক-পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা। তাঁর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের সীমাবদ্ধতা এজন্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

২. শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে ধর্মীয় শিক্ষার ভেতর দিয়ে এবং তাঁর সমগ্র জীবনের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় তার সুস্পষ্ট প্রভাব থেকে গেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত রেখেছে।

www.pathagar.com

৩. উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও আন্দোলন হচ্ছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবধারা গড়ে উঠবার ভিত্তিভূমি। এবং তিনি শেষ দিনটি পর্যন্ত একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী থেকে গেছেন।

৪. মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত না থাকবার ফলে তাঁর দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোতে সত্যিকার বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ ও উত্তর বঙ্গে কৃষক সংগ্রামগুলো সামন্তবাদ ও জমিদারী উচ্ছেদের জন্যে কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রাম ছিল না। ভাসানীর পরিচালিত ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলনের মূল আওয়াজ ছিল হিন্দু জমিদারীর বদলে মুসলমানদের জমিদারী প্রতিষ্ঠা। আসামের লাইন প্রথার আন্দোলনও ছিল মূলত জমিতে কৃষকদের স্বত্ব ও দখলের প্রতিষ্ঠা—সামন্তবাদ অথবা জমিদারী উচ্ছেদের কোনটাই নয়।

৫. মওলানা ভাসানী জীবনের শেষ পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে এলেও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির ভেতর সংশোধনবাদী ও বিলোপবাদী বিচ্যুতির জন্য তাঁর পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব হয় নি। এই কারণে তাঁর পক্ষে নিজস্ব শ্রেণী চেতনার উর্ধ্বে কোন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করা বা তাতে অংশ গ্রহণ করাও সম্ভব হয় নি।

এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশের জনগণের বিভিন্ন সংগ্রামের অগ্রগতি ও সাফল্য অথবা ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানী কতখানি দায়ী, এই নিষ্ফল বিতর্ক না করে মওলানা ভাসানীর যা যথাযথ প্রাপ্য সেই হিসেবে জনগণ তাঁকে একজন সত্যিকারের সংগ্রামী সহযোদ্ধা হিসেবে স্মরণ করবে।

www.pathagar.com

রাশেদ খান মেনন

মওলানা ভাসানী ও ছাত্র আন্দোলন

কৃষকের সন্তান মওলানা ভাসানী কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন গণমানুষের পাশে। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে আসাম-বাংলার গ্রামের মানুষকে নিয়ে। শহরে তিনি এসেছেন সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনে। সেই কৃষক রাজনৈতিক ধারাকে সাধারণ রাজনীতির সাথে সমৃদ্ধ করার জন্যে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিমণ্ডলে তিনি সহযোগিতা খুঁজেছেন, নির্ভর করেন নি। তাই শহরের কাজ শেষ হলেই তিনি গ্রামে ফিরে গেছেন। কৃষকের দাওয়ায় বসে, ফসলের ক্ষেতের ধারে তাদের সংগ্রামের বাণী শুনিয়েছেন। সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করছেন। সেখান থেকেই গড়ে তুলেছেন আন্দোলনের উত্তাল জোয়ার। সমস্ত দেশ তখন সেদিকে ফিরে তাকিয়েছে। নিজেদের মনের মাঝে ধীরে ধীরে আসন করে দিয়েছে একটি মানুষের, যিনি মাটির কাছাকাছি থেকে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সাধারণ মানুষের কথা বলেন।

উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলনের উত্থান ও তার বিকাশ মূলত শহর-কেন্দ্রিক। শহরের সাধারণ রাজনৈতিক ধারাকে অনুসরণ করে এদেশের ছাত্র সমাজ সংগঠিত হয়েছে স্বাধীনতা ও সমাজ প্রগতির আন্দোলনে। গ্রাম সম্পর্কে ঔৎসুক্যে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে। 'গ্রামে ফিরে যাও' শ্লোগানে শিক্ষা সম্পাদন করে অনেকেই গ্রামে গেছে। কিন্তু সেটা গ্রামের মানুষগুলোকে সংগঠিত করার জন্যে নয়—গ্রামকে শহরের কাছাকাছি আনার জন্যে শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি প্রসারের জন্যে। এর একটা ভিন্ন দিক আছে। গ্রামীণ জনগণের রুটি-রুজির সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করার দিকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থেকেছে। কৃষক আন্দোলনের সাথে ছাত্র আন্দোলনের তখনও কোন বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় মওলানা ভাসানীর সমসাময়িক

www.pathagar.com

কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগ নেতারা তাই স্থান পেলেও তিনি অনুপস্থিত থেকে গেছেন।

পাকিস্তান-পরবর্তী যুগেই প্রকৃতপক্ষে মওলানা ভাসানীর সাথে ছাত্র যুব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিচয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ভাষার প্রশ্নে, রাষ্ট্রীয় মৌল নীতির প্রশ্নে এদেশের ছাত্র-যুবকদের সাথে মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর যে সংঘাত শুরু হয় সেখানে তারা মওলানা ভাসানীকেই পায় তাদের পক্ষের যোদ্ধা হিসেবে। আসামের কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলায় এসে মুসলিম লীগের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদ শুরু করেছেন। সে সময় ভাষা আন্দোলন মওলানা ভাসানীকে টেনে আনল এদেশের সংগ্রামী যুবকদের পাশে। কারাবরণ শুরু হলো অতীত যুগের মত পাকিস্তানেও—যে পাকিস্তানের জন্যে তিনি লড়াই করেছিলেন।

মওলানা ভাসানী এরপর থেকেই এদেশের ছাত্র-যুব আন্দোলনের জন্যে প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ান। এদেশের তরুণ প্রগতিশীল কর্মীরা তাঁকে গণআন্দোলনের পুরোধা হিসেবে গ্রহণ করে। অবশ্য এ ব্যাপারে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল। ভাষা আন্দোলনের জেল জীবনে মওলানা ভাসানীর সাথে কম্যুনিস্ট কর্মীদের যে পরিচয় ঘটে, তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি করে। কৃষক সংগ্রামের অতুলনীয় অভিজ্ঞতায় মওলানা ভাসানী সামন্তবাদকে চিনেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার দিকটাও আন্দোলনের ক্রমউত্তরণের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তাঁর এ সম্পর্ক স্থাপন, কৃষক সংগ্রামের পাশাপাশি তাঁকে শ্রমিক, ছাত্র ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ছিল তখনকার প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের একমাত্র সংগঠন ও সকল ছাত্র সংগ্রামের পুরোধা। কাগমারী সম্মেলনের পর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে আন্দোলন মওলানা ভাসানী ও ছাত্র-কর্মীদের ক্রমাগত নিকটতর করে। কিন্তু এই পর্যায়েও মওলানা ভাসানীর সাথে ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও স্নেহের। একে অপরকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা ছিল খুব কমই।

www.pathagar.com

আইয়ুবের সামরিক শাসনের চার বছর পর এদেশের ছাত্র আন্দোলনের নতুন উত্তরণ ঘটে। উত্তরণ ঘটে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তারও। জেল থেকে বেরিয়ে এসে মওলানা ভাসানী চীন ঘুরে এসেছেন। মাও সে-তুঙের দেশে তিনি দেখে এসেছেন সবার মুখে হাসি। কিন্তু এদেশে এসে চীনের কৃষকের মুখের সাথে নিজের কৃষক ভাইয়ের মুখের মিল খুঁজতে গিয়ে সেখানে হাসি খুঁজে পেলেন না। সে হাসির সন্ধানে তিনি বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি ক্রমাগত বেশী বেশী করে আকৃষ্ট হলেন। তাই যখন দেখা গেল, ১৯৫৫-তে এদেশে প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে সেই বিপ্লবী রাজনীতির প্রশ্নে সংঘাত, তখন সেই বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষেই সরাসরি ছাত্র-যুবকদের কাতারে এসে অংশ গ্রহণ করলেন।

বাষট্টির পরে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে সূত্রপাত; ছাত্র সমাজই ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলনের [কনভোকেশন মুভমেন্ট] মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় গণজোয়ারের রূপ নেয়। এই গণজোয়ারের মধ্যমণি ছিলেন মওলানা ভাসানী। কিন্তু তখন শুরু হয়েছে মত ও পথের সংঘাত। এই গণজোয়ারকে কি বিপ্লবী আন্দোলনে রূপ দেয়া হবে না কি সংস্কারবাদী আন্দোলনের মাঝেই তা ঘুরপাক খাবে? সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নির্দিষ্ট রূপ কি হবে? কোন্ পথে এগুবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা? কিন্তু প্রগতিশীল আন্দোলনের বিপ্লবী পথ ও সংশোধন-বাদী পথের মত-পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এদেশের আন্দোলনেও। ছাত্র আন্দোলনের মাঝেই এত মত-পার্থক্যের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৬৫-এর প্রথম ভাগে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের যে অংশ বিপ্লবী রাজনীতির পতাকাকে তুলে ধরে তারা তখন একলা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যান্য অংশের কেউই তখন এগিয়ে আসে না তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্যে। কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ পরবর্তীতে ১৯৬৬-তে এই মত ও পথের পার্থক্য নিয়ে আলাদাভাবে নিজেদের সংগঠিত করে তারাও তখন পার্টির সংশোধনবাদী লাইনের অনুসন্ধানেই ছাত্র আন্দোলনের এই অংশকে কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করা হতে বিরত থাকে। প্রগতিশীল আন্দোলনের অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

বিরুদ্ধতা ও বাইরের বিরূপতার মুখে দাঁড়িয়ে যখন এই ছাত্রকর্মীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তার সঠিক পথে রাখার জন্যে যুঝছিল, তখন মওলানা ভাসানী এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পরনির্ভরতার কেন্দ্র হিসেবে।

অন্যরা সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করলেও মওলানা ভাসানী সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরী করেননি। ছাত্র ইউনিয়নের এই বিভক্তিতে তাঁর মাথা ব্যথার কোন বিষয় ছিল না। কারণ তিনি ছাত্র আন্দোলন থেকে উর্ধ্বে রাজনৈতিক অঙ্গনে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি যেচে এলেন বিপ্লবী ছাত্র কর্মীদের পাশে তাদের রাজনীতিকে—তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্যে। তিনি এটা স্পষ্ট জানতেন, এর ফলে ছাত্র ইউনিয়নের অন্য অংশ ও তাদের মুরুব্বীদের তিনি বিরাগভাজন হবেন। তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতিতেও এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও রাজনীতিতে তাঁর আসনের তোয়াক্কা না করে একাত্ম হলেন ছাত্র আন্দোলনের প্রগতিশীল ধারার সাথে। তাঁকে অনেকটা হাতে ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করলেন গ্রামাঞ্চলে শাখা বিস্তার করে কৃষকের কাছাকাছি থাকার জন্যে।

মওলানা ভাসানীর বয়স তখন আশির কোঠা পেরিয়েছে। কিন্তু তরুণ যুবকদের চিন্তার সাথে তাঁর চিন্তাও ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। মওলানা ভাসানী ও ছাত্র আন্দোলন হাতে হাত ধরে চলা শুরু করল। এতদিন ছাত্র আন্দোলনের সাথে মওলানা ভাসানীর ছিল রাজনীতির সংযোগ, এখন হলো প্রাণের মিল। ধর্মনেতা থেকে শুরু করে কৃষক সংগ্রাম, গণরাজনীতির থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক—মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের এই উত্তরণের সাথে ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী সংগ্রামের একাত্মতা একই সূত্রে গ্রথিত। মওলানা ভাসানী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এই সময়ের কিছু কথা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রগতিশীল অংশ 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর' শিরোনামে ঢাকা বার লাইব্রেরীতে আয়োজন করেছে সমাবেশের। প্রধান অতিথি মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ভূলো ধুনো করলেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে উলঙ্গ করে দেখালেন উপস্থিত সবাইকে। হঠাৎ তিনি পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গে এলেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের

www.pathagar.com

দ্বিধাবিভক্তির উল্লেখ করে বললেন, 'ছাত্ররা এক থাকলে আমরা আরও দৃঢ় সংগ্রাম করতে পারতাম। কিন্তু যেখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রশ্নে আপোষ কি আপোষ নয়—প্রশ্ন, সেখানে আপোষহীন সংগ্রামের পথকে সমর্থন জানাতেই হবে।' বক্তৃতা শেষে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মওলানা ভাসানী।

এই সময়ে মওলানা ভাসানী ছাত্রকর্মীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে বার বার পরামর্শ দেন। গ্রামে শাখা গড়ে তুলতে, কৃষকের ছেলেকে সাথে নিতে উপদেশ দেন। বস্তুত পরবর্তীতে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপারে ছাত্র-কর্মীদের ক্রমবর্ধমান মনোযোগ ও অংশগ্রহণের পেছনে অন্য অনেক কারণের মাঝে মওলানা ভাসানীর এই অনুপ্রেরণা বিরাট ভূমিকা পালন করে।

মওলানা ভাসানীর সাথে ছাত্র-যুব আন্দোলনের এই নিবিড় সম্পর্ক পরবর্তী পর্যায়ের সকল আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে দারুণভাবে। আটষট্টি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের যে" জোয়ারের মুখ মওলানা ভাসানী খুলে দেন ৬ই ডিসেম্বর লাট ভবন ঘেরাওয়ের মধ্য দিয়ে; ছাত্র আন্দোলনের কর্মী আসাদ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ২৯শে ডিসেম্বরের হরতালে ও ২০শে জানুয়ারী ১১-দফা আন্দোলনের কর্মসূচীতে নিজের জীবন দিয়ে তার উত্তরণ ঘটান গণঅভ্যুত্থানে। গোল টেবিলের আপোষ চক্রান্তের পরিকল্পনায় তিনি যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান, তাঁর সেই ভূমিকায় ছাত্র-কর্মীরাই দৃঢ় অবিচলভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। এরপর সত্তরের প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে সারা বছরব্যাপী কৃষক সম্মেলন সমাবেশে লাল টুপি পরে হাজার হাজার কৃষক জমায়েত হয় তাঁর পাশে। একাত্তরের সশস্ত্র প্রতিরোধের যে আগুন এদেশের ছাত্র-যুবকরা জ্বেলেছিল মওলানা ভাসানীর কাছ থেকেই তার চেতনা লাভ করেছিল তারা।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ ও অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিস্ট দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের ছাত্র-যুবকদের যে প্রতিরোধ সেখানেও মওলানা ভাসানী ছিলেন অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু। এ সকল সংগ্রামে সমর্থন জোগাতে রাজনৈতিক বক্তব্য সাংগঠনিক নীতিমালায় তিনি পরোয়া করতেন না। প্রতিরোধ যিনিই করেছেন তিনিই তাঁর সমর্থন পেয়েছেন।

জীবনের শেষভাগে মওলানা ভাসানী ক্রমশই নিজেকে দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা

www.pathagar.com

তাঁকে নীরব থাকতে দেয় নি। এদেশের রাজনীতির প্রতিটি ঘটনা তাঁর দৃষ্টিতে ছিল। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন জনগণের পক্ষে।

সেই শেষ সময়ের কথা। প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকছেন। আবার সুস্থ হলেই সন্তোষে। এমন একদিনে মওলানা ভাসানীর সাথে সন্তোষে কথা। ছাত্র আন্দোলনের বিভক্তি-ব্যর্থতায় দুঃখবোধের কথা বললেন। চরিত্র গঠনের আহ্বান জানালেন। আশা প্রকাশ করলেন তারুণ্যের ভবিষ্যতের। কিন্তু তার জন্যে চাই সংগ্রাম—চাই সংগঠন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমরা পারব কি?

আমরা পারব কি-না জানি না। তবে মওলানা ভাসানীর জীবন ও সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তাঁর আশা পূরণ করবে।

www.pathagar.com

সৈয়দ জাফর

কৃষক সংগঠন ও মওলানা ভাসানী

১৯৬৭ সাল। এপ্রিল বা মে মাস। টাঙ্গাইল শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে বিন্নাফৈর গ্রাম। মওলানা ভাসানী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডেকেছেন সেই গ্রামে। কমিটির সভা দু'দিনব্যাপী। শেষ দিন অপরাহ্নে কৃষক সমাবেশে মওলানা সাহেবের ভাষণ দেয়ার কথা।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। আগের রাতের মধ্যেই কমিটির প্রায় সব কর্মকর্তা ও সদস্য বিন্নাফৈর গ্রামে পৌঁছে গেছেন। সভা ও সমাবেশ উপলক্ষে কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বহু স্থান থেকে আরও বিশিষ্ট কৃষক নেতা ও কর্মীরা আসছেন। দিনাজপুর, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম সব প্রান্ত থেকে এঁরা এসেছেন। ঢাকা থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী গেছেন।

সমস্ত এলাকাটা গমগম করছে। টাঙ্গাইলের কর্মীরা ও মওলানা সাহেবের মুরীদবৃন্দ তদারকি করছেন। কিন্তু সারা দিনে এক মুহূর্তের জন্যে মওলানা সাহেবকে নিশ্চুপ বসে থাকতে কেউ দেখে নি। সব ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে নিজে খোঁজ খবর নিচ্ছেন বার বার।

রাত এগারো বা সাড়ে এগারোটা। প্রায় সবাই যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় হয় বসে বসে আলাপ করছেন অথবা সারা দিনের দীর্ঘপথ পরিক্রমার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মওলানা সাহেব তখন দক্ষিণমুখী ঘরে বারান্দায় একটি চৌকির উপর গিয়ে বসলেন। তখন তাঁর পাশে জনাব আবদুল হক, জনাব মুজাম্মেল মুন্শী, শ্রী বরোদা ভূষণ চক্রবর্তী, জনাব মোহম্মদ আলী ও অন্য কয়েকজন কর্মী। এঁদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কথাবার্তা হচ্ছে নিম্নস্বরে। একজন হঠাৎ মওলানা সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলে বসলেন, 'হুজুর, টাঙ্গাইলের কৃষকরা এক সময় জমিদারদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। কিন্তু এখন এখানে তেমন সংগঠন গড়ে উঠছে না বা আন্দোলন দানা বাঁধছে না কেন?'

মওলানা সাহেব ঐ সময়ে একজন ছুঁতোর মিস্ত্রীকে কি একটা কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ছুঁতোর মিস্ত্রীর কাজ বুঝিয়ে দিলেও কিন্তু প্রশ্নটি মওলানা সাহেবের কান এড়িয়ে যায় নি। তিনি বললেন, 'তোমরা অনেকেই জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে জড়িত ছিলে। জমিদার থাকলেই যে আন্দোলন হবে আর না থাকলে হবে না এমন কোন নিয়ম নেই। এখন কৃষক আগের চাইতে বেশী খাটে। কিন্তু কয় বেলা পেট পুরে খায়? কচু-ঘেচু বনশাক। সংগঠন করো। তোমরা অনেকেই বিখ্যাত কৃষক আন্দোলনের নেতা। টাঙ্গাইলের মহারাজার বিরুদ্ধে কৃষকের আন্দোলন দমন করতে বৃটিশ সরকার নাস্তানাবুদ হয়েছে। আমার মত মোল্লা তার নেতৃত্ব দিয়েছে।'

মওলানা সাহেব যখন এসব বলছিলেন তখনই বেগম ভাসানী এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন মওলানা সাহেবের খাওয়া হয় নি। টাঙ্গাইলে কৃষক আন্দোলনের বর্ণনা তখন থেমে গেলেও মওলানা সাহেব ভুলে যান নি। পরদিন কেন্দ্রীয় সভায় শুরু থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত একটানা বর্ণনা করে গেলেন সেদিনের আন্দোলনের ইতিহাস। বর্ণনা করলেন ঘুমিয়ে থাকা কৃষকের তেজ। জমিদার ও জোতদার শ্রেণী এবং বৃটিশ সরকারের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। মওলানা ভাসানী বলছিলেন যে, কৃষকরা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে নামলেও নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে তা কোন্ দিকে যাবে। টাঙ্গাইলের জমিদারবিরোধী আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশে পরিণত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন যথার্থ দিক-নির্দেশ না পেয়ে কুজ্ঝটিকায় হারিয়ে গেছে।

মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সেদিনের পুরো বৈঠকে টাঙ্গাইলের কৃষক আন্দোলনের ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। বৈঠকের সবাই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সন্তোষের জমিদার ও তার দোসররা কৃষকের ওপর কি জুলুম চালিয়েছে তার ছবি। সবাই যেন নিষ্পলক চোখে দেখছেন কৃষকদের জেগে ওঠার দাবী। বিব্রত বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের ছবি। সাধারণ ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন কিভাবে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে

www.pathagar.com

পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে—তার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করলেন। ময়মনসিংহ জেলা থেকে তাঁকে বহিষ্কারের কাহিনী, কলকাতায় সরকারী ফাইল খেটে বহু পুরাতন দলিলপত্র বের করে জমিদারের অবৈধ দখলের প্রমাণ উপস্থিত করার কাহিনী, আদালতে যে প্রমাণ করেছিলেন জমিদারী ঐ মহারাজার নয় তার মিথ্যা কাহিনী—এসব পার্শ্ব ঘটনা সামগ্রিক আন্দোলনকে কিভাবে শক্তি দান করেছিল তার জ্বলন্ত বর্ণনাও ছিল।

রাতের বৈঠকে কৃষক সমিতির সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে প্রধানত আলোচনা হয়। মওলানা সাহেব এ বৈঠকে বেশীক্ষণ থাকেন নি। যতক্ষণ ছিলেন তার মধ্যে কিছু সময় তিনি সমিতির প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ ফরম বিতরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। জানতে চান, কোন্ কোন্ জেলায় ফরম পাঠানো হয়েছে বা হয় নি। পাঠানো হলে সংখ্যা কত? তিনি বৈঠকে বলেছিলেন যে, অনেকে ফরম না পেয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন। ফরম কম থাকলে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। প্রস্তুত ফরমগুলো সবাইকে ভাগ করে নেয়ারও উপদেশ দিলেন। মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'তোমরা আজ একদল ছেলে কাল অন্যদলে নাম লিখতে দ্বিধা না করতে পার, কিন্তু একজন কৃষক চাঁদা দিয়ে একবার সদস্য হলে সে তা চিরজীবন মনে রাখে।'

মওলানা ভাসানী ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি। ১৯৫৭ সালে ফুলছড়ি সম্মেলনে তিনি কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব হাতেম আলী খান তখন কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর কৃষক সমিতি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৬৪ সালে পুনর্গঠিত হয়। ঐ বছর আমি কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হই। জনাব হাতেম আলী খান ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৬ সালের কুলাউড়ায় অনুষ্ঠিত সমিতির সম্মেলনে দুটো প্যানেল নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জনাব আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন প্যানেল বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে প্যানেল গঠিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যও ছিল। তাঁর দলীয় সভায় চিরাচরিত স্বভাবে দৃপ্তকণ্ঠে সে বক্তব্য প্রচার করে গেছেন। কিন্তু কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন নিয়ে সামান্যতম প্রভাব বিস্তারেরও

www.pathagar.com

চেষ্টা তিনি করেন নি। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মওলানা ভাসানীই ছিলেন।

এত উর্ধ্বে অবস্থান করেও বিন্নাফৈরের সভার ন্যায় প্রায় সবগুলো সভাতে তিনি সংগঠনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় খোঁজ-খবর নিতেন। কারো বিরুদ্ধে জেলা বা অঞ্চল থেকে অভিযোগ পেলে সরাসরি তা শুধরে ফেলার তাগিদ দিতেন। বিন্নাফৈরের ন্যায় ১৯৬৬ সালে মহীপুরেও সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সদস্য সংগ্রহ ফরম বিতরণ নিয়ে অভিযোগ পেয়ে রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। কমিটির সভায় সদস্য ফরম নিয়ে উপস্থিত হবার জন্যে তিনি আমাকে আগে থাকতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সব বৈঠকের আগেই তিনি এই নির্দেশটি পাঠাতেন। কিন্তু আর্থিক কারণে অধিক সংখ্যায় ফরম ছাপানো সম্ভব না হওয়ায় বিতরণের সময় তা টান পড়ে। মওলানা সাহেবের কানে গেল সে কথা। আমরা তখন একটা ঘরে বসে ফরম বিতরণ করছিলাম। তিনি রেগে ছুটে এলেন সেখানে। জেলার কর্মীরা এত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করে আসা সত্ত্বেও সদস্য ফরম না পেয়ে যে অসুবিধায় পড়েছেন তার উল্লেখ করে তিনি একগাদা বকুনি দিলেন। জেলায় জেলায় ফরম পৌঁছে দেবার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন। পরদিন রাতের ট্রেনে প্রায় সকলেই মহীপুর ত্যাগ করে-ছিলেন। আমরা অল্প কয়েকজন পরদিন যাব বলে থেকে গিয়েছিলাম। সকালে চা-নাস্তা নিজেই পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'তুমি অফিস সেক্রেটারী অথচ ফরমগুলো রেডি করে আনতে পার না? এখনও 'সংবাদ'-এ আছ নাকি?' আমার হ্যাঁ-সূচক জবাব পেয়ে বললেন, 'তোমার দোষ দেব কি? ছাপার পয়সা তো তুমি দেবার পার না। কৃষক সমিতিরও টাকা নেই।' আমার চাকরি, বেতন ও পারিবারিক খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে চাইলেন, 'সংবাদ-এ বেতন যা পাও সব নিজে খরচ কর, না বাড়ীতে কিছু পাঠাও?' এরপর তিনি তাঁর পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন। অবশেষে মুরীদদের দিয়ে যাওয়া সেদিনের টাকাগুলো বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। গুণে বললাম, 'সতেরো টাকা।' মওলানা সাহেব বললেন, 'জব্বার (খুলনার ন্যাপ নেতা মরহুম এডভোকেট আবদুল জব্বার) এই সভার জন্যে বহু টাকা খরচ করেছে। কিছুদিন পরে হলেও জব্বারকে রসিদ বই ছাপার জন্যে কিছু টাকা দিও। শহিদুল হাসানের (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কোষাধ্যক্ষ মরহুম শহিদুল হাসান) কাছ থেকে বাকি টাকা নিয়ে রসিদ বই রেডি করবা।'

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালে মহীপুরে কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অন্যতম কর্মকর্তা হিসেবে এই আমার প্রথম উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটে। তখন কৃষক সমিতির পুঁজি বলতে মওলানা সাহেবের ব্যক্তিগত প্রভাব ও সমিতির সীমিত সাংগঠনিক কাঠামো। আলোচনার এক পর্যায়ে মওলানা সাহেব প্রাচীন নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'মতিন! (জনাব আবদুল মতিন) কৃষক সমিতি করতে হলে গ্রামে এক নাগাড়ে থাকা লাগবে। সবাই আমার মত অশিক্ষিত লোক হলে চলবে না। ট্যালেন্টেড কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করো।' উল্লেখযোগ্য, কৃষক সমিতির এই বৈঠকে হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মরহুম আবদুল জব্বার, জনাব আবদুল মতিন, জনাব হাতেম আলী খান, জিতেন ঘোষ, মরহুম আলী সাফদার খান প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

১৯৬৬ সালে ঢাকায় কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসেছে। খাজনা, হাটতোলা ইত্যাদি সমস্যা নিয়েও আলোচনা চলছিল। মওলানা সাহেব তখন পাশের কক্ষে যোহরের নামাযের পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে এলেন। বললেন, 'কৃষকের খাজনার চাইতে বাজনার সমস্যা বেশী। সমাজতন্ত্র ছাড়া এর সমাধান হবে ক্যামনে?' এরপর তিনি কৃষকদের সমস্যাবলীর ওপর এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। খাজনার সমস্যা থেকে শুরু করে গামছা কেনার সামর্থ্যহীনতা পর্যন্ত—কৃষকের সব কিছু সম্পর্কে চিত্রকরের ন্যায় গ্রাম-বাংলার ছবি এঁকে চললেন। প্রায় দেড় ঘন্টা এক নাগাড়ে বক্তৃতা করলেন। মনে হলো, বক্তৃতা শেষ হয় নি। আবার মনে হলো, বহু শিরোনামের পরিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।

১৯৬৭ সালের জুলাই অথবা আগস্ট মাস হবে। সন্তোষ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, প্রাদেশিক ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, কৃষক সমাবেশ ও মুরীদ মাহফিল চারটিই একত্রে ডেকেছেন। দিনে কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা শেষ করলেন। রাত ৪টায় ন্যাপের ওয়ার্কিং কমিটি সভা শেষ হলো। সভা শেষে শুরু করলেন ওয়াজ। এর আগে শত শত মুরীদ খণ্ড খণ্ড আসরে জিকির করছিলেন। ওয়াজ শুরু হতে তারা দলে দলে মওলানা সাহেবকে ঘিরে বসলেন। কয়েকজন মুরীদ শুরু থেকে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রইলেন। মওলানা সাহেবের সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য। সমগ্র

www.pathagar.com

মানব সমাজের জন্যে তিনি ইসলাম ধর্মের আহ্বানকে তুলে ধরলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মেহনতি মানুষের জন্যে ইসলাম ধর্মে যেসব বিধান রয়েছে তিনি তা উদ্ধৃত করলেন। সমবেত মুরিদগণ পরম ভক্তিসহকারে মওলানা সাহেবের মুখনিঃসৃত বাণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করছেন। তিনি জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমদের সংগঠিত হবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। ওয়াজ শেষে তিনি কৃষক সমিতির সদস্য ফরম উপস্থিত মুরিদ-দের মধ্যে বিতরণের জন্যে নির্দেশ দিলেন। তিনি 'ফি' দিয়ে সদস্য ফরম সংগ্রহ করার জন্যে মুরিদদের প্রতিও নির্দেশ দিলেন। ওয়াজ শেষ হতে সকাল সাড়ে দশটা বেজে গেল। এ সময় দেখা গেল, মওলানা সাহেব উঠে যেতে পারছেন না। কয়েকজন মুরীদ তাঁর পা আঁকড়ে ধরে পড়ে রয়েছে। কোন কথাতেই ছাড়ছে না। অন্য ৭/৮ জন মুরীদ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারছে না। তারা বললো, ওরা সম্বিত হারিয়েছে। সবাই ভাবছেন কি করা যায়! এদিকে মওলানা সাহেব বসা অবস্থায় পায়ে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিলেন। হাত থেকে পা বেরিয়ে এলো। মওলানা সাহেব বললেন, 'বে-আক্কেলগুলোর মাথায় পানি ঢালো। গরম দুধ খেতে দাও।'

১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি ঢাকায় ইস্কাটন গার্ডেনে মরহুম সাইদুল হাসানের বাসভবনে মওলানা সাহেব বসে আছেন। পাশে জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব আবদুল হক, মরহুম সাইদুল হাসান, জনাব আনোয়ার জাহিদ, জনাব নূরুল হুদা, কাদের বক্স ও জনাব মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ রয়েছেন। মওলানা সাহেব জানতে চাইলেন, কৃষক সমিতির কোথায় কয়টা কমিটি হয়েছে। তিনি প্রাথমিক সদস্য সংখ্যাও জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, '৬৫ হাজার গ্রামের ২ জন করে সদস্য করলেও সোয়া লাখের বেশী সদস্য করতে পারতে। এই কাজটার তুলনায় সমাজতন্ত্র কায়েম করা অনেক কঠিন!'

১৯৬৯ সালের শেষের দিকে ভারতের আহমদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তার জের হিসেবে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ভারতের ঐ দাঙ্গার প্রতিবাদে মওলানা সাহেব 'প্রতিবাদ দিবস' আহ্বান করেছেন বলে ঢাকায় কোন কোন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কৃষক সমিতির অফিসে এ সম্পর্কে তাঁর কোন নির্দেশ আসে নি। কিন্তু বিভিন্ন মহল সম্পর্কে প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানার জন্যে যোগাযোগ করছিলেন।

www.pathagar.com

জেলা থেকেও এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হলে এখানেও উস্কানিমূলক কাজে পরোক্ষভাবে সহায়তা করা হবে বলে অনেকেরই আশংকা ছিল। অথচ 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের জন্যে কৃষক সমিতির অফিসিয়াল সিদ্ধান্তও ছিল না। অতঃপর আমি কৃষক সমিতির অফিস সেক্রেটারী হিসেবে পত্রিকায় এই মর্মে বিবৃতি দিই যে, 'প্রতিবাদ দিবস' সম্পর্কে মওলানা সাহেব অফিসে কোন নির্দেশ পাঠান নি। উপরন্তু এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তও নেয়া হয় নি। সুতরাং 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হবে না। আমার এই বিবৃতির পর 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয় নি।

এর কয়েক মাস পর পাবনার শাহপুরে ঐতিহাসিক কৃষক সমিতির সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। তা না হলে এই প্রবন্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে না।

১৯৫৭ সালে বিপুল রাজনৈতিক সম্ভাবনার মুখে 'কৃষক সমিতি' সংগঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর ন্যায় একজন যুগস্রষ্টা নেতাকে পুরোধা হিসাব পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৬ সালে জনাব আবদুল হক প্রমুখ নেতা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সংগঠনের বিকাশ ঘটে নি। ১৯৬৬ সালের আগে পর্যন্ত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অনুসারীদের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব কৃষক সমিতির সংগঠন কুক্ষিগত করে রেখেছিল। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত সময় পর্যন্ত কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব হাতেম আলী খান। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক কুলাউড়া সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ভোটাভুটির মাধ্যমে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব পরাস্ত হয়। এরপর থেকেই কৃষক সমিতিতে নতুন প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়। সারা দেশে কৃষক সমিতির বিকাশ ঘটে ও বিভিন্ন স্থানে কৃষক সমিতির ইস্যুভিত্তিক কৃষি সমস্যাজনিত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই সময় মওলানা ভাসানী অন্য সংগ্রামী কৃষক নেতাদের সাথে নিয়ে চারণের বেশে গ্রাম-বাংলার সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তিনি বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তাতে কৃষক সমিতির রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কৃষক সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য, এই পর্যায়ে এ দেশের বহু প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কর্মী গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য গণসংগঠন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনাব আবদুল হক কৃষক সমিতির সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর থেকে মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতি সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। কার্যত ঐ সময় থেকে কৃষক সমিতির তৎপরতা নিশ্চল হয়ে পড়ে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৫ বছর কৃষক সমিতির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। ইতোপূর্বে এ দেশের কৃষক সমাজের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানই এত জোর ও ব্যাপক রূপ লাভ করতে পারে নি। এ সময়ে এ দেশের কৃষকদের মধ্যে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই প্রভাব বৃদ্ধিতে মওলানা ভাসানী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। মওলানা সাহেব এমন কোন কৃষক সভা অথবা সমাবেশে ভাষণ দেন নি, যেখানে তিনি প্রাক্-বিপ্লব চীনের কৃষক সমাজের চিত্র তুলে ধরেন নি। কোন কোন সভায় বা সমাবেশে তাঁর ভাষণের এক তৃতীয়াংশ থাকতো গণচীনের কৃষি সংস্কার ও কৃষকের জীবনযাত্রার বর্ণনায় সমৃদ্ধ। গণচীনের কমিউনিজমের বিস্তারিত বিবরণ শুনেছি ফুলতলার (খুলনার) কৃষক সমাবেশে। পাবনার শাহপুরের সমাবেশে তিনি বর্ণনা করেছেন রাজা পুঈয়ের আত্মোপলব্ধির কথা। কুলাউড়ায় লাখ লাখ কৃষকের সামনে তিনি রিপোর্ট পেশ করেছেন কিভাবে চীনের কৃষকরা বিদেশী ঋণ, সাহায্য, ভিক্ষা ছাড়াই নিজেদের শক্তিতে বিশাল বিশাল বাঁধ, জলাধার, সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ করে ধূসর ভূমি বা দুর্গম পাহাড়ের বুকে সবুজ ফসলের সমারোহ ঘটিয়ে বিশ্বে নতুন চমক সৃষ্টি করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাসঘাতকতা করে সমস্ত প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিয়ে যায়। অথচ গণচীনের জনগণ মাও-সেতুং-এর নেতৃত্বে কিভাবে স্বনির্ভর হয়ে তাদের জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলেন, তা সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে; এ দেশের ভূমিহীন, গরীব কৃষকদের মাঝে মওলানা সাহেব এসব সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন, 'মাও-এর চীনে সেদিনের ভূমিহীন গরীব কৃষকের, শ্রমিকের ছেলেমেয়ে আজ পিকিং-এ ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। সে দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এরাই আজ মেজরিটি।'

মওলানা ভাসানী প্রাক্-বিপ্লবী চীনের যে ছবি আঁকতেন তার সাথে আমাদের দেশের কৃষক সমাজের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার

www.pathagar.com

চীনেরই মতো আমাদের দেশের কৃষকদের মধ্যে যে বিরাট সৃজনশীল ভূমিকা ঘুমিয়ে রয়েছে তারই তিনি উল্লেখ করতেন। তিনি হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন এ দেশের কৃষকরা গণচীনের কৃষকের ন্যায় মুক্ত হলে ঠিক একই রকম অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে। সৃজনশীলতা ও আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এবং এজন্যেই মাও-সেতুং-এর প্রসঙ্গ উঠলেই মওলানা ভাসানী এত উচ্ছ্বসিত ও অভিভূত হয়ে পড়তেন।

www.pathagar.com

ফিরোজ আল-মুজাহিদ

মুকুটবিহীন সম্রাট মওলানা ভাসানী

রাজা বা সম্রাট রাজ্য শাসন করেন, তাঁকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং তাঁর উপর অর্পিত বা ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য, তিনি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও আইন-শৃংখলা রক্ষা করেন। প্রজা ও জনগণের সুখ-দুঃখের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের বৈষয়িক এবং মানসিক উন্নতির চেষ্টা করেন। রাজারও এসবের দায়িত্ব পালনের জন্য থাকে অসংখ্য পাত্রমিত্র, আমলা, উপদেষ্টা, সৈন্য-সামন্ত আরও অনেক কিছু। তাঁর রাজকীয় কাজকর্ম এবং শান-শওকতের খরচের জন্য থাকে সীমাহীন ধনভাণ্ডার আর রাজ্যের যাবতীয় সম্পদ। কিন্তু মওলানা ভাসানীকে প্রদত্ত কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল না, তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল না কিম্বা কোন দায়িত্ব অর্পিত ছিল না, পাত্র-মিত্র, আমলা-উপদেষ্টা, সৈন্য-সামন্ত, ধনভাণ্ডার, সম্পদ কোনটাই তাঁর ছিল না। অথচ তিনি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। দেশের আইন-শৃংখলার প্রতি নজর রেখেছেন। জনগণের সুখ-দুঃখের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির জন্য যে কোন চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। তাঁর এসব কাজের খরচের জন্য কোন ভাণ্ডার ছিল না, রাজ্যের সম্পদে হাত দেবার কোন অধিকারও তাঁর ছিল না। তবুও একটা দেশের জন্য রাজ্য বা সম্রাট যা করেন মওলানা ভাসানী করে গেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

দেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্বের উপর কোন হামলা এলে কিংবা তেমন কোন আশংকা দেখা দিলে রাজা বা শাসকের ঘুম ভাঙার আগে গর্জে উঠেছে মওলানার প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাঁর বজ্রকণ্ঠ ঘুম ভেঙে দিয়েছে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত শাসকবর্গের। তাঁরা জেগে দেখেছেন প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পথে মওলানা ভাসানী এগিয়ে গিয়েছেন অনেক-খানি। জাতির মান-মর্যাদায় কোন প্রকার আঘাত এসেছে কিংবা আসার

www.pathagar.com

আশংকা দেখেছেন অমনি খোঁচা খাওয়া সিংহের মত তিনি গর্জে উঠেছেন। শাসকদের মান-মর্যাদা বোধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আগেই তিনি জাতিকে সতর্ক করেছেন। এর বিরুদ্ধে তৈরী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের কোথাও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের তিরস্কার করেছেন। শাসক এবং শাসনযন্ত্রকে সতর্ক করে দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়েছেন। সে হুমকিতে শাসকবর্গও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কোথাও কোন সরকারী অথবা বেসরকারী জুলুম হতে থাকলে জুলুমের শিকার মানুষগুলো মওলানার কাছে এসে অভিযোগ করেছে, প্রতিকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। মওলানা জুলুমের সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তাঁর হুঁশিয়ারিতে জুলুম বন্ধ হয়েছে, মহাশক্তিধর শাসক থেকে শুরু করে আমলা, ব্যবসায়ী সবাই মওলানা ভাসানীর হুঁশিয়ারি এবং হুমকির সামনে কম্পমান হয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ক্ষমতা বলতে মওলানার কাছে কিছু ছিল না। অথচ রাষ্ট্রের শাসক থেকে শুরু করে আমলা, শিল্পপতি, দুর্নীতিবাজ, টাউট, বাটপার সবাই মওলানাকে এতো ভয় পেতো কেন? কি শক্তির বলে তিনি শাসক না হয়েও দেশের শাসকদের শাসন করতেন, আমলাদেরকেও তটস্থ করে রাখতেন? তাঁর কোন সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী অথবা অন্য কোন বাহিনী ছিল না, তবুও শোষক, শিল্পপতি, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী এবং দুষ্কৃতি-কারীরা কেন তাঁকে এত ভয় করতো? রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক রাজমুকুট তাঁর মাথায় কোনদিন শোভা পায় নি অথচ তিনি ছিলেন জাতির গুরু, অভিভাবক, নেতাদের নেতা, শাসকদের শাসক। তাঁর এই বিস্ময়কর ভাবমূর্তির পিছনে এমন কি শক্তি ছিল?

মওলানার নিঃস্বার্থ অকপট দেশপ্রেম, অসাধারণ মানবপ্রীতি এবং সিংহ-সুলভ ব্যক্তিত্বই ছিল তাঁর শক্তি। যার কাছে পরাক্রমশালী শাসকও মাথা নত না করে পারতো না। মওলানার দেশপ্রেম ও মানবপ্রীতির পিছনে কোন ছলচাতুরী ছিল না। একথা দেশের শাসকদের থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরাও জানতো। আর এও তারা জানতো যে, মওলানা ছাড়া অন্য কোন নেতা ছলচাতুরী এবং স্বার্থবোধ মুক্ত ছিলেন না। মওলানা জনতাকে ডাক দিয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখিয়ে দিতেন যে, কোন্ শক্তিধর ব্যক্তির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে। আর ক্ষেপে গেলে মওলানা এ থেকে পিছপাও হবেন না

www.pathagar.com

এসব কথা সবাই জানতো। তাই সকল পাপাসক্ত চিত্তেই মওলানার নাম শুনলে কম্পন শুরু হতো।

মওলানা ভাসানীর মানবপ্রীতির আর দেশপ্রেমের অনেক ঘটনার মধ্যে মাত্র দুটো ঘটনার কথাই এখানে বলছি। ১৯৭০ সালের শেষদিকে নোয়াখালি ও বরিশালে যখন মর্মান্তিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয় তখন মওলানা ভাসানী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এবার সুস্থ হয়ে উঠবেন কিনা এমন সন্দেহ অনেকের মনেই ছিল। একদিন রাত্রে শহরময় হঠাৎ রটে গেল মওলানা ভাসানী ইন্তেকাল করেছেন। শহরবাসীরা শোকাকুল হৃদয়ে ছুটে গেল হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালের সামনে সমবেত জনতার মনে একই প্রশ্ন মওলানার লাশ কোথায়? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ক্লান্ত ও শংকিতভাবে জনতাকে বললেন, 'ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের খবর পেয়েই মওলানা অসুস্থ শরীর নিয়েই নোয়াখালি চলে গেছেন। তিনি জোর করে বেরিয়ে চলে গেছেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ঠেকাতে পারলাম না। তিনি দুর্গত অঞ্চলে চলে গেছেন বিপন্ন মানুষের সেবা করার জন্য। তাঁর যে এবার কি অবস্থা হবে আল্লাহ্ই জানেন!'

মানুষ কোথাও বিপদগ্রস্ত হয়েছে এমন কথা শুনলে মওলানা অধীর হয়ে পড়তেন, বিপন্ন মানুষের আর্ত চিৎকার যেন তাঁকে উম্মাদ করে তুলতো। আত্মীয়স্বজনের বাধা, প্রকৃতির প্রতিকূলতা, এমন কি মৃত্যু ভয় তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারতো না। তিনি উম্মাদ হয়ে ছুটে যেতেন বিপন্ন মানুষের কাছে।

মওলানা ভাসানী ছিলেন বাঙ্গালী স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। জাতীয় স্বার্থ এবং মর্যাদার উপর সামান্যতম হামলা এলে তিনি সিংহের মত গর্জে উঠেছেন। প্রতিবাদ করেছেন, কোমর বেঁধে প্রতিরোধ করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরেও শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ভারতের নিকট বেরু-বাড়ী হস্তান্তর তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তিনি শেখ মুজিবরের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। জনসভা ও মিছিলের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার ভারতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি পচানব্বই বছর বয়সেও চরম দুঃসাহসিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, দেশের অন্য নেতারা যখন ভয়ে কোন কথা বলছিলেন না তখন একমাত্র মওলানা ভাসানী গোটা জাতিকে ডাক

www.pathagar.com

দিয়েছেন ফারাক্কাবিরোধী জাতীয় মিছিলে যোগদান করতে, লং মার্চ করে ফারাক্কা বাঁধ পর্যন্ত অগ্রসর হতে। আর এই কঠিন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হলো। সারা বিশ্বের আতংকিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো মওলানা ভাসানী এবং বাংলাদেশের সীমান্তের ওপারের ফারাক্কা বাঁধের উপর। ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টিকারী এই ফারাক্কা মিছিলের প্রস্তুতি দেখে বিশ্ববিবেক নড়ে উঠলো। জাতিসংঘের জরুরী সভা আহ্বান করা হলো। ফারাক্কা বাঁধের অযৌক্তিকতা এবং এর সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতি নিয়ে জাতিসংঘে তর্কবিতর্ক শুরু হলো। আর এদিকে ১৯৭৬ সালের ১৬ই মে লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল মওলানার নেতৃত্বে এগিয়ে চললো ফারাক্কা বাঁধ ভাঙতে। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বাধ্য হলেন ন্যায়ভিত্তিক পানি-বণ্টনের আইন মেনে নিতে।

অথচ এই ফারাক্কা মিছিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় মওলানা তাঁর দলীয় নেতৃস্থানীয় কর্মীদের দ্বারাই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। তাদের প্রতিকূল চিন্তাভাবনার মুখে মওলানা বলেছিলেন, 'আমি ন্যাপের নেতা নই, আমি জাতির নেতা। আমি ন্যাপকে নিয়ে কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক কোন দল নিয়ে এই মিছিল করবো না। জাতির প্রতি আমার এই মিছিলের আহ্বান, গোটা জাতিকে নিয়ে আমি এই মিছিল করবো।'

সে সময় মওলানা ভাসানীর স্বাস্থ্য আসলেই খুব ভেঙে পড়েছিল, পুরাতন রোগগুলো নতুন করে দেখা দিয়েছিল। খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর তখনকার স্বাস্থ্য এবং বয়সের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেও অনেকে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শের উত্তরে বলতেন, 'আমি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাই না। ফারাক্কা মিছিলে যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে আমি মনে করবো এই মৃত্যু আমার সার্থক হয়েছে, তোমরা আমার লাশ মিছিলের সাথে বয়ে নিয়ে যেও।'

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে মওলানা ভাসানী বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন, জাতির স্বার্থ ও মানমর্যাদার প্রতি সদাশয় দৃষ্টি রেখেছেন, দেশের মানুষকে তিনি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছেন। যদিও এসব করার কোন গঠনতান্ত্রিক দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল না, তবু তিনি এসব করেছেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, জাতির

www.pathagar.com

স্বার্থ ও মান-মর্যাদার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, দেশের মানুষকে ভালবাসা— এসব নিয়মতান্ত্রিক বা গঠনতান্ত্রিক শাসক বা রাষ্ট্রনায়কের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে তারা যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন মওলানা ভাসানীকে দেখা গেছে এগিয়ে আসতে স্বেচ্ছায় এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে সদর্পে সামনে এগিয়ে যেতে। তাই প্রতিটি জাতীয় দুর্যোগের চূড়ান্ত মুহূর্তে হতাশাগ্রস্ত মানুষকে দেখেছি রাষ্ট্রনায়কের সাহায্য না চেয়ে মওলানা ভাসানীর সাহায্য কামনা করতে। দেশের মানুষের কাছে চরম হতাশার মুহূর্তে যেন মওলানা ভাসানীই ছিলেন দেশের রক্ষক, জাতির মুরব্বী, অভিভাবক; তিনি ছিলেন জাতির শেষ আশা-ভরসার স্থান। একথা যে কেবল সাধারণ মানুষের ব্যাপারে সত্য ছিল তা নয়, দেশের শাসক বা রাষ্ট্র-নায়কদেরকেও দেখেছি মওলানার দরবারে অপরাধীর মত নত মস্তকে ধর্ণা দিতে, তাঁর পরামর্শ চাইতে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে।

এমন করে যিনি দেশকে ভালবাসতে পারেন, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখকে নিজের করে নিতে পারেন, রাজ্যের মালিক না হয়েও তিনি দেশের রাজা, মাথায় মুকুট না পরেও তিনি সম্রাট; তাঁকেই রাজা-প্রজা সবাই নত মস্তকে অভিবাদন জানায়।

বিপ্লব ও মওলানা ভাসানী

বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষকরাজ, শ্রমিকরাজ অর্থাৎ মেহনতি মানুষের রাজত্ব কায়েম করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। বিপ্লব ছাড়া তাঁর এই স্বপ্ন সফল হওয়ার কোন উপায় নেই। এ কথার বাস্তবতা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে নির্বাচনের রাজনীতি এই শ্রেণীর মানুষের জন্য একটা গোলক ধাঁধা এবং ধাপ্পাবাজী। নির্বাচনের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের রাজ কায়েম হতে পারবে না। আর পারবে না বলেই দুনিয়ার শোষক শ্রেণীর কাছে নির্বাচনের গণতন্ত্রের এতো আদর! তারা জানে কায়েমী স্বার্থকে চিরস্থায়ী এবং অম্লান রাখতে হলে নির্বা-চনের গণতন্ত্রই একমাত্র পথ। এপথ ছাড়া জনগণকে ধোকা দেওয়া বেশী দিন সম্ভব হয় না। পুঁজিপতি বা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের শোষক শ্রেণীর দুরভিসন্ধিমূলক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ১৯৬৫ সালে চীন থেকে ঘুরে এসে। যাদের কল্যাণের জন্য তার রাজনীতি—কৃষক, শ্রমিক, কামার-কুমার, তাঁতী, জেলে প্রভৃতি মেহনতি

www.pathagar.com

মানুষ—তাদেরকে সংগঠিত করে তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের আহ্বান জানালেন এবং এদেশ থেকে শোষণ-দুর্নীতি সামাজিক অবিচার, অত্যাচার ইত্যাদি দূর করে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন মেহনতি মানুষের রাজত্ব কায়েম করার ঘোষণা করলেন। বিপ্লব সম্বন্ধে এই হচ্ছে মওলানা ভাসানীর প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা।

তিনি দেখেছিলেন আমাদের জাতির জন্য বিপ্লব অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। জাতি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সব দিক থেকে দুঃসময়ের চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। একটি ব্যাপক পরিবর্তন বা সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া এর অস্তিত্ব রক্ষা করার বিকল্প কোন পথ নেই। জীবনে প্রতিটি স্তরে অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যার ফলে সামান্যতম নীতিবোধ কোথাও আজ আর খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। মানু-ষের স্বার্থবোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতা এমনভাবে জঘন্য রূপ লাভ করেছে যার ফলে জাতীয় স্বার্থবোধ এবং সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা স্রেফ পাগলা-মোর পর্যায়ে নেমে এসেছে। সামাজিক অবিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যে কোথায় পৌঁছেছে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। জাতির এই ভয়ংকার রোগ কোন আস্তে ধীরের চিকিৎসা দ্বারা সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। একটা সিরিয়াস অপারেশন বা সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া এ রোগের অন্য কোন ওষুধ নেই।

আমাদের সমাজ একটা ব্যক্তিতান্ত্রিক ধনবাদী সমাজ। ধন বা সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সমাজ কাঠামো। আর এই কাঠামো থেকেই জন্ম নিয়েছে আমাদের ভূমি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছু। ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি, আহরণ করে সম্পদ রক্ষা, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা এবং ব্যক্তিগত আধিপত্য লাভের চেষ্টার সঙ্গে জড়িত করে যত রকম দুর্নীতি কল্পনা করতে পারা যায়---তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আমাদের এই ব্যক্তিতান্ত্রিক ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থা, এই বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সংগে বিশেষ ধরনের দুর্নীতির সম্পর্কটা হচ্ছে গাছ আর তার ফলের সম্পর্কের মত। গাছ ঠিক রেখে যেমন ফল অবাঞ্ছিত হলেও তার জন্ম সম্ভাবনা দূর করা যায় না, তেমনি এই সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। দুর্নীতি দূর করা মানেই হচ্ছে এর জন্মদাতা বিশেষ অবস্থা বা ব্যবস্থার আমুল উচ্ছেদ সাধন। সুতরাং

www.pathagar.com

কল্যাণকর যে কোন পরিবর্তন বা বিপ্লব সমাধা করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানতেই হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সংস্কার আর বিপ্লব কথা দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। একটা বিশেষ সমাজ বা জীবন ব্যবস্থার কোন বিশেষ অংশের সংস্কার সাধন সম্ভব—কিন্তু কোন অংশ বিষয়ের মধ্যে আলাদা করে কোন বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। বিপ্লব মানে হচ্ছে একটা বিশেষ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন। আমাদের ব্যক্তিতান্ত্রিক ধনবাদী সমাজের মূল ফিলোসফির স্বাভাবিক বিকাশই হচ্ছে আমাদের বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা, অর্থনীতি, প্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর এর স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে ব্যাপক দুর্নীতি, অবিচার আর এক শ্বাসরুদ্ধকর অরাজক অবস্থা। এর একটি অংশের সাথে আর একটির নাড়ির সম্বন্ধ। একটি আর একটির অবিচ্ছেদ্য অংগ। এ সমাজ কাঠামোর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পরিবর্তন না করে কোন অংগ বিশেষের মধ্যে অথবা কোন আংশিক পরিবর্তন বা বিপ্লব আনার কথা চিন্তা করা একটা অবাস্তব এবং অনভিজ্ঞের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। মিল-কলকারখানা, অফিস-আদালত থেকে শুরু করে রাস্তার তরি-তরকারীর দোকান পর্যন্ত একই বিপ্লবের আওতাভুক্ত না করলে একটি সার্থক বিপ্লব সমাধা করা সম্ভব নয়।

বিপ্লব উপর থেকে হয় না বা হবে না। বিপ্লব শুরু হবে গ্রাম থেকে, গ্রামের হাটবাজার থেকে। বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে—কারা তাদেরকে বঞ্চিত করছে, কারা শোষণ করছে। কাদের অবহেলায় এবং অবিচারে তারা সামান্য মানবিক অধিকারটুকু সমাজের কাছে দাবী করতে পারছে না? তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে কারা তাদের শ্রমের ফসল নিয়ে যাচ্ছে। কারা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, কারা তাদের সন্তানদের মনের আশা আর চোখের স্বপ্নকে ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে? কাদের চক্রান্তে ও হঠকারিতার দরুন তাদের সন্তান-সন্ততি অনাহারে অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরছে? আসল শত্রুদের চিনিয়ে দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্য ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এই সব হতভাগ্য কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষগুলোকে দিয়ে। তারপর ওরাই একদিন দেশের চারদিক থেকে দলে দলে এগিয়ে আসবে শহর-

www.pathagar.com

বন্দর এবং রাজধানী দখল করে শোষণ-অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের আখড়া ভেঙে চুরমার করে দিতে। এইরূপ অভ্যুত্থান ও ভয়ের সামনে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সাথে সাথে নির্মূল হয়ে যাবে ভবিষ্যতেও এ শক্তির মাথা তোলার সুযোগ থাকবে না। তাই মওলানা ভাসানী রাজনীতির ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছিলেন সুদূর গ্রামাঞ্চল, সম্মেলন, সংগঠন প্রভৃতি করেছিলেন সকল গ্রামঞ্চলে, রাজনীতিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন গ্রাম্য মানুষের ঘরের দুয়ারে।

নির্বাচনের রাজনীতি দিয়ে বিপ্লব আসে না। কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সুবিধাবাদী শক্তিটাই ক্ষমতায় আসে। শ্লোগান যেখান থেকেই আসুক না কেন, ঘুরে ঘুরে একই শ্রেণী বার বার ক্ষমতায় থাকে। সুতরাং তাদের কাছে গরীবের স্বার্থ সমাজ বিপ্লব আশা করা হাস্যকর।

মওলানা ভাসানী মনে করতেন, বিপ্লব উপর থেকে আসবে না, গণতন্ত্রের মাধ্যমেও আসবে না। বিপ্লব আসবে গ্রাম-গঞ্জ, বন্দরের খেটে খাওয়া জনগণের অন্তর থেকে। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বিপ্লবের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পন্থা সব কিছু বুঝে মওলানা ব্যর্থ হলেন কেন?

সমাজতন্ত্র এক এবং অভিন্ন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করা। এই সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পথের সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন এবং প্রতিকূলতাকে সমূলে উৎপাটিত করাই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বা সার্বিক ন্যায়-নীতিভিত্তিক শ্রেণীহীন জীবনে উত্তরণের কর্মপন্থা। এই সাধারণ সত্যটা বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রীদের সবারই জানা আছে। সমাজতন্ত্র এবং একই কর্মপন্থায় যারা বিশ্বাসী তারা এক হলে যে কোন সময় দেশে সমাজ বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হতো। কিন্তু কতকগুলো ছোটখাট এবং অবাস্তব প্রশ্নে তারা একমত হতে পারছে না যার ফলে জাতির জন্য অতি মহৎ কাজটিও পিছিয়ে যাচ্ছে এবং বিপ্লববাদী কর্মীরা চরম হতাশায় ভুগছে।

সমাজতন্ত্র বিপ্লবীবাদী নেতারা প্রায় সর্বক্ষণই মওলানা ভাসানীর চারপাশে ভীড় করে থাকেন, তাঁরা মনে করতেন মওলানার সবই ঠিক আছে; তবে মওলানা কাঠমোল্লা, মওলানা এখনও নাস্তিক হতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লব সমাধা করা যাবে না। তাছাড়া ভীড় করা নেতাদের মধ্যে ছিল নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। কাকে পিছনে

www.pathagar.com

ফেলে কে এগিয়ে যাবে এই চেষ্টা। কেউ কার্উকে সহ্য করতে পারতো না। দলের মধ্যে তাঁরা উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করতো এবং শেষ পর্যন্ত একদিন একটা গ্রুপ নিয়ে দল থেকে সরে পড়তো বা সরে পড়তে বাধ্য হতো। তারপর সুবিধা মত একটা তত্ত্ব জন্ম দিয়ে নতুন একটা দল দাঁড় করাতো। মওলানা ভাসানীর দলের প্রত্যেক নেতাই মূল দলের ভিতর একটা করে গ্রুপ বা উপদল সৃষ্টি করতো এবং নিজের লাইনে মওলানাকে কাজে লাগাতে এবং মওলানার পরেই নেতৃত্ব দখল করার চেষ্টা করতো। ফলে মূল দলের ভিতর নির্ভেজাল সংহতি ছিল না। সাধারণ কর্মীরা ছিলো মওলানার সত্যিকার ভক্ত, বলতে গেলে অন্ধ অনুসারী। কিন্তু উপরের নেতারা মওলানাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে একদিন একচ্ছত্র নেতা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। ফলে বিপ্লবের চিন্তার চেয়ে ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নই এসব নেতারা দেখতেন বেশী। মুখে তারা সমাজতন্ত্র এবং বিপ্লবের কথা যতোই বুলক না কেন অন্তরে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মত্ত বাসনা। এইরূপ বাসনা নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যে সব নেতারা হেরে যেতেন তাঁরাই মূল দল পরিত্যাগ করে নতুন দল তৈরী করে বিপ্লবের নতুন লাইনের কথা বলতেন।

বিপ্লববাদী নেতারা প্রত্যেকেই একজন মহাপণ্ডিত। কেউ কারো ব্যাখ্যা মানতে রাজী হন না। নিজে যা বিশ্বাস করেন তাকেই চূড়ান্ত বিশ্বাস বলে মনে করেন এবং এর ভিত্তিতে একটা নতুন দল গঠন করেন আর অন্য নেতাদের ভ্রান্ত এবং বিপদগামী বলে মনে করেন। বিপ্লববাদী নেতাদের এইরূপ হঠকারী নীতির ফলে বিপ্লবের পথে তাঁরা অগ্রসর তো হতে পারেন না বরং কর্মী এবং জনগণকে নিদারুণভাবে হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করে বিপ্লবের সম্ভাবনার মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করেছেন।

কোন কোন বিপ্লববাদী নেতা মনে করেন আগে জনগণকে নাস্তিক বানাতে হবে। তারপর বিপ্লব সমাধা করতে হবে। কোন কোন গ্রুপ মনে করে, সন্ত্রাসবাদের পথে শ্রেণীশত্রুদের আগে খতম করতে হবে। তারপর বিপ্লব সমাধা হবে। কেউ কেউ মনে করেন, সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কেবল বিপ্লব সম্ভব, অন্য কোন পন্থায় সেটা হতে পারে না। কেউ কেউ আবার নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর উপর থেকে বিপ্লব ঘোষণা করে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। নিজের নীতি

www.pathagar.com

থেকে এক ইঞ্চিও কেউ বিচ্যুত হতে রাজী নন। বিপ্লবের স্বার্থে কিছু ছেড়ে কিছু গ্রহণ করে পরস্পরের কাছে আসতে তাঁরা রাজী নন। কারণ এখানে আছে নেতৃত্বের প্রশ্ন, একক নেতৃত্বও খর্ব হওয়ার আশংকা। তাই এ ব্যাপারেও তাঁরা অতি সতর্ক।

তাছাড়া যাঁরা নেতৃত্ব চান না অথচ বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং সমাজ বিপ্লবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তাদের মনে একটা সন্দেহ আছে। তাঁরা মনে করেন, বিপ্লববাদীরা গরীব, তাঁদের নেতাদের অনেকেই উচ্চাভিলাষী। বিলাস বাসনা চরিতার্থ করতে না পেরে ক্ষোভে দুঃখে বিপ্লবী হয়েছে। তাদের মানসিকতা বুঝে নিয়ে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের এজেন্টরা সুকৌশলে তাদেরকে বশ করেছে। অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাদেরকে দিয়ে বিপ্লবী দল করাচ্ছে।

এজেন্টদের সঙ্গে এসব ছদ্মবেশী বিপ্লবীদের চুক্তির শর্ত হচ্ছে যে, কোন প্রশ্নে এবং কৌশলে বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া, ঐক্য বিনষ্ট করা, বিপ্লবের পদক্ষেপকে বিলম্বিত করা অর্থাৎ পন্থা, সময় বাস্তবতা ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্নে বিপ্লবের জয়যাত্রাকে বানচাল করে দেওয়া। তাদের এই সন্দেহকে অমূলক উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ বিপ্লবীরা বিপ্লব করার জন্য যতোটা সচেষ্ট হয় তার চেয়েও বেশী সচেষ্ট থাকে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব বিপ্লব না হওয়ার জন্য এবং বিপ্লবকে বানচাল করার জন্য। তাদের বুদ্ধির সাথে আছে তাদের দুনিয়াজোড়া বিস্তৃতি, অগাধ অর্থ এবং অর্থের হাতছানির সামনে অনেক বিপ্লবী নেতার পক্ষেই স্থির থাকা সম্ভব হয় না। ভিতরের শত্রু দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যতো সহজ, বাইরের প্রকাশ্য শত্রু দিয়ে সেটা ততোটা সহজ নয়। তাই গণতান্ত্রিক বিশ্বের এজেন্টরা বিপ্লবীদের দিয়েই বিপ্লবকে ঠেকাবার কৌশল অবলম্বন করেছে।

নাস্তিকতাকে যারা বিপ্লবের সাথে প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করে তারাও এক ধরনের মানসিক রোগের শিকার। তারা নিজেদেরকে কট্টর বাস্তববাদী মনে করে, অথচ বাস্তবতার প্রকৃত সংজ্ঞা তারা জানে না। মানুষের জন্মমৃত্যু, কাজকর্ম, খাওয়া-পরা যেমন বাস্তব, ভাবালোক বিচরণ করার স্বভাবটাও তেমনিই বাস্তব। শেষোক্ত বাস্তবতাকে মানুষের প্রকৃতি থেকে বাদ দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই যে অবাস্তব পথের

www.pathagar.com

যাত্রী হয়েছে সে খেয়াল তাদের নেই। তাই সর্বত্র তারা অবাঞ্ছিত। অথচ নাস্তিকতাকে বিপ্লব এবং সাম্যবাদের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ঘোষণা না করলে শোষিত, অবহেলিত মানব সমাজে তাদের আদর হতো সবচেয়ে বেশী। মানুষ বিপ্লব করে অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর প্রভৃতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। নাস্তিকের কাছে যা অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর, একজন আস্তিকের কাছেও তা অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর। সুতরাং জুলুমমূলক অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আস্তিক, নাস্তিক, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে পারে। জুলুমের উচ্ছেদ সাধন করে ন্যায়নীতিভিত্তিক সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শোষক যখন অত্যাচারী হয়, অবিচার অসত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে উৎখাত করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য—এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তাছাড়া শোষণ, অবিচার, অত্যাচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিপ্লব করেই ইসলাম তার দুনিয়া-জোড়া অবস্থান সুসংহত করেছে। সুতরাং ইসলাম নিজেই বিপ্লবের ধর্ম। যেখানে দুর্বলের উপর সবল অত্যাচার চালায়, এক শ্রেণী অপর শ্রেণী দ্বারা শোষিত হয়, অবহেলিত হয়, মানুষ তার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, অসত্য সত্যকে গ্রাস করে, অসুন্দর সুন্দরকে আছন্ন করে তখনই বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, আর এইরূপ বিপ্লব করার জন্য মুসলমান ধর্মত বাধ্য। কারণ দুনিয়াতে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং আস্তিক মুসলমানকে যদি প্রকৃত বিপ্লবী বলা হয় তবে ভুল করা হবে না। এই প্রকৃত বিপ্লবীদেরকে বাদ দিয়ে এদেশে যারা বিপ্লব করতে চেষ্টা করেছে তারা গোড়াতেই ভুল করে বসে আছে। সারা জীবন তারা বিপ্লবের পায়তারা করতে পারবে; কিন্তু বিপ্লব সমাধা করতে পারবে না।

আর এক শ্রেণীর বিপ্লবী আছে যারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব করতে চায়। বিপ্লবের আদর্শে যারা রাজনৈতিক দল গঠন করবে, নির্বাচনে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতায় যাবে। তারপর ক্ষমতায় থেকে দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে বিপ্লব ঘোষণা করে দেবে। ব্যস, শান্তির পথ ধরে বিপ্লব এসে যাবে। এপথে বিপ্লব করতে পারলে খুবই ভাল হতো। কিন্তু পথটা আসলে এতো সরল, সোজা, মসৃণ নয়, পূর্বেই বলেছি স্বার্থান্বেষী উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা করে নির্বাচনের রাজনীতি। দলের শ্লোগান এবং রাজ-নীতি যা-ই থাক, ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুকৌশলে তারা সে

www.pathagar.com

দলে ঢুকে পড়ে এবং নির্বাচনের প্রতিযোগিতা তারাই করে এবং জয়ীও তারাই হয়। কিন্তু সমাজ বিপ্লবের প্রশ্ন উঠলে দলের প্রতি তারা বিশ্বস্ত থাকবে কি? বিশ্বস্ত থাকে নি তারা শেখ মুজিবরের সময়ে, বিশ্বস্ত থাকে নি জিয়াউর রহমানের সময়ও। কারণ দেশের স্বার্থে বিপ্লব অত্যাবশ্যকীয় হলেও বিপ্লব করে তারা নিজের গায়ে কুড়াল মারতে রাজী নয়। যে কোন মূল্যে তারা বিপ্লবকে রুখবে এতেই তাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে। এদের উপর নির্ভর করে বিপ্লব ঘোষণা করতে যাওয়া কি নির্বুদ্ধিতা নয়? তারপরও আছে দেশের দীর্ঘদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী যারা ইচ্ছে করলে যে কোন সরকারকে মাসের মধ্যে উৎখাত করে দিতে পারে। সরকার বিপ্লব ঘোষণা করে দেবে আর তারা এতদিনকার সঞ্চিত ধন-সম্পদ-শান-শওকত—আরাম-আয়েশ দু'হাতে বিলিয়ে দিয়ে পাক-পবিত্র হয়ে শোষিতের বিপ্লবকে বুকে টেনে নিতে ছুটে আসবে, এটা আশা করা আহম্মকী ছাড়া আর কিছু নয়। এ পরিস্থিতিতে বিপ্লব সাধনের শান্তিপূর্ণ পথটা কোথায়? তাই মওলানা ভাসানী বার বার বলতেন শান্তির পথে কিংবা নির্বাচনের গণতন্ত্রের পথে কখনও বিপ্লব আসবে না।

আর এক শ্রেণীর বিপ্লবীরা মনে করে সন্ত্রাসবাদী পন্থায় দেশের শ্রেণী-শত্রুদেরকে খতম করে দিতে পারলে বিপ্লব আপনা থেকেই হয়ে যাবে। সমাজ বিপ্লবের প্রধান শত্রু দেশের টাউট-বাটপার, দুর্নীতিবাজ, ব্যবসায়ী, ঘুষখোর, আমলা প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। বেছে বেছে ওদেরকে শেষ করে ফেললে অবশিষ্ট যারা থাকবে তারা শোষণহীন শ্রেণীহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ মেনে নেবে। তাদেরও লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যে পন্থায় তারা অগ্রসর হতে চাচ্ছে সে পন্থাটা কি জনগণের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য? সমাজ শত্রু বা শ্রেণী শত্রু হিসেবে যারা চিহ্নিত, তারাও সমাজের লোক, তাদেরও আত্মীয়-স্বজন সমাজে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকা আপনজন শোষিত হচ্ছে বা বঞ্চিত হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা আদৌ সচেতন নয়। তবুও আত্মীয় বা আপন জনদের কেউ নিহত হয়েছে একথা শোনা মাত্র অপরাপর আত্মীয়রা মর্মাহত হয়ে বেদনা বোধ করে। এইরূপ একটি হত্যাকাণ্ড দশটি মানুষের ঘৃণা মধ্যে এবং প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাছাড়া শান্তিপ্রিয় রাজনীতি করায় জনগণ শান্ত মনে কোন হত্যাকাণ্ডকেই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে না, তাই সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য যতোই মহৎ হোক না কেন জনগণের প্রশংসা এবং সহানুভতি

www.pathagar.com

পেতে পারে না। জনগণ থেকে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয় এবং এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদেরকে নির্মূল করে দেয়।

সমাজশত্রু এবং শ্রেণীশত্রু নির্মূল করা ছাড়া বিপ্লব আসে না এটা সত্যি কথা। তবে এর জন্য একটা উপযুক্ত সময় এবং একটা জাতীয় চেতনার প্রয়োজন। যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা কোন বিশেষ অবস্থায় শত শত মৃত্যু দেখলেও কারও মনে কোন বেদনাবোধ জাগে না। অথচ শান্ত অবস্থায় একটি মৃত্যু হাজার মানুষের মনে বেদনাবোধ জাগিয়ে তোলে। তাই শান্ত অবস্থায় শ্রেণীশত্রু খতম করার কর্মসূচী গ্রহণ না করে, শ্রেণীশত্রুদের সমাজ-বিরোধী চেহারা যা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে জনগণকেই একদিন বিপ্লবের পথে পরিচালিত করতে হয় শত্রুদেরই নির্মূল করবার জন্য। তাহলে বিপ্লবও সমাধা হবে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার এবং প্রতি-ক্রিয়াশীলদের দ্বারা নির্মূল হবারও কোন আশংকা থাকবে না। তাই মওলানা ভাসানী বলতেন ঃ তোমরা শ্রেণীর ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোল, গ্রাম্য টাউট-বাটপার দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত কর, জনগণের নিকট শোষকদের চরিত্র এবং গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করো, জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে সচেতন করো। তারপর একদিন বিপ্লবের মাধ্যমে এসব শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

মাহ্ফুজউল্লাহ্

মওলানা ভাসানীর রচনাবলী প্রসঙ্গে

লোকান্তরিত জননেতা মওলানা ভাসানীকে নিয়ে এখন স্মৃতিচারণার অবকাশ অনেক। কিন্তু এই সমস্ত স্মৃতিচারণায় একটি প্রসঙ্গ অনুল্লেখ্য থেকে যাচ্ছে— আর তা হলো রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে মওলানার দীর্ঘ ও বাস্তব উপলব্ধি যা বিভিন্ন সময়ে ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মূল্যায়ন হয় নি।

স্কুলের শিক্ষা মওলানার ছিল না। সে আমলের নিয়মানুযায়ী তিনি মাদ্রাসার পাঠ চুকিয়ে বেশী দূর এগোতে পারেন নি। পারিবারিক দীনতাও ছিল, ছিল পরিবেশের প্রভাব। মাদ্রাসার শিক্ষা শেষেই মওলানা জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সঙ্গে।

রাজনীতি করতে গিয়ে মওলানা মানুষকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। বলা চলে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী, যারা ক্ষমতার সিংহাসন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত তারাই মওলানাকে জুগিয়েছে সংগ্রামের প্রেরণা, দিয়েছে রাজনৈতিক শিক্ষা।

মওলানা রাজনীতিকে দেখেছেন জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম হিসেবে। সেই বেঁচে থাকার সংগ্রামে মওলানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন জীবন থেকে। মানুষের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অভিজ্ঞতাই ছিল মওলানার রাজনৈতিক বক্তব্যের মূল উপজীব্য। এ দেশের অন্য কোন রাজনীতিবিদই এমন সহজভাবে অথচ হৃদয়গ্রাহী করে মানুষের নিত্য-দিনের সমস্যাবলী তুলে ধরতে পারেন নি। এটা সম্ভব হয়েছে জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার ফলে। জনগণের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞ-তার ফলে।

মওলানার সব বক্তব্য, স্মৃতিচারণ এখনো মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় নি। নিয়মিত বক্তৃতা-বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই প্রকাশের কারণে এগুলোর মূল সুর নষ্ট হয়েছে।

www.pathagar.com

ষাটের দশক পর্যন্ত মওলানার কিছু কিছু বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী চীন সফর সম্পর্কেও তাঁর নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি বই 'মাও সেতুং-এর দেশে'। এ বইতেও মওলানার কথা বলার ভঙ্গী, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্টাইল অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ হতে পারে বইটি মূলত তৎকালীন সাপ্তাহিক 'জনতা' পত্রিকার জন্যে লেখা। মওলানা ভাসানী চীন সফর শেষে ফিরে আসার পর ধারাবাহিকভাবে সে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদপত্রের জন্যে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তৈরী করার ফলে তা করতে হয়েছে চলতি ভাষায়। অথচ মওলানা বিবৃতি বা অন্য কোন লেখার ক্ষেত্রে সাধু ভাষাই অনুসরণ করতেন। তাঁর লেখা চিঠিপত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মওলানা ভাসানী লিখেছেন খুব কম। কিন্তু এই স্বল্পতা সত্ত্বেও যা প্রকাশিত হয়েছে দুষ্প্রাপ্য হলেও মূল্যায়নের পক্ষে তা যথেষ্ট। প্রথমেই ধরা যাক ১৩৭০ সালের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত 'ভাসানীর অতীত দিনের কথা' পুস্তিকার কথা। নিজের জীবন সম্পর্কে মওলানা স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে ঃ

'বাংলা ১৩২৯ সালের কথা। আশ্বিন মাসে হঠাৎ প্রবল বন্যা শুরু হইয়া গেল। এই বন্যায় উত্তর বঙ্গ বিশেষ করিয়া বগুড়া, রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ভাসিয়া গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষের মাটির দেয়ালের গৃহ ও প্রাচীর বন্যার স্রোতে ধসিয়া পড়িল। রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। রেল লাইনের উপর তিন ফুট হইতে সাড়ে তিন ফুট বন্যার পানি উঠিয়া গেল, মাঠের রোপা ধান, রক্তদহ বিলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় রোয়া ধান, নওগাঁর গাঁজা চাষের অঞ্চলের ফসলাদি সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল। সুউচ্চ পুষ্করিণীর পাড়ে স্থান না হওয়ায় ঘরের চালের উপর, গাছের ডালে সাপ-মানুষ-পক্ষী সব একই সঙ্গে তিনদিন তিনরাত যাবৎ অনাহারে বাস করিতে লাগিল। হাজার হাজার গরু-মহিষ, অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু এবং অসংখ্য মানুষ পানিতে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিতে লাগিল।

'সেই সময় ভারতের অন্যতম দেশদরদী চিত্তরঞ্জন বসু, স্যার পি. সি. রায় প্রমুখ মহান ব্যক্তির নেতৃত্বে 'সংকট ত্রাণ' সমিতি গঠন করা হয়। তাহাতেই আমি, মরহুম জালালউদ্দীন হাসেমী, ভগবান দাস প্রমুখ

www.pathagar.com

যোগদান করিয়া ১৩২৯ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত চিড়া, গুড়, চাউল, কম্বল, পরিধানের বস্ত্র, গৃহাদি নির্মাণের জন্য বাঁশ, নগদ টাকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বন্যাপীড়িত এলাকার দুঃস্থ লোকদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলাম।

'বাংলার ইতিহাসে এত বেশী নগদ টাকা, কাপড়, চিড়া, গুড়, ঔষধ প্রভৃতি আর কোন সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এবং এইভাবে সুষ্ঠু বন্টন এবং মানুষকে বাঁচাইয়া স্বাবলম্বী করিবার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত যত সরকারী বেসরকারী রিলিফের কাজই হইয়া থাকুক না কেন তাহার সহিত ঐ সকল কাজের তেমন কোন সামঞ্জস্য নাই। ইহার মূলে ছিল আদর্শপরায়ণতা এবং নিঃস্বার্থভাবে কৃষক মজুরদের প্রতি মানবতাবোধ, দরদ, প্রেম ও ভালবাসা।'

সাহিত্যের বিচারে হয়তো এ লেখার মূল্য নেই। কিন্তু ক'জনের পক্ষে সম্ভব এভাবে একটি পরিস্থিতির বর্ণনা করা, মওলানার কৃতিত্ব সেখানেই। এমনভাবে তিনি কথার গাঁথুনি তৈরী করেন যাতে তা শ্রোতার মনকে ছুঁয়ে যায়। 'রক্তদহ বিল' হয়তো কখনই উদ্ধার হতো না। কিন্তু যিনি এ লেখা পড়বেন তার হঠাৎ এক ইচ্ছে জাগবে 'রক্তদহ বিল' সম্পর্কে জানবার। এখানে হয়তো চলন বিলের কথাও আসতে পারতো। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে রক্তদহ বিলের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আবার একই মানুষ যখন বলেন, 'বন্যায় ঘর বাড়ী ভেসে গেলে অবশেষ থাকে, আগুনে পুড়লে ভিটিটা থাকে, কিন্তু নদী সিকস্তি মানুষের কিছুই থাকে না।' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা কতখানি জানেন।

রাজনৈতিক বক্তব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মওলানা একইভাবে উপমা ব্যবহার করেন যা অনেক ক্ষেত্রে কবিরাও পারেন না। রাজনৈতিক বক্তব্যে মওলানার উপমা ব্যবহারের কৃতিত্বে কবি শামসুর রাহমান মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন কবিতা 'সফেদ পাঞ্জাবী'। উপমা প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সফর করে দিল্লী ফিরে গিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভি. ভি. গিরি। মওলানা সভা আহ্বান করেছেন ইসলামিক একাডেমী মিলনায়াতনে বন্দী মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে।

www.pathagar.com

বক্তৃতায় মওলানা বলেছিলেন, 'মুজিব, তুমি ভি. ভি. গিরিকে দেশের সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য কাপ্তাই নিয়া গিয়াছ। কিন্তু ভুল করিয়াছ। আমি হইলে তাঁহাকে লইয়া যাইতাম চাঁদপুরের কাছে যেখানে তিনটি নদীর স্রোত-ধারা একত্র হইয়াও এক সঙ্গে মিশে নাই।' সেদিন উপস্থিত শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এর সাহায্যে মওলানা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? আজ মওলানার সেই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মওলানা খুব সহজভাবে সমস্যাকে তুলে ধরতেন। নিচে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' পুস্তিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তৎকালীন সময়ে দেশের সমস্যাকে মওলানা দেখেছিলেন এভাবেঃ 'বিশ্বের সর্বত্র আলজিরিয়া হইতে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ জেল, ফাঁসি ও স্বৈরাচারীদের গুলী বুক পাতিয়া নিয়া শহীদ হইতেছেন।

'স্বাধীনতা ছাড়া যেমন গণতন্ত্র সম্ভব নয় তেমনি গণতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। গণতন্ত্র মানুষের হৃদপিণ্ড, এই হৃদপিণ্ড ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। যেমন পানি ছাড়া মাছ বাঁচিতে পারে না।

'পাকিস্তানের আজ গণতন্ত্র পদদলিত। গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র, ব্যক্তি-তন্ত্র এবং উদ্ভব তন্ত্রসমূহ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ভুয়া তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলিতেছে। গণতন্ত্র, পূর্ণ গণতন্ত্র ব্যতীত কোন দেশ সুখী ও সমৃদ্ধ-শালী হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না।

জনগণের শাসনতন্ত্রই আমাদের কাম্য। মানুষের জন্য সরকার, সর-কারের জন্যে মানুষ নয়। দেশে সরকার অস্থায়ী কিন্তু মানুষ স্থায়ী। মানুষের প্রয়োজনেই দেশের শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া থাকে। অতএব সে শাসনতন্ত্র দেশের জনসাধারণের দ্বারা রচিত হইতে হইবে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচিত প্রতি-নিধিদেরই শাসনতন্ত্র রচনা করিবার অধিকার। একমাত্র গণভোটের মাধ্যমেই শাসনতন্ত্র জনগণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব বেশীদিন

www.pathagar.com

টিকিয়া থাকিতে পারে না। পারিবে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পরিষ্কার ভাষায় আমি জানাইয়া দিতে চাই যে, ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে যে ধরনের গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র দেওয়া হইয়াছে স্বাধীন পাকিস্তানের জনসাধারণ সেই গণতন্ত্র বা শাসনতন্ত্র চাহে না। স্বাধীন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার নিয়া ছিনিমিনি খেলা আমার দেশের জনসাধারণ আর বেশীদিন সহ্য করিবে না। তাহাদের অধিকারের জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে তীব্র সংগ্রাম করিয়া যাইবে এবং এর জন্য যে কোন ত্যাগ বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।'

রাজনৈতিক বিবৃতি হিসেবে খুবই সাদামাটা। তত্ত্বের জটিলতা নেই, নেই দুর্বোধ্য শব্দের কারুকাজ। কিন্তু আছে প্রভাব। পুরো পুস্তিকাটি যিনি পড়বেন তার পক্ষে ফিরে যাওয়া মুশকিল হবে। সেই সঙ্গে আসবে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মওলানা এমন সব শব্দ আমদানী করেছিলেন যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। জীবনের শেষ লগ্নে তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত 'হক কথা' তার প্রমাণ। রাজনীতিকে জনগণের জন্যে প্রকাশ করার এই শৈল্পিক দক্ষতার জন্যেই 'হক কথা' এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমনি, ধর্মকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও তেমনি দক্ষ শিল্পী ছিলেন মওলানা ভাসানী ধর্মকে তিনি রাজনীতিতে এনেছেন, কিন্তু ধর্মান্ধতাকে বাদ দিয়ে লড়াই করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। মওলানার কাছে ধর্ম ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হাতিয়ার, প্রগতির বাহন। তাই 'পালনবাদ কি ও কেন?' পুস্তিকায় তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছে ঃ

'সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে স্রষ্টা যেমন লালন পালন করেন তেমনি তিনি লালন পালন করেন সৃষ্টির অভিজাত মানুষকেও। মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে সৃষ্টির প্রতিভূ হিসাবে। তাই মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবন যাপনেও হইবে পালনবাদের অনুসারী। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রতিভূ হিসাবে মানুষ পালনবাদের নীতিকে প্রবর্তন করিবে—শাসনবাদকে করিবে পরিহার। একটি পরিবারে পিতা যেমন সন্তান-সন্ততিদের অভাব অনটন অনুযায়ী সব কিছুর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন,

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে পিতা এবং সন্তানদের ভিতর প্রেম-প্রীতির যে মধুর সম্পর্ক বিরাজমান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা মানুষের জীবনকে ঘিরিয়া থাকিবে। শাসন করিয়া অন্যকে আদেশ প্রতিপালন করানো যাইতে পারে কিন্তু তার ফল খুব শুভ হয় না। আন্তরিকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাহ্যিক চাপ শুধু সমস্যারই সৃষ্টি করে। শাসনবাদে যে কর্তৃত্বের অহমিকা রহিয়াছে তাহা মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিতর ফাটল সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাসিত শাসককে দেখে সন্দেহের চোখে, সুযোগ পাইলেই শাসনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে।'

ধর্মের এই ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন বলেই সাধারণ মানুষ তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে নি। আসলে এ সবই হচ্ছে এই জনপদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা।

সবশেষে মওলানার একটি লেখা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। এ লেখায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চরিত্রের দ্বন্দ্ব।

'নিজের সম্পর্কে লিখিতে গিয়া শুনিয়াছি মহাপুরুষরা প্রথমত বিনয় প্রকাশ করেন, মানুষের কাছে নিজেকে জাহির করিবার জন্য তাহাদের কীর্তি যথেষ্ট নয়। আমি মহাপুরুষ নই। আর তাই কীর্তি সম্পর্কে কখনও মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা লইয়া পদে পদে চিন্তা করি। আজ আমার জিন্দেগী সম্পর্কে দুইটি কথা লিখিতে গিয়া মোটেই বিনীত হইতে পারিতেছি না। কারণ আমি জানি, আমার অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক এবং মূল্যবান জীবনে যদি কিছুই না করিয়া থাকি তবু একটি দাবী জোরশোরে করিতে পারি—আমি মানুষকে দেখিয়াছি; যে মানুষ কাঁদিতেছে, সেই আবার বিদ্রোহ করিতেছে। আমি দেখিয়াছি যে, মানুষ নীচতলার আঁধারে পচিতেছে, তাহারাই বুলেটের মুখে আত্মাহুতি দিতেছে। তাই আমার জিন্দেগী—যদি বা আমার নাই কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখের সাক্ষী হিসাবে আলোচ্য বিষয় বৈকি।

'ছোটবেলা হইতেই আমার মনে দাগ কাটিয়াছিল সমাজের তথা-কথিত খানদানিপনা। জমির পরিমাণে মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ করাটা আমি মোটেই বরদাশত করিতে পারতাম না। জমিদার মহাজনদের

www.pathagar.com

সুপরিকল্পিত শোষণের পরিচয় যেদিন পাইয়াছিলাম সেই দিনই মনে চাহিয়াছিল, গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে দুমড়াইয়া নতুন কিছুর পত্তন করি। তাই আসামের জলেশ্বরে জীবন শিক্ষার হাতেখড়ি সুফি সাধক শাহ নাসিরুদ্দিন বোগদাদীর নিকট পাইলেও যুগের আকর্ষণে যোগ দিয়াছি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগে। শিখিবার জন্য, নিজেকে চিন্তায় ও কর্মে বলিষ্ঠ করিবার জন্য, অনুসন্ধিৎসু মনে সঙ্গ লইয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা মুহম্মদ আলী, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মওলানা আজাদ সোবহানী এবং মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর মত ব্যক্তিবর্গের। ঘটনাপ্রবাহ আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গ আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা হইল গড়িতে হইলে আগে ভাঙ্গিতে হয়। মানুষের মুক্তি আপোষরফায় আসে না, সুদূরপ্রসারী কর্মসূচীভিত্তিক বিপ্লবই এর একমাত্র পাথেয়।

'কারাগারে আমার জীবনের অনেক কয়টি দিন কাটিয়াছে। আমি কিন্তু সেই দিনগুলিকে অযথা যাইতে দিই নাই। পাঁচমিশালী চরিত্রের মানুষগুলিকে একত্রে পাইয়া দিনে দিনে অনেক শিখিয়াছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কবিতাটি আজও আমার মনে পড়ে। কারাগারের এপাশে ওপাশে তিনি হাঁটিতেন আর ধীরে ধীরে বলিতেনঃ

"ওরে মন হবেই হবে যদি পণ করে থাকিস, সে পণ রবেই রবে", কথাগুলি আমাদের নিকট মামুলী ধরনেরই মনে হইত। কিন্তু জীবনের প্রবাহে উপলব্ধি করিয়াছি এই কথা কয়টি কত কঠিন, কত বলিষ্ঠ! কারাগারে যাঁহারা সময় কাটাইতে কষ্ট পান শাস্তি তাঁহাদের সত্যিই হইয়া যায়। তাঁহারা বাহির হইয়া আসিয়া মন বদলাইয়া অন্যায় অবিচারের সহিত আপোষ করিয়া গতানুগতিকতায় ডুবিয়া যান। আবার অনেকেই আছেন, কারাগারের দিনগুলিকে সম্বল করিয়া আগামী জীবনের স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নে থাকে ত্যাগের শপথ, সাধনার অভিব্যক্তি। কারাগারে তত্ত্বগত দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়া মনকে স্থির করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে কর্মপন্থা যাচাই করিয়া শুভ-অশুভের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায়। এইগুলি করিতে পারিলে রক্তিম রোদে জীবন ভরিয়া উঠিবার খুবই সম্ভাবনা। অবশ্য এইজন্য দরকার জেল জীবনে উন্নততর জাতের সঙ্গী পাওয়া অথবা নিরলস পড়াশুনা করা। ছেলেপুলে

www.pathagar.com

কারাগারে গেলে মায়েরা কিন্তু ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তাহা খুবই স্বাভাবিক। আমার আজও মনে পড়ে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের সামনে এক মায়ের আর্তি। সে ১৯৪৮ সালের কথা। ছেলেকে কমিউনিস্ট সন্দেহে কর্তৃপক্ষ জেলে পুরিতেছিলেন। এদিকে জেলের দরজায় আছাড় খাইয়া মা তাহার ডুকরাইয়া বলিতেছিলেনঃ বাবারা, আমাকেও ধরে নিয়ে যাও। আমিও কমিউনিস্ট।

'আমি একটি সিদ্ধান্তে গোড়া হইতেই পৌঁছিয়াছিলাম। আমার রাজনৈতিক জীবনের এই ৬৮টি বৎসরে ইহার পরিবর্তন হয় নাই। তাহা হইল আন্দোলনকে গ্রামে লইয়া যাওয়া এবং প্রত্যন্ত গ্রামের স্বরূপ হইতেই রাজনৈতিক কর্মসূচী কিংবা সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা। ইহার কারণ খুব সহজ। শতকরা ৯০ ভাগের বেশী লোক গ্রামে বাস করে। তাহাদের জিন্দেগী সুস্থ না হইলে দেশ ও জাতির কল্যাণ হইতে পারে না। আরও একটি কারণ আছে বটে। শহুরে লোক লইয়া দীর্ঘ কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় না। তাহারা কয়দিন পরই ভাঙ্গিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে গ্রামের লোক কত দুঃসাহসী কত আন্তরিক কত অনুগত। এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে কি যে অসাধ্য সাধন করা যায় তাহা আমি লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। যে যাই বলুন না কেন, জমিদার মহাজনের অপ্রতিরোধ্য অবিচার, শোষণ গ্রামের লোকই মোকাবিলা করিয়াছে। তাহাদের নেতৃত্ব ও ঐক্য দান করাটাই ছিল শুধু আমাদের কাজ। আমি তাই আজীবন সম্মেলনকে ভালবাসিয়াছি। ভাসানী চরের সম্মেলন, ফুলছড়ি ঘাটের সম্মেলন, কাগমারীর সম্মেলন, সিরাজগঞ্জের সম্মেলন, কাগমারীর সম্মেলন ইত্যাদি অত্যন্ত পরোক্ষভাবে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। সুক্ষ্মভাবে যাচাই করিলে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। আর এইসব সম্মেলন করিতে যাইয়া আমি যেমন একাধারে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি আবিষ্কার করিয়াছি, ঠিক পাশাপাশি তেমনই সেই সমাজভুক্ত মানুষের সুপ্ত মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছি। সুকৌশলে এই শক্তির যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে, তখনই কলিকাতা অথবা ঢাকায় কমিশন কিংবা বোর্ড বসিয়াছে।

'আমি পারিবারিক জীবনে বিশ্বাসী। কারণ মানুষের প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বরাবরই রহিয়াছে। নিজেকে সুশৃংখল রাখিবার জন্য পারিবারিক জীবন খুব কাজে আসে। জটিল রাজনীতিতে মাথা ঘামানোর

www.pathagar.com

পর একমাত্র পারিবারিক পরিবেশেই সতেজ এবং পরিবর্তিত মুড পাওয়া যায়। উহা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয় কিংবা পাইলেও নিয়ন্ত্রিত থাকে না। আর মুডের পরিবর্তন না হইলেই আমার মনে হয় মানুষ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া পড়ে। পারিবারিক জীবনের অশুভ দিকও রহিয়াছে বটে। পরিবারের চাপেই মানুষ অতি বৈষয়িক হইয়া উঠে এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। সমাজের কথা ভুলিয়া যায়, আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী হইয়া পড়ে, এইজন্যই গোটা সমাজটাকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়িয়া তোলা দরকার যাহাতে কেহ লোভের বশবর্তী হইয়া বিপথগামী হইবে না। পরিবারের তরফ হইতে পথভ্রষ্ট করা যাইবে না। যাহোক, আমি শুধু বলিতে চাই আমাদের পারবারিক জীবনে আগ্রহ থাকা চাই, কিন্তু পরিবারকে একান্তই নিজের মনে না করিয়া ইহাকে সমাজেরও একটি অংশ ভাবা দরকার।

'জীবনে দুইটি বিষয়ের প্রতি আমি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিয়াছে। তাহা হইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল। তাই আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর, বগুড়া ও টাঙ্গাইল জেলায় আমি বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছি। আমার জীবনে শেষ আশা, সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া। আমি বুঝি না, কেন রাজনীতিবিদরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলায় আগ্রহী হন না। সবাই মনে করেন ক্ষমতায় গিয়া সব করিব। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বেই যদি কিছু করা যায় তবে তাহা সারিয়া লইতে দোষ কি? আমি মানুষের যে গুণটি সব চাইতে বেশী পছন্দ করি তাহা হইল অধ্যবসায়। পরিশ্রম করিলে অসাধ্য সাধন করা যায়, উহা সবাই বুঝে। কিন্তু আশ্চর্য তাহা কেহ করিতে চায় না। শ্রমের মর্যাদা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। ২৫/৩০ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল আজ তাহাও নাই। ক্ষুধা লইয়া যাঁহারা রাজনীতি করেন তাঁহারা ক্ষুধার্ত হইতে চাহেন না, ক্ষুধার্তের মত পরিশ্রমও করেন না। ইহাই পরিহাস!

আমার দেশের বাইরে যে দিনগুলি কাটাইয়াছি তাহা হইতে যেমন শিক্ষা লাভ করিয়াছি তেমনি লজ্জাও পাইয়াছি। ভাবিয়াছি, দুনিয়া কোন্ দিকে চলিয়াছে আর আমরা কোন্ দিকে চলিয়াছি। আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও যাঁহারা অন্যায় অবিচার দূর করিয়া সমাজকে কলুষতামুক্ত করিবার জন্য সাধ্য সাধনা করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের তুলনায়ও

www.pathagar.com

পিছাইয়া রহিয়াছি। আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্যের পরিচয় পাইলে কি লাভ হইবে, আমরা সভ্য হই নাই। মানুষ হইতে পারি নাই। যাঁহারা আজিকার পথিকৃৎ আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করি না। গোলক ধাঁ-ধায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। আমার পিকিং সফর, স্টকহলম, হাভানা, লণ্ডন, টোকিও প্রভৃতি শহরে কাটানো দিনগুলি তাই বড়ই দুঃখের। শুধু ধিক্কার জন্মিয়াছে। মনে চাহিয়াছে কোন এক অলৌকিক শক্তির বলে হইলেও সমাজটাকে ওলটপালট করিয়া দেই—মানুষের মুখে হাসি ফুটাই। আমার জীবনের বিনিময়ে যদি হাসি ফুটিত আমার জন্ম কতই না স্বার্থক হইত।'

আমার কাছে মনে হয়েছে এই-ই মওলানার আসল পরিচয়। তাঁর সম-সাময়িক রাজনীতিবিদদের মধ্যে মওলানা একমাত্র ব্যতিক্রম। তৎকালীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র মওলানাই শেষ পর্যন্ত জনগণের কথা বলেছেন। ক্ষমতার দম্ভকে পদাঘাত করেছেন। কিন্তু যে সামন্ত সমাজের তিনি সন্তান, সেই সমাজের চিন্তা ও চেতনাকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেন নি। আর এখানেই সেই দেদীপ্যমান রাজনীতির সীমাবদ্ধতা।

www.pathagar.com

মাহবুব আলমগীর

বাঙ্গালীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী

একটি নবোদ্ভূত জাতির ইতিহাসে এমন দু' একজন বিরল ব্যক্তিত্ব বিরাজ করেন, যাঁরা সকল প্রতিকূলতার মুখেও জাতিকে তাঁর উন্মেষলগ্ন থেকে লালন করে দাঁড় করিয়ে দেন দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন তাঁদেরই একজন। মওলানা ভাসানী ছিলেন বহু জনেরও একজন। ইতিহাসের অধিকাংশ ব্যক্তিত্ববান পুরুষদের দেখা গেছে প্রাসাদের গজদন্ত মিনার থেকে জনতাকে পরিচালনা করতে। জনগণকে তাঁরা দিয়েছেনও গন্তব্যের দিশা। তাঁরা হয়েছেন জনগণের আরাধ্য। কিন্তু হতে পারেন নি আপনজন, নিত্যদিনের চেনা। এই অসম্পূর্ণতাকে তাদের বহন করতে হয়েছে সাফল্যের মুকুট পরেও। এসব পুরুষের সাথে মওলানা ভাসানীর প্রভেদ এখানেই। তিনি ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত আপামর নিপীড়িত জনগণের আপনজন। প্রত্যেকেরই আত্মার আত্মীয়। তিনি যেমন উঠে এসেছেন গ্রাম-বাংলার চিরন্তন প্রেক্ষাপট থেকে, তেমনি তিনি নিখাদ আন্তরিকতায় সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁর সাথে। তিনি যখন হেঁটে যেতেন মিছিলের পুরোভাগে সংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্তে, শাসকগোষ্ঠীর সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে যখন তিনি উচ্চারণ করতেন গণমানুষের অব্যক্ত কথা, যখন তিনি শাসকগোষ্ঠীকে জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠতেন, 'খামোশ', তখনও তাঁকে মনে হতো পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে কূলে জীবন সংগ্রামরত কালজয়ী কৃষকদেরই একজন সন্তান।

বাংলার আবহমান কালের কৃষকের সংগ্রামই হলো এদেশের জনগণের সংগ্রাম। কৃষকরাই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন অংশ। কৃষক শ্রেণী যুগ যুগ ধরে দেশীয় ও বিদেশীয় শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। এই কৃষক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে মওলানা ভাসানী ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে।

www.pathagar.com

সংগ্রামী কৃষক শ্রেণীর ওপর সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চলছে শতাব্দীব্যাপী। সমান্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ—এ দুটো শক্তির আরোপিত জোয়াল কাঁধে নিয়ে তাদের চলতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে। দেশীয় সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যখনই কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী জনগোষ্ঠী এসেছে নিপীড়কের সহায়ক শক্তি হিসেবে। এ দেশে সামন্ত শ্রেণীর ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ইমারত। অন্যদিকে সামন্ত শ্রেণীকে তার অস্তিত্বের জন্যেই আবার নির্ভর করতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ওপর। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং কৃষক তথা জনগণের ওপর শোষণ শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে তাদের যৌথ ব্যবস্থার চেহারাটা স্পষ্ট হতে সময় লেগেছে। কৃষক শ্রেণীর দুর্বার সংগ্রামের মুখে স্পষ্ট হয়েছে এদের চেহারা—ধরা পড়েছে এদের মধ্যকার গাঁটছড়া। শত্রুকে চিহ্নিত করা গেছে। কোণঠাসা করা গেছে; কৃষকের জমির সংগ্রাম, ফসলের সংগ্রাম, জোতদারী মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং তা এক ও অবিভাজ্য সংগ্রাম। শোষণ মুক্তির পথে এ দুই আপাতঅটল অচলায়তন। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে অপসারণ করতে হলে কৃষক শ্রেণীকে পরিচালিত করতে হয় দীর্ঘ সংগ্রাম। আজকের যুগে আমাদের মত দেশে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদের ওপর ভিত্তি করেই টিকে থাকে। কৃষক শ্রেণীর নিত্যদিনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রয়েছে সামন্তবাদ উচ্ছেদের মধ্যে। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ তার বিদেশী দোসর তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কৃষকের সংগ্রাম হলো জাতীয় সংগ্রাম। কারণ জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করতে হলে দেশের মাটি থেকে প্রয়োজন এই দুই শক্তির উৎসাদন।

মওলানা ভাসানী এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই। দেশ, জাতি ও জনগণের মুক্তি সূর্য ছিনিয়ে আনার দায়িত্ব পালনে কৃষক শ্রেণীকে পালন করতে হয় মূল দায়িত্ব। মওলানা ভাসানী সেই কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যৌবনের প্রথম দিনগুলো থেকে। বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটটা স্মরণ করা যেতে পারে। একদিকে চলছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন এবং সামাজিকভাবে চলছে ভূস্বামীদের সীমাহীন শোষণ। মওলানা ভাসানী জমিদারদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

নিপীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করতে লাগলেন। তিনি সন্তোষকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর কর্মস্থল হিসাবে।

পরবর্তী পর্যায়ে উপমহাদেশীয় রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রেণীর সঠিক রণনীতি গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে এবং কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগের উপরের কাতারের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী নেতৃত্ব আপোষের ফলে স্ববিরোধিতা নিয়ে জন্ম নিলো দু'টি দেশ পাকিস্তান এবং ভারত। মওলানা ভাসানী পাকিস্তান রাষ্ট্রটির স্ববিরোধিতা এবং নেতৃত্বের আপোষকামিতা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের পতাকা বিদায় নিলেও নতুন রাষ্ট্র-টির দেশীয় শাসকদের পুরনো মুনিবরাই বেঁধে রেখেছিল সহস্র জালে। ফলে বাঞ্ছিত ভাগ্য পরিবর্তন ঘটলো না, ঘটলো শাসকের পরিবর্তন। দেশ, জাতি ও জনতার মুক্তির প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদই রইলো মূল শত্রু রূপে।

নতুন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা সামন্ত মৎসুদ্দিদের হাতে থাকায় দেশের সামন্ত সমাজ কাঠামোর গায়ে আঁচড় পড়ে নি। জনগণের সাথে সামন্ত-বাদের দ্বন্দ্ব প্রতিদিন বাড়তে লাগলো। এ দুই শক্তি যে আসলে এক অবিভাজ্য শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগলো রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটের পরবর্তী ঘটনাবলীতে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে এবং সমাজ-তান্ত্রিক বিশ্বের বিস্ময়কর অগ্রগতির লগ্নে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা পোশাকী গণতন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়। মুসলিম লীগের বিশ্বাসঘাতকতা ছিলো এই শ্রেণীগত বর্থতার কারণেই।

মওলানা ভাসানী তাই পাকিস্তানের মুসলিম লীগ শাসনের শুরুতেই জনগণের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হলেন। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে, জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারের দাবীতে ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সেই জোয়ারের মুখেও রুখে দাঁড়ালেন। পাকিস্তানী শাসকরা মওলানা ভাসানীকে সহ্য করতে পারছিল না। ১৯৫০ সালের খাদ্য সংকটের মুখে তিনি পাকিস্তানী শাসকদের অপ-শাসনের ফলশ্রুতি খাদ্য সংকটের প্রতিবাদে ভুখা মিছিল পরিচালনা করলেন, গ্রেফতার হলেন তিনি। জেলখানায় বসে থাকলেন না। অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। মুসলিম লীগ সরকার মুখের ভাষাটাও কেড়ে

www.pathagar.com

নেয়ার চক্রান্ত করছিলো। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। তার ফলশ্রুতি বাঙ্গালী জনগণের ধূমায়িত বিক্ষোভের বিস্ফোরণ '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। মওলানা ভাসানী এই আন্দোলনের ছিলেন একজন প্রধান সংগঠক।

তাঁকে আবার যেতে হলো কারাগারে। প্রকৃতপক্ষে '৪৭ সাল থেকে দেশের প্রতিটি ঘটনাই ঘটতে থাকলো সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে। দেশীয় শাসক-গোষ্ঠী বিদেশী মুনিবদের আদেশ পালন করতে লাগলো পরম আনুগত্যের সাথে। রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে তখন বিদেশী মুনিবের পরিবর্তন ঘটছিলো। বৃটিশের জায়গায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন দেশের শাসকদের কুক্ষিগত করে ফেলেছে। দেশের জণগণের সামনে মুসলিম লীগ তখন চরমভাবে ঘৃণিত।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবির মধ্যে বাঙ্গালী জন-গণের গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হলো।

নির্বাচনে জনগণের যে রায় নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো, সেই রায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুনতে পেলো নিজেদের মরণ ঘন্টা। পাকিস্তানের তদানীন্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তো বেসামাল উক্তি করে বসলেন! কিছুদিন পরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে ৯২ (ক) ধারা জারি করে বাতিল করা হলো যুক্তফ্রন্ট সরকার।

তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীদের চেহারা উলঙ্গ হয়ে পড়ে ১৯৫৬ সালে। কেন্দ্রে তখন মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সরকার। বাঙ্গালী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সপক্ষে পার্টির সুস্পষ্ট বক্তব্যকে বিরোধিতা করে বসলেন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রধান মন্ত্রী। ক্ষমতার লোভে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মেলালেন তিনি। ফলে মওলানা ভাসানীকে এবার দাঁড়াতে হলো নিজের হাতে গড়া পার্টির অভ্যন্তরের সাম্রাজ্যবাদের পদলেহীদের বিরুদ্ধে। বিভক্ত হলো পার্টি। মওলানা ন্যাপ গঠন করলেন।

পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনের কব্জা দৃঢ় হবার ইতিহাস। কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু দেশীয় শাসকশ্রেণীর যেমন পরিবর্তন ঘটে নি তেমনি পরিবর্তন হয় নি

www.pathagar.com

বিদেশী মুনিবের। বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, গণতন্ত্রের দাবী অপূর্ণ রইলো। আইয়ুবী সামরিক শাসনের মুখে সকল দাবীই প্রত্যাখ্যাত হতে লাগলো। কিন্তু জনগণের দাবীকে চিরকালই দাবিয়ে রাখা যায় না। আইয়ুবী দুঃশাসনে জনগণের সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে গেলেও সঠিক সময়েই মওলানা ভাসানী ডাক দিলেন গণআন্দোলনের। এক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করলেন তিনি। পতন ঘটলো 'লৌহমানব' আইয়ুবের। সেই গণঅভ্যুত্থানের অগ্নিক্ষরা প্রতিটি মুহূর্তের পেছনে ছিলো তাঁর অবদান। সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনকে মেনে নিয়ে যখন অন্য গণতন্ত্রীরা পশ্চাদপসরণ করেছে, তখন মওলানা এসে দাঁড়ালেন আবার জনতার সামনে। '৬৯-এর ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে সূচনা করলেন এমন এক গণআন্দোলনর উত্তাল তরঙ্গ যা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়লো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। এশিয়ার অবিস্মরণীয় নেতার পেছনে জনতার জমায়েত দেখে শাসকশ্রেণী ও বিদেশী প্রভু পিছু হটলো।

কিন্তু চক্রান্ত চলতে লাগলো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনতার অর্জিত সাফল্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে পুনরায় নিজেদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার। '৬৯-এর পর থেকে দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশী শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র আরো জটিল হতে লাগলো।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের গণতন্ত্রের অন্তর্বস্তু থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটি বিচ্ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে তার রিজার্ভ বাহিনী মাঠে নেমে পড়লো। দেশে বয়ে যেতে লাগলো উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ার। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের অধিকারের প্রশ্নটি পাশ কাটিয়ে এক শ্রেণীর রাজনীতিকরা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করে চললেন। তাঁদের এই জাতীয়তাবাদ যে দেশভিত্তিক ছিলো না তা স্পষ্ট হতে সময় লেগেছে। তখনকার সত্যিকারের বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এক ভয়াবহ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে লাগলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব তখন সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত। মওলানা ভাসানী সেই চরম জাতীয় দুর্দিনের সময় একাই লড়ে গেছেন একদিকে পাকিস্তানী শাসকদের জুলুমের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। শেষোক্ত শ্রেণীর তৎপরতার পরিণাম সম্পর্কে তখনই তিনি

www.pathagar.com

সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হতে দেখা গেলো '৭১ সালে মার্চের ঘটনাবলীর পর সমগ্র জাতিকে পরিত্যাগ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সম্প্রসারণবাদী ভারতের আশ্রয় নেয়ার ঘটনায়। তিনি তখন পরিপ্রেক্ষিতের হাতে বন্দী। মওলানা ভাসানী এই পরিণতির কথা বহু আগে থাকতেই বারংবার বলে আসছিলেন। '৬৯-এর আন্দোলনই সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও স্বৈরাচারী সরকারকে উচ্ছেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নেতৃত্বে দিতে সক্ষম একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী। তাঁর এই অমোঘ বাণীর প্রতিটি বর্ণ সত্যে পরিণত হলো সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নেতৃত্বে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে। বাংলাদেশে কায়েম হলো তাদের পুতুল সরকার। দেশ-প্রেমিক বাঙ্গালী সৈনিক ও মুক্তি বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে তারা রুশ-ভারতের বেদীমূলে নিবেদন করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো।

মওলানা ভাসানী এই পরভৃত শাসনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকেই। বহু রক্তক্ষয়ের পরও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের মৌল প্রশ্নগুলোর সমাধান না হওয়ার পরিবর্তে নতুন করে বাঁধা পড়লো বাঙ্গালীর ভাগ্য। পাকিস্তানের প্রায় তিনি দশকের শাসনে ও শোষণে যতটুকু ক্ষতি হয় নি তার চেয়েও বহু গুণে ক্ষতি হলো বাঙ্গালী জাতির।

দেশব্যাপী তখন বইছে প্রবল প্রতিবিপ্লবী জোয়ার। গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলো তখন বিভক্ত, পথভ্রষ্ট, অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। রুশ-ভারতের পুতুল আওয়ামী লীগ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে প্রগতিশীলদের হত্যা করে চলেছে। তাদের আশ্রিতরা চোরাচালানোর মাধ্যমে দেশ থেকে ভারতে পাচার করছে জাতীয় সম্পদ। মানুষের বেঁচে থাকার সামান্য ব্যবস্থাটুকুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ক্ষমতান্ধ শাসকশ্রেণী বিদেশী শাসক-দের পদলেহন করে চলেছে। এমন এক জাতীয় সংকটের মুখে মওলানা ভাসানী এগিয়ে এলেন। ১৯৭৪-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখে তিনি অনশন ধর্মঘট করলেন। তাঁর এই অনশন ছিলো সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদপুষ্ট আওয়ামী লীগের অপশাসনের কবলে নিপীড়িত জনগণের সপক্ষে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে গঠিত হলো সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি। কিন্তু সংগ্রামের শুরুতেই শাসকগোষ্ঠী তাঁকে

www.pathagar.com

অন্তরীণ করে এবং অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতার করে রাখলো। কিন্তু জনতার বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে লাগলো। এরই এক পর্যায়ে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট মুজিবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটলো।

এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারলো না রুশ-ভারত। ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশায় তারা নতুন করে শুরু করলো ষড়যন্ত্র। গঙ্গার পানির গতি পরিবর্তন করে আমাদের বঞ্চিত করলো ন্যায্য পাওনা থেকে। সীমান্তে শুরু করলো গোলযোগ। দেশ থেকে পলাতক বাকশালী দুস্কৃতকারীদের ট্রেনিং দিয়ে নাশকতামূলক কাজ করার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে শুরু করলো। সীমান্তে চলতে লাগলো ক্রমাগত হামলা। বস্তুত তারা বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীন অস্তিত্বকে গলা টিপে মারার জন্যে সকল পথেই চালালো হামলা। একদিকে ফারাক্কার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপরে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া করে কাবু করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে সীমান্ত হামলার মাধ্যমে সরাসরি সামরিক হুমকি দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে নতজানু করার প্রয়াস চলতে লাগলো।

এবারও বসে থাকলেন না আজন্ম বিপ্লবী। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী শতাব্দী-প্রবীণ মওলানা ভাসানী জীবনসায়াহ্নে এসে জনগণের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করলেন এক অনন্য ইতিহাস। রুশ-ভারতের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য তিনি ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চের আহ্বান জানালেন। রুগ্ন শরীরেই তিনি লক্ষ জনতাকে নিয়ে ফারাক্কা লং মার্চের নেতৃত্ব দিলেন। সমগ্র বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখলো বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামকে। স্বাধীনতাকামী জাতি যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক নেতৃত্বের পরিচালনায় অর্জন করতে পারে অভীষ্ট লক্ষ্য। মওলানা ভাসানী জাতিকে সেই নেতৃত্বই দিয়ে গেছেন তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত।

মওলানা ভাসানীর ৭০ বছরের সংগ্রামমুখর রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা হলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠাবান থেকেই জাতি তার সামনের যে কোন চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

মেসবাহ কামাল

মওলানা ভাসানী ঃ একটি মূল্যায়ন

মওলানা ভাসানী বেঁচেছিলেন প্রায় শতাব্দীকাল, এবং এই দীর্ঘ জীবনের তিন-চতুর্থাংশ সময় তিনি ছিলেন রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সবগুলো পর্যায়েই তিনি বরাবর দাঁড়িয়েছেন জনগণের সপক্ষে, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে থেকেছেন উচ্চকণ্ঠে সোচ্চার। বিশাল রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বহুভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছেন, কোন কোন মহল থেকে হয়েছেন সমালোচিত, বিভিন্ন সময়ে পরিণত হয়েছেন বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে। এত বিরাট পরিধির একটি রাজনৈতিক জীবনকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে আলোচনা করা সম্ভবপর নয় বিধায় আমি ভাসানীর জীবনের সাথে সম্পর্কিত কেবল নির্দিষ্ট একটি প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করবো।

মওলানা ভাসানীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূষণে ভূষিত করেছে বিভিন্ন মহল। যেমন—কখনো তাঁকে বলা হয়েছে ধ্বংসপরায়ণ মওলানা, পাকিস্তানের শত্রু অথবা ভারতের দালাল। কখনো তিনি নামাঙ্কিত হয়েছেন লুংগীসর্বস্ব মওলানা নামে। কখনো তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে আইয়ুবের দালাল হিসেবে ; কখনো আবার কম্যুনিস্টবিরোধী হিসেবে। কখনো চীন-মার্কিনের দালাল, কখনো সাম্প্রদায়িক। আবরা কখনো বা জিন্নার দালাল হিসেবে। কিন্তু আসলে মওলানা ভাসানী কি ছিলেন? কার দালাল ছিলেন তিনি? বিষয়গুলো একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

মওলানা ভাসানীকে 'ধ্বংসপরায়ণ হিসেবে' চিহ্নিত করা প্রথম শুরু হয় আসামে যখন 'বাঙ্গালী খেদাও আন্দোলন' ও 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণআন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, ভাসানীকে ঐভাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগটি কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেয়া হয় নি বরং নেয়া হয়েছিল তৎকালে ভাসানীর

www.pathagar.com

নিজ দল মুসলিম লীগেরই একটি অংশ থেকে। বাঙ্গালী খেদাও ও লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মওলানা ভাসানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির আসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন. আর মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারী পার্টির প্রধান ছিলেন স্যার সাদুল্লাহ্ যিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে অভিষিক্ত হন পাঁচ পাঁচবার। আসাম রাজনীতির সময়কালে মওলানা ভাসানী সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙ্গালীদের স্বার্থের সপক্ষে অত্যন্ত একরোখা ও জোরদার ভূমিকা রাখেন এবং এই একনিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে যেয়ে তাঁকে অনেক সময় এমন কি স্বীয় সংগঠন মুসলিম লীগেরই বিরোধিতা করতে হয়। স্যার সাদুল্লাহ্ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন একজন আসামীয় এবং বাংলা থেকে জমিদার-জোতদারদের নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে যে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী আসামে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে, হাজারো হিংস্র জন্তুর আক্রমণকে মুকাবিলা করে বাঁচার জন্য একটুখানি আশ্রয় গড়ে তুলেছিলেন তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তিনি তেমন সচেষ্ট ছিলেন না। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর ও কংগ্রেসের সাথে আপোষহীন মধ্যপন্থী রাজনীতির লাইনও অনেকখানি দায়ী। যা-ই হোক ফলটা দাঁড়ায় এই যে, আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা যখন মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ কেবল নয় বরং আসামে মুসলিম লীগের শক্তির প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে সেই অবস্থাতেও যখন সাদুল্লাহ্র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতায় গেছে তখনও বাঙ্গালীদের স্বার্থ-রক্ষায় তেমন খুব একটা কিছু করা হয় নি। ফলে বাঙালী স্বার্থের ধারক হিসেবে মওলানাকে স্বাভাবিকভাবেই তার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়েছে এবং এক জনসভায় তিনি এই মর্মে বক্তব্য রাখেন, 'কংগ্রেসের বর-দুলাই-এর সাথে স্যার সাদুল্লার পার্থক্য হচ্ছে শুধু টুপীর—একজন টুপী পরেন আর একজন পরেন না।' মওলানার এসব কথা এবং বিভিন্ন আন্দো-লনমুখী ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় এসে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে বিপদে ফেলে। কাজেই তারা তখন উচ্চকিত হন ভাসানীকে 'অগঠনমূলক' 'ধ্বংসপরায়ণ' প্রভৃতি অভিধায় অভিষিক্ত করতে। তাঁদের এই ভূমিকার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় স্বয়ং সাদুল্লাহ্র কণ্ঠে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাদুল্লাহ্ আসামেই থেকে যেতে মনস্থ করেন। মুসলিম লীগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়েও তিনি কেন পাকিস্তান যাচ্ছেন না এই মর্মে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন—"One Bhasani is sufficient

www.pathagar.com

to destroy three Pakistan," অর্থাৎ একজন ভাসানীই তিনটি পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।'

মওলানা সম্পর্কে ঐ একই অভিযোগ পুনরায় উচ্চারিত হয় '৬৯-'৭০ সালে। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে, পাকিস্তানের ২২ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ যখন প্রথমবারের মত একযোগে পথে নেমেছেন তখন মওলানা ভাসানী ঐ আন্দোলনকে কেবলমাত্র কতিপয় গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে স্বীয় দর্শন অনুযায়ী জালেম ও মজলুমের মধ্যেকার একটি সংঘাত আকারে রূপ দিতে সচেষ্ট হন; এতে তিনি সফলও হন, আন্দোলন শহরের পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর নির্দেশিত 'ঘেরাও' পদ্ধতির ব্যবহার শীঘ্রই সর্বত্র শুরু হয়। গ্রাম-গঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষের একটি অংশ স্ব স্ব ক্ষমতাবলয়ে অধিষ্ঠিত শোষণকারী শ্রেণীসমূহ বা তার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও সক্রিয় হন। চেয়ারম্যান, মেম্বার, জোতদার, মহাজন, টাউট, ফাড়িয়া গরুচোর বা তাদের সহযোগী পুলিশদের বিরুদ্ধেও কোথাও কোথাও ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়ে যায়। অনেক জায়গায় গণআদালত গঠিত হয় এবং তার বিচারে অনেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পর্যন্ত করা হয়। শহরে শ্রমিকদের পাশাপাশি নিম্ন ও মধ্য আয়ের পেশাজীবীরাও তাদের দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা দাবীসমূহ আদায় করে নিতে সক্রিয় হন; ঘেরাও আন্দোলন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। গণজাগরণের ঐ দৃশ্য ক্ষমতায় আসীন ও ক্ষমা-বহির্ভূত স্থিতাবস্থার পক্ষেকার সকল শক্তিকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলে এবং তাদের থেকে শুরু হয়ে যায় শান্তির অন্বেষা। সরকারের সুরের সাথে সুর মিলায় আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলাম, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ। এইচ. এম. ইস্পাহানী ও ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স যখন শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর তখন মওলানা ভাসানী আন্দোলনকে দেশের সমস্ত কর্নার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। ফলটা দাঁড়ায় এই যে, ভাসানীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজকর্মে উস্কানী তথা ধ্বংস-পরায়ণতার অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। বস্তুত গণজাগরণের উত্তাল তরঙ্গ ও তার শক্তির সম্ভাবনাকে আঁচ করে ভীত হয়ে পড়া স্থিতাবস্থার পক্ষে-কার শক্তিই তাদের শ্রেণীস্বার্থে ভাসানীর উপর ঐ সমস্ত অভিযোগ আনতে থাকে এবং আমরা জানি যে, এক পর্যায়ে পাঞ্জাবের শাহীওয়ালে জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামের গুণ্ডারা ভাসানীর জীবন নাশের জন্য তাঁর উপর আক্রমণ পর্যন্ত চালায়।

আইয়ুব খানের পতন ও সামরিক শাসন জারীর মধ্যে দিয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সমাপ্ত হয়। কিন্তু ততদিন পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা ছাত্র-যুবকসহ সমাজের ব্যাপক অংশে ছড়িয়ে গেছে। উনসত্তর ও সত্তরে সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে ভাসানী একের পর এক কৃষক সম্মেলন আয়োজন করতে থাকেন দেশের বিভিন্ন জায়গায়। এসব সম্মেলন ও জামায়াতে ভাসানী হিংসার সপক্ষে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন। এ ব্যাপারে ভাসানীর বক্তব্য ছিল যে, তিনি তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ আট বছর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করে দেখেছেন যে, তাতে জনগণের কোন লাভ হয় নি তাই মজলুমকে দেখনো দরকার তার স্বার্থে যথার্থ সংঘর্ষের পথ। এখানে আমাদের আরও একটা বিষয় স্মরণ রাখা দরকার, মওলানা যখন সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে কৃষক সম্মেলন করছেন, তখন ঐ সমস্ত সভাতে শ্লোগান উঠছে, 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, পূর্ববাংলা স্বাধীন কর।' ভাসানী নিজে তখনো এই শ্লোগান দেন নি, তবে তাঁর সভাতে মুহর্মুহ এই শ্লোগান উচ্চারণের বিরোধিতাও করেন নি। বস্তুত এর পিছনে তার পরোক্ষ সমর্থন ছিল। আর, এর কিছুদিন পরই নভেম্বরের ভয়াবহ সাইক্লোনে দুর্গত এলাকাসমূহ ঘুরে এসে তিনি ঘোষণা দেন 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান'-এর। বস্তুত ভাসানী সে সময় তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে সমস্ত সংকটের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হবার বিষয়টি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর আশা ছিল যে, এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে হয়তো জনগণের পক্ষেকার শক্তি বিকশিত হয়ে উঠবে এবং পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসতে পারবে। জালেমের শোষণমুক্ত এক সুখী সুন্দর স্বাধীন পূর্ববঙ্গের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই ব্যাপক কৃষক জনতাকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তিনি তখন এত বেশী বেশী করে হিংসার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। বস্তুত তিনি যেন একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে বলছিলেন এবং তাঁর এই দিকনির্দেশ যে সঠিক ছিল তা পরবর্তীকালের ইতিহাসই প্রমাণ করে দিয়েছে।

মওলানা ভাসানীকে একাধিকবার চিহ্নিত করা হয়েছে ভারতের দালাল হিসেবে। এই উদ্যোগ প্রথমবার নেয়া হয় ১৯৫৪ সালে। নির্বাচনে

www.pathagar.com

যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের ভরাডুবিতে লাঞ্ছিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অনধিক এক মাসের মধ্যেই ৯২ (ক) ধারা জারী করে প্রদেশে গভর্নরের শাসন চালু করে। মওলানা ভাসানী তখন বিশ্বশান্তি পরিষদের তৎকালীন সভাপতি বৈজ্ঞানিক জেকলিও কুরী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বার্লিনে অনুষ্ঠিত শান্তি পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে যোগাদানের জন্য ইউরোপ গেছেন। এদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে, ভাসানী পাকিস্তানে ফেরা মাত্রই এয়ারপোর্টে তাঁকে হাবিলদার দিয়ে গুলী করে মারা হবে। ফলে স্বভাবতই দেশে ফিরতে তাঁকে দেরী করতে হলো। ইউরোপে কয়েক মাস অবস্থান করার পর মওলানা কলকাতায় এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় মুসলিম লীগের তরফ থেকে প্রথম তাঁকে ভারতের চর হিসেবে প্রচার করা শুরু হলো—অবশ্য এ প্রচার সে সময় তেমন একটা জোর পায় নি।

দ্বিতীয়বার এ প্রচারটি আসে তাঁর নিজ দলের একাংশের পক্ষ থেকেই এবং এর পিছনেও কি কারণ কাজ করেছিল তা সুস্পষ্ট। আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সোহারাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। আওয়ামী লীগে বৈদেশিক নীতি তখনও স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে প্রকাণ্ড মতপার্থক্য বিরাজ করছে। সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ তখন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসাধনকারী প্রতিষ্ঠান SEATO-CENTO-তে যোগদানের পক্ষে প্রকাশ্যে দালালী করছেন, অন্যদিকে মওলানা ভাসানী এবং অপরাপর বামপন্থী নেতৃবর্গ এর বিরোধিতা করে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির সপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তখন ভাসানী ও তাঁর মন্ত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে যে, বাঙ্গালীসহ পাকিস্তানের সকল জাতিসত্তাকে পূর্ণ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে, অথচ সোহরাওয়ার্দী তখন ক্ষমতায় থেকে ঘোষণা করছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়ে গেছে। সোহরাওয়ার্দীর ঐ উক্তিকে সমালোচনা করে ভাসানী বলেন যে, ঐ কথা বলে সোহরাওয়ার্দী বাঙালী জাতিকে উপহাস করেছেন এবং কাগমারী সম্মেলনে তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করেন যে, পূর্ববঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বাঙ্গালীরা পশ্চিম

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবে। তাঁর এসব ভূমিকা নিঃসন্দেহে মার্কিনের দোসর ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের তখনকার প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে অসুবিধায় ফেলে দেয়। ফলে তারা তখন ভাসানীবিরোধী প্রচারে মেতে ওঠে, ভাসানীকে নামাঙ্কিত করা হয় 'পাকিস্তানের সংহতির শত্রু' ও 'ভারতের চর' হিসেবে। কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে যে সমস্ত ব্যক্তি বিশিষ্ট ভূমিকা রেখে-ছিলেন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁদের নামে নামে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করেছিলেন। অন্যান্যের পাশাপাশি তোরণ নির্মিত হয়েছিল বিধান রায়, দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মহাত্মা গান্ধীর নামে। এটাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের ঐ অংশটি আরও সোচ্চার হলেন 'ভারতের চর' হিসেবে ভাসানীকে কলঙ্কিত করতে। অথচ এঁরাই আবার ৬৬-তে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে উচ্চকিত হয়েছিলেন, '৭১-এ সবার আগে যেয়ে ভারতের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন এবং বৈদেশিক নীতির বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে একটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এই নতুন পার্টির লক্ষ্য নির্ধারিত হয় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে বিরোধিতা এবং পাকিস্তানের সকল জাতিসত্তার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা। নতুন পার্টি করার এই উদ্যোগকে সমর্থন করেন কম্যুনিস্টরা। ভাসানীর এই উদ্যোগে ক্ষিপ্ত সোহরাওয়ার্দী সেদিন ভাসানীকে বক্রোক্তি করেছিলেন 'লুঙ্গীসর্বস্ব মওলানা' বলে। মওলানা ভাসানী যে 'লুঙ্গীসর্বস্ব' ছিলেন না তার প্রমাণ তিনি জীবনে বহু বহু বার করেছেন। আসামে তাঁর আয়োজিত সভাগুলোতে লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশ করে তিনি সকল প্রতিকূলতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যুক্তফ্রন্টে রেখেছিলেন তাঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর; পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ কৃষক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৮-৬৯-এর দেশকাঁপানো গণঅভ্যুত্থানে প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভূমিকা পালন করে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন স্থিতাবস্থার ভীত। এমন কি অতি বৃদ্ধ বয়সে, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থেকেও লক্ষ লক্ষ লোকের অংশ গ্রহণে সমৃদ্ধ ফারাক্কা মার্চ সংঘটিত করে ভাসানী দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি 'লুংগীসর্বস্ব' ছিলেন না বরং ছিলেন নিজেই একটি 'ইনস্টিটিউশন'।

www.pathagar.com

আবদুস শহীদ

মওলানা ভাসানীর জীবন-দর্শন

আজ দেশের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে সংকটের উদ্ভব হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দেশের চিন্তাশীল ও মানবদরদী ব্যক্তি মাত্রেই ভাবছেন। কিন্তু আমার মনে হয় দেশের সার্বিক মুক্তির একটি সঠিক পথ নির্ণয়ের জন্য মওলানা ভাসানীর জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিলম্বে হলেও 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' দেশের কল্যাণকামী চিন্তাবিদদের মওলানার মূল্যায়নের সুযোগ করে দিয়ে নিশ্চিতই একটি মহৎ কাজ করলেন। এজন্য প্রথমেই দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তবে বলে রাখা ভাল, সমুদ্রের তলদেশ থেকে সম্পদ আহরণ সহজসাধ্য নয়। সেজন্যই আমি ভাসানী-সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে দু'একটি নুড়ি কুড়াবার চেষ্টা করব।

কালের ও অন্ধকারের গভীরতা ও ভয়াবহতা অনুভব করতে না পারলে আলোর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এ কারণেই মওলানা ভাসানীর জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করার আগে খুব সীমিত হলেও বর্তমান সমাজের একটি চিত্র তুলে ধরা দরকার মনে করি।

আজকের সমাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। এই মূল্যবোধ শাশ্বত সনাতন ধর্মীয় ক্ষেত্রসহ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। বলতে কি, আমরা এই অবক্ষয়ের এমন এক গভীরে নিমজ্জিত হয়েছি যে, সেখান থেকে উদ্ধার পাবার যেন কোন পথই আমাদের সামনে খোলা নেই। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অস্থিরতা, সুবিধাবাদ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আকাশচুম্বী বৈষম্য, সামাজিক ক্ষেত্রে বলদর্পীদের

www.pathagar.com

দৌরাত্ম্য. ধর্মীয় ক্ষেত্রে একদিকে নিছক আচারসর্বস্বতা, অন্যদিকে জনগণের ব্যাপক অজ্ঞতার সুযোগে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীদের সীমাহীন লালসা সরল বিশ্বাসী মানুষের মনে দ্বিধা সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। কী জাতীয় কী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সংঘর্ষ, যুদ্ধ-হানাহানি, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বিশ্বমানবের শান্তির আশাকে সুদূর পরাহত করেছে।

উল্লিখিত পটভূমিতেই দেখা যাক মওলানা ভাসানীর জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও ব্যক্তি-আদর্শ আমাদের মুক্তি পথের কতটুকু সহায়ক হয়েছে। এবং এটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, বর্তমানে মওলানা ভাসানীর সঠিক ও সার্থক সার্বিক মূল্যায়নই পথ-নির্দেশক হবে।

প্রথমেই মওলানা ভাসানীর শতাব্দীব্যাপী দুধার সংগ্রামী শক্তির উৎস খুঁজে বের করতে হবে; এবং তা সহজেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। মওলানা ভাসানীর জীবনী শক্তি ও কর্ম প্রেরণার অফুরন্ত উৎস হলো একদিকে সর্বশক্তিমানের উপর অটল বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। তারপরই জনশক্তির উপর বিশ্বাস। সত্য বলতে কি, কোন উপর তলা থেকে নয় বরং জনতার মধ্য থেকে উদ্ভূত মওলানা ভাসানী জনগণের মধ্যে দুর্জয় শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। এবং তিনি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনগণকে চরম নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে না পারলে তার অপরিসীম শক্তির বিকাশ ও তার প্রয়োগ কার্যকরী করা যাবে না। তাই দেখি যেখানেই জনগণ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত সেখানেই তিনি উপস্থিত। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, আমাদের দেশে সবচেয়ে নিপীড়িত হলো কৃষক শ্রেণী। তাই তিনি কৃষকদের মুক্তির সংগ্রামে টেনে নামালেন।

ব্যক্তি মওলানা ভাসানী ছিলেন ক্ষমতালোভীদের অনেক উর্ধ্বে। তাই তিনি জনতার একচ্ছত্র নেতা হয়েও কোনদিন ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেন নি। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি নিজের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য জনতাকে ব্যবহার করেন নি। জনগণের মুক্তির জন্যই তিনি জনগণের মধ্যে কাজ করেছেন। তিনি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের লোক ছিলেন না।

মওলানার আর একটি বৈশিট্য হলো তিনি মঞ্চসর্বস্ব ছিলেন না। দেখা গেছে, এদেশের বহু নেতা মঞ্চ আঁকড়িয়ে ধরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অবশ্যই মওলানা ভাসানী প্রয়োজনবোধে মঞ্চ থেকে জনসমুদ্রকে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য করে তাঁর বজ্রগম্ভীর নির্দেশ জারী করতেন এবং কখনও কখনও গগনবিদারী আওয়াজ 'খামোশ' বলে অবাঞ্ছিত সমালোচক ও প্রতিপক্ষকে নীরব করে দিতেন।

মনীষী ভাসানীর আসল কর্মস্থল ছিল গ্রামে-গঞ্জে, কৃষকের ঘরে ঘরে। তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে কত হাজার হাজার কৃষকের ঘরে গিয়ে তাদের খোঁজ নিতেন তার ইয়ত্তা নাই। লোকচক্ষুর আগোচরে মওলানা ভাসানীর কৃষকের ঘরে গিয়ে উপস্থিতি সম্পর্কে অনেক কাহিনী শোনা যায়।

অভুক্ত, নিরন্ন মানুষের জন্য তাঁর অন্তরে ছিল সীমাহীন দরদ। তিনি একবার বানরীপাড়ায় (বাখেরগঞ্জ, বর্তমান পিরোজপুর জেলা) গিয়েছিলেন সেখানে সভা করে যাবেন শ্রীরামকাঠিতে (নাজিরপুর উপজেলা)। দূরের পথ, সময় সংকীর্ণ। মওলানা গিয়ে উঠলেন একখানা ছোট্ট ছই দেয়া নৌকায়। নৌকা ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় এক ভিক্ষুক খালের পাড়ে এসে হাত পাতলো। আমিও সেখানে দাঁড়িয়ে—হঠাৎ মওলানা তাঁর বিশাল বপু নিয়ে ছাড়ন্ত নৌকার গলুইতে এসে যেভাবে ভিক্ষুকের হাতে এক মুঠো পয়সা দিলেন তা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মওলানা খালের ভিতর পড়ে যেতে পারতেন। মানুষের দুঃখ কতখানি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলে এটা সম্ভব। তা ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়!

আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক এবং তার আশি ভাগেরও বেশী মুসলমান মূলত এই কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে মুসলিম জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতা এনে দিয়েছেন। আমার সুদীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় দেখেছি ডানপন্থী কী বামপন্থী—কোন নেতাই সমাজের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন ও প্রাণের মানুষ হতে পারেন নি। কারণ তারা জনসংখ্যার গরিষ্ঠতম অংশ মুসলিম কৃষকদের মনমানসিকতার ধারই ধারতেন না। মওলানা ভাসানী এদিক দিয়ে আজ সকলের ঊর্ধ্বে এবং আমার বিশ্বাস তাঁর এই দিকটার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলে এদেশের মুক্তির দিক-নির্দেশনা লাভ করা যেত।

সরল বিশ্বাসী অগণিত নিপীড়িত মানুষের অন্তরের আরাধ্য পুরুষ হতে পেরেছিলেন তিনি শুধু তাঁর জীবনে বলিষ্ঠ ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত সকল ধর্মের মূলে নিহিত যে মানবতাবাদ মওলানা ছিলেন তারই ধারক। তিনি ইসলামের এই মানবতাবাদী দিকটি সর্বোচ্চে তুলে

www.pathagar.com

ধরেছিলেন। তাই তিনি শুধু একজন মহান রাজনীতিবিদই নন, সরল ও সহজ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি এ দেশের কোটি কোটি নিপীড়িত ও বিশেষ করে মুসলিম জনতার অনন্য নেতা হতে পেরেছেলেন।

একজন রাজনীতিবিদ হয়েও ইসলামী মূল্যবোধকে তার সঠিক প্রেক্ষিতে জীবনে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন বলেই দেখি তাঁর অসংখ্য মুরীদান তাঁর জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতো।

তিনি ধর্মে যেমন জবরদস্তি পছন্দ করতেন না, তেমনি তিনি রূহবা-নিয়াত বা বৈরাগ্যেও বিশ্বাসী ছিলেন না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারে তিনি সহজ সরল ধর্ম পন্থায় যে মুরীদান পেয়েছেন তা যে কোনো পীরের ঈর্ষার বিষয়।

যে দূরদর্শিতা নিয়ে মহানবী (স.) হোদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন, মওলানাকেও দেখি সেভাবেই নিজের ধর্মীয় দর্শন ও রাজনীতিতে অটল থেকে ভিন্ন মতাদর্শীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছেন। মওলানা একদিন বলেছিলেন, 'আমি কুম্যুনিস্ট সোসালিস্ট বুঝি না, যারা একটি শিশু পানিতে পড়ে গেলে তাকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে উদ্ধার করে, আমি তাদের নিয়ে কাজ করতে চাই।' সঠিক প্রেক্ষিতে উপস্থিত করতে পারলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও শক্তি যে অভাবনীয় কাজ করতে পারে মওলানার দুর্বার কর্মজীবন তারই সাক্ষ্য বহন করে।

আমার বিশ্বাস এদেশের আলেমগণ মওলানার এই দিকটা অনুশীলন করতে পারলে জনগণের কল্যাণে সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

মওলানা ভাসানী কোনরূপ স্থূলতা ও নীতিহীনতা পছন্দ করতেন না। এদিক থেকে তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে ব্যবহারেও অত্যন্ত কঠোর ও আপোষহীন ছিলেন।

মওলানা তাঁর সরল ধর্মীয় বিশ্বাসে অটুট থেকেই যেখানে যা ভাল তাকে নিজ আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। দুর্জয় আত্মপ্রত্যয় নিয়েই তিনি কম্যুনিস্টদের সাথে কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এমন বহু নির্যাতিত ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের দেখেছি যাঁরা মওলানাকে দেবতার মত ভক্তি করতেন।

একজন ধর্মভীরু লোক হয়েও যে মওলানা কতখানি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে!

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী যে কত বড় সংগঠক ও কর্মী ছিলেন তার প্রমাণ শুধু সন্তোষই নয়, মহীপুরসহ বহু জায়গায় প্রমাণ রয়েছে।

মওলানা ভাসানী যেমন প্রাচীন মূল্যবোধের ধারক ছিলেন তেমনি আধুনিকতার (অবশ্য ধর্মীয় আলোকে) শ্রেষ্ঠ দিকগুলোর প্রতিফলন ছিল তাঁর কর্মে ও জীবনে।

মহৎ ও মহত্বের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ টান। প্রায় বক্তৃতায়ই তিনি মওলানা আজাদ, মওলানা মোহম্মদ আলী, হাকিম আজমল খান শেখুল হিন্দ প্রমুখের নাম স্মরণ করতেন।

তিনি আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের অন্তরে যে কতখানি জায়গা দখল করেছিলেন তা বুঝতে পেরেছি তাঁর ইন্তিকালের পর। ভিন্ন পথ ও মতাদর্শী ব্যক্তিও তাঁর মৃত্যুশোকে মর্মাহত না হয়ে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুতে আমিও যে কতখানি শোকাহত হয়েছিলাম তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

পরিশেষে আবার বলি 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' মওলানা ভাসানীর জীবনালেখ্য ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ হোসেন

শিক্ষা দর্শনে মওলানা ভাসানী

ভূমিকা ঃ "Seek knowledge from the cradle to the grave". মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করে। আর শিক্ষা হতেই মানুষের মধ্যে জ্ঞানের হয় সমাহার। শিক্ষা মানুষকে সুসভ্য, মার্জিত, অহংমুক্ত আত্মসচেতন ও আত্মিক সমৃদ্ধির উপলব্ধিতে পরিপুষ্ট করে। এ কারণে একজন সুশিক্ষিত মানুষ এমন কতগুলো গুণ অর্জন করেন, যার মাধ্যমে তিনি জীবনকে সুশৃংখলভাবে সুনির্দিষ্ট পথে সুউদ্দেশ্যে পরিচালনে সক্ষম হন এবং এভাবেই তিনি মানব জীবনকে করেন সার্থক, সুন্দর ও সুখকর। শুধু তাই নয়, এ সকল লোকের সংস্পর্শে একটি পরিবার, একটি সমাজ, একটি দেশ ও একটি জাতি হয় কলুষমুক্ত, গৌরবান্বিত, দেশ ও জাতীয় ইতিহাস হয় গৌরবমণ্ডিত। কিন্তু যে শিক্ষা মানব সমাজকে আদিম যুগের অন্ধকার থেকে আজকের যুগের আলোকবর্তিকায় এনেছে সেই শিক্ষা কি বা কাকে বলে এবং সেই শিক্ষা কি ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়?

দৃষ্টিভংগী ঃ মানুষ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বকে বিচার করতে চায়—তাই সত্যোপলব্ধিতে ঘটে পার্থক্য। একই সত্য বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন-রূপে হয় প্রতীয়মান। এজন্যই একজন দার্শনিকের চিন্তা, একজন কবির চিন্তা, একজন সাহিত্যিকের চিন্তা ও একজন চিন্তাবিদ সমাজ সংস্কারকের ধ্যান-ধারণার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পার্থক্য—আবার জ্ঞানের গভীরতা অনুসারে সত্যোপলব্ধির গভীরতাও বাড়ে। এজন্যই শিক্ষায় শিক্ষায়, জ্ঞানে জ্ঞানে, চিন্তায় চিন্তায় হয় পার্থক্য। আমরা আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে যে শিক্ষা লাভ করে থাকি তাতেও এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই শিক্ষকের কথা একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মনে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবে থাকে ব্যবধান। এই ব্যবধানের জন্যই দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ তবে এ সংজ্ঞাগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মূলত একই। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ঃ 'Real education consists in drawing the best out of yourself.' অর্থাৎ মানুষের ভিতরের গুণাবলীর সঠিক বহিঃপ্রকাশই সত্যিকারের শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'Education is the manifestation of the perfection already in man'— মানুষের মাঝে যে পূর্ণতা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে তার সঠিক বহিঃপ্রকাশই শিক্ষা। John Dewey বলেন ঃ 'Education is not a prepartion for life, but it is a life itself'. শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। অনেক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে এরূপ আরও অনেক শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন।

আমরা অনেকেই জ্ঞান ও শিক্ষাকে এক পাল্লায় পরিমাপ করে থাকি। কিন্তু তা' ঠিক নয়। জ্ঞান হলেই যে শিক্ষা হলো, আবার শিক্ষা হলেই যে জ্ঞান হলো তা বলা যায় না। এজন্যই Edward Thring বলেছেন ঃ 'Mere knowledge is not education'—শিক্ষা শুধু জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। আসলে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বাস্তবে সুন্দর অভিব্যক্তিই শিক্ষা। Horne-এর মতে তাই বলা হয়েছে ঃ 'Education is the sharing of expericnes till it becomes a common posession'. অভিজ্ঞতার সহজ ও সাবলীল বন্টনই শিক্ষা। মোটকথা, বিন্দু বিন্দু বারি কণা মিলিত হয়ে যেমন একটি মহাসাগরের জীবন গড়ে ওঠে তেমনি শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের সামগ্রিক জীবন গড়ে ওঠে। এজন্যই রুশো বলেছেন, 'Plants are developed by cultivation and man by education'. গাছ বাড়ে চাষ আবাদে এবং মানুষ বাড়ে শিক্ষায়।

শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাশীল শিক্ষাবিদগণ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তদ্রূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে প্রতি সংজ্ঞাতেই শিক্ষার্থীর কল্যাণ কামনার শুভ প্রয়াস বিদ্যমান। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য নিম্নে কয়েকজন বিশেষ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকের এতদ্‌সম্পর্কিত প্রদত্ত সংজ্ঞা আলোচিত হলো।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানবতাবাদী দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন ঃ 'The aim of edncation should be the discovery of truth and abhorrence of untruth.—শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্যের আবিষ্কার এবং মিথ্যার বিতাড়ন।' প্লেটো বলেছেন ঃ 'The aim of education should be the fullest develoment

www.pathagar.com

of body and mind—শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শরীর এবং মনের পরিপূর্ণ বিকাশ।' অ্যারিস্টটল বলেছেন ঃ "The aim of education should be the acquisition of happiness through approved by action of religion. শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ধর্মীয় অনুশাসন কর্তৃক অনুমোদিত কার্যাবলীর মাধ্যমে সুখ আহরণ।' অনুরূপভাবে ক্যামিন্যাস, জনলক, পেস্টালজী, বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও আরও অনেক শিক্ষাবিদ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয় Froebel-এর সংজ্ঞাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। Froebel বলেছেন, 'The realization of a beautiful, faithful aud pure life should be the aim of education. একটি সুন্দর বিশ্বাসী এবং পবিত্র জীবনের উপলব্ধিই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।'

বিশ্লেষণ ঃ শিক্ষা হচ্ছে মানব জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর, সুখকর ও সার্থক করার জন্য কতকগুলো কলাকৌশলমাত্র। মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত ও মার্জিত মনের অধিকারী হয়। শিক্ষিত মানুষের আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে একটা আদর্শিক আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠ প্রত্যয় অথচ মার্জিত ও সুন্দর মনের অভিব্যক্তি ঘটে। তাঁর কথা বলার স্টাইল ও আচরণের স্টাইলেই শুধু নয়, তাঁর পারিবারিক জীবনবোধ থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনেও মার্জিত ও অতি সুন্দর রুচিসম্মত স্টাইল এবং একটি পবিত্র অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। শিক্ষা মানুষের জীবনকে পবিত্র ও সুন্দর করার জন্য কতকগুলি 'Art' শিক্ষা দেয়। সেগুলো যে শিক্ষার্থী যত বেশী গভীরভাবে অনুধাবন, অনুকরণ, অনুশীলন করে আয়ত্ত করতে পারে তত বেশী সেই শিক্ষার্থীর জীবন সম্পর্কে তথা বিশ্ব সম্পর্কে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপলব্ধি হয় ব্যাপক ও সম্প্রসারিত।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঃ শিক্ষা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিসমাপ্তি ঘটায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গত ভোগ লিপ্সাকে করে সংযত, আত্মাকে করে আত্মোপলব্ধিতে সমৃদ্ধশালী। প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাবিদ সক্রেটিস, চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াস, লাউৎ সেন ও ভারতের মুণি ঋষিদের শিক্ষা দর্শনে বিদ্যার্থীদের আত্মিক বিকাশের প্রতি জোর দেওয়া হত অত্যন্ত বেশী। বাস্তব জীবনে দায়িত্ব কর্তব্য কর্মসম্পাদনে 'স্মার্টনেস' বা নৈপুণ্যতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হত কম। যার ফলে বিদ্যার্থী জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হত না। সেইরূপ আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

জাগতিক শিক্ষাকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আর এজন্যই আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ হচ্ছে নৈতিক চরিত্রে বড়ই দুর্বল। দেহের যত্নের সাথে আত্মার যত্ন না নিলে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা বজায় থাকে না, চরিত্রে মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ঘটে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ 'পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব অর্জন যেমন সহজ মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব অর্জন তত সহজ নহে। মনুষ্যত্ব আমাদের অন্তরের ধন। উহা অর্জনের জন্য তপস্যা করতে হয়—ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।'

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমন্বয়ঃ জাগতিক শিক্ষার সাথে আত্মিক শুদ্ধি ও আত্মিক সমৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীর চরিত্রে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষায় শিক্ষার বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই দুইয়ের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে এতদুদ্দেশ্যে এ ধরনের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় নি। তাই এই দুইয়ের সমন্বয়ের জন্য দেশ, সমাজ ও মানব জীবনের উন্নতি, প্রগতি, কর্ম ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের তাগিদে আমাদের জাতীয় নেতা, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক মানবতাবাদী মহান নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুযুর (র.) সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট আদর্শিক সুশিক্ষার সুব্যবস্থা প্রণয়নের আবেদন জানিয়ে গেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা প্রণেতাদের চিন্তা ও গবেষণার জন্য তাঁরই ভাষায় হুবহু সংযোজন করা হলোঃ 'দেশে শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদগণ যখন শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া চিন্তাভাবনা করিতেছেন তখন আমি কেনই বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম ইহা একটি প্রশ্ন বটে। স্পষ্ট ভাষায়ই আমি বলিতে চাই, ইহার কারণ আমার হতাশা ও উপলব্ধি দুই-ই—আমি বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে হতাশ হইয়াছি। তাঁহারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অন্ধ হইয়া যাইবে—কাহাকেও মাথায় তুলিয়া নাচিবে, আবার কাহাকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। সোজা কথায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞ থাকিয়া যায়, মূর্খতার স্বভাব লাভ করিয়া যায়।

www.pathagar.com

'প্রথমত আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি গণচেতনা ও গণআন্দোলনের সাথে সাথে আগামী দিনের জন্য ত্যাগী পুরুষ গড়িয়া তোলা দরকার। তাহারা শুধু ত্যাগী নয়, সাধকও। তাহারাই চিন্তাবিদ, তাহারাই কর্মী, তাহারাই নেতা। এমন পুরুষই সমাজের জন্য কাম্য বটে। কিন্তু তাহার আবির্ভাবের জন্য প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, এহেন পরিবেশও বজায় রাখিতে হইবে। বাংলাদেশের জন্য তেমন ত্যাগী চিন্তাবিদ আজ যে কত জরুরী তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার জানা নাই। ১৯৪৭ সালের পর আমরা যুব সমাজকে কিছুই দিতে পারি নাই। তাই আজ তাহাদের মধ্যে এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এত দ্বিধা, এত দ্বন্দ্ব! তাহাদের মধ্যে শীঘ্রই এমন হতাশা ভাব জাঁকিয়া বসিবে যাহা দূর করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে, এই সময়ে জাতি অনেক দূর পিছাইয়া যাইবে। তাই কালবিলম্ব না করিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়া দরকার।

'এখন বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রাম কিছু পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে, আশার বাণী শুনাইতে হইবে। বাস্তব কর্মসূচী কিছু না কিছু দিতেই হইবে। তাহা না হইলে গোটা জাতি অজানা লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। তাই আমি ভাবিতেছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে গ্রামে কাজ করিবার জন্য নিয়োজিত করিব।

'আমি নিঃসন্দেহে আশাবাদী যে, এমনিভাবে কাজ করিয়া গেলে অচিরেই জাতিকে একটি বিশেষ লক্ষ্যের সন্ধান দেওয়া যাইবে। আর সন্ধান পাইলে অনুসন্ধিৎসু সমাজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে আগাইয়া চলিবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যা-লয় সেই গতিপথ উন্মুক্ত করিয়া দিক, ইহাই আমার কামনা।

'একটি কথা সত্য যে, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' বাংলাদেশে কেন, সম্ভবত পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথক ধরনের হইবে। সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়টির ৫টি বৈশিষ্ট্য তুলিয়া ধরিতেছি ঃ

প্রথমত, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পড়ানো হইলেও প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য যে কোন একটি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকিবে। যেমন ধরুন, কোন ছাত্র ইতিহাসে এম. এ. পড়ে। তাহাকে রুটিনমাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ক্লাস তো করিতেই হইবে; তাছাড়া সে যদি কারিগরি শিক্ষাস্বরূপ তাঁতের কাজ বা ছাই

www.pathagar.com

করিয়া লয় তবে তাহাকে প্রতিদিন রুটিনমাফিক তাঁতের কাজও শিখিতে হইবে। এইভাবে কাজটি শিখার সবচেয়ে বড় ফায়দা হইল, ইতিহাসে এম. এ. পাশ করিয়া সে ডিগ্রীভিত্তিক কোন চাকুরী যদি নাও পায় তবু সে বেকার থাকিবে না। কারিগরি শিক্ষা যা-ই লইয়া থাকুক তাঁতের কাজ হউক, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ হউক, ফিশারীর কাজ হউক, কৃষি কাজ হউক, ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ হউক, কর্মজীবনে উহা তাহার উপকারে আসিবেই। এর মধ্যে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া কলা বিভাগের সিলেবাস বাছাইয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা ধরনের হইবে। আমরা গণমুখী গবেষণা, দেশীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক আবিষ্কার এবং আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ নজর দিব।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার দৈহিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক থাকিবে। দৈহিক প্রশিক্ষণ ইউনিটই খেলাধূলা ও কায়িক পরিশ্রমের রুটিন এবং শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়াদি নিয়ন্ত্রণ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-শিক্ষকগণ আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন। উহার মাধ্যমগুলি উক্ত ইউনিটের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় আচরণ বিধি ঐ ইউনিটের দেখাশুনার বিষয় হইবে। তবে ইহাও ঠিক যে, নিয়ন্ত্রণ সীমা কখনো কোন ক্ষেত্রেই স্বভাববিরুদ্ধ হইবে না। গবেষণা ও তথ্য ইউনিটের পরামর্শ মোতাবেক আলাদাভাবে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর স্বভাব ও গঠন নির্দিষ্ট করিয়া রুটিন করা হইবে। উহাতে পরিবেশ ও কাজকর্ম অত্যন্ত নূতন হইলেও কোন ছাত্র তাহাতে খাপ খাওয়াইয়া নিতে মোটেই বেগ পাইবে না। তবে একটি ক্ষেত্রে ইউনিটগুলি আপোষহীন হইবে। তাহা হইল সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। পোশাকে ও চালচলনে অতিশয় অনাড়ম্বর হইতে হইবে। খাওয়া-দাওয়া পুষ্টিকর হইলেও অত্যন্ত মামুলি ধরনের এবং দেশীয় হইবে।

তৃতীয়ত, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে তাহার ধর্মের মূল শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দান করা হইবে এবং তাহা আমল করা বাধ্যতামূলক থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ মুসলমান ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্য হইতে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মনোনয়ন করা হইবে। ইমামকে জুমআর খুৎবায় চলতি সপ্তাহের বিশ্ব সমীক্ষা আলোচনা করিতে হইবে। এইভাবে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃস্টান হউক, বৌদ্ধ হউক প্রত্যেক ছাত্রকে স্বীয় ধর্মের ধারায় শৃঙ্খলা,

www.pathagar.com

পবিত্রতা, চরিত্র গঠন এবং বিশ্বানুভূতির শিক্ষা দান করা হইবে। পবিত্র জীবন যাপন ও চরিত্রবান হওয়ার প্রতি অবহেলা করিলে কোন ছাত্রকেই ক্ষমা করা হইবে না। গবেষণা ও তথ্য ইউনিটের দায়িত্বে এইসব তদারক করা হইবে।

চতুর্থত, কেরোসিন তৈল ও লবণ ছাড়া বাকী সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদিগকে উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে। এই উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করা থাকিবে। আবার বিনিময় প্রথা অনুসারে একে অন্যেরটি ভোগ করিবে। এইভাবে প্রতিটি ছাত্রের যাবতীয় চাহিদা, যথাঃ কাপড়, সব্জি, মাছ, মশলা ইত্যাদি ছাত্ররাই ছাত্রদিগকে সরবরাহ করিবে। একটি উদাহরণঃ ধরুন, দর্শন বিভাগের ছাত্ররা তাঁতের কাজ অর্থাৎ কাপড় বুনানকে কারিগরি শিক্ষাস্বরূপ পছন্দ করিয়া লইয়াছে। আবার রসায়ন বিভাগের ছাত্ররা লইয়াছে চামড়ার কাজকে। কারিগরি ইউনিটের মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা হইবে। যেমন লুঙ্গী, গামছা, পাঞ্জাবী ও পায়জামার কাপড়ের বিনিময়ে সুতা, ব্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে। চাহিদার সংখ্যাতত্ত্ব আদান প্রদানের বাটোয়ারা ইত্যাদি সব কিছুই কারিগরি ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করিবে।

পঞ্চমত, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা বৎসরগুলির মাঝে চার পাঁচ সপ্তাহ-কাল প্রত্যন্ত গ্রামে কিংবা শিল্প এলাকায় হাতে কলমে কাজ করিতে হইবে। যেমন ধরুন, ইংরেজি বিভাগের ছাত্রগণ প্রথম বৎসর কিংবা দ্বিতীয় বর্ষের আগস্ট মাসে পাট কাটার মওসুমে দেশের কোথাও মাঠের কাজ করিবে; কিংবা ধরুন, বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রগণ ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের কোন সুগার মিলে আখ টুকরা করার কাজে যোগদান করিবে। এইজন্য দেখা যাইবে যে, অবসরের দিন কাটানোর জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের কোন ছুটিই দেওয়া হইবে না। সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় কয়েকটি বড় উৎসবে ছুটি দেওয়া হইবে বটে কিন্তু উহার মধ্য দিয়াও শিক্ষামূলক কাজ আদায় করিয়া লওয়া হইবে।

যাহোক মূল কথা হইল, ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যাহাতে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ দেখা দেয় তাহার পরিবেশ সর্বতোভাবে বজায় রাখা হইবে। মানুষের কল্যাণকেই সবচেয়ে বড় বলিয়া জানিবার স্পৃহা জাগানো হইবে।

আমি স্বীকার করিতেছি, প্রথম হইতেই এই পাঁচটি বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি' চালু করা সম্ভব হইবে না। প্রথম হইতেই

www.pathagar.com

পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার কাজে হাত দিলেও কয়েকটি সেশন কাটিয়া গেলে উহার পুরাপুরি রূপটি দেখা যাইবে। আর ইহাও তো মানিয়া লইতে হইবে যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পড়িয়া সব কিছুতে কমবেশী রদবদলের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন হইলেও এইভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকা মোটেই অসম্ভব নয়, আমি বিশ্বাস করি।'

মওলানা ভাসানী হুযূর (র.)-এর শিক্ষা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজের প্রতি স্তরে আজ দুর্নীতি-কূটনীতি ও শোষণ বিদ্যমান। এ সমাজকে দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত করতে হলে আমাদের নৈতিক চরিত্রকে সুন্দর ও শুদ্ধ করতে হবে। আর এর জন্যই আমাদের জাতীয় শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আমরা আসলে প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা থেকে পিছিয়ে রয়েছি। মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব কর্তব্য সে সম্পর্কে আমরা শুধু উদাসীনই নই, কি করে মানুষকে ঠকিয়ে সমাজের সর্ব উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারি সে শিক্ষাই আমরা লাভ করে চলেছি। সরকার সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোৎচ্ছেদ ঘটানোর জন্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের বিষয় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। এর জন্য অনেক লেখা, অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনেক মূল্যায়ন চলছে। কিন্তু একটি কথা অত্যন্ত সত্য তা হচ্ছে এই যে, যতদিন পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সাম্যতার সুফল পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে না— ততদিনই শোষণ ও দুর্নীতি বন্ধ হবে না। সমাজে ছোট-বড়, ধনী-গরীব থাকবে। তবে তার মধ্যে মৌলিকভাবে থাকবে একটা সামঞ্জস্য যা শ্রেণী বিদ্বেষ নয়—শ্রেণী বন্ধুত্ব। হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ছোট-বড় থাকলেও যে আঙ্গুলে যতটুকু রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন সেই আঙ্গুলে যথারীতি ততটুকু রক্ত সঞ্চালন না হলে আঙ্গুল সচল কার্য সম্পাদনে অক্ষম। শুধু তাই নয়, অন্যান্য আঙ্গুলকেও সক্রিয় কার্য সম্পাদনে ব্যাহত রাখে।

আমরা যত চেষ্টা প্রক্রিয়াই চালাই না কেন, সব কথার মূল কথা এটাই দাঁড়ায়—অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে জাতীয় চরিত্রের বিকাশ সাধন করতে হবে। ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষাই আমাদেরকে জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী শিক্ষায় কেবল মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরই অধিকার রয়েছে। ইসলাম একটি সার্বজনীন ও

www.pathagar.com

সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাজা-বাদশাহ্‌, সুলতান ও ধনিকদের কল্যাণে এবং পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ইসলাম আজ সালাত-সিয়ামসর্বস্ব এক পারলৌকিক মতবাদে পরিণত হয়েছে বলেই ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা অনেকের ভিতর বিদ্যমান।

বস্তুত এই আনুষ্ঠানিক ইসলাম, আমাদের মনগড়া ইসলাম, আল্লাহ্‌র মনোনীত মানব প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলামের আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের লালন পালন ও বিবর্তনকর্তা, ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ও রহমত এবং ইসলামী জীবন আদর্শ মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত স্বাভাবিক জীবন বিধান। কাজের শুরুতেই আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, ইসলামী শিক্ষার অর্থ অধুনা প্রচলিত মন-গড়া ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা নয় বরং ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার অনুশীলনই ইসলামী শিক্ষা, ইসলাম বিষয়ক শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ শিক্ষা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত। ......'এক কথায় মানুষ আত্মা ও বুদ্ধি, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ গোটা মানব জীবনই ইসলামের পরিমণ্ডলভুক্ত। বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির সূচনা, বিকাশ ও লালন পালনের জন্যে বিধান প্রণয়ন করেছেন, সেই সব বিধান অনুযায়ী জড় জগত, জীব জগত ও মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিশ্বরূপ পাঠশালায় ঐসব নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তার আলোকে নিজেদের জীবন দৃষ্টি এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ও সাধনাই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।' মি. গান্ধী-ও এ ধরনের শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই বলেছেন ঃ 'সমগ্র বিশ্বে একটি সত্য আছে এবং তা হচ্ছে স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান। যে নিজেকে জানে সে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর সৃষ্টিকেও চিনতে পারে, জানতে পারে। যার মধ্যে এ জ্ঞান দেখা যায় না তার আসলে কোন জ্ঞানই নেই। পৃথিবীতে একটি মাত্র শক্তি আছে, মাত্র এক ধরনের স্বাধীনতা আছে এবং ন্যায় বিচারেরও একটি মাত্র রূপই আছে সেটা হচ্ছে স্বীয় সত্তাকে শাসন করার শক্তি। যে নিজ সত্তাকে বশে রাখতে পারে সে দুনিয়াতেও প্রভুত্ব করতে পারে।'

পৃথিবীতে মাত্র এক ধরনের মহত্ত্ব আছে, তা হচ্ছে নিজের মত করে অপরকে ভালোবাসা। অন্য কথায় ভিন্ন মানুষকেও আপন জ্ঞান করা। এছাড়া

www.pathagar.com

আর যা কিছু আছে, তা হচ্ছে মায়া ও বাতিল। এ কথার মানে হচ্ছে, তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যও তাই পছন্দ কর—তাহলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আর এ উপলব্ধি এবং বাস্তবায়ন তখনই হবে যখন আমরা বুঝতে পারব, 'নিজেকে জানো যাতে তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে জানতে পার'— 'তোমার প্রভু (আল্লাহ্‌কে) ভুলে যেও না তা'হলে তুমি নিজেকেও ভুলে যাবে'- এরই তাৎপর্য।

আমরা যতই বিশ্বকে জানছি ততই নিজত্বকে ভুলে যাচ্ছি। এ সম্পর্কে ইরানের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বলেছেনঃ 'বিশ্বের সুধীজন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে সমালোচনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হচ্ছে দুনিয়া সচেতন সংস্কৃতি এবং প্রবণতা হচ্ছে আত্মবিস্মৃতির দিকে। এ সংস্কৃতির গণ্ডির মাঝে অবস্থান করে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়াটাকেই জানতে পারে। একজন লোক পৃথিবীকে যত বেশী জানতে পারে, সে তার অস্তিত্বকে তত বেশীই ভুলতে থাকে। পাশ্চাত্যে মানবতার অবক্ষয়ের পেছনে এটাই হচ্ছে আসল রহস্য। মানুষ যখন নিজেকেই নিজে হারিয়ে ফেলে—পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলতে গেলে তখন বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করে লাভ কি?'

এ প্রসঙ্গে মি. গান্ধী তাঁর 'My Religion' বইয়ে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেনঃ 'একজন পাশ্চাত্যবাসী অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে যা অন্য লোকদের কাছে বিধাতার দূরদর্শী কাজ বলেই মনে হবে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সে নিজের অন্তরাত্মা নিয়ে ভাবতে সক্ষম নয়। আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিম চোখ ধাঁধানো জৌলুসের অন্তসারশূন্যতা প্রকাশ করার জন্যে এ উপলব্ধিই যথেষ্ট।

'পাশ্চাত্য সভ্যতা পশ্চিমা লোকজনদের মদ্যপান ও অশ্লীলতার দিকে নিয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে, পাশ্চাত্যের লোকজন আত্ম আবিষ্কারের চেয়ে আত্ম-বিস্মৃতি এবং নিজেদের সত্তাকে ধ্বংস করার পথেই বেশী অগ্রসর হয়েছে। তাদের অধিকাংশ বড় বড় সাফল্য, বীরত্ব এমন কি ভালো কাজগুলোর ভিত্তি হচ্ছে আত্মবিস্মৃতি ও তুচ্ছতা। সৃজনশীলতা, আবিষ্কার এবং যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তবে শ্রেষ্ঠত্ব এসেছে—নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়ানোর ফলশ্রুতি থেকে, স্বীয় আত্মার উপর কোন ব্যাতিক্রমধর্মী প্রভাব বিস্তারের কারণে নয়। মানুষ যদি তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলে তা'হলে বিশ্বকে জয় করে তার কি লাভ হবে?'

www.pathagar.com

কবি ইকবালের শিক্ষা দর্শনে বলা হয়েছে ঃ 'শিক্ষাধারা শিশু মনকে তৈরী করবে কর্ম জীবনের জন্য, ধ্যান-ধারণার জীবনের জন্য নয়—প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে যে জীবন গড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ ভাবাবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে ও রাজনৈতিক অধঃপতনের ফলে। যে জ্ঞান কর্মশক্তিকে পংগু করে দেয়, তাকে বলিষ্ঠ করে না। যা মানুষকে বাস্তব জীবন থেকে পলায়নপর করে তোলে, তার স্থান অপদার্থতার চাইতেও নিম্নস্তরে। কারণ তাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না যা সকল মানবীয় প্রচেষ্টার লক্ষ্য এবং যা অর্জন করা যায় কেবলমাত্র কঠোর কর্মজীবনের ভিতর দিয়ে। এই ধরনের জ্ঞান ইসলামী শিক্ষার প্রাণবস্তুর সম্পূর্ণ বিরোধী।'

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বহারা মহামানব হযরত মুহম্মদ (স.) বলেছেন ঃ 'জ্ঞান হচ্ছে মুসলমানের হারান ধন, যেখানে যে তা পাবে সে তার হকদার।' আল্-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'রাব্বী যিদ্নী ইলমা—হে আমার রব—আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত কর।' জিব্রাইল (আ.) আল্লাহ্র বাণী বয়ে নিয়ে আসতেন নবী (স.)-এর উপর; কিন্তু আল্লাহ্র রসূল (স.) তবু প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ্, তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই বিদ্যা হতে যা হিতকারী নয়, সেই হৃদয় হতে যা বিনম্র নয়, সেই প্রার্থনা হতে যা গ্রাহ্য নয় এবং সেই চিত্ত হতে যা তৃপ্ত নয়।'

ইকবালের ভাষায় ঃ 'আত্মার সন্ধানের লক্ষ্য নয়—ব্যক্তিত্বের সীমা বন্ধন থেকে মুক্তি; পক্ষান্তরে এ হচ্ছে তার অধিকতর সংকীর্ণ সংজ্ঞা। বুদ্ধি, বুদ্ধিগত কর্মই চূড়ান্ত কর্ম নয়, তা হচ্ছে এমন প্রাণময় কর্ম যা গভীরতর করে দেয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে এবং তীক্ষ্ণতর করে তার ইচ্ছাশক্তিকে এই সৃষ্টিধর্মী প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, এই বিশ্ব কেবল ধারণার মারফতে দেখবার বা জানবার বস্তু নয়, বরং ক্রমাগত কর্ম দ্বারা গঠন ও পুনর্গঠন করবার বস্তু।' তাঁর রচিত 'জাবিদনামা'য় এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ঃ

'তুমি কি কেবল একবিন্দু ধূলি কণা?
দৃঢ় কর তোমার আত্মার গ্রন্থি
আর আঁকড়ে থাক তোমার সত্তাকে?
কত গৌরবময়
দীপ্ত করা আপন আত্মাকে
আর পরীক্ষা করা তার দীপ্তি
সূর্যের সম্মুখে!

www.pathagar.com

পুনর্গঠন করো তোমার প্রাচীন কাঠামো,
গড়ে এক নূতন সত্তা।
এই ধরনের সত্তাই হচ্ছে সত্যিকারের সত্তা,
নইলে আত্মা তোমার ধূম্রকুণ্ডলীমাত্র।'

আবূ সীনা ইব্ন হিয্ম, আল ফারাবী, ইমাম গাজ্জালী, আবূ রুশদ্ ও নসীররুদ্দীন তুসীর দর্শন ; ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আবূ হানিফা, ইব্নে খলদুন, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.), শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র.), সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী, শায়খ আহমদ সরহন্দী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী, মওলানা আবুল কামাল আজাদ, মওলানা আল্লামা আজাদ সুবহানী পরিশেষে কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাধারা আমাদের এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের পথে উদ্বুদ্ধ করে যা মানুষকে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা সর্বাঙ্গিক সুন্দর করে। এজন্যই কবি ইকবাল বলেছেন: 'The moral and religious idea of man is not self negation, but self affirmation, and he attains to this ideal by becoming more and more individual, more and more unique.'

'মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ আত্মঅস্বীকৃতি নয়, কিন্তু আত্ম-স্বীকৃতি এবং সে এই আদর্শ লাভ করে ক্রমশ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ক্রমশ অধিক হইতে অধিকতর একত্বসম্পন্ন হইয়া।'

'আল্লাহ্ কোনও জাতির অবস্থা পরিবর্তিত করেন না যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তিত করে।' আল্লাহ্ পাকের এই মহান বাণীতে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত, দেশগত, জাতিগত ও বিশ্বগত অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বস্তুর পরিবর্তন করেও এর মূল্যবোধকে বৃদ্ধি করতে পারি। এ বাণীর মর্মার্থ শুধু স্বীয় জীবনেরই পরিবর্তন নয়: Man can change the shape of every thing of the world and make it valuable and beautiful for his comforts. In accordance with the Quranic directions he can also beautify his life and can live in brotherhood peacefully in this world by using these material objects according to his need.

তাই এই আদর্শের উপর ভিত্তি করে জাতীয় নেতা শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক মানবতাবাদী চিন্তাবিদ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুযূর (র.) জ্ঞান ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

এবং একটি সাবলীল সার্বজনীন কর্ম ও কল্যাণমুখী আদর্শিক শিক্ষা প্রণয়ন করে গেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে উদার ও খোলা মন নিয়ে সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষটির শিক্ষা দর্শনটি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রণেতাবৃন্দ গভীর অভিনিবেশ সহকারে গবেষণা ও মূল্যায়ন করে জাতীয় শিক্ষারূপে প্রণয়ন করলে আমার মনে হয় দেশ, জাতি, তথা বিশ্ববাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হত।

উপসংহার ঃ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সরকারকেই শুধু নয়, দেশের প্রতিটি বিবেকবান সচেতন নাগরিককেই দেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক মানবতাবাদীরূপে সৎ উদ্দেশ্যে সৎ নাগরিক হিসেবে এদেশের মানব সন্তানকে গড়ে তোলার দায়িত্ব গভীর আগ্রহ ও যত্ন সহকারে বহন করতে হবে এবং সেজন্যেই মওলানা ভাসানীর শিক্ষানীতির মূল্যায়ন করে সেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীনের হুকুমত সম্পর্কিত জ্ঞান ও হিকতম মানব জীবনের একমাত্র পাথেয়। এ শিক্ষায় অমানুষ মানুষ হয়, দুষ্ট শিষ্ট, চরিত্রহীন চরিত্রবান, অধার্মিক ধার্মিক, অসুন্দর সুন্দরতম, পাপী হয় পুণ্যবান, স্বার্থবাদী স্বার্থহীন, হিংসুক অহিংসুক, আত্মবিস্মৃতিকারী হয় আত্মদর্শনকারী, পর অপকারী হয় পরোপকারী, দেশদ্রোহী দেশপ্রেমিক, অমানবিক হয় মানবতাবাদী বিশ্বপ্রেমিকরূপে প্রতীয়মান। সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ব্যতীত জাতীয় জীবনে এমন একটি মহৎ আদর্শিক শিক্ষা কখনো কায়েম করা যাবে না। সেই সঙ্গে শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষকদের দিতে হবে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা। তাদের থাকা-খাওয়া ও নিরাপত্তার দিতে হবে পূর্ণ নিশ্চয়তা। শিক্ষকগণ যাতে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অথবা শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত থাকতে পারেন তার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে তাঁরা যেন প্রাইভেট টিউশনী, অথবা অন্য কোন প্রকার খণ্ডকালীন কাজ করতে না পারে তজ্জন্য অনমনীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট টিউশনীকে যেমন নিরুৎসাহিত করেছেন তেমনি শিক্ষকবৃন্দ যাতে তাঁদের পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সদা সর্বদা চিন্তান্বিত না থাকেন তজ্জন্য তাঁদের পরিবারের অনাড়ম্বর অথচ থাকা-খাওয়া ও সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করে গড়ে তোলার একটা পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে চেয়েছিলেন—যাতে শিক্ষকবৃন্দ স্বাধীন মন ও মানসিকতা নিয়ে শিক্ষার বান্থনীয় সুফল শিক্ষার্থীদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা দর্শন ও সারা জীবনের সংগ্রামের লব্ধ উপলব্ধি ও কর্মধারা মানব কল্যাণে যাতে অবদান রাখে তারই লক্ষ্যে সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মদীনার মসজিদে নববীতে বসে নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (স.) সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র হুকুমতের আহ্‌বান জানাতেন—আসহাবে সুফফারা তাঁর বাণী বইয়ে নিয়ে যেত মানুষের দ্বারে দ্বারে। নবী (স.)-এর সেই বাণী আজও যাতে বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্বের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বিশ্বের মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়া যায়—আজও যাতে আসহাবে সুফফাদের মত বীর মুজাহিদ, ত্যাগী সমাজকর্মী ও মানবতাবাদী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক গড়ে তোলা যায় তারই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী হুযূর (র.)-এর এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। একে মানুষের কল্যাণ কামনার এক মূর্ত প্রতীক হিসাবে জাতীয় জীবনে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বললে আশা করি সত্যের বরখেলাপ হবে না। একজন প্রবীণ আইনবিদ বলেছেনঃ 'মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) ছিলেন তাঁর কর্ম ও ধ্যান-ধারণায় সত্যিকার অর্থে ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী এবং এর প্রকৃত অনুসারী। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন তাঁর একমাত্র আদর্শ পুরুষ যাঁর কর্ম ও চিন্তাধারাকে নিজের জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা মওলানা ভাসানী জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত করে গেছেন। জিন্দিগীর বাইরে কোন বন্দেগী নেই—ইসলামের এই মহান শিক্ষাকে সামনে রেখে মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) তাঁর সমাজসেবা এবং রাজনীতির ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মানুষের জন্য সুখ, শান্তি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ জীবনকে প্রেমময় করে তুলতে হবে, মানুষের মনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতিকে দূর করে মনকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করতে হবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুশীলন করে নব নব সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে জগত ও জীবনকে সুন্দর হতে সুন্দরতম অবস্থায় পৌঁছে দিতে হবে—এই ছিল তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামময় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জীবনভর মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন এবং এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি বিরামহীন জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন।'

তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মানুষ গড়ার সাবলীল সর্বজনাদৃত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই—এক মানুষ আর এক মানুষের ভাই—অতএব একত্ববোধের আদর্শে স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ অনুপ্রেরণায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হবে। নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসনে জগত ও জীবনকে করতে হবে সুন্দর সুখকর। এই মহৎ উদ্দেশ্য ও মহান আদর্শের উপর ভিত্তি করেই তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অতএব তাঁর ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার পবিত্র দায়িত্ব পড়েছে দেশের প্রত্যেক চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও প্রতিটি মানুষের উপর। তাই জাতীয় জীবনের সুন্দর অভিব্যক্তির জন্য তাঁর এই শিক্ষানীতিকে প্রণয়ন করা জাতির ঐকান্তিক কামনা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি?

www.pathagar.com

কাজী আনোয়ারুল ইসলাম

ভাসানীর ঐতিহাসিক 'আসসালামু আলাইকুম'

১৯৫৭ সালের শেষ দিকের কথা। পাকিস্তানের কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলা প্রদেশে তখন আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আর আতাউর রহমান খান পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পর পরই গণতন্ত্রের 'মানসপুত্র' শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল। পূর্ব বাংলার নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অবহেলিত জনগণ তাঁর আসল চেহারা দেখতে পেলেন।

শাসন-ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই সোহরাওয়ার্দী নিজের ব্যক্তি-স্বার্থের প্রয়োজনে দলের ঘোষিত নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীর পরিপন্থী কাজ শুরু করেন। কথা ও কাজে তাঁর সাথে তাঁর পূর্বসূরী পাকিস্তানী শাসক-দের আর কোন পার্থক্য থাকলো না। পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনসহ অন্যান্য দাবী আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ নেতা মওলানা ভাসানীসহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীকে সোহরাওয়ার্দী তাঁর পূর্বসূরী পাকিস্তানী শাসকদের সুরে সুর মিলিয়ে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী', 'বিদেশের অর্থপুষ্ট দালাল', 'কমিউনিস্ট' ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে লাগলেন। ফলে এ সময় সোহরাওয়ার্দীর সাথে মওলানা ভাসানীর বিরোধ চরমে পৌঁছে। দলের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীর সাথে 'বিশ্বাসঘাত-কতাকারী' শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর অনুসারীদের সাথে মওলানা শেষ বোঝাপড়া করতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে দলের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। এটাই ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে কাগমারী সম্মেলন এক অনন্য-সাধারণ ঘটনা। কোন দেশের কোন রাজনৈতিক দলের সভাপতি নিজ দলেরই

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন নেতাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে এ ধরনের আয়োজন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন পাকিস্তানী রাজনীতির দুই বিশাল ব্যক্তিত্ব- মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

একজন দেশ জনগণ ও দলের স্বার্থে নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী সমুন্নত রাখতে উচ্চকণ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মওলানা ভাসানী আর অন্যজন ক্ষমতার মোহে অন্ধ, নিজের প্রয়োজনে দলের ঘোষিত নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচীবিরোধী কার্যক্রমে ব্যস্ত প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী তাঁর দীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে লক্ষ্য করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ অন্যান্য ন্যায্যদাবী মেনে না নিলে পূর্ববাংলার জনগণ অচিরেই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' জানাবে অর্থাৎ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করবে।

মওলানা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম। তাই দেশটির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল। সেজন্যে তিনি প্রথম থেকেই পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ, নির্যাতন, নিপড়ীন ; ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হামলা, এ অঞ্চলের জনগণের ন্যায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনে নিয়োজিত নেতা ও কর্মীদের 'দেশের শত্রু', 'সংহতি বিনষ্টকারী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'বিদেশের অর্থপুষ্ট দালাল' ও 'কমিউনিস্ট' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করায় ব্যথিত মওলানা ভাসানী দেখলেন শেষ পর্যন্ত তাঁর দলের নেতা সোহরাওয়ার্দীও ক্ষমতায় গিয়ে পূর্বসূরী পাকিস্তানী শাসকদের অনুকরণে পূর্ব বাংলার সাথে একই আচরণ করছেন।

এ পরিস্থিতিতে মওলানার বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের শেষ পর্যন্ত একত্রে থাকা সম্ভব নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার আশা নিরর্থক। তাই একদিন স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হবে। পরিস্থিতি পরিপক্কতার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন। স্বাধীনতার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যেই তিনি সেদিন

www.pathagar.com

পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি 'আস্সালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেছিলেন। সেজন্যেই মওলানা ভাসানীর সেদিনের এই 'আসসালামু আলাইকুম' পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রত্যক্ষ সূচনা।

মওলানার সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণার ব্যাপারে তিনি নিজে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। এটা বোঝা যায়, মওলানার সেই ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী মহল যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং মওলানার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেছিল তা থেকে।

এ ছাড়া মুসলিম লীগ সমর্থক 'দৈনিক আজাদ'সহ পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদপত্রই মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। 'দৈনিক আজাদ'-এ ১৯৫৭ সালের ১২ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পর পর পাঁচ দিন সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'কাগমারী সম্মেলন'। এসব সম্পাদকীয়তে 'আসসালামু আলাইকুম' উক্তির জন্য মওলানা ভাসানীর কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়ঃ 'এমন উক্তির মাত্র একটি অর্থই হইতে পারে এবং তা হই-তেছে, যিনি এমন উক্তি করেন, পাকিস্তান হিসেবে এই রাষ্ট্রের টিকিয়া থাকা তার কাম্য নয়। পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিলেন? এ উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আগেও তিনি কয়েকবার পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমনই ধরনের তর্জন-গর্জন করিয়াছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান, কেন্দ্র এবং পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী একটা প্রবণতা তার মনের মধ্যে লালিত হইয়া আসিতেছে এবং দিন দিন তা বাড়িতেছে।'

কাগমারী সম্মেলনের আগে এবং পরে আরো বেশ কয়েকবার মওলানা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ব্যাপারে আভাস দেন। 'আসসালামু আলাইকুম' তথা পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা কাগমারী সম্মেলনেই মওলানা ভাসানী প্রথম বলেন নি। এর আগে ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি একই ভাষায় সতর্ক বাণীটি উচ্চরণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যটি সে সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে এক মহাআলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এরপর ১৯৫৬ সালের ৭ ও ১৫ জানুয়ারী দু'টি জনসভায় ২১ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রের দাবী জানাতে গিয়েও মওলানা ভাসানী বলেছিলেন ঃ 'না হলে পূর্ব বাংলাকে

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করতে হবে।' প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সে সময় মওলানা ভাসানীকে 'বিদেশের প্রতি অনুগত রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যায়িত করে শাস্তি বিধানের হুমকি দেন।

১৯৫৬ সালের ২৯ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে আরেকটি জনসভায় পাকিস্তানী শাসকদের সতর্ক করে দিয়ে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা ভাসানী আবারো বলেছিলেন, 'কেন্দ্র যদি স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে অবহেলা করে তাহলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করতে হবে।'

এরপর ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করার সময়ও পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মওলানা পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেছিলেন।

পরবর্তী এক যুগে পরোক্ষ আভাস ইঙ্গিত, প্রত্যক্ষ ঘোষণা, আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণকে তাঁদের প্রিয় নেতা মওলানা ভাসানী প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ও বহু কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। এ মহাপ্রলয়ের পর মওলানা ভাসানী আবারও পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের হৃদয়হীনতার প্রমাণ পেলেন। আর কালবিলম্ব না করে মওলানা ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে। চারণের বেশে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এ সময় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার মোহে অন্ধ। তারা দেশে কোন কোন স্থানে স্বাধীনতার দাবীতে আয়োজিত মওলানার জনসভায় হামলা চালায়। কারণ তাদের আশংকা হলো মওলানা এভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে গেলে নির্বাচন বানচাল হয়ে যেতে পারে যার ফলে তাদের ক্ষমতায় যাবার সাধ পূরণ হবে না। দূরদর্শী মওলানা সুষ্ঠু ভাষায় ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনে গিয়ে কোন লাভ হবে না। নির্বাচনে জয় লাভ করলেও পূর্ব বাংলার জনগণের হাতে পাকিস্তানী শাসকরা ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, দিতে পারে না। মওলানা ভাসানীর সেই ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হলো। ১৯৭০ সালে দেশে নির্বাচন হলো। আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো, কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ তারা পেল না।

www.pathagar.com

শাহরিয়ার কবির

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন উপমহাদেশের রাজনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ১৯১৯ সালে তিনি খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত হন। তারও আগে জড়িত ছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগদান, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ এবং মুসলিম লীগে যোগদান, জমিদার-মহাজনবিরোধী আন্দোলন, আসামে লাইন-প্রথা চালু এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে মতবিরোধ, পাকিস্তান আন্দোলন, পাকিস্তান হওয়ার পর আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দাবী ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা, আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন, গণচীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির গঠন, ন্যাপের ভাঙ্গন এবং সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি সমর্থন, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী, ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার দাবী, বাংলাদেশ হওয়ার পর আওয়ামী লীগের স্বৈরাচার এবং ভারত ও রাশিয়ার শোষণ-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, দুর্ভিক্ষের পূর্বে ভুখা মিছিল সংগঠিত করা, আওয়ামী লীগের পতনের পর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ, ফারাক্কা মার্চে নেতৃত্ব প্রদান প্রভৃতি অসংখ্য আন্দোলন ও সংগ্রামে মওলানা ভাসানী এদেশের শোষিত-নিপীড়িত জনসাধারণের সঙ্গে ছিলেন।

মওলানা ভাসানী কম্যুনিস্ট ছিলেন না, যদিও কম্যুনিস্ট চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকাংশই তাঁর ভেতর ছিলো যে কারণে তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কম্যুনিস্টদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। কম্যুনিজমকে

www.pathagar.com

পছন্দ করতেন না তিনি একটি মাত্র কারণে—'তারা ধর্ম মানে না' বলে। মাও সেতুঙ ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের অভাবনীয় সাফল্যে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই বিস্ময় ও মুগ্ধতা এবং এদেশের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ কারণেই সম্ভব হয়েছিলো যে, তিনি আন্তরিকভাবেই শোষণহীন সমাজের কথা ভেবেছিলেন। গোটা উপমহাদেশে তাঁর সমসাময়িক বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতাদের আর কারো ভেতরই মেহনতি মানুষের জন্য এই দরদ ছিলো না। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে যখন তাঁর দল ক্ষমতায় গিয়েছে, যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা শোষিত মেহনতি মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়, তখনই তিনি তার বিরোধিতা করেছেন—তা সে আসাম মুসলিম লীগের সাদুল্লাহ্‌র মন্ত্রীসভা হোক কিম্বা যুক্তফ্রন্টের ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা হোক অথবা আতাউর রহমানের আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীসভাই হোক।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি এমন সব রাজনৈতিক দলে অবস্থান করেছেন শ্রেণীচরিত্রের কারণে যাদের দ্বারা জনগণের প্রকৃত সমস্যার সমাধান এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই দলগুলো শুধু শোষকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে, কারণ তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই এগুলো গঠিত। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট বা আওয়ামী লীগ প্রভৃতি সংগঠন ক্ষমতার বাইরে যখন ছিলো তখন জনগণকে সকল প্রকার দেশী-বিদেশী শোষণ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার জন্য জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে সহস্র লক্ষ প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই ভক্ষক হয়েছে। ইতিহাস কখনো প্রতারিত করে না। এই শতাব্দীর ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে পরশ্রমজীবী জমিদার মহাজন বা কলকারখানার মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী নয়, সমাজের মূল উৎপাদক শক্তি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের সরকারই সত্যিকার গণতান্ত্রিক সরকার এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মওলানা ভাসানী নিজে কৃষক, শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের উপর থেকে সকল প্রকার শোষণের অবসান কামনা করলেও তাঁর দল সবসময় তাঁর সঙ্গে প্রতারিত করেছে, যেভাবে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এদেশের লক্ষ কোটি মেহনতি মানুষের সাথে। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর দলের দ্বারা যেমন প্রতারিত হয়েছেন আবার দলের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কম্যুনিস্টদের দ্বারাও সমানভাবে সমালোচিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

সমাজ বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, যার দ্বারা এদেশের লক্ষ কোটি মেহনতি মানুষকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যেতো। যুক্তি আর আবেগকে তিনি একই সমান্তরালে প্রবাহিত করেছেন। কখনও তাঁর বক্তৃতায় আবেগ বেশী থাকলেও সে আবেগ ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী বা শেখ মুজিবের মতো যুক্তিবর্জিত ছিলো না। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শেখ মুজিবের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় কোন যুক্তি ছিলো না, ছিলো আবেগ। সাম্রাজ্য-বদের কাছে আত্মসমর্পণের পথ খোলা রেখেই তিনি সেই বক্তৃতায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন; স্বাধীনতা সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী দিতে পারেন নি। কিন্তু মওলানা ভাসানী একই পরিস্থিতিতে বলেছিলেন, ‘আমার পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন নয়। পরাধীন। কারণ ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগস্ট আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি মাত্র। কিন্তু স্বাধীনতার আস্বাদ পাই নাই। পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৮ জন মানুষ শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থার দরুন শোষিত নয়, রাজনৈতিক সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও শোষিত এবং ধিকৃত। এই অপ্রিয় সত্যকে রূপান্তরিত করিতে আমরা বিগত ২৩টি বৎসরে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইহাকে আমাদের দুর্বলতা মনে করিয়াছে। তাহারাও জানে পূর্ব পাকিস্তানীরা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে আজও পরাধীন। কিন্তু ইসলাম বিপন্নের জিকির এবং সংহতির ধুঁয়া তুলিয়া সব কিছু ধামাচাপা দিয়া চলিয়াছে। আমরা এইবার সব কিছু উন্মোচন করিয়া বিদ্রোহ করিব এবং স্বাধীন হইব।

‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদিগকে দুই প্রকার দুশমনের মোকাবেলা করিতে হইবে। প্রথমটি হইল পশ্চিমা প্রতিরোধকারী মহল। দ্বিতীয়টি হইল পূর্ব পাকিস্তানেরই বিশ্বাসঘাতক কিংবা সুবিধাবাদী মহল। বিশ্বাসঘাতকেরা গোড়া হইতেই আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ করিবার চেষ্টা কারিবে। আর সুবিধাবাদীরা স্বাধীনতাকামী সাজিয়া সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তিমুখর আন্দোলনের মোড় পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম প্রকারের শত্রুকে জান-মালের বিনিময়েই খতম করিতে হইবে। কারণ তাহারা ধস্তাধস্তিতে বিশ্বাস করে এবং বেনিয়াসুলভ কায়দায় যে কয়দিনই পারে লুটপাট করিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে। দ্বিতীয়ত দেশী গোষ্ঠী প্রতিরোধ করিতে স্বাধীনতা আন্দোলন সঠিক মূল্যবোধে উদ্দীপিত জনতার হাতে নেতৃত্ব দান করিতে হইবে।

www.pathagar.com

এই কাজ প্রতিযোগিতার নয়। ইহাতে দরকার শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের প্রভাবমুক্ত বলিষ্ঠ মানসিকতার।

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বরূপ সাম্য ও মুক্তির আদলে রচিত হইবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানী ইতিহাসের পাতায় সোনালী দিনের যোজনা করিবে।' (মাতৃভূমি, ২৩ জানুয়ারী ১৯৭১) সেই সময় মওলানা ভাসানীর চেয়ে এতখানি স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার কর্মসূচী দেয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় দালালদের নেতৃত্বে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে ঠিক তাই হয়েছে। ঠিক এ কারণেই তিনি স্বাধীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রকাশ্য-ভাবে সর্বপ্রথম বলেন, 'পতাকা বদলের স্বাধীনতা ছাড়া এ স্বাধীনতা জনগণের জীবনের প্রান্তে অধিকতর দুঃখ ছাড়া আর কি আনিয়া দিতে পারিয়াছে। ..জনগণের সুখ শান্তির আশা দেশী ও বিদেশী লুটেরাদের উচ্চা-ভিলাষের বানে ভাসিয়া গিয়াছে। এই দেশীয় লুটপাট সমিতি গ্রামের টাউট হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অবধি ভারতীয় বেনিয়া ও ভারত সরকারকে এবং বিদেশী শক্তিকে অবাধে লুটপাট করিবার সুযোগ করিয়া দিতেছে। গ্রামের জোতদার বদমায়েস মহাজন, অসৎ পরশ্রম-জীবী শোষকদের অত্যাচারে যুগ যুগান্তের শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া এই অসহ্য পাষাণের চাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কৃষক জনতা মরিয়া হইয়া সংগ্রাম শুরু করে। প্রধান মন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল লোক এবং তাহার আস্কারা পাইয়া তাহার চ্যালাচামুণ্ডারা এই শোষিত মানুষদের বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, প্রতিকারে উদ্যোগী না হইয়া, নকশাল বলিয়া সব দায়িত্ব চুকাইতে চাহে। এই নির্যাতিত কৃষক শ্রমিকদের নকশাল বলিয়া অভিহিত করার পর নকশালদের দেখা মাত্র গুলী করিবার নির্দেশ দিয়া প্রধান মন্ত্রী জনতার দরবারে ক্ষমাহীন অপরাধ করিয়াছে। রাশিয়া সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে দিয়া এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপানকে দিয়া বাংলাদেশের উর্বর ক্ষেত্রে শোষণের বীজ বপনের কাজ শুরু করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াও বাংলাদেশ আবার ইহাদের খপ্পরে পড়িয়াছে সরকারের মেহেরবানীতে। এক পয়সা দান বা ঋণ দিয়া যাহারা ৭০ পয়সার ফায়দা লুটিতে চায় সাম্রাজ্যবাদীরা সেই বেনিয়া। ইহাদের হাত হইতে দূরে থাকার চেষ্টা থাক বরং মুজিব সরকার ম্যাকনামারা, কিসিঙ্গারের প্রতি আহ্লাদ

www.pathagar.com

দেখাইয়া মান অভিমানের পালা চুকাইয়া জবর পীরিতিতে মাতিয়াছে। পাকিস্তানকে ২৪ বৎসরে ২৩০০ কোটি ঋণ গিলাইতে সাম্রাজ্যবাদীরা সফল হইয়াছিল। বাংলাদেশকে আমেরিকা ৫ বৎসরের মধ্যে ৩৩০০ কোটি টাকার ঋণ গিলাইবে বলিয়া শুনা যইতেছে।' (আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ ওয়াদা ভঙ্গের এক অতুলনীয় নজীর ঃ মওলানা ভাসানী, টাঙ্গাইল, জুলাই ১৯৭২)

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল সম্পর্কে মওলানা যে কথা বলেছিলেন ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের আগে এদেশের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদেরও অনেকে সেটা বুঝতে পারেন নি। বাস্তব ঘটনাবলীকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং জনগণের গভীরে অবস্থানের কারণে মওলানা ভাসানী আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরাচারের যুগে ভারত-রাশিয়ার শোষণ নিয়ন্ত্রণের কথা যেভাবে বলেছেন ঠিক একইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও জনগণকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন।

মওলানা ভাসানীর ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবন যদি সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে সেখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বিধৃত হবে উপমহাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনগণের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারাবাহিক চিত্র যা এদেশের জনগণের সকল প্রকার দেশী-বিদেশী শোষণ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা জোগাবে।

যতদিন এই উপমহাদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটবে ততদিন মওলানা ভাসানী এই অঞ্চলের মেহনতি জনগণের সংগ্রামে অকৃত্রিম সহযোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

www.pathagar.com

আবদুল মতিন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রসঙ্গে

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ প্রসঙ্গে কিছু লেখা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করার মতই কঠিন। তবু সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন বিশ্লেষণ করতেই হবে তেমনি সেই সমাজ থেকে উদ্ভূত তার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদকেও বুঝতে হবে। আমার বর্তমান প্রয়াসটা তাই।

আমাদের দেশে রাজনীতির প্রধান স্রোত তিনটি ঃ ১. আমলা ও সামন্ত মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের, ২. পেটি বুর্জোয়াদের, ৩. শ্রমিক শ্রেণীর। প্রথমটি দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির উচ্ছেদের লক্ষ্যবস্তু (target)। এখানেই দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ঐক্য, আবার বিরোধও এখানেই। দ্বিতীয়টির প্রধান রাজনীতি-বিদ তথা মুখপাত্র মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমাদের তথা তৃতীয়টির সম্পর্কও ঐক্য ও সংগ্রাম। ঐক্যের ক্ষেত্রে অনেক সময় ঐক্য করা ভুল, অনেক সময় ঐক্য না করা ভুল, সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই। নীতিহীন ঐক্য ভুল, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থা সত্ত্বেও ঐক্য না করা ভুল।

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ১৯৪৭ সাল ও তার পরবর্তী কয়েক বছর (১৯৫৬ পর্যন্ত) প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শভিত্তিক থাকলেও ১৯৫৬-এর পর থেকে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ ১০ বছর পরেই কেবল এবং তাও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রভাবে মোটামুটি শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির সূচনা হয়। তারপর ১১ বছরে সেই সূচনার স্তর আমরা অতিক্রম করতে পারি নি।

১৯৪৭ সাল থেকে '৫৬ সালের মধ্যে পেটি বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও তার সাথে রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে। এই রাজনৈতিক বিকাশে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ও অবদান সবচেয়ে বেশী।

www.pathagar.com

পেটি বুর্জোয়াদের প্রকৃত বিজয়ের সূচনা হয় ১৯৫২ সালে ভাষার দাবীতে আন্দোলনে বিজয় থেকে। মওলানা বা শেখ মুজিবুর রহমান বা তাঁদের পার্টি আওয়ামী লীগ এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন না। কিন্তু এই সংগ্রাম সম্পর্কে মওলানা ভাসানী ও শেষ মুজিবুর রহমান সচেতন ছিলেন। ১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সংগ্রাম শুরু হয় এবং এই আন্দোলনের অন্যতম একজন নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু এই আন্দোলন সূচনার লগ্নেই শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোষের পঙ্কিলে তা তলিয়ে যায়। এরপর আর আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমান ভাষার জন্যে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন না। বরং তখন তাঁরা এই আন্দোলনের বিরোধীই হয়ে উঠেছেন। প্রমাণ—১৯৪৮ সালের মার্চের পর থেকে (অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আপোষের পর) ১৯৫২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তাদের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা, নীরবতা, ভাষার দাবীতে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ যখন ব্যাপকভাবে ছাত্রদের সচেতন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তখনই কেবল, তাও নিজেদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার হীন উদ্দেশ্যে মনি সিংদের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ সর্বদলীয় হওয়া; ২০শে ফেব্রুয়ারী সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক এক মাস আগে আহূত ছাত্র সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ ভবন ঘেরাও সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী সম্পর্কে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্তের আকারে বিরোধিতা, ২১শে ফেব্রু-য়ারী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গুলী চালানো ও বরকত-সালামদের হত্যার প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারী হরতাল পালন এবং শোভাযাত্রা ও গায়েবী জানাযার সমর্থনে প্রচারপত্র বিলিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বিরোধিতা, ২৩শে ও ২৪শে'র সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

১৯৫২ সালের সার্থক সংগ্রামের পরিণতিতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জনগণ থেকে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২ সালের দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে ১৯৫৪ সালে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল মাত্র। ১৯৭১ সালে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় সেই রোগী মৃত্যুবরণ করেছিল।

১৯৫৪ সালে পেটি বুর্জোয়াদের জোটের কাছে শাসকরা নির্বাচনে শোচনীয়-ভাবে পরাজয় বরণ করলো। বুর্জোয়াদের লেজুড় কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব

www.pathagar.com

শ্রেণী ভূমিকা বিসর্জন দিয়ে পেটি বুর্জোয়াদের বিজয়কে পূর্ণাঙ্গ করেছিল। মওলানা ভাসানী কর্মীশিবিরে সংগঠিত কর্মীদের সংগ্রামের জন্যে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনি সিংরা আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীকে সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত করেছিল।

এর পরই ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম অঙ্গদল আওয়ামী লীগ সাম্রাজ্যবাদের সাথে যোগসাজশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রণ্ট বিজয়কে কবর দিয়েছিল। মওলানা ভাসানী এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরোধিতা করার জন্যেই এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীদের সাথে আওয়ামী লীগের আপোষের কারণেই আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আহূত কাগমারী সম্মেলনের বিরোধিতা করেছিল। গান্ধী, মতিলাল, নেহরু প্রমুখের নামে তোরণ করা এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলার জন্যে আওয়ামী লীগ মওলানা ভাসানীকে ভারতের চর ও পাকিস্তানের দুশমন বলে আখ্যায়িত করেছিল। সেই আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সেই নেতৃত্বই ১৯৭১-এর অনেক আগে থেকেই ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোষ, চক্রান্ত ও নির্ভরতার মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। ১৯৬৬ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে আওয়ামী লীগের কি ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা কারো অজানা নয়। অথচ মওলানা ভাসানী তখন সমস্ত দেশব্যাপী জনসভা করে ঐ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও হামলাকারীকে নিন্দা করে দেশবাসীকে সচেতন করেছিলেন। এর পরই আগরতলা ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইতিহাস এখনও অনুদ্‌ঘাটিত। তবে এটাও যে বৃহৎ ষড়যন্ত্রেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এই ষড়যন্ত্রে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নায়ক। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচটি বছরের আগে একথা কেউ ধারণাও করতে পারে নি। অক্‌টোবর বিপ্লব-এ লেনিনের কি অপরিসীম প্রভাব যে এই উপমহাদেশে ১৯৭১-এর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে, রাশিয়া এতখানি হীন ও জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী। আজও ভারত-বাংলাদেশের প্রগতিশীলের মুখোশধারী অনেক বিপ্লবী বলতে পারে যে, রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ নয়। রুশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে বিরোধ সত্ত্বেও বহু অপকর্মের মত এসব ক্ষেত্রে দোসর ও সহযোগী ছিল মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ।

বর্তমান দুনিয়াটা দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে ভাগাভাগি করে লুটেপুটে খাচ্ছে এবং তার জন্যে কখনও আপোষ কখনও সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে তার

www.pathagar.com

রূপগুলো সম্পর্কে, তার ধরন ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যারা কম্যুনিস্ট বলে দাবী করি তারা যে কত অজ্ঞ, কত মূর্খ, কত সরল তা '৭১ সালে ও পরবর্তীকালে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রতীয়মান ও প্রমাণিত হওয়ার পর অকপটে স্বীকার করাই ভাল।

সাম্রাজ্যবাদ একটা ব্যবস্থা যা ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও মুমূর্ষু অবস্থা, যে অবস্থায় সে মরিয়া, হিংস্র এবং নিজের প্রাধান্য ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত কিন্তু সব কিছু করতে অক্ষম এটা অনেক সময়ই আমাদের উপলব্ধিতে থাকে না। এ বিষয়ে আমরা মাও সে তুঙের চিন্তার পুরোপুরি অনুধাবক নই এবং সেই কারণে চীন ও বর্তমান দুনিয়া বুঝি না, সাম্রাজ্য-বাদ ও তাদের চরিত্র এবং কলাকৌশলও বুঝি না।

মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য-বাদের চরিত্র তাঁর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখেই মাত্র বিচার করতে পারেন। এখানে মওলানা সাহেবকে বড় করতে চাওয়া প্রকারান্তরে তাঁকে ছোটই করা। সাম্রাজ্যবাদের সাথে চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কম্পোচিয়া, লওস, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জনগণের মত সরাসরি সংগ্রামে তথা দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত না থাকার কারণে আমাদের মতই মওলানা ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কে উপলব্ধিতে কমতি ছিল। তবু তিনি উপলব্ধি করতেন সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির প্রধান দুশমন। আমাদের মত আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদ তাদের সব কিছু করে তাদের 'আদর্শ, অর্থ ও লোক' দ্বারা। এই লোকেরা আবার একটি বিশেষ শ্রেণীর। শ্রেণী বলেই তাদের থাকে শ্রেণী চরিত্র এবং শাসক শ্রেণী হিসেবে তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রযন্ত্রের থাকে তাদের সহযোগী শ্রেণী এবং বিরাট ও পরাক্রমশালী এবং ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটা আমলা বাহিনী।

অত সব মিলিয়ে এবং অত সবের সাথে সম্পর্কিত যে সাম্রাজ্যবাদ তাকে বোঝা এবং তার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম করা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন ব্যাপার। আমাদের মত আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদ সব কিছু করে তাদের সাথে সম্পর্কিত ও তাদের ওপর নির্ভরশীল ধনিক ও আমলাদের দ্বারা যাদের বলা হয় মুৎসুদ্দী, আমলা-ধনিক। এই ধনিকরা আবার পুতুলও না যারা প্রতিনিধিত্ব করে কেবল সাম্রাজ্যবাদীদের তথা বিদেশী ধনিকদের বরং এই ধনিকরা নিজেদের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এই ধনিকদের

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের সাথেও দ্বন্দ্ব থাকে। তবে জাতীয় ধনিকদের তুলনায় এই ধনিকদের সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্বও দুই প্রকৃতির। মওলানা ভাসানী নিজস্ব শ্রেণীগত কারণে এই দুই প্রকৃতির ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের দুই প্রকৃতির দ্বন্দ্বকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলতেন। এ বিষয়ে আমরাও কি ত্রুটি-মুক্ত? এই কারণে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জয়যুক্ত না হওয়ার কারণও এখানেই।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মকাণ্ড মূলত রাষ্ট্রবিষয়ক তথা রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যাপার। মওলানা ভাসানীর মুৎসুদ্দী-আমলা-ধনিক ও জাতীয় ধনিকদের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিভ্রান্তির কারণে তিনি অনেক সময় এমন শ্রেণী তথা শ্রেণীর লোকদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করতেন যারা প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নয়, যেমন আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হওয়ার কারণে তিনি এক সময় যাদের সমর্থন করতেন তাদের সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষের কারণে অন্য সময় তাদের বিরোধিতাও করতেন। জনসাধারণ এই কারণে বলতেন, 'মওলানার মতের ঠিক নেই, তিনি কেবল সকলের বিরোধিতা করেন।' রাষ্ট্রক্ষমতায় এই বা ঐ বুর্জোয়াদের অধিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে তাদের সাম্রাজ্যবাদের আরো পক্ষপুট হওয়ার কারণে তাঁর বিরোধিতায় জনগণ বলতেন, 'মওলানা কখনো নিজে ক্ষমতায় যেতে পারে না; কিন্তু সমালোচনার বেলায় ঠিক আছেন।' জনগণের সমস্ত সমালোচনা দ্বন্দ্বমূলক, তাই মওলানার মৃত্যুতে তাঁরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানে বিরাট এক রাজনৈতিক শূন্যতা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

এবার আমরা আর একটা প্রাসঙ্গিক জটিল বিষয় এবং তাতে মওলানা সাহেবের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। সেটা হলো আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা পরিপূর্ণ সামন্তবাদী (যদিও Mara-এর কথায় এশীয় ধরনের) থেকে আধা-সামন্তবাদীতে রূপান্তরিত হতে থাকে একটি বিদেশী ধনবাদী দেশ কর্তৃক আমাদের দেশ দখল হওয়ার পর থেকে। ধনিকদের (বুর্জোয়াদের) দখলের ফলে আমাদের অর্থনীতিটা রূপান্তরিত হলো সামন্তবাদ থেকে আধা-সামন্তবাদে। ফলে সমাজটা হয়ে দাঁড়াল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্তবাদী থেকে আধা-সামন্তবাদী হওয়ার কারণ অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং সেই পুঁজির এদেশীয় দালাল তথা সহযোগী হিসেবে মুৎসুদ্দী-ধনিকদের উদ্ভব। ইতিপূর্বে জমির মালিক ছিল রাষ্ট্র, যদিও দখলী এবং কায়েমী স্বত্ব ছিল জমির উৎপাদক কৃষকরা। এই কৃষকরা রাষ্ট্র তথা তার প্রতিনিধিদের দিতেন নির্দিষ্ট অংশ। বিদেশী ধনিকরা এই ব্যবস্থার পারবর্তে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে জমিদারদের করে দিল জমির মালিক, যারা তাদের মালিকানাধীন জমির উৎপাদক কৃষকরা নির্দিষ্ট খাজনাও দেয়, না দিলে উচ্ছেদ করতে পারত সেই সব কৃষককে। জমির উপর হস্তান্তর-যোগ্য মালিকানা এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সামন্তবাদের পরিবর্তে বুর্জোয়াদের হওয়ায় সামন্তবাদী ব্যবস্থা রূপান্তরিত হলো আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায়। কৃষকরা বুঝতে পারল জমির ওপর তাদের যুগ যুগান্তরের দখলী স্বত্বমূলক ব্যবস্থাটা বিদেশী শাসকদের নতুন ব্যবস্থায় মূল্যহীন একটা ব্যাপার যা নতুন ব্যবস্থায় নির্ধারিত হয় জমির ওপর আরোপিত মালিকানা স্বত্ব দ্বারা এবং যে মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী। ঐ নতুন ব্যবস্থা কৃষকদের মধ্যে সৃষ্টি করলো সংগ্রামের অবস্থা। কৃষকদের সংগ্রামের দাবী হয়ে উঠতে লাগল জমির মালিকানাভিত্তিকরূপে।

তত্ত্বগতভাবে এখানে যে প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয় তা হলো—আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা, সামন্তবাদ ও বিশ্ব পুঁজিবাদ (পরে এ ব্যবস্থারই সর্বোচ্চ স্তর সামন্তবাদ) উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সামন্তবাদী ব্যবস্থার (এশীয় ধরনের) মধ্যে বিশ্ব পুঁজি-বাদের অনুপ্রবেশ ও অবস্থান এই আধা-সামন্তবাদী নতুন ব্যবস্থার জন্মদাতা। আধা-সামন্তবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদ (পরে এই অবস্থারই সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদী) ও সামন্তবাদ অর্থাৎ দুই উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ কালে সাম্রাজ্যবাদের (বিশ্ব পুঁজিবাদের) প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণেরই মাত্র অবসান হয়েছিল এবং স্থানে স্থানে সাম্রাজ্যবাদের অপ্রত্যক্ষ শোষণ ও শাসন কায়েম হয়েছিল। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় আধা-ঔপনিবেশিকতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে সেই অপ্রত্যক্ষ শোষণ ও শাসনের রূপের পরিবর্তন হলেও আধা-ঔপনিবেশিকতা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের পুঁজির শোষণ পূর্ণমাত্রায় বহাল আছে অর্থাৎ এখনও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন জনগণের জন্যে উচ্ছেদের তথা বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এবং এই কারণে ১৯৪৭-এর আগের মতো আধা-সামন্তবাদের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সামন্তবাদ (সামন্ত শোষণ) ও সাম্রাজ্যবাদ পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল। আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা—একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক অবস্থান, আর আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা--একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থান। এই কারণে একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থান। এই কারণে একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে সামন্তবাদী (আধা-সামন্তবাদী) ব্যবস্থার উচ্ছেদ না করে সেই দেশের সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে উচ্ছেদ করা যায় না। এই কারণে এই রকম দেশে আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের উপর আঘাত কোন আঘাতই হয় না যতক্ষণ না আধা-সামন্তবাদকে আঘাত করা হয় অর্থাৎ এ রকম দেশে আধা-সামন্তবাদ উচ্ছেদ করেই কেবল দেশকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উদ্ধার করা এবং সাম্রাজ্যবাদকে পরিপূর্ণভাবে পরাস্ত করা সম্ভব।

একটি উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থান আধা-সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংরক্ষিত। একটি নয়া উপনিবেশেও তাই, একটি আধা-ঔপনিবেশেও তাই। কারণ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্যেই একটি উপনিবেশ, নয়া উপনিবেশ বা আধা-ঔপনিবেশের অর্থনৈতিক চরিত্র হয় আধা-সামন্তবাদী অর্থাৎ উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশ মাত্রেই সামাজিক, অর্থনৈতিক চরিত্র হয় আধা-সামন্তবাদী। পক্ষান্তরে, একটি দেশ উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ এবং নয়া-উপনিবেশ হয় সেই দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানের দ্বারা।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় কৃষকরা পেটি বুর্জোয়া নয়, তারা ভূমিদাস বা রাষ্ট্রের কাছে উৎপন্নের অংশ হিসেবে করদাতা। কেবল আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় অর্থাৎ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের তথা তার পুঁজির অবস্থান আছে এবং পুঁজিবাদী দেশ অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষকরা পেটি বুর্জোয়া। এ কারণে আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে বাহ্যত সামন্তবাদী বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। কিন্তু আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সমস্ত উৎপাদন সম্পর্কই প্রধান। আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি-বাদী বৈশিষ্ট্য, পুঁজিবাদী উৎপাদক সম্পর্ক প্রধান হলে সে ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী—তখন আর তা আধা-সামন্তবাদী নয় তখন সেটা হয় পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা সমাজ বা দেশ আর আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা

www.pathagar.com

বা সমাজ বা দেশের মধ্যে থাকে মৌলিক তফাৎ। আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা বা সমাজ বা দেশ আর সামন্তবাদী ব্যবস্থা বা সমাজ বা দেশের মধ্যে বিরাট তফাৎ থাকে কিন্তু মৌলিক তফাৎ থাকে না—সে তফাৎ হয় পরিমাণগত। আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা যখন মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয় তখন তা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী।

তাহলে আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কৃষকদের যখন ভূমিদাস বা রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের একটি অংশরূপে করদাতা কৃষক (যেমন বৃটিশপূর্ব অবিভক্ত উপমহাদেশে ছিল) না বলে পেটি বুর্জোয়া বলা হয়। কারণ সামন্তবাদী (তা যে কোন রূপেই হোক) ব্যবস্থায় কৃষকরা কখনও জমির মালিক না—মালিক হলো সামন্ত ভূস্বামী বা রাষ্ট্র। আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কৃষকরাই জমির মালিক। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি বৃটিশ আমলে কৃষকরা জমির মালিক ছিল? বৃটিশ পুঁজির অবস্থানে, জমির ওপর মালিকানা স্বত্বই কেবল স্বীকৃত হয় নি (যদিও তা ছিল কেবল বৃটিশ-সৃষ্ট জমিদারদের মালিকানা স্বত্বরূপে), জমি পণ্যও হয়ে গেছে যদিও জমির পণ্যরূপ বিকশিত হয়েছে অত্যন্ত ধীরে এবং বিলম্বে। এটাই হলো পুঁজিবাদের মহান বিপ্লবী অবদান। কিন্তু বিদেশী পুঁজি সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে না, তাকে কেবল আধা-সামন্তবাদে রূপান্তরিত করে।

তাই আধা-সামন্তবাদ বিলুপ্ত হলেই অর্থাৎ সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক বিলোপ হলেই দেখা দেয় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক। এ কারণে ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের পর পুঁজিবাদের বিকাশ না হয়েও এবং ব্যবস্থা পুঁজিবাদী না হয়েও প্রধান দ্বন্দ্ব হয়েছিল বুর্জোয়ার সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

মাও-সে-তুঙ চীনের কৃষক আন্দোলনকে যথার্থভাবেই মূল্যায়ন করেছিলেন 'আধা-ঔপনিবেশিক কৃষক আন্দোলন' হিসেবে। এ কারণে মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার নেতৃত্বে আধা-ঔপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী সমাজে কৃষি-বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পেরেছিল। উপনিবেশেও কৃষি-বিপ্লব হয় এবং প্রধান থাকে সাম্রাজ্যবাদ। আধা-উপনিবেশে কখনও সাম্রাজ্যবাদ কখনও সামন্তবাদ হয় প্রধান। কিন্তু কি উপনিবেশ, কি আধা-উপনিবেশ সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আধা-সামন্তবাদী হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান থাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা আধা-সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। তাই আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ বা বিলোপ না করে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ বা বিলোপ করা যায় না।

www.pathagar.com

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুঁজিবাদীদের তথা সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে আধা-সামন্তবাদের রূপান্তরে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও জাতীয় পুঁজিবাদের মধ্যে কি রকম জট পাকিয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক কর্মসূচী তথা করণীয় পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে যায়।

আমাদের দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির এ রকম জট পাকানো অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা এবং উচ্ছেদের সংগ্রাম যে কত জটিল এবং অনিবার্যভাবে সশস্ত্র রূপ ধারণ করে বা করবে তা আমরা উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারবো। মওলানা ভাসানী আমাদের দেশের জটিল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণমূলকভাবে অনুধাবন না করে সারা জীবন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি সমাজ পরিবর্তন করতে পারেন নি। তাঁর সমাজ পরিবর্তনের মহান আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সে পরিবর্তনের জন্যে সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পদ্ধতি তাঁর আয়ত্তে ছিল না।

সান-ইয়াৎ সেনের সমাজ পরিবর্তনের মহান আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু তিনিও সমাজ পরিবর্তন করতে পারেন নি। সমাজ পরিবর্তনের জন্যেই তিনি রাশিয়া ও কম্যুনিস্টদের সহযোগিতা করেছিলেন। মওলানা ভাসানীও চীন (রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ার আগে রাশিয়াকেও) এবং কম্যুনিস্টদের সহযোগী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। এদেশের কম্যুনিস্টরা সঠিকভাবে সমাজ বিশ্লেষণ করতে এবং তা পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী, কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন নি। সেটা কম্যুনিস্টদের ত্রুটি এবং দুর্বলতা। এ সম্পর্কে মওলানা সাহেবের ত্রুটি ও দুর্বলতা ভিন্ন প্রেক্ষিতের। তবু এই ত্রুটি এবং দুর্বলতার কারণে সমাজ পরিবর্তনের মহান আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রধানত সংস্কারবাদীই থেকে গেছেন। মওলানা ভাসানী-সহ সকল বিপ্লবীর সমাজ পরিবর্তনের জন্যে পথ দেখানোর দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে এদেশের মার্কসবাদীদের। তারা সে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন? কেবল মওলানা ভাসানীকে দোষারোপ করে আমরা ইতিহাসের কাছে রেহাই পেতে পারি না। পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানী ইতিহাসের কাছে উৎরে গেছেন; কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শীরা এখনও উৎরাতে পারে নি।

www.pathagar.com

নূরুল ইসলাম উয়ায়সী

ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা ভাসানী

নিখিল বিশ্ব তথা সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও বিচার দিনের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। অতএব, আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রদর্শিত মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের উৎস ধর্ম ও মুক্তির পথও একটাই। আর তা হলো ইসলাম। আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রথম সৃষ্টিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর প্রেরিত নবী-রসূল এবং তাঁদের অনুসারী মর্দে মুমিনদের দ্বারা ইসলাম প্রচার ও প্রয়োগ জারি রেখেছেন, ভবিষ্যতেও রাখবেন। শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সময় ইসলামের প্রচার ও প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ পাক 'আল উয়াত্তমো আকমালতু লাকুম দীনুকুম' অর্থাৎ 'আজ তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করা হলো' এই ঘোষণায় তা প্রকাশ করেছেন। এই পটভূমির প্রেক্ষিতেই ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা ভাসানীর ধ্যান-ধারণা, কর্মকাণ্ড ও আজীবন সাধনার মূল্যায়ন করতে হবে।

মওলানা ভাসানী একজন বিশিষ্ট আলিম, মারেফাতের শেখ বা বুযূর্গ ওলী আল্লাহ্ এবং প্রখ্যাত শক্তিধর রাজনীতিবিদ। হযরত মুহম্মদ (স.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পর জগতে একই ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি গুণের একত্র সার্থক সমাবেশ খুব কমই দৃষ্ট হয়। উমাইয়াদের আমলে যখন খালেস লিল্লাহিয়াত ও খিদমতে খাল্ক-এর রব্বানী প্রক্রিয়া অবরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন ইসলামের মহান ধর্মীয় নেতা হযরত রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) আপোষে খিলাফতের দাবী ত্যাগ করে দীন ইসলামকে জিন্দা রাখার সর্বাত্মক সাধনায় লিপ্ত হন। তাতেও তিনি রেহাই পান নি। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার

www.pathagar.com

হয়ে জহরের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। তারপর হযরত ইমাম হোসেন (রা.) অন্য পথে অর্থাৎ জালিমের কাছে আত্ম-সমর্পণ না করে যুদ্ধে শাহাদত বরণের মাধ্যমে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার দ্বারা দুনিয়ার মর্দে মুমিনদের জন্য মহান প্রেরণার উৎস এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বাদ' শ্লোগানের মধ্যে তার অম্লান আলোক-রশ্মি আজও ঠিকরে পড়ে। কারবালার ঘটনার পর মুসলিম জাহানে রাজনৈতিক হানাহানি এত বেশী হয়েছে যে, তা দেখে অমুসলমান ও কমজোর ঈমানের অধিকারী অনেক মুসলমানও ইসলাম সম্পর্কেই বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তাই বলে খালেস ও অটুট ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান মর্দে মুমিনগণ কিন্তু হাল ছেড়ে দেন নি। তাঁরা সর্বদা সর্বত্র জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিজ নিজ পরিবেশ, ক্ষমতা ও সুযোগমত বিভিন্নভাবে ইসলামী নীতিমালার প্রচার, প্রসার ও প্রয়োগের জন্য সব রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ বা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মওলানা ভাসানী এসব মর্দে মুমিন মুজাহিদদের মধ্যে এক অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

এটা লক্ষণীয় যে, এসব মর্দে মুমিন মুজাহিদ তথা ইমাম, মুজতাহিদ, দার্শনিক, ফকির, পীর ও ওলী-আল্লাহ্ সকলে একই উদ্দেশ্যে হলেও হুবহু একই পদ্ধতিতে জিহাদ বা সংগ্রাম করেন নি। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান ও শক্তি মুতাবেক ইসলামের এক এক বিশেষ দিককে আকর্ষণীয় করার মহান সাধনায় লিপ্ত হয়ে নিজ নিজ ক্ষমতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়েছেন। স্পেশালাইজেশনের কল্যাণকর দিকটিকে তাঁরা অবহেলা করেন নি। আবার অনেকে এই স্পেশালাইজেশনের ক্ষতি প্রয়োগের কুফল যাতে মুসলমান সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে সেদিকে নজর রেখেই স্বীয় জিহাদ বা সংগ্রামের পদ্ধতি স্থির করেছেন। মওলানা ভাসানী এই দ্বিতীয় দলের।

মওলানা ভাসানী একজন আলিম। তিনি মসজিদের ইমামতি বা শিক্ষকতা পেশাকে কখনও অবজ্ঞা করেন নি। ইমাম ও শিক্ষকগণকে সর্বদা সম্মান দেখিয়েছেন এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে শিক্ষার আলো বিস্তারে বিরাট অবদান রেখেছেন; কিন্তু নিজে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে শুধু খানকায় রওনক বৃদ্ধি করেন নি, তাঁর কাজে-কর্মে. বক্তৃতা-বিবৃতিতে ওলী-আল্লাহ্ পীর, মাশায়েখগণের প্রতি তাঁর অশেষ ভক্তি শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে তিনি মুসলমানগণকে ইলমে মারেফাত চর্চার

www.pathagar.com

উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু ইল্‌মে মারেফাত চর্চাই ইসলামী জিন্দেগীর ষোল আনা— এই ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ দেন নি। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সক্রিয় রাজনীতিবিদ ; কিন্তু ক্ষমতালোভী-স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শরিক হন নি। তাঁরই গড়া রাজনৈতিক দল যখন জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, নেতারা করেছেন বিশ্বাসঘাতকতা তখন তিনি চুপ করে বসে থাকেন নি। বজ্রকণ্ঠে তিনি সে সবের প্রতিবাদ করেছেন। সমালোচনার কষাঘাতে তাদেরকে করেছেন জর্জরিত। লিল্লাহি রাজনীতির এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ্‌র প্রতি অটল ঈমান রেখে কারোর মুখাপেক্ষী না হয়ে, কারোর সমর্থন বা বিরূপ মন্তব্যের তোয়াক্কা না করে সকল প্রকার ও সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, ন্যায়ের সংগ্রামে শরিক হবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উদাত্ত আহ্‌বান জানানোর মধ্যে আল্লাহ্‌র হুকুম 'যাহিদু বিল্লাহে হাক্কা জিহাদেহী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের মত জিহাদ করে যাও—এই হুকুম পালনের যে দৃষ্টান্ত মওলানা ভাসানী রেখে গেছেন তা ভবিষ্যতে মর্দে মুমিনদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা প্রকৃত মুসলমানের জন্য নয়।

অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে সুদূর আসামে গিয়ে পরবাসী হয়ে জলেশ্বর নিবাসী কাদেরিয়া তরিকার পীর শাহ নাসিরুদ্দীন (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা থেকে দীনি ইল্‌ম হাসিল করেন ; তাঁরই খিদমতে থেকে ইল্‌মে মারেফাত চর্চা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলায় পারদর্শিতা অর্জন মওলানা ভাসানীর ছাত্র জীবনের বহুমুখী প্রতিভা ও ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। তারপর কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি জমিদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে চারাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, চিলমারী ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি বড় বড় কনফারেন্স করে অতুলনীয় সাংগঠনিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। খোশনাদপুর বা সন্তোষের নিকট কাগমারীতে সমাহিত পীর শাহ জামানের বিস্তৃত ইতিহাস মওলানা ভাসানীই আবার জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি দুর্বার প্রজা-আন্দোলন গড়ে তোলেন জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেজন্য জমিদারদের কোপে পড়ে তাঁকে সাময়িকভাবে আসামে হিজরত করতে হয়। সেখানেও তিনি একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালান এবং অন্যদিকে কুখ্যাত 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনও গড়ে তোলেন। বাংলার যেসব ভাগ্যাহত

www.pathagar.com

চাষী জন্মভূমি পরিত্যাগ করে আসামের জঙ্গলে গিয়ে সাপ, বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে অনাবাদী ভূমি আবাদযোগ্য করে তোলে 'লাইন প্রথা'র মাধ্যমে তাদেরকে বিতাড়িত ও তাদের উপর অকথ্য জুলুম করার মত বর্বরতাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তারপর আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে পাকিস্তান অর্জনের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট অবদান রাখেন। পাকিস্তান অর্জনের প্রাক্কালে তিনি আবার বাংলায় এসে কাগমারীতে অবস্থিত পীর শাহ জামানের মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে পীর শাহ জামানের মিশনকে সফল করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বাংলা তথা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তিনি প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও তারপর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন এবং সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দান করে রাজনীতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে হুকুমাতে রব্বানী সমিতি, খোদাই খিদমতগার প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে দেশে সৎ, নিষ্ঠাবান ও খাঁটি সেবাধর্মী রব্বানী নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান।

নানা কারণে এসব প্রচেষ্টা আশানুরূপ সফল হয় নি, একেবারে বিফলও হয় নি। এসবের দ্বারা তিনি ইসলামের প্রচার, প্রসার ও জনসেবার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার তুলনা হয় না। তবু স্বীকার করতেই হয়, এসবের দ্বারা মওলানা ভাসানীর আকাঙক্ষা পূরণ হয় নি। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন। সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা ও ইল্‌মে লাদুন্নী সম্পৃক্ত জ্ঞানের আলোকে জীবনসায়াহ্নে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, একক প্রচেষ্টা যত আন্তরিক, যত দক্ষতা ও শক্তিপূর্ণই হোক না কেন, সমাজের অন্যায়, অনিয়ম, অত্যাচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনাকে রোধ করার জন্য খিদমতে খাল্‌কের রব্বানী প্রক্রিয়াকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তা মোটেই যথেষ্ট নয়। সেজন্য প্রয়োজন ইসলামের সার্বিক উপলব্ধি ও অভ্যাস আত্মস্থকারী সুশৃঙ্খল ও বিশাল কর্মী বাহিনীর। মওলানা তাই তাঁর ধ্যানধারণার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছেন। আর মওলানার স্বপ্ন অলস কল্পনা নয়—জিহাদী মননশীলতার প্রতিফলন।

মওলানা তাই দেশের জ্ঞানী-গুণীকে সমবেত করে বক্তব্য-বিবৃতিতে তাঁর এই স্বপ্নের কথা, তাঁর কল্পলোকের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখার কথা দেশবাসীকে জানিয়েছেন। সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্বরূপ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করে গেছেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

অঙ্গনেই স্বীয় মাজার স্থাপনে ওসিয়ত করে সেখানে মৃত্যুর পরেও সমাধিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের তাগিদ জারি রেখেছেন। সরকার বিলম্বে হলেও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করে ও অতি সম্প্রতি সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ হলে ধর্মীয় নেতা মওলানা ভাসানীর অবদান ও দূরদর্শিতা উপলব্ধি করা আরও সহজ হবে।

প্রসঙ্গত মওলানা ভাসানীর পরিকল্পিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য আমরা স্মরণ করতে পারি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পড়ানো হলেও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট দৈহিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তার ধর্মের মূল শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রদান করা হবে এবং ধর্ম পালনও বাধ্যতামূলক থাকবে। এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস, যথা : কাপড়, সব্জি, মাছ, মশলা, চাল ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নিজেরাই উৎপাদন করবে এবং বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিট সেই উৎপাদিত জিনিস থেকেই যথাসম্ভব নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করবে। শিক্ষাবর্ষের কিছু অংশে ছাত্রগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বা শিল্প এলাকায় হাতে-কলমে কাজ করবে। মওলানা সাহেবের আশা—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিগণ হবে হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-র মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রতিবাদকারী। হযরত আলী (রা.)-র ন্যায় জ্ঞানপিপাসু। গাজী সালাহউদ্দিনের মত মুজাহিদ এবং ইমাম হযরত আবু হানিফা (র.)-র ন্যায় শহীদ। চিন্তা ও কর্মে তারা হবে আত্মনির্ভরশীল; কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়। আত্মসচেতন কিন্তু অহঙ্কারী নয়। চাকরি না পেলেও তারা বেকার থাকবে না। তারা হবে সদাচারী, সরল জীবন যাপনকারী এবং কঠোর মানসিক ও কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মওলানা ভাসানী ইসলামের মৌলিক অবদানকে অবলম্বন করে সমাজ গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

নূরুল আলম রইসী

হুকুমাতে রাব্বানিয়ার স্বাপ্নিক ঃ মওলানা ভাসানী

নির্যাতিত মজলুম মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে অধিক। অথচ এদের পক্ষ নিয়ে কথা বলার লোক খুবই কম।

কবি-শিল্পী সকল দেশের সকল যুগের সম্পদ। সৃষ্টিকে নতুন করে অনুভবে ও উপস্থাপনায় তারা সজীব ও সমুজ্জ্বল। এদের কথা শাশ্বত সত্যের প্রতিধ্বনি, চিরনবীন। একজন একনিষ্ঠ দরদী জননেতার বেলাতেও একথা প্রযোজ্য। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মানুষ মহানবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (স.)-এর এই পরিচয়ই তো মুখ্য। মানুষের কল্যাণে নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি যে দেশেরই অধিবাসী হন, কর্মের ঐশ্বর্যে তিনি সার্বজনীন, শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয়।

মজলুম মানুষের দুঃখ বেদনায় সকাতর এক মনীষী ত্রিকালদর্শী মওলানা ভাসানী। ইংরেজ আমলে আসামে আরম্ভ তাঁর কর্মতৎপরতা। পাকিস্তান আমলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনা। বাংলাদেশেও তাঁর অনমনীয় কণ্ঠে ছিল বাঞ্ছিত ব্যথাতুর মানুষের অধিকার আদায়ের বজ্র-নির্ঘোষ উচ্চারণ। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এক আপোষহীন প্রত্যয়।

একটি প্রশ্ন ঃ নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর দরদী মনোভাবের উৎস কী?

কিছু মানুষ অন্যায় দেখলেই ব্যথিত হন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন না এমন লোকের সংখ্যা বেশী। কিন্তু যাঁরা ব্যথিত হন, প্রতিবাদে হন মুখর, গড়ে তোলেন প্রতি-রোধ তাঁরাই তো সত্যিকার দরদী, মহৎ প্রাণ। দেশ-কালের উর্ধ্বে তাঁরা মানবতার প্রতীক। স্বভাবজ এই বৈশিষ্ট্যে ধর্মীয় আবেগ ও দায়িত্ব চেতনা যুক্ত হলে সহস্র গুণে বৃদ্ধি পায় দৃঢ়তা। অবশ্য ধর্মীয় এই চেতনায় থাকতে হবে সার্বজনীন মানবপ্রেম ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত দু'টি বৈশিষ্ট্যে সচেতন অনুরাগী। নিপীড়িত মানুষের জন্য দরদ ছিল অকৃত্রিম। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক—এ ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যেখানেই মানুষ দুঃখে বিপদে নিপতিত মওলানা ভাসানী সেখানেই উপস্থিত। ব্যথিত মানুষের বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর। সহজ সরল জীবনের অভিলাষী। তাঁর পোশাক, খাদ্য ও বাসস্থান এই সত্যকেই স্পষ্ট করে তোলে।

যেদিকেই তাকানো যাক দুঃখী মানুষের আর্তপীড়িত মুখচ্ছবি, করুণ দৃশ্য। আর তার পাশে নানাভাবে সাধারণ মানুষের শোষণকারী ধনীদের বিত্তবেসাতি। আসামে বাংগালী মুসলিম সমাজের দুর্ভোগ এবং পরবর্তীকালে স্বদেশে জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর নানা অত্যাচার মওলানা ভাসানীকে ব্যাকুল ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। মজলুম ও অভাবী মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআনের বক্তব্যই যেন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল লিস সায়েলি ওয়াল মাহ্রূম—অর্থাৎ সম্পদশালীদের সকল সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রয়েছে।

এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মওলানা ভাসানী ছিলেন নির্ভীক ও নিরলস।

মওলানা ভাসানী কম্যুনিস্ট বা অমুক দেশের চর ইত্যাদি মন্তব্য প্রায়ই শোনা যেত। পত্র-পত্রিকাতেই এসব মন্তব্য থাকতো। মন্তব্যকারীদের অনেকেই শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। কিন্তু মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শুনলেই আমার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিত। তাঁর কণ্ঠে নিপীড়িত মানুষের কথা শুনে আমার মনে হতো এসবই তো ইসলামের কথা। মানবতা প্রতিষ্ঠার শপথ। মহানবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (স.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু যর গিফারী (রা.) প্রমুখ সত্যিকার মানব দরদীদের বক্তব্যই তাঁর ঘোষণায়। ব্যক্তি জীবনের সারল্যও তারই প্রমাণ বহন করে। তবু কেন তিনি কম্যুনিস্ট বলে আখ্যায়িত সঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত! কেন তিনি বারবার রাশিয়া ও চীনের প্রসঙ্গ টানেন!

প্রশ্নের উত্তর মিলেছে অনেক পরে। মূলত এই মনীষী ছিলেন বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদী। আর এই শ্রেণীর মানুষের মুক্তির

www.pathagar.com

আন্দোলনে ঐ দু'টি দেশ সমকালীন পৃথিবীতে তুলেছিল ব্যাপক আলোড়ন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক নানা কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজে ইসলামী চেতনার দারুণ অভাব। প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশ অন্যের পদানত, অপমানিত। এদেশেও ইসলামপ্রিয়দের ঐ একই কারণে ছিল না উল্লেখ-যোগ্য সংগঠন। ইংরেজ শক্তির প্রতি নানা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও সমাজের নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে এদের দ্বারা দুর্বার আন্দোলন স্থায়ী-ভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না।

মওলানা ভাসানী দেখেছেন এদেশে উৎপীড়িত মানুষের প্রাত্যহিক দুঃখ-দৈন্যের চিত্র তুলে ধরে ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদে মুখর, তাদের অধিকাংশই কোন না কোনভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত। মওলানার সামনে লক্ষ্যই ছিল বড় এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই ছিল মুখ্য সাধনা। তাঁর চারপাশে যাঁরা ভিড় জমাতেন তাঁরা মজলুম মানুষের মুক্তিকামী এটাই ছিল বড় কথা। মওলানার পক্ষে মুগ্ধ হওয়া তাই স্বাভাবিক। কি কারণে মওলানা ভাসানী শেষ পর্যন্ত কম্যুনিজম আদর্শ থেকে ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে হুকুমাতে রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠায় গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠেন তার বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, ১৯৪৬ সালে আসামে মওলানা ভাসানী এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবী দার্শনিক মওলানা আজাদ সুবহানী এক বৈঠকে মিলিত হন। মওলানা আজাদ সুবহানী হুকুমাতে রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে সাগ্রহ সম্মতি প্রকাশ করে মওলানা ভাসানী ওয়াদা করেন, তাঁর সকল সংগ্রাম হুকুমাতে রাব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

তারপর অতিক্রান্ত হলো কয়েক যুগ। ১৯৭৪ সালে মওলানা ভাসানী অভিমত ব্যক্ত করেন—ওয়াদাকৃত সেই লক্ষ্যে তিনি অনেক দূর অগ্রসর। তাঁর ভাষায়ঃ 'সব কথা ও কাজের একটি মওসুম আছে। যদি তা মওসুম মাফিক মানুষের নিকট পেশ না করা যায়, তবে অতীব কল্যাণকর বিষয়ও অর্থহীন ও পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেনঃ যদি কোথাও আযান দিয়ে মানুষকে নামাযের দিকে না আনা যায়, তবে ঢোল সহরতই বাজাও। বাংলাদেশের মানুষ বহুত ঘুমিয়েছে। এতদিন ঢোল সহরতে ঘুম ভাঙত, আজ আযানেই ভাঙবার অভ্যাস হয়েছে।'

www.pathagar.com

সন্তোষে কৃষক সমিতির অফিসের সামনে তাঁর টানানো সাইনবোর্ডের ভাষা ঃ 'হুকুমাতে রাব্বানিয়া'—আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম কর।—এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি। সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও তৎপরতাও এর আরেকটা দিক।

মওলানা ভাসানী মূলত সমকালীন হিমালয়ান উপমহাদেশে এক বিপ্লবী দরাজ কণ্ঠ যে কণ্ঠে বাঙময় ছিল নির্যাতিত মানবতার সপক্ষে নির্ভীক সাহসী উচ্চারণ। এমন একটি কণ্ঠ কি এখন আছে?

www.pathagar.com

নজরুল হক

হুকুমাতে রব্বানী ও মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অতি সাধারণ দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও ধর্মীয় বিশ্বাসের অপরিসীম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি উত্তরকালে উপমহাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে এই অসামান্য মওলানা সমকালীন শ্রদ্ধাভাজন সকল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে একই কাতারে দাঁড়িয়ে বৃটিশ উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আবার ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় আন্দোলনও অব্যাহত রেখেছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর ব্যতিক্রম ছিল এইখানে। মওলানা ভাসানীর কাছে ইসলাম আর রাজনীতি একাকার হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি ছিলেন অনন্য অকুতোভয় রাজনীতিক।

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তাই মওলানা ভাসানীর জীবনে রাজনীতি ও সমাজনীতি ছিল ইসলামের মৌল আদর্শভিত্তিক। ওয়াজ মাহফিলে দাঁড়িয়ে মুরিদানদের সামনে মওলানা যেমন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ওয়াজ করতেন তেমনি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গলদ ও ইসলামবিরোধী দিকগুলোও তুলে ধরতেন। ইসলামী আদর্শবিরোধী কোন রাজনীতিকে সমর্থন করেন নি কখনো। পাকিস্তানী শাসন আমলে বহু কম্যুনিস্ট মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আশ্রয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর ইসলামী আদর্শ থেকে একচুলও সরে দাঁড়ান নি। সমাজতন্ত্রের শোষণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গতি কিছু পরি-মানে থাকলেও মওলানা ভাসানী কম্যুনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না কখনো।

www.pathagar.com

যা হোক, মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দী কালের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানীর জীবন-দর্শন থেকে কি লাভ করতে পারি তাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী হুকুমত কায়েম করার দাবীতে সম্প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক ইসলাম-পন্থী রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। মওলানা ভাসানীর দীর্ঘজীবন সংগ্রাম ছিল এই লক্ষ্যেই নিবেদিত। চৌদ্দশত বছর আগে সামন্তবাদী যুগে ইসলাম যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, তার আদর্শ, মৌল দর্শন ও লক্ষ্যকে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় কিভাবে প্রতিফলিত করা যাবে? আল্লাহ্‌র রসূল যে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পত্তন করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত চারজন খলীফা আল্লাহ্‌র রাষ্ট্রের হেফাজতকারী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন, তার বাস্তবায়ন কিভাবে বিংশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় করা যাবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন রূপরেখা দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন নি। মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

এটা নির্মম সত্য যে, ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক যুব সমাজ বিশেষত রাজনীতি-সচেতন যুবমানসে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম নিয়েছে। অতীতে পাকিস্তানী শাসকদের মুখে ইসলামী হুকুমতের বুলি আর কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত রীতির দরুন দেশ স্বাধীন হবার পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের বক্তব্য জনমনে তেমন রেখাপাত করছে না। উপরন্তু কোন কোন রাজনৈতিক দল পাকিস্তান আমলের অভিজ্ঞতার আলোকে অধুনা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দাবীর প্রতি কটাক্ষ করেন। কিন্তু মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে হুকুমাতে রব্বানী বা তাঁর কথায় ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য দিয়ে গেছেন। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা সুন্নত—এই ছিল মওলানা ভাসানীর জীবনের সংগ্রাম।

ইসলামী আদর্শ চৌদ্দ শত বছর পূর্বের হলেও তাতে সর্বকালের উপযোগী সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যুগে যুগে মানব সভ্যতার ও

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থার উৎকর্ষ ঘটলেও মানুষের জৈব বৈশিষ্ট্য, আবেগ-অনুভূতি ও অর্থনৈতিক-বৈষয়িক চাহিদা আবহমানকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। মানব প্রকৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য-বর্জিত কোন সমাজ অকল্পনীয়। অথচ আজকে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের রেখে যাওয়া মৌল জীবন দর্শনের তাৎপর্য এবং ইসলামের আর্থ-সামাজিক রূপরেখা কি, তা যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের পদ্ধতি তুলে ধরার ব্যর্থতার দরুনই আধুনিক বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ ও আকর্ষণ বাস্তব ফলদায়ক হতে পারছে না।

অথচ উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রাক্কাল থেকে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁদের লেখনী ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.), মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ, মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিশিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন এবং তাঁদের লেখনী ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ রেখে গেছেন।

মওলানা ভাসানীর সঠিক মূল্যায়ন আজো হয় নি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ যে ইসলামী বিপ্লবমুখী এক সঠিক দিক-নির্দেশনা, যা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর জন্য উপযোগী, এ সত্যটা সম্ভবত আগামী দিনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মওলানা ভাসানী বাংলাদেশে এমনই এক জননেতা ও ধর্মীয় নেতা, যিনি ছিলেন এদেশের সমকালীন সকল জননেতার শ্রদ্ধাভাজন, যিনি ছিলেন এদেশের ৯০ ভাগ মুসলমান-হিন্দু কৃষক-শ্রমিকের নয়নমণি। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান তাঁরই প্রেরণায় এদেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কর্মসূচী হিসেবে বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায় গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন এবং মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করে জনগণের নির্বাচিত প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমে নয়া প্রশাসন ভিত্তি রচনা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর আদর্শকে পাথেয় করেই রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গ্রাম-সরকার ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদও এই যুগস্রষ্টা মওলানার আশীর্বাদ কামনা করে তাঁর মাযারে এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আসুন, আমরা মওলানা ভাসানীর এই পবিত্র মাযারে সমবেত হয়ে তাঁর শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

জন্য শপথ গ্রহণ করি। মওলানা ভাসানী আজীবন সর্বহারা কৃষক-শ্রমিকের দারিদ্র্য মোচনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। আসুন, আমরা তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে শপথ গ্রহণ করি। আসুন, মওলানার শোষণহীন সমাজ গঠনের কাজে আমরা সমবেতভাবে শক্তি ও সামর্থ্যকে নিয়োগ করি।' রাষ্ট্রপতি এরশাদের এ আবেগময় বক্তব্য সার্থক হয়ে উঠতে পারে মওলানা ভাসানীর আদর্শের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

মওলানা ভাসানী শেষ জীবনে তাঁর সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকালের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ধর্মীয় সাধনাকে সিঞ্চিত করে গঠন করেছিলেন 'খোদায়ী খিদমতগার পার্টি'। শেষ জীবনে তিনি মতবিরোধের কারণে তাঁর নিজ রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন। জীবনের শেষকালে মওলানা ঘোষণা করেছিলেন, 'এবার আমি এদেশের কৃষক-শ্রমিক, সর্বহারা-মেহনতি মানুষকে নিয়ে এমন এক বিপ্লব করবো, যা বিশ্বের কেউ কোথাও দেখেনি—আমি হুকুমাতে রব্বানী কায়েম করবো—যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন খোদায়ী সমাজ ব্যবস্থা।' ভাসানী তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি। তবে এই সত্যটা তিনি এ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন যে, এদেশে শোষণহীন অর্থ ব্যবস্থা ছাড়া যেমন মজলুম মানুষের মুক্তি আসবে না, তেমনি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনও সম্ভব নয়।

আমরা জানি, মওলানা ভাসানী খোদাপরস্ত মানুষ ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী তাঁর প্রাত্যহিক রাজনৈতিক জীবনের রুটিনমাফিক কাজ ছিল। বাংলাদেশ ও আসামে তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরিদান ছিল। তবু তিনি দীনহীন বেশে জীবন কাটিয়েছেন। মুরিদানের দেয়া অর্থে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর জীবন প্রবাহে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের প্রতিফলন। রসূলে করীম (স.)-এর বিশ্বস্ততম সত্যবাদী সাহাবা হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর জীবনাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনে। আল-কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতেই তিনি তাঁর হুকুমাতে রব্বানীর স্বপ্নকে রঞ্জিত করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ছিল, আমাদেরকে অবশ্যই শোষণহীন সৌভ্রাতৃত্বময় সাম্যবাদী সমাজ কায়েম করতে হবে, যাতে আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দা নিশ্চিন্ত মনে ইবাদত-বন্দেগী করতে সক্ষম হয়—এটাই হবে সকলের প্রচেষ্টা। মওলানার এই বক্তব্য প্রসঙ্গে ইসলামী

www.pathagar.com

জীবন দর্শন সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বাণী আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

আল-কুরআনের সূরা হাশরে ৫৯ ঃ ৭ আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ 'তোমরা ধন-সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা এমন করো না যাতে বিত্তসম্পদ একই শ্রেণীর ভিতর আবর্তিত হতে থাকে।' আল-কুরআনের ১০৪ ঃ ৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও ছিদ্রান্বেষীর জন্য আক্ষেপ! যারা ধন পুঁজি করে এবং তা গণনা করে এবং মনে করে যে, তাদের ধন চিরস্থায়ী হবে, তাদেরকে হোতামা দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।' পুঁজিবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে আল-কুরআনের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার প্রতিফলন আমরা মওলানা ভাসানীর মতাদর্শে লক্ষ্য করেছি।

ইসলাম মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রাখার সীমিত অধিকার দিয়েছে। কিন্তু হাদীস ও আল-কুরআনের নিম্ন আয়াত ও বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামী সমাজে কোন ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ তখনই রাখতে পারে, যখন সমাজে কোন অভাবগ্রস্ত মানুষ থাকবে না। সামাজিক দারিদ্র্য বিদ্যমান থাকলে কোন ব্যক্তিকে ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার ইসলাম অনুমোদন করে না। সূরা বাকারায়—২১ আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ 'মুসলমানগণ তোমাকে (হে রসূল) জিজ্ঞাসা করে যে, কি পরিমাণ অর্থ অপরের জন্য ব্যয় করবে? বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তা সবই।' সমাজের এক অংশ অনাহারে-অর্ধাহারে পশু জীবন যাপন করবে আর বিত্তশালিগণ আল-আফওয়া বা উদ্বৃত্ত শস্য-সম্পদ গোলাজাত করে রাখবে, এ অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় নি। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আল-আফওয়া বা উদ্বৃত্ত সম্পদ দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ব্যয় করার বিধান দিয়েছে। যদি কেউ তা না করে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিত্তশালীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করবে এবং তা সমাজের দারিদ্র্য মোচনে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাবে। এটাই আল্লাহ্‌র খেলাফতের বিধান। মওলানা ভাসানী তাঁর 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'-এ আল-কুরআনের এই নির্দেশকে তুলে ধরেছিলেন।

ইসলামী সমাজে ভূমি ব্যবস্থা কেমন হবে, তার রূপরেখা প্রতিফলিত হয়েছে আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোর ভিত্তিতে। বিশ্বের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর সময় যারা প্রকৃত কৃষিজীবী,

www.pathagar.com

তারা শুধু জমি কেনা ও চাষাবাদ করার অধিকার পেতো। কোন অকৃষিজীবী বিত্তশালীকে জমি কেনার অনুমতি দেয়া হতো না। অপরের পরিশ্রমের ওপর বসে খাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই দ্বিতীয় খলীফা বর্গায় জমিচাষ বা জোতদারী ও জায়গিরদারী ব্যবস্থা রহিত করে ডিক্রি জারি করেন। মদীনার উপকণ্ঠে বাজিলা গোত্রসহ কয়েকটি গোত্র কৃষিজীবী ছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য ওইসব গোত্রের লোকেরা খেলাফতের মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেয়ার তাদের গমক্ষেত অনাবাদী পড়ে থাকতো। খলীফার কাছে এ খবর পেঁৗছলে তিনি বিনা ক্ষতিপূরণে ওইসব গোত্রের জমি বাজেয়াফত করে প্রতিবেশী গোত্রের কৃষিজীবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। রসূল (স.)-এর সময়ে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় তহবিল ছিল না বলে সাহাবাদের জন্যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা.)-এর সময় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত সকলকে পারিবারিক ভাতা দেয়া হতো। আর সেইজন্য তাদের নামে বরাদ্দ জমিগুলো খলীফা প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। খেলাফতের যুগের এই ভূমি ব্যবস্থা অধুনা সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভূমি ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। আল-কুরআনের সূরা হামীম-এর ১০ম আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'বিশ্বে যা কিছু সম্পদ-ঐশ্বর্য সবই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন জীবের কল্যাণের জন্য--যাতে সকল প্রাণী সমভাবে হিস্সা পাবে এবং ভোগ করবে আর আল্লাহ্র ইবাদত করবে।' আল-কুরআনের এইসব আয়াতের আলোকে আমাদের নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হুকুমাতে রব্বানী কায়েম করে দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মানুষের দুঃখ মোচনে নিরলস সংগ্রাম করতে হবে। এই ছিল মওলানা ভাসানীর বক্তব্য। তাই তিনি কৃষিজীবী জনগণের পক্ষে 'লাঙ্গল যার জমি তার' দাবী জানিয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানীর মত বিশাল মহীরুহের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে কোন কোন সমাজতন্ত্রী নেতা মওলানা ভাসানীর সমালোচনা করেছেন। আবার বিদেশী পত্র-পত্রিকায় মওলানা ভাসানীকে 'রেড মওলানা' এবং 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' নামে বিশেষিত করেছে। কম্যুনিস্টরা তাঁকে ধর্মীয় মোল্লা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরাই 'ধর্ম, কর্ম, সমাজতন্ত্র'—এর শ্লোগান দিচ্ছেন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের অধুনা তাত্ত্বিকগণ এশিয়ার দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে অভিমত দিচ্ছেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ধর্মের বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আন্দোলনে সাফল্য আসবে না। ধর্মকে সমাজ বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করার

www.pathagar.com

পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। মওলানা ভাসানীর জীবনদর্শন ও সংগ্রাম ছিল ইসলামী আদর্শ অর্থাৎ আল-কুরআন ও সুন্নাহর উপরিউক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে শোষণহীন সুসম সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে। তাই বলা চলে, এদেশে আগামী দিনে জাতীয় ভাগ্যোন্নয়নের পথের নির্দেশনা রেখে গেছেন মওলানা ভাসানী।

পরিশেষে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মওলানা ভাসানী পঞ্চাশের দশকে গণচীন সফরে যান। মাও সেতুং-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মওলানা ভাসানী চেয়ারম্যান মাও-কে বলেছিলেন, 'আপনার সমাজতন্ত্র আমি গ্রহণ করতে পারতাম, যদি এতে আল্লাহ্ থাকতেন।' মাও সেতুং হেসে বলেছিলেন, 'মি. মওলানা, আপনারা কুরআনে যা পড়েন, আমরা বাস্তবে তা কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছি।' মওলানা ভাসানী তাঁর এই ছোট্ট মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণহীন সীমিত ব্যক্তিমালিকানায় পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যে সমাজ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত। ধর্মীয় বিশ্বাসবর্জিত সমাজে মানবতা ও নৈতিকতা স্থায়ী হতে পারে না।

www.pathagar.com

বদি-উজ-জামান

রাজনীতিবিদ-ধর্মপ্রচারক-শিক্ষাবিদ-সংবাদপত্রসেবী মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

যুগে যুগে বিশ্বে যেসব মহামানব এসেছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে দেশকে, সমাজকে, জাতিকে দান করে গেছেন। দেশ, সমাজ ও জাতি প্রতিদানে কিছু দিল কি না দিল সেদিকে তাঁদের নজর থাকে না। দেশ, সমাজ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করাই তাঁদের মহান ব্রত।

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৭২ বছরের রাজনৈতিক জীবনে শুধু রাজনীতিতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি, তিনি ছিলেন ধর্মীয় গুরু শিক্ষানুরাগী, সংবাদপত্রসেবী এবং আরও অনেক কিছু।

শতাব্দীর প্রবীণ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৭২ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ৩১ বছর ৪ মাস জেলে কেটেছে—এ কথা ভাবলেও অবাক লাগে। জীবনের মূল্যবান বিরাট এক সময় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর কেটেছে নির্জন প্রকোষ্ঠে। তবুও তিনি বিরত হন নি মজলুম মানুষের মূক কণ্ঠ মুখরিত করে তুলতে। বলা হয়ে থাকে, মওলানা ভাসানী বার বার দল গড়ে ভেঙেছেন। কিন্তু কেন? এই ভাঙা-গড়ার কারণ অনুসন্ধান করলেই পরিষ্কার হবে তাঁর নীতি ছিল অপরিবর্তনীয়। দল করেছে নীতি পরিবর্তন।

খেলাফত আন্দোলন দিয়ে মজলুম জননেতার রাজনৈতিক জীবন শুরু। তারপর কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ (নাম পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। দলের আদর্শ-চ্যুতি হওয়ায় তিনি নিজের আদর্শ নিয়ে অন্য দলে প্রবেশ করেছেন অথবা নিজেই দল গড়েছেন। মুসলিম লীগে থাকাকালে মজলুম জননেতা আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের

www.pathagar.com

সভাপতি ছিলেন। তিনি আসাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। মওলানা ভাসানী নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিরও সদস্য ছিলেন।

নীতিভ্রষ্ট মুসলিম লীগ ত্যাগ করে মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে) নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন জলাঞ্জলি দেয়। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মওলানা ভাসানী রাজনীতি হতে দূরে সরার ইচ্ছা করেন। কিন্তু জীবনভর যাঁর সাথে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনি রাজনীতি ছাড়লেও রাজনীতি তাঁকে ছাড়ে নি।

রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও মজলুম জননেতা অসংখ্য শ্রেণী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে কৃষক সমিতি, পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ, পাকিস্তান ডাক-তার ইউনিয়ন। এ ছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠিত হুকুমাতে রব্বানী পার্টি, খোদাই খিদমতগার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

মজলুম জননেতা একজন রাজনৈতিক নেতা হলেও তিনি আজীবন ইসলামের নিয়ম-নিষ্ঠা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালন করেছেন। শাহ নাসির-উদ্দিন বোগদাদীর সংস্পর্শে এসে তিনি ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। শাহ সাহেবের প্রধান শাগরিদ হিসেবে মওলানা ভাসানী বাংলা-আসামে ১৭ লাখ মুরিদ লাভ করেন। এই মুরিদদের নিয়ে মওলানা ভাসানী জীবনে অনেক সম্মেলন করেছেন। এসব সম্মেলনে লাখ লাখ লোক সমবেত হয়েছেন। মুরিদরা নিজেরাই সম্মেলনের সকল খরচ বহন করেছেন। চাল, ডাল, খাসী, গরু ইত্যাদি এসেছে। খিচুড়ি পাক করে বড় বড় নৌকায় রাখা হয়েছে এবং শাগরিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। লাখ লাখ লোক উপস্থিত থাকলেও কেউ অভুক্ত থাকেন নি। সবাই পেট পুরে খেয়েছেন।

মওলানা ভাসানী আসামের হামিদাবাদে, বড়পেটায়, আমতলীতে, রাধা-বাড়িতে, ভাসানের চরে, বাংলাদেশের মহীপুরে, কাগমারীতে, সন্তোষে, তালোরায়, ভুরুঙ্গামারীতে মসজিদ স্থাপন করেছেন। ইসলামী শিক্ষার জন্য ভাসানের চরে, হামিদাবাদে, ধরের বাড়িতে, কাকুয়ায়, সিরাজগঞ্জে, পাঁচ-বিবিতে মাদ্রাসা-মক্তব স্থাপন করেছেন।

শিক্ষা বিস্তারের অদম্য পেশায় মজলুম জননেতা বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অনেক লুপ্তপ্রায় প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তিনি

www.pathagar.com

হামিদাবাদে ইসলামিয়া কলেজ, মহীপুরে হাজী মহসিন কলেজ, কাগমারীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ এবং হামিদাবাদে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ১৯৫৬ সালে লুপ্তপ্রায় সন্তোষের জাহ্ণবী হাই স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচবিবিতে প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় অন্যদের সাথে মওলানা ভাসানীও ছিলেন। এছাড়া মজলুম জননেতা সন্তোষে নার্সারী স্কুল, বয়েজ হাই স্কুল, গার্লস হাই স্কুল, কৃষি কলেজ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে অবশ্য অনেক বাকি আছে। মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে সরকারী উদ্যোগ ছাড়া এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

আজীবন শিক্ষার প্রতি অনুরাগী মওলানা ভাসানী এছাড়াও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাঁর বাড়ীতে চির-দিনই বহু ছাত্র জায়গীর থেকে লেখাপড়া করেছে এবং মুরিদদের বাড়ীতেও ছাত্র রাখার উদ্যোগ করেছেন।

লেখনীর মাধ্যমেও মজলুম জননেতা জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন সময় বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেছেন।

মজলুম জননেতা পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে আসাম থেকে সাপ্তাহিক 'তবলীগে দীন', সাপ্তাহিক 'জেহাদ', পাকিস্তান হবার পর জনাব আবদুস সামাদের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'হক কথা, 'ইসলাম মিশন', 'ইত্তেফাক', 'ইত্তেহাদ', 'নতুন দিন', 'ধূমকেতু'; মুসলিম লীগের পতনের পর 'দৈনিক সংবাদ'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মজলুম জননেতা 'দৈনিক বঙ্গবার্তা'রও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 'গণশক্তি'রও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। 'জনতা' ও 'নিউ-ওয়ার্লড' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন মওলানা ভাসানী।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার জন্য মওলানা সাহেব আবার 'হক কথা' ও 'প্রাচ্যবার্তা' নামে দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সাপ্তাহিক 'হক কথা' এদেশের সংবাদপত্র জগতে এক বিরাট আলোড়ন এনে দিয়েছিল। 'হক কথা' প্রকাশের দিন মানুষ হন্যে হয়ে খুঁজতেন পত্রিকাটি। 'হক কথা' টাঙ্গাইলের সন্তোষের একটি ক্ষুদ্র প্রেসে ছাপা হলেও

www.pathagar.com

পরবর্তীতে এর অবিশ্বাস্য চাহিদা লক্ষ্য করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাপা হয়। কোন একটি প্রেসে 'হক কথা' ছেপে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় নি। এদেশে আর কোন পত্রিকার ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য জোটে নি।

সত্যিকারের যাঁরা যুগস্রষ্টা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা বিভিন্নমুখী প্রতিভা লাভ করে দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দিয়ে যান। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। দেশ ও জাতি তাঁকে চিরদিন স্মরণ করবে। অনেকের নামে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও মওলানা ভাসানীর নামে একটিমাত্র গুরুত্বহীন রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। তবুও মজলুম মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় মজলুম জননেতার নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

শেখ আবদুল মতিন

মওলানা ভাসানী ও উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলন

বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনসমূহের সঠিক ও সার্বিক মূল্যায়ন এবং এর পর্যালোচনা করতে গেলে যে নামটি অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্যভাবে বারবার এসে পড়বে সেটি হচ্ছে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী—ভাসান চরের চেগা মিয়া। ভারতে বৃটিশ উপনিবেশ যখন প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম তখন সদ্য যুবা বিধায় তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদেরকে অতিক্রম করতে না পারলেও তারুণ্যের অমিততেজে তিনি সকল সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। বিশ্বের আর সব মুক্তিকামী মানুষের নেতাদের যে বৈশিষ্ট্য এবং আর সব অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী সরকারের যে প্রবণতা, মওলানা ভাসানী তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান নি, তাই তাঁর ছিয়ানব্বই বছরের জীবনের একত্রিশ বছর কেটেছে উপমহাদেশের বিভিন্ন কারাগারে। তবুও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে ভাটা পড়ে নি কখনো।

মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা হাসরত মোহানী, আল্লামা আজাদ সুবহানী, নেতাজী সুভাষ বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন সংগ্রামের। মওলানা ভাসানী এঁদের কাছে দীক্ষা পেয়ে এবং তাঁর সমসাময়িক নেতৃবর্গের উজ্জ্বল সান্নিধ্যে থেকে মুসলমান জাতিকে তাদের শক্তি ও প্রবল সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করেন যার ফলশ্রুতিতে বাঙালী মুসলমানরা একটা বিপ্লবী পতাকা তলে সমবেত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, আর এই সফল ও মহান কর্তব্যটি সমাধা হওয়ার পেছনে মওলানা ভাসানী ছিলেন এক মহতী পুরুষ।

দেওবন্দ মাদ্রাসায় থাকাকালীন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। শোষিত

www.pathagar.com

ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ানোর দীক্ষা তখনই হয়েছিল তাঁর। এজন্যই বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখন মওলানা তেইশ বছরের টগবগে তেজী তরুণ, তাই হয়তো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অসারতা বুঝতে পারেন নি। পরে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এবং নিপীড়িত মানুষের প্রিয় ভাসানী তাদের নয়নমণি হয়েই রইলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তথা উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি বরাবরই ছিলেন সামনের কাতারে।

একথা সর্বাগ্রেই বলে রাখা বান্ছনীয় যে, মওলানা ভাসানীর সহকর্মীরা কম্যুনিস্ট বলে পরিচিত হলেও তিনি নিজে কখনোই কম্যুনিস্ট ছিলেন না। তবে তাঁর রাজনীতির যে প্রকৃতি এবং বিত্তহীন ও নিরন্ন মানুষের জন্য তাঁর যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা ছিল তাতে সুযোগসন্ধানী মানুষ যদি তাঁকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দেয় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে কিছু কম্যুনিস্ট মওলানার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে উপরে উঠতে চেয়েছিলেন, এ কথা সত্য।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সাহচর্যে থেকে কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ আন্দোলনের সাথে মওলানা ভাসানীর সম্পৃক্ততা ছিল বিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আর যুগপৎভাবে মওলানা মোহাম্মদ আলীর সাথে তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল ত্রিশ দশক পর্যন্ত। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর ঝোঁক যেদিকেই থাকুক না কেন, কৃষক ও শোষিত মানুষের পক্ষে তাঁর সংগ্রাম কখনোই স্তব্ধ হয় নি। ১৯২৪ সালে তিনি আসামের ভাসানচরে কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন, অবিস্মরণীয় এই সম্মেলনেই আসামের জমিদার মহারাজাদের ত্রাস এই মহান ব্যক্তিত্ব ভাসানী নামে আখ্যায়িত হন। কাগমারী পরগণার জমিদারের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে মওলানা ভাসানী বাংগাল খেদাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের কারণে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সূত্রে ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নিয়ে তিনি লাহোর সম্মেলনে

www.pathagar.com

যোগদান করেন। পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সংগ্রহে ভাসানীর ছিল একক আধিপত্য, এমন কি তাঁর প্রচেষ্টা না থাকলে শ্রীহট্ট আজ হয়তো আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। মওলানা ভাসানীর জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কেটেছে আসামে। আসামের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক তথা আপামর মুসলিম জনগণের কাছে তিনি ছিলেন এক শক্তিমান সংগ্রামী পুরুষ। আসামের কুখ্যাত 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন ছিল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নিকট এক মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। তাঁর বিরোধিতার কারণেই স্যার সাদুল্লাহ্ মন্ত্রী সভার পতন ঘটে। আসামের বহিরাগত মুসলান তথা ময়মনসিংহ ও সিলেট থেকে আসামে পাড়ি জমানো দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষককুলের অবিসম্বাদিত নেতা মওলানা ভাসানী এতোই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ছিলেন যে, মন্ত্রীরাও তাঁকে প্রকারান্তরে সমঝে চলতেন।

আসামের অনাবাদী ও দুর্গম জঙ্গল এলাকায় নিরাশ্রয় কৃষককুলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জমি আবাদ করে মওলানা ভাসানীর দ্বন্দ্বমুখর জীবন গড়ে উঠেছিল প্রবল ভাঙাগড়ার দোলাচলে। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রেরণার উৎস হিসেবে আসাম ছিল জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রের মতো। এমন কি এ কারণে অনেকে তাঁকে জন্মসূত্রে অসমীয়া বলেও ভুল করে থাকেন। তবে আসামের বাইরেও পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও তাঁর তৎপরতা ছিল অব্যাহত। এহেন রাজনৈতিক পটভূমি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কংগ্রেস কিম্বা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর ঝাণ্ডা হাতে আসেন নি এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ফকির মজনু শাহ, তীতুমীর, হাজী শরিয়তউল্লা ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) তাঁকে আরো ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন।

আজীবন কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের সপক্ষে যাঁর আন্দোলন ও জীবনপাত সেই ভাসানী সমাজতন্ত্রের দীক্ষা কখনোই নেন নি, যদিও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া কিম্বা চীন, লেনিন এবং মাও সেতুঙ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল প্রবল। কিন্তু মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং আন্দোলনের প্রতি তাঁর আসক্তি, অনুরাগ বা বিশ্বাস কোনটাই ছিল না। কারণ তাঁর মতে এই ব্যবস্থা নফসানিয়াতের দোষে দুষ্ট। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বস্তুবাদী দর্শনে তাঁর অনাস্থার প্রমাণস্বরূপ তিনি ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা, এর হুকুমত এমন এক দর্শন

www.pathagar.com

মার্কসবাদ- লেনিনবাদ থেকে অনেক উর্ধ্বে। তিনি আজীবন মজলুম জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে এক অনন্য শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন, রবুবিয়াত হাসিলের একমাত্র পথ হিসেবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে গণ্য করেছেন। তাঁর হুকুমাতে রব্বানীয়া ছিল এই সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই।

শ্রেণী সংগ্রামকে মওলানা ভাসানী চিরজীবন দেখেছেন মজলুম আর জালেমের মধ্যকার সম্পর্ক হিসেবে। জালেমের যেমন কোন জাতি বা ধর্ম নেই, মজলুমেরও তেমনি। তবে তাঁর মতে ইসলামী হুকুমাতের অনুশীলন ও কার্যকর বাস্তব প্রয়োগ জালেম-মজলুমের না-হক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। ইসলামের ঝাণ্ডা তলে সমবেত মানুষ পরিপূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নিরিখে জীবন যাপনে প্রয়াসী হলেই জালেমের শোষণের হাতিয়ার স্তব্ধ হবে আর এটাই হবে মানুষের সত্যিকার মুক্তি সংগ্রাম, আর এই মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমেই হাসিল হবে হক্কুল এবাদ। উপমহাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যেহেতু শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয় বরং অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও বটে, সেহেতু মওলানা ভাসানী তাঁর স্বকীয় দর্শনের মাধ্যমে এই মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে গেছেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাও ছিল মুক্তি সংগ্রামে তাঁর স্বকীয় দর্শনের নিরিখে। যেহেতু এই আন্দোলন ছিল শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, উপমহাদেশের মুসলমানরাই সবচাইতে অবহেলিত, দুর্ভাগ্যপীড়িত, অত্যাচারিত ও ঋণভারে জর্জরিত সেহেতু হিন্দু ভূস্বামী রাজা ও জমিদারদের আওতাভুক্ত মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ডের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল—আর পাকিস্তান আন্দোলন মওলানা ভাসানীর কাছে মুক্তি সংগ্রামের এই রূপ নিয়েই এসেছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সাম্যের ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে কারণে মওলানা ভাসানী এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে সিলেটের উপর গণভোটে মওলানা ভাসানী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেসপন্থী হিন্দু নেতাদের একগুঁয়েমীর মনোভাব না থাকলে হয়তো পাকিস্তানের মানচিত্র অন্যভাবে অঙ্কিত হতো।

www.pathagar.com

দেশ বিভাগের বছর তথা ১৯৪৭ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ মওলানা ভাসানী আসামে বেংগল আসাম মুজাহিদ সম্মেলন, ন্যাশনাল গার্ডস সম্মেলন, নওজোয়ান সম্মেলন এবং লিটারারী কনফারেন্স করেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামান, কাজী ঈসা, মামদুদের নবাব প্রমুখ নেতৃবর্গ এসব সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরপরই আসাম সরকার মুসলমানদের অবিসম্বাদিত নেতা মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করেন যিনি একদা আসাম সরকারের ত্রাস ছিল, দেশ বিভাগের আগে যাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস আসাম সরকারের ছিল না, ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগের পর সেই নেতার উপর নেমে এলো সরকারী নির্যাতন। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার মওলানা ভাসানীকে বিনা শর্তে মুক্তি দান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ফিরেই মওলানা ভাসানী তাঁর আরদ্ধ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এখানে তখন ভাষা আন্দোলনের জোয়ার শুরুর পথে। স্বাধীনতার পর মুসলিম লীগ সরকারের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। দেশে ফেরার কিছু দিনের মধ্যে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এটি ছিল স্বাধীন পাকিস্তানে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধী দল। এই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র খাদ্যাভাব চলছিল, দুর্ভিক্ষাবস্থা রোধ করার জন্য মুসলিম লীগ সরকারের উদাসীনতা ভাসানী প্রমুখ নেতৃবর্গকে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করতে প্ররোচিত করে। ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা সফর কেন্দ্র করে আও-য়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে আরমানীটোলা ময়দানে এক সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সরকারী আমলাদের তরফ থেকে এই কর্মসূচী বাতিলের অনুরোধ জানানো হলেও ভাসানী তাঁর কর্মসূচীতে অবিচল থাকার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হলে পুলিশ বাধা প্রদান করে। মিছিল নাজির বাজার রেল ক্রসিং-এ পৌঁছুলে মওলানা ভাসানী রেল লাইনের পাশে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যান। এমতা-বস্থায় জালেম সরকারের একজন পুলিশ তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। সেদিন সে মিছিল অবশ্য পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। মিছিলে নেতৃত্ব দানের অপরাধে প্রাদেশিক সরকার মওলানা ভাসানীসহ মোট এগার জন নেতাকে কারাগারে আটক করে। পরের বছর তিনি কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। জনতার চাপে সরকার তাঁকে ও অন্যান্য রাজবন্দীকে মুক্তি

www.pathagar.com

দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে শত শত ছাত্র-জনতার সাথে মওলানা ভাসানীকেও গ্রেফতার করা হয়। জনতার প্রবল বিক্ষোভের মুখে সরকার আবারো তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে মওলানা ভাসানী শেরে বাংলার সাথে যুক্ত-ফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৪-র সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মদ আলী শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মধ্যে কোন্দল বাঁধিয়ে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার পায়তারা শুরু করেন। মওলানা ভাসানী তখন স্টকহল্‌মের শান্তি সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। মরহুম আবুল মনসুর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, দেশের যুক্তফ্রন্টের এমন পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে শাসন করতে পারতেন। অথচ এমন সময়ে তিনি দেশের বাইরে। যদি তিনি সেদিন বাইরে না থাকতেন তবে বোধ করি যুক্তফ্রন্টের বিরোধ বাড়ত না। দেশের ইতিহাসও হয়তো অন্যভাবে লিখতে হতো।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের মে মাসে ৯২-ক ধারা জারী করে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয় এবং শেরে বাংলাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে গৃহবন্দী করে। ইস্কান্দার মীর্জা সে সময় পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। মীর্জা সাহেব ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে তাঁদেরকে আটক করতে শুরু করেন। মওলানা ভাসানী তখন স্টকহল্‌ম থেকে এসে লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন। যে ব্যক্তিটি অবিভক্ত ভারতে আসাম সরকারের ত্রাস ছিলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রাপ্ত বলে কথিত একটা নতুন দেশেও সে ব্যক্তি অনুরূপ-ভাবে সরকারের রুদ্ররোষে পতিত হলেন। জেনারেল মীর্জা সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, মওলানা ভাসানী দেশে ফিরে এলে তাঁকে গুলী করে মারার জন্য তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ হাবিলদারকে পাঠাবেন। এই হুমকি শুনে মওলানা ভাসানী লণ্ডনে বসেই খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং দেশে ফেরার জন্য জেদ ধরেন। তাঁর কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে দেশে ফিরে আসতে দিতে রাজী হলেন না। তবুও তাঁর জেদাজেদীতে তাঁরা তাঁর অজান্তে তাঁকে কলকাতাগামী বিমানে উঠিয়ে দেন। দমদম বিমান বন্দরে নামার আগ পর্যন্ত তিনি কিছুই বুঝতে

www.pathagar.com

পারেন নি। ১৯৫৫ সালে পররাষ্ট্র নীতি, স্বায়ত্তশাসন এবং সমাজতন্ত্রের ইস্যুতে আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায় এবং মওলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। মওলানা এ সময় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন খান আবদুল গাফফার খান, জি. এম. সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দীন, শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী, গাউস বখস বেজেনজু এবং আবদুস সামাদ খান আচকজাই প্রমুখ নেতৃবর্গ। ১৯৫৭ সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। মওলানা ভাসানীকে মির্জাপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় পাঁচ বছর কারাভোগের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তানের একতা ও সংহতির পক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং এই ইস্যুতে ন্যাপ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়।

মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর স্বকীয় দর্শনের প্রতি নিজের অবিচল আস্থা এবং দৃঢ়তার কারণে বহুবার বহু জনের সাথে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছে। আপন নীতি থেকে তিনি কখনোই একচুলও সরে দাঁড়ান নি। এরপর আসে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে জেলে ভরা হয়েছে। ভাসানী তাঁর অনুজপ্রতীম এই নেতার মুক্তির জন্য দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬৯-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী পল্টনের এক জনসভায় মওলানা ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মত কারাগারের ফটক ভেঙে শেখ মুজিবকে বের করে আনা হবে। সেদিনের সেই সংগ্রামও ছিল জনতার মুক্তির সংগ্রাম। শেখ মুজিবের রাজনীতির সঙ্গে মওলানা ভাসানীর সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর মুক্তির জন্য তিনি আন্দোলন করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় এই জননেতা জালেমের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা কিরূপ প্রতিবাদমুখর ছিলেন।

১৯৭০ সালে মওলানা ভাসানী ইসলামী সমাজতন্ত্রের দাবী উত্থাপন করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে মার্কসীয়-লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না, তাই তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েমের মধ্য দিয়ে ইসলামী সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ বছরের নভেম্বর মাসে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের কয়েক লক্ষ লোক প্রাণ হারায়; এহেন দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পরও পাকিস্তানী সরকার ও নেতাদের কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি দেখে মওলানা অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ বছরেরই ডিসেম্বরে পল্টনের এক জনসভায় তিনি

www.pathagar.com

প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার কথা ঘোষণা করেন। আবার ১৯৭১-এর জানুয়ারী মাসে তিনি সন্তোষে সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

বস্তুতপক্ষে আজীবন সংগ্রামী মওলানা ভাসানী ১৯৪৭-এর পর পরই মুসলিম লীগ সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের পর পাকিস্তানী অত্যাচার ও নিপীড়ন আবার সমানভাবে চলতে থাকে। ১৯৫৬ সালের কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীই সর্বপ্রথম পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠীকে প্রকাশ্য সংগ্রামের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'শাসন-শোষণের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে আমরা তোমাদেরকে আস্সালামো আলাইকুম বলতে বাধ্য হব।' অপ্রিয় হলেও সত্য যে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মওলানার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। আওয়ামী লীগ সমর্থক একটি পত্রিকা তাঁকে 'লুঙ্গীসর্বস্ব' মওলানা বলে ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধা করে নি। প্রায় পনেরো বছর পর ১৯৭১ সালে পল্টনে দাঁড়িয়ে সেই মওলানাই আবার স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা গঠনের ডাক দিয়েছিলেন।

দেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মওলানার সন্তোষের বাড়িটি জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় তিনি ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকার উপর অবস্থান করছিলেন। এপ্রিল মাসেই তিনি ভারত হয়ে লণ্ডন গিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেই ভারত গমনই ছিল তাঁর জীবনে একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। ভারতে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। অতএব লণ্ডনে গিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মওলানা সেদিন যদি ভারত হয়ে লণ্ডন যাওয়ার পরিকল্পনা না করতেন তবে হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লিখতে হতো।

১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারী তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে এসেই তিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। তাঁর 'হক কথা' পত্রিকায় হককথা লেখার জন্য তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পতিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনের কারণে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন এক বছরেরও অধিক কাল যাবত। তাঁর জীবনের একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৭৬-এর ফারাক্কা মহামিছিল।

www.pathagar.com

রাজশাহী থেকে কানসাট পর্যন্ত এই মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁর হুকুমাতে রব্বানীয়া, খোদাই খিদমতগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল—এসবই ছিল তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ১৯৭৪ সালে তিনি বেসরকারীভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করলেও সরকারী তরফ থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করাতে পারেন নি।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মওলানা ভাসানী কখনোই মানুষের মুক্তির প্রশ্নে আপোষ করেন নি। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে সংগ্রামে ও বিদ্রোহে। যেখানে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের দুর্দশা দেখেছেন সেখানেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর এই সংগ্রামী চরিত্র ও ঐতিহ্যের কারণে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছেন আর অবমূল্যায়ন করেছেন। ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকা তাঁকে 'ফায়ার ইটিং মওলানা', 'রেড মওলানা', আমেরিকার টাইম ম্যাগজিন তাঁকে 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' বিশেষণে আখ্যায়িত করেছে। তাঁর সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ছিল তিনি জ্বালাও পোড়াও নীতির সমর্থক। কিন্তু বিপ্লব ও সংগ্রাম ছাড়া আযাদী হাসিল হয় না, এ কথা বোধ হয় তাঁর সমালোচকদের জানা ছিল না।

মত ও পথকে বাস্তবায়িত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসে না, ইতিহাস তার সাক্ষী। আজীবন সংগ্রামী মওলানা তাঁর সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনা, ত্যাগ ও কর্মমুখর জীবনে এই একটি দর্শনই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন—তিনি সংগ্রাম করেছেন গণ-মানুষের মুক্তির জন্য। জনগণের সংগে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর নাম সবার উপরে; এ ব্যাপারে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এদেশের প্রচলিত সনাতনী সুবিধাবাদী চরিত্রের লেশমাত্র তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এদেশের মুক্তি আন্দোলনে কৃষক শ্রমিকের নয়নমণি, সর্বহারা মানুষের মুকুটহীন সম্রাট, জনতার মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী ছিলেন অপরাজেয়।

মওলানা ভাসানী শুধুমাত্র আযাদী আন্দোলনেই নেতৃত্ব দেন নি, তিনি আজীবন শিক্ষা-সংস্কারেও অবদান রেখেছেন। মওলানার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ সাল। মওলানা ভাসানীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রেস ক্লাব হতে একদল সাংবাদিক রওনা হলেন। সামান্যের জন্য তাদের সাথে আমি যেতে পারি নি। সেদিন ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যাণ্ড হতে টাংগাইলের বাসে রওনা হলাম। সাড়ে দশটায় আমি টাংগাইল গিয়ে পৌঁছলাম। রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো, 'উঠেন স্যার, বুঝেছি আপনি মওলানা ভাসানীর বাড়ীতে যাবেন।' আমি যখন সন্তোষের দিকে যাচ্ছিলাম তখন দেখা হয়েছিল একজন ফটোগ্রাফারের সাথে। তখন বেলা এগারোটা। আমার মনটা ছটফট করছিল। আমি কাগমারী প্রবেশ করে দেখলাম কতকগুলো তোরণ। সন্তোষে পেঁৗছে মওলানা ভাসানীর বাড়ী পেলাম। এক সাধারণ বাড়ী, মলিন বিছানা-পত্র। গাড়ী-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-ব্যালেন্স কিছুই ছিল না তাঁর। সারা দেশের মানুষ যাঁর নাম জানতো, অত্যাচারীর সিংহাসন যাঁর হুংকারে টলমল করতো সেই মওলানা ভাসানী অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। শাহজামান (র.)-এর মাজার সংলগ্ন ঘরগুলোতে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বিশ্রাম করছিলেন। বিরাট এক ঘর। বর্তমানে যেটাকে 'দরবার হল' বলে—সেখানে খেজুর পাতার চাটাই বিছানো ছিল। বেলা সাড়ে এগারটায় মওলানা ভাসানী মঞ্চে ওঠেন। সভার সভাপতি কাজী মোতাহার হোসেন আসন গ্রহণ করেন। জনাব আবুল হাশিমকে ধরাধরি করে মঞ্চে উঠানো হলো, সাথে বেগম সুফিয়া কামাল, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন এবং ইসলামী একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব আহমদ হোসেন, জনাব আশরাফ ফারুকী, শাহ আজিজুর রহমান, অধ্যাপক শাহেদ আলী ও অধ্যাপক আবদুল গফুর আসন গ্রহণ করেন।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে কেবল অধ্যাপক ইন্নাস আলী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি তাঁর এক সহকর্মী মারফত একটি মূল্যবান পত্র মওলানা ভাসানীর নিকট প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত বলে উল্লেখ করেন। মওলানা ভাসানী দীর্ঘ দেড় ঘন্টা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে তিনি ইতিহাসের অনেক কথা বলেন, সকলের সাহায্য-সহানুভূতি কামনা করে বক্তৃতা শেষ করেন। তারপর বুদ্ধিজীবিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সবার শেষে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন আবুল হাশিম। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

গঠন প্রণালী, আকৃতি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ইসলামী চিন্তাধারায় শিল্পকলার গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর বেগম সুফিয়া কামাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আলোকপাত করেন। কাজী মোতাহার হোসেন একটি ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চীন সফর শেষে মওলানা ভাসানী দেশে এসে হুকুমাতে রব্বানী প্রচার এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনে তাঁর স্বপ্ন প্রসংগে তিনি তাঁর চীন সফরের একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। চীনের একটা নার্সারীর ছাত্রকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার প্রধান শত্রু কে?' ছেলেটি জবাবে বলেছিল, 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, আধিপত্যবাদ, উপনিবেশবাদ।' ছেলেটির ত্বরিৎ জবাব থেকে তাঁর ভাবনায় এসেছিল ঃ তাহলে আমরা কি আমাদের দেশের শিশুদের শিক্ষা দিতে পারি না—তোমার রব কে, তোমার আদর্শ কি, তোমার রসুল কে? একটা আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা স্থাপন করার ধারণা এভাবেই তাঁর মাথায় আসে। শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানালেন।

ভাসানীর চেতনা ও স্বপ্ন এক শ্রেণীর মানুষকে তাঁর কঠোর সমালোচকে পরিণত করলো। কেউ কেউ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জিগিরও তুলে-ছিলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী বুঝেছিলেন আধুনিক শিক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আধুনিক শিক্ষাও অযৌক্তিক। অতএব এই দুই বিপরীত স্রোতধারার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন মওলানা ভাসানীই প্রথম।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টার পিছনে তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের চরিত্রবান সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলা। তাঁর স্বপ্নের ইসলামী বিদ্যালয়, তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের এক বাতিঘর।

শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের কর্মসূচী একমাত্র মওলানা ভাসানীই দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নের এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র

www.pathagar.com

মুসলিমদের জন্যেও সীমাবদ্ধ রাখেন নি তিনি, যে কোন ধর্মের লোক এই বিদ্যাপীঠের জ্ঞানালোকে অবগাহন করতে পারেন। সারা জীবন সাধনা করে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন মওলানা ভাসানী।

তথ্যপঞ্জী

১. পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ বদরুদ্দীন উমর।

২. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ আবুল মনসুর আহমদ।

৩. মধ্য রাতের অশ্বারোহী ঃ ফয়েজ আহমদ।

৪. সচিত্র স্বদেশ ঃ ২য় বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা, ১৯৮২।

৫. আমাদের কালের কথা ঃ সৈয়দ মুর্তাজা আলী।

www.pathagar.com

এস. এম. আবদুল জব্বার

আমাদের জাতীয় চেতনা উন্মেষে মওলানা ভাসানী

আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় কোটি কোটি নির্যাতিত মজলুম জনমানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার জ্বলন্ত প্রতীক ছিলেন মজলুম জননেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা ভাসানীর জীবন-ইতিহাস আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস, সাফল্যে মুখোজ্জ্বল বিজয়ের ইতিহাস। অগণিত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির ইতিহাস, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিক শোষণের নাগপাশ থেকে চিরমুক্তির ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এই উপমহাদেশে অনন্য প্রতিভার অধিকারী যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষণজন্মা মনীষী নিঃস্ব-নির্যাতিত, সর্বহারা মানুষের দুঃখময় জীবনে বাঁচার সাধ এনে দিয়েছিলেন, মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিশোর কাল থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় শতাব্দী কাল ব্যাপী অভাবী ও সর্বহারা মানুষের সেবায় আত্মনিয়োজিত, আত্মোৎসর্গীকৃত এই মহান নেতা শুধু রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অগণিত মানুষের ধর্মীয় গুরু-পীর, মুর্শিদ, মওলানা হুযুর। সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের কাছে তিনি যেমন ছিলেন অসীম শ্রদ্ধার পাত্র, নিম্নস্তরের মানুষের কাছেও তিনি ছিলেন তার চেয়েও অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ ভালবাসার পাত্র—তাদের প্রাণের কাছাকাছি অতি আপন জন। বিপদে-আপদে, আশ্রয় ও সাহায্যে, রোগে-শোকে, সেবা ও চিকিৎসায়, দুর্দিনের সাথী-বন্ধু, নিরাশার আঁধারে উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা, পথহারা পথিকের হারানো পথের দিশারী, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসংকুল অকূল সাগরে টালমাটাল ভগ্ন তরণীর তিনি ছিলেন নির্ভীক বলিষ্ঠ কাণ্ডারী।

আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষে মওলানা ভাসানীর অসীম অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্যতম মহান স্থপতি

www.pathagar.com

হিসেবে তিনি সর্বজনস্বীকৃত। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নবতর প্রেক্ষাপটে তাঁর এই অবদান আরো অপরিসীম। মওলানা ভাসানী নামসর্বস্ব পেশাদার পোশাকী মওলানা ছিলেন না। আজীবন জনস্বার্থে উজ্জীবিত সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতি করেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তাই বলে তিনি গোঁড়ামী পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন নিরহংকার, সদালাপী ও মহৎ দরদী প্রাণের অধিকারী। তিনি ছিলেন ইসলামী জীবনাদর্শে ও ধর্মীয় অনুশাসনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। তাঁর জীবন ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও আবর্তিত। তাঁর কথায় ও কাজে ছিল অপূর্ব সমন্বয় ও সামঞ্জস্য। তিনি যা অনুভব করতেন, শুধু কথায় নয় কাজেও তা প্রকাশ করতেন। নিজের জীবনে সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি আদর্শ প্রচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পোশাকে-আশাকে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। তেমনি কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী। খাঁটি বাঙালীত্বের সংগে মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় সাধন শেরে বাংলার পক্ষেও সম্ভব হয় নি। নিজের দুরূহ রোগের চিকিৎসার জন্য হোক বা কোন সরকারী বা বেসরকারী দলের নেতা হিসেবেই হোক মওলানা ভাসানী যখনই পৃথিবীর যে কোন দেশে সফরে গিয়েছেন—সাধারণ মোটা সূতী খদ্দরের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী ও আটপৌঢ়ে লুংগী, মাথায় তাল গাছের আঁশের টুপী—এই পোশাকের ব্যতিক্রম কোথাও হয় নি। এর মাঝেই ফুটে উঠেছে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তাবোধ। সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতে হয়েছে রাণী এলিজাবেথের, চৌ-এন লাইয়ের, নাসেরের মত বিশাল ব্যক্তিত্বশালী রাষ্ট্রপ্রধানদের। ক্ষমতার দাপটে নয়, নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব আর হৃদয়নিঙড়ানো সীমাহীন ভালবাসা দিয়েই তিনি জয় করেছেন দেশ-বিদেশের লাখো লাখো মানুষের হৃদয়-মন। তাই তার ভক্তের মধ্যে আছেন রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে অগণিত দীন-দরিদ্র, সর্বহারা কুলি-মজুরের দল।

মওলানা ভাসানী ছিলেন জিতেন্দ্রিয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করেছিলেন তিনি। অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ-লালসা ছিল না। ক্ষমতা বা নাম-কামের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। নিজের জীবদ্দশায় মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর মৃত্যুর পর সাড়ে তিন হাত জায়গা—এর বেশী মহান আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর নিজের জন্য আর কিছুই কাম্য ছিল না। কিন্তু রহমানুর রহিম স্রষ্টার কাছে তাঁর কাম্য ছিল সীমাহীন—আর তা

www.pathagar.com

ছিল দুর্গত মানুষের দুর্গতি নাশের জন্য। ভুখা-নাংগা-সর্বহারাদের অন্নবস্ত্রের সমাধানের জন্য। নুন-লংকা আর পান্তা ভাতেই তৃপ্ত ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর তখ্‌তে তাউস বা রাজপ্রাসাদ তাঁর কাম্য ছিল না। সন্তোষের রাজপ্রাসাদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও দখল হাতে পেয়েও সামান্য একখানা খড়ের ঘরে দীন-দরিদ্র চাষীর মতই সরলভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি। ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা তাঁর কাছে হারাম ছিল যেমনি হারাম ছিল তাঁর কাছে আরাম। তাঁর সংগঠনের জন্য, তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন আন্দোলন পরিচালনার জন্য, দুঃস্থ মানবতার সেবার জন্য, ত্রাণ কার্যের জন্য তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মুহূর্তে তাঁর কোষাগার লক্ষ লক্ষ টাকায় ভরে দিত। কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি তা হাসিমুখে বিলিয়ে দিতেন। মওলানা ভাসানীর নাম করে বা তাঁর দোহাই দিয়ে কত রাজনৈতিক চ্যালা-চামুণ্ডা আখের গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মওলানা ভাসানী হাসিমুখে বেছে নিয়েছেন দারিদ্র্য। কবি নজরুলের ভাষায়ঃ 'হে দরিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান'—এই অমর পংক্তিটির মূর্ত প্রতীক ছিলেন মওলানা ভাসানী। বস্তুত জীবনভর নিজের জন্য চিন্তা করার মত অবসর তাঁর ছিল না, তিনি আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। আর তাই মৃত্যুর সময় কপর্দকহীন, দীন-দরিদ্র অবস্থায় এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে অবিনশ্বর জগতে তাঁর ইন্‌তিকাল তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব আর সুমহান আদর্শকে প্রত্যেক বাঙালীর মনে চিরস্থায়ী আসনে অভিষিক্ত করে।

একমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের প্রতি অসীম আনুগত্য, সততা, ন্যায়-পরায়ণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাদিতা তাঁকে যে কোন প্রতিকূলতার মুকাবেলা করার শক্তি যোগাত। রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ব্যক্তিকেও তিনি অকুতোভয়ে ও নির্দ্বিধায় বাগ্মিতার ক্ষুরধারে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতেন। নিজের জীবনকে বাজি রেখে সর্বহারা মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে কামিয়াব করার জন্য যে কোন দুঃসাহসী প্রচেষ্টাই তিনি অবলীলায় গ্রহণ করতেন। নিজের জীবনের চেয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্যই ছিল তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। ঈমান ও আমলের সমন্বয় সাধনেই এই চারিত্রিক মাধুর্য বিকশিত হয়েছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর প্রকট প্রমাণ মেলে। রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষের কাছে তিনি দূরের মানুষ বলেই বিবেচিত হন। ক্ষমতাচ্যুতির সাথে সাথে তিনি হন পরিত্যক্ত। কিন্তু মওলানা ভাসানী ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

মতাদর্শের পার্থক্য তাঁকে জনগণের এমন কি জননেতাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করে নি। তাঁর রাজনৈতিক দলভুক্ত যারা নয় এমন কি যারা রাজনীতি করেন না তাদের এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের হৃদয়ের মণি-কোঠায় তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের পাতায় সত্যিই বিরল। একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পালন এবং রসূলুল্লাহ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনা-দর্শের সফল অনুসারী না হলে এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। মওলানা ভাসানীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাল্যকালেই প্রতিভাত হয়। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার ছিল একটি জুতার দোকান। কিশোর আবদুল হামিদ দোকানে যেয়ে দেখতেন থরে থরে সাজানো নানা রঙের জুতার অপূর্ব সমাহার। আনন্দে আত্মহারা হতেন তিনি! কিন্তু যখন তিনি দেখতেন দূরে অদূরে অগণিত বালকবালিকারা পাদুকাহীন তখন মুহূর্তেই তাঁর এই আনন্দ মিলিয়ে যেত। পিতার অনুমতিসাপেক্ষে তিনি প্রতিদিন দুই জোড়া জুতা ও কিছু বাতাসা নিয়ে সমবয়সী ও আরো ছোটদের-সহ একটি মিলাদ অনুষ্ঠান করতেন। সবচেয়ে অভাবী দু'জনের মধ্যে জুতা আর সকলের মধ্যে বাতাসা বিতরণ করতেন তিনি; আনন্দে আর তৃপ্তিতে তাঁর মনপ্রাণ ভরে উঠতো।

প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠতো। তাদের এই দুঃখ মোচনের জন্য তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও আন্দোলনে মেতে উঠতেন। কিন্তু কিশোরে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার পর এক চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁকে নিজ গ্রাম ছাড়তে হয়। তিনি সিরাজগঞ্জে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি গড়ে তোলেন কৃষক আন্দোলন। তাঁকে স্বদেশের মাটি ছেড়ে আসামে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। আসামেই মওলানা ভাসানীর জীবনের নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। আসামে 'লাইন প্রথা' তথা 'বাঙালী খেদা' আন্দোলন প্রতিরোধে পাল্টা আন্দোলন সংগঠনে তাঁর নির্ভীক ও সঠিক নেতৃত্ব ছিন্নমূল বাঙালীদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। আসাম প্রাদেশিক পরিষদের জন্য আসন সংরক্ষণ, আসামে ৩২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠন ইত্যাদি তাঁর জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ১৯১৯ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সাল থেকে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ১৯৪৬

www.pathagar.com

সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে সিলেট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পাকিস্তানের সপক্ষে বিপুল ভোট পড়ে এবং তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ সিলেট জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির অনতিকাল পরে তিনি স্বদেশ ফিরে আসেন এবং দেশসেবায় ও সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়াশীল ও জন-বিরোধী ভূমিকায় তিনি দলত্যাগ করেন এবং ১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন প্রগতিশীল জনকল্যাণমূলক ভূমিকায় আবর্তিত। তাই পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও গণবিরোধী ভূমিকায় ব্যথিত হয়ে তিনি নিজ গঠিত দল আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন।

জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি বামপন্থী রাজনীতি করতেন। কিন্তু তাই বলে তিনি ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় বা ধর্মকে বিসর্জন দেন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনীতি ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত ছিল। আর তাই মওলানাকে ভুল বুঝে মওলানার সংস্পর্শে যাঁরা রাজনীতি করতে এসেছেন তাঁরা মওলানার ধর্মভীরুতার পরিচয় পেয়ে হয় মওলানার অনুসারী অনুগত হয়েছেন নইলে দল ত্যাগ করে ভিন্ন দল গঠন করেছেন। কিন্তু মওলানা ছিলেন নীতির প্রশ্নে অটল। আর তাই তিনি তাঁদের হাসিমুখে বিদায় দিয়েছেন।

কিন্তু তাই বলে মওলানা ভাসানী ধর্মের নামে অনাচার বা গোঁড়ামী পছন্দ করতেন না। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়। স্বাধীনতার পর তৎকালীন সরকারের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা তাঁকে ব্যথিত করে। অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে ও সর্বহারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের চরম ব্যর্থতায় তাঁকে বৃদ্ধ বয়সেও পুনরায় গণআন্দোলনে নামতে বাধ্য করে। সরকারের ভারতঘেঁষা নীতির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে তিনি তাঁদের আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতের আগ্রাসী নীতি ফারাক্কা বাঁধের মরণ ছোবলের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এই নবতিপর বৃদ্ধ যে প্রবল গণআন্দোলন ও ঐতিহাসিক মিছিল পরিচালনা করেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

মওলানা ভাসানীর জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও অক্ষয় কীর্তি সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বস্তুত মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এটা অনুধাবন করেছিলেন যে, একমাত্র ইসলামই আমাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন ও বিশ্বে সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে পারে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ; আর এই জীবন ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের জন্যই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। যা সরকারের পক্ষেও গঠন করা সম্ভব হয় নি তিনি তা বাস্তবে পরিণত করেছেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সাহায্য ও অনুদান প্রদান করেছেন। তাঁর এই পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে সরকার এ বৎসর এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর সঠিক উন্নয়নের ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষে মওলানা ভাসানীর অবদান যথার্থরূপে প্রতিভাত হবে। আজ একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, আজীবন সংগ্রামী রাজনীতি করলেও মওলানা ভাসানী তাঁর অগণিত সরল প্রাণ মুরীদানের কাছে ছিলেন পীর-মুর্শিদ। তিনি তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ করতেন। সঠিক পথে পরিচালনার নির্দেশ দিতেন। রোগে-শোকে ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ কবজ দিতেন। বিভিন্ন সময়ে ওরশ ও মাহফিলের আয়োজন করে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের থাকা খাওয়ার আয়োজন করতেন। আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষে এর অবদান অপরিসীম।

বস্তুত রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে—সর্ব বিষয়ে মওলানা ভাসানীর অবদান সমগ্র জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

www.pathagar.com

সৈয়দ ইরফানুল বারী

ভাসানী-রাজনীতির পটভূমি

শেয়বে আবি-তালিবের দ্বিতীয় ভাষণে নবী করিম (স.) বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে যখন হক কথা উপেক্ষিত হয় আল্লাহ্‌মুখীনগণ তখন অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠেন। হক-এর সাহায্যে হয় তাদের প্রতি পদক্ষেপ, হক কায়েম করার লক্ষ্যে হয় তাদের সকল প্রয়াস। জুলুম ও জুলমতের অবয়ব ক্ষতবিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত তারা শঙ্কাহীনভাবে বসে থাকতে পারেন না। জলে-স্থলে বিদ্রোহ ও পাপের ফ্যাসাদ যখন প্রসারিত হয় আল্লাহ্-প্রেমিকদের তখন শান্তি বিনষ্ট হয়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারা দুনিয়ার সব আরাম-আয়েশ তুচ্ছজ্ঞান করে ময়দানে নেমে আসেন আর মরণপণ করে সত্য ও ন্যায়ের ঘোষণায় অটল অবিচল থাকেন।'

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সেই মানুষটিই ছিলেন। জীবন ও সংগ্রাম দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন।

১৯১৮ সালে প্রথম হজ্জ সমাপনের আগে (দ্বিতীয় বার ১৯৪০ সাল) তাঁর জীবনে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যা তাত্ত্বিক দিক থেকে সারা জীবন তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রথমটি হলো তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ বাগদাদ থেকে এ উপমহাদেশে হিজরতকারী সৈয়দ নাসিরুদ্দীন (র.)-এর সুদীর্ঘ সাহচর্য লাভ এবং দ্বিতীয়টি ছিল উস্তাদেরই নির্দেশে কয়েক বছর (১৯০৭-৯) দেওবন্দে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের সাথে অবস্থান। আসামে স্থায়ীভাবে বসতকারী সৈয়দ নাসিরুদ্দীন (র.) নিজেই সর্বভারতীয় বিদ্রোহের (১৯৫৭) বুযুর্গ সংগঠক সূফী নূর মুহম্মদ জানজবী, আমীর ইমদাদউল্লাহ (র.) প্রমুখের আধ্যাত্মিক উত্তরসুরি ছিলেন। আর আন্দোলনের উত্তরাধিকারী ছিলেন উল্লিখিত বিপ্লবী মওলানা মাহমুদুল হাসান (মৃত্যু ১৯২০ খৃ.)। এ আন্দোলনের নিকট অতীতের প্রবর্তক ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (র.)-[মৃত্যু ১৯৬৩ খৃ.]। মজলুম মানুষের মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যে তিনি

www.pathagar.com

সার্বজনীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মসূচী রেখে গেছেন যার প্রথম করণীয় হলো তাঁর (শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র) ভাষায়—ফুক্কা কুল্লে নেজামিন। রাজনৈতিক পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায়—বিরাজমান সব শাসন ভেঙে দাও। এই বৈপ্লবিক শ্লোগানের ধারক-বাহক হিসেবেই ১৮০৩ খৃস্টাব্দে শাহ্ আবদুল আজিজ (র.)-[মৃত্যু ১৮২৪ খৃ.] বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের আহ্বান জানান এবং তাঁর কর্মসূচী অনুযায়ী ১৮১৮ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন এক সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। অতপর দেওবন্দ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রণ-কৌশল পরিবর্তন করেন এবং সবশেষে মওলানা মাহমুদুল হাসান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' গড়ে তোলেন (১৯১৪-১৭)। এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং নেতৃবর্গ মাল্টায় নির্বাসিত হন।

কিন্তু 'ফুক্কা কুল্লে নেজামিন'-এর রাজনীতি কখনো নির্বাসিত হয় নি। এর তাত্ত্বিক আবেদন ও সংগ্রামী আহ্বান যুবক মওলানা ভাসানীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিরদিনের জন্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। সহজাত প্রতিভাবান মওলানা ভাসানী আপন অভিজ্ঞতা ও জীবন দিয়ে সংগ্রামের ক্ষেত্রভূমি ও ভঙ্গিমা পরিবর্তন করেছেন মাত্র। মওলানা মাহমুদুল হাসানের পরপরই ১৯১১ সালে সেদিনের তেজস্বী যুবক আবদুল হামিদ খান মওলানা মোহাম্মদ আলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কমরেড সম্পাদক কংগ্রেস নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী আলীগড় ও ক্যামব্রিজের ছাত্র হলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তখন তিনি অগ্রসেনানী। মওলানা ভাসানী নিজেই বলেছেন, মওলানা মোহাম্মদ আলীর ঘনিষ্ঠ পারিবারিক ও রাজনৈতিক সান্নিধ্য লাভ করে অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর প্রভাবেই পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯১৯)। সে সূত্রেই 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসেন এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে নামেন। (মওলানা মোহাম্মদ আলীর প্রতি মওলানা ভাসানী এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, ১৯৫৭ সালে তাঁর নামে কাগমারীতে একটি কলেজ স্থাপন করেন।)

১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান ও কারাবরণের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। মওলানা মাহমুদুল হাসানের 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' যদি ব্যর্থ না হত তবে হয়তো বা মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনে তাৎক্ষণিক এমন পরিবর্তন সূচিত হত না।

www.pathagar.com

তবে মওলানা ভাসানী সে পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তা নয়। কারণ মওলানা মোহাম্মদ আলী সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান-ইসলামিজম আন্দোলন ও দেওবন্দভিত্তিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-র আন্দোলনের সমর্থক ও এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই দেখা যায় একই নেতৃত্ব কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনে যুগপৎ সক্রিয় ছিলেন। মওলানা ভাসানী তাঁদেরই একজন হয়ে এসব আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। এই কারাজীবনে তিনি আরেক মহাপুরুষের সাহচর্যে আসেন যাঁর সুফলের স্বীকৃতি তিনি আজীবন দিয়ে গেছেন। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তাঁর স্বরাজ আন্দোলন ও ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এ মওলানা ভাসানী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে খিলাফত আন্দোলনের অবসান ও ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বরাজ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি মওলানা ভাসানীকে আরেক ধরনের রাজনৈতিক জীবনে টেনে নিয়ে যায়।

আশৈশব মওলানা ভাসানী ছিলেন গ্রামের মানুষ। কলকাতা-দিল্লীর রাজনৈতিক জীবনেও তাঁর প্রকৃত ঠিকানা ছিল গ্রাম—কখনো বাংলার, কখনো আসামের। সামন্ত প্রভু ও মহাজনদের শোষণ-নির্যাতনের যাঁরা শিকার ছিলেন তাঁদের সাথেই ছিল তাঁর জীবন। সূফীসাধক সৈয়দ নাসিরুদ্দীন (র.)-এর সান্নিধ্যে ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠস্থ কলপা গ্রামে তিনটি বছর কাটিয়ে তিনি যৌবনের বেশ কয়টি বছর আসামের ধুবড়ী মহকুমার জলেশ্বর গ্রামে কাটান। কৃষক মজুরের দৈনন্দিন জীবনে শরীক থেকে তিনি এদেশের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে নিজস্ব একটি উপলব্ধি আবিষ্কার করেন। গগন-চুম্বী তাত্ত্বিক শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেও মওলানা ভাসানী তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রামকে কৃষক মজুরের ভাষায় রূপান্তরিত করেন। এখানেই তাঁর সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য। ১৯২৪ সালের প্রথম ভাসানী চরের কৃষক-প্রজা সম্মেলন থেকেই তা অতিশয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহারাজ, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে তিনি বাংলা-আসামের শত সহস্র গ্রামগঞ্জ ঘুরে বেড়ান এবং এ জনমতকে একটি সংগঠন ও শক্তির রূপ দিতে আসামের ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত ভাসান চরে কৃষক-প্রজা সম্মেলনের আহ্বান করেন। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যে অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয় তা-ই সেদিনের মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খানকে চিরদিনের জন্যে মওলানা ভাসানী পরিচয়ে চিহ্নিত করে। সেই যে কৃষক-মজুর সম্মেলনের

www.pathagar.com

রাজনীতি শুরু হল তা থেকে তিনি কোনদিন বেরিয়ে আসেন নি, আসতেও পারেন নি।

এদিকে কংগ্রেসের শঠতা, গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যু (১৯৩১) ইত্যাদির প্রেক্ষিতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.)-এর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত তদানীন্তন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে মুসলিম লীগে যোগদানে আগ্রহান্বিত করে। কংগ্রেসের ব্যাপারে হতাশ হয়ে মুসলিম লীগকে জনগণের পার্টিতে পরিণত করতে তাঁদের অনেকেই এই সময়কালে এতে যোগদান করেন এবং মওলানা ভাসানীও তাঁদের একজন ছিলেন। এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আল্লামা আজাদ সোবহানী। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি তাঁদেরকে হতাশই হতে হয়েছে; কিন্তু মওলানা ভাসানীর জীবন-মিশনে ভিন্ন আর একটি ধারা বহমান ছিল বলেই পার্টি-পলিটিক্সের উর্ধ্বে মজলুম মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর আন্দোলন কখনো গতিহারা হয় নি। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলায় এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে আসামের বড়পেটা ও মঙ্গলদৈ-এ অনুষ্ঠিত কৃষক-প্রজা সম্মেলনগুলো বাংলা-আসামের মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়কালেই তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে ঐতিহাসিক লাইনপ্রথাবিরোধী আন্দোলন যা তাঁকে কিংবদন্তীর এক রহস্যময় পুরুষে পরিণত করেছিল। ১৯৪০ সালে আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে লাহোর প্রস্তাবে যোগদান, তৎপরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দান মওলানা ভাসানীকে কৃষক মজুরের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ধরাবাহিকতা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক অনন্য দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপোষহীন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি তৃতীয় বিশ্বের মজলুম মানুষের নেতৃত্বে বিশ্বদরবারে স্থান লাভ করেছিলেন। বিশ্বশান্তি সম্মেলনগুলোতে যোগদান করে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সফর করে এবং বিশ্ববরেণ্য চিন্তাবিদ ও নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাতে অথবা পত্রালাপে মওলানা ভাসানী নিজেকে একজন দার্শনিক-রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যে প্রতিভা-প্রবাহে তিনি লালিত বিকশিত হয়েছিলেন তাতে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অথবা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পদচিহ্নে তাঁর আটকে পড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার হত না বৈ কি। কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি তা অতিক্রম করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এক অতুলনীয় গতিশীলতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যকে দুঃখজনকভাবে ভুল বোঝা হয়েছে এবং অহেতুক নানা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে।

আসাম, পাকিস্তান, বাংলাদেশ—এই তিন পর্যায়েই মওলানা ভাসানী সংসদীয় প্রগতিশীল রাজনীতির পাশাপাশি শ্রেণীভিত্তিক কৃষক সমিতির সংগঠন ও আন্দোলন বজায় রেখেছিলেন। এই সুবাদে মার্কসবাদিগণও তাঁর সাহচর্যে এসেছিলেন ও সহকর্মী হিসেবে বহুদিন কাজ করেছিলেন। এভাবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ধর্মভীরু মুসলমান হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং মানুষের শাসনের বদলে রাব্বুল আলামীনের পালনবাদ কায়েমের আওয়াজ সর্বদাই বুলন্দ রেখেছেন। সেজন্যেই তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় স্বরূপকে এক কথায় 'হুকুমাতে রব্বানীয়া' বলেছেন। এই আপাতসংঘাতের জবাবে মওলানা ভাসানী নবী করীম (স.)-এর হিজরতকালীন উষ্ট্র চালকের কথা উল্লেখ করতেন। সেই চালক হিজরতকালে তো বটেই, এমন কি সারা জীবন অমুসলমানই ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন দ্রুতগামী দক্ষ চালক এবং মদীনার পথের মঞ্জিলগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। মজলুম মানুষের মুক্তি আন্দোলনে প্রগতিশীল ও বস্তুবাদীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত করেই মওলানা ভাসানী ঐ উপমা পেশ করতেন। হুকুমাতে রব্বানিয়ার সামগ্রিক রূপায়নের বক্তব্যের স্থলে কৃষক মজুররাজ কায়েমের আহ্বান প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী ইমাম গাজ্জালীর (র.)-এর একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করতেন। ইমাম বলেছেন, ফযরের আযানে যদি কোন কওমের ঘুম না ভাঙে তবে প্রথমে ঢোলসহরত বাজিয়ে ঘুম ভাঙার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এভাবেই মওলানা ভাসানী বুঝিয়েছেন, হুকুমাতে রব্বানিয়ার লক্ষ্যে তিনি সকল আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। সেজন্যেই তিনি আজীবন অসাম্প্রদায়িক ও সকল প্রকার গোঁড়ামীমুক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তিনি বলতেন, 'রব্বানীগণ কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ তোমরা রব্বানী হয়ে যাও। আল্লাহ্ আরো বলেছেনঃ আমার রঙে রঞ্জিত হও। সৃষ্টির লালন-পালনে তিনি কি কখনো সাম্প্রদায়িক? রাব্বুল আলামীন যেমন নন, তেমনি তাঁর পালনবাদের অনুসারিগণও হতে পারেন না।'

বাংলাদেশ আমলে মওলানা ভাসানী যুগপৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং

www.pathagar.com

সম্প্রসারণবাদের মুকাবেলায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। একজন আল্লাহ্-মুখীন মুসলমান, একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, একজন কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতা যে কোন দেশে যে কোন কালে যা করতেন মওলানা ভাসানী দুঃসাহসী সেনানী হিসেবে একাই তা করেছিলেন। 'ফুক্কা কুল্লে নেজামীন' দিয়ে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন এবং সেই ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেই জীবনের শেষ দায়িত্ব-টুকু পালন করে গেছেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর সংগ্রামের উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি আল্লাহ্প্রেমিকের বিনয় নিয়ে বলতেন, 'আমার আহ্বান নশ্বর, কিন্তু আল্লাহ্র আহ্বান চিরন্তন।' অতঃপর তিনি সূরা নেসার ৭৫ নম্বর আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। আল্লাহ্ স্বয়ং তাগিদ দিচ্ছেন ঃ 'তোমাদের কী হল যে তোমরা সংগ্রাম করছ না আল্লাহ্র পথে, অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্যে? ওরা বলে, হে আমাদের রব! এই জালিম অধিবাসীর জনপদ থেকে আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাও, তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করে দাও, তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করে দাও।'

ভাসানী-রাজনীতির পটভূমি ও উত্তরাধিকারিত্ব এই একই আয়াতে নিহিত।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার

নিপীড়িত মানবতার মুক্তি সংগ্রামে মওলানা ভাসানী

যুগে যুগে পৃথিবীতে যে সমস্ত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন—যাঁরা নিজেদের সব কিছু ব্যয় করেছেন সর্বস্বহারা শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য এবং যাঁদের জীবনাদর্শ বঞ্চিত মজলুম মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের সংগ্রামে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁদেরই একজন। তাঁর সংগ্রামবহুল সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এদেশের খেটে-খাওয়া নিরন্ন মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন। আর তা করতে যেয়ে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন; কেউ কেউ তাঁকে 'দালাল' আখ্যাও দিয়েছে। কিন্তু কারো কোন হুমকিতে তিনি কখনও তাঁর আরদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন নি। বরং বিরাট মহীরুহের মত অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আশ্রয় দিয়েছেন হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষকে। সর্বহারা নিপীড়িত মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য মওলানা ভাসানী বার বার মত ও পথের বদল করলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটাই—তা হলো নির্যাতনের অবসান, শোষিত মানুষের মুক্তি। তাইতো ক্ষমতাসীন কায়েমী স্বার্থবাদী, মুনাফাখোর-মজুতদার, জুলুমবাজ প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একটি মূর্তিমান আতংক; আর শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং অবহেলিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আশা-ভরসা, শক্তি-সাহস ও প্রেরণার উৎস। মওলানা ভাসানী কোন জন-সভায় কিছু বলতে যাচ্ছেন কিংবা কিছু একটা করতে যাচ্ছেন—একথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে দেশের শাসক, শোষক, সুযোগসন্ধানী, মুনাফা-খোর, জুলুমবাজদের কণ্ঠ ভয়ে শুকিয়ে যেত; তারা ভাবতো নির্ভীক স্পষ্টভাষী মওলানা না জানি হাটে এবার হাড়ি ভাঙেন! অন্যদিকে শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত চাষা, তাঁতি-জোলা, শ্রমিক-মজুর, কামার-কুমার প্রভৃতি মেহনতি মানুষের দল নতুন আশার স্বপ্ন নিয়ে ছুটে আসতো দূর দূরান্ত হতে;

www.pathagar.com

ভাবতো—সংগ্রামের নেতা মওলানা ভাসানী নিশ্চয়ই তাদের বাঁচার কথা বলবেন। সুতরাং শোষিত, অত্যাচারিত, অসহায় দুঃখী মানুষের তিনি ছিলেন বন্ধু, পরামর্শদাতা, তাদের সুখ-দুঃখের নিত্যসাথী।

সুতরাং সভ্যতার উষাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ মানব সভ্যতার প্রগতির ইমারত নির্মাণে যে অকিঞ্চিৎকর অবদান রেখেছেন, মওলানা ভাসানী তাঁদেরই একজন। তাই তিনি এমন একজন নেতা, এমন একটি প্রতিষ্ঠান, এমন একটি প্রতীক—যিনি অতীতের সাফল্য কিংবা বর্তমানের বিশৃংখলা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। একটি সুন্দর আগামী দিন সৃষ্টিই ছিল তাঁর রাজনীতি ও সকল কর্মকাণ্ডের মূল মর্মবস্তু।

১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার অনেক আগে তিনি জড়িত ছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগদান, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ এবং মুসলিম লীগে যোগদান, জমিদার-মহাজনবিরোধী আন্দোলন, আসামে লাইন প্রথার বিরোধিতা, পাকিস্তান আন্দোলন, পাকিস্তান পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দাবী ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা, আওয়ামী লীগে ভাঙন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন, গণচীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির গঠন, ন্যাপের ভাঙন এবং সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি সমর্থন, আইয়ূববিরোধী আন্দোলন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী, ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার দাবী, বাংলাদেশ হওয়ার পর আওয়ামী লীগের স্বৈরাচার এবং ভারত ও রাশিয়ার শোষণ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আওয়ামী লীগের পতনের পর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ, ফারাক্কা মিছিলে নেতৃত্ব প্রদান—প্রভৃতি অসংখ্য আন্দোলন ও সংগ্রামে মওলানা ভাসানী এদেশের শোষিত-নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে ছিলেন।

মওলানা ভাসানীর জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে। বস্তুত উৎপীড়িতের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, অসহায় দুর্বল মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন সহানুভূতির কারণ বুঝতে হলে, বুঝতে হবে তাঁর এই অর্থনৈতিক অবস্থানকে। সেকালে তাঁর

www.pathagar.com

পিতার মত বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক পরিবার ছিল সামন্ত শাসন-শোষণে জর্জরিত। তাই জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রজাসাধারণের স্বার্থে আন্দোলন সংগঠন করার মাধ্যমেই হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। আসামে 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৩৩৭-এ সন্তোষের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠন, সিরাজগঞ্জে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন, ১৩৩৮-এ রংপুরের গাইবান্ধার সম্মেলন প্রভৃতি তাঁর আজন্মলালিত সামন্ত-বাদবিরোধী শ্রেণীঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু ইতিহাসসচেতন মওলানা ভাসানী অচিরেই বুঝতে পারলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র সামন্তবাদের রক্ষকই নয়, বরং এর উপর ভর করেই সাম্রাজ্যবাদ এদেশের মাটিতে টিকে আছে। আর এও বুঝতে পারলেন, তাঁর চারপাশের সঙ্গী-সাথী মানুষগুলো শোষিত, অধিকার বঞ্চিত, অনাদৃত, অবহেলিত। আর এসব মানুষের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় জমিদার-মহাজন, টাউট-বাটপার প্রভৃতি শ্রেণীর দালালরা। এই সমস্ত সর্বস্বহারা দুঃখী মানুষের কষ্ট দূর করতে হলে প্রথমেই দূর করতে হবে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে। এই সময় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল জুড়ে চলছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। দেশের হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষকে শোষণ আর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মওলানা ভাসানী এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর এই সূক্ষ্ম মানবতাবোধ, নিপীড়িত মানবশ্রেণীর প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ এবং সর্বোপরি নিপীড়ন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কথা বলবার সৎ সাহসই তাঁকে রাজনীতিতে এবং সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কৃষক, মজুর এবং মেহনতি মানুষের একতা এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া যে জমিদার-মহাজনদের শোষণ-নিপীড়ন আর অত্যাচার বন্ধ করা যাবে না—এ কথা তিনি অল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি জমিদার-মহাজন শোষক-দালালদের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলেন।

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ এবং মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল ছল-চাতুরীবর্জিত, অনাবিল ও অকৃত্রিম। মানুষকে ভালবাসলে জনপ্রিয়তা বাড়বে, নির্বাচনে বেশী ভোট পাওয়া যাবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এদেশের হর্তাকর্তা হবেন—তাঁর মানবপ্রেমের

www.pathagar.com

পেছনে এমন কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না ; বরং দুঃখিতের জন্য দুঃখবোধ, ব্যথিতের জন্য বেদনাবোধ, বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াই ছিল তাঁর সহজাত গুণ। আর এজন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন রাজনীতিকে। কেননা রাজনীতি মানবসেবার উৎকৃষ্টতম মাধ্যম।

হাজী শরাফত আলী খানের তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মওলানা ভাসানী। ছোটবেলায় সবাই তাঁকে জানতো 'চেগা মিয়া' হিসেবে। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যেই মারা যায় তাঁর ভাই-বোন ও মা। অতঃপর চাচারা তাঁকে শিক্ষার জন্য পাঠালেন ময়মনসিংহের কলপা গ্রামে। সেখানে তিনি নাসিরুদ্দীন বোগদাদী নামক এক পীর সাহেবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বাইরের টানে সেই যে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন আর ঘরে ফেরেন নি ; পীর সাহেবের সঙ্গে একদিন পাড়ি জমালেন আসামের পথে।

আসামের মাটিতে পা রেখেই মওলানা দেখলেন এক অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কয়েক লাখ বাঙালী। জমিদারের অত্যাচার, মহাজনদের শোষণ, প্রকৃতির মার আর নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ জেলার ছিন্নমূল কৃষকেরা আসামের বনেজঙ্গলে গিয়ে জীবিকার সন্ধানে ব্যাপৃত। বনজঙ্গল সাফ করে নিতে পারলে জমি পাওয়া যায়, চাষবাস করে খেতে পারলে খাদ্যের অভাব হয় না। তাই আসামের বিরান জনপদে তখন চলছে বসত গড়ার দারুণ প্রতিযোগিতা। এই আসামের ঘাগমারার জঙ্গলে তারা তাদের দুঃখ-কষ্টের সাথী হিসেবে পেল মওলানা ভাসানীকে। মওলানাও তাদের পেয়ে খুশী হলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ঘাগমারার জঙ্গল জনপদমুখর হয়ে গেল, ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কোলাহলে ভরে উঠল। এখানে মওলানা এই সব ছিন্নমূল নিপীড়িত অসহায় মানুষের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল, ইসলামী কলেজ ও কৃষকদের গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়ার চিকিৎসার জন্য একটি পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। তখন ঘাগমারার জঙ্গলের নাম পাল্টে মওলানার নামে নামকরণ করা হলো 'হামিদাবাদ'।

এই নতুন বসত আসামের জন্য সৃষ্টি করলো এক নতুন সমস্যার। সেখানে দেখা দিল জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ভাষায় সংঘাত, চলনে-বলনে

www.pathagar.com

সংঘাত। অসমীয়ারা বাঙালীদের মেনে নিতে রাজী নয়। তদুপরি বৃটিশ সরকার লাইন করে সীমানা ভাগ করে দিয়েছিলেন দুই সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য। বাঙালীদের ভাগে যে এলাকা পড়লো, তাতে স্থান সংকুলান হলো না। আসাম-প্রবাসী বাঙালীদের তখন এক করুণ অবস্থার শিকার হতে হলো। এহেন পরিস্থিতিতে সর্বহারা দুঃখী মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবেই মওলানা ভাসানী বাঙালীদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। এর পূর্বেই তিনি জেনেছেন কেনিয়ার মানুষের লাইন প্রথা ভেঙে দেয়ার আন্দোলনের কথা। মওলানা সিদ্ধান্ত নিলেন এই লাইন প্রথা ভাঙতে হবে এবং জাতিগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আসামের পাহাড়ী উপত্যকায়। তদুপরি এই সময় আসামের গোয়ালপাড়া এস্টেটের পরাক্রমশালী জমিদার মুসলমানদের পক্ষ থেকে লিখিত ওয়াদা আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তারা সেই জমিদারের 'সাম্রাজ্যে' কোনদিন গো-হত্যা করবে না; করলে তারা জমির অধিকার থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত হবে। আসামপ্রবাসী বাঙালীদের দাবীদাওয়ার সঙ্গে তাই যুক্ত হলো আরও একটি ধারা—'গরু জবেহ্ করার অধিকার চাই।' মওলানা লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন ধর্মীয় আন্দোলনকে। উপরন্তু তিনি দেখলেন, 'ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-৮৯' ধারা মতে যে কোন নাগরিক যে কোন প্রদেশে বসবাসের অধিকার লাভ করবে। তাতে তার ধর্মীয় অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ভোটের অধিকার খর্ব হবে না।

ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মওলানার কাছে থেকে সংগ্রামের দীক্ষা নিতে শুরু করেন হাজার হাজার আসাম-প্রবাসী বাঙালী। সহস্র জনতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রূপ নেয় বিদ্রোহের। আর তারই ফলশ্রুতি ১৩৪২ বঙ্গাব্দে ভাসানচরের ঐতিহাসিক সম্মেলন। মওলানা সাহেব ব্রেক করলেন লাইন প্রথা; আসামের বুকে প্রতিষ্ঠিত হলো ছিন্নমূল বাঙালীদের অধিকার। সেই সময় তারা মওলানার নতুন নামকরণ করলো 'ভাসান চরের মওলানা' বা 'মওলানা ভাসানী' নামে। তাঁর এইরূপ নামকরণের পেছনে একটি সুন্দর কিংবদন্তীও আছে। কথিত আছে, ভাসানীর চরটি ছিল একটি ভাসমান দ্বীপের মত। কিন্তু সারা বছর দ্বীপটি ভেসে থাকতো না। বছরের কোন কোন সময় পানিতে ডুবে যেতো, আবার ভেসে উঠতো। ফলে এই দ্বীপে চাষবাস করে কৃষকেরা তাদের পরিশ্রমের ফসল ঠিকমত ঘরে তুলতে পারতো না। তাই ঐ চরের কৃষকেরা একবার মওলানাকে

www.pathagar.com

দাওয়াত দিয়ে সেখানে নিয়ে যায় এবং সমস্ত চরটি ঘুরিয়ে দেখায়। মওলানা হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করেন ঃ এই চর যেন আর কোনদিন ডুবে না যায়। এরপর থেকে এ চর আর সত্যি সত্যিই ডুবলো না। এ থেকেই নাকি তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সে যা-ই হোক, এই নামেই তিনি বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মেহনতি মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন।

কিন্তু এ ঘটনা মওলানার দ্বিতীয়বার আসাম অবস্থান কালীন। মাঝ-খানে তিনি কয়েকটি সংগ্রামী বছর কাটিয়েছেন টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ আর রংপুরে। এই কয়েক বছর সংগ্রামের বছর, সম্মেলন আর সংগঠনের বছর। এই সময় তিনি রিলিফ নিয়ে বন্যাদুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কৃষক-প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়েছেন বহিষ্কৃত।

বাংলা ১৩৩৭ সালে বন্যায় যখন গোটা দেশ প্লাবিত হয়ে যায়, সে সময় তিনি আসাম থেকে রিলিক নিয়ে টাঙ্গাইলের বন্যাপীড়িত অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। এই সময় সন্তোষে রাজত্ব চালায় এক হিন্দু জমিদার। এই জমিদারীর মালিক ছিলেন মুসলমানেরা। কাশ্মীর থেকে আগত পীর শাহ্ জামান ছিলেন এই জমিদারীর মালিক। শাহ্ জ.মান ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তিনি বাটনাগ্রামের ধর্মান্তরিত ইন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। ইন্দ্রনাথের ধর্মান্তরিত নাম শাহ্ এনায়েতুল্লাহ্ চৌধুরী। তখন সন্তোষের নাম ছিল খোশনাদপুর। কথিত আছে, শাহ্ এনায়েতের হিন্দু নায়েবের মেয়ে কমলা পিতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এনায়েতকে হত্যা করে জমিদারী দখল করেন।

তাই ১৯৩৭-এ টাঙ্গাইলে এসে মওলানা ভাসানী আরও অনেক কিছুর সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষ থেকে দাবী করলেন জমিদারীর মালিকানা। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হলো কৃষকদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া। জমিদারের অত্যাচারে কৃষকেরা জর্জরিত ; সর্বস্ব হারাতে বসেছে। গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হলো অসন্তোষ। অবশেষে মওলানাকে ময়মনসিংহ ছেড়ে আশ্রয় নিতে হলো সিরাজগঞ্জে। এখানে এসেই তিনি আয়োজন কর-লেন বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারীর অবসান, মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং চক্রবৃদ্ধির সুদের অবসান। কিন্তু

www.pathagar.com

সম্মেলনের পাঁচদিন পূর্বে সরকারী পক্ষ থেকে মওলানাকে সিরাজগঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৩৮-এর শেষাশেষি মওলানা অনুরূপ আর একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন রংপুরের গাইবান্ধায়। এই সম্মেলনের কারণে এবার তাঁকে ছাড়তে হলো বাংলাদেশ। কিন্তু তাঁর প্রতিটি সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সর্বহারা নির্যাতিত দুঃখী মানুষের কল্যাণ সাধন। তাই যখনই তিনি দেখেছেন, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখনই তিনি সোচ্চার কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সেই কারণে ইংরেজি ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ যুক্তি ও গণতন্ত্রের যে আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা পাকিস্তান সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। ...পাকিস্তানের কোটি কোটি মজলুম নরনারী আজও নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত, শোষিত।... বার বার প্রতারিত হইয়া দেশের জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগিতেছে এবং তাহারা নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছেন। আজ আমি বলিতে চাই যে, সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষক ও শোষিতের লড়াই, জমিদার ও প্রজার, সুদখোর মহাজন ও খাতকের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই, ধর্ম-অধর্মের লড়াই—বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হইয়াছে, তাহাতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশ গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের ত্যাগ কুরবানী ও নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।...দেশবাসীর নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি যে, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রমিক ও অন্যান্য মজলুম জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, সমাজ সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি ও খাদ্যসংকটের সমাধান, শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরী, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, যুক্তনির্বাচন প্রথাকে সুন্দর করা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রকার সামরিক জোট হইতে আমাদের দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামিগণ একটি মঞ্চে মিলিত হউন।' ভাসানীর এ বক্তব্য মূলত দেশের অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সপক্ষে। এ কেবল তাঁর মুখের কথা নয়, অন্তরের একান্ত কামনা।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে '৪৭-এর দেশ ভাগাভাগির পর কয়েকবারই মওলানা রাজনৈতিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এ সবের মধ্যে যেমনি উল্লেখযোগ্য '৫৬ সালের কাগমারী সম্মেলন, তেমনি উল্লেখযোগ্য '৬৮ সালের ঘেরাও আন্দোলন।

১৯৬৮-৬৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী যে গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যায়, সে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। '৬৮ সালের ৬ই অক্টোবর সন্তোষে মওলানার সভাপতিত্বে ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ১০ দফা দাবীর ভিত্তিতে ৩রা নভেম্বর থেকে দাবী দিবস পালনের। দাবীগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল—১. বন্যানিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা কার্যকরীকরণ, ২. বন্যাপীড়িত অঞ্চলসমূহকে দুর্গত ঘোষণা করা, ৩. প্রদেশব্যাপী পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু, ৪. সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ৫. দেশ হতে জরুরী ব্যবস্থা প্রত্যাহার, ৬. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ৭. শিক্ষা সংকোচন নীতি বাতিল এবং ৮. ভিয়েতনাম ও প্যালেস্টাইনীয় জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর মওলানা ভাসানী সংগ্রাম চালিয়েছেন কালোবাজারী, চোরাচালানী, ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ; দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য বার বার আবেদন জানিয়েছেন। তাই তিনি অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে বাঁচানোর দাবীতে '৭৪ সালের ১৫ই মে শুরু করেন অনশন। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সম্পদের লোভে নয়, ঐশ্বর্যের প্রতিপত্তি নয়, শুধু নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন রাজনীতিকে। তাই জীবনের শেষ পর্বে ফারাক্কা মিছিলের বিরাট জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছেন, 'আমি গরীব কৃষকদের জন্য কি করে যেতে পারবো জানি নে। তবে এখন মনে হয়, এদের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এদের যে বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম, তার মূল্য আমি দিতে পারি নি। এই গরীব মানুষদের ভোট এনে আমি বার বার গদিতে বসিয়েছি কতকগুলো বেঈমানকে যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রাখে নি। যারা কৃষকদের কথা ভুলে নিজেরা সম্পদের পাহাড় করেছে। আজ আর কিছু করতে পারি বা না পারি একটা কথা আমি কৃষকদের বলে যাব—এসব নেতাদের তোমরা বিশ্বাস করো না, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হও।'

www.pathagar.com

সুতরাং মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের অরুণোদয় থেকে শুরু করে অস্তাচলের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় তিনি তাঁর নিজস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন দুর্দশাগ্রস্ত, অত্যাচারে জর্জরিত নিরন্ন মানুষের জন্য। তাদের জন্যই তাঁর সম্মেলনের আয়োজন; তাদের জন্যই তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার সীমাহীন দুঃখ ভুলতে হয়েছে। এসব শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক। আর এই সম্পর্কই মওলানাকে করেছিল পীর, আর তাদের করেছিল শিষ্য যা মুরিদান। কোন কিছুর হুমকি তাঁর মুখ বন্ধ করতে পারে নি কোনদিন। ছেলে বয়সেও তিনি অসহায় মানুষের মুক্তির জন্য চিন্তা করেছেন। ইবরাহীম খাঁ যথার্থই লিখেছেন, 'ভাসানীর মওলানা সাহেবের কাজকর্ম দেখে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, লোকটি বাংলার কালবৈশাখী। প্রচণ্ড তার শক্তি, ততোধিক তার গতিবেগ। যেদিকে চলেন, তার দাপটে আধমরা ডাল ভাঙ্গে, জরাজীর্ণ গাছ উপড়ে যায়, বাসি পাতা খসে হাওযায় উড়ে, খড়ো-ঘর ভূমিসাৎ হয়। তারপর কালবৈশাখী কোথাও চলে যায়। নতুন ঘর তোলার দায়িত্ব অন্য লোকের, নতুন চারা লাগানোর ভার অন্য মালির, নতুন পাতাপল্লব জাগিয়ে তোলার কর্তব্য নব বসন্তের।'

শোষিত, বঞ্চিত এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য সামাজিক, আর্থিক ও ন্যায়ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার বাসনায় মওলানা ভাসানী এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সব ভাগ্যাহত মানুষগুলোর মন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে না। কারণ সংস্কারমুক্ত সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়া মানুষের জাগতিক এবং আত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি যেখানে গেছেন, সেখানেই তিনি জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিয়েছেন। স্কুল করেছেন, কলেজ করেছেন, মাদ্রাসা, মক্তব, হাসপাতাল ও পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের যা রুজি রোজগার, মুরিদানের যা সাহায্য—সব কিছু নিঃশেষে দান করেছেন এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি নিজের নামে কিছুই করেন নি; নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে তিনি স্মৃতি রক্ষা করেছেন অন্যের, কল্যাণ করার চেষ্টা করেছেন সর্বহারা দুঃখী মানুষের। তাঁর চারপাশের দুঃখী, তাপী, শোষিত, বঞ্চিত মানুষেরা অন্য কাউকে দেখে নি, তাদের সাহায্যে আর কারো বাস্তব উপস্থিতিও তারা কোনদিন অনুভব করতে পারে নি। কিন্তু

www.pathagar.com

তারা তাদের শোকে, দুঃখে, আপদে বিপদে মওলানা ভাসানীকেই পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছে, শক্তি সাহস দিয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখেছে। পৃথিবীর সকল মহাপুরুষকেই দেখা গেছে নানা প্রকার সামাজিক অন্যায় অবিচারে জর্জরিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত মানব-গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কথা বলতে, তাদের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের প্রথম থেকেই সংগ্রাম শুরু করতে। মহাপুরুষ মানেই হচ্ছে অন্যায় অসত্য জুলুম ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি মূর্তিমান প্রতিবাদ, বিশেষ সময়ের কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে গণমানুষের সংগ্রামে তাদের পথ প্রদর্শক। মওলানা ভাসানীর জীবনেও এর সামান্যতম ব্যতিক্রম নেই যদিও তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না।

মওলানা ভাসানীর ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবন যদি সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে সেখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বিধৃত হবে উপমহাদেশের নিপীড়িত জনগণের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারাবাহিক চিত্র যা এদেশের জনগণের সকল প্রকার দেশী-বিদেশী শোষণ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাবে। সুতরাং যতদিন পৃথিবী থেকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটবে, যতদিন নিপীড়িত মানুষের কাৎরানিতে পৃথিবীর আকাশ বাতাস মুখরিত, ততদিন মওলানা ভাসানী মেহনতি জনগণের সংগ্রামে অকৃত্রিম সহযোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

গ্রন্থঋণ

১. মওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম—শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত।

২. মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন ঃ ফিরোজ আল-মুজাহিদ।

৩. মওলানা ভাসানী — আরেফিন বাদল সম্পাদিত।

৪. সাপ্তাহিক বিচিত্রা — ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা '৮৩।

৫. সাপ্তাহিক বিচিত্রা — ৫ম বর্ষ ১১ সংখ্যা '৮৩।

৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা — ৫ম বর্ষ ২৬ সংখ্যা '৮৩।

৭. সাপ্তাহিক বিচিত্রা — ৫ম বর্ষ ৩১ সংখ্যা '৮৩।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আয়েশ ইউসুফ

মানবতাবাদী মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী কোন্ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করতে হলে তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রের সঠিক মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রয়োজন। তেমন তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা করা হলে ভবিষ্যতে ইতিহাস তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অচিরেই এদিকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

মওলানা সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে যা শুনেছি, যা জেনেছি এবং চিন্তাভাবনা করে যা পেয়েছি, তাতে রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষা অনুরাগী, সমাজ-চিন্তাবিদ—সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল ও মূর্ত হয়ে ওঠে তা হলো তাঁর মানবতাবাদ। মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। আর সকলই মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের নিমিত্ত সৃষ্ট। আল্লাহ্‌র এই দুনিয়ায় ন্যায়সঙ্গত ও বৈধভাবে সব কিছু ভোগ করার পূর্ণ অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত। মওলানা ভাসানী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষ কখনও জন্মগতভাবে ধনী-নির্ধন হয়ে জন্মায় না। মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক নানা অব্যবস্থা প্রথা এবং শোষণই মানুষকে ধনী, নির্ধনে পরিণত করে। এই বিশ্বাস, এই অনুভূতিই তাঁর সব কিছুর উৎস ও মূল। এই বিশ্বাসই তাঁকে অতি শৈশবে ঘরছাড়া করেছিল। মনুষ্যসৃষ্ট এই অনাচার, অবিচার, ভেদাভেদ, বৈষম্য ও বিধি-ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে খান খান করে একটা বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মানসেই মাত্র বারো বৎসর বয়সে সুখ-শান্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েন এবং আমরণ নিরলস সংগ্রাম করে যান সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য। তাঁর এই বিশ্বাস ও প্রগাঢ় দরদই ঐ অতটুকুন বয়সে তাঁকে প্রথমে নিরীহ নিরপরাধ মানুষের উপর জুলুমকারী ধনিকশ্রেণী, লুণ্ঠনকারী, শোষকশ্রেণী, বলদর্পী, অনাচারী, অত্যাচারী জমিদারকুল এবং অতিলোভী মহাজনকুলের কবল হতে অসহায়

www.pathagar.com

হতভাগ্য মানুষদের রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য করে। জিহাদ ঘোষণা করেন এবং সবাইকে সংঘবদ্ধ করে তুলতে থাকেন। ফলে তিনি স্থানীয় সামন্তবাদী জুলুমবাজ জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের রোষানলে পড়ে শত্রু হয়ে ওঠেন এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের রোষে পড়ে স্থান হতে স্থানান্তরে বিতাড়িত হতে থাকেন। জন্মভূমি পাবনা হতে টাংগাইল, টাংগাইল হতে রংপুর, রংপুর হতে বগুড়া, আসাম ইত্যাদি স্থানে তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়। এতে যেন তাঁর উৎসাহ-উদ্যম, শক্তি-সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি হতভাগ্য ভূমিহীন কৃষক আর ভুখানাংগা নিরন্ন লোকদের সংঘবদ্ধ করে অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর মহাজন আর জুলুম-বাজ বৃটিশ সরকারের সকল কূটকৌশল, চক্রান্ত ও ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সর্বত্র বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ, পোড়াবাড়ী, রংপুর ইত্যাদি স্থানের নজিরবিহীন কৃষক সমাবেশ, আসামের লাইন প্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইভাবে শোষক জমিদার, সুদখোর মহাজন আর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের করতল হতে নিরীহ, নিরপরাধ প্রজা তথা জনগণকে রক্ষা করতে অমিত-বিক্রম ও তেজে তিনি এগিয়ে যান এবং শত ঘাত-প্রতিঘাত, নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সফলকাম হন। প্রায় সকল জমিদার ভূস্বামী আর মহা-জনেরা প্রজা ও নিরপরাধ জনসাধারণের উপর জোর-জুলুম কমাতে, তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরে আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকাকালীন ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে জমিদার ও ভূস্বামীদের খপ্পর হতে নিরীহ অসহায় জনসাধারণকে রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয়ে এদেশ হতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মানুষের প্রতি তাঁর এই অসীম দরদ, সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে ধাপে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ এ সবের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের রূপ নেয়। এবং তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানেই আর্তের হাহাকার, উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল সেখানেই তিনি সোচ্চার, তাঁর গর্জন আকাশ বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলেছে। আফ্রিকা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্যসহ দুনিয়ার যে কোন দেশে যে কোন জাতি ও মানুষের উপর যে কোন প্রকার আধিপত্যের চেষ্টা, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন হয়েছে মওলানা ভাসানী এক অমিততেজী আপোষহীন সংগ্রামীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন মনুষ্যত্বের

www.pathagar.com

সকল অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষণের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটে চলার, ছিন্নভিন্ন করে তা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার। তাঁর এই আহ্বান, সংগ্রাম ; এই আন্দোলন সারা জাহানের আধিপত্যবাদ, পুঁজিবাদী শোষকচক্রের ভিত্‌কে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তুলেছিল।

তিনি ছিলেন শাশ্বত সত্য সুন্দরের সাধক, নিরলস-নির্ভীক সংগ্রামী। দুর্জয় তেজ ও বলিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ এক কালজয়ী সেনানী। সকল প্রকার অসত্য, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে নির্ভীক সেনানীর মতো যুঝেই কেটেছে তাঁর সারা জীবন। এই নির্ভেজাল নীতি ও আদর্শের বলে তিনি শুধু বাংলাদেশেরই জাতীয় নেতা নন, তিনি হতে পেরেছেন সারা বিশ্বের নির্যা-তিত শোষিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের নেতা, সবার প্রিয় হুযূর।

অসহায়, নিঃসহায় ও দরিদ্র জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনার সাথে সাথে তাদের নৈতিক অগ্রগতি, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আসা-মের গোয়ালপাড়া, বড়পেটা, ভাসানীর চর, বগুড়ার পাঁচবিবি, টাঙ্গাইলের সন্তোষ, কাগমারী প্রভৃতি স্থানে তিনি নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগে অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুলকলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন যা শিক্ষার ব্যাপারে অনেক দরিদ্র ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অসীম উপকার করছে ও করবে। দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। যে কেউ, যে কোন বিপদে তাঁর কাছে গেলে মহীরুহের মত তাঁর বিশাল বক্ষপুটে তাকে তিনি ঠাঁই দিয়েছেন। প্রথমেই তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করে-ছেন, অভুক্ত-ক্ষুধার্ত কি না, সে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর চরম বিরুদ্ধ-বাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে হাজার কটূক্তি করেছে, কুৎসা রটিয়েছে তবুও তিনি ঘূর্ণাক্ষরেও তার কোন প্রতিবাদ করেন নি। কোন কূটকৌশলের আশ্রয় নেন নি, প্রত্যাঘাত হানেন নি। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, পরম সহিষ্ণু।

মওলানার শত সহস্র ভক্ত মুরীদরা টাকা-পয়সা, চাল-ডাল, ফল-ফলাদি নজরানা দিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ভরে তুলতেন আর সে সবই তিনি আশে-পাশে থাকা দীন-দুঃখীদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে এমনভাবে বিলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর কাছে আর এক কপর্দকও অবশিষ্ট থাকে নি। এমনিভাবে তিনি তাঁর জীবনের সব কিছু শুধু দীন-দুঃখী আর নিঃসম্বল নিপীড়িতদের অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। সস্তা দামের খদ্দরের

www.pathagar.com

পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, তালের আঁশের টুপি পরে অতি সাধারণ সহজ সরল জীবন যাপন করতেন মওলানা ভাসানী। সন্তোষের বাড়ীতে তিনি নড়বড়ে চালাঘরে বাস করতেন। জাজিম, তোষকহীন সামান্য কাঠের চৌকির ওপর ছেঁড়া পাটি বা চাদর বিছিয়ে শুতেন। একটা ঘটনা এখনও আমার বেশ মনে আছে—ইংরেজি ১৯৬৫ বা '৬৬ সালের কথা। মওলানা সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১২ কিংবা ১৮ নং কেবিনে ভর্তি হয়েছেন। খবর পেয়ে আমার কয়েকজন আত্মীয় তাঁকে দেখতে যান, আমিও তাঁদের সঙ্গ নিই। সেই সময়ে আরও অনেকেই তাঁকে দেখতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন অনেক আলাপের পর মওলানা সাহেবকে উদ্দেশ্য করে আফসোসের সুরে বললেন, 'হুযূর, ঢাকায় আপনার থাকার এত কষ্ট! কত করে বললাম আপনার পছন্দ মতো ঢাকার যে কোন জায়গায় একটা বাড়ী করে দিই। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও আপনি কেন যে রাজী হন না—আমার একটা বিরাট দুঃখ রয়ে গেলো। মওলানা সাহেব তদুত্তরে স্বভাবসুলভ হেসে বললেন, 'মি. ইস্পাহানী, আমার তো নির্দিষ্ট কোন বাড়ীঘরের প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানই তো আমার আবাসভূমি, বাড়ীঘর। আমার বাড়ীর জন্য যে টাকা পয়সা খরচ করবে তা দিয়ে তুমি তোমার ইণ্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক মজুরদের বেতন বাড়িয়ে দাও। তাদের কিছু ঘরদোর বানিয়ে দাও, তাতেই আমি বেশী খুশী হবো, ওই হবে আমার বড় পাওয়া।' মওলানা ভাসানীর নিকট ব্যক্তিগত সুখ, শান্তি ও স্বার্থ যে কত তুচ্ছ ছিল এবং মেহনতি মজুর শ্রমিকদের জন্য যে তাঁর কি অপরিসীম দরদ ছিল এটি সেসব দৃষ্টান্তের সামান্য একটি মাত্র যা সেদিন আমি নিজ কানে শুনেছিলাম। পরে জেনেছিলাম ঐ ভদ্রলোক ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ইস্পাহানী সাহেব (জুনিয়র)। এমনি আরও কত কথা কত কাহিনী যে কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই!

যাঁরা সত্যিকার খাঁটি জননেতা, অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক তাঁরা মনেপ্রাণে সব সময় জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে থাকেন। কোন প্রকার লোভ-লালসা, নির্যাতন-নিপীড়ন, ক্ষমতার মোহ ভাসানীকে আমরণ জনগণ হতে এতটুকু বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের অভাব-অভিযোগ দৈন্যদেশা তিনি ক্ষণিকের তরেও ভুলে যান নি। তাঁকে বিস্মৃত হতে বা বিশ্রাম নিতে দেয় নি বরং জনগণের অভাব, বিপদ-আপদ যতই

www.pathagar.com

ঘনিয়ে এসেছে তিনি যেন ততই তাদের সাথে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে গেছেন, মুখর হয়ে উঠেছেন। সীমাবদ্ধ গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ থাকাকে তিনি কখনও পছন্দ করতেন না বরং তাকে ঘৃণা করতেন। ক্ষমতার বাইরে থেকে সর্বদা নিগৃহীত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত জনগণের সামনের কাতারে থেকে তাদের অধিকার আদায় করাকেই তিনি অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করতেন। তাই দেখা যায়, কি দেশে, কি বাইরের বিশ্বে, সর্বক্ষেত্রে সকল বিদ্রোহ আন্দোলনের সময়েই তিনি জনগণের সামনের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন, অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন, সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। ক্ষমতাসীনদের সকল ভাওতা ও চক্রান্তকে নস্যাৎ করে ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে তুলেছেন। তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন ঃ 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, অভাব-অভিযোগ মোচনই সবচেয়ে বড়। শোষিত বঞ্চিত জনগণের অধিকার আদায়ই সকল রাজনীতির সেরা রাজনীতি। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। ১৯৫৭ সালে স্টকহল্‌মে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও জোরালো ভাষার মাধ্যমে তিনি একটানা সাড়ে তিন ঘন্টা যে অনলবর্ষী ভাষণ দান করেছিলেন তা সারা বিশ্বের শান্তিকামী ও চিন্তাশীল মানুষের মাঝে দারুণ চাঞ্চল্য ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। তা আজও যেন বর্তমানের চিন্তাশীল ও শান্তিকামী মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তিনি মনেপ্রাণে আচার-আচরণে ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। কিন্তু কোন প্রকার সংকীর্ণতা, কুসংস্কার বা গোড়ামি তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। তার প্রমাণ পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন জাতি, গোত্র বা সম্প্রাদায়ের ওপরই শোষণ, পীড়ন, নির্যাতন হয়েছে সেখানেই মওলানা ভাসানীর কণ্ঠ গর্জে উঠেছে; তিনি প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। আর শুধু পাক-ভারত-বাংলায়ই নয়, বিশ্বের অনেক জায়গায়ই ছড়িয়ে আছে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নীতি ও আদর্শের অগণিত অনুসারী—শিষ্য, মুরীদ, ভক্ত ও অনুরক্তরা। এমন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা বর্তমান বিশ্বের ইতিহাসে খুবই বিরল।

মওলানা ভাসানীর জীবনব্যাপী সকল সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সকল কার্যক্রম ছিল শুধু মানুষের মঙ্গল, মানুষের কল্যাণেই উৎসর্গকৃত। তাঁর কোন আন্দোলন, সংগ্রাম কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না;

www.pathagar.com

তা ছিলো একান্তই শোষক, অত্যাচারী, নির্যাতক নিপীড়কের বিরুদ্ধে আর সে যে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রাদয়েরই হোক না কেন।

এমন একজন মানবদরদী সর্বত্যাগী নেতার সারা জীবনের সকল কার্যকলাপ, কীর্তিকাহিনী নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা, জাতীয় মঙ্গল ও ইতিহাসের বৃহত্তর স্বার্থে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মওলানা ভাসানী শুধু বিশ্বের সকল নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগণের মজলুম নেতাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতা-বাদের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

www.pathagar.com

বেগম মাজেদা আলী

নিপীড়িত মানবতার মুক্তিদূত মওলানা ভাসানী

নিপীড়িত মানবতার অগ্নিপুরুষ সংগ্রামী জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর সংগ্রামের প্রজ্বলিত মশাল হাতে নিয়ে আজীবন ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম-বাংলার সাধারণ দুঃখী মানুষের ঘরে ঘরে—এদেশের কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, শ্রমিক, কৃষক, আপামর জনগণের হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে। তাঁর মতো এমন জনদরদী, সংগ্রামী কর্মবহুল বিতর্কিত অথচ আলোচিত ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের নয়—বিশ্বের ইতিহাসেও বিরল।

সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের চেগা মিয়া নামের গৃহত্যাগী ছেলেটি কিভাবে শোষকের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে একদিন আসামের জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে পরবর্তীকালে কেমন করে সর্বভারতীয় খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান থেকে শুরু করে নিখিল বাংলা-আসামের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য কৃষক-মজদুর নির্ভর সামন্তবাদের প্রতিভূ মহারাজ, জমিদার, মহাজনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন ; সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন না থেকেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের মজলুম জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক ধারার নেতৃত্ব দান করে গিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

মওলানা ভাসানী তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ স্বীয় দর্শন ও নীতিতে ছিলেন অনড়-অটল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এদেশের উন্নয়ন কর্ম-সূচীকে যে কব্জা করে রেখেছে তাদের শক্ত মুঠো থেকে যেটুকু পানি গলে তাতে মাটি ভেজে না। তার একটি কাঠামোগত পরিবর্তন ও সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি কারও কাছ থেকে কোন ধার করা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মতবাদের স্থির বিশ্বাস নিয়েই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন

www.pathagar.com

রাজনীতির জটিল সংগ্রামে। তাঁর স্বীয় কর্ম এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যেই তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হত। তিনি ছিলেন এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক।

অনেক সময় তিনি কি করতে চাচ্ছেন বা চিন্তা করছেন তা তাঁর সহ-কর্মীদের অজ্ঞাত থাকায় নিজেদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হত; সহকর্মীরা মওলানার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তারা মওলানার চিন্তাধারার দূরদর্শিতা, কর্মপন্থার বাস্তবতা এবং আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে মুগ্ধ হতেন তখন তাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হত। তিনি বিশ্বাস করতেন, কর্মের মধ্য দিয়েই আসে সংগ্রাম আর সংগ্রামই হচ্ছে মুক্তির অন্যতম শর্ত। তাই তিনি বলতেন, 'আমার জনতা বইয়ের লেখা পড়ে বোঝে না। কাজ করো, সংগঠন গড়ে তোল, সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাও।'

মওলানা ভাসানী ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সেই অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, বিস্ময়কর ভাবমূর্তি এবং অসাধারণ জনপ্রিয়তা গড়ে ওঠার পিছনে ছিল তাঁর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, অন্তহীন মানবপ্রীতি, স্বীয় বুদ্ধি ও কর্মশক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস, আল্লাহ ও ধর্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও সুদৃঢ় ঈমান। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা, তাঁর দেশপ্রেম তাঁর নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে জড়িত ছিল না। আত্মস্বার্থের প্রেরণায় বা ক্ষমতার প্রলোভনে তিনি দেশকে ভালবাসেন নি। দেশের সংখ্যাগুরু যে সব দুঃখিত, ব্যথিত, বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত মানুষ তাদের তিনি সন্তানতুল্য ভালবাসতেন। তাই তাদের জন্য আজীবন বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন সাধকের মতো।

তাঁর সাধনা ও সংগ্রামের সুফল অনেকের ভাগ্য প্রসারিত করেছে, অনেকেই ক্ষমতার সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করেছেন, কিন্তু মজলুম জননেতা মওলানার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। তিনি তাঁর লুঙ্গি, পাঞ্জাবী আর তালের আঁশের টুপির বেশে সর্বদা নিরন্ন মানুষের পাশে থেকেছেন, অবস্থান করেছেন গ্রাম-বাংলার সেই সনাতন কুটিরে। আবার দেশের এই আপামর জনসাধারণের স্বার্থে যখনই সামান্যতম আঘাত তিনি লক্ষ্য করেছেন, তখনই সংগ্রামী ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ছুটে গিয়েছেন প্রিয় দেশ আর তার মানুষের মর্যাদা রক্ষার্থে। বজ্র কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়েছেন, স্তব্ধ করেছেন ষড়যন্ত্রকে।

আজকে বিশ্বব্যাপী মানুষের মাঝে যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, সেখানে শোষক শ্রেণী সর্বত্র একই কৌশলে শোষণ ও ক্রমাগত নিপীড়ন করে চলেছে—

www.pathagar.com

এ বিষয় মওলানা ভাসানী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সে শোষকের দেহের বর্ণ সাদা কালো যা-ই হোক না কেন, সে শোষণের রীতি সর্বত্রই এক রকম। কারণ শোষকের ধর্মই হচ্ছে যে কোন মূল্যে শোষণ করা। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে যারা নির্বিচারে শোষণ করে, নিপীড়ন, বঞ্চনা, অবহেলার মাধ্যমে যারা মানুষকে উপযুক্ত মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর কখনও আপোষ ছিল না। তাদেরকে তিনি জঘন্যতম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বোধ করি তাঁর জন্মলব্ধ প্রকৃতিগত গুণাবলী মানুষের কল্যাণের প্রতি, সমাজ ও দেশের প্রতি এমনিভাবে তাঁকে ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তো তিনি তাপস, তাই তো তিনি সংগ্রামী।

তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন শোষণহীন সমাজ ভিন্ন শোষিতের কল্যাণ হতে পারে না। তাই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের পথ, রাজনীতির পথ তিনি পছন্দ করে নিয়েছিলেন। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক মুক্তি। তবে সাধারণত রাজনীতির মাধ্যমে যারা দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, দেশসেবক হতে চায়, তাঁরা হৃদয়ের গোপন কন্দরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিতও হতে চায়। তাদের ধারণা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী অথবা প্রভাবশালী কর্মকর্তা হতে না পারলে রাষ্ট্রশক্তির উপর চাপ প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু মওলানা ভাসানী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন।

মওলানা পছন্দ করেছিলেন রাজনীতির এক ভিন্নতর পথ। এ কারণে অনেকে তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন না। তবে তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রশক্তির বাইরে থেকে সংগ্রাম আর আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তির উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে জনগণের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা আদায়ের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি কোন শক্তিমান রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। রাষ্ট্রনায়কের বেতনভুক্ত উপ-দেষ্টাও হতে চান নি ; বরং রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদাই ছিলেন একটা বিরোধী শক্তি। তিনি নিজেই ছিলেন একটি রাজনৈতিক দল—একটি প্রতিষ্ঠান।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ১৯২৮ সালে মওলানা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে সপরিবারে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন আসামের ঘাগমারার গভীর জঙ্গলে, সেখানে তিনি একটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করে বসবাস করছিলেন।

www.pathagar.com

জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ আর প্রকৃতির নির্মম পরিহাসে সর্বহারা হয়ে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার ছিন্নমূল কৃষকেরাও তখন আসামের বন-জঙ্গলে গিয়ে জীবিকার সন্ধান করতো। সেই সব ছিন্নমূল কৃষকদের নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মওলানা জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ ঘাগমারাকে মঙ্গলময় করে তোলেন। ক্রমান্বয়ে সেখানে গ্রাম, স্কুল, চিকিৎসালয় সবই গড়ে ওঠে। এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘাগমারা যখন আর জঙ্গলাকীর্ণ রইল না তখন ভক্তরা মওলানার নামানুসারে এর নামকরণ করেন 'হামিদাবাদ'।

পরবর্তীকালে মওলানা ধুবড়ী শহরের নিকট ভাসানীর চরে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, শিক্ষা ও কল্যাণমূলক উপদেশ চরের কৃষকদের হৃদয়ে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। সেই থেকেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মানবপ্রেম ও জনসেবার আদর্শ মানুষকে শিক্ষা ও জ্ঞান দানের আগ্রহ এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগ, এই সত্য সুন্দর মানবিক গুণাবলী লক্ষ লক্ষ কৃষককে মুগ্ধ করেছিল। শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে তারা মওলানাকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাঁর ভক্তগণ শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁকে যে সব উপহার ও অর্থ প্রদান করতেন তাদেরই কল্যাণে তিনি সে সব অর্থে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাঁরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ভাসানীর চর উচ্চ মাদ্রাসা। তাই তো তিনি নিপীড়িত, মেহনতি মানুষের কাছে হযুর মওলানা, মওলানা ভাসানী।

এদেশবাসীর জীবনে যখন এমন সময় এসেছে, যখন মুক্তিযুদ্ধের পদক্ষেপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে, রাজনীতিবিদগণ চিন্তিত, সন্ত্রস্ত তখন সমুদ্র গর্জনের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ কণ্ঠ ভেসে এসেছে, সন্তোষ থেকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। তখন সব বিপ্লবীরাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অসীম সাহসে বুক বেঁধে সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছেন। যে কোন সংকটকালে দেশ ও জাতির কাছে তিনি ত্রাতা হিসেবে দেখা দিয়েছেন। নিজেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, অন্যকেও সম্মুখে এগিয়ে চলার সাহস দিয়েছেন। এদেশের প্রগতিবাদী বা বামপন্থী রাজনীতিকরা যত্রতত্র তাঁকে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় কার্যসিদ্ধির পর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, বিব্রত করেছেন, তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। আবার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যখন ছুটে গিয়েছেন তখন সন্তানতুল্য সবাইকে কৃপা করেছেন, বুকে টেনে নিয়েছেন তিনি।

www.pathagar.com

শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের কাছে মওলানা ভাসানী ছিলেন আশা-ভরসা, সাহস-শক্তি ও সংগ্রামী প্রেরণার উৎস। তিনি যখন কোন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন অথবা কোন জনসভার আহ্বান জানিয়েছেন তখন দেশের শাসক, শোষক, সুযোগ-সন্ধানীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের ধারণা মওলানা তাদের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবেন। অথচ নিপীড়িত মেহনতি মানুষ দলে দলে হৃদয়ে নতুন আলোর স্বপ্নে উদ্ভাসিত হয়ে, শক্তি সাহসে বুক বেঁধে সংগ্রামের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছেন দূর-দূরান্ত হতে। মওলানার আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের হৃদয়-মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। কারণ তাঁরা নিশ্চিত জানতেন সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানী তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে তীব্রতর সংগ্রামের আহ্বান জানাবেন। সত্যিই তিনি শোষকের নিকট ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্কস্বরূপ।

মওলানার প্রভাব শুধুমাত্র বর্তমানের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিপীড়িত মানুষের জন্য তিনি সংগ্রামী মশাল হাতে সরল মন নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা। নিপীড়িত মানবতার মুক্তি সংগ্রামে তথা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোকে প্রথম ও প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৫৪ সালে স্টকহলমের বিশ্বশান্তি সম্মেলন থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সালের ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে জীবনের ৯৬টি বছর এক অপূর্ব সামঞ্জস্য বজায় রেখে আন্দোলন করেছেন। আর এই অবিরাম সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই মজলুম জনগণের হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন। তাই কবির ভাষায় ঃ

"শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে
হৃদয়ে নগরে
মুখের ভাষায় শুনি, বুকের সাড়ায় শুনি, চোখের তারায় দেখি নাম
মৌলানা ভাসানীর নাম।"

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. ভাসানী যখন ইউরোপে—খোন্দকার মোহম্মদ ইলিয়াস
২. মওলানা ভাসানী— আরেফিন বাদল সম্পাদিত
৩. মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন—ফিরোজ আল-মুজাহিদ

www.pathagar.com

মওলানা খালেদ সায়ফুল্লাহ্

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ও মওলানা ভাসানী

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয়। কিন্তু সাথে সাথে হায়েনাকবলিতও হয়। মওলানা ভাসানী অন্তরীণমুক্ত হয়ে দেশে আসেন বাহাত্তরের বাইশে জানুয়ারী। তিনি দেশে এসেই ৬ই ফেব্রুয়ারী কর্মীদের ডাকেন সন্তোষে। তিনি সেদিন সন্তোষে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে ভারতীয় মতলব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, অবিলম্বে বাংলার মাটি হতে অপসারণ করতে হবে ভারতীয় সকল সৈন্য এবং বন্ধ করতে হবে বাংলার মাটিতে ভারতীয় সৈন্যের লুটপাট।

এ পর্যায়ে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম উন্নীত হলো এক নবতর পর্যায়ে। দীর্ঘ বাইশ-তেইশ বছর যাবত যে মানুষটি ভারতের দালাল, নেহরুর দালাল আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছিলেন পাক-ভারত মৈত্রীর দাবী জানিয়ে, তিনিই এখন আবার প্রধান প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসাবে দাঁড়ালেন ভারতের আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা, রুশ-ভারতের মদদ, ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি, রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন লাল, নীল, সশস্ত্র বাহিনীর নির্যাতন উপেক্ষা করে মুজিব পরিচালিত আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী ও রুশ-ভারতবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল একমাত্র মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পক্ষেই।

সেই কর্মী সম্মেলনেই ন্যাপকে পুনর্গঠিত করার কর্মসূচী ঘোষণা করলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

তিনি আবারও অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, এবারও স্বাধীনতার স্বাদ জনগণের ঘরে ঘরে পেঁৗছার কোন সম্ভাবনা নেই। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির তো প্রশ্নই আসে না, রাজনৈতিক স্বাধীনতাও যেন সম্পূর্ণ অর্থহীন ও

www.pathagar.com

অকেজো হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার নামে যেন প্রভু বদল হয়েছে। পিণ্ডির স্থান দখল করেছে দিল্লী। এবার বাংলার জনগণ যেন ধর্মীয় স্বাধীনতাও হারিয়ে ফেলেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দিকে অনেক জায়গায় মাথায় টুপি পরে চলাফেরা করাও মুসলমানদের পক্ষে কঠিন ছিল। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে যখন অনেক স্থানে মুসলমানদের উপর নেমে এলো নিপীড়ন, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে বাংলাদেশের বুকে নেমে এলো চরম ধর্মহীনতা, তখনও একমাত্র মওলানা ভাসানীই রুখে দাঁড়ালেন এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের জজবা এবং ইসলামী জোশ সৃষ্টিতে তৎপর হলেন।

বাংলাদেশে ইসলামের ও মুসলমানদের সে দুর্দিনে দেখা যায় নি কোন মর্দে মুজাহিদকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে।

মওলানা ভাসানী বিশ্ববাসীকে অবগত করিয়ে দিলেন যে, চব্বিশ বছর ধরে পাঞ্জাবীরা বাংলার সম্পদ যা লুণ্ঠন করেছে ভারতীয় সৈন্যরা কয়েকদিনে লুণ্ঠন করেছে তার চেয়েও শত গুণ বেশী। তিনি বললেন, 'আমি দেখি নাই, আমি শুনি নাই, আমি কোন ইতিহাসে পড়ি নাই, কোন ইতিহাসে আছে কিনা জানি না যে, একটি বিজয়ী দেশও এভাবে লুণ্ঠন করেছে কোন বিজিত দেশে, যেভাবে বাংলাদেশে লুণ্ঠন করেছে ভারতীয় সৈন্যরা। হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম থেকে আরম্ভ করে তরি-তরকারী, মাছ, মাংস, হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু, ধান, চাউল, রেডিও, ট্রান্‌জিস্টার, টেলিভিশন, স্বর্ণ, চাঁদি, তামা, কাঁসা, থালা-বাসন, প্লেট, চামচ, চেয়ার, আলমারী, খাট, পালং, মোটরগাড়ী, ট্রাক, কার, রেলের ইঞ্জিন, বগী মায় কলকারখানাশুদ্ধ গাড়ী বোঝাই করে করে ভারতীয় সৈন্যরা নিয়ে গেছে। ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, হিটলার, মুসোলিনী, হালাকু খান, চেঙ্গিস খান, আলেকজাণ্ডার, তাতার, মোগল—কেউ কোনদিন এভাবে কোন দেশকে লুণ্ঠন করেছে বলে কোন ইতিহাসবেত্তার, কোন ইতিহাসের পাঠকের তা জানার কথা নয়। বাংলার ইতিহাস শোষণের ইতিহাস, লুণ্ঠনের ইতিহাস, সে ইতিহাসের যেন শেষ নেই। বিংশ শতকের আগের লুণ্ঠনের ইতিহাস বাদ দিলেও এই শতকে বাংলাদেশকে লুট করেছে ইংরেজ। তাদেরকে তাড়ানোর পর বাংলাদেশকে লুট করেছে পাঞ্জাবীরা, সর্বশেষ লুট করলো ভারতীয়রা। কিন্তু অন্য লুটেরারা বাংলাদেশকে এভাবে নিঃস্ব করে নাই।'

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদররা মিলে যা লুট করেছে, সে সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যও ভারতীয় সৈন্যদের হস্তগত হয়। তাও তারা নিয়ে যায় সাথে সাথে আর যা ছিল বাংলার সম্পদ, টেলিফোনের সেট, টেলিফোনের তার, ইলেক্‌ট্রিকের তার, কল-কারখানার যন্ত্রপাতিও খুলে খুলে নিয়ে গেছে তারা।

এই নেওয়ার পর যা বাকী ছিল রাজাকার, আলবদরদের ঘরে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়া মানুষদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর তা লুন্ঠন করতে আরম্ভ করলো আওয়ামী মুজিববাদী লুটেরা হাইজ্যাকাররা।

তাতেও তাদের সাধ মিটলো না, ব্যাংক ও কল-কারখানা জাতীয়করণ করে কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কোন হিসাব নিকাশ না করে এক একজন পরিচালক নিযুক্ত করে দেওয়ায় তারা ব্যাংক এবং কল-কারখানার সঞ্চিত মালামাল লুট করতে আরম্ভ করে দিল এবং সেই লুণ্ঠিত মালামালের ভাগ-বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ কোন্দলের ফলে সৃষ্টি হলো ছিনতাই, হাইজ্যাকিং। সে ব্যাধি থেকে বাংলার সমাজ আজো মুক্ত হতে পারে নি।

মওলানা ভাসানী সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন এই সকল লুটপাট-হাইজ্যাকের। তিনি আওয়ামী লীগের নাম দিলেন 'লুটপাট সমিতি'।

স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্যোগ নেয়া হলো পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে। মওলানা ভাসানী বললেন, 'পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত সদস্যগণের কোন অধিকার নাই, কোন আইনগত ভিত্তি নাই স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনার। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন মানুষের ভোটে স্বাধীন দেশের শাসনতন্ত্র রচনার মেণ্ডেট নিয়ে নির্বাচিত গণ পরিষদ রচনা করবে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র।'

সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করে গঠন করা হলো রক্ষীবাহিনী। তাদের পোশাক দেওয়া হলো ভারতীয় বাহিনীর পোশাকের অনুরূপ। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সদস্যগণকে প্রমোশন দেওয়া হলো সেনাবাহিনীর নিয়মরীতি লংঘন করে। সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠলো। তাই শুরুতেই মওলানা ভাসানী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন রক্ষীবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশ ভারতের সাথে পঁচিশসালা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করলো। মওলানা ভাসানী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তিকে 'গোলামী চুক্তি' আখ্যা দিলেন এবং চুক্তি

www.pathagar.com

বাতিলের দাবী জানালেন। অবশ্য বাংলাদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রাশিয়ার সাথে ভারত বিশসালা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছিল যাতে করে বাংলাদেশ-ভারত-রাশিয়া একই মৈত্রী নিগড়ে তারা গোলামীর বন্ধনে রাশিয়ার সামরিক জোয়ালে আবদ্ধ হলো।

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন ঃ নক্‌শাল দেখা মাত্র গুলী কর। মওলানা ভাসানী পল্‌টনে সিংহের গর্জনে হুংকার ছেড়ে বললেন, 'নক্‌শাল কারো গায়ে লেখা থাকে না যে, দেখামাত্র গুলী করবা।'

স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আলশামসের নেতাদের জেলে আটকানো হলো মুক্তিযোদ্ধাদের রোষানল থেকে রক্ষার জন্যে। স্বাধীনতা-বিরোধীদের বিচার করে যথাযোগ্য শাস্তি না দিয়ে, পাইকারীভাবে ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। তখন জেলে অবস্থানকারী সবুর খান, শাহ্‌ আজিজ প্রমুখের মুক্তির দাবী জানালেন মওলানা ভাসানী।

বাংলাদেশে আর একবার প্রমাণিত হলো যে, মওলানা ভাসানী দলমত নির্বিশেষে সকল প্রকার রাজনৈতিক দমন পীড়নের বিরুদ্ধে ছিলেন। এমন কি যারা মওলানা ভাসানীর চরম বিরোধিতা করেছে, মওলানা ভাসানীকে রাজনৈতিক কারণে নির্যাতন করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের উপর রাজনৈতিক কারণে নিপীড়নের বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছেন আজীবন।

মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার ছোবল থেকে রক্ষার জন্যে মওলানা ভাসানী যখন ইসলামী জজবা উজ্জীবনকারী কথা বলতেন তখন আবার অনেকে মওলানা ভাসানীকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দেওয়ার অপ-প্রয়াস চালালেন। এমন কি তাঁর নিজস্ব দল ন্যাপের মধ্যে তখনও যে সকল কম্যুনিস্টরা অবস্থান করছিলেন তারা ন্যাপের সভায় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শ্লোগান তোলার চেষ্টা করতেন। আবার দেখা গেল মওলানা ভাসানী যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুকুমাতে রাব্বানীয়া কায়েমে রাজী আছে কিনা?' তখন জাতীয় গণতন্ত্রীদের পরিবর্তে সে সকল কম্যুনিস্ট বন্ধুরাই হাত তুলে স্বীকৃতি জানালেন।

৩রা জুন ১৯৭৩ সাল। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে মওলানা ভাসানীর আরেক ঐতিহাসিক ডাক—ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিলেন।

১৭ই জুন অনুষ্ঠিত হলো সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কর্মী সভা ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে। জনাব আতাউর রহমান, অলী আহাদসহ সকল দলের নেতৃবৃন্দ ওয়াদা করলেন ভারতীয় পণ্য বর্জন আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়ার।

www.pathagar.com

৩০শে জুন, মওলানা ভাসানী শান্তিনগরস্থ দলীয় কার্যালয় হতে মুজিব সরকারের আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলেন। মিছিলের পুরোভাগে মওলানা ভাসানীর পিছে পিছে তখনকার মত দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত শতাধিক কর্মী। রমনা থানার নিকটবর্তী স্থানে মিছিল হতে মওলানা ভাসানীকে তুলে নিয়ে সন্তোষে তাঁর নিজগৃহে অন্তরীণ করা হলো। সেই অন্তরীণাদেশ থেকে মওলানা ভাসানী মুক্তি পেলেন শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হবার পর, তার পূর্বে নয়। মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ রেখে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলসহ জনগণের আশা-আকাঙক্ষাকে দলিত মথিত করে; গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরে, নির্মমভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করে গঠন করা হলো বাকশাল। তার আগেই চালু হয়েছিলে প্রেসিডিন্সিয়াল পদ্ধতি। বাকশাল চালু করে সকল দল নিষিদ্ধ করা হলো। সিভিল, মিলিটারী নির্বিশেষে সকল সরকারী অফিসার, পুলিশ, বি. ডি. আর., সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী সকলের জন্যে বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হলো। দলে দলে বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়ে গেল। মওলানা ভাসানীকে বাকশালের চেয়ারম্যান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী বাকশালে যোগদানের চেয়ে অন্তরীণাবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে রাজী হলেন।

গণতন্ত্রের জন্য এক সময় সংগ্রাম করলো যে দল, সে দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনগণের সকল অধিকার হরণ করে নিল। রুশ-ভারতের গোলামীর নিদর্শন এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে?

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট দুঃসাহসী কয়েকজন বীর সৈনিকের বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে ক্ষমতার পট পরিবর্তিত হলো। বাকশালের রাহুগ্রাস থেকে জনগণ মুক্তি লাভ করলো। কিন্তু রাজনীতির পট পরিবর্তন হলো না।

পচাঁত্তরের ১৫ই আগস্টের পর মওলানা ভাসানীর নবতর সংগ্রাম আরম্ভ হয় রুশ-ভারত অক্ষশক্তি ও তাদের এ দেশীয় এজেন্ট আওয়ামী-বাকশালীদের বিরুদ্ধে।

তারপর ভারতের একগুয়েমীর কারণে যখন ফারাক্কার ন্যায়সঙ্গত সমাধান অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন মৃত্যুশয্যা হতে মওলানা ভাসানী ডাক দিলেন ফারাক্কা মহামিছিলের (লং মার্চ)। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মোনা-জাত সভায় ফারাক্কা মিছিলের ঘোষণা দিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে মহীপুরের শান্তি সম্মেলনেই ফারাক্কা মহামিছিলের ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মওলানা

www.pathagar.com

ভাসানী দীর্ঘ সীমান্ত সফর করে খুলনায় অসুস্থ হয়ে হেলিকপটার যোগে পি. জি. হাসপাতালে নীত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন বিধায় মহীপুরের শান্তি সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি।

আগ্রাসী শক্তির কবল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মানসে সেদিন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও নবতিপর বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী ফারাক্কা মহামিছিলের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে ফারাক্কার বিষয় জাতিসংঘে উত্থাপনের ব্যবস্থা করে ভারতকে বাধ্য করেছিলেন ফারাক্কাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে স্বীকৃতি দিতে।

জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ভারতীয় শর্তে ফারাক্কা চুক্তি না করার জন্য বলেছিলেন জিয়াউর রহমানকে মওলানা ভাসানী। তিনি বলেছিলেন, 'ভারত তোমার শর্ত না মানলে ফায়সালা হবে জাতিসংঘে।'

এ পর্যায়ে মওলানা ভাসানী জাকের সম্মেলন, জোয়ান কর্মী শিবির, হুকুমাতে রাব্বানিয়া সমিতি, খোদাই খিদমতগার প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন করেছেন।

মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ জীবনে বৃটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশ আমলের সকল আন্দোলন ও সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মওলানা ভাসানী যাবতীয় শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। লড়াই করেছেন জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, আগ্রাসনবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। তাঁর মতের গরমিল ছিল কম্যুনিস্টদের সাথে, ইসলামপন্থীদের সাথে, সুবিধাবাদী জাতীয়তাবাদীদের সাথে। তবে তিনি কি ছিলেন? কি তাঁর পরিচয়? কি তাঁর আদর্শ? ভাসানীর নিজস্ব কোন আদর্শ ছিল কি?

আসলে মওলানা ভাসানীর ভিন্ন কোন আদর্শ ছিল না। থাকতে পারে না। তিনি রবুবিয়াত তথা ইসলামী আদর্শ কায়েমের নতুন নতুন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন মাত্র এবং তাঁর এ আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাস জন্মেছিল হক্কানী ওলামাগণের সাহচর্যে ও তাঁর পীর হযরত নাসিরউদ্দিন বাগদাদীর একান্ত প্রচেষ্টায়। তিনি দেওবন্দে যে দীক্ষা পেয়েছেন তাই কার্যকরী করার জন্য আজীবন প্রচেষ্টা করে গেছেন।

অধ্যাপক আবদুল গফুরের ভাষায়ঃ মরহুম মওলানা ভাসানী দেওবন্দে অবস্থান কালে এবং তৎপরবর্তীকালেও মওলানা হাসরত মোহানী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শায়খুল হিন্দ, হযরত মওলানা মাহমুদুল হাসান, মওলানা মোহাম্মদ আলী,

www.pathagar.com

মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তাঁর পীর হযরত মওলানা নাসিরউদ্দীন বোগদাদী ও দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানীর কাছ থেকে যে বিপ্লবী জীবন দর্শন লাভ করেছেন, তা থেকে মওলানা ভাসানীর এসব বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মেছিল। এ দর্শন রবুবিয়াতের দর্শন যার মূল কথা বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপ্রতিপালক যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব মানবকে লালন-পালন করেন, মানুষেরও কর্তব্য সেই প্রতিপালন ব্যবস্থা কায়েম করা। তাই মওলানার জীবনে হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ এমনভাবে মিশে গেছে, যাকে আলাদা করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

তিনি মনে করতেন এবং বলতেনও যে, তথাকথিত ইসলামপন্থীদের মধ্যে হক্কুল্লাহ্ আদায়ের প্রচেষ্টা যা-ই থাকুক না কেন, হক্কুল এবাদ আদায়ের কোন প্রচেষ্টা নেই। অপর দিকে কম্যুনিস্টদের মধ্যে হক্কুল এবাদ আদায়ের প্রচেষ্টা আছে বটে কিন্তু হক্কুল্লাহ্ নামমাত্রও নেই। এখানেই মওলানা ভাসানীর বৈশিষ্ট্য। এখানেই কম্যুনিস্ট ও তথাকথিত আলিমদের সাথে মওলানা ভাসানীর পার্থক্য। তাই মাওলানা ভাসানী ভাসানীই। তাই মওলানা ভাসানীকে তাঁর মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে। অন্য কোন মানদণ্ডে নয়। তাঁকে প্রচলিত মান-দণ্ডে বিচার করতে গিয়েই কম্যুনিস্টরা মনে করেছেন সংস্কারবাদী আর এক শ্রেণীর ইসলামপন্থীরা মনে করেছেন কম্যুনিস্ট।'

এ প্রসংগে তাঁর ১৯৭৩ সালের বিবৃতি স্মর্তব্য। বিবৃতিটি হচ্ছে ঃ

মুসলিম জাহান কোন্ পথে

কোন ধর্মাবলম্বীর পরিচয়ে মুসলিম জাহান ব্যতীত আজকাল বিশ্বের আর কোন অংশ পরিচিত নহে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এমনিভাবে খৃস্টান জগত পরিচিত হইত। তাহাদের এই পরিচয় বিশেষ করিয়া গাজী সালাহুদ্দীনের আমল হইতে শুরু হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ এবং কারিগরি সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করায় ধর্মের নামে পরিচিত হইবার মূল্যবোধ লোপ পাই-য়াছে। বৌদ্ধদের জন্যও এমন একটি জগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। মুসলিম জাহানের মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ছাড়া আর সব অধিকর্তাই কমবেশী ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভিত্তিতে একটি একক জগতের মূল্যদান করিয়া থাকেন, অবশ্য এই মূল্যদানের ব্যাপারে অধিকর্তা বিশেষ আসমান জমিন পার্থক্য রহিয়াছে।

আজকের শোষণসর্বস্ব এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদসম্বলিত দুনিয়ায় মুসলিম জাহান বলিয়া একটি কথার অবতারণা করাকে অনেকে অযৌক্তিক

www.pathagar.com

অথবা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া থাকেন, তবে ইহা সত্যি যে মৌলিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলিম জাহানে যদি একবার জজবা দেখা দেয়, তবে দুনিয়ার যে কোন মহাশক্তিকে হিসাব করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু এই দাবী কিংবা চ্যালেঞ্জ আজ পাগলের পাগলামী বৈ কিছুই নয়।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তিকে মোকাবিলা করিবার হিম্মত আজ মুসলিম জাহান হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবুও মুসলিম দেশগুলিতে আজও কয়েকজন চিন্তাবিদ আছেন যাঁহারা মুসলিম জাহান বলিয়া আলাদা একটি জগত ভাবিবার প্রয়াস পান। ইহাকে একটি পরিবার বলিয়া মনে করেন এবং অন্তর্নিহিত একটি আশার আলোর সন্ধানও তাঁহারা দিয়া থাকেন—ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হর কারবালা কে বাদ।

মুসলিম জাহানে একদিন রাজনীতি ছিল, অর্থনীতি ছিল, বিজ্ঞান ছিল, ভ্রাতৃত্ব ছিল, ভাব ও বস্তু উভয়েরই দর্শন ছিল, কি যে ছিল না তাহাই বলা মুশ্‌কিল, আর এত থাকার মধ্যে আজ সমাজ সংসারের আড়ালে আধ্যাত্মিক একটি প্রবাহ ছাড়া আমাদের কিছুই নাই। যে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আমাদের গ্রহণ করার কথা ছিল তাহা বিগত চৌদ্দ শত বছরের মধ্যে বড়জোর বছর বিশেক আমরা কার্যকরী করিয়াছি। যুগে যুগে তাই মুসলিম জাহানে প্রতিভার আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটিলেও সাধারণ মানুষ মৌলিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে কিয়াস, ইজমা, কিংবা ইজতিহাদের শিক্ষা পায় নাই। ফলে কোন কিছুতেই তাহাদের এস্‌তেক-বাল থাকে নাই এবং মোজাদ্দেদের সংস্কারকে ঢালাই করিয়া স্থান-কাল ও পাত্রভেদে কায়েম রাখিতে পারে নাই। এইভাবে মুসলিম জাহানের সবচেয়ে মারাত্মক যে ক্ষতিটি সাধিত হইয়াছে তাহা হইল—বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীকে সহজ এবং সুঠামভাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা হারাইয়া ফেলা। ইসলামই আসলে একটি বিপ্লব। কিন্তু আফসোস! ইসলামকে রক্ষা করিতে অসংখ্য প্রতিভা খাটাখাটনি করিলেও মূল বিপ্লবকে কায়েম রাখিতে কেহই কোন কিছু করেন নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনু-প্রাণিত হইয়া উঠিলেও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের কুচক্রে পড়িয়া তাঁহারা ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিয়াছেন।

হয়তো বা স্বীয় আন্দোলনে ক্ষেত্রবিশেষে কামিয়াবও হইয়াছেন। কিন্তু সং-গঠনের অভাবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে চূড়ান্ত বিজয় কোনদিন সম্ভব হয় নাই। পরিস্থিতি মোতাবেক হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর প্রত্যেকটি কথা

www.pathagar.com

বৈপ্লবিক ছিল। সময় বিশেষে ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর প্রত্যেকটি মন্তব্য বৈপ্লবিক ছিল। পরিবেশ অনুয়ায়ী শেখ আহমদ সরহিন্দ মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রা.)-এর প্রতিটি সংস্কার বৈপ্লবিক ছিল। কিন্তু সত্যিকারের ফায়দা হইল কোথায়?

আজ মুসলিম জাহান হাজার বছরের অভিশাপে অভিশপ্ত। কারণ খোলা-ফায়ে রাশেদীনের সাম্যের কথা বলিয়া বেড়াইলেও সম্পদের সমবণ্টন করিয়া কেহ বাস্তবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই; ভ্রাতৃত্বের কথা বলিলেও কেহ নামাযের কাতার ছাড়া আর কোথাও তাহা বহাল রাখেন নাই।

ইসলামের মৌলিক বিপ্লবকে অস্বীকার করার দরুনই আজ মুসলিম জাহানে ঐক্য নাই, সংহতি নাই, ভ্রাতৃত্ববোধ নাই। আজ মুসলিম জাহানে যদি ভ্রাতৃত্ব-বোধটি থাকিত তবে পারমাণবিক শক্তি ছাড়াই মুসলমানগণ পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু সেই ভ্রাতৃত্ববোধই আসা সম্ভব নয়, যদি না ইসলামের সাম্যবাদী সংস্কারকে কার্যতঃ সবাই গ্রহণ না করে। স্বীয় রূহানী শক্তিকে উপেক্ষা করার দরুনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ চক্রান্ত আর রুশ চালের খপ্পরে পড়িয়া গোটা মুসলিম জাহান বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা ক্রমেই জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। যে কোন দফার নামেই হউক না কেন, শান্তি আসার সম্ভাবনা মোটেই নাই। দুর্বল আশ্রয়প্রার্থীর ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যের দশ কোটি মুসলমান দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, মধ্য এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের মুসলমান-দেরও একই অবস্থা। তাহাদের দুর্বলতায় সামরিক না হইলেও ইহার চেয়েও মারাত্মক অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অর্থনৈতিক চাপে ফেলিয়া এই দেশ কয়টি লইয়া দাবা খেলিতেছে। দেশের শাসনযন্ত্রই যদি বিদেশী দয়ার উপর চলে তবে দেশবাসীর নসিবে কি থাকা স্বাভাবিক, পাঠকমাত্রই তাহা উপ-লব্ধি করিতে পারেন। এহেন নসিবওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বিজ্ঞ নাট্য-কার জর্জ বার্নাড শ' ইসলাম ধর্ম সরাসরি গ্রহণ করেন নাই। জর্জ বার্নাড শ'-এর মত ইসলামের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বহু জ্ঞানীগুণী আজকের দুনিয়ায়ই পাওয়া যাইত যদি যে অর্থনীতি লইয়া ইসলাম আবির্ভূত হইয়াছিল এবং যে রূহানী শক্তিতে মোমেন মুসলমানগণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা থাকিত। মুসলিম জাহানের অসংখ্য মুসলিম দেশে রাজতন্ত্র কায়েম আছে। ধনতন্ত্র ও সামন্তবাদ আজও কায়েম আছে। ইসলাম তো শুধু মসজিদের সাম্য লইয়া আসে নাই, ভাত কাপড়ের চাহিদারও সাম্য লইয়া আসিয়াছে। প্রতি বৎসর হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ওফাত পালন করা হয়। কিন্তু ওফাতের সময় এক কপর্দকও যে তাহার সঞ্চয়

www.pathagar.com

ছিল না, তাহা কেহ স্মরণ করেন না কিংবা স্মরণ করিলেও আমল করেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন মুসলমান কোন কিছুই ভোগ করিতে পারিবে না, সঞ্চয় করিতে পারিবে না, ইহাই ইসলামের শিক্ষা। আবার এই শিক্ষা রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কায়েম করিতে হইবে ইহাও নির্দেশ। কিন্তু কোথায়ই বা শিক্ষার আমল কোথায়ই বা নির্দেশের বাস্তবায়ন? মোট কথা 'মূল হইতে মুসলমান বহুদূরে সরিয়া' পড়িয়াছে। কেহ কেহ মূলের সন্ধান জানেন কিন্তু দশ চক্রে পড়িয়া কিছুই করিতে পারিতেছেন না।

কিন্তু না করিতে পারাটা কোন কৈফিয়তের জবাব নয়। ইতিহাস তো আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। সময় কাটিয়া যাইবে, ইতিহাসের পরিচ্ছেদও বাড়িয়া চলিবে। অনতিবিলম্বে আমাদিগকে নতুন একটি পরিচ্ছেদের সূচনা করিতে হইবে। ভাবুকের ন্যায় শুধু তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়াইলে চলিবে না।'

মওলানা ভাসানীর উপরিউক্ত ভাষণ সম্যক অবহিত হওয়ার পর তাঁর আদর্শ সম্পর্কে আর ব্যখ্যা বিশ্লেষণ এবং মতভেদের কোন কারণ থাকা উচিত নয়।

আজকের এই দ্বন্দ্ব সংঘাতময় যুগে বিশেষ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে আর এক মুহূর্তও কালবিলম্ব না করে ভাসানী অনুসৃত আদর্শের রূপায়ণে তাঁর অনুসারীদের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

এই আদর্শ কায়েমের জন্যে প্রয়োজনীয় আদর্শবান ও চরিত্রবান কর্মী গড়ে তোলার জন্যেই মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতীব দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত অনেকেই জানেনই না যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি? রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও এ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এমন কি শিক্ষা দফতরের কর্মকর্তারাও এ ব্যাপারে কিছু জানার প্রয়োজন মনে করেন নি। আরও দুঃখের বিষয়, যাঁরা মওলানার আদর্শ কায়েমের জন্যে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং জনে জনে বিভিন্ন মতাদর্শকে এমন কি পরস্পরবিরোধী আদর্শকে মওলানা ভাসানীর আদর্শ বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তারাও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কিছু জানেন বা জানার চেষ্টা করেছেন বলে বিশ্বাস করা যায় না।

এমতাবস্থায় যাঁরা মওলানা ভাসানীর আদর্শ কায়েমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের অবগতির জন্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বর্ণিত হলো।

www.pathagar.com

মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালে থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণে খোশনদপুর (সন্তোষ) কাগমারী এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করে আসছিলেন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রচার করেন।

অতঃপর সে বছরই তিনি বিভিন্ন ব্যাংকের টাঙ্গাইলস্থ শাখায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একাউন্ট খোলেন। ১৯৭০ সালেই তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং চৌদ্দটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তাঁদের পিণ্ডিস্থ রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে পত্রালাপ করেন। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে ১৯৭০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দরবার হল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এবং ঐ দিনটিকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

দরবার হলের উদ্বোধনী ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেন, 'কাগমারী পরগণায় সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে পীর শাহ জামানের মিশন বাস্তবায়নই আমার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪২ সাল থেকে শুরু হয়েছে আমার এ সংগ্রাম। ১৯৫৭ সালে পেশ করেছিলাম আর ১৩৯০ হিজরীর ৬ই রজব মোতাবেক ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ইং সালে এর প্রতিষ্ঠা দিবস ঘোষণা করলাম।'

১৯৭১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানী সন্তোষে একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং একটি লিখিত রিপোর্ট দলিলস্বরূপ দেশবাসীর জন্যে প্রচার করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন কেন তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। উক্ত রিপোর্টেই তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ও নাস্তিক্যবাদের প্রভাবমুক্ত আমাদের উপযোগী একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা কি হইতে পারে এবং সেই শিক্ষাকে কিভাবে বাংলাদেশের সকল মানুষের দরজায় পেঁৗছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এই সব বিষয়ে বাস্তব নজির প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাখিয়া যাইতেছি। আমি আশা করি, দেশবাসী তাহা কবুল করিবেন এবং জাতির ভবিষ্যৎ সেই রূপরেখায় দেখিতে পাইবেন।'

সে ভাষণে তিনি আরও বলেন, 'আমাদিগকে আজ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী তত্ত্বগত শিক্ষার

www.pathagar.com

পাশাপাশি কৃষি, বিভিন্ন কুটির শিল্প, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় হাতেকলমে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইবে। মনের উৎকর্ষ সাধন, রূহের শক্তি বৃদ্ধির অবকাশ থাকিবে যাহা কেরানী ও গোলাম সৃষ্টি না করিয়া মানবদরদী, আত্ম-নির্ভরশীল, পরিশ্রমী এবং দেহ-মন-আত্মার দিক দিয়া সুস্থ, চরিত্রবান ঈমানদার নাগরিক গড়িয়া তুলিবে।'

তিনি ১৯৭৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সালের ৭ই এপ্রিল ও ২৭শে জুলাই পর পর তিনটি সম্মেলন আহবান করে দেশের ভিতরের বাইরের শিক্ষাজীবী, বুদ্ধিজীবীদের বার বার ডেকে বিস্তর আলোচনা এবং গবেষণার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো ও রূপরেখা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত করেন ও পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।

এভাবে মওলানা ভাসানী নিম্নতম স্তর হতে লেখাপড়ার সাথে হাতেকলমে শিক্ষা দানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল সৎ পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও চরিত্রবান কর্মী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগ হিসেবে শিক্ষা, উৎপাদন ও ব্যবসা—এ তিন পর্যায়ে মওলানা ভাসানী যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন সেগুলো হলো ঃ

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ, ২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বালক হাই স্কুল, ৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বালিকা হাই স্কুল, ৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সূচীশিল্প স্কুল, ৫. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বহুমুখী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ৬. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উইভিং স্কুল, ৮. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উইভিং ফ্যাক্টরী।

এ সবগুলোই সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত। এছাড়াও রয়েছ মৎস্য খামার, কৃষি খামার, ফলমূলের বাগান, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদি। আরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন শান্তিপ্রেস—যেখান থেকে প্রকাশিত হতো 'হক কথা' পত্রিকা। মওলানা ভাসানী ২/৩ বছরের মধ্যে সেখানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাতটি সমবায় প্রকল্প, পাঁচটি হোস্টেল, বিশাল মসজিদ, খেলার মাঠ, দরবার হল, পুকুর এসব সমেত দুই শতাধিক বিঘা জমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভুক্ত করেন।

'৭২ সাল হতে '৭৬ সাল পর্যন্ত ন্যাপ নেতৃবৃন্দসহ মওলানা ভাসানীর অন্যান্য ভক্ত অনুসারী বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অঙ্গীকার করেছেন, ইসলামী

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় খাতে মঞ্জুরী ও সকল প্রকার সরকারী সহযোগিতা পায়, সেজন্যে সচেষ্ট হবেন ক্ষমতায় গেলে।

মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায়ই যখন দেশব্যাপী একমাত্র তাঁর রাজনীতিই প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাসীনরাও যখন তাঁর রাজনীতির কথাই বলতেন, তখন বাস্তবেও দেশে অন্য কোন রাজনীতির অস্তিত্বই ছিল না, সেই '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পরবর্তী সময়ে ত্রিদলীয় চক্র যখন পর্যুদস্ত, বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে কেউ বা পাকিস্তানী হানাদারদের সহযোগী হিসেবে কেউ বা নক্‌শালবাড়ী অথবা গলা-কাটা রাজনীতি করে জনগণের সামনে আসতে কুণ্ঠিত, সাম্প্রদায়িক দলগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করার কারণে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হওয়ার ফলে জনগণ ও দেশের রাজনীতির অঙ্গন হতে বহুদূরে অবস্থিত, তখন একমাত্র মওলানা ভাসানীই সকলের ঊর্ধ্বে সর্বাবস্থায় জনগণের সাথে ছিলেন বলে, বাংলাদেশ আমলে রুশ-ভারতবিরোধী তথা আওয়ামী কুশাসন দুঃশাসনবিরোধী আন্দোলনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন বলে দেশে তাঁর রাজনীতিই প্রতিষ্ঠিত হলো। জনগণ তাঁর রাজনীতিই গ্রহণ করে নিলো। শুরু হলো বাকশালবিরোধী রাজনীতি ; আধিপত্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনবাদবিরোধী ও তাদের তাবেদারদের উৎখাত করার রাজনীতি—যে রাজনীতির একমাত্র নেতা মওলানা ভাসানীই। তাই তৎকালীন ক্ষমতাসীনরাও তাঁর রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো। তারা নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর প্রতীক ধানের শীষও কেড়ে নিল, তারা তাঁর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে মঞ্জুরী ও সহযোগিতা দানের কথা বললো। সীমান্ত সংকটের আশংকা দেখা দিল ; মওলানা ভাসানী চারণের মত ঘুরে ঘুরে ময়মনসিং হতে খুলনা পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় সভা করে জোয়ান ও জনগণের মনোবল দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুললেন। এবং সেই সীমান্ত সফরকালে বৃদ্ধ বয়সের অতিরিক্ত পরিশ্রমে খুলনায় অসুস্থ হয়ে পি.জি. হাসপাতালে নীত হন। ভারত যখন গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্‌সা প্রদানে গড়িমসি করছিল এবং কোন আন্তর্জাতিক ফোরামে এ সমস্যা আলোচনায় বাধা দিচ্ছিল বার বার ফারাক্কাকে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা বলে, তখন ফারাক্কাকে আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সমস্যা বলে স্বীকৃতি প্রদানে ভারতকে বাধ্য করেছিলেন মওলানা ভাসানীই ফারাক্কা মহামিছিল করে, জাতিসংঘে ফারাক্কা সমস্যা উত্থাপনের মাধ্যমে। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর তাঁর দলের এক বিরাট অংশ ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিয়ে এম. পি. ও মন্ত্রী হলেন, ন্যাপকে বিলুপ্ত করে তাঁরা মওলানা ভাসানীর সবচেয়ে বড় এবং শেষ ও মৃত্যুকালীন স্বপ্ন

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কি করলেন? সে বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকা জনগণের অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত।

মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ইন্‌তিকালের মাস দুয়েক পর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা প্রদান করেন। পূর্বাপর কয়েকটি কারণে ওয়াকেফহাল মহল তখন থেকেই মনে করতে থাকেন যে, মজলুম জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনের সর্বশেষ অসমাপ্ত কাজ সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বপ্নদ্রষ্টার আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত করাই হবে জেনারেলের এ ঘোষণার চূড়ান্ত সার্থকতা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ অথবা ব্যবসায়িক কাজের জন্যে মওলানা ভাসানীর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্‌তিকাল পরবর্তীতে টি.সি.বি. থেকে, সিমেন্ট ফ্যাক্‌টরী থেকে, বস্ত্রবিভাগ থেকে, সি.এণ্ড.বি. থেকে, কয়লা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড থেকে বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট সামগ্রী যথা সিমেন্ট, টিন, কাঠ, বড় কয়লা, সুতা ইত্যাদি যা কিছু মঞ্জুর ও সরবরাহ করা হয়েছে সবক্ষেত্রেই সন্তোষস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই করা হয়েছে। পূবালী ব্যাংকের শাখাটি অফিসিয়ালী সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা নামেই। সন্তোষের পার্শ্ববর্তী জায়গাসমূহ জমি, পুকুর ইত্যাদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই বাংলাদেশ সরকারই লীজ দিয়েছেন। মিউনিপাল ট্যাক্সসহ যাবতীয় ট্যাক্স বাংলাদেশ সরকারই আদায় করে আসছেন এবং আদায় করছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এখানকার পুকুর সংস্কারে গম মঞ্জুর করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ সরকারই তা বরাদ্দ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন বাংলাদেশ সরকারই মৎস্য চাষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা থাকার কারণে।

দেশী-বিদেশী, ছোট-বড় মাঝারী কত কর্মকর্তাই তো সন্তোষ এসেছেন ও আসা যাওয়া করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সবারই অফিসিয়াল ভিজিটে উল্লেখ থাকে—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন। ১৯৭৬ সালের একুশে মে তারিখে তদানীন্তন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল, শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী জনাব মজিবুল হক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এসেছিলেন মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শিক্ষা ও পরিকল্পনা

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞদের একটি টীম সন্তোষে আসা যাওয়া করেছিলেন তৎকালীন সরকারের নির্দেশেই। সরকারীভাবেই বাংলাদেশ সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ডক্টর এম.এন. হুদা মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। এতসব ঘটনার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বেতার ভাষণ প্রদত্ত হয়। উক্ত বেতার ভাষণেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় ওয়াকেফহাল মহল কি ভাবতে পারেন? স্বভাবতই সকলে ধরে নিয়েছিলযে, মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি পেতে চলেছে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের ঘোষণার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্লানিং কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু তাতে মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে সদস্য হিসেবে তো নেওয়া হয়ই নি—এমন কি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মওলানা ভাসানী যেসব পরিকল্পনা, রূপরেখা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত রেখে গেছেন সেসবের সাথেও প্লানিং কমিশন কোন প্রকার সংযোগ স্থাপন করেন নি। আবার বেশ কিছুদিন পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থান নির্বাচন কমিটি ঘোষণা করা হয়। তাতেও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত কেউই স্থান পান নি। সর্বশেষ পর্যায়ে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিল' পেশ করা হলো। তাতে সন্তোষ কিংবা মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-গন্ধও নেই।

তখন মওলানা ভাসানীর যে সকল রাজনৈতিক অনুসারিগণ, ন্যাপের এককালের নেতা ও কর্মিগণ যাঁরা ন্যাপকে বিলুপ্ত করে সরকারী দলে যোগদান করে মন্ত্রী মেম্বার হয়েছেন, তাঁরা তখন কি ভূমিকা রেখেছেন তা কারো জানা নেই। যা জানা আছে তা হলো এই যে, মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাদের মুখে রা'টি ছিল না। বড় আশ্চর্য এবং দুঃখের বিষয়, তারা কিন্তু এখনও আবার মওলানা ভাসানীর আদর্শ কায়েমে উচ্চকণ্ঠ। এমন কি যাঁরা ক্ষমতার বাইরে ন্যাপের বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁদেরও কোন সাড়াশব্দ তখন এ ব্যাপারে পাওয়া যায় নি। তাঁরাও মওলানা ভাসানীর আদর্শ কায়েম করার আপ্রাণ চেষ্টা এখন পর্যন্ত করছেন।

অপরদিকে ১৯৭৭ ও '৭৮ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সন্তোষে এসেছিলেন এবং সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঘোষিত হয়েছে জেনারেল জিয়াউর রহমান মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। ১৯৭৮ সালের চব্বিশে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পহেলা অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী সরকারী প্রোগ্রামেই মওলানা

www.pathagar.com

ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। সেই জিয়াউর রহমানের উত্তরসুরিরাও মওলানা ভাসানীর আদর্শ কায়েমে পঞ্চমুখ। কেন এত ধূম্রজাল? কেন এত লুকোচুরি?

১৯৫৭ সাল থেকে যখন মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন তখন থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সরকার ও সরকারী যন্ত্রগুলো ত বটেই, এমন কি মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দরাও আপাতদৃষ্টিতে ঘনিষ্ঠ কতিপয় সহকর্মী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শুধু আপত্তি নয়, বিশেষ বিরোধিতাও করেছেন। অথচ সকল মতামত ও অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামটিই চূড়ান্ত ফায়সালা ঘোষণাপূর্বক মওলানা ভাসানী সন্তোষে তাঁর জীবনের শেষ সাধনা অব্যাহত রেখে গেছেন। একজন বাংলাদেশীও যদি মওলানা ভাসানীর জীবন ও সংগ্রামকে প্রবহমান রাখতে চান, তার জন্যে অবশ্য করণীয় হবে মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

শেখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

জাতির চৈতন্যে অমর মহানায়ক

আজো বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অমল ধবল শ্মশ্রুমণ্ডিত শান্ত-সৌম্য জ্যোতির্ময় এক মহামানবের মুখোচ্ছবি। সে ছবি ছিলো বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের আশা-ভরসার স্থল। সেই মুখ পানে তাকিয়ে দুঃখী পেত সান্ত্বনা, উৎপীড়িত পেতো প্রতিশোধের আশ্বাস, সর্বহারা পৌঁছে যেতো 'সব পেয়েছি'র দেশে। সেই ছবির মুখাবয়বের অধিকারী মানুষটি ছিলেন এদেশের অধিকার-বঞ্চিত কোটি জনতার সোচ্চার কণ্ঠস্বর, জাতির জাগ্রত বিবেক, দরদী অভিভাবক। কেবল বাংলাদেশের নন, তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত মানুষেরও নেতা ছিলেন তিনি। তাদের ন্যায্য দাবি ও সংগ্রামের সমর্থনে শোনা গেছে তাঁর বজ্র নির্ঘোষ হুঙ্কার, জালিমের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কঠোর হুঁশিয়ারি। এ ব্যাপারে কারো রক্ত-চক্ষু ও ভ্রূকুটিকে তিনি এতটুকু পরোয়া করেন নি।

আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে তিনি চলে গেছেন আমাদের দৃষ্টি-সীমার বাইরে। কিন্তু আমাদের মানসচক্ষে আজো তিনি দীপ্তিমান। কীর্তিমান সেই মানুষকে আজো স্মরণ করছি তপ্তাশ্রুতে পুষ্পিত হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে।

বাংলাদেশের আপামর জনগণের সাথে ছিলো তাঁর অবিচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্ক। এদেশের দুঃখী মানুষেরা এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা আর কারো কাছ থেকেই পায় নি কোনোদিন। বিনিময়ে তারাও হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে অটুট বন্ধনে বেঁধেছিলো তাঁকে। তিনি ছিলেন তাদের হৃদয় সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিপতি। বলা যায় এই উপমহাদেশে কোনো জননেতা মওলানা ভাসানীর মতো জনচিত্তকে এতটা আলোড়িত করেন নি, জনগণের এমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে রাজনীতি করেন নি, এমন প্রাণঢালা ভালোবাসাও পান নি কেউ। মূলত তিনি ছিলেন জনগণের আর জনগণ ছিলো তাঁর। শুধু

www.pathagar.com

কি জননেতা, তিনি ছিলেন নেতাদেরও নেতা। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় ভাসানী মওলানা।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনিই ব্যতিক্রমধর্মী নেতা যিনি কখনো ক্ষমতার রাজনীতি করেন নি। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, জনগণের অধিকার আদায় করতে হলে জনগণের কাতারে থেকেই তার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। সমসাময়িক বিশ্বের রাজনীতির ইতিহাসে কি এমন নজির আছে যিনি ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হয়েও প্রকাশ্য জনসভায় উপস্থিত প্রধান মন্ত্রীর কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করতে পারেন? হ্যাঁ, একমাত্র মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পক্ষেই বুঝি এমনটি করা সম্ভব!

প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের রাজনৈতিক জীবনে মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যে যেমন তিনি পক্ষ-বিপক্ষের সমালোচনা হজম করেছেন, তেমনি তাঁকে হতে হয়েছে বজ্রের মতো কঠোর। বিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার স্রোতের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে তিনি সকল অন্যায়, অবিচার, অপরাধ আর নষ্ট সমাজের পংকিলতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কেউ তাঁর সাথী না হলে একাই তিনি পথ চলেছেন। কিন্তু অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি। তাঁর এই নিরাপোষ সংগ্রামী চরিত্রের জন্যেই 'দি স্টেটস্‌ম্যান' তাঁকে 'দি প্রফেট অব ভায়োলেন্স' নামে আখ্যায়িত করেছিল।

আসলে মন, মানসিকতা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-ধারার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমাদের চেয়ে শত বছরের অগ্রগামী। তাই আমাদের অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন দুর্বোধ্য। কেবল রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মীয় বিষয়েও তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অধিকারী। সে চিন্তাধারা বাস্তবে রূপায়িত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। তাঁর মৃত্যুর পর এক শোকসভার ভাষণ দিতে গিয়ে আমাদের একজন যশস্বী সাংবাদিক যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, 'তিনি ভারতে জন্ম নিলে হতেন মি. গান্ধী, রাশিয়ায় জন্ম নিলে হতেন মহামতি লেনিন, গণচীনে জন্ম নিলে হতেন মাও সেতুঙ আর ভিয়েতনামে জন্ম নিলে হতে পারতেন কমরেড হো চি মীন।' ভাসানী মওলানার ক্ষেত্রে এই মন্তব্য অতিশয়োক্তি নয় বরং অনেক বিষয়েই তিনি তাঁদের অতিক্রম করে গেছেন।

www.pathagar.com

কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিলেন তিনি। রাজনীতিতে ধোঁকাবাজি কাকে বলে তিনি তা জানতেন না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা-ই তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইতেন অকুতোভয় হয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতিই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের নেতা। তাই তাঁর ঘরদোর, আসবাবপত্র, তাঁর শোবার তক্তপোষ, বিছানাপত্র ও ব্যক্তিগত পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি তাঁর খাদ্য তালিকাও ছিলো বাংলাদেশের আর দশজন সাধারণ চাষাভুষারই মতো। সন্তোষের যে বাড়ীটিতে তিনি বাস করতেন সেটাও তাঁর নিজের ছিলো না—এক মুরিদানের দেয়া উপহারমাত্র। সন্তোষের মহারাজার বিশাল বাড়ির সব কিছুই তিনি দান করে গেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে।

টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ আলী কলেজসহ আসাম ও বাংলাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি কখনও নিজের নাম ব্যবহার করেন নি। তাঁর সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া আলেমা ভাসানী পিতৃপ্রদত্ত পাঁচ শ' বিঘা জমি পাঁচবিবি কলেজকে দান করে দিয়েছিলেন তাঁরই অনুপ্রেরণায়। অথচ এই সর্বত্যাগী মানুষটিরই নামে সন্তোষের রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ মহল কুৎসা রটনা করে তাঁকে জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার কম অপপ্রয়াস চালায় নি।

জীবনসায়াহ্নে অসুস্থ শরীর নিয়ে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলের মাধ্যমে শেষবারের মতো তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন প্রবল শক্তিধরের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে হয়। সাধারণ লুঙ্গি, পাঞ্জাবী ও তালের আঁশের টুপি পরিহিত একজন সাধারণ চাষীর অবয়ব যাঁর সর্বাঙ্গে, সেই নিরস্ত্র মওলানার শান্তিপূর্ণ মিছিলকে সত্য সত্যই সেদিন ভয় পেয়েছিল বাংলাদেশের ২৫ গুণ বৃহৎ ও শক্তিশালী একটি দেশ। বিএসএফ বাহিনীর হাজার হাজার জওয়ানকে সেদিন যুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত রাখা হয়েছিল ফারাক্কা সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায়।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের নয়নের মণি। তাঁর মৃত্যুর পর দেশের সরকারও তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে নি। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পর সাত দিন রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালন এক মওলানা ভাসানী ছাড়া ইতিপূর্বে এদেশে আর কারো ভাগ্যেই ঘটে নি।

www.pathagar.com

মরহুম মওলানা ভাসানী এদেশের গণমানুষের কতখানি প্রিয় আর ভালেবাসার পাত্র ছিলেন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর চেহলামে যোগ দিয়ে। দীর্ঘ ৪০ দিন পরেও আমার কেবল মনে হয়েছিল সারা সন্তোষ যেন মুহ্যমান। মনে হয়েছিল সন্তোষের আকাশ, বাতাস, বৃক্ষলতা ও পথে-প্রান্তরে যেন উত্থিত হচ্ছে একটা অস্ফুট গুমোট কান্নার ধ্বনি। চেহলাম অনুষ্ঠানে আগত হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগীর চোখে-মুখে তখনো লেগেছিল সুস্পষ্ট কান্নার চাপ। দীর্ঘ দিনেও তাদের কান্না থামাতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি তাদের প্রিয় নেতা, প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের বিচ্ছেদ-বেদনা। স্বজন হারানোর দুঃসহ বেদনায় মথিত সেই সেই অসহায় করুণ মুখে সেদিন আমি লক্ষ্য করেছিলাম দুখিনী বাংলার লাখো কোটি মেহনতি, দরিদ্র, ভুখা-নাঙ্গা নরনারী ও শিশুর মুখ। তাদের বোবা চাহনিতে যেন একটি মাত্র জিজ্ঞাসা ঃ হায়! কে আর তাদের হয়ে লড়াই করবে শোষকের বিরুদ্ধে? ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, গর্কি, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে কে ছুটে আসবে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে? মজলুম উৎপীড়িতের মাথায় কে বুলিয়ে দেবে স্নেহের উষ্ণ পরশ, কে শোনাবে সান্ত্বনার বাণী? তাদের হয়ে কথা বলার জন্যে বুঝি আর কেউ রইলো না!

www.pathagar.com

শরীফুল ইসলাম আলমাজী

রূপকথার রাজপুত্র মওলানা ভাসানী

সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে জন্মেছিলেন আফ্রো-এশিয়া লাতিন আমেরিকার সিংহপুরুষ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সৌভাগ্যক্রমে সেই গ্রামেই আমার জন্ম। স্বাভাবিক কারণেই আমাদের পরিবারের ওপর ছিলো মওলানা ভাসানীর প্রচণ্ড দখল। রাজনীতির হাতেখড়ি যাঁর কাছ থেকে সেই মা'র মুখে ছেলেবেলা রূপকথার গল্পের পরিবর্তে শুনেছি মওলানা ভাসানীকে নিয়ে প্রচলিত হাজারো কিংবদন্তী। অবাক বিস্ময়ে ভেবেছি সে সব কথা। অজান্তে ছোট্ট মনের গহীনে আধিপত্য পেয়েছেন কিংবদন্তীর এই মহানায়ক। সেই অবুঝ ভালোবাসা সময়ের সাথে সাথে সক্রিয় রাজনীতির ঘাত-প্রতি-ঘাতের মধ্য দিয়ে পেয়েছে পূর্ণতা। ভালোবাসা হয়েছে পরীক্ষিত।

মাঝারি কৃষক হাজী শরাফত আলীর ছেলে চেগা মিয়া। ছ'বছর বয়সে হারা-লেন বাবাকে। এগারো বছরে পা দিতেই হারালেন জন্মদাত্রী মাকে। স্কুলে যাবার বয়সে জীবন ধারণের জন্য যাঁকে পা দিতে হয়েছে ঘরের বাইরে। সেই চেগা মিয়াই হলেন এক অলৌকিক কমপিউটার। অনায়াসে বলে যেতেন বিশ্ব-রাজনীতির কথা, বৃহৎ শক্তির আগ্রাসনের কথা। করে যেতেন বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁর ভবিষ্যত বাণী শুনতে ছুটে আসতো পশ্চাত্যের বড় বড় সাংবাদিক। কেমন করে তিনি বলতেন? সে বিস্ময় সকলের মতো আমারও!

যে শিশু ছেলেবেলায় হারিয়েছেন বাবা-মাকে, চাচাতো ভাইদের অত্যাচারে কিশোর বয়সেই হতে হয়েছে স্বজনহারা, সেই এতিম শিশুই হলেন পরবর্তীতে কৃষকের নয়নমণি। হাজারো মানুষের হলেন আপন জন। দেশের বাইরেও তাঁর গড়ে উঠলো হাজার ভক্ত। ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বিশ্ব হয়েছিল শোকাচ্ছন্ন। কেমন করে, সে বিস্ময় সকলের মতো আমারও।

www.pathagar.com

বৃটিশ সরকার এবং তার পা-চাটা দালাল জমিদারদের অত্যাচারের লাগাম টেনে ধরার অপরাধে তিনি হয়েছিলেন দেশান্তর। আসামের গহীন বনে যিনি গড়েছিলেন বসত, সেখানেই তিনি পেলেন উপাধি। হলেন ভাসান চরের ভাসানী। জন্ম দিলেন লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলন। কালাজ্বর, ডেঙ্গু জ্বর আর ঝাড়-জঙ্গলের দেশে গড়ে তুলেছিলেন 'আসাম চাষী মজুর সমিতি'। গড়ে তুললেন অনেক মসজিদ, মক্তব, স্কুল। ১৯২৮ সালে আসামের ঘাগমারিতে বিপুল সংখ্যক সহকর্মী ও ভক্তদের নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে তুললেন মানুষের বসত এলাকা। ঘাগমারি হলো হামিদাবাদ। তাঁর একটি মাত্র কথায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ গড়ে তুলেছিল মসজিদ। পরের দিন সকালে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল ফযরের আযানে। কেমন করে, আজও এ এক জিজ্ঞাসা !

কৃষকের সন্তান মওলানা। শহরের তথাকথিত চাকচিক্য তাঁকে লালায়িত করে নি। ৯৮ ভাগ সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষ ছিলো তাঁর সঙ্গী। ঋণসালিশী বোর্ড থেকে শুরু করে এদেশে যতোগুলো সংস্কারমূলক আইন পাশ হয়েছে প্রতিটির পেছনে মওলানা ভাসানীর দান অনস্বীকার্য। কৃষকের নয়নমণি মওলানা ভাসানী পুরো জীবন কাটিয়েছেন গাঁয়ের সরল প্রাণ কৃষকের মাঝে। আর তাই তিনি কৃষকের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারতেন সঠিকভাবে। অলৌকিক কম-পিউটারের মতো বলে যেতেন কখন চালের দাম কতো, আলুর দাম কতো, সারের কতোটা মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। বলে যেতেন ঝড়ে বা খরায় কৃষকের কতোটা ক্ষতি হয়েছে। বলে যেতন কৃষকের ঘরের হাহাকারের কথা।

তিরিশ দশকে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলায় মওলানার কৃষক প্রজা সম্মেলন আজও এক অবাক বিস্ময়। এ সম্মেলনে কতো সংখ্যক কৃষকের সমন্বয় ঘটেছিল তা অনুমান করাও দুরূহ। দু' মাইল দীর্ঘ চৌকায় খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। কৃষকের ঋণ মওকুফের যে দরখাস্ত করা হয়েছিল তার পরিমাণ ছিলো ১৬টি গরুর গাড়ী ভর্তি। এই সম্মেলনের কারণেই সালিশী বোর্ড আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সরকার। মওলানা ভাসানীর শাহপুরের কৃষক সম্মেলন পাকিস্তান হবার পর সর্ববৃহৎ ও প্রথম কৃষক সম্মেলন।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। কিতাবী জ্ঞানের আলোকে তিনি শোষণের বিরোধিতা করেন নি। নিজ জীবনে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে তিনি হয়েছেন প্রতিবাদী। আর তাই

www.pathagar.com

তাঁর প্রতিবাদ এতো বস্তুনিষ্ঠ যার ফলে মুহূর্তেই ভরা জনসমুদ্রে বয়ে যেতো বিক্ষোভের দাবানল। শুধু একটি মাত্র বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি অগণিত জনতাকে করে তুলতেন মারমুখো। ভেঙে দিতে পারতেন জালেমের কালো হাত। আর তাই মওলানা কর্মসূচী দিলেই কেঁপে উঠতো জালিমের তখ্‌তো-তাউস।

মওলানা কি যাদু জানতেন? তিনি কি ছিলেন হ্যামিলটনের সেই বিখ্যাত বংশীবাদক? পল্টনের ভরা জনসমুদ্রে দেখেছি সে কী বিশাল উত্তেজনা! কখন মওলানা আসবেন? দেবেন তাঁর মূল্যবান বাণী। তৎকালীন শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমেদ, কৃষক নেতা রাশেদ খান মেননের মঞ্চে কী আকুল ব্যস্ততা! কিছুতেই গর্জন থামছে না বিশাল জনসমুদ্রের। মওলানা আসলেন। মঞ্চে উঠেই 'খামোশ' বলে হুংকার দিতেই কী অবাক নীরবতা! পিন পতন নিস্তব্ধতা। কেমন করে?

মওলানা ভাসানীর ইতিহাস শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার শোষিত মানুষের জ্বলে ওঠার ইতিহাস। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই কিংবদন্তীর নায়ক, মুকুটহীন সম্রাট, কৃষকের নয়নমণি, শতাব্দীর সিংহপুরুষকে নিয়ে কেউ কেউ বিতর্কও তোলেন।

কেউ বলেন মওলানা ভাসানী সাম্প্রদায়িক, কেউ বলেন গোঁড়া মওলানা, কেউ বলেন ভারতের দালাল, কেউ বলেন ভারতবিরোধী, কেউ বলেন মওলানা কম্যুনিস্ট, কেউ বলেন সি. আই.এ.-র এজেন্ট, কেউ বলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। কারো মতে মওলানা শুধু ভাংতে জানেন, গড়তে জানেন না। কারো মতে মওলানা ক্ষমতায় যান নি। তিনি মুকুটহীন সম্রাট। কারো মতে মওলানা ক্ষমতায় যেতে পারেন নি। ব্যর্থ রাজনীতিবিদ। কিন্তু মওলানা আসলে কি ছিলেন?

১৯৭০ সালে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে গোটা দক্ষিণ বাংলা। মানুষের মরদেহ ঠুকরে ঠুকরে খেলো কুকুর, শেয়াল আর কাক, শকুন। মওলানা তখন ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি ছুটে গেলেন দক্ষিণ বাংলার বিধ্বস্ত দিশেহারা মানুষের পাশে। ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনের বিশালে জনসভায় দাঁড়িয়ে মওলানা হাত উঁচিয়ে বললেন, 'ওরা কেউ আসে নি।' নিপুণ শিল্পীর মতো ভরা জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি দুর্গত এলাকার মানুষের করুণ চিত্র আঁকলেন। সরকারের উদাসীনতা

www.pathagar.com

ও ব্যর্থতায় অবাক মওলানা ঘোষণা করলেন 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'। কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'সফেদ পাঞ্জাবী' কবিতায় লিখলেন, 'বল্লমের মতো বার বার ফুঁসে ওঠে তার হাত।' এ কারণেই অনেকে বলেন মওলানা ভাংতে জানেন। মওলানা জানেন জ্বালাও পোড়াও।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে মওলানার ভূমিকা প্রসঙ্গে টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদক তাঁকে আখ্যায়িত করেন 'প্রফেট অফ ভ্যায়লেন্স' বলে। প্রতিবেদক এক স্থানে লিখেছিলেন একজন মানুষই গত মাসে পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ূব খানকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

ভারতের মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি যখন রুখে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে বলা হতো সাম্প্রদায়িক। আবার সেই মওলানাই যখন পরম করুণাময়ের কাছে দু'হাত তুলে সকল ধর্মাবলম্বী দেশবাসীর জন্য মোনাজাত করতেন, সকল ধর্মের মানুষই তাঁর কাছে আসতো দোয়া, তাবিজ, পানি পড়ার জন্যে, তখন তাঁকে বলা হতো পীর।

মওলানা ছিলেন মানবপ্রেমিক। আর এ কারণেই তিনি বলতেন 'কেউ খাবে, কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না।' তখন তাঁকে বলা হতো কম্যুনিস্ট।

মওলানা আসলে ছিলেন সংগ্রামী, বিপ্লবী এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য-বিরোধী। আমার কাছে মওলানা ভাসানী এখনো মায়ের কোলে বসে চাঁদনী রাতে শোনা রূপকথার রাজপুত্র।

www.pathagar.com

এম. এন. সালামত উল্লাহ

মওলানা ভাসানী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মরেও মরেন নি। বেঁচে আছেন কর্মে। বেঁচে আছেন স্মৃতি হয়ে মানুষের স্মৃতিপটে। বেঁচে থাকবেনও। যতদিন বাংলায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হবে এবং পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা প্রবাহিত হবে ততদিন বেঁচে থাকবেন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে। যাঁর নাম বাংলার এক প্রান্ত হতে অপার প্রান্ত পেরিয়ে বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তিনি হচ্ছেন কিংবদন্তীর নায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বিদেশী শাসনাধীনের ভেড়াজালে আবদ্ধ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পিছিয়ে থাকা এক জাতির কোলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা চিন্তাচেতনা কর্মে ছিলেন খুবই স্বাধীন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা সহ্য করতে পারতেন না। তাই তো তিনি নির্যাতিত, শোষিত ও মজলুমের নিবেদিতপ্রাণ প্রিয় নেতা। জুলুম, অত্যাচার ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কণ্ঠ। দেশে যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও অবক্ষয় মারাত্মক আকার ধারণ করতো তখন তিনি অপ্রতিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বে সোচ্চার হয়ে উঠতেন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

মানুষ নামের সার্থকতা মানব কল্যাণকর কাজে। দেশের মানুষের কল্যাণমূলক কাজে তাঁর চেতনবোধ ছিল খুবই সূক্ষ্ম। যখন বেশীর ভাগ মানুষের চিন্তাভাবনা পারিবারভিত্তিক ঠিক তখনি তিনি দেশীয় ভুখা-নাঙ্গা মানুষের অন্ন-বস্ত্র আন্দোলনে গ্রহণ করতেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কারণ তিনি যে ছিলেন নিপীড়িত মেহনতি মানুষের একান্ত বন্ধু। দেশ উন্নয়নের জন্য একাগ্র চিত্তে কাজ করে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সংস্কারমুক্ত উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। দেশ ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত হোক এটাই ছিল তাঁর কাম্য। তাই ইসলামী কর্মধারা বাস্তবায়ন করার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে স্থাপন করলেন সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ইসলাম আল্লাহ্পাকের মনোনীত ধর্ম। দুনিয়ার মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ন্যায় কাজে উৎসাহিত করা প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা-কেন্দ্রগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়। আমরা ইসলামী সামাজিক রূপ ভুলে যেয়ে বৃত্তি-মূলক কাজ থেকে সরে গিয়ে পরিশ্রমবিমুখ হচ্ছি। আমরা নিজের অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের অন্যায়ের বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকি। এভাবে অন্যায়, ভীরুতা ও মোনাফেকীর কার্যকলাপ চারদিক ঘিরে ফেলেছে। মওলানা ভাসানী এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি চিন্তা করলেন, দেশের এই জর্জরিত অবস্থায় এমন একদল ইসলামী কর্মী সৃষ্টি করতে হবে যারা ইসলামী কর্মধারা সম্প্রসারণ ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে। সেজন্য দরকার একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে জ্ঞান ও ব্যবহারিক বিদ্যা দানে উচ্চমানসম্পন্ন।

মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি বহুল আলোচিত ও আলোড়িত প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে আলাদা ধরনের। বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও এর একটি নিজস্ব স্টাইল ও স্বাতন্ত্র্য আছে যা কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। নিজস্ব সিলেবাসের ক্যারিকুলামের আওতাধীন থেকেও যুগপৎ প্রতিষ্ঠানগত এবং প্রকৃত নির্ভরশীল শিক্ষার দাবী মেটাতে পারে অর্থাৎ এটা একটি কল্যাণকর বাস্তবমুখী প্রগতিশীল শিক্ষা প্রণয়নে সক্ষম।

মানুষ সাধারণত অভিজ্ঞতা ও যুক্তিভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পছন্দ করে। যা কিছু বোঝে তা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাথে সাথে কিছু আবিষ্কারে নিমগ্ন হয়। সব কিছু জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হচ্ছে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মার সমৃদ্ধি ও আত্মার প্রশান্তি ঘটে না সেই শিক্ষা ব্যবস্থার কোন দরকার নেই।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক তেমনি আবার প্রকৃত নির্ভরশীল। ইসলাম যুক্তিতর্ক সমর্থন করে কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে যে শিক্ষা তার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে গঠন করে চরিত্র ও মনুষত্বকে বিকশিত করা। শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিশ্লেষণে একনিষ্ঠ হওয়া।

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় কল্যাণকর বাস্তবমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। মওলানা ভাসানী ইসলামের স্বরূপ প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন এর মাধ্যমে। এতে করে মানুষ আত্মপ্রেরণায় আত্মনির্ভরশীল হতে অনুপ্রাণিত হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানই নয়। এটা মানুষ গড়ার কারখানা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কায়েম করাই এর উদ্দেশ্য। ১৯৪৬ সালের পর থেকে মওলানা সন্তোষে পর্যায়ক্রমে মসজিদ, মুসাফিরখানা, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে এই কর্মকাণ্ডকে বিকশিত করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করার চিন্তা-ভাবনা করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে তাঁর মনের ইচ্ছা সরাসরি ঘোষণা করেন। ১৯৭১, '৭৩ ও '৭৪ সালে পরপর সন্তোষে তিনটি সম্মেলন হয়। সম্মেলনে দেশীয় নামীদামী শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের সহযোগিতায় তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৯৭৪ সালে বাস্তব কাজে নামেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও রূপরেখা সম্বন্ধে তাঁর যে বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছু কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হলো।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কাঠামো সম্পর্কে আলোচনার আগে ইসলামী শিক্ষা বলতে কি বুঝি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থাই কোন না কোন জীবন ব্যবস্থা তথা জীবন দর্শনের অনুসারী। শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন দর্শনের ভিত্তিতে জীবন যাত্রার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল সূত্র হচ্ছে স্রষ্টার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস।

জীবনের দু'টি দিক বাদ দিয়ে আমরা যে বৈষয়িক মানুষ পাই সে মানুষ গোটা মানুষ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি ছাড়া বৈষয়িক উন্নতি মানুষকে অন্ধ করে তোলে।

অজ্ঞতার কারণে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, ভাষাগত ও বর্ণগত বিভেদের যে সব প্রাচীর সৃষ্ট হয়ে আছে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস তার মূলে কুঠারঘাত করে।

অনেকে মনে করেন যে, ইসলামী শিক্ষায় কেবল মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরই অধিকার রয়েছে। না, এ শিক্ষা সার্বজনীন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সেরা জীব হিসেবে একটি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মে; সমস্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা নিজেদের কাজ নিজেরা করবে। তারা নানাবিধ উৎপাদনমূলক কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি হবে সুষ্ঠু ও অনমনীয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভাসানী ইসলামী বিপ্লবের বাতাস দেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন ইসলামী সংস্কৃতির উপর বারবার হামলা হয়েছে এবং আঘাত এসেছে এবং সংস্কৃতি ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছে। তাই শিক্ষানুরাগী দূরদর্শিতার অগ্নিপুরুষ মওলানা ভাসানী এগিয়ে এসেছেন ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী কার্যকলাপের বীজ মানুষের দুয়ারে পেঁৗছে দিতে। তাই তিনি মাধ্যম হিসেবে স্থাপন করলেন সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যা ভাসানীর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম।

এই মানবদরদী নেতা মনীষী পৃথিবীর সমস্ত কর্মব্যস্ততার অবসান ঘটিয়ে ১৯৭৬ সনের ১৭ই নভেম্বর সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে। আমাদের কাছে রেখে গেলেন তাঁর কর্মকাণ্ড ও উপদেশাবলী। যেগুলো আমাদের আগামী দিনের চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। তাই ভাসানী মরেও মরেন নি। বাংলার আকাশে ধ্রুবতারার মত অম্লান হয়ে জ্বলবে একটি নাম—মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

www.pathagar.com

হাফিজা বেগম

মওলানা ভাসানী

কর্মময় বিপ্লবী জীবন গভীরভাবে প্রবাহিত হয়। জীবনের বাহক কণ্টের সাগর থেকে নেয়ে উঠে বার বার—ফলে বুকে জেগে উঠে তাঁর অসীম সাহস, আর মেরুদণ্ডে পায় অজস্র শক্তি। হৃৎপিণ্ডের গাঢ়তর উপলব্ধিতে জ্বলতে থাকে বিশ্বাসের প্রজ্বলিত মশাল—অক্ষরের নিঃশব্দ পুষ্পমাল্যে ক্রমাগত সে জীবন ভূষিত হয়ে আসে সভ্যতার কাছে।

মানুষের ভালোবাসা জীবনে বাঁচার নেশা জাগায় তাঁকে ; লাঠি খেলার পারঙ্গমতা দেয়। মাদ্রাসার তরুণ ছাত্র, নানান কৌশলে মানুষকে খেলা দেখায়। বৃটিশশাসিত যুগে মাদ্রাসায় পড়ুয়া লাঠিয়াল, নিতান্তই নেটিভ—চূড়ান্ত গেঁয়ো। তারুণ্যে ভয় তখন শ্বেতদানবের। কিন্তু এ তরুণ তাদের হিসেবেই পড়ে না। দানবের গুরুত্বহীনতা তরুণকে লাঠিখেলার নিপুণতা দিল—এদেশের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং তদীয় পোষ্য দেশীয় দালাল ও চিরকালের জালেমের পিঠে তিনি শক্ত হাতে লাঠি মারবেন, এই হলো তাঁর মানসিক প্রয়াস।

তিনি দেখেছেন শোষিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষ আপন কর্মের মর্যাদা পায় না ; মনুষত্বের অধিকার পায় না। লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় বার বার, নীরবে অশ্রুপাত করেন তিনি। মাদ্রাসা শিক্ষা-রবুবিয়াতের আদর্শে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃস্টান নির্বিশেষে অনাদৃত মানুষের জন্য তিনি নিশুতির গাঢ় গভীরতায়ও জেগে থাকবেন অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। আজীবন রাষ্ট্রশক্তির বহির্দ্বারে হবে তাঁর অবস্থান, গণমানুষের মুক্তি বোধে তিনি থাকবেন উদ্বাহু।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পৃথিবীর মানুষ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণী। দুনিয়ার সকল শোষক একই কায়দায় শোষণ করে, হরণ করে মানুষের মানবিক মর্যাদা—এরা সবই একই খাপে মিলে যাওয়া মানুষ। তাঁর প্রতিজ্ঞা হলোঃ তাদের গায়ের রং সাদা কালো, লাল নীল যা-ই হোক,

www.pathagar.com

তাদের ধ্বংস করাই আমার চিন্তা ভাবনা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য। শত্রু ধ্বংস করবার আগে সাধারণ মানুষের মাঝে মনুষত্বের মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই স্বপ্নময় প্রয়াসে তিনি লোভমুক্ত রাজনীতির পথে পদক্ষেপ করেন। স্বয়ং নিজের এবং মেহনতি মানুষের মাংসপেশীর শক্তি তিলে তিলে যাঁর মেরুদণ্ডকে করেছে শক্তিশালী, হৃৎপিণ্ডে দিয়েছে গাঢ়তর উপলব্ধি—তিনি আবদুল হামিদ খান ভাসানী। জনপ্রিয়তার দাবীতে মওলানা ভাসানী নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে হামিদ খান ভাসানীর জন্ম। ১৮৮০ সালে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে শিশুর জন্ম, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা পারিবারিক—এর কোনদিক থেকেই তাঁর স্বাভাবিক বিকাশ হবার কথা নয়। জীবনের শুরুতেই তিনি সর্বহারা হলেন—ছয় বৎসর বয়সে পিতা হাজী শরাফত আলী খান মারা যান, আর এগার বৎসর বয়সে মা তাঁকে ছেড়ে গেলেন, পর পর দুই ভাইও মারা গেলেন, বেঁচে রইলেন কেবল তিনি এবং একটি বোন। অসহায় শূন্যতার মাঝেই বুঝি জগৎ-জীবনকে উপলব্ধি করবার সুযোগ হয় মানুষের! নিজের অস্তিত্বের সাথে মিলে যাওয়া মানুষের অশ্রুর সাগরে তিনি কষ্টের তুফান লক্ষ্য করেছেন। উত্তুঙ্গ তরঙ্গে পথ করে দিতে হবে মানুষকে।

ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যেই আবদুল হামিদ খানের হৃদয়ে রোপিত হলো রাজনৈতিক চেতনা। কবিয়াল, লাঠিয়াল ও যাত্রা জীবনের শুরুতেই তো তিনি পরিচিত হয়েছিলেন সমাজের বঞ্চিত মানুষের সাথে। কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী জেলে—সবাইকে তিনি জানেন, ভালো করে জানেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম তথা মানবপ্রেম নীচু স্তরের মানুষ থেকে উৎকেন্দ্রিক ছাড়া কিছু হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে ভাসানীর জীবন হয়ে উঠল একটি সংগ্রাম, একটি উত্থান, একটি ইতিহাস।

পুঁথি-পুস্তকের তাত্ত্বিক লেখায় কাজ হবে না। জীবন ব্যবহারিক। কর্মপদ্ধতির মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে সংগ্রাম হবে সার্থক। শুভ সত্যের কল্যাণকর সত্তায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন, মানুষও তাঁকে চিনতে শুরু করল ক্রমাগত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সংগে একটা নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। এই সম্পর্কে মওলানা ভাসানী কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন না, তিনি বাংলা এবং আসামের মানুষের কাছে পীর-আওলিয়া হিসেবেও সম্মানিত হয়ে ওঠেন। কোন উচ্চশিক্ষা তিনি গ্রহণ করবার সুযোগ পান নি বটে, কিন্তু তাঁর জ্ঞানগভীরতায় মানুষ হতো মুগ্ধ, ব্যক্তিত্বে গুণীজন হতো শ্রদ্ধাবনত।

www.pathagar.com

সে সময় বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ—ভারতের পূর্বাঞ্চল জুড়ে চলছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এদেশে অবস্থানকারী ইংরেজ এবং তাদের সাহায্য-কারী দালালদেরকে গোপনে বা প্রকাশ্যে হত্যা করে দেশ শত্রুমুক্ত করা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। তরুণ লাঠিয়াল আবদুল হামিদ খান গোপনে তাদের সংগে যোগদান করেন। ইংরেজপোষ্য জমিদার মহাজনদের দোর্দণ্ড প্রতাপে মানুষকে পশুর মত জীবন যাপন করতে হতো, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক ধাপ তিনি এগিয়ে গেলেন। কিন্তু অল্পদিনের মাঝেই সরকারের দৃষ্টি পড়ায় তিনি তখন ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাটে পালিয়ে যান। ধর্মীয় শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করবার মানসে তিনি হালুয়াঘাটে শাহ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর স্থাপিত মাদ্রাসায় ভর্তি হন। বোগদাদীর আস্তানা ছিল আসামের গোয়ালপাড়া। দীক্ষা নিয়ে তিন চার বৎসর তিনি আসামে কাটিয়ে দেন। তারপর উপ-মহাদেশের ঐতিহাসিক খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে দিল্লী চলে যান। সেখানে মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী, ওবায়েদুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ নেতাদের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মতাদর্শে তাঁর হৃদয়মন বিধৌত হয়। আত্মার অন্তরালে আগুন চাপা পড়ে ছিল প্রজ্বলিত হবার অপেক্ষায়। সকল জবরদস্তিকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন। কলকাতায় গিয়ে তিনি কংগ্রেস নেতা গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হলেন। তাঁদের ধ্যান-ধারণায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন।

চারদিকে প্রতাপশালী জমিদার শ্রেণীর পীড়ন—নরক যন্ত্রণায় ছটফট করছে কর্মী মানুষ। ভাসানী হলেন দুঃখের সান্ত্বনা, হক কথা বলার মানুষ। একদিকে মহাজনবিরোধী আন্দোলন, অন্যদিকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের হোতা হলেন যুবক মওলানা। ১৯২৮ সালে তিনি বৃটিশরাজের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন। আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে আশ্রয় নিলেন শ্বাপদসংকুল আসামের জঙ্গলে। ঘাগমারার জঙ্গলের কুঁড়ে ঘরে দুঃসহ জীবন তাঁর তখন। কিন্তু আস্তে আস্তে তা জনপদে পরিণত হলো, জীবনের মায়ায় সংসারী মানুষ জঙ্গল কেটে বসতবাটী, হাটবাজার, চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ল, স্কুল মাদ্রাসা গড়ল। তারপর জঙ্গলের সাহসী পুরুষ ভাসানীর নামে স্থানটির নাম দিয়েছিল হামিদাবাদ।

ভাসানীর চরে অবস্থান কালে ভাসানী পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাঁড়ালেন। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রথম শর্ত তার রাজনৈতিক মুক্তি।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধ সিপাহী বিপ্লব বৃটিশকে শিখিয়েছে মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিতে। মুসলমান এবং তফসিলী হিন্দুকে একই পর্যায়ভুক্ত করে রাখা হলো। তারা হলো পশুবৎ প্রজা—আদেশের গোলাম। নানা প্রকার চাপের মুখে নিরীহ মানুষ নির্দ্বিধায় মরে যেত। কেউ কেউ বা বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতো বছরের পর বছর।

তফসিলী হিন্দু? তাদের জন্য ব্রাহ্মণবাদী হিন্দু এসে দাঁড়িয়ে যাবে বেকায়দা দেখলে। কিন্তু ম্লেচ্ছ মুসলমান! তাদের জন্য স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলের। অতি উত্তম প্রস্তাব মুসলিম লীগের। তাই ১৯৩০ সালে ভাসানী কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভাসানীর আন্দোলন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেবল তৎকালীন রাজনৈতিক মুক্তি নয়। রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম পর্যায়ে সহকর্মী নবাব, জমিদার, ভূঁইয়া, পুঁজিপতি মহাজনদের সাথে কাজ করে প্রাথমিক স্বার্থ আদায় করে পরক্ষণেই তিনি শুরু করবেন শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম। বিচক্ষণ নেতা বুঝতে পেরেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই মুসলমানদের মধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হবে এবং শোষণ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

তাঁর প্রাণের মানুষতো কৃষক, শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষ। মূলত তিনি তাদেরই নেতা একথা বুঝানোর জন্যেই তিনি সম্মেলন করেছেন—মহাসম্মেলন। তাঁর ধ্যানের মানুষরা যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন তাই তিনি ১৩৩৬ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত অসংখ্য গণজমায়েত করেছেন। এসব সম্মেলনের খরচ কৃষক ভাইরা যোগান দিত। কেননা তারাও জানে তাদের জন্যে যে দাঁড়াবে সে ঐ মওলানা! ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সালে ভাসানী আসামের লাইন প্রথার বিরুদ্ধে এক জোরালো আন্দোলন গড়ে তুললেন। আসামের গভীর জঙ্গল সাফ করে বিপর্যস্ত বাংগালী কৃষক জমি আবাদ করেছিল। তখন সরকার ছিন্নমূল মানুষকে বাধা দিত না। ফলে তাদের জীবনপণ চেষ্টায় জঙ্গলে মঙ্গল এলো—বনাঞ্চল আবাদী জমিতে পরিণত হলো। এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সরকারের সাহায্যে কৃষকদের উৎখাতের অভিযান শুরু করলো। নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ভাসানী রুখে দাঁড়ালেন। গোটা দশটি বছর স্বার্থবাদী মহলের নির্মমতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন। হাতী দিয়ে মানুষের বাড়ীঘর ভাঙ্গা, আগুন লাগিয়ে বস্তীর পর বস্তী পুড়িয়ে

www.pathagar.com

ফেলা, কৃষককে শারীরিক নির্যাতন করা—এসব অবিচার তিনি সহ্য করবেন না। তাই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হলো।

কারাগার থেকে বিনা শর্তে মুক্তি পেয়ে ১৯৪৮ সালে মওলানা ভাসানী আসাম থেকে পাকিস্তানে ফিরে এলেন। তিনি যা ধারণা করেছিলেন তাই হয়েছে। মুসলিম লীগ বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলো না। ফলে ভাসানী মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারালেন। তিনি তাঁর কৃষক ভাইদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক সুব্যবস্থাকে শহর থেকে তিনি মেহনতি মানুষের ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনবেন। মানুষের কল্যাণে বিদ্রোহ করা যাঁর স্বভাব তিনি অন্যায় বরদাস্ত করবেন কি করে? তিনি তাই বিরোধী শক্তি সঞ্চয় করলেন।

১৯৪৯ সালে ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ নামক একটি নতুন দল গঠন করেন। সুযোগ বুঝে বঞ্চিত হতাশাগ্রস্ত রাজনীতিবিদ জনদরদী সেজে তাঁর দলভুক্ত হলেন। ফলে লাল মিয়া কালা মিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়ে গেল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্যে তো তিনি দল গঠন করেন নি। এজন্যেই কি ভুখা মিছিল করে কারারুদ্ধ হয়েছেন? এজন্যেই কি তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগকে উৎখাত করলেন এবং জনগণের সরকার গঠন করলেন। প্রতিটির পতন নব অভ্যুত্থানের পথ বেঁধে দেয়।

১৯৫৭ সালে ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ গঠন করলেন। উচ্চাভিলাসী স্বার্থান্ধ দল থেকে তিনি দূরে সরে দাঁড়ালেন তাঁর সংগঠন নিয়ে। কোন নির্বাচন নয়, যারা বৃহত্তর জনসংখ্যার কল্যাণ করবে তাদের প্রতিই তাঁর সমর্থন থাকবে। যিনিই ক্ষমতায় আসুন তিনি তাঁর কাছ থেকে গণমুখী দাবী আদায় করে নেবেন। তা না হলে চলবে তাঁর বিদ্রোহ। সব মানুষের সমান পাওনা রাষ্ট্র মিটাতে না পারলে তিনি বিরোধিতা করবেনই।

সম পাওনা বলতে তিনি ইসলামিক সোস্যালিজম-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন! সেখানে কট্টর কম্যুনিজম নয় বরং অবাঞ্ছিত কুসংস্কারকে পরিহার করে মূল ইসলামকে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানোর বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন। ইসলামী সমাজতন্ত্র রবুবিয়তের দর্শনে উজ্জ্বল। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে তিনি কম্যুনিজমের সমন্বয় সাধন করে এক বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন। তাঁর চিন্তায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাধিকারী মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে

www.pathagar.com

জীবন সমস্যা বুঝবে এবং বুদ্ধির সাহায্যে সমাধানের পথ খুঁজবে। তাহলেই স্বার্থের বাড়াবাড়ি আসবে না। ইসলাম সুশৃঙ্খল রাজনীতি, সমাজ-নীতি, পারিবারিক নীতির সঠিক পন্থা ধারণ করে আছে। শ্রেণীহীন শাসন পদ্ধতি হুকুমাতে রব্বানীর মূল বিষয়বস্তু।

জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ছিলেন চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী। এক্ষেত্রে তিনি ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ—সর্বত্র ছিলেন অকপট দেশপ্রেমিক। সেখানে মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা, আপন কৃষ্টি মাতৃদুগ্ধসদৃশ্য। ঘরকে বাদ দিয়ে পরের চিন্তা ছিল তাঁর কাছে বাতুলতা। তবে হ্যাঁ, শোষক ও শোষিতের সমস্যায় তিনি আন্তর্জাতিক মানসিকতা পোষণ করতেন। পৃথিবীর সকল শোষক একই শ্রেণীভুক্ত, একই জাত, একই কৌশলে জুলুম করে চলে। আর শোষিত ? এশিয়া, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা—সে যে মহাদেশেরই হোক, তাদের বাঁচার সংগ্রাম একটি অভিন্ন সংগ্রাম। সে সমস্যায় সকলের সাথে তিনি সমভাবে বেদনাবোধ করেছেন এবং সমাধানের পথ খুঁজেছেন।

আপন বিচক্ষণতা এবং পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন পাকিস্তান সরকার যত সুপরিকল্পিত চক্রান্তই করুক, সত্য সূর্যোদয়ের মত মহীয়ান। বাংগালীকে চিরশৃঙ্খলে আর কখনোই বাধা যাবে না, তারা আন্দোলনের পর আন্দোলন করতে শিখেছে, লড়তে শিখেছে এবং মরতে শিখেছে। আগরতলা মামলাকে বাংগালী জেনেছে সদূরপ্রসারী হামলা। তাই সমবেত জঙ্গী জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি নির্দ্বিধায় সারা দেশে হরতাল, শোভামাত্রা এবং ঘেরাও আন্দোলনের নির্দেশ দিলেন। হিংস্র আগুনের লেলিহান শিখা থেকে তাই জন্ম নিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা; জালিমের সুখের ঘরে প্রয়োজনে তিনি আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারতেন।

তিনি বলেছেন ঃ 'দয়া বা ক্ষমা প্রদর্শন করাটা তোমাদের দুর্বলতা, তোমাদের কাপুরুষতা। কেউ যদি তোমার এক গালে একটা চড় মারে, তুমি তার দুই গালে পাঁচটা চড় মেরে দাও। তাহলে অন্যেরা তোমাকে হিসেব করবে, তোমার দাবী, তোমার অধিকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করবে। দুর্বল বা কাপুরুষের দাম কোথাও নেই।' এটা কোন হিংসার অবতারের Prophet of violence-এর কথা নয়। এটা প্রকৃত মুসলমান ও সচেতন বৈশিষ্ট্যে গরিমান মানুষের কথা। তাঁর মতে পাপীকে ক্ষমা করতে নেই। তেমন ক্ষমাকারী এক সময় না এক সময় পাপের শিকারে পরিণত হবে। পাপকে ক্ষমা করা জাতীয়

www.pathagar.com

মহাপাপ। এ ধরনের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণেই ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দূরদর্শী নেতাকে সুকৌশলে রণক্ষেত্র থেকে দূরে রেখেছিলেন। গোপন কোন্ শর্তে ভারত মুজিব নগর সরকারকে কতখানি সাহায্য করেছে সে কথা ভাসানীর কানে গেলে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদী হয়ে উঠবেন—এই ভয় ছিল তাদের। ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে ভারত সরকারের সুরক্ষিত অতিথিশালা থেকে ছাড়া পেয়েই বৃদ্ধ অভিভাবক ভাবলেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিক্রি হয়ে যায় নি তো? তাই পাঁচটি প্রতিশোধের চড়ের মত করেই তিনি ঘোষণা দিলেন যে পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ, আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে বৃহত্তর বাংলা গঠন করা হোক। তাঁর এই সংগ্রামের ডাকে ভারত সরকারের ভিৎ নড়ে ওঠে। বৃহত্তর বাংলা গড়ার ঘোষণার কৌশলগত চাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছিল সেদিন।

দেশীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর যে কোন প্রকার হামলা এলে শাসকশ্রেণী জেগে উঠে দেখেছেন প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পথে মওলানা ভাসানী অনেক এগিয়ে আছেন। শাসকের মানমর্যাদাবোধে প্রতিক্রিয়ার আগেই তিনি জাতিকে সতর্ক করে দিতেন। কোথাও কোন সরকারী বা বেসরকারী জুলুম হতে থাকলে তাঁর কানে পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি জুলুমের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দিতেন। তিনি কেবল একটি নির্দিষ্ট দলের নেতাই ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন অভিজ্ঞ অভিভাবক; যে কারণে আজীবন প্রশাসনিক ক্ষমতার বাইরে থেকেও শাসকদের প্রতি সাহসের তর্জনী উঁচিয়ে কথা বলতেন। নিঃস্বার্থ সমাজসেবা, নিখাদ দেশপ্রেম তাঁকে শাসনের অধিকার দিয়েছিল আর প্রিয় অপ্রিয় সত্য বলবার মনোবল দিয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবুর রহমানের ভারতকে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে ভাসানীই প্রথম প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। সত্য মূল্যায়নে নির্ভীক নেতা পথের মানুষ আর জাতির পিতাকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'গভীর আদর্শবোধসম্পন্ন চরিত্রবান এবং আপোষহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ সুগম করিতে পারে। আদর্শবোধবর্জিত, শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিসর্বস্ব ভাওতাবাজ মানুষ মেহনতি জনতার জন্য কেবল দুর্ভাগ্য বহিয়া আনে। শ্রমজীবী মানুষের হাতে নেতৃত্ব না আসিলে উপার্জনের সুপবিত্র ঘামের মূল্য কেহ বুঝিবে না।'

তাঁর দেশের মানুষ বিশ্বমানবের একটি অংশ, মানুষ দৈবদুর্বিপাক ও প্রাকৃতিক কারণে কষ্ট পেতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করে যখন মানুষের উপর

www.pathagar.com

মানুষ জুলুম করে তখন তাকে ক্ষমা করা যায় না। তাই ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে তিনি লং মার্চের আন্দোলন করেছিলেন। লং মার্চের ঘোষণা দেবার সংগে সংগে তাঁর বয়সের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে ন্যাপের দলীয় নেতারা বিষয়টি থেকে বিরত রাখতে চাইলে তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি ন্যাপ নেতা নয়, এ বিষয়ে তিনি জননেতা। গোটা জাতিকে নিয়ে তিনি মিছিল করবেন। আত্মবিশ্বাসী বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল। মিছিলে মৃত্যু হলে তাঁর লাশ যেন ফারাক্কা পর্যন্ত বহন করে নেওয়া হয় এমন ঘোষণাও তাঁর ছিল। প্রকৃত দেশপ্রেমিক এই মানুষ দেহ ও আত্মায় দেশময় হয়ে গিয়েছিলেন।

রাজনীতির পশ্চাৎভূমি হিসেবে মওলানা ভাসানী বেছে নিয়েছিলেন গ্রামাঞ্চল। সাদা কাপড়ী দালানবাসীদের রাজা মেহনতি জনতার দুঃখ বোঝে না। তাই সমাজে নবতর সৃষ্টির বিপ্লব আসে না। বিপ্লব উপর থেকে আসে না, বিপ্লবের জন্য চাই নীচুতলার মানুষ। মিল কারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে রাস্তার তরকারীর দোকানদার বিপ্লবের আওতাভুক্ত। কিন্তু এক জীবনের চেষ্টায় ঘুণেধরা ব্যক্তিতান্ত্রিক ধনবাদী সমাজের কতটুকুন পরিবর্তন আনা যায়? শ্বাসরূদ্ধকর অরাজকতার মধ্যেও তিনি শ্রমিক আন্দোলন করেছেন, কৃষক সম্মেলন করেছেন বহুবার। কর্মক্ষেত্রে এসেই তিনি সমস্যা দিব্যচোখে দেখেছেন—দেখেছেন সমাজের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ভ্রান্তি। কাজ করার জন্যই যেন তিনি জীবনের আয়ুকে স্রষ্টার দরবারে প্রার্থনা করে করে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন সুদীর্ঘ ছিয়ানব্বই বৎসর।

পঁচাত্তর বৎসর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগে জড়িত কৃষকনেতা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যেই একটি অভূতপূর্ব ইতিহাস গড়ে তুলে ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর চারদিন আগেও তাঁর লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন:

'যে কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আবাল্য দেখিয়াছি, সেজন্য সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা আজও সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়াছে। তাই আমার সংগ্রামের শেষ নাই। এই সংগ্রাম আজীবন চলিবে। আমার মৃত্যুর পর এই সংগ্রামের উত্তরাধিকারী তাহাদের উপর বর্তাইবে যাহারা এক আল্লাহ্কে প্রভু জানিয়া এবং একমাত্র তাহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিঃস্বার্থভাবে খেদমতে খালকে অর্থাৎ মানব জাতি তথা সমগ্র সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে।…"

www.pathagar.com

আফিয়া আক্তার খানম

মওলানা ভাসানী (র)

মওলানা ভাসানী একজন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি সারা জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে দুর্বার সংগ্রাম করে গেছেন। এদেশের কৃষক, মজুর, ছাত্র, যুবক, মেহনতি জনতার তিনি একান্ত আপনজন ছিলেন। নির্যাতিত, অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত মজলুম মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি সারা জীবন আরামকে হারাম করেছিলেন। অত্যাচারী জালেম শোষকদের অত্যাচার ও শোষণের কবল থেকে মজলুমদের রক্ষা করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। এজন্যই তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি অতি সাধারণ লুঙ্গি, গায়ে সুতী পাঞ্জাবী, মাথায় তালের আঁশের টুপি, পায়ে নিম্নমানের চটি জুতা পরতেন। মোটা চালের ভাত, টাকী মাছের চাসনী, শাক, ডাল প্রভৃতি অতি সাধারণ খাদ্য খেতেন। গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের ঘরের মতই তাঁর ঘরে হ্যারিকেন ও কুপী বাতি জ্বালাতেন। গ্রাম-বাংলার কৃষকের মতই তিনি সাধারণ চৌকির উপর মাদুর পেতে শুতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চুলার কয়লা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন।

তাঁর মনে কোন অহংকার ছিল না। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সদ্ভাব রাখতেন। ধনী-গরীব, ছোট-বড় সবার সাথে তিনি একইরূপ ব্যবহার করতেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষই সমান এবং এই পৃথিবীতে সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে। পৃথিবীর সকল মানুষই একজন আর একজনের ভাই। অতএব মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ মহাপাপ। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সকলের সমভাবে প্রতিপালন হওয়া একান্ত জরুরী বলে মনে করতেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, যাকাত দিতেন। মিলাদুন্নবী, ফাতেহা ইয়াযদাহম, মহররম প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন। তাঁর প্রায় নয় লাখ মুরিদান ছিল—তিনি তাদেরকে মদ, গাজা, ভাঙ ইত্যাদি নেশা থেকে বিরত থেকে শরীয়তের বিধি নিষেধ মেনে চলতে নির্দেশ দিতেন। রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে ভালবাসতে, আল্লাহ্‌র হুকুমকে মান্য করতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জনাতেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুযুর (র.) অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। দানশীলতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি পরোপকারী ছিলেন। প্রতিবেশী-দের খোঁজ খবর নিয়ে পরে তিনি আহার করতেন। তিনি খুব আতিথেয়তা-পরায়ণ ছিলেন। অতিথিদের আগে খাইয়ে পরে তিনি খেতেন।

মওলানা ভাসানী হুযুর (র.) শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। এতিমদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতেন। অনেক সময় তিনি ছোট ছোট বাচ্চার সাথে শিশু ভাসানী হতেন। তাদের সাথে অত্যন্ত আপনজনের মত মিশতেন। হাসি, তামাশা করে শিশুদেরকে অনেক সময় তিনি আনন্দ দিতেন। শিশুরা যত্নের সাথে লালিত-পালিত হচ্ছে কিনা তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।

মওলানা ভাসানী গৃহপালিত পশুর যত্ন নিতে পছন্দ করতেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে গৃহের কুকুর বেড়ালের খাওয়ার প্রতিও তিনি যত্নশীল ছিলেন। পুকুরের মাছের খাদ্য দেয়া হচ্ছে কিনা তৎপ্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখতেন।

মওলানা ভাসানী হুযুর (র.) কৃষি কাজের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। শুধু ধান, পাট, সরিষা, কলাই, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ শস্যই নয়, শাক-সব্জীর উৎপাদনের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। লাউ, সীম, বরবটী, করলা, কুমড়া, আলু, পটল, কচু, ঝিংগা, ধুন্দুল, মিঠা লাউ প্রভৃতির চাষের প্রতিও তিনি ছিলেন আগ্রহী। অনাবৃষ্টিতে তরিতরকারীর বাগানে পানি দেওয়া হচ্ছে কিনা তৎপ্রতিও তাঁর দৃষ্টি থাকত। শস্য ও শাক-সব্জীর বাগানে পোকা লাগল কিনা তারও খবর রাখতেন, ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। আম, জাম, লিচু, কলা' নারিকেল প্রভৃতি ফলবৃক্ষের বাগান করতে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর মুরিদানদের পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ-পালা লাগানোর জন্য উপদেশ দিতেন।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) রোগীদের প্রতি খুব দয়ার্দ্র ছিলেন। অসুস্থ মানুষের সেবা করতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। অসুস্থদের তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের খেদমত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবার জন্য তিনি নিজের আরাম-আয়েসও ভুলে যেতেন। তাদেরকে বিপদ মুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি পিছপা হতেন না।

মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) দেশের অনুন্নত স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, মোসাফিরখানা, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী ডিগ্রী কলেজ, বিন্যাফৈর-এর হাই স্কুল, মসজিদ, দাতব্য চিকিৎসালয়; মহীপুরের হক্কুল এবাদ মিশন, হাজী মোঃ মহসীন ডিগ্রি কলেজ; কাগমারী স্কুল-মাদ্রাসা, মসজিদ, কলেজ তাঁর আগ্রহের বাস্তব রূপ।

মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক নাগরিক ছিলেন। তিনি তাঁর নাগরিক অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন। তিনি দেশকে ভালবেসে দেশের মানুষকেও নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিলেন। সাধারণ মানুষের তিনি বড়ই অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাদের অতি আপনজন ছিলেন তিনি। শোকে ও দুঃখে সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর সমবেদনা পেত। ধর্মবিরোধী ও উচ্ছৃংখল ব্যক্তিদেরও তিনি ভাল-বাসতেন। ধর্মের নিয়ন্ত্রণে মানুষ সংযত জীবন যাপন করুক—এটাই তিনি মনেপ্রাণে কামনা করতেন।

ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাচালানী, দেশীবিদেশী শোষকগোষ্ঠীরা মওলানা ভাসানী হুযূরের দুশমন ছিল। দেশ-জাতি-সমাজকে এ সকল খারাপ মানুষদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি জনসাধারণ নিয়ে সংগ্রাম করতেন। দুর্নীতিবাজ কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে তিনি লোকদের ক্ষেপিয়ে দিতেন, ঘেরাও আন্দোলন করতেন। প্রকাশ্য রাষ্ট্র প্রধানদেরও দোষত্রুটি তুলে ধরতেন। দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী, ঘুষখোর, চোর-ডাকাত, হাইজ্যাকার নেশাখোর প্রভৃতি জঘন্য চরিত্রের মানুষদের তিনি মোটেই বরদাস্ত করতেন না। কঠিন শক্ত হাতে দমন করতেন সমাজের এ সকল হীনমনা ঘৃণ্য চরিত্রের লোকদেরকে।

মওলানা হুযূর (র.) একজন ক্ষমাশীল কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের সময় দিতেন। সৎপথে জীবন যাপনের জন্য

www.pathagar.com

উপদেশ দিতেন—কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও করে দিতেন। কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা নিজের আয়ত্তে না থাকলে তিনি বেকার মানুষের জন্য অনেক সময় কোন কোন মিল কারখানার মালিকের নিকটও মাঝে মধ্যে সুপারিশ করতেন। কর্মহীন মানুষের কর্ম-সংস্থানের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কর্মজীবী মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কর্মহীন উদ্‌ভ্রান্ত মানুষকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে আগ্রহী ছিলেন আর এজন্যই তিনি পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ধারণে সবাইকে উৎসাহিত করতেন। মানুষের জীবনের একটি সৎ উদ্দেশ্য ও সৎ লক্ষ্য থাকতে হবে বলে তিনি সকলকে সার্থক জীবন যাপনের জন্য সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রেরণা দিতেন। মওলানা ভাসানী হুযূর (র.) গরীব মেধাবী শিক্ষার্থী-দেরকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পথে উৎসাহিত করতেন। তাদের পড়াশুনার সুযোগ করে দিতেন। অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের পক্ষে সুপারিশ জানিয়ে পত্রও দিতেন। মেধাবী গরীব ছাত্রছাত্রীরা যাতে দেশের বাইরে গিয়েও জ্ঞানার্জন করতে পারেন তজ্জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাতেন।

বন্যাপ্লাবিত অথবা প্রাকৃতিক অন্য কোন প্রকার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকনের জন্য তিনি সশরীরে যেতেন। দুর্দশা-গ্রস্ত মানুষের করুণ পরিণতির নিরসনকল্পে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। নিরন্ন বিবস্ত্র গৃহহারা মানুষের দুঃখ দূরীকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে তোলপাড় করে তুলতেন। তাঁর আচার আচরণ, হাবভাব ও উৎকণ্ঠা দেখে মনে হতো তিনি যেন নিজেই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন—ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের করুণ মিনতি যেন তাঁর মনে দারুণ ব্যথার সঞ্চার করতো; সকল অসহায় বঞ্চিত মানুষের দুঃখ যাতনা নিরসনের সব দায়-দায়িত্ব যেন তাঁরই।

মওলানা ভাসানী হুযূর (র.)-এর আহ্‌বানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের দঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য সাহায্যসামগ্রী পৌঁছে যেত। সেবার ও সমমর্মিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের লোকেরা। আজ দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন অস্থিরতা বিরাজমান তেমনি সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রাও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এই দেশের গরীব সাধারণ মানুষের চলার পথে মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজন আজ অতি জরুরী।

www.pathagar.com

মুফতী সৈয়দ মোস্তফা কামাল এশিয়া

মওলানা ভাসানী ও ইমাম হাসানুল বান্না

মওলানা ভাসানী ও হাসানুল বান্না এশিয়া-আফ্রিকায় ইসলামী পুনর্জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন; সাম্রাজ্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন। মরহুম মওলানা ভাসানী ১৯১৪ সালে বল্কান যুদ্ধের সময় সাধারণ একজন কর্মী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে আমরোহা অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সময় হাসানুল বান্না একজন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এই উপমহাদেশের অসহযোগ আন্দোলনকে গভীরভাবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আজ মওলানা ভাসানীর জীবনপঞ্জীতে হাসানুল বান্নার নামটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমি গৌরব বোধ করছি। আল্লাহ্ আমাদের রবুবিয়াতের সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের সেবক হিসাবে যেন কবুল করেন।

শহীদ হাসানুল বান্না ছিলেন বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের একজন বিশেষ বিপ্লবী ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি ১৯২৮ সালে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলেমিন নামে একটি ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। শীগ্গিরই তিনি স্বৈরাচারী রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে একজন জনপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অত্যাচারী শাসক ও তাদের বিদেশী প্রভুদের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেন। রাজার সঙ্গে দীর্ঘ সময় সাক্ষাৎকারের পর রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ডাকার প্রাক্কালে ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী রাজার ঘাতক বাহিনী কর্তৃক তিনি শহীদ হন। এটা ছিল একটি পূর্ব-পরিকল্পিত ঠাণ্ডা রক্তপাত। ইখ্ওয়ানুল মুসলেমিন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পর্যন্ত বিশ্বের মুসলিম জনগণের মনে ওসমানী খিলাফতের ধ্বংসের স্মৃতি বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান ছিল। খিলাফত ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ইসলামী ঐক্যের চিহ্ন মুছিয়া যায়। স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে সার্ব-জনীনভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রেরণা উজ্জীবিত হয়। এ সময় বাস্তহারা ইহুদীদের বসতি স্থাপনের জন্য প্যালেস্টাইনের আরবী মুসলমানেরা সুপরিকল্পিত-

www.pathagar.com

ভাবে তাদের মাতৃভূমি হতে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল। এটাই ছিল ইস্‌রাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টির প্রারম্ভে অ্যাংলো আমেরিকান এবং রাশিয়ানদের আরব ও অন্যান্য দেশের মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। মুসলমানদের সত্য, ন্যায় এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ছিল মৌলিক বিশ্বাস। তাদের কাজের তালিকার মধ্যে জিহাদ পেয়েছিল অগ্রাধিকার। খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্যালেস্টাইন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইখওয়ানুল মুসলেমিনের প্রধান পথ প্রদর্শক শহীদ হাসানুল বান্না মুসলিম বিশ্বের কাছে তিন দফা কর্মসূচী পেশ করেন। ঐ সময় বঙ্গ-পাক-ভারত উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলন বিদ্যমান ছিল। তিন দফা কর্মসূচীর প্রথম কর্মটি ছিল মুসলিম সংগঠন এবং মুসলিম জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা চালু করবে। পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের সুযোগ থাকবে এবং অবাধ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা থাকবে যাতে আন্তর্জাতিক ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

মুসলিম জাতিসমূহ পরস্পরের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবে। ২. প্যালেস্টাইন সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক মন্ত্রী সভা প্রবর্তন করতে হবে যা এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে স্থির করতে চেষ্টা করবে। প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে। ৩. একটি সম্মিলিত মুসলিম জাতিপুঞ্জ গঠন করতে হবে। এই সংগঠনের পছন্দনীয় ব্যক্তি যাঁর মধ্যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটবে তিনিই হবেন পবিত্র ইমাম পদের যোগ্য অধিকারী। ইমাম সাহেব তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতার গুণে মুসলিম ঐক্য দৃঢ় করবেন। ইমাম হবেন মানব জাতির প্রতি আশীর্বাদ এবং যাঁর মধ্যে জাতি খুঁজে পাবে সত্যিকার কাজের সঠিক ও সন্ধান। মুজাদ্দেদ আলফে-সানী, আল্লামা ইবনে তাইমীয়া, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, মুফতী মোহাম্মদ (র.)-এর লিখিত বিষয়সমূহ শহীদ হাসানুল বান্না অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অন্যতম ভক্ত ছিলেন।

উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.), শাহ আবদুল আজিজ, সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ (র.)-এর এবং ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজবিরোধী যে জিহাদ হয়েছিল ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' বইয়ে এসবের মূলতত্ত্ব ও এর ব্যর্থতার

www.pathagar.com

কারণ লিপিবদ্ধ আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেখ আহমদ নামক একজন লোককে ব্যবহার করে এবং শাহ নিয়ামত উল্লাহ্‌র কসিদা নামে একটি বিভ্রান্তিকর ভবিষ্যৎ বাণীসম্বলিত বই নিরীহ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে। এখনও বিভ্রান্তিকর বাণীসমূহ প্রচারিত হচ্ছে। শহীদ শেখ হাসানুল বান্না এই সকল ইতিহাসের দর্শক ছিলেন না— বিংশ শতাব্দীতে মওলানা ভাসানী যেভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন তিনিও তদ্রূপভাবে বলিষ্ঠ চিত্তে একই লক্ষ্যে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

www.pathagar.com

খালেদুর রহমান টিটো

মওলানা ভাসানী : একটি ইনস্টিটিউশন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উপমহাদেশের একজন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ। তাঁর জীবন একটি কর্মময় গতিধারা। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর দেশের মাটি আর মানুষের জন্য। আর সে কারণেই কোটি কোটি মানুষের কাছে তিনি চিরঞ্জীব।

মওলানা ভাসানীর জীবনকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে আসলেই 'মওলানা ভাসানী' একটি ইনস্‌টিটিউশন। কারণ তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ড শুধু রাজনীতির অঙ্গনকেই প্রভাবান্বিত করে নি, এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, এমন কি ধর্মীয় চেতনার উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানেই মওলানা ভাসানী অন্য দশজন নন্দিত রাজনীতিবিদদের থেকে স্বতন্ত্র।

তিনি মূলত একজন উদারপন্থী দার্শনিক। আর সেই কারণে তাঁর জীবনের চিন্তা ও চেতনার সাথে কর্মকাণ্ডের কিছু কিছু সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একেশ্বরবাদী। তাঁর আল্লাহ্ ও রসূল (স.)-এর উপর ছিল গভীর বিশ্বাস। তাঁর ধর্মীয় চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষের ব্যথা, আকুলতা, ন্যায় বিচারের জন্য প্রার্থনা যখন সমাজের রূঢ় নীতিমালায় রুদ্ধ হয়ে গেছে তখন তিনি চুপ করে থাকেন নি। তিনি বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর এ বিদ্রোহ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়—এ বিদ্রোহ ছিল সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে ; জুলুম, শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধ। আর সে কারণে তিনি আঘাত করেছেন সকল ঘূণেধরা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। প্রগতিশীল চেতনাকে বিকশিত করবার জন্যেই ছিল তাঁর সংগ্রাম আর এই সংগ্রাম করতে যেয়ে তিনি কোন কোন সময় এদেশের বামপন্থীদের আপন জন হয়েছেন, কোন কোন সময় তাঁদের বিরাগভাজনের পাত্রও হয়েছেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি ছিলেন সবসময়ই সহনশীল। তাঁকে আঘাত করে কেউ তাঁকে টলাতে পারে নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একজন তৌহিদবাদী মুসলমান হয়েও সমাজ বিকাশের ধারার প্রয়োজনে আল্লাহ্‌বিশ্বাসী নয় এমন শক্তিবর্গের

www.pathagar.com

সাথে সমঝোতা করতে তাঁর আদৌও অসুবিধা হয় নি। পাশাপাশি চলতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হলে সহনশীলতা দিয়ে মানিয়ে চলতেন।

কোন গোঁড়া মুসলমান কোন অবস্থাতেই কোন নাস্তিকদের সাথে সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে অথবা অন্য যে কোন প্রয়োজনে সমঝোতা করবে না। কিন্তু মওলানা ভাসানী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সমাজ ও মানুষের জন্য সমঝোতা করে চলেছেন। এইদিক থেকে বিচার করলে তাঁর চেতনা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে ফারাক পরিলক্ষিত হয়। এই স্ববিরোধিতাকে কেন্দ্র করে এদেশের অনেক আলেম তাঁকে সমালোচনা করেছেন। অনেকে তীব্র থেকে তীব্রতর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সহজাত সহনশীল মানসিকতা দিয়ে সময়ের অপেক্ষায় সবই মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য তাঁর চেতনা যে সঠিক ছিল—তা সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত।

মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর দশ বছর পর আজও আমরা তাঁর কর্মজীবনের কৃতকর্মের ফল যা পেয়েছি বা পাচ্ছি তা থেকে তাঁকে পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারছি না। কারণ তাঁর কর্মফলের ফলভোগ করতে আরও আমাদের সময়ের প্রয়োজন। সেই কারণেই তাঁকে বোঝা বা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত দুরূহ।

তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার চেষ্টা করা হলে তা তিনি বলিষ্ঠভাবে বন্ধ করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় অন্ধত্বকে প্রশ্রয় দেন নি। অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে যদি কেউ ইসলাম ধর্মকে খাটো করবার চেষ্টা নিয়েছে অথবা নাস্তিকতাবাদকে প্রাধান্য দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধকে খাটো করবার চেষ্টা নিয়েছে সেক্ষেত্রে তাঁর থেকে বলিষ্ঠভাবে কেউ ধর্মীয় মূল্যবোধকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হন নি। এখানেই মওলানার বৈশিষ্ট্য।

মওলানা ভাসানী তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এদেশের মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বা নাস্তিকাবদের নামে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া হোক না কেন—এদেশের মানুষের চেতনায়, চিন্তায় আল্লাহ্-রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা এত প্রবলভাবে আছে যে, সেখানে কোন চক্রান্তই সফল হবে না। অবশ্য তাই বলে ধর্মীয় অন্ধত্ব যেন এদেশের মানুষকে পেয়ে না বসে সেদিকে বারংবার তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন।

তাঁর এই চেতনা এদেশের মানুষের শুধু ধর্মীয় চেতনাকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য ছিল না। আসলে এই চেতনা দিয়ে তিনি এদেশের মানুষের মুক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানী প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান একটি ইনস্টিটিউশন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

মওলানা ভাসানীর জীবনের শেষ পাঁচ বছর

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাত দশকের। বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুতে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে শেষ নিঃশাস ত্যাগের আগে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। মওলানার এই সুপরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক জীবনের শেষ পাঁচ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কাল। তাঁর জীবনের এই শেষ কাল-পর্ব আলোচনার সুবিধার্থে সত্তর বছর ব্যাপ্ত তাঁর অতীত রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

মওলানা ভাসানী মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে জলন্ধরীর পীর সাহেব মওলানা নাসিরউদ্দীন বোগদাদীর শাগরিদ হিসাবে এবং তারপর উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপোষহীন সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে জীবন সংগ্রামের সবক গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক বছরগুলোর তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। ১৯১৯ সালে তাঁকে দেখা যায় কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরূপে, ১৯২৩ সালে আসামের কৃষক ও প্রজা আন্দোলন এবং ১৯২৪ সালে ভাসান চরের ঐতিহাসিক সম্মেলনের সংগঠকরূপে। ১৯৩০ সালে মুসলমানদের পৃথক জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে যোগদানের পর ১৯৩১ সালে সন্তোষে জমিদার-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহের সংগঠক এবং ১৯৩৫ সালে আসামের বাংগাল-খেদা ও ১৯৩৭ সালের লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলনের নেতারূপে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে শেরে বাংলার নেতৃত্বে বাংলার মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব এবং ১৯৪৬ সালের সিলেট রেফারেণ্ডামে পাকিস্তানের পক্ষে সিলেটবাসীদের জনমত সংগঠনসহ পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দলরূপে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনী বিজয়, ১৯৫৬ সালের কাগমারী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দাবি, ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি না মানলে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে দেয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে পাকিস্তানের ঐক্য ও আযাদীর পক্ষে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র ব্যাপক গণ-সংযোগ অভিযান পরিচালনা করেন। পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় প্রার্থীরূপে ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৮ সালে জুলুম প্রতিরোধ আন্দোলন ও গভর্নর হাউস ঘেরাও'এর মাধ্যমে উনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মুখ্য নায়করূপে 'প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মতো জেল-খানা ভেঙে মুজিবকে নিয়ে আসার' ১৬ই ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা, আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠক বর্জন এবং প্রচণ্ড গণজোয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে আই-য়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানোর নায়করূপে 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' আখ্যা লাভ ; ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন এবং ১২ই নভেম্বরের গোকি বিধ্বস্ত দক্ষিণ বাংলা অসুস্থ শরীরে ঘুরে এসে পল্টনের জনসভায় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন, ১৯৭১ সালের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা দেশে ব্যাপক গণ-সংযোগ ; এসবই মওলানা ভাসানীর পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক।

১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত গমন করেন এবং ভারত-প্রবাসের পুরো সময় তাঁকে কাটাতে হয় দিল্লীতে অন্তরীণ অবস্থায়।

মওলানা ভাসানীর এই সত্তর বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের তিনটি মূল লক্ষ্য চিহ্নিত করা যায়। এক. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ; দুই. সকল প্রকার অন্যায়, জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার ও জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং তিন. আধিপত্যবাদের মোকাবিলা করে স্বাধীনতার পতাকাকে সমুন্নত রাখা। মওলানার জীবনের শেষ পাঁচ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশী

www.pathagar.com

মেয়াদে তাঁর সকল কথা ও কাজে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতাই সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। মওলানা ভাসানীর সারা জীবনের রাজনীতি ছিল নিরাপোষ এবং সঙ্গত কারণেই এস্টাবলিশমেন্ট বা কায়েমী স্বার্থের বিরোধী। এই রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে মওলানা ভাসানী পাকিস্তান আমলে কখনো আখ্যায়িত হয়েছেন 'হিন্দুস্তানের চর' বা 'কম্যুনিস্ট'রূপে। আবার বাংলাদেশে কখনো তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'পাকিস্তানের দালাল' কিংবা 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'সাম্প্রদায়িক'রূপে।

মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় গ্রামাঞ্চলে অতিবাহিত করেছেন। এদিক থেকে তিনি শুধু বাংলা-আসামে নয়—সমগ্র উপমহাদেশে অদ্বিতীয়। মওলানা ভাসানী রাজনীতি করেছেন মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, গোখলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, গান্ধী, মতিলাল নেহরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা, আকরম খাঁ, সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দীন ও আবুল হাশিম প্রমুখের সাথে। সেদিক থেকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মওলানা ছিলেন তাঁর অবস্থানে একক এবং কতকটা নিঃসঙ্গ। মওলানার এই আমলের মাত্র পাঁচ বছরেরও কম সময়ের কার্যকাল খুব সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত এবং অত্যন্ত ঘটনাবহুল।

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন কারো কারো চোখে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য সঙ্গত কারণেই অপেক্ষা করতে হবে বেশ কিছু কাল। এখানে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা না করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছরের কার্যক্রমের কিছু তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বাহাত্তরে ভাসানী ঃ ছয়টি প্রধান সমস্যা

মওলানা ভাসানী ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারী ভারত থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পরপরই তাঁকে ছয়টি প্রধান বিষয়ে বক্তব্য রাখতে হয়। ১. যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ, ২. অস্ত্র উদ্ধার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ৩. দেশের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও লুটপাট এবং সীমান্তে চোরাচালান দমন, ৪. ধর্মীয় অবমূল্যায়ন রোধ, ৫. বিদেশী আধিপত্যের অবসান; এবং ৬. সদ্য স্বাধীন

www.pathagar.com

দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এ সময়ই তিনি 'হক কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

২২শে জানুয়ারী দেশের মাটিতে পা রেখে ঐদিনই মওলানা ভাসানী সন্তোষে তাঁর পোড়া বাড়ীর সামনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য সকল রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি লোকদের হাতে পড়ে থাকা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরকারের কাছে জমা দেয়ার আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে মওলানা বলেন, 'আরো একটি বিপ্লবের জন্য কেহ অস্ত্র রাখিয়া দিলে তাহা হইবে মস্ত বড় ভুল।' তিনি বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের জন্য চীনের প্রতি আহ্বান জানান।

২৩শে জানুয়ারী সন্তোষে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া সমাবেশে মওলানা ভাসানী 'স্বাধীন, সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়িতে কাজ করিবার জন্য এবং শোষণমুক্ত সমাজ গড়িতে সরকারকে সহযোগিতা করিবার জন্য' সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি 'মুক্তি সংগ্রাম ও দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাহারা কাজ করিয়াছে তাহাদের বিচারের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলিয়া না নিয়া গণ-তন্ত্রের খাতিরে তাহাদেরকে আদালতে হাজির করিবার' আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আদালতে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। প্রত্যেকেরই বিচার হওয়া উচিৎ। কিন্তু তাহাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া বাংলাদেশ দুর্নাম কুড়াইতে পারে না।'

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি প্রথম ঢাকা আসেন ৯ই ফেব্রুয়ারী, অসুস্থ অবস্থায়। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পি. জি. হাসপাতালে ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

মওলানা ভাসানী দেশ গড়ার কাজে সকলের ঐক্যবদ্ধ অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারের ব্যর্থতা, বাংলাদেশের বুকে রুশ-ভারত আধি-পত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তার, সীমান্ত পথে দেশের মূল্যবান সম্পদ অবাধে পাচার এবং দেশের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নীতিবোধ বিবর্জিত দুর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষীদের অবাধ লুন্ঠন ও শোষণের মুখে সরকারের প্রতি প্রথম সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্তোষে আয়োজিত কৃষক সমিতির সমাবেশে।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে তিনি প্রথম জনসভা করেন ২রা এপ্রিল। এই জনসভায় তিনি সকল প্রকার বিদেশী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, 'বাংগালীরা ভারত, চীন, বৃটেন বা আমেরিকার গোলামী স্বীকার করিবে না। প্রতি বিন্দু রক্ত দিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিব ইনশাআল্লাহ্।' মওলানা ভাসানী দেশের ভিতরে স্বার্থবাদী 'লুটপাট সমিতি'র কার্যকলাপ কঠোর হাতে দমন করার দাবি জানান। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকার করে নিতে বলেন। 'নকশালদের দেখা মাত্র গুলী করার' প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'বিনা বিচারের কাউকে গুলী করা চলিবে না। গুলীর ভয় দেখাইও না। দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মানুষকে মুক্ত করিতে না পারিলে জনতা সরকারকে ধূলিসাত করিয়া দিবে।' স্বাধীনতার পর ঢাকার বুকে এটাই প্রথম জনসভা যার কাজ শুরু হয় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। মওলানা তাঁর ভাষণে নিজেই 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'রাব্বি জেদনী এলমা', শিক্ষা বোর্ডের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ অপসারণ, রেডিও টেলিভিশনে 'আসসালামু আলাইকুম', 'খোদা হাফেজ' বাতিল, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এসব অতি-উন্মাদনার সেই মুহূর্তে মওলানার পক্ষেই সম্ভব ছিল বজ্র নির্ঘোষে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দান।

মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে দ্বিতীয় জনসভা করেন মাত্র এক সপ্তাহ পর ৯ই এপ্রিল। এ জনসভায় তিনি দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র রচনায় দল-মতনির্বিশেষে সকলকে শামিল করার দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন। তিনি নকশালদেরকে দেখা মাত্র গুলী করার নির্দেশেরও সমালোচনা করে এ সভায় বলেন, 'স্বাধীনতা কাহারো একার সম্পত্তি নয়। অন্যের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া সকলকে মতামত প্রকাশের অধিকার দাও।' তিনি বলেন, 'নকশাল কারো গায়ে লেখা থাকে না।' তিনি চোরাচালানের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

২১শে এপ্রিল মওলানা ভাসানী জনসভা করেন দিনাজপুরের বড় ময়দানে। এ সভায় তিনি বলেন, 'সীমান্তের দশ মাইলের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি বাতিল না করিলে সীমান্তের চোরা কারবার ঠেকানো যাইবে না। সরকার লুটপাট

www.pathagar.com

সমিতির কার্যকলাপ প্রতিরোধ না করিলে দেশে বিশৃংখলা বৃদ্ধি পাইবে। সরকার শায়েস্তা না করিতে পারিলে আমিই চাবুক মারিয়া ইহাদেরকে শায়েস্তা করিব। সরকার দেশবাসীর প্রতি তাহার ওয়াদা পূরণ না করিলে আমি আন্দোলন গড়িয়া তুলিব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার, নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা ও শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব না থাকিলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।' মওলানা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'সৈয়দপুরে প্রায় বারো হাজার বিহারী খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কেন? এর জবাব কে দিবে? পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের জন্য ইহা খুবই পরিতাপের ঘটনা।'

২৩শে এপ্রিল সকালে মওলানা ভাসানী দ্বারিয়াপুর উচ্চ সম্মিলনী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এবং বিকালে মাগুরা নোমানী ময়দানে দু'টি জনসভা করেন। ২৪শে এপ্রিল তাঁর জনসভা অনুষ্ঠিত হয় যশোরের ঈদগাহ ময়দানে। এই বিশাল জনসভায় তিনি ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, 'দশ দিনের মধ্যে হিন্দুস্তানের সৈন্য প্রত্যাহার কর।' তিনি অবিলম্বে মাদ্রাসাসমূহের তালা খুলে দেয়ার জন্যও সরকারের প্রতি দাবি জানান।

৯ই মে মওলানা ভাসানীর জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মোমেনশাহীর সার্কিট হাউস ময়দানে। এ জনসভায় তিনি বলেন, 'বন্ধুত্ব ও প্রভুত্ব এক কথা নয়। ভারত ও রাশিয়ার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব থাকিবে,—কিন্তু আমরা কাহারো প্রভুত্ব মানিয়া লই নাই এবং ভবিষ্যতেও মানিব না।'

এ সময়কার জনসভাগুলোতে মওলানা ভাসানী দেশের বন্ধ হয়ে থাকা দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়ার ক্রমাগত দাবি জানাচ্ছিলেন। একটি মহল থেকে সে সময় 'রাজাকার-আলবদর আল-শামস তৈরীর কারখানা' বলে মাদ্রাসা না খোলার পক্ষে কথা বলা হচ্ছিল। তার জবাবে মওলানা ভাসানী বলেন, 'স্কুল খুলিয়াছে, কলেজ খুলিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে। হাজার হাজার মাদ্রাসায় আজো তালা কেন? রাজাকার-আলবদর-আল-শামস শুধু মাদ্রাসার ছাত্ররা হয় নাই। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও হইয়াছে। তাই শুধুমাত্র মাদ্রাসা বন্ধ রাখা চলিবে না। মাদ্রাসাগুলি অবিলম্বে খুলিয়া দাও। লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা ছাত্রের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা বন্ধ কর। স্বাধীনতার পর সমাজে আযান দেওয়া, ইমামতি, জুমা, ঈদ, খুতবা, জানাযা পড়ার প্রয়োজন কি শেষ হইয়া গিয়াছে?' মোমেনশাহীর জনসভায় মওলানা ভাসানী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় চালু করার জোর দাবি জানান।

www.pathagar.com

'হক কথা'র প্রকাশক, পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকরূপে

ভারত থেকে দেশে ফেরার মাত্র এক মাসের ব্যবধানে মওলানা ভাসানী 'হক কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। শিরো-ভাগে 'প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক : মওলানা আবদুল খান ভাসানী' মুদ্রিত এ পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৭২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার থেকে। স্বল্পকাল-স্থায়ী এ পত্রিকা তৎকালীন রাজনীতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে এবং অত্যন্ত সাহসী বক্তব্যের জন্যে দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান দখল করে। প্রকাশনা শুরুর মাত্র চার মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ২০শে জুন মঙ্গলবার 'হক কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করা হয়। স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে কোন সাংবাদিকের গ্রেফতারীর ঘটনা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এটাই ছিল প্রথম। মওলানা ভাসানী এই গ্রেফতারীর নিন্দা করে বলেন, 'সরকারের কার্যকলাপ আমলাতান্ত্রিক ও বেআইনী। সম্পাদ-কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয় নাই এবং গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারী করা হয় নাই।' মওলানা এ ঘটনার প্রতিবাদ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তাও প্রেরণ করেন। তার জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 'হক কথা' সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ উল্লেখ করে মওলানাকে জানান যে, পাক-বাহিনীর দালালী করার অভিযোগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই গ্রেফতারীর প্রতিবাদে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ২রা জুলাই সংখ্যায় 'ছয়মাস পর দালাল হলেন' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলা হয় : 'জনাব বারীর বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায় কি যায় না তা বিবেচনা করবেন আদালত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাঁর বিরুদ্ধে দালালী সংক্রান্ত এতগুলো অভিযোগ সরকারের কাছে মওজুদ থাকা সত্ত্বেও ছয় মাসাধিককাল বিলম্ব হলো কেন?...বাংলাদেশের একটি জন-প্রিয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক হিসেবে (প্রকাশ্যে নিশ্চয়ই) কাজ করার পর হঠাৎ করে তাঁকে পাক বাহিনীর দালাল আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে বলে জনগণ সন্দেহ প্রকাশ করলে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় কি?'

সম্পাদকের গ্রেফতারীর পর 'হক কথা'র প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক মওলানা ভাসানী নিজেই পত্রিকাটির অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

সম্পাদকের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে এখানে পত্রিকাটির ভূমিকার দৃষ্টান্তস্বরূপ ২রা জুন সংখ্যার একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ তুলে দেয়া হলো। এই গ্রেফতারীর ঘটনার মাত্র আঠারো দিন আগে 'বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা পঙ্গু রাখায় রুশ-ভারতীয় চক্রান্ত' শিরোনামে 'হক কথা'র এই প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

'ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে চলছে, তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। মুজিব সরকারের প্রতি ইন্দিরা চক্রের নির্দেশ বলবৎ হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য পৃথক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা যাবে না। পদাতিক বাহিনীতে আর একজনও যদি রিক্রুট করতে হয় তবে আর কারো না হউক, বাংলাদেশের 'অসরকারী প্রধান মন্ত্রী' বলে পরিচিত মি. ডি.পি. ধরের অনুমতি লাগবে। জেনারেল ওসমানী চোরাচালান রোধকল্পে সীমান্তে পদাতিক বাহিনী নিয়োগ করতে চাইলে সরকার এর সংখ্যাল্পতার প্রশ্ন তোলেন। এমতাবস্থায় নওজোয়ান সংগ্রহ করবার অনুমতি চাইলে সরকার তাতেও রাযী হন নি। ভারত সরকার জানিয়েছেন তাদের সৈন্যসামন্ত সীমান্তে থাকলে আর কারো দরকার পড়বে না। শুধু সংখ্যা নিয়ন্ত্রণই নয়, গত ডিসেম্বরে খোদ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক দখল করা পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রগুলো পর্যন্ত ভারতীয়রা নিয়ে গেছে। তাদের সাফ জবাব, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য এসবের কোন প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি একটি ফরাসী ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানে আটক বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাজার হাজার জোয়ান তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে আসুক ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতর তা কামনা করেন না। ...মেজর জলিলের মত দেশপ্রেমিক যোদ্ধা আমাদের মাঝে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কূট ইঙ্গিতে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে কোর্ট মার্শালে বিচার করতে যাচ্ছেন। সবই কিন্তু একই পরিকল্পনার অবিচ্ছিন্ন এ্যাকশন।...আমাদের বিমান বাহিনীকে অঙ্কুরেই তারা পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হয়েছে। রহস্যজনকভাবে কয়েকজন ক্যাপ্টেন বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। কিন্তু তদন্তের বিষয়টি আজও রহস্যাবৃত রয়েছে। বাংলাদেশের বিমান বাহিনীকে উপেক্ষা করে ভারতীয় বিমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণ করে। তৎসঙ্গে আবার ভারতীয় গোয়েন্দারই উস্কানীতে সাড়ে তিনশত এয়ারম্যান গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পদাতিক বাহিনী দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিমান দফতর এলাকাটিকে ঘেরাও করে ফেলা হয়। ৪৮ ঘন্টা এই অবরোধ চলার পর ৩০ জনকে গ্রেফতার ও ৫ জনকে কোর্ট

www.pathagar.com

মার্শালে বিচার করা হয়। এই ঘটনাটি বাংলাদেশ পদাতিক ও বিমান বাহিনীর মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের তা-ই কাম্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নৌশক্তি বলে একটা কিছু হতে পারতো। কিন্তু একটি উপনিবেশে তা কি করে হয়। বোমা মেরে যে তিনটি জাহাজ সমুদ্র মুখে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলোকে উদ্ধার করতে রুশ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়। অথচ এইটুকু কাজ সারার এক্সপার্ট বাংলা-দেশেও রয়েছে। কিন্তু আমাদের অক্ষমতা প্রমাণ করতেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। ১৯৬২ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যেসব জাহাজ চরায় উঠে পড়েছিল বাংলাদেশের নাবিকরা তা উদ্ধার করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গোপসাগরে রুশ নৌশক্তি চেপে বসবার সুদূরপ্রসারী অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে তারা বন্ধু সেজে এসেছে।...'

সম্পাদককে গ্রেফতার করে 'হক কথা'কে তার পূর্বের ভূমিকা থেকে টলানো যায় নি। বরং পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ও প্রকাশক মওলানা ভাসানী নিজেই অস্থায়ী সম্পাদকরূপে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক লুটপাট, দুর্নীতি, সীমান্ত পথে চোরাচালান, আইন-শৃংখলা রক্ষায় প্রশাসনের ব্যর্থতা এবং আধিপত্যবাদের কাছে সরকারের নতি স্বীকারের খবর ক্রমাগতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মওলানা ভাসানী দেশের দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতির সমালোচনা করে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যেসব অগ্নিঝরা বক্তব্য রাখছিলেন, সেগুলো 'হক কথা'র পাতায় হুবহু নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল।

'হক কথা'র ২৮শে জুলাই সংখ্যায় 'সাংবাদিককুল এখন মুজীবী দাবার গুটি' শিরোনামে বলা হয়, 'দাবা খেলে চলে গেলাম, গুটি যেন ঠিক ঠিক চলে' সাংবাদিকদের প্রেস ক্লাবের তাস-জুয়ার ঘরে ঢুকে প্রধান মন্ত্রী খেলোয়াড় সাংবাদিকদের প্রতি যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, বিলক্ষণ সেটার অনুসরণ শুরু হয়ে গেছে। আইয়ূবের গুটিগুলি নতুন প্রভুর চালে এখন নবোদ্যমে জি হুযুর বলে কলম চেপে ধরেছে। পত্রিকার কলামগুলি ভরে উঠেছে তোষামোদের ভাষায়।' এই তোষামোদী সাংবাদিকতার বিপরীত স্রোতে গড়িয়ে 'হক কথা' সে সময় যে ভূমিকা পালন করে, তার দৃষ্টান্ত ২২শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ঠগ কে তাজুদ্দিন সাহেব, জনগণ না আপনারা? সেই গোপন ৭টি চুক্তি' শিরোনামের প্রতিবেদনটির মতো অনেক অনেক প্রতিবেদন। প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়...

www.pathagar.com

'তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে ঠগ ভারত বাংলাদেশ সুবিধা মতো বাগে পেয়ে গোপন সাতখানি চুক্তি গোপনে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিল, সেগুলির পীড়ন ও দংশনে বাংলাদেশের জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবার সাথে সাথে তাজুদ্দিন গংরা মুছিবতে পড়েছেন। ভারতীয় প্রভুদিগকে আশ্বাস দিয়ে তাজুদ্দিন কলকাতায় বলেছেন, কতিপয় ঠগের কার্যকলাপে বাংলাদেশকে ভুল বোঝা ভারতীয় প্রভুদের উচিৎ হবে না। বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে এক শ বছরের জন্য ভারতের কাছে বন্ধক রেখে তাজুদ্দিন মন্ত্রীসভা মহাপুরু-ষের কাজ করেছে এবং এই বন্ধকী রাখার প্রতিবাদে যারা মুখর হয়েছে তারা তাজুদ্দিনের চোখে ঠগ জুয়াচোর ইত্যাদি। অন্তর্যামী নীরবে এসব ঘটনা দেখে না হেসে পারবেন না।

'এখন জানা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশকে মোট ৮ খানি অধীনতামূলক সম্প-র্কের চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে।...এসব চুক্তির শর্ত এত হীন এবং লজ্জাকর যে, তাজুদ্দিন সরকার ও বর্তমান সরকার জনগণের ভয়ে তা প্রকাশ করছে না। সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গুতোগুতি শুরু হওয়ায় গোপন চুক্তিগুলির কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যতদূর জানা গেছে, এসব চুক্তিতে ভারত কতকগুলি ব্যাপারে বাংলাদেশকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনার কর্তৃত্ব লিখিয়ে নিয়েছে।'

একটি চুক্তি সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ 'বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত তার পছন্দসই লোক দিয়ে পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধা সামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরুত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীটি হচ্ছে রক্ষী বাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোশাক, ভারতীয় সেনানীমণ্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'-এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ি, পোশাক, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বাহিনীটি ব্যবহার করা হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারতবিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে।'...

মওলানা ভাসানী ১৯শে সেপ্টেম্বর বরিশালের এক বিশাল জনসভায় যে ভাষণ দেন, 'হক কথা'র ২২শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তার বিবরণ নিম্নরূপে

www.pathagar.com

ছাপা হয় ঃ 'বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ জননেতা মওলানা ভাসানী শোষক, দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, তিন মাসের মধ্যে দুর্নীতিবাজ এম. সি. এ. ও আওয়ামী লীগারদের শাস্তি না দেওয়া হলে তিন মাস পর জনগণ লুটপাট সমিতির এসব সদস্যদের রাস্তার উপর জবাই করবে। তিন মাস পর গরীবরা শোষক অত্যাচারীদের অন্যায়ভাবে অর্জিত দোকান পাট, বাড়ীঘর জোতজমি সব কেড়ে নেবে।...

'বাইরে থেকে আমদানী করা খাদ্যশস্য থেকে ভারত ১৭ লাখ টন খাদ্য নিয়ে গেছে।...ভারতীয়রা এদেশ থেকে ঔষধপত্র অন্যান্য রিলিফ সামগ্রী বিপুল পরিমাণে পাচার করে নিয়ে গেছে। চাল, ডাল, তেল, পাট, চামড়া মশলাও চলে যাচ্ছে ভারতে।'

'হক কথা'য় ভারতের সাথে ৭টি গোপন চুক্তি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পরপরই এ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। একই সাথে তখন 'মুখ-পত্র' ও 'স্পোকসম্যান' নামক আরো দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। 'হক কথা' বন্ধ করে দেয়ার পর পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী ২৮শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন ঃ 'হক কথা' শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতির কথা প্রকাশ করিত বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 'হক কথা' বন্ধ করিয়া সত্য বলা বন্ধ করা যাইবে না। আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাইবে না। আমি থানায় থানায় কনফারেন্স করিয়া 'হক কথা'র চাইতে বেশী কাজ করিব। আমি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করিতেছে, এই কথা পারিলে অস্বীকার কর।'

নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত

'হক কথা' বন্ধ হবার পরপর মওলানা ভাসানী ব্যাপক গণসংযোগে বের হন। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি '৭৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে তাঁর দলের অংশ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। ঢাকা শহর ন্যাপের এক কর্মী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে 'ন্যাপ একটি নিয়ম-তান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল' বলে তিনি উল্লেখ করেন। ২২শে অক্টোবর মওলানা ভাসানী খসড়া শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, 'সংবিধানে দেশের প্রধান মন্ত্রীকে অহেতুক অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যাহা একনায়কত্ববাদী শাসনের দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে।' নভেম্বরের

www.pathagar.com

প্রথম সপ্তাহে ভাসানী-ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলের নির্বাহী কমিটির সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়ঃ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত গণ-পরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান রচনার অধিকার রাখে না। মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, তাঁর দল নির্বাচনে জয়ী হলে নতুন সংবিধান রচনা করবে। তিনি ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ইসলাম মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ বা মুজিববাদ হইতে অনেক বেহতের।' তিনি আসামে ভাষা-দাঙ্গার নামে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানোর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সেখানকার সঠিক অবস্থার খবর সংগ্রহের জন্য নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের একটি টীম প্রেরণের প্রস্তাব করেন।

২৯শে নভেম্বর কালিয়াকৈরের জনসভায় মওলানা ভাসানী দালাল আইন বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, এই আইন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচনের তিন মাস আগে বর্তমান সরকার ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনেরও তিনি দাবি জানান। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এ সময় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়করূপে তিনি প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল, ৩১শে ডিসেম্বরের পর আর কাউকে দালাল আইনে গ্রেফতার না করা প্রভৃতি দাবিসহ ১৫ দফা দাবিনামা পেশ করেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও, টেলিভিশনে বিরোধী দলের নির্বাচনী বক্তব্য প্রচারের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ২৫শে ডিসেম্বর তিনি চোরাচালান, মজুতদারী, কালো-বাজারী, ঘুষ, দুর্নীতি, হাইজ্যাক, রাহাজানি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস ও ফ্যাসিবাদী হামলার প্রতিরোধকল্পে সন্তোষে নিখিল বাংলা জোয়ান-কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেন।

৩১শে ডিসেম্বর ১৪ দলীয় সংগ্রাম পরিষদ আহূত পল্টন ময়দানের কৃষক শ্রমিক মৈত্রী সমাবেশে মওলানা ভাসানী বলেন, 'জনগণ সরকারকে ব্যালটের মাধ্যমে উৎখাত করিবে, না বুলেটের মাধ্যমে তাহা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কোন বিদেশী সরকার যদি আওয়ামী লীগের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে তবে বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তি তাহাদের গলা ধাক্কা দিয়া বাহির

www.pathagar.com

করিয়া দিবে। দুষ্কৃতকারী দমনের নামে ভারতীয় সৈন্য আনা হইলে পরিণতি ভয়াবহ হইবে।'

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সরকারী দলের শ্বেত-সন্ত্রাস ও ব্যাপক কারচুপি সম্পর্কে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। বিরোধী দল মাত্র সাতটি আসন লাভে সক্ষম হয়। তার মধ্যে ভাসানী-ন্যাপের ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাহউদ্দীন একটি আসন লাভ করেন।

তিয়াত্তরে ভাসানী ঃ খাদ্যের দাবিতে অনশন

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর দেশের রাজনীতিতে মারাত্মক স্থবিরতা নেমে আসে। এ সময় মওলানা ভাসানী খাদ্য সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশনকে কেন্দ্র করে তখনকার ঝিমিয়ে পড়া রাজনৈতিক অঙ্গন সরব হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও সিপিবি ছাড়া দেশের আর সকল রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠন মওলানার তিন দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানায় এবং দাবি আদায়ে সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে। মওলানা ভাসানী তাঁর অনশন সম্পর্কে ১৪ই মে প্রকাশিত 'হলিডে'র এক সাক্ষাতকারে এবং একই দিনে অনুষ্ঠিত পল্টনের জনসভায় বলেন, 'যুবক হইয়া বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে গিয়া জনসভা করিয়া সরকারের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তাই আমি অনশন ধর্মঘট করিয়া দেশের মানুষের মনে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাইতেছি।'

অনশনের পর মওলানা ভাসানীর পরবর্তী কর্মসূচী কি, জানতে চেয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঠানো চিঠির জবাবে এক বিবৃতিতে মওলানা ঘোষণা করেন ঃ '৭ই আগস্ট সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে জোয়ান শিবির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশা আল্লাহ্ আমি আমার সংগ্রামের কর্মসূচী উক্ত সম্মেলনে দেশবাসী ও দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের কাছে জানাইব।' এ বিবৃতিতে ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি পুনরুচ্চারণ করে মওলানা বলেন, 'সেদিন বেশী দূরে নয়, শুধু বাংলাদেশে নয়, দুনিয়ার বহু দেশে সংগ্রামী ঈমানদার জোয়ানদের সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

www.pathagar.com

১৯৭৩ সালের ২০শে জুন মওলানার কাছে লেখা এক চিঠিতে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম বাংলা থেকে আগত প্রায় ১৫ হাজার নকশালকে দমনের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। মওলানা তাঁর সাহায্যের শর্ত হিসাবে জানান, তার আগে ভারতের শোষকদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবকে সুস্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে।

ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক

মওলানা ভাসানী তাঁর অনশনের পর থেকেই ভারতীয় পণ্য বর্জনের আওয়াজ তোলেন। জুন মাসের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের এক বিশাল জনসভায় তিনি ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানালে সভায় উপস্থিত প্রায় আড়াই লক্ষ লোক দুই হাত তুলে সে আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানায়। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে মওলানা পল্টন ময়দানের সমাবেশ থেকেও ভারতীয় পণ্য বর্জন এবং ভারতের সাথে সকল গোপন চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। মওলানা ভাসানী তাঁর পূর্ব ঘোষিত তিন দফা দাবি এবং বাংলাদেশ-ভারত গোপন চুক্তি বাতিল ও ভারতীয় পণ্য বর্জনের দাবিতে ২৯শে আগস্ট সারা দেশে হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

মওলানার ডাকে ২৯শে আগস্ট সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। হরতাল বানচালের জন্য আওয়ামী লীগ, মো-ন্যাপ, সিপিবি ত্রিদলীয় মোর্চার পক্ষ থেকে অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন করা হয়, হরতালকারীদের ঢালাওভাবে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে তাদেরকে ঠেঙ্গানোর প্রকাশ্য হুমকি দেয়া হয়। সরকারী ও সরকার সমর্থকদের সৃষ্ট ব্যাপক সন্ত্রাস সত্ত্বেও সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ৩০শে আগস্ট ঢাকার কাগজগুলোতে হরতাল সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী খবর ছাপা হয়। কয়েকটি সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল ঃ 'সারা দেশে হরতাল হয়েছে', 'হরতাল অনেকাংশে ব্যর্থ', 'মেহনতি মানুষ হরতাল প্রত্যাখ্যান করেছে', 'ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে জীবন যাত্রা ছিল স্বাভাবিক', 'সিটি লাইফ নরমাল', 'ঢাকায় আংশিক হরতাল' ইত্যাদি। ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের আহ্বানে সারা দেশে পালিত প্রতিবাদ দিবসে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সমাবেশে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ঢাকার সাংবাদিকরা মওলানা ভাসানী আহূত হরতালের সঠিক খবর লিখতে পারেন নি। মধ্যরাতের টেলিফোনে সাংবাদিকদের সঠিক খবর লেখার অধিকার থেকে বিরত রাখা হয়েছে।'

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বরে সংঘটিত আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে 'ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আরব জনগণের জন্য অবিলম্বে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করিবার জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি' আবেদন জানান। 'ইসরাইলী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আরব ভাইদের সাহায্য করিবার জন্য' তিনি তাঁর নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে অবিলম্বে অনুমতি প্রদানের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

৯ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর জনসভায় তাঁরই স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। এই প্রচারপত্রটিতে 'জনসাধারণকে সশস্ত্র সাড়াশী আক্রমণ চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করার' আহ্বান জানিয়ে বলা হয়ঃ '১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার জনগণের সবচে গ্লানিকর দিবস।' প্রচারপত্রটিতে আরো বলা হয়, 'পূর্ব বাংলার মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণের উপর ধর্মীয় নির্যাতন চালান হচ্ছে, তাদের তাহজীব-তমদ্দুনকে ধ্বংস করে স্পেনের মতো তাদের নাম নিশানা মুছে ফেলবার চক্রান্ত চলছে।'

১২ই ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন আয়োজন করেন। এর আগে ১৯৭০ সালে প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনেও দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ যোগদান করেন। তাঁদের সহযোগিতায় এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্রিয়া শুরুর উদ্দেশ্যে একটি প্রজেক্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মওলানা ভাসানী ঃ 'দালাল ও দেশদ্রোহী'

পাকিস্তান আমলে মওলানা ভাসানীকে '৫৭ সালের শেষ ও '৫৮ সালের শুরুতে 'ভারতীয় চর' আখ্যা দেয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের মঞ্চ থেকে। তার মাত্র এক যুগের ব্যবধানে সেই আওয়ামী লীগের মঞ্চ থেকেই 'পাকিস্তানের দালাল' নামে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন একজন বিদেশী নাগরিক। তিনি ভারতের মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির (সি পি আই) নেতা রাজেশ্বর রাও।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে পাঁচ দিনের সফর শেষে ১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. রাও বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাত ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির জন্য স্বাধীনতাবিরোধী অতি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অতি বামপন্থীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করেছে।' ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতার বিদায় নেয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে মো-ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি দৈনিক পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'বর্তমানে মওলানা ভাসানী রাজ-নীতির অযোগ্য। তিনি বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেন নি। ভাসানী এখনো বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চান। বাংলাদেশের জনগণ এই চক্রান্ত-কারীকে খতম করে দেবে।' মওলানা ভাসানী তার জবাবে মোমেনশাহীর সার্কিট হাউস ময়দানে ৯ই মে'র জনসভায় বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু মনি সিং-মোজাফফররা করে নাই, স্বাধীনতা আনিয়াছে বাংলার ৯৫ ভাগ মানুষ। কম্যুনিস্টরা যা-ই বলুক, আমার তাহাতে কিছুই যায় আসে না। আমিই মুজিবের প্রকৃত ভালাই চাই।' এ সময় থেকেই ক্রমশ মওলানার বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও নিন্দাবাদ বাড়তে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও এই নিন্দাবাদে শামিল হন। মওলানা ভাসানীকে তাঁরা আখ্যায়িত করেন 'পাকিস্তানের দালাল', 'বাংলাদেশে চীনের রাষ্ট্রদূত', 'দেশদ্রোহী', 'দালাল-রাজাকার আল বদরদের আশ্রয়দানকারী', 'দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী', 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি বিশেষণে। বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির ব্যর্থতার জন্যও তখনকার কোন কোন আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা ভাসানীকে অভিযুক্ত করেন। মওলানাকে নিয়ে সৃষ্ট এই ঝড়ের সময় ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায় বলা হয়ঃ 'সরকারী মুখপাত্রদের অন্ধ বিদ্বেষমূলক প্রচারাভিযানের ফলে জনমতে এরূপ ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে যে, আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান যেমন ন্যায্য দাবী-দাওয়ার কথা তোলায় শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রবিরোধী ও ভারতের চর বলে গালিগালাজ করতো, বর্তমান সরকারও দেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধরায় ভাসানীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে দেশদ্রোহী ও চীনের চর বলে গালিগালাজ করছে। বস্তুত অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ শাসকরা জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাবার জন্য বিরোধী পক্ষকে দেশের শত্রু ও স্বাধীনতার শত্রু আখ্যা দিতে যে চিরদিনই অভ্যস্ত, সে সম্পর্কে এদেশের মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে।'

www.pathagar.com

ভারতীয় পত্রিকায় প্রচার অভিযান

১৯৭৩ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামের জনসভায় ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানোর পর হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার ৮ই জুন সংখ্যায় এই নবতিপর বর্ষিয়ান জননেতার একটি কার্টুন ছবি ছাপা হয় গাছের বাকল পরা অবস্থায়। ভারতীয় পণ্য বর্জন করলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পরনে বস্ত্র জুটবে না, সে কথারই ইঙ্গিত হিসাবে ছবির নীচে ক্যাপশন ছাপা হয়ঃ 'বয়কট ইণ্ডিয়ান গুড্স্।' ঠিক সে সময়ই কলকাতার যুগান্তর পত্রিকায় মওলানা ভাসানীকে তাঁর সরকারবিরোধী ভূমিকার জন্য 'শয়তান' বলে গালিগালাজ করা হয় এবং আওয়ামী লীগের পরই মো-ন্যাপ ও সিপিবি সর্বাত্মক জনপ্রিয় দল বলে উল্লেখ করে 'প্রশাসনের ভিতর ও বাইরের কুচক্রীদের সম্পর্কে' দ্রুত কঠোর হবার জন্য বাংলাদেশের সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়। প্রায় একই সময়ে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা প্রাভদায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রবন্ধে 'বাংলাদেশ সরকারকে হেয় ও অপদস্ত করার জন্য যে অভিযান শুরু হয়েছে' তা প্রতিহত করার কাজে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগের প্রতি সমর্থন' জানান হয়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা পি টি আই-এর সূত্রে এই খবর বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ভারতের শুধুমাত্র আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকাতেই মওলানা ভাসানীকে 'শয়তান', 'বেইমান', 'ধূর্ত', 'ধুরন্ধর', 'পাগল', নিমকহারাম' প্রভৃতি অশালীন বিশেষণে অভিহিত করে অন্তত আটটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

মওলানা ভাসানী তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের অপপ্রচারের জবাবে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক বিবৃতিতে বলেন, 'এক-দল উগ্রপন্থী কম্যুনিস্ট ও অন্য একদল প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রসারণবাদী হিন্দুস্তান সরকার, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আজ্ঞাবহ তল্পীবাহী বাংলাদেশ সরকার ও তাদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে যে, আমি ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আওয়াজ তুলিয়াছি তাহাতে সাম্রাজ্য-বাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ শক্তিশালী হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিবে, সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইবে, বাংলাদেশ পুনরায় পাকিস্তান হইবে। এই সকল জঘন্য প্রচারের উত্তরে আমার সারা জীবনের কার্যক্রম সম্পর্কে যাহারা অবগত আছেন তাহাদেরকে নতুন করিয়া কিছু বলিবার নাই।'

www.pathagar.com

আনন্দবাজারের জবাবে

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'মৌলানার জেহাদী জিগির' শিরোনামে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঢাকার বেশ ক'টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে আনন্দবাজারের মন্তব্যের কড়া জবাব দেয়া হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের ঘরে-বাইরে উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশিষ্ট কলামিস্ট সন্ধানী লেখেন ঃ

'⋯অধুনা আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা যেভাবে মওলানা ভাসানীর ঠ্যাং কামড়া-কামড়ি শুরু করেছেন, সত্যি বলতে কি, তিরিশোত্তর জীবনে কোন-দিন তা দেখি নি। তাই বিষয়টি যুগপৎ বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে।.. আনন্দবাজার যা করেছেন তা আলোচনা নয়, গালাগালি। এবং সেই সাথে উপদেশচ্ছলে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে বিকৃত করার ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়ার মতো কাজ। এই অবাঞ্ছিত কাজ আনন্দবাজার কোন্ প্রেরণা থেকে করেছেন সে কথা অন্তর্যামী জানেন। আমরা জানি, স্বার্থে টান পড়লেই মানুষ ক্ষিপ্ত হয় সবচে বেশী। গ্রামীণ প্রবাদেও আছে, 'পুত্রশোক ভোলা যায়, কিন্তু অর্থশোক ভোলা যায় না।' বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তাব্যক্তিরা ঢাকার হোটেল ইন্টারকনে মহাসমারোহে রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করেছিলেন। কেউ কেউ তখন রগড় করে বলেছিলেন, আসলে সে নাকি ছিল এদেশের সংবাদপত্র জগতকে এ কথাটা সুকৌশলে জানিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা 'তোমাদের প্রয়োজন শেষ, বিদায় হও, আমরা তোমাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে প্রস্তুত।' সে প্রচেষ্টা মাঠে মারা পড়ার জ্বালা হতে ক্ষিপ্ততার সৃষ্টি, তেমন কথা আমরা বলি না। মওলানার মাথার টুপীই আনন্দবাজারকে বেসামাল করেছে বলে যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁদের সঙ্গেও আমরা একমত হতে চাই না। মওলানা যেহেতু মওলানা সেহেতু তাঁর মাথায় টিকির পরিবর্তে টুপী থাকবে, সে ত জানা কথা।

'...এ যুগেও পরিশীলিত মানসিকতার অধিকারী সাংবাদিক সমাজের পক্ষে এহেন ভাষা প্রয়োগ করা সম্ভব, আনন্দবাজারের সৌজন্যে আমরা শুধু তা-ই জানতে পেরেছি তা নয়, আনন্দবাজার মওলানার দেশপ্রেম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কেও নতুন জ্ঞান দানের চেষ্টা করেছেন। আনন্দ-বাজার মওলানার দেশাত্মবোধ সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন সে

www.pathagar.com

সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনা চরকায় তেল দেওয়াই অধিকতর শোভনীয়। কেননা মওলানার রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যাঁরা একমত নন তাঁরাও তাঁর সংগ্রামী জীবন এবং দেশাত্মবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন না।... সুতরাং শ্বেতাঙ্গিনী মিস মেয়োর জাত ভাই কালাহান সাহেবরা একদা যে বিদ্বেষী মানসিকতা দেখিয়েছেন সে রকম কিছু না দেখানোই ভাল। মার চেয়ে মাসির দরদ বেশী দেখাতে গেলে লোকে অন্য কিছুও ভাবতে পারে। তাই আমাদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে 'মৌলানার জেহাদী জিগির' জাতীয় সম্পাদকীয় লেখার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এবং মুরুব্বীগিরি না করাই সঙ্গত।'

দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, '..অবাঞ্ছিত এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি নিবন্ধের শ্লেষাত্মক মন্তব্য থেকে।... কোন বক্তব্য যদি কেবল অশালীন ভাষা, বিদ্রূপ আর কটু-কাটব্যে ভরা থাকে তবে তাকে আর যা-ই হোক সুচিন্তিত মতামত বলা যায় না। কটাক্ষই তখন বক্তব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কল্পনাও করতে পারিনি আনন্দবাজারের মতো একটি সুপ্রাচীন পত্রিকা মওলানা ভাসানীর নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে এমন ব্যক্তিগত আক্রমণের আশ্রয় নিতে পারেন। ...আনন্দবাজার কেন এই বয়োবৃদ্ধ নেতা সম্পর্কে এমন সব বিদ্রূপাত্মক উক্তি করলেন তা আমাদের সাধারণ বিচারবুদ্ধির অগম্য।

'আমরা আরো হতবাক হয়েছি একই প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে তাঁরা স্বাধীনতার কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্যে যে অহংকার প্রকাশ পায় তা বন্ধুত্বের মর্যাদাবোধকে হেয় করে।...একথাও আনন্দবাজারের অনুধাবন করা উচিৎ ছিল পৃথিবীর সব মুক্তি সংগ্রামের পেছনেই অনেক বন্ধু দেশের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান থাকে। তার জন্য কেউ কাউকে খোঁটা দেয় না। এটা অনুদার মনোভাবেরই পরিচায়ক।'

'মওলানা ভাসানীর অপমান গোটা জাতির অপমান' শিরোনামে দৈনিক গণকণ্ঠে জনাব আহমদ ছফা লিখেছেন ঃ

'...তাঁরা ভাবেন আমরা তাদের আশ্রিত করদরাজ্য। সুতরাং নিজের চাইতে শক্তি সামর্থ্যে যে দুর্বল তাকে বন্ধু বলার মধ্যে যে কোন গৌরব নেই, আমাদের বন্ধু দেশ ভারতের 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'অমৃত বাজার' 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড', সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুরা ভাল করেই বুঝে গেছেন। ...এই পর্যন্ত উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের নামে

www.pathagar.com

যত ধরনের মিথ্যা, উদ্ভট এবং আজগুবি সংবাদ পরিবেশন করেছেন তার সবগুলো সংগ্রহ করলে এ বিষয়ে খুব বড় আকারের একখানা গ্রন্থ লিখে ফেলা যায়।...বিগত কয়েকদিন আগে হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড-এ মওলানা ভাসানীর উপর একখানি কার্টুন ছাপা হয়েছে। তাতে মওলানার শরীর থেকে লুঙ্গী খুলে যাচ্ছে দেখানো হয়েছে। তার কিছুদিন পরে যুগান্তর পত্রিকায় একটি মন্তব্যে মওলানাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে মাননীয় সাংবাদিক তাঁর ইতর রুচির চরিতার্থতা করেছেন। এই দুই-তিন দিন আগে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় কলামে মওলানাকে 'বেঈমান' ঘোষণা করেছেন। এবং বলেছেন, এই বাংলাদেশে মওলানা ভাসানীই সাম্প্রদায়িকতার আমদানী করেছেন। হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারছি নে। আজ আনন্দবাজার পত্রিকা অসাম্প্রদায়িকতার সাফাই গাইছেন—যেমন ভূতের মুখে রাম নাম। আমাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, ভারতে যখন জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা মিলে সাম্প্রদায়িকতার জয়ধ্বনি দেয় তখন আপনারা কোন্ ভূমিকা পালন করেন! ১৯৬৪ সালের রায়টের সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে চালান দেয়া ইলিশের ঝুড়িতে মানুষের মাথা পাওয়া গেছে—এই উদ্ভট সংবাদ প্রকাশ করে পশ্চিম বঙ্গে আপনারা সম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগান নি? এখন কোন্ মুখে আপনারা অসাম্প্রদায়িকতার ভেক ধরে মওলানা ভাসানীর নিন্দে করছেন? কয়লা ধুলে ময়লা যায় না কথাটি আপনাদের বেলাতেই অত্যধিক সত্য।

...'তিনি (মওলানা ভাসানী) আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকা পালন করছেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আপনারা যে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিকে দেবতাজ্ঞানে কূটনৈতিকভাবে পূজো করেন, তিনিও এক বয়সে এক সময়ে মওলানার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদও এক সময় ইউরোপে মওলানা সাহেবের সুটকেস বহন করে রাজনীতির আসরে এসেছিলেন। কমরেড মনি সিংদের এক সময় মওলানা সাহেবই রাজনৈতিকভাবে লালন-পালন করেছিলেন। আপনারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস জানেন না। তাই যখন তখন যা ইচ্ছা তাই বলে ফেলেন। আমাদের বিশ্বাস, জানলে এমন বলতে সাহস করতেন না।

'ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে'—একথা বলে আপনারা কি বাংলাদেশের জনগণকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, বাংলাদেশের জনগণ ভারতের অধীনতা মেনে চলুক! ভারতের অধীন করে রাখার জন্য

www.pathagar.com

আপনারা স্বাধীন করে দিয়েছেন। মওলানা ভাসানী তার বিরোধিতা করেছেন সুতরাং বেঈমান মওলানা ভাসানী।'

'ওপারের সাংবাদিকতা ঃ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক' শিরোনামে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় এক দীর্ঘ উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'মওলানা ভাসানী নবতিপর বৃদ্ধ জননেতা। সম্ভবত উপমহাদেশে তাঁর চেয়ে বয়োবৃদ্ধ জননেতা নেই।...তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে একটু সরে দাঁড়ালেই তিনি ভারতের জয়প্রকাশ নারায়ণের চেয়েও যে বেশী গ্রহণীয় হতেন একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর সম্পর্কে অনবরত গালাগালি বর্ধিত হচ্ছে ওপারের পত্র-পত্রিকায়। আনন্দবাজার তাঁকে 'শয়তান' বলেছে। বলেছে, 'জাল টাকা, রদ্দি মাল, চোরা কারবার হেন অপরাধ নাই যে অপরাধে বেঈ-মান এই মওলানা তাঁহার দেশের মুক্তিদাতা ভারতকে দায়ী করেন নাই।' ...মওলানা ভাসানী ভারতকে বাংলাদেশের মুক্তিদাতা দেশ মনে করেন না বলেই তাঁকে ধূর্ত, ধুরন্ধর, বুড়া, বেইমান, পাগল, নিমকহারাম, শয়তান বলে গালাগাল করা হচ্ছে। মওলানা ভাসানী কেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষও তাই মনে করে। তাই বলে গোটা জাতিকে কি তারা ঐ বিশেষণে বিশেষিত করবেন?'

টুকরো টুকরো করার হুমকি

মওলানা ভাসানীর রুশ-ভারত আধিপত্যবাদবিরোধী ভূমিকার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে সর্বাধিক উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মনি সিং। ১৯৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, মো-ন্যাপ ও সি পি বি সমন্বয়ে গঠিত ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে বায়তুল মুকাররমে অনুষ্ঠিত জনসভায় মনি সিং মওলানা ভাসানীকে 'টুকরো টুকরো করে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করার' হুমকি দেন। তার জবাবে মওলানা ভাসানী বলেন, 'শ্রীমনি সিং দেশে বড় একটা গোলযোগ বাধাইয়া উহার উসিলায় এখানে রুশ-হিন্দের প্রভাব আরও প্রত্যক্ষ ও মজবুত করিতে চাহিতেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এক বিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে রাশিয়া ও ভারতের কোন প্রকার ষড়যন্ত্রই কায়েম হইতে দিব না।'

চুয়াত্তরে ভাসানী ঃ 'আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন'

১৯৭৪ সালে মওলানা ভাসানী সকল প্রকার দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার এবং রবুবিয়াত বা পালনবাদী দর্শনের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হুকুমাতে রব্বানীয়া সমিতি গঠন করেন। হুকুমাতে রববানীয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, 'শ্রেণীহীন সমাজের কথা ভাবিতে গিয়া মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও হিংস্র হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস, একমাত্র রবুবিয়াতের দর্শনই জাতি-ধর্ম-মতবাদ নির্বিশেষে সকল মানুষকে শান্তি দিতে পারে। সবার লক্ষ্য যদি স্রষ্টা হয়, সকল সমস্যা সমাধান কল্পে যদি স্রষ্টার নিয়ম প্রবর্তিত হয় তবে হানাহানির অবকাশ কোথায়? স্রষ্টার নিকট তো সবাই সমান। তিনি একই বিধানে সকলের নিকট দাতা, দয়াময়, প্রেরণাদানকারী—এক কথায় সকল চেতনার উৎস।... হুকুমাতে রব্বানীয়ার মূল কথা—আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন।...'

মওলানা এ সময় সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, লুটপাট এবং রুশ-ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সকল প্রকার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অব্যাহত রাখেন।

'৭৪-এর জানুয়ারীতে তিনি জিহাদের ঘোষণা প্রচার করে বলেন, 'আমরা হিন্দুস্তান, হিন্দু মহাসভা এবং বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ ভাগ মুসলমানের অপরাপর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করিব, যাহারা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নষ্ট করিয়া দিতে চায়। আমরা মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করিব, কারণ তাহারা আমাদের সকল ধান, চাউল, পাট, মাছ, সোনা ইত্যাদি পাচার করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা হত্যা ও লুটপাটকারী সকল বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিব।'

এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী এ সময় বলেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এক বিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে রাশিয়া ও ভারতের কোন প্রকার ষড়যন্ত্র কায়েম হইতে দিব না। এই সংকল্প আমার একার নহে। বিগত দুই বৎসরে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলাদেশের কোটি কোটি স্বাধীনচেতা নাগরিক জান-মাল সব কিছু হারাইতে প্রস্তুত, কিন্তু রাশিয়া ও ভারতের গোলামী মানিয়া লইবে না।'

জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'যেই সব দামাল ছেলে ইণ্ডিয়ার দাসত্ব হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য অস্ত্র হাতে লইয়াছে, আমার এই শেষ বয়সে তাদের জন্য দোয়া করিয়া যাই, তাহারা জয়ী হইবে। লুটপাট বাহিনী উচিৎ শিক্ষা পাইবে। জনগণই এই দেশের বড় শক্তি। সহ্যের

www.pathagar.com

মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে জনগণই একতাবদ্ধ হইয়া ইণ্ডিয়ার তাবেদার শক্তিকে উৎখাত করিবে।'

মার্চ মাসে মওলানা ভাসানী প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবের উদ্দেশে বলেন, 'সময় থাকিতে মুসলমান প্রধান মন্ত্রীর মতো কাজ আরম্ভ কর। তোমাকে এই সকল কথা জানাইয়া কোন ফল হইবে না। তবে মনে রাখিও, অত্যাচারী ও তাহাদের সাহায্যকারীকে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করেন না।'

মধ্য এপ্রিলে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'এদেশের মানুষ না খাইয়া মারা যাইতেছে। আইনের শাসন নাই। রক্ষীবাহিনী লোকজনকে ঘর হইতে টানিয়া নিয়া হত্যা করিতেছে এবং লাশ নদীতে ভাসাইয়া দিতেছে। রক্ত পানি করিয়া উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্যের বদলে বিদেশ হইতে সিনেমা আমদানী করা হইতেছে।' তিনি বলেন, 'রাজবন্দীদের অপরাধ কি পাকিস্তানী যুদ্ধ অপরাধীদের চাইতেও বেশী? ...পিটাইয়া, জেলে পাঠাইয়া গুলী করিয়া মুজিববাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে জনগণকে বাধ্য করা যাইবে না। জনগণ একমাত্র আল্লাহ্র আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করিবে না।'

প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিব ২৪শে এপ্রিল বুধবার 'বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার, চোরা-চালান দমন, সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের আটক এবং খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুতদারী মুনাফাখোরী রোধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য' সামরিক বাহিনী তলব করেন। এই অভিযান চলাকালে 'সাময়িকভাবে সমস্ত ধর্মঘট, লক আউট, বিক্ষোভ, শোভা-যাত্রা বন্ধ থাকবে' বলে প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে উল্লেখ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন, 'সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের পরিচালক-মণ্ডলী ও তাঁহাদের সমর্থকরা যখন দলীয় আদর্শ বিসর্জন দিয়া লুটপাট সমিতির সদস্য হইয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছিল, তখনই আমি বারবার তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপদেশ সরকার ও সরকারের সমর্থক কেহই শুনেন নাই।

'আমার দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সামরিক বাহিনীও যদি আমার শেষ উপদেশ না শুনে তবে বাংলাদেশের যে সর্বনাশ হইবে তাহা হইতে দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না।

www.pathagar.com

'প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শায়েস্তার পরিবর্তে যদি বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে শুধু দেশের আপামর জনসাধারণের কোপানলেই পড়িবেন না, বিশ্বের স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের গজবে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।'

কম্যুনিস্টদের বিদায়

১৯৭৪ সালে কম্যুনিস্টদের সর্বশেষ গ্রুপটিও মওলানা ভাসানীর সাথে সম্পর্ক-চ্ছেদ করে। মওলানা ভাসানীর সাথে কম্যুনিস্টদের প্রথম যোগাযোগ হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হবার পর, '৫০-এর দশকে। তাদেরকে সাথে নিয়ে '৫৭ সালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক লাইনে মস্কো-পিকিং কম্যুনিস্ট দ্বন্দ্বের জের হিসাবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে মস্কোপন্থীরা মওলানার ন্যাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে মওলানার সাথে চীনপন্থী কম্যুনিস্টদের সম্পর্কেরও দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক আইন জারীর পর থেকে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালু করার আগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে কম্যুনিস্টদের সাথে মওলানার দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এ সময় 'কিছু কিছু ধর্মীয় সমাবেশে' মওলানা ইসলামী সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তোলেন এবং 'ছোট ছোট ঘরোয়া রাজনৈতিক মজলিসে' কম্যুনিস্টদের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)-র অনেক সমালোচনা করেন। ১৯৭০ সালে জনাব আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা চারু মজুমদারের নকশাল বাড়ীর লাইন ধরে যথাক্রমে কৃষক সমিতি ও ভা-ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। আবদুল মতিনও একই পথ অনুসরণ করেন। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, '১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কমিউনিস্টদের সাথে, বিশেষত যে সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি ১৯৭১ সালের প্রথম পর্যন্ত তাঁর সাথে কিছুটা সম্পর্কিত ছিল, তাঁদের সাথেও মওলানার পরিপূর্ণ রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে। কাজেই এরপর তাঁর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে কমিউনিস্ট নামে পরিচয় দানকারী কোন গ্রুপের কেউই আর অবস্থান করেনি।' (কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী ঃ শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত মওলানা ভাসানী জীবন ও সংগ্রাম)। বাংলাদেশ হবার পর ভাসানীপন্থী ন্যাপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে হাজী দানেশ, সিরাজুল হোসেন খান ও এনায়েতুল্লাহ খানের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

'জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন' গঠিত হয়। কিন্তু এরপরও কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন ও মাহবুব উল্লাহদের নেতৃত্বে 'কোঅর্ডিন্যাশন কমিটি ফর কম্যুনিস্ট রেভোল্যুশন'পন্থী নামে পরিচিত কম্যুনিস্টরদের একটি গ্রুপ মওলানা ভাসানীর সাথে ছিলেন। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মওলানার সাথে এই গ্রুপের বিরোধ প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। এই গ্রুপটির অভিযোগ ছিল, মওলানা ভাসানী ও তাঁর সমর্থক রাযী-মশিয়ূর-ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাহউদ্দীন গং প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা পোষণ করেন, দলের প্লাটফরম থেকে নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দেয়া হয়, কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়। কিন্তু মওলানার ব্যক্তিগত ইমেজের সামনে দাঁড়িয়ে এসব প্রতি-ক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরোধিতা করাও সম্ভব হয় না। অন্যদিকে ভাসানী সমর্থক অন্য গ্রুপটির অভিযোগ ছিল, জাফর-মেননপন্থীরা প্রকাশ্যে ভাসানী ন্যাপের সাথে জড়িত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত। তাছাড়া তারা ভারতের সিপিএম-এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত বলে অভিযোগ করা হতো। জনাব মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়াকে দালাল হিসেবে জেলে ঢুকানো এবং অন্যদিকে কাজী জাফরের হুলিয়া সম্পর্কে নীরবতা পালনের জন্য উভয় গ্রুপ পরস্পরকে দোষারোপ করতো। ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরে 'চরম বাম' ও 'সমন্বয়পন্থী'দের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করার পর 'চরম-পন্থী'রা নিজস্ব মুখপত্র হিসেবে 'বঙ্গবার্তা' এবং অন্যদিকে 'সমন্বয়পন্থী'রা 'হক কথা' দৈনিকরূপে প্রকাশ করারও তোড়জোড় শুরু করেন। দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে সন্তোষে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 'চরম বাম'-পন্থীরা দলের তলবী সভা আহ্বান করে এবং মওলানা সম্পর্কে প্রকাশ্য কটুকাটব্য উচ্চারণ করে। 'চরম বাম'-দের উক্তির জবাবে মওলানা ভাসানী ২৩শে মে এক বিবৃতিতে বলেন, 'তথাকথিত বিপ্লবী নামধারী কম্যুনিস্টরা গত ৩০ বছর যাবত আমার ঘাড়ে সওয়ার হইয়া রাজনীতি করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু সে আশা তাহারা পূরণ করিতে পারে নাই। কারণ কোন কালেই আমি কম্যুনিস্ট ছিলাম না এবং বর্তমানেও না ইনশায়াল্লাই ভবিষ্যতেও হইব না। আমি আজীবন ইসলামের জন্য এবং শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। ইনশায়াল্লাহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহাই করিয়া যাইব।

'তথাকথিত বিপ্লবীদের আমি আগেও বলিয়াছি, আমার পিছনে ঘুরিয়া কম্যুনিজম প্রচার করিয়া কোন লাভ হইবে না। তোমরা নিজস্ব আদর্শ

www.pathagar.com

অনুযায়ী পৃথক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর। একই ব্যক্তি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হইয়া সমাজকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কোন ফল হইবে না।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আমার ছত্রছায়ায় যাহারা রাজনীতি করে তাহারাই আবার পরে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাহাতে আমি মোটেই দুঃখিত নই।'

'বামপন্থীরা' তাঁদের তলবী সভার নোটিশে যে কাউন্সিল সদস্যদের নাম উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে অন্তত তেরো জন নেতৃস্থানীয় কাউন্সিলর নোটিশে তাদের নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। পাল্টা বিবৃতিতে তাঁরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন।

এর পর মওলানা ভাসানীর দলে আর কোন কম্যুনিস্ট অবশিষ্ট থাকল না।

বলা প্রয়োজন, কম্যুনিস্টরা মওলানাকে কখনো কম্যুনিস্ট ভাবেন নি। তাঁরা তাঁকে তুলনা করেছেন জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ সেনের সাথে। পঞ্চমের দশক থেকে কম্যুনিস্টরা সব সময়ই মওলানার সাথে যোগ দিয়েছেন নীরবে, নিঃশব্দে। কিন্তু মওলানার সাথে প্রতিবারই তাদের সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাগুলো ছিল সরব ও সশব্দ।

খাঁচায় বন্দী সিংহ

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ছয় দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ২রা জুন তাঁর সভাপতিত্বে ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে খাদ্যের দাবিতে এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩০শে জুনের মধ্যে দিল্লী চুক্তি বাতিল এবং সর্ব প্রকার দমন নীতি প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে চরমপত্র দেয়া হয়। দাবি না মানলে ৩০শে জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করা এবং পল্টনে জনসভা করার ঘোষণা প্রদান করেন মওলানা ভাসানী। জাসদের জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও-এর ঘটনা কেন্দ্র করে ১৭ই মার্চ থেকে ১৪৪ ধারা জারি ছিল। মধ্য জুনে ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে দলীয় কর্মী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সকলের কাছ থেকে 'বিদায়' গ্রহণ করেন এবং তাঁর দোষত্রুটি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাফ করে দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ৩০শে জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে

www.pathagar.com

বিরোধী দলের ওপর ব্যাপক জুলুম নির্যাতন চালানো হয়। মওলানা ভাসনীকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে অন্তরীণ রাখা হয় সন্তোষে। এরপর দেশের রাজনীতিতে নেমে আসে কবরের নীরবতা। জুলাই মাসের প্রথমার্ধে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ও ওয়ার্কিং কমিটির এক যৌথ বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীকে নিরঙ্কুশ সাংবিধানিক ক্ষমতা দান, সমাজবিরোধী দমনে ফায়ারিং স্কোয়াডসহ কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত, ৬ জন কেবিনেট ও ৩ জন প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ, নাগরিকদের বিদেশ যাত্রার ওপর বিধিনিষেধ, চোরাচালান বন্ধ করতে সীমান্ত 'সীল' করার কাজে সেনাবাহিনী নিয়োগ প্রভৃতি চরম পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জাতির ওপর অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তকে ২৭শে আগস্ট তারিখে প্রদত্ত আদালতের এক রায়ে 'অবৈধ, বাতিলযোগ্য, এখতিয়ার-বহির্ভূত এবং সংবিধানে বর্ণিত সকল মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী' বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার পরও মওলানা ভাসানীকে তাঁর সন্তোষের অন্তরীণ জীবন থেকে মুক্তি দেয়া হয় নি। দেশের খাদ্যাভাব ও আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা তখন মারাত্মক আকার ধারণ করছিল। দ্রুত ক্রমাবনতিশীল তখনকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঢাকার সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় 'ভাসানীর বিদ্রোহী কণ্ঠ আর কতদিন দাবিয়ে রাখা হবে?' শিরোনামে প্রথম উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'আজ প্রায় চার মাস হতে চললো, বাংলার বয়োবৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানী...স্বয়ং মুজিব সরকারের পুলিশের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ। মওলানা ভাসানীর সবচে বড় অবদান হচ্ছে জুলুম নির্যাতন অবিচারের বিরুদ্ধে মজলুম গণমানুষের প্রতিবাদী চেতনাকে জিইয়ে রাখা। আর এ জন্যই ক্ষমতা-সীন কায়েমী স্বার্থীরা চিরদিন মওলানাকে ভীতির চোখে দেখেছে। ...দেশের বর্তমান দুর্যোগময় মুহূর্তে মওলানা ভাসানীর প্রয়োজন ছিল সবচে বেশী।'

সন্তোষে সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরায় নিজগৃহে অন্তরীণ অবস্থাতেও ভাসানী দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্ভোগের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতি দেখে চুপ করে থাকতে পারেতন না। দেশের উল্লেখযোগ্য যে কোন ঘটনায় তিনি সর্বপ্রথম মুখ খুলতেন সেই মওলানা ভাসানী দেশের ভয়াবহ বন্যায় জাতির দুর্দিনে আগস্ট মাসে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'দুর্গত লোকদের ত্রাণকাজ ত্বরান্বিত না হইলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে একমাত্র বিলম্বের জন্যই ৫২

www.pathagar.com

লাখ লোক মারা গিয়াছিল। এবারও সেই ভুল করিলে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৩ সালের মন্বন্তরকে ছাড়াইয়া যাইবে।'

১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর দেশের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ সরকারের চরম অবহেলার মধ্যে খাদ্য ও চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার ঘটনাতে মওলানা ভাসানী অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, 'দেশের দানশীল ব্যক্তিদের অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে কবি ফররুখ আহমদের ইন্তেকালের খবরে আমি দুঃখিত হইলেও আশ্চর্য হই নাই।...এইজন্য জাতির লজ্জিত হওয়া উচিৎ।'

এরপর ডিসেম্বর মাসে দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে সন্তোষ থেকে পাঠানো অপর এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রধান মন্ত্রী প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়াছে, ইহা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। মানবতার খাতিরে রাজনীতির উর্ধ্বে থাকিয়া এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইবে।

'বাংলাদেশ হইতে ভারতে চাউলসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী যে পাচার হইয়া যাইতেছে, এখনও এ ব্যাপারে কি কাহারও সন্দেহ রহিয়াছে? স্বাধীনতার শুরু হইতে আমার সাপ্তাহিক হক কথা এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে আমি উল্লেখিত ঘটনাসমূহের পুনরুক্তি করিয়াছি। ইহার জন্য আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। 'হক কথা' আজ বন্ধ, আমিও স্বগৃহে বন্দী জীবন যাপন করিতেছি। কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধি কোথায়? আমার দেশের নিরপরাধ জনগণ যখন ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করে তখন আমার হৃদয় ব্যথায় ভরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই দুর্ভাগা জাতিকে বাঁচানোর মানবিক ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি। গণহত্যা সর্বদাই রাজনৈতিক ভুল কিন্তু দুর্ভিক্ষ সরকারের নিকট উহার চেয়েও মারাত্মক। বন্ধুত্বের নামে, কর্ম দক্ষতা ও প্রজ্ঞার অভাবে এবং একগুঁয়েমী ও প্রশাসনিক দুর্বলতার ফলে সাত কোটি 'আশরাফুল মখলুকাত' আজ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হইয়া মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে।

'যেখানে সরকার নিজ দায়িত্ব অনুধাবন ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ সেখানে শুধুমাত্র রিলিফ আর ঋণ দান করিয়া এ জাতিকে বাঁচান যাইবে না।

www.pathagar.com

'ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় কালোবাজারীদের থাবা বিস্তৃত হইয়াছে। এসব কালোবাজারীর হিংস্র থাবা হইতে সাড়ে সাত কোটি লোককে রক্ষা করার জন্য সরকারের এ মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করা উচিৎ। এজন্য দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার স্বাভাবিকীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমি মশিয়ূর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করিতেছি। আমি মনে করি এ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে এ জাতিকে রক্ষা করার জন্য সরকার এবং বিরোধী দলসমূহ একই কর্মসূচীর ভিত্তিতে বর্তমান মানবিক সমস্যার মোকাবিলা করিতে পারে।'

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন

মওলানা ভাসানী সন্তোষে অন্তরীণাবস্থাতেই ১৯৭৪ সালে তাঁর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সন্তোষ ও তার আশ-পাশের প্রায় এক শ' একর জমি নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে তোলেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ হিসেবে গৃহাদি, রাস্তা-ঘাট সংস্কার ও নির্মাণ এবং শিক্ষা সরঞ্জাম তৈরীর কাজে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করেন। সে বছরই তিনি তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ জানান। তিনি প্রধান মন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা ও কাঠামো বিশ্লেষণ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের জন্য একটি খসড়া পেশ করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে অর্ডিন্যান্সের খসড়ায় 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর পরিবর্তে 'মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণের সুপারিশ করেন। মওলানা ভাসানী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আসলে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই। ইহার আদর্শ ইসলাম ও রবুবিয়াতের প্রচার। ইহাতে মওলানা ভাসানীর নাম সংযোজন মানে বিসমিল্লাহতেই গলদ—রবুবিয়াতের বরখেলাফে নফসানিয়াত কায়েম করিয়া দেয়।' মওলানা আরো বলেন, 'আমি একজন একক ব্যক্তি। আর ইসলাম একটি সুমহান আদর্শ, বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। আমি তোমার পরামর্শ মানিয়া নিতে পারিলাম না।' মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ১৯৭৪ সালেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন।

www.pathagar.com

পঁচাত্তরে ভাসানী ঃ 'রাজনীতি থেকে সাময়িক অবসর'

১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দেশের একক রাজনৈতিক দলরূপে 'জাতীয় দল' (বাকশাল) গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব সন্তোষে গিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাত করেন এবং একান্তে কথাবার্তা বলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানীর 'জাতীয় দল'-এ যোগদান প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মওলানা ভাসানী জাতীয় দলের প্রধান?' শীর্ষক প্রধান শিরোনামে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করে। মওলানা ভাসানী তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ সংবাদপত্রে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলেন, 'আমার বয়স এখন ৯৪ বছর। সুদীর্ঘ ৭৩ বছর যাবত আমি রাজনীতিতে ছিলাম। কিন্তু বর্তমানের মত নোংরা রাজনীতি আমি অতীতে কখনও দেখি নাই। তাই, এখন আমি রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইয়াছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেশের কিছু সংখ্যক পত্রিকা এবং বিদেশী সংবাদপত্র, বার্তা সংস্থা ও বেতারে আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক খবর প্রচার করা হইতেছে। এইসব খবরে জনসাধারণ ও আমার মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করা হইতেছে।

'সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছে যে, আমি নাকি জাতীয় দলের প্রধান হইতেছি, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। এই ব্যাপারে জাতীয় দলের কাহারো সহিত আমার কোন আলোচনা হয় নাই কিংবা জাতীয় দলে যোগদান সম্পর্কে সেই দলের কেহ আমার সহিত কথা বলেন নাই।

'সম্পাদক ও বেতার পরিচালকদের প্রতি আমার আবেদন, তাহারা যেন আমার সম্পর্কে কোন খবর প্রকাশ বা প্রচারের আগে সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করেন কিংবা আমার স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতেই খবর প্রকাশ ও প্রচার করেন।'

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের বিশেষ পরিস্থিতিতি 'বর্তমানের মত নোংরা রাজনীতি অতীতে কখনো দেখি নাই' বলে বিবৃতি প্রদান মওলানা ভাসানীর পক্ষেই সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল। রাজনীতি থেকে 'সাময়িক অবসর' সত্ত্বেও মওলানা তখনো জাতীয় সমস্যার উপর থেকে একেবারে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারেন নি।

www.pathagar.com

১০ই মে তিনি ফারাক্কা ও বঙ্গোপসাগরে তেল অনুসন্ধান প্রশ্নে দু'টি বিবৃতি প্রদান করেন। ফারাক্কা বাঁধ চালু করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা দীর্ঘকাল যাবত ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত ও আন্ত-র্জাতিক সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছি যে, ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতিকে পঙ্গু করিয়া দিবে। কিন্তু আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের ফসল বিনষ্ট করার জন্য ভারত বাঁধ নির্মাণের কাজ অব্যা-হতভাবে চালাইয়া যাইতেছে। ভারতের শাসকশ্রেণী প্রচার করিয়াছিলেন যে, পশ্চিম বঙ্গ ও কলিকাতা নগরীর উন্নয়নের জন্যই ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প। কিন্তু এখন পশ্চিম বঙ্গের নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছেন যে, কেবল বাংলাদেশই নহে পশ্চিম বাংলাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূল এলাকায় তেল অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অপর এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূল এলাকার তৈল অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কয়েকটি দেশের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারতের প্রতিবাদের দরুন এই প্রয়াস বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয় তবে বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলা হইবে একেবার অসম্ভব এবং এই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান কখনই করা যাইবে না। বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমার অনুরোধ, যে কোন মহলের হুমকি উপেক্ষা করিয়া দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া সকল উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করুন।'

এরপর ১৭ই আগস্টের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতির মাধ্যমে মওলানা ভাসানী তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করেন। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পট পরি-বর্তনের ঘটনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছিল তাঁর এই বিবৃতি।

১৯৭৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী সন্তোষে আয়োজন করেন এক বিরাট ধর্মীয় সমাবেশ। এই সমাবেশে তিনি দীর্ঘকাল পর দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত অসংখ্য অনুসারী ও দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মুক্ত কণ্ঠে ভাষণ দেন। এ সমাবেশে তিনি বাংলাদেশের বৈরী শক্তিসমূহের যোগসাজশে অন্তর্ঘাত তৎপরতায় লিপ্ত মুষ্টিমেয় লোকের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

পনেরোই আগস্টের পট পরিবর্তনের পর মওলানার ভাষণ বিবৃতি মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংহতকরণ

www.pathagar.com

এবং ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ চালু করার ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রশ্নে। ১০ই ডিসেম্বরও তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

ছিয়াত্তরে ভাসানী ঃ ফারাক্কা মিছিল

১৯৭৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী মওলানা ভাসানী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা আসেন এবং পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৮ই জানুয়ারী ঢাকার আবুযর গিফারী কলেজ প্রাঙ্গণে হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি জামালপুর সীমান্ত সফর শেষে মোমেনশাহী ফেরার পথে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প। মওলানা ভাসানী এরপর উত্তর বঙ্গ সফর করেন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ধান ক্রয় কেন্দ্রগুলোর কর্মপদ্ধতি ও হিসাব তদন্তের আহ্-বান জানান। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি দিনাজপুরে এক সমাবেশে বাংলাদেশ-ভারত সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী যশোর সফরকালে তিনি ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তদন্তের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি সমন্বয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ভারত কর্তৃক ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপনের জন্যও দাবি জানান। ২০শে মার্চ এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে, ভারত ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার বন্ধ না করলে এবং আপোষ মীমাংসায় রাযী না হলে ভারতের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে। ১লা এপ্রিল প্রদত্ত অপর এক বিবৃতিতে তিনি স্বাধীনতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

৫ই এপ্রিল পুনরায় মওলানার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। অসুস্থ অবস্থাতেই সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী ৯ই এপ্রিল বলেন, ভারত সরকার একতরফা পানি প্রত্যাহার করে বিশ্বের ইতিহাসে এক অমানবিক নজীর সৃষ্টি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের ৩ কোটি মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছে।

www.pathagar.com

মওলানার আহ্বানে ১৭ই এপ্রিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'মুনাজাত সভা'। এ অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে পাঠানো তাঁর খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে মওলানা ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। মুনাজাত সভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'এই নীতি অনুসৃত না হইলে মরক্কোর ন্যায় আমি আগামী ১৬ই মে রোজ রবিবার রাজশাহী হইতে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু বাঙালীসহ অহিংস শান্তিপূর্ণ নীরব মিছিল লইয়া ফারাক্কার দিকে অগ্রসর হইব।' ফারাক্কা মিছিল সম্পর্কে ২৮শে এপ্রিল মওলানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে এই মিছিলে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান হয়।

মিছিল পরিচালনার জন্য মওলানা ভাসানী ১১ই মে রাজশাহী উপস্থিত হন। ১৪ই মে তিনি ঘোষণা করেন, 'ফারাক্কা মিছিল হবেই, কোন চোখ রাঙানিকে পরোয়া করি না।' মওলানার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ফারাক্কা মিছিলে যোগদানের জন্য রাজশাহী সমবেত হন। ১৬ই মে মিছিল শুরুর আগে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানের বিশাল সমাবেশে মওলানা ঘোষণা করেন, 'সুবিচার অর্জনের লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।' ১৬ই মে সন্ধ্যায় ফারাক্কা মিছিল নবাবগঞ্জে পৌঁছলে তিনি ঘোষণা করেন, 'ভারত ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে রাযী না হইলে আমি ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু করিব।' ফারাক্কার প্রতিক্রিয়া সচক্ষে দেখে যাওয়ার জন্য তিনি ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল বাংলাদেশের জনগণের এই জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের সহায়ক হয়। মিছিলের সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলার জন্য ভারত তার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়।

রাজশাহী শহর থেকে দীর্ঘ পথ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে ছিয়ানব্বই বছর বয়-সের প্রবীণ জননেতা মওলানা ভাসানী তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস আগে ১৭ই মে তারিখে সীমান্তবর্তী কানসার্টে গিয়ে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর সমাপনী ভাষণে বলেন, 'নিরস্ত্র মানুষের ভয়ে ভারতকে যখন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছে তখন তার অবিলম্বে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসা উচিত।' তিনি ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার দাবি ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে অস্বীকৃতি জানাইলে আগামী মাসের মধ্যে আমি স্বেচ্ছাসেবক

www.pathagar.com

বাহিনী গঠন করিব এবং সে বাহিনী লইয়া ১৬ই আগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু করিব।'

জীবনের শেষ দিনগুলো ঃ 'রবুবিয়াতের পথ'

২৭শে মে মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত দেশে কত গুপ্তহত্যা সংঘটিত হইয়াছে, লুট হইয়াছে কত ব্যাংক ও ধন সম্পত্তি তাহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটি করিতে হইবে।' সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দিনই অসুস্থতার কারণে তিনি পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হন। ৫ই জুন হাসপাতালের শয্যা থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বাঙালী মালিকদের কারখানা শর্তসাপেক্ষে ফেরত দেয়ার আহ্বান জানান। ৩১শে জুলাই তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে সর্বশক্তি নিয়োগ করে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। সেদিনই ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পুনরায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৩ই আগস্ট তাঁকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন পাঠানো হয়। লণ্ডনে ২৯ দিন চিকিৎসার পর ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি দেশে ফিরে আসেন।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ২রা অক্টোবর 'খোদায়ী খিদমতগার' নামে একটি নতুন সংগঠন কায়েম করা হয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য বলে মওলানা ঘোষণা করেন। ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে মৃত্যুর মাত্র দশ দিন আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি '৭২ সালের সংবিধান বাতিল এবং নির্বাচন স্থগিত রাখার আহ্বান জানান। এরপর মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে ১৩ই নভেম্বর মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সন্তোষে শুরু হয় খোদায়ী খিদমতগার সম্মেলন। মওলানা ভাসানী তাঁর প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ সংগঠনের সম্মেলনে তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে বলেন, 'অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার শোষণ-জুলুমের সহায়ক। অজ্ঞতাই বিভেদ মানসিকতার জন্ম দেয়। জ্ঞানের অভাবই মানুষে মানুষে বৈরিতা ও হিংসার উৎস। দিকে দিকে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। চিন্তার উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। 'সেবাই পরম ধর্ম'— এই নীতিবাক্য অনুশীলন করিয়া দেখাইতে হইবে। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পালনবাদী মনোবিপ্লব। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে পালনবাদী জীবন-দর্শনের

www.pathagar.com

প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সুশিক্ষিত চরিত্রবান ও জেহাদী চেতনাসম্পন্ন কর্মী তৈয়ার করার লক্ষ্যেই আমি ইতিহাসবিশ্রুত খোশনদপুরে (সন্তোষ) হযরত পীর শাহ জামান কাশ্মীরীর (র.) মিশনের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়াছি।...রবুবিয়াতের পথই অর্থাৎ সার্বজনীন মানবাধিকার ও সামগ্রিক কল্যাণের পথই সাফল্য ও শান্তির পথ।

'...-আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকলেই পরস্পর ভাই ভাই। এই ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি করিতে পারিলেই দুনিয়াতে শান্তি আসিবে। শুধু গল্পগুজবের ভিতর দিয়া, জাতি-সংঘে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া শান্তি আনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী, কুরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা অনুযায়ী সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব স্থায়ীভাবে গঠন করাই হইবে শান্তি আনয়নের একমাত্র উপায়।'

পরের দিন ১৪ই নভেম্বর ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত মওলানা ভাসানী ঢাকা মেডি-কেল কলেজ হাসপাতালে পুনরায় ভর্তি হন। তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেয়া হয়। তার মাত্র তিন দিন পর ১৭ই নভেম্বর মওলানা ভাসানী শতাব্দীর কর্মময় জীবন পিছনে ফেলে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁর ইন্‌তিকালে সাত দিন ব্যাপী জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়। ১৮ই নভেম্বর করুণ সুরের মাঝে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সন্তোষে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

মুকুল চৌধুরী

মওলানা ভাসানীর স্বপ্ন ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

'পরনে সফেদ পাঞ্জাবী, সাধারণ লুঙ্গি, তালের আঁশের টুপী, সাদা দাড়ি, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, আপাদমস্তক বাঙালী—তাঁর নাম মওলানা ভাসানী।' জীবন ছিলো যাঁর সুদীর্ঘ অথচ সংগ্রামে স্পন্দিত। যিনি ছিলেন এদেশের এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। শুধু প্রতিবাদীই নয়, গর্জমান কণ্ঠস্বর ছিলো যাঁর চিরসোচ্চার, যিনি জন্ম দিলেন এক অগ্নিগর্ভা বাংলার, চলার বেগে যুগের বুকে জ্বলে উঠতো আগুন। বজ্র নির্ঘোষ শ্লোগান ছিলো যাঁর মুখের ভাষা, অগুণতি মানুষের মিছিল ছিলো যাঁর সর্বক্ষণের সাথী। মাথার টুপী, পরনের লুঙ্গি আর গায়ের পাঞ্জাবীটাই ছিলো যাঁর একমাত্র সম্পদ, এককভাবে তিনিই ছিলেন এক বিরাট সংগঠন, একটি একক ইন্‌সটিটিউশন। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর ভাষায়—'বাংলার কাল বৈশাখী'। হ্যাঁ, কালবৈশাখীর মতোই তিনি রেখে গেছেন কতিপয় চিহ্ন। তাঁর এমন একটি চিহ্ন—সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয় বরং তা একটি শিক্ষা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক রূপরেখা বা কাঠামো। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূলত মওলানার শেষ জীবনের কীর্তি। তাই জীবনের এই উল্লেখযোগ্য মহৎ কর্মটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তাঁর জীবন কালে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কিন্তু উত্তরসূরীদের জন্য তিনি রেখে গেছেন এর কাঠামো, এর শিক্ষাপদ্ধতি বা কারিকুলাম তথা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা।

মওলানা ভাসানীর জীবন দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো তাঁর শিক্ষা দর্শন। তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূল কথা হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে। মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নের ভেতরই এর সার্বিক উন্নয়ন নিহিত। তাঁর মতে মানুষের শৈশবকাল হলো সুপ্ত সম্ভাবনার

www.pathagar.com

বিকাশ সাধনের প্রথম সোপান। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা শুরু হবে শৈশব থেকেই।

আর এ লক্ষ্যেই তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। তাঁর মতে এ বিশ্ববিদ্যালয় অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শুধু উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হবে না, শিশুকে শিক্ষা প্রদানের মুহূর্ত থেকেই এর কাজ শুরু হবে। মওলানা ভাসানীর মতে, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ও নাস্তিকতাবাদের প্রভাব-মুক্ত আমাদের ঐতিহ্য উপযোগী একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা কি হতে পারে এবং সে শিক্ষাকে কিভাবে বাংলাদেশের সকল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে এর বাস্তব নজীর প্রতিষ্ঠা করা হবে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'ইতিহাসের যে কোন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করিয়া মানব জাতির জন্য শাশ্বত কল্যাণস্বরূপ স্বীয় ধারাকে প্রবহমান করিয়া রাখিতে ভাবগত ও বিষয়গত সর্বোত্তম শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থাকা দরকার। তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা।'

তাঁর প্রণীত এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা' নামেই অভিহিত করেছেন। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'ইসলামী শিক্ষা কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নহে। ইহা অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন। জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকলের জন্যেই ইহার দ্বার উন্মুক্ত। আল্লাহ্‌র খাস রহমত আলো-হাওয়ার মতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রতিটি মানুষের রহিয়াছে জন্মগত অধিকার। ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা ভাষাগত ভেদাভেদের প্রশ্ন তুলিয়া কোন মানুষকেই সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

তাঁর মতে 'শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে স্থান ও কাল সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করিবে। ছাত্রছাত্রীরা চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের শিক্ষা লাভ করিবে। তাহারা বিনয়ী হইলেও স্ব স্ব কর্তব্যে উদ্দাম চাঞ্চল্য সহকারে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ছাত্রছাত্রীরা গাম্ভীর্যের শিক্ষা লাভ করিলেও রসবোধে জীবনটাকে প্রাণময় করিয়া রাখিবে। আদব-কায়দায় তাহারা যেমন অনুসরণীয় হইয়া উঠিবে, ঠিক তেমনি স্মার্টনেসের দিক হইতেও তাহারা হইবে অনুকরণীয়। এইসব দীক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আজকের দুনিয়ার সহিত

www.pathagar.com

শুধু তাল মিলাইয়া নয়, অগ্রগামী হইবার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে কারিগরি শিক্ষালাভ করিবে। ······আর ইহাই হইবে পার্থিব ক্ষেত্রে তাহাদের সৎসাহস ও মনোবল রক্ষার চাবিকাঠি। কারণ দেশব্যাপী বেকার সমস্যা বিরাজ করিলেও তাহারা বেকার থাকিবে না, না খাইয়া মরিবে না।'

১৯৪৮ সালে আসামের ভারতীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আগমনের পর থেকেই মওলানা ভাসানী তাঁর প্রভাবাধীন এলাকাগুলোতে মসজিদ, মুসাফিরখানা, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনেও তিনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেন এবং তখন থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ১৯৭০ সালের আগে তাঁর পক্ষে কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি ১৯৭০ সালের জুন মাসে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন এবং চৌদ্দটি দেশের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সন্তোষে পর পর কয়েকটি শিক্ষা সম্মেলনেরও আয়োজন করেন। শিক্ষা সম্মেলনসমূহে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদরা যোগদান করেন এবং এঁরা মওানাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়নে সহযোগিতা করেন।

১৯৭০ সালে সন্তোষস্থ মওলানার ছন-বাঁশের বাসগৃহে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সম্মেলন বসে এবং এই সম্মেলনেই তিনি প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ বছরই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারীর প্রস্তাব নিয়ে তিনি রাওয়ালপিণ্ডি যান এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সফল হয়ে ওঠে নি। এ সময় আহমদীয়া সম্প্রদায় মওলানাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও একই সময়ে এ ধরনের প্রস্তাব আসে। কিন্তু আদর্শিক কারণে মওলানা সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে মওলানা ভাসানী অনুরূপ আরেকটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনেও দেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদরা অংশ নেন। তাঁদের সহযোগিতায়

www.pathagar.com

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্রিয়া শুরুর লক্ষ্যে একটি প্রজেক্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মওলানা ভাসানী আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হাত দেন ১৯৭৪ সালে। সন্তোষ ও এর আশেপাশের প্রায় এক শত একর জমি নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলেন এবং প্রাথমিক কাজ হিসেবে গৃহাদি সংস্কার ও নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত এবং শিক্ষা সরঞ্জামাদি তৈরীর কাজে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করেন। এ বছরই তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ-রেখা ও কাঠামো বিশ্লেষণ করে এতদসম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সের খসড়াও প্রদান করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে অর্ডিন্যান্সের খসড়ায় 'মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়' রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে অবিচল ও নিরাপোষ এই ব্যক্তিত্ব মওলানা তাঁর প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আসলে আদর্শ প্রতিষ্ঠারই লড়াই। এর আদর্শ ইসলাম এবং রবু-বিয়াতের প্রচার। এতে মওলানা ভাসানীর নাম সংযোজন মানে বিস্‌মিল্লা-তেই গলদ—রবুবিয়াতের বরখেলাফে নফসানিয়াত কায়েম করে দেয়।' মওলানা প্রধান মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, 'আমি একজন একক ব্যক্তি। আর ইসলাম একটি সুমহান আদর্শ, বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা, আমি তোমার পরামর্শ মেনে নিতে পারলাম না।'

১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পরও ১৯৭৫ সালে মওলানা আরেকটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেন এবং ১৯৭৩ সালের সম্মেলনে গঠিত প্রজেক্ট কমিটির অনুমোদন নিয়ে অবিলম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মওলানা নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং মীর ফখরুজ্জামান এর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে থাকবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনা এসে এই মহৎ পরিকল্পনা বাস্ত-বায়নে বাধ সাধে। মওলানা প্রথম থেকেই এ সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ১৯৭৫ সালের ২৬ অক্টোবর এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পবিত্র ইসলামী আদর্শের মহাশত্রুরা এখন হইতে

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে এবং গোপনে সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে তজ্জন্য নানারূপ মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু যত বাধাই আসুক, সন্তোষের ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম আদর্শ শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব।"

বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র নস্যাতের লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেই মওলানা ক্ষান্ত হন নি। ১৯৭৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মরহুম জিয়াউর রহমানের কাছেও ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিয়ে একটি টেলিগ্রামও করেন। টেলিগ্রাম পেয়ে জিয়াউর রহমান মওলানার কাছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওয়াদা করেন। মওলানার ইনতিকালের পর তাঁর মাযারের সামনে দাঁড়িয়ে ১৯৭৭ ও '৭৮ সালে আরো দু'বার জিয়াউর রহমান তাঁর ওয়াদার কথা পুনরুল্লেখ করেন। কিন্তু মওলানা তাঁর হায়াতে উৎপাদনের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়, শিক্ষার সাথে কায়িক শ্রমের সম্পর্ক স্থাপন, হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃস্টান—তথা ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীদের গ্রামীণ পরিবেশে সহজ সরল জীবন যাপনের মাধ্যমে মানবতাবোধ, দেশপ্রেম এবং নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশে একে অন্যের প্রতি সহনশীলতা, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাসহ সকল মানবীয় গুণাবলী সৃষ্টির মাধ্যামে শোষণমুক্ত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সর্ববৃহৎ কারখানা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব দেখে যেতে পারলেন না। এর চেয়ে আফসোসের আর কি হতে পারে!

অবশ্য সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয় সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ গত ১৩ নভেম্বর '৮৩ সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) অধ্যাদেশ জারি করেছেন। অধ্যাদেশ মোতাবেক সন্তোষে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু প্রশাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত হলে এর একটি কর্পোরেট বডি থাকবে যা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ ও মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষমতা লাভ করবে। বোর্ডে সরকার নিয়োজিত ৯জন ট্রাস্টি থাকবেন। বোর্ডের কাজ সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনে ট্রাস্টির মধ্যে থেকে আরও একাধিক কমিটি গঠন করা যাবে। আশা করা

www.pathagar.com

যায় বর্তমান সরকার মওলানার অসমাপ্ত কাজ অন্তত কিছুটা হলেও সমাধা করবেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, এর কারিকুলাম ও বৈশিষ্ট্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলকত্ব ও স্বকীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় অনেক কথা বলে এবং লিখে গেছেন। এ সম্পর্কিত লেখা জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এবং সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সিরিজ নামে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে মওলানার এ সম্পর্কিত লেখাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ১৯৭০ সালের জুন মাসে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক লেখাটি। উল্লেখ্য, পরে এটি সৈয়দ ইরফানুল বারী সম্পাদিত 'মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সংকলনে সংকলিত হয়। মওলানার এই লেখাটিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে।

'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক লেখার ভূমিকাতে মওলানা বলেন, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী পরিকল্পনায়ই হওয়ার কথা। আমার পরিকল্পনা বলিতে আলাদা কিছু হইতে পারে না। তবে ইসলামী পরিকল্পনা বলিলে আজকাল স্পষ্ট কোন ধারণা নেওয়া সম্ভব নয়।... ... ...

'আমি খোলাখুলি ভাষায় বলিয়া ফেলিতে চাই, স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে ইসলামের যে আবেদন রহিয়াছে তাহা কখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ওফাতের পর সরকারী বেসরকারী উভয় দিক হইতেই চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের আদিম দুষ্ট মন ইহাকে বানচাল করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছিল। ইহার পর সরকারীভাবে ইসলামের সেই সব আবেদনকে লালন-পালন করা হয় নাই। তবে যুগে যুগে এমন মুসলিম পণ্ডিতবর্গও জন্ম নিয়াছেন যাঁহারা একক প্রচেষ্টায়ই সেই আবেদন তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোন প্রচেষ্টা একটানা শতাব্দী-কালও টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

'যাহা হউক তাহাদের সংগ্রাম মাঝে মাঝে স্তিমিত হইয়া গেলেও তাহা একেবারে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই কিংবা বিলোপ সাধন সম্ভব হয় নাই। আমরা আজ সেই সংগ্রামের ধারাকে স্মরণ করিয়া ইসলামের মৌলিক

www.pathagar.com

আবেদনকে অবলম্বনপূর্বক স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারি। সেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবেই, সে ভরসা আমাদের আছে। কিন্তু ভরসা লইয়া বহু কর্মী অনেক কাল শুধু বসিয়াই রহিলেন। কাজের কাজ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। আজও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সুধী সমাজে উপস্থাপিত করিতে হয়, ইহাই আফসোস।'

দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ বিবেচনা করেই মওলানা ভাসানী গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তাঁর ভাষায়, 'দেশে শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদগণ যখন শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া চিন্তাভাবনা করিতেছেন তখন আমি কেনইবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম ইহা একটি প্রশ্ন বটে। স্পষ্ট ভাষায় আমি বলিতে চাই, ইহার কারণ আমার হতাশা ও উপলব্ধি দুই-ই। আমি বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে হতাশ হইয়াছি। তাহারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অন্ধ হইয়া যাইবে—কাহাকেও মাথায় তুলিয়া নাচিবে, আবার কাহাকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। সোজা কথায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞ থাকিয়া যায়, মূর্খতার স্বভাব লাভ করিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি গণচেতনা ও গণ-আন্দোলনের সাথে সাথে আগামী দিনের জন্য ত্যাগী পুরুষ গড়িয়া তোলা দরকার। তাহারা শুধু ত্যাগীই নয়, সাধকও। তাহারাই চিন্তাবিদ, তাহারাই কর্মী, তাহারাই নেতা। এমন পুরুষ সমাজের জন্য কাম্য বটে। কিন্তু তাহার আবির্ভাবের জন্য প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, এহেন পরিবেশও বজায় রাখিতে হইবে। বাংলাদেশের জন্য তেমন ত্যাগী চিন্তাবিদ আজ যে কত জরুরী তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার জানা নাই।'

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে এর প্রতি তাঁর অনীহা ব্যক্ত করে এবং শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করে মওলানা আরেকটি প্রচারপত্রে বলেন, 'প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন নৈতিক প্রশিক্ষণের কোন স্থান নেই, ঠিক যেমনি নিম্নস্তর হতে শ্রমের মর্যাদা ও বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাও নেই। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে

www.pathagar.com

কৃষি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান করা আজকের শিক্ষা সংস্কারের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটি শান্তিপূর্ণ সুসংহত ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সংস্কারমুক্ত, উদার, সার্বজনীন, কল্যাণমুখী চিন্তা-ধারার উন্মেষ সাধন করা প্রয়োজন।'

মওলানা ভাসানী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা বাধ্যতামূলকভাবে কোরআন ও হাদীসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা যা সর্বযুগে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ সাধন করিবে তাহাও রপ্ত করিবে। আজকাল মাদ্রাসা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় ইসলামী শিক্ষা তাহা নহে। তাই কোরআন-হাদীসের মৌলিক বিষয় এবং ইসলামী জনতার ইতিহাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে সঙ্কীর্ণমনা করিবে না, কূপমণ্ডুক হইতে দিবে না। তাহারা হইবে হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-র মত প্রতিবাদকারী, হযরত আলী (রা.)-র ন্যায় জ্ঞান-পিপাসু, গাজী সালাহউদ্দীনের মতই মোজাহেদ এবং ইমাম আবু হানিফা (র.)-র ন্যায় শহীদ।'

মওলানার পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে দু'টি। একটি পড়াশুনা, অপরটি শিক্ষা-দীক্ষা। এই কাজ দু'টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মওলানা বলেন, 'পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা দুনিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পিছে পড়িয়া থাকিবে না। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্বের পাঠ্য বিষয় বাছাইয়ের ব্যাপারে এমন একটি মাপকাঠি ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকিবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা মানবতার কল্যাণকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করিতে পারে।'

মওলানার মতে তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার এমন উপাদান রয়েছে যা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে বিপ্লবী তৎসঙ্গে সহনশীল, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী করে তুলতে পারে।

তিনি তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে বলেন, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী দিনরাত এখানেই থাকবে। খেলাধূলা ও আমোদের ব্যবস্থা বিশ্ব-বিদ্যালয়েই থাকবে। বাইরের অশুভ সংশ্রব থেকে তাদের মুক্ত রাখা হবে। তারা নিজেদের হাতে পাক করা মোটা ভাত খাবে। নিজেদের হাতে বোনা

www.pathagar.com

মোটা কাপড় পরবে। জীবনের যে কোন বিপর্যয়কে হাসি মুখে বরণ করে নেওয়ার জন্য তাদের শুধু কঠোর পরিশ্রমই নয়, রীতিমতো কষ্ট সহ্য করার শিক্ষাও দেওয়া হবে।

বস্তুত আজকের পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে বিশেষ যত্ন সহকারে কারিগরি শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা থাকবে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরাই উৎপাদন করবে এবং বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ভোগ করবে। একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ব্যাঙ্কের শাখা, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পশু হাসপাতাল ও একটি মুসাফিরখানা স্থাপন করে গেছেন।

মওলানা তাঁর পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানও নির্ধারণ করে গেছেন। তাঁর মতে বর্ণিত গুণে ছাত্রছাত্রীদের গঠন করতে হলে প্রথমত অধ্যাপকবৃন্দকেই তেমনটি হতে হবে। অধ্যাপকবৃন্দও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে থাকবেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো হলেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের সাধনা হবে উচ্চমানের।

মওলানা তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়নকালে যে সমস্যাটিকে সবচেয়ে বড় করে দেখেছেন তা হচ্ছে, উল্লিখিত মানের শিক্ষকমণ্ডলী এবং তাঁর পরিকল্পিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা।

মওলানা ভাসানী তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলেন। তাঁর মতে পরিকল্পনানুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে 'অচিরেই জাতিকে একটি বিশেষ লক্ষ্যের সন্ধান দেয়া যাবে। আর এই সন্ধান পেলে অনুসন্ধিৎসু সমাজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি গতিপথ উন্মুক্ত করে দেবে।'

তাঁর এই আশাবাদের যথেষ্ট কারণ ছিলো। কারণ জীবিতকালেই তিনি যেমন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, এর পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষকদের মান সম্পর্কে বক্তব্য রেখে গেছেন, ঠিক তেমনি এর কারিকুলামও নির্দিষ্ট করে গেছেন। 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে মওলানা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এতেই এই কারিকুলাম খুঁজে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

মওলানা কর্তৃক প্রণীত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহে তিনি যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ও কর্মশালারূপে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এঁকেছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। তাঁর মতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গ্রামমুখীন কর্ম ও উৎপাদনশীল এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা এক প্রণালীবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জীবনধারায় উজ্জীবিত হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং বৃত্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মনে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, মানুষে মানুষে সাম্যের শিক্ষা এবং সমবেদনা ও সেবার মনোভাব গড়ে উঠবে। আর এ লক্ষ্যেই তিনি তাঁর জীবিতকালে এই বৈশিষ্ট্য-সমূহ প্রণয়ন করে যান।

মওলানা প্রণীত এই বৈশিষ্ট্য পাঁচটি হচ্ছে ঃ

প্রথমত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পড়ানো হলেও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য যে কোন একটি কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। যেমন, কোন ছাত্র ইতিহাসে এম. এ. পড়লেও পাশাপাশি তাকে কারিগরি শিক্ষাস্বরূপ একটি কাজ বাছাই করে নিতে হবে এবং প্রতিদিন রুটিনমাফিক সেই কাজও তাকে শিখতে হবে। ফলে কর্মজীবনে তাকে বেকারত্বের শিকার হতে হবে না। সাধারণ শিক্ষার সিলেবাস বাছাইয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী বিশ্ববদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণমুখী গবেষণা, দেশীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক আবিষ্কার এবং আদর্শ-ঐতিহ্যের আলোকে পাঠ্য-সূচী প্রণয়ন করা হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার দৈহিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক থাকবে। দৈহিক প্রশিক্ষণ ইউনিট খেলাধূলা ও কায়িক পরি-শ্রমের রুটিন এবং শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়াদি নিয়ন্ত্রণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-শিক্ষকগণ আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। এর মাধ্যমগুলো উক্ত ইউনিটের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এভাবে ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় আচরণবিধি ঐ ইউনিটের দেখাশোনার বিষয় হবে। তবে এটাও ঠিক যে, নিয়ন্ত্রণ সীমা কখনো কোন ক্ষেত্রেই স্বভাব-বিরুদ্ধ হবে না। গবেষণা ও তথ্য ইউনিটের পরামর্শ অনুযায়ী আলাদাভাবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বভাব ও গঠন নির্দিষ্ট করে রুটিন করা হবে। 'সবাইকে কঠোর প্ররিশ্রম করতে হবে'—এ ক্ষেত্রে ইউনিটগুলো আপোষহীন হবে।

www.pathagar.com

পোশাকে ও চালচলনে অতিশয় অনাড়ম্বর হতে হবে। খাওয়া-দাওয়া পুষ্টিকর হলেও অত্যন্ত মামুলি ধরনের এবং দেশীয় হবে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তার ধর্মের মূলশিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দান করা হবে এবং তা আমল করা বাধ্যতামূলক থাকবে। মুসলমান ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্য থেকে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মনোনয়ন করা হবে। ইমামকে জুমআর খুতবায় চলতি সপ্তাহের বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা করতে হবে। এভাবে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ ধর্মের আলোকে শৃঙখলা, পবিত্রতা, চরিত্রগঠন এবং বিশ্বানুভূতির শিক্ষাদান করা হবে। পবিত্র জীবন যাপন ও চরিত্রবান হওয়ার প্রতি সবিশেষ নজর দেয়া হবে। চরিত্রগঠনের কার্যবিধির প্রতি অবহেলা করলে কোন ছাত্রকেই ক্ষমা করা হবে না। গবেষণা ও তথ্য ইউনিটের দায়িত্বে এইসব তদারক করা হবে।

চতুর্থত, কেরোসিন ও লবণ ছাড়া বাকী সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের উৎপাদন করে নিতে হবে। এই উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করা থাকবে। আবার বিনিময় প্রথা অনুসারে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করবে। এভাবে প্রত্যেক ছাত্রের যাবতীয় চাহিদা যথা ঃ কাপড়, সবজি, মাছ, মশলা ইত্যাদি ছাত্ররাই ছাত্রদের সরবরাহ করবে। কারিগরি ইউনিটের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা হবে। চাহিদা সংখ্যাতথ্য, আদান-প্রদানের বাটোয়ারা ইত্যাদি সব কিছুই কারিগরি ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করবে।

পঞ্চমত, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা বছরগুলোর চার-পাঁচ সপ্তাহকাল প্রত্যন্ত গ্রামে কিংবা শিল্প এলাকায় হাতে কলমে কাজ করতে হবে। এজন্য অবসরে দিন কাটানোর জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের কোন ছুটিই দেয়া হবে না। সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কয়েকটি বড় বড় উৎসবে ছুটি দেয়া হবে বটে কিন্তু এর মধ্য দিয়েও শিক্ষামূলক কাজ আদায় করে নেয়া হবে। মূলত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাতে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয় তার পরিবেশ সর্বতোভাবে বজায় রাখা হবে। মানুষের কল্যাণকেই সবচেয়ে বড় বলে জানার স্পৃহা জাগানো হবে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং সে ফলাফলের ভিত্তিতেই শিক্ষালয়ের ডিগ্রী প্রদান করা হবে।

www.pathagar.com

মওলানার পরিকল্পনানুযায়ী বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি প্রকল্প ও ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এ সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ৫টি আবাসিক হোস্টেল। প্রকল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১টি নার্সারীসহ প্রাইমারী স্কুল, ১টি আবাসিক বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি আবাসিক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি হেফজখানা, ১টি আবাসিক বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, ১টি ভোকেশনাল প্রজেক্ট এবং ১টি বিশালাকৃতির হাঁস-মুরগীর খামার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবাসিক ছাত্রছাত্রীও রয়েছে। ভোকেশনাল প্রজেক্টের অধীনে রয়েছে এম্ব্রয়ডারি সেকশন, হাউজ উইভিং, কার্পেন্টিং, ফারমিং, সেরিকালচার, পিসিকালচার এবং প্রিন্টিং প্রেস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা মূল্যের শতাধিক একর জমি। এর মধ্যে নিজস্ব জমি ২৫.৯৪ একর, খাস জমি ২২.৯৬ একর, বন্দোবস্ত নেয়া ৩৮.৯৬ একর, সড়ক ও জনপথ বিভাগের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেয়া ১৪.৫৫ একর এবং ওয়াক্ফকৃত জমি ৯.৯ একর। বিশ্ববিদ্যালয় প্রজেক্টের অধীনে যে সকল ইমারত ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোর বর্তমান মূল্য ৯১ লাখ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১৫ লাখ টাকার। প্রতি বছর সরকার অনুদান দিচ্ছেন ৩০ লাখ টাকা।

মওলানা ভাসানী তাঁর সারা জীবনের সাধনার পর জীবনসায়াহ্নে এসে দেখতে পেয়েছিলেন গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের আসল চেহারা। তাই এদেশ মনীষার কীর্তিগাঁথায় আগের মতোই যাতে আবার ঝলমল করতে পারে এই দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ও আকুল আগ্রহ নিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন প্রকৃত মানুষ গড়ার কারখানা, এক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠ সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মওলানার ভাষায়, 'জীবনে দুইটি বিষয়ের প্রতি আমি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিয়াছি। তাহা হইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল। আমার জীবনে শেষ আশা সন্তোষে ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া।'

মওলানা তাঁর মহাপরিকল্পনার মাত্র প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করে গেলেও এর পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের লক্ষ্যে রূপরেখা ও কাঠামো এবং যথেষ্ট উপায় উপকরণ রেখে গেছেন। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও

www.pathagar.com

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে; কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার স্তর—মওলানার পরিকল্পনার আসল স্তরের কাজ—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নীতকরণের পরিকল্পিত নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। মওলানার অনুপস্থিতিতে এটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মওলানার আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর এই অসমাপ্ত কাজ সমাধা কল্পে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সন্তোষে স্থাপিত ও প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে মওলানার মূল পরিকল্পনার আলোকে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নাম অক্ষুণ্ণ রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ও কাঠামোয় স্বীকৃতি দান করা এবং তা বাস্তবায়নে সর্বপ্রকার সরকারী সহযোগিতা অব্যাহত রাখা। যে লোকটি এদেশের মানুষের কল্যাণ কামনায় ক্লিষ্ট ও অক্লান্ত, কর্ম ও সংগ্রামমুখর জীবনের নব্বইটি বছর কাটিয়েছেন তাঁর অন্তিম বাসনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে সেদিনই তাঁর লোকান্তরিত আত্মা খুশী হবে এবং সেদিনই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যপঞ্জী

১. মওলানা ভাসানী-আরেফিন বাদল সম্পাদিত। প্রকাশক: ধানসিঁড়ি, ঢাকা।

২. মওলানা ভাসানীর ভূমিকা--সৈয়দ ইরফানুল বারী সম্পাদিত। প্রকাশক: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাংগাইল। মার্চ—১৯৭৪।

৩. সাপ্তাহিক রোববার। ২৯শে জানুয়ারী—১৯৮৪। ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৩তম সংখ্যা।

৪. মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-সৈয়দ ইরফানুল বারী সম্পাদিত। প্রকাশক: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল। জানুয়ারী ১৯৭৬।

৫. সচিত্র স্বদেশ। ১৮ নভেম্বর ১৯৮২। ২য় বর্ষ ৩৬ সংখ্যা।

৬. মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম: সম্পাদনা: শাহরিয়ার কবির প্রকাশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। মে ১৯৭৮।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান

স্বাধীন বাংলার প্রথম রূপকার-মওলানা ভাসানী

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর। তিরোহিত হলো একটি শতাব্দী। অস্তমিত হলো একটি প্রদীপ্ত সূর্য। আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের দোসর, বিশ্বের লাখো-কোটি বঞ্চিত-ব্যথিতের লড়াকু বন্ধু মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী দেহাবসানের সাথে সাথে সবার পর্ণ-কুটিরে নেমে এলো শোকের ছায়া। আজো যখন ফিরে আসে ১৭ই নভেম্বর শত তোরাব ফকির বক্ষবিদারী আর্তনাদে কারবালার মাতম শুরু করে বাংলার ঘরে ঘরে।

একটি তেজোদীপ্ত অঙ্গীকার—'মওলানা, মনে কর এটাই কা'বা শরীফ, এই কা'বা শরীফকে ছুঁয়ে তুমি অঙ্গীকার করবে, তুমি রবুবিয়াত কায়েম করবে।'—১৮৪৬ সালে মওলানা আজাদ সোবহানীর এই অঙ্গীকারনামায় মওলানা যেদিন স্বাক্ষর করলেন মূলত সেদিনই শুরু হলো তাঁর ন্যায়, সুন্দর ও শাশ্বত সত্যের সংগ্রাম। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটি শোষণহীন ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠা। আজীবন তাড়িত হয়েছেন এই মহাসত্যের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আসাম থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত শত শত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সবশেষে সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যার পরিসমাপ্তি। কার্যত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর সারা জীবনের সমস্ত স্বপ্নের বীজ।

বাল্যের চেগা মিঞা মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহারা হন এবং পাঁচ বৎসর পর হারালেন মা-ভাইবোন সবাইকে। হলেন এতিম। যাযাবর। পথের ভিখেরীসম। এক সময় চলে আসেন ময়মনসিংহের কলপা গ্রামে। পরিচিত হলেন বোগদাদের পীর সৈয়দ নাসিরউদ্দীন বোগদাদীর সাথে। তারপর ২৪ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়েন আসামের পথে। মওলানা যখন আসামে এলেন আসামে তখন চলছিল বৃটিশ সরকারের 'লাইন প্রথা'র জুলুম ও অত্যাচার। অসমীয়া কর্তৃক বাঙ্গালীদের অধিকার খর্বের হীন চক্রান্ত। মওলানা আসামে পা দিয়েই প্রথম ঘোষণা করলেন এই জুলুম

www.pathagar.com

ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জেহাদ। লাইন প্রথা উচ্ছেদকরণে বাঙ্গালীদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে অবহেলিত বাঙ্গালীদের আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাঁড়ালেন। লাইন প্রথা আন্দোলনের সাথে যুক্ত করলেন আরেকটি আন্দোলন যাকে ধর্মীয় আন্দোলনও বলা যেতে পারে। সে সময় হিন্দু জমিদারদের দাপটে মুসলমানেরা এমন কি গরু জবেহ পর্যন্ত করতে পারতো না। মওলানা আসাম প্রবাসীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করলেন জমিদারবিরোধী আন্দোলন। হলেন লাখো মুরীদের ভক্ত পীর। সেই থেকে তিনি সবার 'হুযুর'। আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে ডাকলেন ভাসানচরের ঐতিহাসিক সম্মেলন। হলেন সবার প্রিয় 'ভাসানী'।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগ্রামী জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কয়েকটি বছর। রংপুর থেকে সিরাজগঞ্জ। আর সিরাজগঞ্জ থেকে কখনো বা আসাম। সম্মেলন আর সংগঠন আর সংগ্রাম। টাঙ্গাইলের ব্যাপক বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে ত্রাণ নিয়ে এসে মওলানা দাবী করলেন টাঙ্গাইলের জমিদারীর মালিকানা জনসাধারণের। (আজকের সন্তোষের পুরোটাই ছিল সেদিনের জমিদারের দখলে)। অতঃপর পীর শাহ জামানের মাযারে উদ্যোগ নিলেন মসজিদ প্রতিষ্ঠার। বাঁশ গেড়ে দখল করলেন সে এলাকা। কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে জারী হল হুলিয়া। হুলিয়া মাথায় নিয়ে এলেন ময়মনসিংহ। কিছুদিন পর আবার ময়মনসিংহ ত্যাগের নির্দেশ এলো। আস্তানা গাড়লেন সিরাজগঞ্জে। আয়োজন হলো আসাম প্রজা সম্মেলনের। তাতে প্রস্তাব নেয়া হলঃ ১. জমিদারীর অবসান, ২. মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ করা ও ৩. চক্রবৃদ্ধি সুদের অবসান ইত্যাদি। কিন্তু সরকার এতে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. এম. এস. দাস সম্মেলনের ৫ দিন পূর্বে তাঁকে পাবনা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। চলে গেলেন কলকাতা। ১৩৩৮ সালে গাইবান্ধায় আয়োজন হলো আরেকটি সম্মেলনের। এবারে এজন্য তাঁকে ছাড়তে হলো খোদ বাংলাদেশ।

আবার আসাম। শুরু হলো তাঁর ভিন্ন জীবনের পালা। এই আসাম তাঁকে দিয়েছে যেমন বৈভব, প্রাচুর্য (ব্যক্তিত্বের) ও নেতৃত্ব, তেমনি দিয়েছে প্রচুর দুঃখ। দীর্ঘ ১৩ বছর কখনো পাহাড়ের গুহায় সন্ন্যাসী হয়ে, কখনো জেলে, কখনো বা ফকির হিসাবে এখানে তিনি কাটিয়েছেন। আন্দোলন করে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নিশ্চিত করেছেন ৯টি আসনের। আসাম আইন সভার সদস্য ছিলেন ১১ বছর। প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রায় অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ইন্সটিটিউশন।

www.pathagar.com

প্রায় শতাব্দীকাল জীবিত ছিলেন মওলানা ভাসানী। মাত্র ৬ বছর বয়সে যখন তিনি গৃহছাড়া হলেন বলতে গেলে তখন থেকেই পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। প্রথম জীবনে তিনি কংগ্রেসের সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস যখন তার জন্মলগ্নের প্রতিশ্রুতি 'জনগণের স্বার্থে'র পরিবর্তে হিন্দু জমিদারদের স্বার্থরক্ষার তাবেদারী করছে এবং ক্রমশ মুসলমানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছে তখন তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মূলত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে মওলানার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। । তিনি কোন সময়ই তাদের অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনকে মেনে নিতে চান নি। এজন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে তাঁকে দেখেছি ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগবিরোধী ভূমিকা পালন করতে; দেখেছি '৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী ভূমিকায়, দেখেছি '৬২-র শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলনে, '৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে দেশের জন্য জনগণকে সাহস যোগাতে। সর্বোপরি ১৯৬৮-৬৯-এর ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে সামনের কাফেলায় ছিলেন তিনি।

মওলানা কখনো ভোটের রাজনীতিকে বিশ্বাস করেন নি। মনে করতেন ভোটে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসে না। তাই '৭০-এর নির্বাচনে সবাই যখন ভোট নিয়ে মাতোয়ারা তখন মওলানা বন্যা প্লাবিত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মুমূর্ষু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন মওলানার শ্লোগান ছিল, 'ভোটের বাক্সে লাথি মার পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর, গোলটেবিল না রাজপথ—রাজপথ রাজপথ' ইত্যাদি। কিন্তু স্বার্থসর্বস্ব নেতারা মওলানার আহ্বানে সাড়া দিলেন না। অবশেষে কৃষক শ্রমিককে অস্ত্র ধরতেই হলো। অপরিকল্পিতভাবে নিরস্ত্র জনগণকে অস্ত্রের মুখে ঠেলে দিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করলো। দূরদর্শী মওলানা হাতিয়া সন্দ্বীপের ভেসে যাওয়া লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ৭০ সালেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'ওরা কেউ আসে নি। আজ থেকে আমার এক দফা আর তা হলো, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা'।

অবশেষে এদেশের দামাল ছেলেরা বুকের তাজা খুন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করলো। মওলানা ভারতের অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে

www.pathagar.com

ফিরেই সোচ্চার হলেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও ভারতীয় যোগসাজশের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করলেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ করলেন ভারত-বাংলাদেশ পঁচিশ বছর দীর্ঘ মেয়াদী দাসত্ব চুক্তির বিরুদ্ধে। এজন্য মওলানাকে কম খেসারত দিতে হয় নি।

ইতিহাস বলে, অত্যাচারীর পতন অনিবার্য। চেঙ্গিস, নাদির শাহ, হিটলার তার প্রমাণ। সুতরাং মুজিব কোন ছার! গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে একদলীয় জগদ্দল পাথর 'এক নেতা এক দেশ, শেখ মুজিব বাংলাদেশ' জনগণের ঘাড়ে চেপেছিল। ১৫ই আগস্ট '৭৫ আওয়ামী বাকশালীদের এই 'এক নেতা এক দেশ'-এর পতন হলো। মওলানা ব্যক্তি মুজিবের জন্য দুঃখ পেলেন আর স্বাগত জানালেন স্বৈরাচারী মুজিব-এর পতনের সংবাদকে। '৭৫-এর ১৬ই আগস্ট থেকে ১৯৭৬-এর ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত মওলানা তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও চারণের বেশে ভারত কর্তৃক আগ্রাসী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। বুলবুলির মত গেয়ে গেছেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার গান। ভারত কর্তৃক একতরফাভাবে ফারাক্কার পানি প্রত্যাহারকে তিনি কারবালার এজিদের মানবতাবিরোধী কাজের সাথে তুলনা করেছেন এবং ভারত সরকারের এই বিবেক বর্জিত কাজের বিরুদ্ধে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংগঠিত করে ১৯৭৬-এর ১৬ই মে পরিচালনা করেছেন পৃথিবীখ্যাত ঐতিহাসিক 'ফারাক্কা মিছিল'। মূলত তখন থেকেই ফারাক্কা সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে আসে। কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। তবুও বিশ্বের প্রতিটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও আগাম মন্তব্য করতেন তিনি পাকা জহুরীর মত।

এক শ্রেণীর মওলানারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন, তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। কারণ তিনি সমাজতন্ত্র চান। ব্যক্তিগত জীবনাচরণের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী প্রমাণ করেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীন ও মহানবী (স.) -এর জীবনদর্শনই তাঁর জীবনের একমাত্র পরিচয়। তিনি সে সব তথাকথিত মওলানার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ইসলামেই সমাজতন্ত্র আছে। একথা কে না জানত যে, তিনি লক্ষ মুরীদের শ্রদ্ধেয় পীর ছিলেন এবং মুরীদদের সাহায্যকৃত অর্থ দিয়েই তাঁর নিজ হাতে গড়া শত শত প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

চলতো। এ দেশের বামপন্থীরাও তাঁকে ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁরাও উপলব্ধি করলেন যে, মওলানা তাঁদের ত্রাণকর্তা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। বামপন্থীদের বিপদে সঙ্কটে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর পক্ষেই কেবল বলা সম্ভব ছিল—'নকশাল কি কারো গায়ে লেখা আছে! মুজিব, আবদুল মতিনকে ছেড়ে দাও, ওর কোন অপরাধ নেই, নইলে জেলের তালা ভেঙে মতিনকে বের করে নিয়ে আসা হবে' ইত্যাদি। এই বিশাল মহীরুহের ছায়ায় এ দেশের বামপন্থীরা বারে বারে ক্লান্তিতে অবসাদে ও বিপদে আশ্রয় নিয়েছেন।

মওলানা তাঁর স্মৃতিতে সব সময় কয়েকজন ব্যক্তির নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেন। যেমন, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সি. আর. দাস ও গোখলে প্রমুখ। তাঁর জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও সমাজতন্ত্র। ক্ষমতায় না গিয়েও তিনি প্রমাণ করেছেন সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে জনগণের জন্যে অনেক কিছু করা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর নিন্দুকেরা যাঁরা বিভিন্ন সময়ে তাঁকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, মওলানা ছিলেন সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে। যারা দূর থেকে তাঁকে দেখেছে ও অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছে, তারাই কেবল মিথ্যে দুর্নাম রটিয়েছে।

মওলানা ভাসানী শান্তির দূত হিসেবে বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। বহু বিশ্ববরেণ্য নেতার সাথে মিলিত হয়েছেন তাঁর ঐ শ্বেতশুভ্র কাশফুলের মত দাড়ি, খদ্দরের পাঞ্জাবী, মার্কিনী লুঙ্গি ও তালের টুপী পরে। এ উপমহাদেশে তিনিই প্রথম বিরোধী রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র প্রোথিত করেন—যা পরে মহীরুহে রূপ লাভ করে। ১৮৮০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনা, বক্তৃতা বিবৃতি এর সাক্ষ্য বহন করে।

আজকে জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে মওলানার মত কালজয়ী ক্ষণজন্মা পুরুষের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। নইলে জাতিগতভাবে আমরা তাঁর প্রতি অবিচার করবো।

www.pathagar.com

উলফত রানা

ক্ষণজন্মা প্রবাদপুরুষ মওলানা ভাসানী

অনেক জ্ঞানী এবং গুণীজন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপৃত কর্মকাণ্ড ও দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অধিকারী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ঘটনাবহুল জীবনধারার উপর অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তবু মনে হয় লুঙ্গি-পাঞ্জাবী আর তালের আঁশের টুপি পরা সাধারণ চেহারার এই অসাধারণ মানুষটির অমূল্য জীবনের মূল্যবান অনেক কিছুই যেন অপ্রকাশিত রয়ে গেছে; এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ বিশাল ব্যক্তিত্বদের পূর্ণাঙ্গ বা নির্ভুল জীবন-বৃত্তান্ত একক প্রচেষ্টায় ফুটিয়ে তোলাটা সাগর সেচে মাণিক তোলার মতই অসাধ্য ব্যাপার।

এ ধরনের ক্ষণজন্মা প্রবাদ পুরুষদের ফেলে যাওয়া প্রতিটি ঘটনাই সুখপাঠ্য ইতিহাসের একেকটি মূল্যবান পৃষ্ঠা! এর কিয়দংশ বাদ পড়া মানেই দুষ্প্রাপ্য পাথরের সুনিপুণ গাঁথুনী থেকে একটি মূলবান পাথর খসে যাওয়া। অন্তত পলেস্তেরা ত বটেই। খসে যাওয়া পাথর বা পলেস্তেরা মেরা-মতের জন্যে বিভিন্ন সময়ে যেমন বিভিন্ন রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন হয়, তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকদের লেখার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে একজন মহান ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক জীবনী পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষ আর সর্বহারা মজদুরদের দরদী পুরুষ, জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তেমনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব।

আজীবন মানুষের মুক্তি আন্দোলনের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ মওলানা ভাসানী এবং এক সময়ের তেজোদীপ্ত প্রত্যয়ী যুবক আবদুল হামিদ খান ওরফে চেগা মিয়ার নিরলস তথা আপোষহীন সংগ্রামের শুরু জমিদার ও মহাজনদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে। চেগা মিয়ার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ। (জন্ম ১৮৮০ খৃস্টাব্দে সিরাজগঞ্জের ধানগড়া

www.pathagar.com

গ্রামে।) এই বয়সেই তিনি মুক্তির পথ খুঁজতে অজানার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ছেড়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজন এবং পিতৃভিটার মায়া। আশ্রয় এবং শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন জলন্ধরীর পীর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন বোগদাদীর মোমেনশাহীর কল্লা গ্রামের খানকায়। এরপর বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের সময়ই তিনি প্রত্যক্ষ করেন জমিদারদের নিত্যদিনের নির্যাতনের সীমাহীন দৃশ্য। তাঁর তেজী রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। চেগা মিয়া হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী। সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং টাঙ্গাইলের নিপীড়িত মানুষ এবং শোষিত কৃষকের পক্ষ হয়ে রুখে দাঁড়ান বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের চাটুকার পিশাচ জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। জোরদার আন্দোলনের মানসে তিনি ক্রমান্বয়ে যোগ দেন অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে। এসব আন্দোলনে জড়িত থাকার সময় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলেমদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনেও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ফলে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাড়িত হয়ে তিনি আসামের ঘাগমারী জঙ্গলে আশ্রয় নেন। সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত ভক্তদের নিয়ে ঝাড়জঙ্গল কেটে ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলেন নতুন বসতি। প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং মাদ্রাসা। মওলানা ভাসানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘাগমারী যখন পূর্ণাঙ্গ জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তখনি ঔপনিবেশিক কূটকৌশলে গায়ের রক্ত পানি করা আবাদী জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদকল্পে কুখ্যাত 'লাইন প্রথা'র অভিশপ্ত উৎখাত অভিযান শুরু হয়। স্বভাবমত গর্জে ওঠেন প্রতিবাদী ভাসানী। আন্দোলন শুরু করেন 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামে থাকা অবস্থায়ই ১৯৩০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেন। তখন ভারতের পশ্চিম অংশ নিয়ে পাকিস্তান, বাংলা ও আসাম নিয়ে বঙ্গে ইসলাম এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদকে নিয়ে ওসমানী স্থান নামে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র করার জল্পনা চলছিল। ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের ভেতর জোরালো কলহ দানা বাঁধায় সারা বাংলায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্ব অভাবিতভাবে

www.pathagar.com

প্রসার লাভ করে। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে এ. কে. ফজলুল হক 'কৃষক-প্রজা পার্টি' গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদে কৃষক-প্রজা পার্টি জয়লাভ করে। ১৯৪০ সালের দিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মওলানা ভাসানীসহ অধিকাংশ মুসলিম নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আন্দোলনকে অনেকটা সুসংগঠিত করে আনেন। তখন আলেমদের একটি ক্ষুদ্র অংশের সমর্থনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী প্রস্তাবিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের প্রস্তাবিত বঙ্গে ইসলামের সমর্থনে আসামসহ অখণ্ড বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রখ্যাত কবি ইকবালও এ সময় বারো শ' মাইল ব্যবধানে একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি অযৌক্তিক বলে মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগীকে সমর্থন করেছিলেন।

১৯৪৩ সালে ক্রিপস্ মিশন এবং ১৯৪৪ সালে কেবিনেট মিশন ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তাভাবনার পর ক্রিপস্ মিশন তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব দিলে পাকিস্তান আন্দোলন আরও দানা বেঁধে ওঠে। সারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে কাতারবন্দী হন। এ আন্দোলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সাথে যে ক'জন উল্লেখযোগ্য নেতা নেতৃত্ব দেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁদের অন্যতম।

শেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সময় সারা উপমহাদেশে যখন স্বাধীনতা লাভের জোর প্রস্তুতি, তখনি এলো ছিচল্লিশের নির্বাচন। দেশের সিংহভাগ মানুষ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে। ৩রা জুনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সারা দেশে জয়ী হলেও ময়মনসিংহের গফরগাঁও ত্রিশাল থেকে মওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী এবং বরিশালের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে জয়ী হন।

মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর যখন পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আয়োজন চলছে মওলানা ভাসানী তখন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা ভাষাভাষী সিলেটকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে রেফারেণ্ডামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার বেশ কিছুদিন পর ১৯৪৮ সালে আসামের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মওলানা ভাসানী ঢাকায় আসেন এবং ক্রমান্বয়ে প্রভাবাধীন এলাকাসমূহে গিয়ে

www.pathagar.com

সর্বাগ্রে মসজিদ, মাদ্রাসা, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং স্কুল-কলেজ গড়ে তুলতে তৎপর হন।

মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে যে পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন, সে পাকিস্তানের শাসন, শোষণ ও ত্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত)। ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম কর্মী সম্মেলনে জন্ম নেয়া এই আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর মেনিফেস্টোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মাতৃভাষা আন্দোলনের গতি সঞ্চার করা হয়। ৯ই মার্চ মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে উনিশ সদস্যের পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী ভাষা আন্দো-লনের অন্যতম সংগঠক হিসেবে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকেন। মাতৃভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছে বায়ান্ন সালে। ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়। ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা বার লাইব্রেরীতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তব্য রাখেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খান, আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামছুল হক, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আবদুল মতিন এবং তমুদ্দন মজলি-সের আবুল কাশেমসহ আরও অনেকে। এ সভায় ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, যুব ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলার ছাত্র-জনতার বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলে অন্যান্য ভাষা সৈনিকের মত গর্জে ওঠেন ভাসানী এবং লাখো জনতার মিছিল নিয়ে নেমে আসেন রাজপথে। ফলশ্রুতিতে ২৪ ও ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গ্রেফতার হন। জেলখানায় তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ,

www.pathagar.com

খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর, আবুল হাশিম, ওসমান আলী, গোবিন্দ বল্লভ ব্যানার্জী প্রমুখের সাথে।

মাতৃভাষার অধিকার ও শোষিত মানুষের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট মোর্চা গঠনে শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে নৈতিক বিরোধের কারণে তিনি মুসলিম লীগের মত আওয়ামী লীগও ছাড়তে বাধ্য হন এবং বামপন্থীদের নিয়ে গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

আজীবন আপোষহীন জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বৃটিশ-ভারত ও পাকিস্তান আমলে যেমন খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দেলন, লাইনপ্রথাবিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ইংরেজ খেদা আন্দোলন, মাতৃভাষা আন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং একুশ দফার ভিত্তিতে স্বাধিকার আন্দোলন করেছেন, ঠিক তেমনি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে স্বাধীনতা এনেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অজ্ঞাত কারণে ভারত সরকার মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ করেছিলেন। স্বাধীনতাউত্তর সময়ে তিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেছেন। করেছেন ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল এবং বাংলা খুতবা ও খোদায়ী খিদমতগার প্রতিষ্ঠা। আর করেছেন তাঁর জীবনের একটি অন্যতম স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। এই বাস্তবায়িত স্বপ্নটির নাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ঘোষণা দেন। ১৯৭০ সালের জুনে পত্রিকান্তরে 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং চৌদ্দটি দেশের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ বছরই তিনি সন্তোষে একটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং আগত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সামনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক রূপরেখা তুলে ধরেন। শিক্ষাবিদরা রূপরেখা প্রণয়নে সহযোগিতা করেন। সম্মেলন শেষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারীর প্রস্তাব নিয়ে মওলানা ভাসানী রাওয়ালপিণ্ডি যান এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর সরকারবিরোধী মনোভাবের জন্যে এ উদ্যোগ

www.pathagar.com

সফল না হলেও আহমদীয়া সম্প্রদায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার প্রস্তাব আসে। মওলানা ভাসানী আদর্শের প্রশ্নে এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বাধীনতাউত্তর সময়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে মওলানা ভাসানী আরও একটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন (১৯৭৩ সালে) এবং সবার সহযোগিতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রজেক্ট কমিটি গঠন করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৭৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯৭৫ সালে ভাসানী আরও একটি জাতীয়ভিত্তিক শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেন। সেই সাথে '৭৩ সালের সম্মেলনে গঠিত প্রজেক্ট কমিটির অনুমোদন নিয়ে যাবতীয় কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয়, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং মীর ফখরুজ্জামান ভাইস চ্যান্সেলর থাকবেন।

নিঃস্বার্থ সমাজসেবক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। চিরাচরিত রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তন করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন দেশ উপযোগী ভিন্ন স্রোতধারার রাজনীতি যাতে নিহিত ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উত্তরণের পথ। নিজের নাম বা ক্ষমতার জন্যে তিনি কোনদিন রাজনীতি করেন নি। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মেলে। বরং ক্ষমতার নিকট সান্নিধ্যে এসেও তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। কোন প্রলোভন জনতার কাতার থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। আর তাই জনতার পোশাক লুঙ্গি-পাঞ্জাবী পরেই তাঁর দীর্ঘ জীবন কেটেছে। কোন বিশেষ পরিবেশ বা পরিস্থিতি রাজনীতির মত ভাসানীর পোশাকেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি।

আমাদের দেশে প্রায় সবাই যে নামের মোহে রাজনীতি করেন, সে ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর ছিল দারুণ অনীহা। সারা জীবন ক্ষমতার বাইরে থেকেও নিজস্ব প্রচেষ্টায় তিনি এত সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, বর্তমান আমলের কোন প্রভাবশালী মন্ত্রীর পক্ষেও তা করা সম্ভব নয়। অথচ কোন প্রতিষ্ঠানই তিনি নিজের নামে করেন নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত কাগমারী মুহাম্মদ

www.pathagar.com

আলী কলেজ-এর নাম ভাসানী কলেজ রাখার জন্যে উচ্চ পর্যায় থেকে পরামর্শ দেয়া হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মজিবুর রহমান প্রস্তাব করেছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের জন্যে—আত্মপ্রচারবিমুখ ভাসানী এ প্রস্তাবও দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ের বাইরেও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পরিচয় রয়েছে। দেশের ক্রান্তিকালে সাংবাদিকের সাহসী কলম নিয়ে দিকভ্রষ্ট সরকার ও সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার জন্যে তিনি প্রকাশ করেছিলেন সাপ্তাহিক 'হক কথা'। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্যে পত্রিকাটি সারা দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহতা'আলার উদ্দীপ্ত আদর্শ চরিত্র অর্জনে সক্ষম হতে পারে এবং মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্ব অত্যধিক। আর সে আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিশ্বাসের সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর অগণিত মুরীদ। ব্যবসায়ী পীরের দীক্ষা না দিয়ে তিনি তাদের আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে জিহাদী জীবন গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু মুসলমান নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রাণপ্রিয় মানুষ।

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর (ছিয়ানব্বই বছর বয়সে) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যুর খবরে সারা দেশের মানুষ হয়েছিল শোকে মুহ্যমান। জানাযা রূপ নিয়েছিল জনসমুদ্রে।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ভাসানী-চরিত্রে নবী জীবনের প্রভাব

মওলানা ভাসানী কোন জবরদস্ত হাদীসবেত্তা মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির বা ফকীহ ছিলেন না। প্রধানত তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠক। একজন অনলবর্ষী বক্তা। তাঁর জীবনের এসব দিকের মূল্যায়ন করা হয়েছে দেশের পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য লেখকের বিভিন্নমুখী রচনায়। কিন্তু আলেম উলামার আসল পরিচয় হচ্ছে তাঁরা ওরাসাতুল আম্বিয়া—নবী রসূল-গণের উত্তরাধিকারী। মওলানা ভাসানী তাঁর বিপুল হৃদয়বৃত্তি ও জীবন সাধনায় সত্যিই নবীসুলভ অনাড়ম্বর ত্যাগী জীবন ও দরদী মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনে মহানবী (স.)-এর আদর্শ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তাই আলোচনা করবো। মওলানা ভাসানী মওলানা হিসেবেও কেন অনন্য মাহাত্ম্যের অধিকারী, আশা করি এ আলোচনার দ্বারা পাঠকসমক্ষে সে রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

মহানবী (স.)-এর একটি অতি মশহুর দোয়া ছিল ঃ

'হে আল্লাহ, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ। আমাকে মিসকীনরূপে মৃত্যু দান করিও। মিসকীনদেরই সাথে আমার হাশর করিও।'

জীবনে মরণে পরকালে মিসকীনরূপে মিসকীন তথা নিঃস্ব দুঃস্থজনদের সাথে অবস্থান করার এই আকাঙ্ক্ষা মওলানা ভাসানীর ছিল মজ্জাগত। তাই স্বদেশের কোন আত্মীয় ভক্তজনের বাড়ীতে অথবা বিদেশের কোন জাঁকজমক-পূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন একান্তই সরল অনাড়ম্বর বেশভূষার অধিকারী। অনেক দেন-দরবার কোর্ট-কাচারী করে যখন টাঙ্গাইলের সন্তোষের রাজবাড়ী তাঁর পূর্ণ দখলে তখনো তাঁর নিজের নিবাস ছিল টিনের একচালা ঘর—একান্তই বাঁশের বেড়া ঘেরা এক পর্ণকুটীর। স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্রই তিনি পাঞ্জাবী, লুঙ্গি আর তালের আঁশের টুপী পরা এক সংসারত্যাগী দরবেশের প্রতিমূর্তি,

www.pathagar.com

অথচ রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার মত কেতাদুরুস্ত কুলীন অভিজাতরা তাঁর পার্শ্বচর। মওলানা আতহার আলী সিলেটী, আল্লামা মুশাহেদ আলী, মওলানা সিদ্দীক আহমদের মতো বিদ্যাসাগর ও তাসাওউফের দিকপাল গোছের আলেমগণও তখন রাজনীতিতে সক্রিয়। শেরে বাংলার তো শ্লোগানই ছিল 'মোটা ভাত মোটা কাপড়'। কিন্তু মওলানা ভাসানী তাঁর চরিত্রকে যেভাবে মিসকীনী নিঃস্বতামণ্ডিত করে রেখেছিলেন গোটা ভারত-বর্ষের তথা পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তা একান্তই বিরল। বরং এক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই তাঁর তুলনা বললে অত্যুক্তি হবে না। সম্ভবত এই দরিদ্রপ্রীতিই তাঁকে এ দেশে বামপন্থী রাজনীতির জনকে পরিণত করেছিল। তাঁকে এশিয়া-আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় মজলুম জননেতা বলা হয়ে থাকে। তিনি যে সত্যিকারই বিশ্বের মজলুম জননেতা তার কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি গত ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্যরূপে চীন সফরকালে। সংহাই, ক্যান্টন, সিয়ান, পিকিং প্রভৃতি স্থানে আমাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাঁর প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন দেখে আমি অনেকটা বিস্মিত হয়েছি।

হিন্দু জমিদারগোষ্ঠীর শোষণে জর্জরিত বাংলা-আসামের মুসলিম প্রজাকুলের প্রতি দরদে উতালা ছিল তাঁর মন। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ তাঁর বিখ্যাত আত্মকথা 'বাতায়নে' মওলানা ভাসানীর সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তখন করটিয়া সাদাৎ কলেজের প্রিন্সিপাল। বানভাসিতে সারা দেশ প্লাবিত—দুর্যোগগ্রস্ত। এমন একদিন আসাম থেকে নৌকা বোঝাই ধান আর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রিলিফ বিতরণের জন্য এসেছিলেন এক গেঁয়ো ধরনের সাদা মোটা পোশাক পরিহিত মওলবী। পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানা গেল ইনিই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে সেদিন তাঁকে এক ব্যতিক্রম-ধর্মী মৌলভী বলেই মনে হয়েছিল আর তা মনে হবারই কথা। মহানবী (স.) যেখানে বলে গেছেন ঃ 'উপরের হাত নীচের হাত থেকে মানে দাতার হাত দানগ্রহীতার হাতের চাইতে উত্তম।' গোটা আলেম সমাজকে মানুষ যেখানে হরহামেশা দান গ্রহণ করতে দেখেই অভ্যস্ত সেখানে মওলানা ভাসানী এসেছিলেন দান নিয়ে বন্যার্তদের মধ্যে ধান বিতরণ করতে! মহানবী (স.)-এর জীবন চরিত শিক্ষার কী সার্থক অনুসৃতি! মহানবী (স.) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

'মানুষের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে মানুষের উপকারে আসে।' মওলানা ভাসানী সারা জীবন তাই ছিলেন। নবী করীম (স.)-এর একখানা হাদীস হলো:

'যে মানুষের শোকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহ্‌র প্রতি শোকর-গোজার হতে পারে না।'

মওলানা ভাসানীর মধ্যে এ শোকরগোজারীর কমতি ছিল না কোন-দিন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র মাস ছয়েক পূর্বে আমি আমার অনুজ উবায়দুল্লাহ ও গ্রাফিক আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ বন্ধুবর কাজী ওবাদুর রশীদসহ তাঁর সাথে দেখা করতে যাই তাঁর সন্তোষের বাড়ীতে। এর কিছুদিন পূর্বেই তিনি লণ্ডন থেকে এসেছেন চিকিৎসা করিয়ে। আমাদেরকে দেখেই তিনি আবে-গের সাথে বলে উঠলেন, 'আমি তোমাদের সিলেটি ভাইদের কাছে খুব ঋণী। লণ্ডনে ওরাই তো আমাকে সেবাযত্ন আতিথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।' কারা ছিলেন সেই লণ্ডনপ্রবাসী সহৃদয় সিলেটি মেজবান? জীবনে তাঁদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ আছে কিনা বা হবে কিনা তাও জানি না। কিন্তু মও-লানা ভাসানী এমনিভাবে আতিথ্যের জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন যে, মনে হচ্ছিলো আমরাই যেন তাঁকে সে আতিথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। এমনি উদার স্বীকৃতি আর কৃতজ্ঞতাবোধ খুব কমই দেখা যায়। আমি তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধ দেখে অত্যন্ত অভিভূত হই।

মওলানা সাইয়েদ হোসায়ন আহমদ মাদানী (র.) ছিলেন বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার সদরুল মুদারিসীন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ তথা অবিভক্ত ভারতের জাতীয় উলামা সমিতির সভাপতি। তিনি ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আযাদের মতোই জাতীয়-তাবাদী তথা দ্বি-জাতিত্বের ঘোর বিরোধী আর মওলানা ভাসানী ছিলেন আসাম-মুসলিম লীগের সভাপতি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব ও তিক্ততা সুবিদিত। মওলানা ভাসানী কোনদিন যথারীতি মওলানা মাদানীর কাছে বিদ্যাভ্যাস করেছেন বলে জানা যায় না, অথচ জনসভায় বক্তৃতায় তিনি অনেক সময়ই শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করতেন এবং তাঁর ভাবশিষ্য বলে গর্বও প্রকাশ করতেন। উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতাবোধের এ পরিচয় মওলানা ভাসানী জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত রেখে গেছেন। অথচ মুসলিম লীগের একটা প্রাদেশিক শাখার (আসাম) সভাপতিরূপে তাঁর মনে মওলানা মাদানীর প্রতি

www.pathagar.com

বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। স্মর্তব্য, শুধুমাত্র এই লীগ বিরোধিতার জন্যে মওলানা মাদানী সিলেটে ও রংপুরের সৈয়দপুরে লীগ কর্মীদের হাতে রীতিমত নিগৃহীত হয়েছিলেন। মওলানা আযাদ গড়ের মাঠের ঈদগাহের ইমামতি থেকে বাদ পড়েছিলেন; কিন্তু মওলানা ভাসানী কোনদিন তাঁর উস্তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ হারান নি। কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে একমত হতে না পারলেই কারো দেশপ্রেমে সন্দেহ পোষণ করার যে প্রবণতা তার অনেক উর্ধ্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী।

হুযূর পাক (স.) ফরমান ঃ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন গর্হিত কাজ দেখতে পাবে তার উচিত, বাহুবলে তার পরিবর্তন সাধন করা, যদি সে ক্ষমতা তার না থাকে তবে মুখে (প্রতিবাদ করবে) আর যদি তাও না থাকে তবে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর ঐটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' অন্য হাদীসে আছে ঃ 'সত্য কথা না বলে যে চুপ থাকে, সে বোবা শয়তান।'

মওলানা ভাসানীর জীবন ছিল একটি প্রতিবাদমুখর জিহাদী জীবন। মহানবী (স.)-এর উক্ত হাদীসগুলো তাঁর জীবনকে আন্দোলিত করেছিল দারুণভাবে। বৃটিশসিংহ, পাকিস্তানী আমলের লীগ সরকার এমন কি তাঁর স্বহস্তে গড়া আওয়ামী লীগ সরকারের অনাচার অত্যাচার অযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকার জন্যে ইতিহাসে এক প্রতিবাদী বিবেকী কণ্ঠরূপে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাউত্তরকালে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার অস্তিত্ব যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামো আর স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সাধারণভাবে আলেম সমাজের ভূমিকার জন্যে—এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী লোক এবং বিদ্বিষ্ট মনের অধিকারী প্রতিশোধপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা যখন বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন আর আলেম সমাজ নিরুপায় ও জড়সড় হয়ে তাদের সেসব বিবৃতির জবাব দিতেও ভয় পাচ্ছিলেন, ঠিক তেমনি সময় আমি এক দিকে জাতির তৎকালীন একচ্ছত্র অধিপতি শেখ মুজিবকে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে থাকি, অপরদিকে আমরা জমিয়তুল মুদারিসীনের পক্ষ থেকে যথারীতি একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করি তাঁর পল্টন ময়দানে বক্তৃতার দিন পূর্বাহ্নে মতিঝিলস্থ ন্যাপের কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

কার্যালয়ে। তখন আমি বাংলাদেশ জমিওতুল মুদারিসীনের সভাপতি এবং মওলানা ওয়ারিস আলী (দিগধা) সাধারণ সম্পাদক। বর্তমান ধর্মমন্ত্রী মওলানা এম. এ. মন্নান সাহেবের অগ্রজ মওলানা আবদুস সালাম সাহেবও জমিয়তের তখনকার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। মওলানা ভাসানী আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই বক্তব্য রখবেন। সম্ভবত সেটা ছিল '৭২ সালের এপ্রিল অথবা মে মাস এবং স্বধীনতাউত্তরকালে মওলানা ভাসানীর পল্টনের প্রথম জনসভা। মওলানা ভাসানীর সভায় আমরা জমিয়ত নেতারাও শামিল হয়েছিলাম সদলবলে। কিন্তু নির্ধারিত সমায়ে বক্তৃতাকালে মওলানা ভাসানী তা ভুলে যান। তারপর তিনি সভা-শেষে যখন হঠাৎ দোয়ার জন্য উপস্থিত শ্রোতাদেরসহ হাত তুললেন, তখন আমি তাঁর পাশ থেকেই তাঁকে মাদ্রাসা শিক্ষার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম। মওলানা ভাসানী তাড়াতাড়ি মোনাজাত শেষ করেই বললেন, হাঁ, আর একটি জরুরী কথা, মাদ্রাসা শিক্ষা উঠিয়ে দেয়ার কথা কেউ কেউ বলছে। ওরা পাগল, ওরা পাগল। আমি ভাসানী বলছি, মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে, থাকবে, থাকবে।'

মওলানা ভাসানীর সেদিনকার সে প্রতিবাদ ধ্বনিতে এ দেশের কোটি কোটি ধর্ম প্রাণ মনুষের মনের কথা উচ্ছারিত হয়েছিল। আশার সঞ্চায় করছিল লক্ষ লক্ষ হতাশাগ্রস্ত আলেমের মনে। এর মাত্র দু'তিন দিন পর আবার শিবপুরে শহীদ আসাদের পিতা মৌলভী আবু তাহির সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় মওলানা ভাষানী তাঁর এ বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন—যা জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তখন একটা ব্যক্রমধর্মী ও গুরুত্ব-পূর্ণ বক্তব্যরূপে প্রকাশিতও হয়েছিল। জীবনের অন্তিম সময়ে ফারাক্কা মিছিলের মাধ্যমে উচ্ছারিত মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদী কণ্ঠ শেষবারের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী উচ্ছারিত হয়েছিল। ভারত-নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী এ নিয়ে রীতিমত প্রমাদ গুণছিলেন। সেদিন নবতিপর বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী সদি ফারাক্কা মিছিলের নেতৃত্ব না দিতেন তবে এ মিছিলের আওয়াজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এত গুরুত্বের সাথে যে বিবেচিত হতো না, তা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

এহেন প্রতিবাদী কণ্ঠ, পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় যিনি ছিলেন 'বিপ্লবী মওলানা ভূসানী' (খন্দকার ইলিয়াসের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য) যাঁর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে ভিড় করতেন বিদেশী সাংবাদিকের দল। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই তিনি ভয় করতেন না।

www.pathagar.com

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। আইয়ুব আমল। ভারতের জব্বলপুর ও আহমদাবাদে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত মুসলমান নির্মমভাবে নিহত ও হাজার হাজার আশ্রয়চ্যুত ছিন্নমূল হলেন। মওলানা ভাসানী তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদ দিবস আহ্বান করে বসলেন। গোটা দেশের সংখ্যালঘুরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো, না জানি সে প্রতিবাদ দিবসে তাদের উপর দেশব্যাপী পাল্টা হামলা না শুরু হয়ে যায়! সত্য কথা বলতে কী, মওলানা ভাসানীর সাথে তখন আমার ব্যক্তিগত পরিচয় বা ততোটা শ্রদ্ধাবোধও ছিল না। আমরা 'আঞ্জুমানে এজহারে হক' (সত্য প্রকাশ সমিতি)-এর পক্ষ থেকে পত্রিকায় যথারীতি বিবৃতি দিয়ে মওলানা ভাসানীকে তাঁর প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী বাতিল করে মহানবী (স.)-এর সুন্নত মোতাবেক 'কুসুতে নাজিলা' বা নামাযের জামাতে জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিশাপমূলক দোয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবেদন জানালাম, বিশেষত দৈনিক আজাদে আমার সে বিবৃতি খুব ফলাও করেই ছাপা হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর মত নিরাপোষ সংগ্রামী নেতা আমার মত একটা তরুণের বিবৃতিকে যে গুরুত্ব প্রদান করলেন তা আমার তো বটেই সারা জাতির জন্যেই ছিল অভাবনীয় ও অকল্পনীয়। বলা বাহুল্য, মওলানা ভাসানী তাঁর সে কর্মসূচী সত্য সত্যই বাতিল করে দিয়েছিলেন। সত্যের কাছে নমনীয় হওয়ার যে মহান শিক্ষা মহানবী (স.) দিয়ে গেছেন, এটা ছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন।

মহানবী (স.) বলেছেন ঃ 'মোমেন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার করে পড়ে না।' মানে একই ব্যক্তির হাতে দু' দু'বার সে প্রতারিত হয় না। মওলানা ভাসানী তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য সতীর্থ ও সহকর্মীর হাতে বারবার প্রতারিত হয়ে শেষটায় বুঝেছিলেন, এক শ্রেণীর বামপন্থী সুবিধা-বাদী মহল তাঁকে আজীবন ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। তাই তাঁর সাথে আমাদের সেই সাক্ষাৎকারের সময় মওলানা ভাসানী অত্যন্ত খেদের সাথে যথার্থই বলেছিলেন আমাকে লক্ষ্য করে। বলেছিলেন ঃ 'মওলানা, আমি সারা জীবন ব্যবহৃত হলাম অন্যদের হতে, কম্যুনিস্টরা আমার ঘাড়ে হুকো রেখে সারা জীবন তামুক খেলো, তোমরা তো আমার কাছে এলে না, আমার দ্বারা ইসলামের কিছু কাজ করালে না!

মওলানা ভাসানীর সে উপলব্ধি ও অনুভূতিটাই শেষ জীবনে তাঁকে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক সহচরকে ছেড়ে দিয়ে খোদায়ী খিদমতগার পার্টি গঠনে

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি 'হক কথা' ও 'খোৎবা'র মাধ্যমে সে কথাগুলোই ব্যক্ত করে গেলেন জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে। আমি নিজে যেহেতু 'আঞ্জুমানে এজহারে হক'-এর মাধ্যমে 'জীবন্ত মসজিদ সংগঠনে'র কর্মসূচীর মধ্যে যুগোপযোগী খোৎবা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছিলাম ১৯৬৬ সালেই, তাই তাঁর মহানবী (স.)-এর আদর্শ মোতাবেক খোৎবা প্রচারের উদ্যোগে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে অনেকটা আলাদা হয়েছিলেন মহানবী (স.)-এর আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়ে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপ্লেক্সেই গড়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে খানকাহ ও মুরীদানদের নিয়ে জিকির আযকার করা ও তাঁদেরকে উপদেশ দানের জন্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাথে 'দরবার গৃহ'ও তিনি তৈরী করেছিলেন। জীবনে মরণে নিঃস্বদের সঙ্গ কামনাকারী নবী (স.)-এর আশেক মওলানা ভাসানী তাঁর সারা জীবনের নিঃস্বদের সেবার সংগ্রাম শেষ করে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব মুরীদদেরই একান্ত সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ পরিবেশে সন্তোষে তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল রচনা করেছিলেন। কর্ম কোলাহলপূর্ণ জীবন শেষে তিনি তাঁর অন্তিমশয্যা রচনা করেছিলেন রাজধানী থেকে সুদূরে সন্তোষের ছায়াঢাকা পল্লীগ্রামে—যেমনটি করেছিলেন মহানবী-(স.)-এর একনিষ্ঠ ত্যাগী সাহাবী আবুযর (রা.) মদীনা থেকে অনেক দূরে রাবজায়। মহানবী (স.)-এর এক সার্থক অনুসারীরূপে এভাবে সারা জীবন তিনি তাঁরই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দুঃস্থসেবী নবী (স.)-এর দুঃস্থ-দরদী এ উম্মত যেন পরকালে তাঁর শাফাআত লাভ করেন আর আমরাও সে শাফাআতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারি—আজ একান্তভাবে তাই আমাদের কাম্য।

মহানবী (স.) বলে গেছেন ঃ

'আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকাপুঞ্জ তুল্য। তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে যাঁকেই অনুসরণ করবে, হেদায়েত প্রাপ্ত হবে—পেয়ে যাবে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান।'

মওলানা ভাসানী জীবনে মরণে অনুসরণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এমনি এক বিপ্লবী সাহাবীর জীবনাদর্শকে যিনি বিশ্বাস করতেন—আজকের আহারের পর কালকের জন্যে আহার্য তুলে রাখা ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী—যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে হবে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে। এ

www.pathagar.com

আদর্শ অনুসরণ যে কত আয়াসসাধ্য, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর এ ভাবশিষ্য তাই টাঙ্গাইলের খোশ্‌নদপুর (সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রদত্ত জায়গীরনামায় সন্তোষের নামটি এভাবেই লিখিত রয়েছে—বন্ধুবর অধ্যাপক মওঃ মুজিবুর রহমান জালালাবাদীর সৌজন্যে) বিশ্ব স্রষ্টার খোশনুদী হাসিলের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলে তাঁরই সাধের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অন্তিম শয্যা গ্রহণ করে তাঁর জীবন-সাধনা সার্থকভাবে সমাপ্ত করে গেছেন।

www.pathagar.com

ডা. (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত

আলোর সন্ধানে মওলানা ভাসানী

পবিত্র কুরআনে প্রথম যে শব্দটি নাজিল হয়েছে, তা হচ্ছে 'ইক্‌রা' অর্থাৎ পড়। এখানে দেখা যাচ্ছে পবিত্র কুরআনেও পড়া সম্বন্ধে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হাদীস শরীফে আছে, 'তালাবুল্‌ ইল্‌মে ফারিযাতুন আলা কুল্লে মুস্‌লেমাও ওয়া মুসলেমাতুন'। অর্থাৎ ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলমান নরনারীর উপর ফরয। হাদীস শরীফে আরো আছে, 'আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ বা নায়েবে রসূল।' হাদীসে আরো বলা হয়েছে, 'প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যেয়েও জ্ঞান অর্জন কর।'

কুরআন ও হাদীসের এই কথাগুলো মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর সারা জীবনের সাধনায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে, যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা মা-বাপের ছত্রছায়ায় দিন কাটায়, সে বয়সে তিনি পরিবারের স্নেহ-মায়া-মমতা ছিন্ন করে, 'ইলমে তাসাওউফ' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধনায় ঘর ছেড়ে চলে যান মোমেনশাহীর কল্লা গ্রামে বিখ্যাত পীর সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বোগ্‌দাদী (র.)-এর খানকায়। সেখানে পীরের দোয়ায় এবং নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার বলে তিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কামেল হতে পেরেছিলেন।

ইল্‌মে তাসাওউফে সফলতা অর্জন করার পর তিনি দীন ও দুনিয়ার ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে আবার জ্ঞানের সাধনায় পাড়ি জমান বাংলা থেকে শত শত মাইল দূরে, উত্তর ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায়।

আবদুল হামিদ খান কঠোর পরিশ্রম করে এই মাদ্রাসা থেকে পাশ করে 'মওলানা' উপাধিতে ভূষিত হন এবং তাঁর নাম হয় মওলানা আবদুল হামিদ খান।

www.pathagar.com

পড়াশুনা সমাপ্ত করার পর তিনি ইসলামের খিদ্‌মতে নেমে পড়েন এবং জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদার-মহাজনগণ) মজলুমদের পাশে দাঁড়িয়ে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে পাবনা, মোমেনশাহী ও বগুড়ায় বিরাট বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদার-মহাজনদের কোপানলে পতিত হন। কিন্তু ধরা না দিয়ে এবং কারাবরণ না করে আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করে আসামের ঘাগমারী জঙ্গলে পালিয়ে যান এবং তাঁর লোকজন নিয়ে সেই গহীন অরণ্য কেটে সাফ করে তিনি সেখানে নতুন লোকালয় গড়ে তোলেন। এই নতুন লোকালয়ে যে জিনিষটি তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন তা হলো স্কুল ও মাদ্রাসা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, ছেলে-মেয়েদের ইল্‌ম শিক্ষা দিতে না পারলে তারা জাহেল থেকে যাবে এবং জাহেল লোক অনেকটা পশুর সমান। পরে তিনি সেখানে মসজিদ, হাসপাতাল ও মুসাফিরখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

শুধু ঘাগমারীতে স্কুল-মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ধুব্‌ড়ীর ভাসান চরেও তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি পড়ে এবং সেখানেও তিনি অনুরূপ স্কুল-মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপন করে ভাসান চরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং সেই চরের নামানুসারেই তাঁর নামের শেষে 'ভাসানী' শব্দটি যুক্ত হয় এবং তখন থেকে তাঁর পুরা নাম দাঁড়ায়—আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

এভাবে তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার আলো দিতে না পারলে মানুষের মনের অন্ধকার দূরীভূত হবে না, মানুষ জাহিলিয়াতের যুগেই থেকে যাবে এবং সেক্ষেত্রে মানুষ ও পশুতে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। সুতরাং যে-কোন জাতির ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করতে হলে সেই জাতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য।

শিক্ষার দিক থেকে মওলানা ভাসানী খুব একটা বিরাট ডিগ্রীধারী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে কত বড় শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষার কদর যে তাঁর কাছে কত বেশী ছিল, তার প্রমাণ মেলে কাগমারী 'মুহাম্মদ আলী কলেজ' এবং 'সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায়।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আলী কলেজ

কাগমারী-সন্তোষ অঞ্চলে এমন কি টাঙ্গাইল টাউনেও তখন ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন কলেজ ছিল না। তাই তিনি উক্ত অঞ্চলে একটি কলেজের অভাব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছিলেন এবং কিভাবে এই অভাব পূরণ করা যায় দিনে রাতে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কিভাবে অল্পদিনের মধ্যে সে সুযোগ এসে যায় এবং কিভাবে কাগমারীতে 'মোহাম্মদ আলী কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

ভাসানী সাহেব অত্যন্ত অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। যেখানেই সভা-সমিতি করে দাবী-দাওয়া পেশ করার বা মনের দুঃখ প্রকাশ করার অসুবিধা দেখা দিত সেখানেই তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শরণাপন্ন হতেন। এর জ্বলন্ত উদাহরণ মেলে ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের গায়েবানা জানাজায়। একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের গায়েবানা জানাযার আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ২২শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, সকাল বেলায়। আকাশে বজ্রাঘাত হলে সে শব্দ যেমন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে পুলিশের গুলীতে ছাত্র হত্যার সংবাদও তেমনি সারা শহরে, এমন কি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। দোকান-পাট, অফিস-আদালত, গাড়ী-ঘোড়া, রিকসা-টাঙ্গা সবই বন্ধ হয়ে গেল। চতুর্দিকে থেকে অগণিত লোক পঙ্গপালের মত মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে জামায়েত হতে লাগল। ছাত্র-শিক্ষক, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, কর্মচারী-কেরানী, জোতদার-ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুর, কামার-কুমার, গাড়ীওয়ালা, ঘোড়াওয়ালা, রিকসাওয়ালা-টাঙ্গাওয়ালা—কেউ বাদ রইল না। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এলেন সবার পরে, বেলা প্রায় দশটার দিকে এবং তারপরই গায়েবানা জানাযা শুরু হলো। জানাযায় ভাসানী সাহেব দোয়া করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠালেন এবং তাঁর দীর্ঘ মুনাজাতের ভিতর দিয়ে শুধু শহীদদের আত্মার মাগফিরাতই কামনা করলেন না, বরং অগণিত মানুষের অব্যক্ত বুকের ব্যথার কথা আল্লাহ্‌র দরবারে এমন করুণভাবে পেশ করলেন যে, মনে হলো আল্লাহ্‌র আরশ যেন কেঁপে উঠল এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত বা সেদিন জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুমদের এই করুণ ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন। কারণ এর পরবর্তীতে প্রতিটি ঘটনার ভিতর দিয়ে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি।

www.pathagar.com

বায়ান্ন সালের আগেও ১৯৪৯ সালে তিনি এ ধরনের একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন পশ্চিমা শাসনের বিরুদ্ধে। যদিও পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল; কিন্তু পাকিস্তান কায়েমের এক বৎসরকাল অতীত হতে না হতেই একজন দূরদর্শী রাজনীতিক হিসেবে রাজনৈতিক বাতাসে এমন একটা গন্ধ খুঁজে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, পশ্চিমা শাসনের নাগপাশ থেকে ছিন্ন হতে না পারলে এ দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হবে না। অথচ মুসলিম লীগের ভিতরে থেকে এমন একটা মনোভাব প্রকাশ করাও সম্ভব নয়, তাই তিনি আরেকটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন এবং 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন দল গঠন করলেন, যা পরে 'আওয়ামী লীগ' নামে রূপান্তরিত হয়।

যে আওয়ামী লীগ সারা দেশে বিস্তৃত—এই আওয়ামী লীগের পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা; কিন্তু প্রথমদিকে কবে, কোথায়, কিভাবে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল তা কিন্তু অনেকেরই অজানা। যদিও ১৯৪৯ সালে ঢাকার গোলাপবাগে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিকারে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত আওয়ামী লীগার বদিউজ্জামান খান সাহেবের বাসায়। আর যে মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আওয়ামী মুসলিম লীগ এ দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছিল, আজকাল কিন্তু প্রায় সবাই সেই মানুষটির নাম বেমালুম ভুলে গেছেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ টাঙ্গাইলের মাইঠান গ্রামের বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা সামছুল হক সাহেব যিনি মি. জিন্নাহর সাথে সাথে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভাসানী সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং দিবারাত্র পরিশ্রম করে এই পার্টিকে মজবুত করে তোলেন। তিনি সেই শামছুল হক যিনি ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের এক উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগের এক জাদরেল প্রার্থী করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার জনাব খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে এম. পি. এ. নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকার গোলাপবাগে যখন আওয়ামী লীগের ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন মওলানা ভাসানীকে প্রেসিডেন্ট এবং সামছুল হককে জেনারেল সেক্রেটারী করা হয়। এই সামছুল

www.pathagar.com

হক কিভাবে অকালে কালের কপোলতলে লোক-চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলেন সে এক হৃদয়বিদারক করুণ ইতিহাস।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেও তৎকালীন পশ্চিমা শাসনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলা খুবই কঠিন কাজ ছিল। কেননা শামছুল হক সাহেব নতুন পার্টি গঠন করার পর এবং এম. পি. এ. নির্বাচিত হওয়ার পর ভিক্টোরিয়া পার্কে এক জনাকীর্ণ সভায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পতিত হন যার জন্য তাঁর ভাস্করের মত সমুজ্জ্বল জীবন প্রদীপটি অকালে পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হয়। এমতাবস্থায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানী রাজনীতির সাধারণ গতিপথ পরিবর্তন করে, তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তায় অগ্রসর হওয়ার পথ বেছে নেন। তিনি বিরাটাকারে কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতি না করে ১৯৪৯ সালে কাগমারীতে এক ধর্মীয় সম্মেলনের আহ্বান করেন এবং সেই সঙ্গে 'জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ'—এই কথাটিও যুক্ত করেন। এই ধর্মীয় সভা আহ্বান করে তিনি সারা বাংলার জনগণের প্রতি (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান), বিশেষ করে মুরীদানদের প্রতি একটাই আরজ করলেন ঃ সম্মেলনের কাজকে সফল করার জন্য তোমরা দলে দলে সম্মেলনে যোগদান কর এবং তোমাদের পীর ভাইদের খাওয়াবার জন্য, তোমরা যে যা পার টাকা-পয়সা, চাল-ডাল, হাঁস-মুরগী, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া সঙ্গে নিয়ে এসে কাগ্মারীতে জমা দাও।

একজন মানুষের সামান্য আহ্বানে সারা দেশের মানুষ যে কিভাবে সাড়া দিয়েছিল এবং কাগ্মারীতে সে যে কি মহাসম্মেলন হয়েছিল, তা যিনি দেখেন নি তাকে বুঝানো মুশকিল। কাগ্মারী ও সন্তোষের মধ্যবর্তী এক বিরাট মাঠে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং কাগ্মারীর মত এক অজ পাড়াগাঁয়ে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। সেই সম্মেলনে ধর্মীয় বক্তৃতার পর ভাসানী সাহেব জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ সম্বন্ধে বজ্রগম্ভীর স্বরে যে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তাতে নিকটবর্তী সন্তোষ জমিদারীর ভিৎ ভূমিকম্পের মত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদও হয়ে গিয়েছিল। আর এই সম্মেলনের ফলেই যে কাগ্মারীতে মোহাম্মদ আলী কলেজ এবং সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

এই মহাসম্মেলনে কে কি বক্তব্য রেখেছিলেন, তা অবশ্য এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু ভাসানী সাহেবের ডাকে আপামর জনসাধারণ কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এবং কি পরিমাণ জিনিস-পত্র সেখানে মওজুদ করেছিলেন তার একটু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। কেননা সম্মেলন শেষে বেঁচে যাওয়া জিনিসপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল কাগমারী মোহাম্মদ আলী কলেজ। টাকা-পয়সা জমা দেওয়ার জন্য মস্‌জিদের সম্মুখে মাধ্যম আকারের দু'টি বাক্স রাখা হয়েছিল এবং অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য যে, দু-চার ঘন্টা পর পরই টাকায় বাক্‌সগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছিল এবং টাকা বের করে বাক্‌সগুলো খালি করে দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। কাগমারীর পূর্ব দিক দিয়ে লৌহজং নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীর অপর পারে অর্থাৎ পূর্ব পার্শ্বে জিনিষপত্র রাখার এবং অগণিত লোকের খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। চাল রাখার জন্য বিরাট মাঠে শত শত হাত লম্বা টিনের চালাঘর বাঁধা হয়েছিল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই বিরাট চালাঘরের টুই (ছাদ) পর্যন্ত অপরিমিত চাল জমা হয়েছিল। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী-ডিম—সব কিছুর জন্যই আলাদা জায়গা ঠিক করা হয়েছিল এবং প্রতিটি জায়গাই প্রতিটি জিনিষ দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। কত হাজার গরু-ছাগলের যে আমদানী হয়েছিল তার হিসেব নির্ণয় করা মুশ্‌কিল ছিল। খুব সহজ তরিকায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে খিচুড়ী পাকিয়ে, সেই খিচুড়ী মাটির বাসনে সবাইকে পরিবেশন করা হয়েছিল। এ জন্য শত শত ভলান্টিয়ার বা খিদমতগার নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিরাট লম্বা চুলায় শত শত পিতলের ডেকচিতে এই খিচুড়ী পাক হয়, আর এই খিচুড়ী রাখার জন্য বেশ কয়েকটি মাধ্যম সাইজের পাতাম-নৌকা সাফ্‌-সুফ্‌তা করে রাখা হয়েছিল যেখান থেকে খিদমতগারগণ প্রতি বৈঠকের হাজার লোককে খেতে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগণিত লোক এই লঙ্গরখানায় খিচুড়ী খেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পরিবেশে খানা খাওয়াতে বহু লোকের ডায়রিয়া হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তেমন কিছুই হয় নি। তিন দিন পর্যন্ত এই লঙ্গরখানা চলেছে। তৎপর সম্মেলন শেষে যে পরিমাণ চাল-ডাল-গরু-ছাগল বেঁচে গিয়েছিল, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ পকেটস্থ করলেই মওলানা ভাসানী সুসজ্জিত বাড়ী-ঘর করে আরাম-আয়াসের জিন্দেগী যাপন করতে পারতেন। কিন্তু অন্যান্য

www.pathagar.com

অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে মওলানা ভাসানীর পার্থক্যটা এখানেই। অনেক নেতাই এমন একটা মওকা পেলে সেটাকে জীবনের পরম পাওয়া বলে মনে করতেন। কিন্তু এই লোভ মওলানা ভাসানীর জীবনে কোনদিনই ছিল না বলেই আজ কাগ্‌মারীতে মোহাম্মদ আলী কলেজ আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; আর তাই আজ আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা করতে, তাঁর স্মৃতি স্মরণ করতে গৌরব অনুভব করছি।

একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার যে সাধ তাঁর মনে ছিল, যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং যে সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন, আল্লাহ্‌র রহমতে এতদিনে সেই সুযোগ হাতে এসে গেল এবং সম্মেলনের বেঁচে-যাওয়া জিনিসপত্র বিক্রি করে যে টাকাটা হাতে পেলেন তার একটি পয়সাও অপচয় না করে সেই টাকা দিয়ে টিনের ঘর করেই তিনি মোহাম্মদ আলী কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে ধীরে ধীরে সেখানে বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় এবং কলেজটি সরকারী কলেজে পরিণত হয়। এখন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে মওলানা ভাসানীর স্বপনকে সার্থক করে তুলছে।

এই কলেজের নামকরণ সম্বন্ধে যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে এবং এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত যে অভিজ্ঞতা আছে তাও এখানে তুলে ধরছি। এত সাধ ও স্বপ্ন নিয়ে যে কলেজটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৯ সালে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ও অর্থনৈতিক সমস্যায় কলেজটির তখন শোচনীয় অবস্থা। এমতাবস্থায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার হিসেবে আমার হস্তক্ষেপে কলেজের কিছু উন্নতি হতে পারে ভেবে ভাসানী সাহেবের ইঙ্গিতে এবং অধ্যাপক আবদুর রহিম সাহেবের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে কলেজের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এই সুবাদে প্রায় প্রতি মাসেই একবার করে এই মজলুম জননেতার একান্ত সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। কলেজের কাজ নিয়ে তাঁর কাছে গেলে আধ-ঘন্টার মধ্যে কলেজের কাজ শেষ করে তিনি তাঁর মনের আবেগে দেশ ও দশের কথা অনর্গল বলে যেতেন যে পর্যন্ত না অন্য কোন পার্টি এসে হাযির হত। তিনি উত্তরে আসাম থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে পূর্বে চিটাগাং পর্যন্ত এত লোকের এত কথা এমন নিখুঁতভাবে বলে যেতেন যে, সে এক বিরাট ইতিহাস!

কোন রকম নোট-বুকের সাহায্য ছাড়াই তিনি কবে, কোথায়, কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সন তারিখসহ খুঁটিনাটি বলে যেতেন। আর শুধু

www.pathagar.com

বিদ্রোহের ঘটনাই নয়, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী থেকে আরম্ভ করে, মোহন চাঁদ, করম চাঁদ গান্ধী, দাদা ভাই নওরোজী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, রাধাকৃষ্ণণ মেনন, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহেরু, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুল গফ্ফার খান (সীমান্তের পাঠান) সরদার আবদুল কাইয়্ুম খান, মিঞা মমতাজ দৌলতানা, আসামের বরদলই সরকার, কলকাতার সি. আর. দাস (চিত্তরঞ্জন দাস), নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, স্যার সৈয়দ আহমদ, স্যার আবদুল লতিফ, স্যার আবদুর রহিম, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকার নবাব আবদুল গনি, নবাব আহসান উল্লাহ, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ধন বাড়ীর নবাব হাসান আলী চৌধুরী, বগুড়ার নবাব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিঞা), খুররম খান পন্নী, সন্তোষের জমিদার রাণী জাহ্নবী, রাণী বিন্দুবাসিনী, খুলনার আবদুস সবুর খান, কুমিল্লার ধীরেন দত্ত, চিটাগাং-এর ফজলুল কাদের চৌধুরী, ময়মনসিংহের হাশেমুদ্দিন প্রমুখ অগণিত লোকের অসংখ্য নাম সর্বদা ঠোঁটাগ্রে ছিল এবং শুধু ঐ সমস্ত লোকের নাম বলেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, ঐ সমস্ত পরিবারের দাদা-দাদী, নানা-নানী থেকে আরম্ভ করে নাতী-নাতনী পর্যন্ত প্রতিটি নাম তাঁর মুখস্থ ছিল।

কলেজ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে প্রায়ই তিনি বলতেন, 'দেখ বাছেত, একজন মহান ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত করে আমি এই কলেজটা করেছি, তোমরা বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে কলেজটা যাতে ধ্বংসের দিকে না যায় এবং এমন একটি মহান নামের স্মৃতি যেন মুছে না যায়।' একবার সুযোগ পেয়ে বুকে সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'হুযুর, নিজের নাম, বাপের নাম বা পরিবারের কোন নাম না দিয়ে আপনি একজন পশ্চিমা লোকের নামে কলেজটা করলেন কেন?' উত্তরে তিনি রাগতস্বরে বলেছিলেন, 'মওলানা মোহাম্মদ আলী কত বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং কত বড় মহান ব্যক্তি ছিলেন, তা তোমরা জান না বলেই এসব প্রশ্ন কর। যদি জানতে তাহলে করতে না। আমি তাঁর গুণে, তাঁর আদর্শে, তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েই তাঁর নামে কলেজটা করেছি। এই কলেজ থেকে যদি দু-একটা ছেলেও তাঁর মত পণ্ডিত হয়ে বের হতে পারে তাহলেই কলেজের নামকরণ সার্থক হবে।'

বাংলাদেশ হওয়ার পর এই কলেজের আর্থিক অবস্থা আবারো যখন শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং কলেজটিকে সরকারীকরণের দাবী ওঠে তখন

www.pathagar.com

উর্ধ্বতন মহল থেকে চাপ আসে কলেজের পশ্চিমা নাম বদলিয়ে ওটাকে 'ভাসানী কলেজ' করার জন্য। কিন্তু মওলানা ভাসানী মওলানা মোহাম্মদ আলীর প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, কলেজের ঐ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও তিনি কলেজের নাম বদলাতে রাজী হননি বরং ক্রোধভরে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের প্রতি এত অন্ধ বিদ্বেষ থাকলে, পাকিস্তানের চেয়ে আরো পশ্চিমের নবীকে বদলিয়ে একজন বাঙ্গালী নবী বানিয়ে নিলেই পার তোমরা (অধ্যাপক আবদুল গফুরের 'মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক মওলানা ভাসানী' থেকে।) বলা বাহুল্য তাঁর এই দৃঢ় মনোভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত 'মোহাম্মদ আলী কলেজ' নামেই কলেজটির সরকারীকরণ হয়েছে।

সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ১৯৭৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর রূপরেখা ঠিক করে তিনি সেটা অনুমোদনের জন্য তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট পাঠান। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় রাখার সুপারিশ করেন। ভাসানী সাহেব তখনও তাঁর আদর্শে অবিচল থেকে ঘৃণাভরে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আসলে আদর্শ প্রতিষ্ঠারই লড়াই। এর আদর্শ ইসলাম ও রবুবিয়াত প্রচার। এতে মওলানা ভাসানীর নাম সংযোজন মানেই বিসমিল্লাতেই গলদ—রবুবিয়াতের বরখেলাফে নফসানিয়াত কায়েম করে দেয়। আমি একজন একক ব্যক্তি। আর ইসলাম একটি সুমহান আদর্শ, বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। কাজেই আমি তোমার পরামর্শ মেনে নিতে পারলাম না।'

অন্য নেতাদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই। নিজের নামে বা বাপ-মায়ের নামে কিছু করার জন্যে নেতারা যেখানে জানমাল কুরবান করে দেন মওলানা ভাসানী সেখানে নিজের নামে করার জন্য উপর মহল থেকে প্রস্তাব ও চাপ আসার পরও ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন—এর চাইতে মহানুভবতা মানুষের জীবনে আর কি হতে পারে।

এখানে একটা বিষয় স্মরণ রাখার যোগ্য যে, ভাসানীর নামে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হয় নি বলে ভাসানীর নাম সেখান থেকে মুছে যায় নি বরং মানুষের অন্তর-ফলকে সে নাম আরো গভীরভাবে খোদিত হয়ে আছে এবং

www.pathagar.com

এখন তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর কোন নিন্দুকেরাও (যদি থাকে) এ কথা বলতে পারবে না যে,—ভাসানী তাঁর নাম-যশের জন্যেই এসব করে গিয়েছেন। যাঁরা মহান, তাঁদের চিন্তাধারা এইরূপ মহানই হয়ে থাকে।

হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ

হক্কুল্লাহ, হক্কুল এবাদ ও হকুমাতে রব্বানিয়া—এই শব্দগুলো তিনি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন ও বলতেন, 'তোমরা শুধু হক্কুল্লাহ নিয়ে অর্থাৎ নামায-রোযা-এবাদত-বন্দেগী নিয়েই ব্যস্ত থাক ; কিন্তু হক্কুল এবাদ অর্থাৎ বান্দার হক্, মানে মানুষের সেবাও যে ধর্মের একটা বিরাট অঙ্গ—এ কথাটা তোমরা মোটেই খেয়াল রাখ না।' বুভুক্ষু মানুষের পেটে আহার তুলে দেওয়াও মহাপুণ্যের কাজ, ধর্মেরই একট বিরাট অঙ্গ। আর হকুমাতে রববানিয়া সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্র জমীনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম করাই হকুমাতে রব্বানিয়া।' হক্কুল এবাদ সম্বন্ধে মনে প্রাণে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি মজলুম জননেতা হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর কথা ছিল—কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লাহতা'আলা দুনিয়াতে যখন মানুষকে তাঁর খলীফা হিসেবে পাঠাতে চাইলেন, তখন সেই মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি, রূপরেখা, চেহারা-সৌন্দর্য কি হবে আল্লাহ্তা'আলা তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে, মনের সেই কল্পিত মানুষটির পূর্ণরূপ দিলেন—আদম আলাইহি সাল্লামের উপর। মওলানা ভাসানীও শিক্ষাঙ্গনের যে ছবি অন্তরে এঁকেছিলেন, যে শিক্ষার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার পূর্ণরূপ দিয়ে গিয়েছেন 'সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একদিকে যেমন আধুনিক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষায়ও তারা পিছিয়ে থাকবে না। আবার গোড়া ধর্মীয় ভাব নিয়ে কোন সাম্প্রদায়িকতারও সৃষ্টি করবে না। তাছাড়া বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে এবং একজন গরীব ছাত্র যাতে নিজের উপার্জিত অর্থেই নিজের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে, তজ্জন্য উচ্চ শিক্ষার পাশে প্রত্যেক ছাত্রকেই তার পছন্দ মোতাবেক যেকোন একটি কারিগরি শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নামেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'ইসলামী' কথাটা আছে বলে অন্য ধর্মের বা সম্প্রদায়ের লোকের মনে যাতে কোন রকম সন্দেহ বা সংশয়ের উদ্রেক না হয় সেজন্য তিনি বলেছেন, 'ইসলামী শিক্ষা কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নহে, ইহা অসম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন। জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত।'

১৯৭০ সালে পাকিস্তান আমলেই তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রূপরেখা তৈরী করে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। সন্তোষে কয়েকটি সম্মেলন ডাকেন, চৌদ্দটি দেশের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারীর প্রস্তাব নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত গিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা সফল হয়ে ওঠে নি। এমতাবস্থায় আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার নেওয়ার প্রস্তাব আসে; কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে ভাসানী সাহেব সব সময় ছিলেন অটল, তাই ঐসব প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ থেকে তিনি এ নিয়ে আবার চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হাত দেন। সন্তোষ জমিদার বাড়ীর আশেপাশে প্রায় এক শত একর পরিত্যক্ত, খাস ও বন্দোবস্ত নেয়া জমি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলেন এবং গৃহ-নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও শিক্ষা-সরঞ্জামাদি তৈরীর ব্যাপারে বহু টাকা খরচ করে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের জন্যে আহ্বান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে শেখ মুজিব অর্ডিন্যান্সের খস্‌ড়ায় 'মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়' রাখার সুপারিশ করেন, যা মওলানা ভাসানী আদর্শের প্রশ্নে প্রত্যাখ্যান করেন।

পরে অবশ্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্যে সরকারী অনুদানের ভিত্তিতে (প্রতি বৎসর ৩০ লাখ টাকা) বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হয়েছে এবং চলছে। কিন্তু আপসোস এই যে, মওলানা ভাসানীর সাধের ও স্বপ্নের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ কার্যকরী রূপ বা চেহারা জীবদ্দশায় তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তবে ঠিকমত চালু থাকলে তাঁর বিদেহী

www.pathagar.com

আত্মা পরপারে থেকেও খুশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি প্রকল্প ও ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ৫টি আবাসিক হোস্টেল। প্রকল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে নার্সারীসহ একটি প্রাইমারী স্কুল, একটি আবাসিক বালিকা প্রাইমারী স্কুল, একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি আবাসিক বালক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, একটি হেফজখানা, একটি ভোকেশনাল প্রজেক্ট এবং একটি হাঁস-মুরগীর খামার।

উপসংহার

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে, সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক বনেদী খাঁ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (পিতা হাজী শরাফত আলী খান) এবং ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর, বুধবার তিনি তাঁর লক্ষ-কোটি ভক্তকে চোখের পানিতে ভাসিয়ে পরলোকে গমন করেন। সন্তোষে তাঁর সাধের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে তিনি চির-নিদ্রায় শায়িত আছেন। মৃত্যু মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে নেয়, দুনিয়ার মানুষও ক্রমশ মৃত ব্যক্তিকে ভুলে যায়; কিন্তু মওলানা ভাসানী মরেও অমর হয়ে আছেন। তাঁর ভক্তরা ত তাঁকে দিনে-রাতে ফুল দিয়ে মনের অর্ঘ্য নিবেদন করছেনই; কিন্তু সব চেয়ে বড় আশ্চর্য এই যে, জীবনে যাঁরা তাঁর ধার-কাছ দিয়ে যান নি, মরণে তাঁরাও বিরাট বিরাট ফুলের মালা গেঁথে তাঁর মাযারে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। এর চেয়ে বেশী সৌভাগ্য ক'জনের হয়? জীবনে ফুলের মালার চাইতে মরণে ফুলের মালার দাম অনেক বেশী।

তিনি যে কত বড় মহান ছিলেন এবং তাঁর বিরাটত্ব যে কত ব্যাপক ছিল তা সবার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তাঁর শাগরিদদের নিকট তিনি ছিলেন একজন কামেল পীর, সাধারণ মুসলমানদের নিকট তিনি ছিলেন একজন মুসলিম নেতা, কম্যুনিস্টদের নিকট তিনি ছিলেন 'বাংলার মাও সেতুং', মজলুমদের নিকট তিনি ছিলেন মজলুম জননেতা, আর যে-কোন বিদ্রোহ-আন্দোলনে তিনি ছিলেন তিতুমীরের মত বীর সৈনিক। জনগণের কল্যাণে যে-কোন আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে তিনি এতটুকু দ্বিধা করতেন না। তার এক বিরাট প্রমাণ—মৃত্যুর আগে তাঁর ফারাক্কা মিছিল

www.pathagar.com

সংগঠিত করা ও সশরীরে তাতে যোগদান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আগুনে ঝাপ দিয়ে কোনদিনই তিনি আগুনে পুড়ে মারা যান নি বরং সেই আগুনই নির্বাপিত হয়ে তাঁকে করে তুলেছে সুমহান। আদতে তিনি ছিলেন এক বিরাট বট-বৃক্ষ যার মধ্যে শালিক, ময়না, টিয়া, তোতা-পাখী থেকে আরম্ভ করে কাক-চিল-ঈগল পর্যন্ত সব ধরনের পাখী নিরাপদে নির্বিঘ্নে বাসা বাঁধতে পারত অথবা তিনি ছিলেন ভারত মহা-সাগরের মত এক বিরাট সমুদ্র, যার মধ্যে অসংখ্য নদী-নদী তাদের সাদা পানি, ঘোলা পানি, কালো পানি, নীল পানি নিয়ে এসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেত।

www.pathagar.com

কাজী মোহাম্মদ রশিদুল আলম

স্বাধীনতার স্থপতি ও আপোষহীন বিপ্লবী মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন ত্যাগী ও আপোষহীন বিপ্লবী নেতা। আমরা যদি বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ত্যাগী বিপ্লবী নেতা দুনিয়াতে বিরল। তিনি ছিলেন ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত একজন সার্থক দেশদরদী। তাঁর রাজনীতি ছিল মানুষের সর্বপ্রকার অবিচার ও শোষণ নিপীড়নের মুক্তির রাজনীতি। তিনি কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আজও তাঁর নেতৃত্ব সমানভাবে সক্রিয় রয়েছে। দেশে আজ যাঁরাই বিপ্লব ও সংগ্রাম করে চলেছেন তাঁদের অধিকাংশই তাঁর কাছ থেকে হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় পরোক্ষভাবে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত। আজ দেশে যতগুলো দল রাজনীতিতে পদচারণা করছে তার প্রায় সব কয়টি মওলানার কাছ থেকে সবকপ্রাপ্ত।

মওলানা ভাসানী অন্যায়, অবিচার, শোষণ, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে আপোষহীন, দুর্দান্ত দুঃসাহসী সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তা তাঁর চরম শত্রুরাও একবাক্যে স্বীকার করেন।

দেশ থেকে স্বৈরশাসন, নির্যাতন, জুলুম ও অবিচার দূর করে জনসাধারণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মওলানা ভাসানী যে নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও বিপ্লব করেছেন তদানীন্তন পাকিস্তান রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সীমান্ত প্রদেশের ডা. খান সাহেব তার স্বীকৃতি দেন। ডা. খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের মেজরিটির বলে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য ডা. খান সাহেব মওলানা ভাসানীর সমর্থিত প্রতিনিধিকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী বানাবেন

www.pathagar.com

বলে মওলানা ভাসানীর নিকট প্রস্তাব দেন। আওয়ামী লীগ তখন পাকিস্তান গণপরিষদের ১১ জন সদস্যের সমর্থিত সংখ্যালঘু দল। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। উভয় পাকিস্তান মওলানার সংগ্রাম ও বিপ্লবে গণজাগরণে উদ্বেলিত। স্বৈরশাসনের উৎখাতের লক্ষ্যে এবং জন-সাধারণের মুক্তির স্বার্থে ডা. খান সাহেবের প্রস্তাব মেনে নিয়ে মওলানা ভাসানী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধান মন্ত্রী বানানোর প্রস্তাব দেন। ডা. খান সাহেব কথা রাখেন। পাক গণপরিষদে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাব-লিকান পার্টির সমর্থন দিয়ে পাক গণপরিষদের সংখ্যালঘু পার্টির নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী বানালেন মওলানা ভাসানীর বদৌলেতেই। হায় কপাল! শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসে অল্প দিনেই অন্যরূপে আবির্ভূত হলেন। এতকাল ধরে মওলানা ভাসানীর সাথে জনগণের মুক্তির স্বার্থে স্বৈরশাসনের উৎখাতে তখন যে সব কথা বিশাল বিশাল জনসমুদ্রে বলে এসেছিলেন প্রধান মন্ত্রীর গদি পেয়েই তা শুধু তিনি বেমালুম ভুলেই গেলেন না, বিরুদ্ধাচরণও করতে লাগলেন। মওলানা ভাসানীর যাবতীয় নীতিরই সোহ্‌রাওয়ার্দী বিরোধিতা করতে থাকেন। স্বৈরাচারী সরকার ও জালেমদেরকে প্রতিপক্ষ না করে মওলানা ভাসানীকেই সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান প্রতিপক্ষ করে আঘাত হানতে থাকেন। মওলানা ভাসানী দুর্দান্ত মহাতেজী পুরুষ। তিনি তাঁর নীতিতে অবিচল হিমালয়ের মত দাঁড়িয়ে, মাথা না নুইয়ে, না পালিয়ে যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিহত করতে থাকেন। হায় আফসোস! তখন তাঁরই গড়া ইত্তেফাক তাঁরই সাহায্যে লালিত হয়ে মওলানার কুৎসা রটিয়ে ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে রাজনীতির গগন থেকে মওলানাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মওলানা ভাসানী নীতির কাছে তাঁর সাধের গড়া আওয়ামী লীগ, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও ইত্তেফাককেও ত্যাগ করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে এতদিন পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে এক ইউনিট গঠন করার তীব্র প্রতিবাদ করে এলেও দেখা গেল সোহ্‌রাওয়ার্দী এক ইউনিট রক্ষার পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছেন। এমন কি পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের সকল সদস্য এক ইউনিট গঠন করার প্রতিবাদে পার্লামেন্ট সভা বর্জন করে চলে এলেও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী গদি পেয়ে তা হজম করে এক ইউনিটের পক্ষে থেকে যান। এদিকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সারা পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এক ইউনিটবিরোধী তীব্র গণবিক্ষোভ ও আন্দোলন সোচ্চার হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। এমন কি বলতে থাকেন এক ইউনিট বিরোধিতাকারীরা রাষ্ট্রের ধ্বংসকারী। তিনি প্রধান মন্ত্রীর গদি পেয়েই বলতে থাকেন স্বায়ত্তশাসন দাবী হলো ভাওতাবাজী আর শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। স্বৈরাচারী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সংঘর্ষে না যেয়ে মওলানা ভাসানীর সংগে তাঁর সংঘর্ষের তীব্রতা ক্রমশ বাড়াতে থাকেন। এটা হল ১৯৫৭ সালের কথা।

মওলানা ভাসানী আজীবন গরীব মেহনতি মানুষের মুক্তির রাজনীতি করেছেন। গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। সাম্য ও ইনসাফের সমাজ গঠন করতে সর্বস্তরে জীবনভর মেহনত করেছেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্বের নীতিবিচ্যুতি, সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী ঘেঁষা রাজনীতির সঙ্গে তিনি আপোষ করতে পারেন নি। বাধ্য হয়ে গড়ে তোলেন সর্বস্তরের মানুষের মুক্তির সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রী থাকা কালেই ১৯৫৭ সালে এই পার্টিকে তিনি গঠন করে এ দেশে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের এক শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীর জনসমর্থন ছিল অনেক বেশী। ১৯৫৭ সালের ৬ থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারীতে কাগমারীতে যে রাজনৈতিক, শিক্ষা, শিল্প, ধর্মীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানী-গুণীদের সমন্বয় ঘটে। মওলানা ভাসানীর সর্বস্তরের জনপ্রিয়তা দেখা যায় সত্যই অনন্য। মওলানা ভাসানীর এই কাগমারী সম্মেলন এ দেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করে তা অনন্য চেতনায় ভাস্বর। সেদিন কাগমারীতে দেশের ও বিদেশের সর্বস্তরের লোকের ঢল নেমেছিল, লাখ লাখ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল মওলানা ভাসানীর সর্বপ্রকার নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় এবং সর্বহারার মুক্তির যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা পেশ করা হয়েছিল তা মওলানাকে এক প্রধান পুরুষ ও কিংবদন্তীর মহানায়কে পরিণত করে। পাকিস্তানের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, গণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সকল প্রাদেশিক মন্ত্রী ও সদস্যগণ এই মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। তাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী যেন তিন দিনের জন্যে কাগমারীতে স্থাপিত হয়ে যায়। এই সম্মেলনে সকল শ্রেণীর মেহমানদের থেকে শুরু করে সকল মন্ত্রী এমন কি প্রধান মন্ত্রীর অবস্থান ও বাসস্থানের পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়

www.pathagar.com

সন্তোষের পাঁচ আনি রাজবাড়ীর কম্পাউণ্ডে তাঁবুতে। এই কাগমারী সম্মেলনের কর্মকাণ্ডে মনে হয় যেন কোন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠার সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানের তদানীন্তন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মি: হোরেস হিলড্রেথ (Horess Hildreath) কাগমারীর এই জনসমুদ্র দেখে প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ঠাট্টা করে বলেন, 'অল পাকিস্তান ইজ রানিং বিহাইণ্ড মওলানা ভাসানী নট বিহাইণ্ড দি প্রাইম মিনিস্টার, মি. সোহ্‌রাওয়ার্দী।'

সেদিন কাগমারী সম্মেলনের সভাপতি মওলানা ভাসানী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বিশাল জনসমাবেশে বজ্রকন্ঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেভাবে শোষণ, জুলুম ও অবিচার ও বেইনসাফি চালিয়ে যাচ্ছে তা এখন থেকে যদি কমাতে চেষ্টা না করে তবে তাদের সাথে আমাদের আর একত্রে থাকার প্রয়োজন নেই। এখন হতে আমরা তোমাদের বিদায় সালাম আস্‌সালামু আলায়কুম জানাই।' মওলানা ভাসানীর এই ঘোষণার সাথে সাথে নারায়ে তাকবির—আল্লাহু-আকবার, মওলানা ভাসানী—জিন্দাবাদ শ্লোগানে শ্লোগানে বিশাল জনতা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। সেদিন কাগমারীর বিভিন্ন প্রদর্শনী, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকজনের আনন্দ দেখে ও কথাবার্তা শুনে প্রধান মন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্তব্য করেন, 'হামি এখানে লাল মিয়াদের গন্ধ পায়।'

সেদিন লাল মিয়া বলতে প্রধান মন্ত্রী সাহেব বিপ্লবী কম্যুনিস্টদের বুঝাতে চেয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানী অতি নিরপেক্ষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক ও স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে যে চুলচেরা অভিযোগ এনেছিলেন এবং ভবিষ্যতের মহাঅমঙ্গলের প্রতি যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে রাগে-গোস্বায় বলেন, 'মওলানা সাহেব পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার জন্য আস্‌সালামু আলায়কুম বলেছেন। তাই আমি প্রধান মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিব, আর মওলানা সাহেব যদি চান তবে এখনই আমি ইস্তফা দিতে পারি।' পূর্ব পাকিস্তানের অন্যায়, বঞ্চনা ও ন্যায্য স্বার্থের কথা বলাতেও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী রাগে বেসামাল হয়ে পড়াতে দেশবাসী অমঙ্গলের প্রমাদ গুণতে থাকে। ভাসানী প্রধান মন্ত্রীর সন্তুষ্টি, তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বিনষ্টের তোয়াক্কা না করে পূর্ব পাকিস্তানের অবিচার ও বঞ্চনার প্রতিকারের দাবী জানাতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, দূরদর্শী নেতা। তাঁর চিন্তাচেতনায় মানবতা, দেশপ্রেম তথা খেটে খাওয়া ও সর্বহারা মানুষের জন্য মমত্ববোধও ছিল প্রবল। তিনি জীবনকে দেখেছেন মাটির অতি নিকট থেকে। কাদা মাটি থেকে উত্থিত এই মহান নেতা মানুষের কল্যাণের কথাই শুধু চিন্তা করে যান নি, মজলুমের মঙ্গলের জন্যে সারাটা জীবন জালিমের অস্ত্রের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

তিনি সর্বহারা, মজলুম ও ব্যথিতের পক্ষে জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। তাঁর বহু কর্মকাণ্ড কিংবদন্তীর কাহিনীকেও অতিক্রম করে গেছে। তাই তাঁকে দেখা যায় সংসার, সমাজ, রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে থাকা শিক্ষা-দীক্ষাহীন গরীব ফকির কাগমারীর হযরত শাহ্ জামান (র.)-এর সন্তোষ-এ মাযারের খাদেম কালু ফকির, গৈজুদ্দি ফকিরের পাশে দাঁড়িয়ে মহারাজার অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের প্রতিবাদে লড়তে। মওলানা ভাসানী স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে বন্যায় প্লাবিত টাঙ্গাইলের উপদ্রুত অঞ্চলে ত্রাণকার্যে ঝটিকা সফরে অতিবাহিত করার সময় কালু ফকির ও গৈজুদ্দি ফকির তাঁকে জানান তাদের প্রতি সন্তোষের জমিদারের অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের কথা। তাঁরা মওলানাকে এইটুকু মাত্র জানান যে, হযরত শাহ্ জামান (র.)-এর বিরাট সম্পত্তিও সন্তোষের মহারাজা আত্মসাৎ করেছেন। এই সম্পত্তি থেকে অনেকগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নামাযের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচাদি রাজবাড়ী থেকে রীতিমত বহন করার কথা। কিন্তু মহারাজা তা করেন না। বরং খাদিম মাযার পরিচালনার জন্য যে সকল চাঁদা ও জিনিষপত্র সংগ্রহ করে তাও মহারাজা বন্ধ করে দিয়েছে। তখনকার দিনের বড় জমিদার ও মহারাজা সন্তোষ—যিনি তদানীন্তনকালে বাংলার বৃটিশ লাট বাহাদুরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলার ছিলেন তার সামান্য অবিচার ও জুলুম---মাযারের দুইজন গরীব ফকিরের অভিযোগে তার প্রতিকারে দাঁড়াবে, এ রকম হিম্মতওয়ালা বীরপুরুষ সারা বাংলায় কেন, বিশ্ব খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। অতি অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্যের ব্যাপার, ত্রাণকার্যের সমাপ্তির অল্পদিনের পরই তিন টাকা মাসিক বেতনের মসজিদের ইমাম মোল্লা ভাসানীকে তালের আঁশের টুপি মোটা লুঙ্গিপরা হালে বিনা টাকা-পয়সা ও লোকজন সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কালু ফকির ও গৈজুদ্দি ফকিরের পাশে এসে মহারাজা সন্তোষের অন্যায় ও জুলুম রোধের প্রতিকারের সলাপরামর্শ করতে দেখা যায়। তাঁর চিন্তাধারা যাদুমন্ত্রের মত তড়িৎগতিতে সকলকে

www.pathagar.com

হতবাক ও বিস্মায়বিভূত করে দেয়। মওলানা ভাসানী হযরত শাহ জামান (র.)-এর মাযারের বন্ধকরা শিন্নি চালু করার জন্য কয়েক শত মণ চাউল, মরিচ-পিঁয়াজ, ২০/২৫টা খাসি, ১৫/২০টা গরু দুই একদিনেই সংগ্রহ করে অতি মহাধুমধামের সংগে হাজার হাজার লোকজনদের আছুদা করে গরুর গোস্তের শিন্নি খাইয়ে দেন। মহারাজাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মুসলমান তথা এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ মওলানার নেতৃত্বে শোষণমুক্ত জীবনের আস্বাদন লাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সন্তোষকে মওলানা ভাসানী পরবর্তীকালে বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চিরনিদ্রায় সেখানেই তিনি শায়িত রয়েছেন।

www.pathagar.com

এস. এম. শাহজাহান তালুকদার

শতাব্দীর সূর্য-সৈনিক মওলানা ভাসানী

১.

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে এক প্রদীপ্ত সূর্য ; স্বকৃতিত্বে কীর্তিমান সুমহান ব্যক্তি। যে কোন রাজনীতিকের জীবন ও রাজনীতি বিষয়ক গতানুগতিকভাবে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় স্বাভাবিকভাবে সেসব প্রশ্নের উর্ধ্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী। যদিও তিনি রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যক্তি-বিশ্বাসের প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু আসলে এসব সমালোচনা ছিল সমালোচনার খাতিরে। সমালোচনার ভেতর সারবত্তা ছিল না কিছুই। এর কারণও ছিল যুক্তিযুক্ত—তা হচ্ছে তাঁর বিশাল জীবন-কর্ম এবং চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সমালোচকরা ছিলেন মূলত অজ্ঞ এবং নিজস্ব স্বার্থের জোয়ালে আবদ্ধ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান—চিন্তাভাবনা-বিশ্বাস, কথা-কাজে এবং রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তি জীবনের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে একটি সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে বলিষ্ঠভাবে দেশ-জাতি তথা বিশ্বমানবের কল্যাণে অব্যাহত কর্মমুখর প্রচেষ্টার দ্বারা নতুন পথ নির্মাণের পথিকৃৎ। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন সংগ্রামের প্রতিটি পরতে পরতে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি প্রসারিত করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তিনি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুপ্রশস্ত মহাসড়ক নির্মাণ করে গেছেন। তাঁর এই মহাসড়ক নির্মাণে সময়ের প্রয়োজনে অনেকক্ষেত্রেই বাঁক পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল, সে অপরিহার্য দিক পরিবর্তন মহাকালের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে, আরোপিত বা চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন ছিল না মোটেই।

মওলানা ভাসানীর জীবন যাপন, তাঁর রাজনীতির মূল উৎস সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা থাকলেই তাঁর সৃষ্ট মহাসড়কের অবয়ব, বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্যকেন্দ্র

www.pathagar.com

সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব। মওলানা ভাসানীর মূল্যায়ন তাই তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি থেকেই শুরু করা উচিত। তাঁর বিশ্বাস, আদর্শ এবং যাপিত জীবনের পরিমণ্ডলকে সামনে রেখেই রাজনীতি, ধর্মনীতি, সংস্কার-সেবার গতিপথকে উপলব্ধি করতে হবে। পূর্বেই বলেছি তিনি নতুন পথ নির্মাণের পথিকৃৎ অর্থাৎ বিশ্বমানবের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি নতুনভাবে রাজনীতির ধারণা ও কর্মকাণ্ডের বিন্যাস করেছেন। আর তার উৎসমূল থেকে বিকাশ পর্যন্ত যে সমন্বয় সাধন করেছেন সেটাই এক মহাসড়ক। এই রাজনৈতিক বিন্যাস কি, তার লক্ষ্যই বা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

২.

'রাজনীতি' মূলত জনগণের কল্যাণে বিশাল এক কর্মকাণ্ডের সার-শব্দ। রাজনীতি চর্চার প্রয়োজন ও এর উৎপত্তি শুধুমাত্র মানব জাতির কল্যাণেই; পৃথিবীর জমিন ভাগবাটোয়ারা করে সীমানা নির্ধারণসহ শাসক-শাসিতের শ্রেণীবিন্যাস নয়। অবশ্য কল্যাণের তাকিদেই এই সীমানা-নির্ধারণ এবং শাসক-শাসিতের সৃষ্টি হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ-সাধন। এই কল্যাণ সাধনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরাই রাজনীতিক আখ্যায় ভূষিত, জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিনিধির চিন্তাভাবনা-বিশ্বাস থেকেই জন্ম লাভ করে মানব কল্যাণের কর্মপন্থা তথা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক জীবন গঠনের কর্মকাণ্ডের শাখা-প্রশাখা। সহজ কথায় বলা যায়, মানব কল্যাণে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মের মূল উৎস হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মীর চিন্তা-ভাবনা-বিশ্বাস। এই উৎসধারা থেকে প্রবাহিত পথ-পদ্ধতির বিকাশ লাভই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। এই দর্শনই জাতিতে জাতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। মূলত এই পার্থক্যটা হচ্ছে মৌলিক উৎসের পার্থক্য। যদিও পার্থক্যের মধ্যেও অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—তা হচ্ছে মূল উৎসের কতিপয় সাদৃশ্যেরই প্রকাশ এবং দুনিয়ায় বসবাস করার প্রশ্নে যেসব প্রয়োজনীয় প্রকৃতিদত্ত সম্পদ—তার উৎপাদন ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যেই।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনীতির উৎস মূলত তাঁর বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাসের গভীর থেকেই উপলব্ধি করতেন সারা পৃথিবীর

www.pathagar.com

মালিক বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন মানুষ নয়; একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তা'আলা। আর মানুষ শুধুমাত্র তাঁর প্রতিনিধি। দেখাশোনা ও তদারকি করার দায়িত্বে আসীন। মৌলিক এই বিশ্বাসের উৎসমূল থেকেই তাঁর মানব কল্যাণের জন্যে রাজনীতি এবং তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিশ্বাসের পরিপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যারা শিকার তাদের পক্ষেই পরিচালিত হয়েছে। সহজভাবে তাঁর এই দর্শনকে মজলুমের রাজনীতি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জন্মগতভাবে কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়—বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তাঁর চিন্তা-ভাবনা-বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। সেই কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে স্রষ্টার নির্ধারিত বিধানে পরিপূর্ণভাবে আস্থা। সেই আস্থাকে ব্যক্তিগত জীবনে রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিলো নিজের জীবনে এবং এই রাজনীতির মাধ্যমে মানব কল্যাণ ও মুক্তির জন্যে আজীবন সংগ্রামী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া—রাজনৈতিক দল এবং কল্যাণমূলক অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠান।

৩.

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাসীরা এবং কম অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা তাঁকে তাঁর জন্মগত শ্রেণী অবস্থানকে খুঁটি ধরে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ মওলানা ভাসানী আধা-সামন্তবাদী কৃষকের সন্তান—যেহেতু সাধারণভাবে ক্ষয়িষ্ণু আধা-সামন্তবাদের শিকার হয়েছেন এবং মজলুম জনগণের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে, তাই তিনি এই মজলুম মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করেছেন। বিষয়টি একতরফা সিদ্ধান্ত। মজলুম মানুষ সবকালেই ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে—তা মওলানা ভাসানী বুঝতেন। কিন্তু মজলুম মানুষের প্রতি যখন মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ্‌ নির্ধারণ করেছেন তা অবহেলিত হচ্ছে; তখন সেই দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের তাকিদেই তিনি মজলুম জনতার সারিতে দাঁড়িয়ে তাদের মুক্তির জন্যে লড়েছেন। বিশ্বাসগত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁর এই রাজনীতির সিঁড়িতে অবস্থান। মজলুম জনতার মুক্তির সংগ্রামে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিন-মাওসেতুঙ যে রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে

www.pathagar.com

বিশ্বাসকেন্দ্রিক মহান আদর্শের উপস্থিতি নেই। ফলে তা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব—পরিশেষে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে অফুরন্ত ভোগবিলাসের আরামের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ ও অভ্যস্ত নতুন শোষকশ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। সাম্যবাদ মূলত আসাম্য-দানবের নতুন শৃঙ্খলে বন্দী হয়েছে যা আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অভিধায় চিহ্নিত। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের চেয়ে ভয়ঙ্কর। কেননা এ সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করা হয় এবং কঠিন শৃঙ্খলে একদলীয় শাসনের মাধ্যমে মূলত একটি শাসক-শোষক শ্রেণীরই স্বার্থ গড়ে তোলা হয়।

সর্বহারা শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির প্রবক্তা মার্কস মানব জাতির বিকাশ সম্পর্কে যে সূত্র উত্থাপন করেছেন—'মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস' মূলত তা কালের মহাপরীক্ষায় টিকছে না। কেননা মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে আদর্শ ও আদর্শহীনের মধ্যেকার সংগ্রামের ইতিহাস অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আদর্শবান আর আদর্শ বিচ্যুতদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। মানবজাতির এক অংশ বরাবরই একটি সঠিক সুমহান আদর্শ যা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌তা'আলা কর্তৃক প্রবর্তিত তা পালন করে আসছে এবং এই সুমহান চিরন্তন আদর্শবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই মূলত মানব জাতির ইতিহাস। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্রষ্টার বিধান বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। এই আদর্শ বা বিধান কায়েম করার লক্ষ্যেই নিবেদন করেছেন তাঁর রাজনীতি। ইসলামী বিধি-বিধান সর্বশেষ পরিপূর্ণ বিধান—তা তিনি বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনে এসে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন। তখন এই উপমহাদেশে বিদেশী শাসন-শোষণ চলছিল। বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম মূলত সীমালঙ্ঘনকারী আদর্শহীন একটি অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই নামান্তর।

দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের সংস্পর্শে থেকে আরো গভীরভাবে ঐশী বিধানের মর্মকথা জানার জন্যে তৎকালীন বুযুর্গ নাসিরউদ্দীন বোগদাদী (র.)-এর সান্নিধ্য লাভ মওলানা ভাসানীকে আদর্শ-সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রামী প্রেরণা যোগায়। বৃটিশ আমলে তাই বৃটিশ শাসক ও তাদের এদেশীয় সহচর-বন্ধু জমিদার শ্রেণীর সরাসরি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

আসামের লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলন তার পূর্বে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি তাঁকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তিসংগ্রামে সংযুক্ত করে।

বৃটিশ আমলে এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যে ধারায় এগিয়ে চলছিল তাকে বলা হতো সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগে যোগদান করেন উনবিংশ শতাব্দীর তিন দশকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের প্রশ্নে তিনি ছিলেন নিরাপোষ। যেহেতু বুর্জোয়া স্বাধীনতা বা সর্বহারা স্বাধীনতাই তাঁর রাজনীতির আদর্শ ছিল না; একটি ভূখণ্ডই লক্ষ্য ছিল না কিংবা বৃটিশ তাড়ানোর ভেতরেই ছিল না আদর্শ প্রতিষ্ঠার সমাপ্তি—তাই পাকিস্তানের শুরুতেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের রেখে যাওয়া কূটনীতির আশ্রয়ে যে রাজনীতিকবর্গ দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর আদর্শিক সংগ্রাম তীব্রতর হতে থাকে। এ সময়েই তিনি সাম্যবাদী রাজনীতির এদেশীয় ভক্ত-কর্মীদের নিজের কাছে টেনে আনেন। শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাসে তথা শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনীতিতে বিশ্বাসীরা তাঁকে ঘিরে সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন একথা সত্য। কিন্তু ভাসানী স্বীয় দর্শন সমাজ বিপ্লবের স্বার্থে সংযুক্ত করার জন্যে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনমুখর করে তোলার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বামপন্থী রাজনীতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন নি। আবার তিনি একজন বামপন্থী মার্কসীয় দর্শনের উত্তরাধিকার বনে যান নি। মূলত তাঁর রাজনীতির এই সন্ধিক্ষণের ভূমিকা নিয়েই তাঁকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে অধিক। কখনো মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানবিরোধী, কখনো ভারতবিরোধী, কখনো চীনের পক্ষে, কখনো ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে বলে মত প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। মূলত এর কারণ ছিল মানবতার শত্রুরা সর্বদা মওলানাকে ভয় করতো—তাঁর সত্যনিষ্ঠা এবং যুগোত্তীর্ণ ও সময়োপযোগী চিন্তাভাবনা—এবং দেশপ্রেমের সামনে কুচক্রীরা ছিল সতত বিব্রত।

মজলুম জনগণের মুক্তি লড়াইয়ে তিনি আসলেই ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। আর সেজন্যেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁকে অবমূল্যায়নে প্রয়াস পেয়েছে বেশী।

পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে দেখা যায় মওলানা ভাসানী একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। মুমিন ব্যক্তিত্ব—অপর

www.pathagar.com

দিকে মার্কসীয় দর্শনধারীরা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। ধর্মীয় কাজ-কর্ম তাদের কাছে ভাববাদী দর্শন এবং ধর্ম আফিমের সঙ্গে তুলনীয়। তৃতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে—এই মার্কসীয় দর্শনের ঢেউয়ে তখন সারা বিশ্ব প্লাবিত। মহাচীনে এর বিজয় লাভ। পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের সদ্যশিক্ষিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতিতে এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে। এ সময় মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানের গতানুগতিক শোষকদের তথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শিবিরের স্বার্থে রাজনীতি করতে হয় নতুবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বহারা রাজনীতির নেতৃত্ব দিতে হয়। তিনি তৃতীয় মতবাদে বিশ্বাসী অর্থাৎ ইসলামী আদর্শে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক। সময়ের দাবীকে মুকাবিলা করতে হয় সুকৌশলে। তিনি তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নিজের পক্ষে আনার জন্যেই বামপন্থীদের সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সক্রিয় হলেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামী আদর্শকে মজবুত করার জন্য জনগণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা অব্যাহত রাখতেও সচেষ্ট থাকলেন। বামপন্থীরা জনপ্রিয় নেতাকে তাদের দিকে টানতে সচেষ্ট হলেও সরাসরি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে সাহস পেলেন না। মওলানা ভাসানী ইসলামী আন্দোলন যে মূলত শোষণের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের উৎপাটনে অপরিহার্য তা পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করতে সক্ষম হলেন। বামপন্থী রাজনীতির কতিপয় বিষয় মূলত ইসলামী অনুশাসনের সঙ্গে সাদৃশ্য। আসল কথা হচ্ছে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা ইসলামী দর্শন থেকেই উদ্ভূত। এই বিষয়টি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যেই বামপন্থী রাজনীতির সামনের কাতারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এখানে আরেকটি কারণও ছিল নেপথ্যে ঃ পাকিস্তানের প্রথম দিকের এই রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো প্রতিবেশী দেশ থেকে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের চাবিকাঠি ছিলো মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদী একশ্রেণীর কট্টর নেতাদের হাতে। মুসলমান কম্যুনিস্টরা ছিলো তাদের হাতের পুতুলমাত্র। অবশ্য সকল মুসলিম নেতাই যে এ ভিন্ সংস্কৃতি ও নাস্তিক্যবাদী এবং পৌরাণিক ধর্মধারীদের খপ্পরে পতিত হয়েছিলেন তা নয়। কতিপয় মুসলিম নেতা নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে নির্যাতিত মানুষের পাশে থেকে সংগ্রাম চালিয়েছেন। মওলানা ভাসানী তাঁদের উৎসাহিত করতেন এবং কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কৃষকদের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সে সময় কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কমরেড আবদুল হক এই আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রভূত সফলতা অর্জন করেছিলেন—জনগণের, বিশেষ করে নির্যাতিত কৃষককুলের মুক্তির লক্ষ্যে আপোষহীন এক ব্যক্তিত্ব, বিপ্লবী নেতা হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতায়-সাহায্যে পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলন হতো পরিচালিত। এই মহামারী থেকে জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভাসানী ইচ্ছা করেই কাঁধে তুলে নেন। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায়, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির সৃষ্টি হয় কলকাতায় এবং পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বেশীর ভাগ নেতারা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের, হিন্দু এলাকায়ই ছিলো এর প্রাধান্য। প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোতে ছিলেন হিন্দু মেজরিটি। এই সম্প্রদায়ের নেতারা নিজেদের আজন্ম লালিত স্বপ্নকে সফল করার জন্য সুকৌশলে মুসলিমদের মধ্যে নাস্তিক্যতাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য মুসলমানী নামে পরিচিত হতেন। আন্তর্জাতিক লাইনের প্রশ্নে পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট আন্দোলন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর আশ্রয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে যারা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করতেন তাদের মধ্যেকার নেতা সুখেন্দু দস্তিদার এবং প্রকাশ্য মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাপ যে রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করেছিলো তার মূল নেতৃত্বে ছিলেন মণি সিংহ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান তাঁর আদর্শ-বিশ্বাসকে খোলাখুলিভাবে বলেছেন, তিনি কম্যুনিস্ট নন। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান। কম্যুনিস্টরা তাঁকে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের মানসে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে নি। সুযোগের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে সুযোগ তাদের আসেনি। ফলত বামপন্থী নাস্তিক্যবাদী রাজনীতি জনগণ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাহার করেছে। এখানে মওলানা ভাসানী মজলুম মানুষের মুক্তির সনদ মার্কসবাদ নয়—ইসলামী আদর্শ—তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪.

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ব্যক্তি জীবনে কোন্ আদর্শকে প্রতি-পালন করেছেন? তিনি আজীবন ইসলামী আদর্শকে ব্যক্তি জীবনে রূপদান

www.pathagar.com

করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁর এই যাপিত জীবনই ছিলো রাজনীতি। মানব কল্যাণে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই—তা নিজের জীবন যাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ইসলামের পরিপন্থী যে কোন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদ ছিল বলিষ্ঠ। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা জ্ঞানার্জন করা। তিনি জ্ঞান বিতরণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তা উপলব্ধি করেই জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য মক্তব-মাদ্রাসা-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। একাধিক কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ শেষ জীবনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছেন—রাজনীতি মূলত সমাজের কল্যাণেই এবং তা একমাত্র সম্ভব ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

এই উপমহাদেশে বৃটিশ আমলেই তিনি গণশিক্ষা বিস্তারে আসাম, বগুড়া, টাঙ্গাইল, রংপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। পাকিস্তান আমলে ক্ষমতার রাজনীতির পরিবর্তে সমাজসেবার রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে অসংখ্য বিদ্যালয়-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশ আমলেও তাঁর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে। নিজেকে জানার মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করতে হবে, এবং মহান ইসলামী আদর্শকে জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠা করেই সমাজ কল্যাণে সফলতার স্বাক্ষর স্থাপন করা যায়—এই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি ছিল প্রবহমান।

যেখানেই অন্যায়-অত্যাচার সেখানেই বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। মওলানা ভাসানী আজীবন অন্যায়-অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, আন্দোলন করে-ছেন। আর এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে কখনো জমিদার ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে, কখনো ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রীয় শাসকদের বিরুদ্ধে কখনো বৃটিশ-পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কখনো ক্ষমতায় গিয়ে শোষণের ভিত্ উপড়ে ফেলবেন এমন স্বপ্ন দেখেন নি। এর কারণও যথার্থ। কারণ হচ্ছে সমাজের অনাচার-অত্যাচার উপর থেকে উৎপাটন সম্ভব নয়। একমাত্র নৈতিক শিক্ষায় পরিবর্তন অর্থাৎ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যায়বোধ এবং অন্যায় প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে না পারলে ক্ষমতা গ্রহণ করে সুফলের প্রত্যাশা করা যায় না; মৌলিকভাবে সচেতন না হলে আইনের মাধ্যমে জনগণের মন-মস্তিষ্কে-চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়—তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন।

www.pathagar.com

সত্য-ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যে জাতির ভবিষ্যত নাগরিক তারাই সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করতে সক্ষম। সমাজ-নাগরিক গঠনে চাই সুশিক্ষা ও সুআদর্শ অর্থাৎ স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শের বাস্তবায়ন-লক্ষ্য শিক্ষা। এই আদর্শের আদর্শবান সৈনিকরাই সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম হবেন— এই লক্ষ্যেই মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এর জন্যেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল আমরণ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শুধুমাত্র স্বদেশবাসীর কাছেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরেন নি, তিনি আফ্রো-এশিয়ার মেহনতি মানুষের পক্ষে তাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান করেছেন। বাংলা-দেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন বার বার, বিশেষ করে ভারতের আগ্রাসী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদী। ফারাক্কা প্রশ্নে তিনি ঐতিহাসিক মিছিল পরিচালনা করে জনগণকে ন্যায় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন শেষ বয়সে। তিনি বারবার ভিন্ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশকে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে জনগণকে আহ্বান করেছেন। ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিজস্ব সংস্কৃতিবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে প্রখ্যাত কলামিস্ট খোন্দকার আবদুল হামিদ বলেছেন ঃ "মওলানা সাহেব ছিলেন বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ। কিন্তু তাঁর অন্তর বাঁধা ছিল মক্কা-মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারায়।"

৫.

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দীর্ঘ জীবনের রাজনীতি, সমাজ কল্যাণমূলক কর্মনিষ্ঠা ও যাপিত জীবনের মূল্যায়ন করা অতীব দুরূহ কাজ। সময়ের প্রয়োজনে তাঁর রাজনীতি ছিলো যুগোত্তীর্ণ। জীবন যাপনে তিনি ছিলেন তাঁর বিশ্বাসের কাছে সমর্পিত। সমাজ কল্যাণে ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপন, কথা ও কাজের সুবিন্যস্ত রূপই হচ্ছে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন নির্মিত মহাসড়ক। আর মওলানা ভাসানী ছিলেন এসবের সমন্বয়ে সমন্বিত এক ব্যক্তিত্ব। অপরাজেয় সূর্য-সৈনিক। জাতির অবিস্মরণীয় নেতা। ভবিষ্যত জাতি গঠনের পথিকৃৎ—পথপ্রদর্শক।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর উদ্দেশে নিবেদিত

কবিতা ও গান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আশরাফ সিদ্দিকী

দেশবন্ধু ভাসানীর নামে

সারাদিন সারাক্ষণ অকারণে ছুটছো কোথায়?
ঘরে আসো। ঘরে বসো। দেখো মাকে।
দেখো বোন ভাই-এর আননে, পিতার বিনিদ্র চোখে
কি করুণ সজল মিনতি!

ঘরে আসো। ঘরে বসো। দেখো মাকে।
দেখো দেশ। দেশের মানুষ। দেখো নদী।
মাঠ-ঘাট। ফুল ফল। বিচিত্র প্রকৃতি।
গোধনের হাম্বা রব। পাখীর কূজন।

কোথায় ছুটছো তুমি হে তরুণ—
হাতে বোমা, পকেটেতে এসিড, পিস্তল, চোখে ঠুলি,
কাকে মারবে আজ?

কাকে মারবে? কাকে খুঁজছো?

সে তোমারই দেশের মানুষ।
তোমারই মতন কত আদরের মায়ের দুলাল!

সেই হয়তো একদিন শেরে বাংলা দেশবন্ধু
মওলানা ভাসানী আর ওসমানী হ'ত...

কাকে মারবে? কাকে মারছো?

এদেশে মরেছে দেখো কত কত তীতুমীর
শত শত বরকত জব্বার রফিক ...
আর কত? আরও কত? আর কেন?

সারাদিন সারাক্ষণ অকারণে কি খেয়ালে
কার পাপে কোন্ লোভে কার মন্ত্রণায়—
মারছো গানের পাখী, মারছো নদীর সুর,
মারছো মাঠের কাব্য, বুকে জ্বালছো
ঘরে ঘরে শোকার্ত কারবালা ...।

ঘরে আসো। ঘরে বসো। শোনো সেই বজ্রকণ্ঠ—
উদাত্ত আহ্বান।

www.pathagar.com

আবদুস সাত্তার

মওলানা ভাসানী

পাশের যমুনা কিংবা ধলেশ্বরী নদীর কিনারে
যদি দেখি ধান চাল ভর্তি যতো নৌকোর বহর
মনে হয় নৌকো নয় মৌলানার বুকের ডহর
দাতার আযান যেন মাস্তুলের সুউচ্চ মিনারে।

চরের বাসিন্দা সব খুশীর পায়রা বুকে ফের
উড়ে যেতো খুঁটে খেতে ধানচাল ; এমন স্বভাব
দেখেছি সমগ্র চরে, যখনি হ্যাঁ, নেমেছে অভাব।
'চিন্তা কি আছেন পাশে মৌলানা ভাসানী আমাদের।'

যখনি অভাব দেখি, অন্যায় সে করে তোলপাড়—
নাভিশ্বাস উঠে এই ঘুণেধরা সমাজ জীবনে
তখন শুনতে পাই মৌলানার সাহসী হুঙ্কার ঃ
'বেক্কেলেরা পাবে না কি মনুষ্যত্ব জ্ঞান কোনো ক্ষণে।'

ঘুণেধরা সমাজের শায়েস্তায় তেজী মৌলানার
বেতের টুপির বেত চাবুকের মতো দরকার।

শামসুর রাহমান

সফেদ পাঞ্জাবী

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানী,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ

www.pathagar.com

সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তার বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলীময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জন সমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়; ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।

ঝাঁকা মুটে, ভিখারী, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজ সেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানী
সমস্ত দোকানপাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকসা, ট্যাকসি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যাণ্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, দপ্তর
যাচ্ছে ভেসে; যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর
হায়; আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।
বল্লমের মত ঝলসে ওঠে তার হাত বরাবর
অতি দ্রুত স্ফীত হয়; স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবী।

যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবী দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

আল মাহমুদ

ভাসানী : হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি

মওলানার টুপীওয়ালা উঁচু মাথাটি যেন
এক হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি।

www.pathagar.com

আমি এই পর্বতের পাশে মাঝে মধ্যে যেতাম
স্নিগ্ধ, যেন নিজের মধ্যে সমাহিত এক বাতাসের ফুৎকার।
বলতেন, কবিতা দিয়ে কি হবে? আগে চাই স্বাধীনতা
তারপর ভাত-কাপড়।

স্বাধীনতা আর ভাত-কাপড়ের পর আপনার আর কি চাই মওলানা।
নিরুত্তর মওলানা আমার বোনের রেঁধে দেয়া গলদা চিংড়ির মালাইকারীর
পেয়ালা উবুড় করে ঢেলে নিতেন পাতে।
প্রাচীন অজগরের মত নিঃশব্দ আহার
আহারের পর দাঁত আর দাড়িতে খেলাল।
বলুন এখন, এ অবস্থায় মানুষের আর কি চাই—
—না, এবার তুমি আমাকে যা খুশি শোনাতে পারো
এমন কি তোমার ডায়রীটা খুলে
আবোল-তাবোল যা খুশি।

আমার খাতাটি খোলার আগেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।
যেন রহস্যময় দূরাগত ভাঙনের শব্দ তার নাক দিয়ে
উপচে পড়ছে।

আর এক ঘুমন্ত পর্বতের পাশে
আমার পাণ্ডুলিপির সমস্ত শব্দমালা ফর ফর করে
ফড়িংয়ের মত উড়তে লাগলো।

ফজল শাহাবুদ্দীন

মওলানা ভাসানী

তুমি যেতে চেয়েছিলে ফারাক্কার কাছে
জেনেছিলে ফারাক্কা মানেই
এক ধরনের শত্রুতা
এক ধরনের শক্তি-মত্ততার নগ্ন প্রদর্শনী
জেনেছিলে ফারাক্কা আসলে একটি বিশাল
ষড়যন্ত্রের অন্য নাম

www.pathagar.com

দেখেছিলে ফারাক্কা সীমান্তের ওপারে নয় শুধু
অসংখ্য ফারাক্কা আছে এপারেও
যারা সুযোগ পেলেই খুলে দেবে
আমাদের তাজা রক্তের ভেতরের শত শত স্লুইস গেট
তুমি চিনেছিলে ওরা কারা
যারা আমাদের রক্তহীনতায় নিক্ষেপ করতে চায়
প্রতিদিন ক্রমাগত
তুমি বলেছিলে
ভেতরের এবং বাইরের সকল ফারাক্কাকে
গুঁড়িয়ে দিতে হবে
জানি সকল ফারাক্কাকে নিশ্চিহ্ন করার
শক্তি এবং সাহস
তোমার ছিলো
আজ সারা বাংলাদেশ প্লাবিত
তুমি আর একবার সত্য ভাষণের মতো
উজ্জ্বলতরো হও আমাদের রক্তে।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আমাদের মিলিত সংগ্রাম ঃ মৌলানা ভাসানীর নাম

শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে
হৃদয় নগরে
মুখের ভাষায় শুনি, বুকের সাড়ায় শুনি, চোখের তারায় দেখি নাম
মৌলানা ভাসানীর নাম।

পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণের কালাম—
কণ্ঠে শুনি তার। হতবাক সবিস্ময়ে দেখি
জীবনে জীবনে এ কী
মিলিত প্রাণের গতি ; কলকণ্ঠে আকাশ মুখর
বজ্রে আর ঝড়ে শুনি স্বচ্ছ স্বর

www.pathagar.com

মুখের ভাষায় শুনি নাম।
মৌলানা ভাসানীর নাম ॥

এই নাম শুনে যেন আশা পাই বুকে
দুঃখে সুখে
ঝড়ে ভগ্নধ্বজা দেখে শিবিরের বলি নিজ হৃদয়কে ডেকে--
"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"
এ তিমিরের রাত্রি হলে শেষ
যে নতুন প্রাণের উন্মেষ
আজ তারই রক্তঋণে, হতাশার সংক্রমণে ভীত--
অগণিত
মানুষের মুখে দেখি, বুকে দেখি, চোখে দেখি তারার জ্যোতির—
মৃদু রেখা। এক ডাকে দৃঢ় সংহতির—
উত্তরণ আশা যেন শুভ্র পাখা নতুন বলাকা
এ মিছিলে আসেনি যে, তারও চোখে সংগ্রামের অগ্নিরেণু মাখা।

কত না দুঃখের পথে এই দুঃস্থ দেশের জনতা
পেয়েছে আপন নেতা
সুবচনি রথ নয় তার,
নয় মিথ্যা অভিনয়ে মানুষের সাথে ব্যভিচার
তাঁর যৌবনে শিখা
কারাগারে, হাটে, মাঠে রেখেছে প্রাণের লিখা
নক্ষত্র সঙ্ঘের মত মূঢ়, মূক মানুষের জামাতে জামাতে
দিনে রাতে
বজ্রের আওয়াজ কেড়ে গেড়েছেন নতুন কালাম
মানুষ শুনেছে সেই নাম।
মৌলানা ভাসানীর নাম।

দেখেছি রাত্রির কালো পাখা
(দেখেছি পিশাচ সিন্ধু ঈগলের থাবা)
দেখেছি শ্যামল নীল আকাশের রক্তপটে আঁকা--
দুঃশাসন,

www.pathagar.com

সময়ের সঙ্কেত হরণ।
হাত তার ঘোরে দেশময়
সে হাতের তীক্ষ্ণ ছোরা সারা প্রাণময়।
কলম, লেখনি বন্ধ, গান স্তব্ধ, নাস্তি নাস্তি হৃদয় কন্দরে
মুক্তির ফসল কেটে কে যেন তা কারাগারে ভরে।
সাহিত্য কলঙ্কবতী, শিল্প দুঃস্থ, মানুষের দাস
নতুন ভয়ের মেঘে কালো হলো এমন বাংলার নীলাকাশ,
পলাতক স্তাবকেরা এবার শিল্পের ছদ্মবেশে
সাহিত্যের ছদ্মবেশে
বাজারে জমাট
দুদিনের খেলার আসরে, তারা আজ শিল্পের সম্রাট।
তখন ক্রন্দন শুনি, হৃদয়ের শিল্পী ওঠে কেঁদে
মাঝে মাঝে ক্ষোভে, রোষে সে কলম হাতে তোলে
হৃদয়কে তবু রাখি বেঁধে।
হতাশায় মর্মরিত হওয়ার নিঃশ্বাসে
অথবা আকাশে
পাঁচ কোটি মানুষের রুদ্ধরোষ দেখি ভেসে
আমার হৃদয়ে এসে মেশে।
বলি নিজ হৃদয়কে ডেকে—
"বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারি শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"
তখন হৃদয়ে পাই ভাষা,
দেখি তিনি মানুষের সকলের এমন কি আমাদেরো আশা।
নক্ষত্র সঙ্ঘের মত মানুষের জামাতে জামাতে
দেখি তিনি রাখী হাতে।
আমাদের মিলিত সংগ্রাম
মৌলানা ভাসানীর নাম।

www.pathagar.com

জাহানারা আরজু

বার বার মরে মরে বাঁচি

[মরহুম মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী স্মরণে]

এমন কিছু কিছু কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ কাঁপে মাটি জনপদ,
এমন কিছু কিছু লাভাস্রোতের ধূম্র উদ্‌গীরণ
সহসাই ভাসিয়ে নেয় দিনে দিনে জমে ওঠা পংকিলতার
জঞ্জাল, কিছু কিছু বিক্ষুব্ধ বৈশাখী ঝড় ঈষাণে বিষাণে
বাজে, মুহূর্তে ওলোট পালট করে দেয় ছকবাঁধা জীবনের
গতি, অশরীরী ছায়া ছায়া হয়ে মুখ বুঁজে পড়ে থাকি যখন
তখন সে কন্ঠধ্বনি, সে লাভাস্রোত, বৈশাখী ঝড় আমাদের
পথ দেখায়, শেখায় বেঁচে থাকার আর এক নাম!

সে অজেয় কণ্ঠধ্বনি, সে লাভাস্রোতে,
সে বৈশাখী ঝড় আবার নতুন দীক্ষায় দীপ্ত করে—
তাঁর উত্তোলিত বাহু, উন্নত শিরস্ত্রাণ—সে তাল টুপী,
সে তর্জনী সংকেত যেন এক মহাসমুদ্র ঢেউ হয়ে
ফেটে পড়ে—'খামোশ'—সেই উচ্চারিত সাবধান বাণী
অনাচার অবিচার—শোষণের গলা টিপে ধরে, সর্বকালের
নমরূদ ফেরাউন মীরজাফরদের ভিত্‌ নড়ে ওঠে—
দাবাগ্নি হয়ে জ্বলে ওঠে বাংলার ভিজে মাটি, কৃষাণের
পেশী, মাঝির বৈঠা, হালের বলদ, রাখালের বাঁশি।

মেঘ চুয়ানো ছনের কুটিরে কে ওই পুরুষ?
কে জাগে পুরুষ উমরের মতো?
কে জাগে পুরুষ দরবেশ—ঋষি তাপসের মতো?
দোয়া ও দরুদে মজলুমদের টেনে নেয় বুকের গভীরে
বটবৃক্ষের নিবিড় ছায়ায়।

মস্‌নদহীন কে ওই রাজা?
ক্লান্তিহীন যে একা একা হাঁটে নিরন্ন বাংলার
ঘরে ঘরে রাত্রি দিন—
বার্ধক্য লাজে নোয়ায় শির তার দীপ্ত পদতলে!

www.pathagar.com

শতাব্দীর সুতীক্ষ্ণ পীড়নের বলিরেখায় কুঞ্চিত
তাঁর মুখায়বব, কোন নিপুণ ভাস্করের খোদিত
এক কালজয়ী ইতিহাস হয়ে জাগে—
'ভাসানে'র সেই চর জাগে বাংলার মাঠে ময়দানে—
জীবনের নিভু নিভু শামাদানে জ্বলে সে নাম—
সে নাম শুনে শুনে আজো আমরা মরে মরে বাঁচি!

দিলওয়ার

মওলানা ভাসানী : স্মৃতি বহমান

প্রকৃতির গণমুখী পবিত্র শিল্পের রত্নদ্বীপে
সুহৃদ প্রহরী এক দুর্যোগ তাড়াতে এসেছিল
সেই কবি একদিন। শোনো, শোনো, নেশালু স্মৃতিরা,
সদর্থে লজ্জিত হও কৃষ্ণপক্ষে রক্তপাত করো।

কেননা স্বদেশে তার সময়ের মুণ্ডুপাত করে—
বহুকাল অসময়ে ঘটেছে রক্তের অপচয়,
সেই রক্ত আস্বাদনে কুকুর ও কাকের পিপাসাস
দেখা গেছে সন্তোষের বিকৃতি কৃষ্ণাভ প্রতিচ্ছায়া,

স্মৃতিরা চকিত কেন? অপদার্থ স্মৃতি সন্তানেরা
স্বগৃহে নিখোঁজ থেকে দিন কাল কাটিয়েছে তারা
এখনও কাটাবে নাকি? জানবে না ভাসানীর নাম?
শুনবে না প্রিয় রক্তে ডাকে কোন্ সান্ত্রী মোয়াজ্জিন?

বিক্ষুব্ধ বিলাস শুনে সমীরণ শিহরিত হয়
পদ্মা, সুরমা, যমুনা ও বঙ্গোপসাগর সীমানায়:
ঊর্মিময় বাংলাদেশে মানুষের ঊর্মিরা কেনো হায়
রইলো নিস্ফল আজো অস্তিত্বের সমূহ বিস্তারে?

মুক্তদ্বার মসজিদের যূঁইশুভ্র উন্মুক্ত চত্বরে
সুহৃদ প্রহরী হাঁটে, ঝড় নামে তাজের গম্বুজে
ঝড়ের আরেক নাম বেলাল, যায়েদ, জুয়েইবার
ফারুক, গিফারী, আলী নির্যাতিত মানব সন্ততি?

www.pathagar.com

নেশালু স্মৃতিরা শোনো রক্তমাংসে মোয়াজ্জিন ডাকে
সদর্থে সজ্জিত হও রত্নদ্বীপে কেননা এখনো
পায়নি একাত্ম ভোর নবান্নের জন্মের আযান
ঊর্মিময় বাংলাদেশে এসো লক্ষ দুঃখীর ভাসানী।

ফারুক মাহমুদ

আর একজন মওলানা চাই

আর একজন মওলানা চাই, একজন
হোক সে মাদ্রাসা পাশ
অথবা মাদ্রাসা ফেরত মওলবী,
কোটি মানুষের মনের মণি-কোঠায় যে দীপ্যমান
মওলানা—আমাদের মওলা, বন্ধু, দিশারী।

মোটা তহবন ময়লা পিরহান আর
তেলশিটে পড়া তালের টুপির লেবাসে
খাড়া আলিফের মতো শিরদাঁড়া;
মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে
জীবনে যে মাথা নোয়াবে না কোন দিন
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন প্রভুর পায়ে।

পুঁজিবাদের পুঁজপায়ীরা যার পিছু ধাওয়া করবে
—বলবে কমিউনিস্ট,
কামনিষ্ঠ কামরেডেরা যাকে পরিত্যাগ করবে মাঝ পথে
—বলবে প্রতিক্রিয়াশীল,
মজলুম মানুষেরা যার মুখে দেখবে
রাব্বানিয়াতের রোশ্নী-দীপ্ত মর্দে মুমেনের আদল,
হাতের তালুতে যাঁর জ্বলজ্বল করবে
মুহাম্মদের মুক্তিসনদ।

আর একজন মওলানা চাই
সুউচ্চ মিম্বরে দাঁড়িয়ে যে পাঠ করবে না
নিষ্প্রাণ খুৎবা,

www.pathagar.com

চাঁদির তাজের দীপ্তি ছড়িয়ে
জরিদার চাপকানে বাড়িয়ে দেহের ওজন
মেদুল চেহারায় চেকনাইয়ের চমক দেখিয়ে
ভুখা-নাংগা বর্ষণ ভেজা মুমূর্ষু মোমেনদেরে
অংগুলি সংকেতে দেখাবে না
সাত আসমান পারে বাগে-বেহেশ্‌তে
নহরের বাঁকে আনার-আঙুরের ক্ষেত।

আর একজন মওলানা চাই
মোটা তহ্‌বন ময়লা পিরহান আর
তেলশিটে পড়া তালের টুপির লেবাসে
বাংলার মাটির মানুষের কাঁধে হাত রেখে
খর বোশেখের চৌচির মাঠের আলে ব'সে
পুরানো হালটে এক হাঁটু কাদায় পথ চলতে চলতে
প্রমত্তা পদ্মার উত্তাল তরংগে দোল-খাওয়া
ডিংগির গলুইয়ে দাঁড়িয়ে
মাঠের কিষাণ ঘাটের মজুর, নদীর মাল্লাকে শোনাবে
দরাজ গলায় জংগী জেহাদের ডাক ঃ
"আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য বদলান না
যে জাতি আপন ভাগ্য বদলানোর কোশেশ করে না।"

গর্কি তুফানে প্রলয়ংকরী ঝড়ঝঞ্ঝায়
বর্গী হার্মাদ দস্যু লুটেরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
অকুতোভয়ে যে উচ্চারণ করবে ঃ
"খা-মো-শ্‌"।

মশাল মিছিলের পুরোভাগে
ক্ষিপ্ত গোলার গতিতে যে এগিয়ে যাবে
গড়িয়ে গড়িয়ে
ঘোষণা করবে ঃ
"সাদ্দাদ নমরুদ ফেরাউন কারুনেরা সব এক জাত
—তারা মানবাস্থিতে গড়া রংমহলায়
মানুষের খুন পান করে পাশব নৃত্যের আসর জমায়।"

www.pathagar.com

আর একজন মওলানা চাই
মোটা তহবন ময়লা পিরহান আর
তেলশিটে পড়া তালের টুপির লেবাসে
সজাগ, সচেতন—প্রয়োজনে একটু 'অনুদার',

ফেরাউন কারুনের আধুনিক মানসপুত্রেরা
চাদরে গতর ঢেকে,
আড়াল করে পাতলুনের বেল্ট, নেকটাই,
যার পয়জারের ধূলা মুছতে মুছতে
পিরহানের ঝুল বেয়ে কোলে উঠে বসে,
এক লাফে সোয়ার হয়ে জাতি ও জনতার কাঁধে,
দখল করে ক্ষমতার মসনদ
—বালাখানা গড়বার সুযোগ পাবে না আর।

ফজল-এ খোদা

মৌলানা ভাসানী

জীবনকে মহীয়ান করা যায়
কীর্তিকে অমর করা যায়
কে, কে সেই সুন্দর মানব!

মরণকে তুচ্ছ করা যায়
ব্যক্তিকে সহজ করা যায়
কে, কে সেই দুরন্ত পুরুষ!

যে নিরস্ত্র তবু যে সশস্ত্র
আশ্চর্য! বিস্ময় মানি—
সে মৌলানা ভাসানী।

আফজাল চৌধুরী

আরেক গিফারী তুমি

যেন বা গিফারী তুমি, এ কথা কি মানো তুমি
এই শতকের এই
পথে ফুটপাতে?

www.pathagar.com

ইউরোপ ও এশিয়ার উৎপীড়িত জনতার
অবিচল মুখ দেখি
তোমার পশ্চাতে
ঘনকৃষ্ণ আফ্রিকার, ল্যাটিন আমেরিকার
জর্জরিত প্রাণগুলো
দাঁড়ালো তো এসে —

তুমি যে তাদের হয়ে বলেছ অকুতোভয়ে
তুলেছ সহিংস ধ্বজা
দৃঢ় বিশ্বাসে
তোমার প্রচণ্ড কথা যতই শাণায় বৃথা
জালিমের গালভরা
হাসি খিলখিল
আমি দেখি দূর হতে আশীর্বাদ নিয়ে হাতে
পরলোক হতে দীর্ঘ
মনীষী মিছিল
সহাস্য ক্রপটকীন দৃঢ়কণ্ঠ বাকুনিন
সম্পূর্ণ টলস্টয়
যেন এক সাথে
সকলি অবাক হয়ে দেখলেন সবিস্ময়ে
আর এক গিফারীকে
মাইক্রোফোন হাতে
তোমার নেতৃত্ব থেকে উদ্বেলিত জনতাকে
গর্জন সমেত ওরা
যেতে দেখলেন
এমন প্রচণ্ড রোষ এশিয়ার অসন্তোষ
ধূমায়িত হতে দেখে
স্মিত হাসলেন।

রুষে উঠে ফুঁসে ওঠে জনতার চাপা ঠোঁটে
স্থিরতার বোধে ঘন
ঘোর প্রতিশোধ

www.pathagar.com

তেতে ওঠা ফুটপাতে, দ্রুত-পা ও দৃঢ় হাতে
শ্লোগানের ক্রোধে চেপে
আসে প্রতিরোধ
মুহূর্তেই জট বাঁধে গাঁইতি শাবল হাতে
সব মজদুর দুখী
সব ফরজন্দ
শোর ওঠে দূরে-কাছে মেহনতি রক্তে নাচে
আর হরতাল হৈ
আজ চাকা বন্‌ধ।

প্রাচীন হিন্দের পূর্বে এই জনপদ কবে
শত শত স্রোতে আসা
শোণিত ধারায়
আবাদিত হল আর অশ্বত্থ বটেরা তার
সাক্ষী হল জনতার
চলা ও ফেরায়
এই গ্রাম-জনপদ, বিশাল দীঘি ও হ্রদ
করুণ উদাম মাঠ
অকূল হাওরে
ছয়টি ঋতুর লীলা পাখিদের ডানা মেলা
কুয়াশা বিস্তার আর
কুসুমিত ভোরে
প্রতিদিন জেগে ওঠা, ক্লান্ত হয়ে ঘুমে লোটা
আম কাঁঠালের গন্ধে
হয়ে অচেতন
দারিদ্র্য ও মহামারী বার মাসে তের বারই
মৃত্যুনীল শংকাসহ
তুলে আলোড়ন।

তাই তো যে অসন্তোষে, এসে তুমি এ সন্তোষে
যে বৃক্ষটি পুতে দিলে
সে মহীরুহের

www.pathagar.com

আগ্নেয় ছায়ার তলে বড় হয় দলে দলে
অগ্নি-ফরজন্দগণ
আপন রূহের
যারা বিনা প্রতিবাদে মওলানার মতবাদে
শোষিত জনের হয়ে
কথা বলবেই
আগামী শতাব্দীতে ওদের চলার পথে
শত ফুলদল জানি
ফুটে উঠবেই।

মওলানা মৌন হলে আর কেউ নিষ্ঠাবলে
যুক্তি ও ভক্তির এই
সেতুর বন্ধনে
বাংলা ও অবাংলার শিশুদের মেলাবার
বিশাল বুকের মাঝে
স্নেহের বন্ধনে
শতাব্দীর শেষপাদে, বিবাদে ও বিসম্বাদে
হেন অঙ্গীকারসহ
আসবে কি কেউ?
এমন প্রবীণ বৃক্ষে এত ফুল অন্তরীক্ষে
এত ফল ভারসহ
ফোটাবে কি কেউ?
এমন নিপুণ করে আগুনকে দীপাধারে
সমস্ত জীবন ব্যাপী
যিনি জ্বাললেন
দুনিয়া সরাইখানা দেখে এই মুন্‌সিয়ানা
ভাবে মুসাফির
তাঁর ব্রত পাললেন।

www.pathagar.com

শামসুল ইসলাম

মওলানা ভাসানী

তোমরা তাকে যে নাম দেবে দাও
আমি তাকে নাম দিয়েছি নদী,
সর্বসহা জনহিতের ধারায়
পাহাড় কেটে চলেন নিরবধি।

চলার পথে জাগলে আঘাত ... বাধা
ক্ষুব্ধ রাগে উর্মিমুখর বেগ
চৌদ্দ কোটি বাহুর প্রতিঘাত
হানেন তিনি, হানেন খর তেগ্।

তোমরা তাকে যে নাম দেবে দাও,
আমি যে তার নাম রেখেছি প্রেম,
বঙ্গভূমির শ্যামল ছায়া পেলে
পায়ে ঠেলেন মুকুট গড়ার হেম।

তোমরা তাকে যে নাম ধরেই ডাকো
আমি তাকে নদী ও প্রেম জানি,
ডুবলে জলে ভাসিয়ে তোলার পথ
জানেন তিনি, মওলানা ভাসানী।

সৈয়দ শামসুল হুদা

অনল পুষ্পঝরা

যুগ যুগ বঞ্চনার শ্যামল শিকার
প্রিয় দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ

এই দেশে একদিন জন্মেছিলে তুমি
এই দেশে চিরদিন বেঁচে আছো তুমি

কী অনল পুষ্পঝরা নামটি তোমার
নির্ভয় সৌগন্ধ স্রোতে তেমনি জাগ্রত

www.pathagar.com

অগ্নিগর্ভ ভাস্বর চলমান বাণী
স্বদেশের প্রাণে প্রাণে রুয়ে গেছ তুমি
সেই বীজ মহীরুহ ছায়াতলে জানি
সকলে সংকট ঠেলে হবো একত্রিত

সত্যাশ্রয় দেশপ্রেম হিরন্ময় দ্যুতি
এ-ই তো ছড়িয়ে দ্যায় মন থেকে মনে
অনির্বাণ টেক্‌নাফ থেকে তেঁতুলিয়া
স্বপ্নময়, ছন্দে গড়ে চেতনার ধ্বনি।

কে জি মোস্তফা

ভাসানীর হুঁশিয়ারি সংকেত

আমাদের মানবিক পৃথিবীটা ইদানীং
দানব শক্তির দাপটে সন্ত্রস্ত
আমরা এখন অদ্ভুত দেশে দেশে
জীবন ও মৃত্যুর গোলার্ধে হেঁটে বেড়াচ্ছি।
তবুও এগিয়ে যেতে হবে
সামনে আরও অসংখ্য দৃশ্য—
ইলেকট্রিকের শরীর
গণতান্ত্রিক আত্মা
বন্যার জোয়ারভাটা
দূর নিকটে, নিকট দূরে
অবিরত পরিবর্তন ভেতরে বাইরে।

সময়ের চলমান গতি থমকে গেছে
স্বপ্নের বন্ধনগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ
পৌরাণিক কাহিনী যেন লুকিয়ে আছে গোলক ধাঁধায়
আমি দেখি পিকাসোর বিখ্যাত ছবি, মাতৃমূর্তি
মলিন ম্যাডোনা আলু থালু শুয়ে আছেন
নোংরা মাদুরের ওপর।

www.pathagar.com

যখন কোটরাগত আগ্নেয়গিরির মুখের দিকে তাকাই
দেখি সমীকরণের কোন চিহ্ন নেই
ভারসাম্যে ভরা এ পৃথিবী, শূন্যে পরিণত পৃথিবী
চোখের সামনে যায় মুছে।

শ্রদ্ধেয় ভাসানীর কবর থেকে
বেজে ওঠে হুঁশিয়ারি সংকেত—
পাতায় পাতায় ছিটকে পড়ে
তাঁর ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর
নতুন প্রজন্ম, দাও দাও
ভ্রষ্ট পৃথিবীটাকে উল্টে দাও।

আবুল হোসেন মিয়া

ভাসানী এক জীবন্ত নাম

মজলুম নেতা যে তুমি ভাসানী প্রতিবাদী প্রতিপদে,
শোষক শাসক শংকা ও ভয়ে নোয়াত শির তোমার পদে।
যে কোন রকম স্বৈরাচারের ভেঙে দিতে কালো হাত
ঝঞ্ঝামুখর নানারূপ সেই দুর্দিন, কালো রাত,
এলো আর গেলো বীর বাঙালী মুক্তি সেনানীদল
অসম যুদ্ধে বাজি রেখে প্রাণ, পেলো ঈপ্সিত ফল।
সেখানেও তুমি অগ্রসেনানী আজাদীর ভূমিকায়
দুর্নীতিবাজ মুনাফাখোরেরা সদা ভয়ে শিহরায়।
অন্যায় সাথে আপোষ করো নি বিবেক দেও নি বলি
বন্ধুস্বজন ত্যাগ করলেও ন্যায়নীতি পথে চলি।
আপন সাধনে সিদ্ধি লভেছ এই তব বাহাদুরী
ভাসানী একটি জীবন্ত নাম, নেই তার কোন জুড়ি।
নব ইতিহাস স্রষ্টা, যুগের অগ্নিপুরুষ ঠিক
নীতি অবিচল আপোষবিহীন তুমি চির নির্ভীক।
আদর্শ তুমি সব মানুষের সুন্দর জীবনের
দেয় আহ্বান সফল হতে সে, হবে নাকো হেরফের।

www.pathagar.com

আবু সালেহ

ছড়া

ভাসান চরের মওলানা নেই
রাজপথ রয় খালি
দেশ বিক্রির ঐ নেতারা
দিচ্ছে যে হাত তালি

'খামোশ' 'খামোশ' উচ্চকণ্ঠ
যায় না সে শোনা তার
নতজানুদের কপালে তিলক
দেশ হয় হায়েনার

ভাসান চরের মওলানা নেই
নেই ভাসানী নেই
তাঁর গড়া দেশ রক্তে রাঙানো
মুকতো সে হবেই।

শেখ ফজলুর রহমান

নিদ্রিত বিসুভিয়স

বিসুভিয়সের অগ্নুদ্গার ইতিহাস হয়ে থাক,—
ভয়াবহতার শিহরণে আজো সভ্যতা কেঁপে ওঠে।
মনে ও মগজে, মানসিকতায় বিস্ফোরণের ঢেউ—
দাওয়াত জানায় আজরাঈলের দরবারে মাথা তুলে।

হেরার জ্যোতির প্রতিঃসরণে মুখরিত বাংলায়
'ইল্লাল্লাহ্‌তে পজিটিভ হলো 'লা-ইলাহা'-র সুর।
পাষাণ দেবতা প্রতিমার পায়ে মুশরিক কেঁদে সারা,—
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে ইসলাম দিলো ডাক।

খুনের সূচনা কারবালা-মাঠে ফোরাত নদীর ধারে—
মানবতা সেথা শহীদ হয়েছে জঙ্গে কারবালায়,

www.pathagar.com

কারবালা মাঠে কোণঠাসা হ'লো পবিত্র ইসলাম,
স্বৈরাচারের বৃক্ষরোপণে মৈত্রী দাফন হলো।

ইনসানীয়াৎ দেশে দেশে ঘুরে কাটায় ক্রান্তিকাল,
স্বাধীনতা আজো বালির পাহাড়ে ধুঁকে ধুঁকে কেঁদে মরে।
হালকু-হামলা বারে বারে হেথা এনেছে যুগান্তর,
মমির মাজারে অনাদিকালের পিরামিড গড়ে গেছে।

বিসুভিয়সের অগ্নুদ্গার ইতিহাস হয়ে আছে।
নতুন শ্লোগানে গর্জে উঠেছে লাঞ্ছিত মানবতা।
মজলুমানের পাঁজরে পাঁজরে মাথা তোলে ফরিয়াদ,
সাম্যের পথে সামনে এসেছে সীরাত-ই-মুস্তাকীম।

মুমীনের চেয়ে শ্রেয়তর হলো মর্দে মুস্‌লেমীন।
সূক্ষ্ম সুতোর শক্ত বাঁধনে তওহীদ চিরজয়ী।
নির্যাতিতেরা হেঁকেছে আবার নারা-ই-তকবীর।
স্বকীয় নিশানে মানবদরদী মুজাহিদ ছুটে যায়।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় এলো ফোরাতের কলধ্বনি,
এক আল্লাহ্‌র লক্ষ কালাম বাংলার মাঠে-বাটে।
শোষিত শিখেছে মহাজীবনের মহাজাগরণী গান,
বাদশাহ-ফকীর, চালক-চালিত একই পরিধিতে চলে।

কথায় ছুটেছে ইনকিলাবের নায়াগ্রার খরস্রোত।
এভারেস্টের তুষার গলেছে সাহারার দাবদাহে।
জীবনের বীজে উপ্ত হয়েছে গাঙ্গেয় সমভূমি,—
চমকে উঠেছে হিমাচল থেকে কুমারিকা সেই ত্রাসে।

জীবন জাগালে সুবেহ্ সাদিকের মহাজাগরণী গানে।
কর্মক্ষেত্রে সোচ্চার হলো মানুষ ও মানবতা।
মুখর দাবীতে বাঙময় হলো আল্লাহ্‌র মালিকানা,—
রবুবিয়তের দূতাবাস এলো বাংলার ঘরে ঘরে।

www.pathagar.com

জঙ্গে জেহাদ ময়দানে আনে খুনের উন্মাদনা,
অর্থনীতির জেহাদ জাগায় অশনির সংকেত।
বাঁচার দাবীতে প্রতিবাদী সুর মিছিলে মিছিলে ফেরে।
যুগের প্রভাতে সফলতা আনে সোনালী দিনের আলো।

সে আলোয় আজ সিনান করেছে যুগের মজলুমান।
বিসুভিয়সের গর্জন ওঠে কলিজাপোষাণো খুনে।
শ্বাসে-প্রশ্বাসে হুংকার দেয় ঘুমন্ত ফুজিয়াল্লা।
মানুষের দাবী পথে-প্রান্তরে পদে পদে লেলিহান।

'কেউ খাবে, আর কেউ খাবে না'—শ্লোগানেতে সোচ্চার
সবাই বুঝেছে অর্থনীতিহীন স্বাধীনতা-ব্যর্থতা।
হিংস্র বুলেট ব্যর্থ হয়েছে ইনকিলাবের সুরে—
অত্যাচারীর বুকের ওপরে সত্যের শিখা জ্বলে।

মানুষের কথা দুনিয়ার দ্বারে প্রতিধ্বনিত আজো।
মানুষের কথা মানুষের কাঁধে দায়িত্ব তুলে দিয়ে,—
মানুষের কথা বাস্তবায়নে সাধনার আবেদনে
মানুষের কথা মুখে-মনে আজ গড়েছে পুলসিরাত।

দীন-দুনিয়ার সীমানায় জাগে প্রহরী তন্দ্রাহীন।
মুক্তির দাবী দিগবলয়ের ব্যানারে ব্যানারে লেখা।
আল-ফারানের মূর্ত শ্লোগানে জীবনকে বেঁধে দিয়ে
স্তব্ধ হয়েছে বিসুভিয়সের আগুন ঝরানো গান।

সে গান শোনালো সুষম নীতিতে দুনিয়াও আখিরাত,
সে গান চেনালো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মুকাবেলা।
সে গান দেখালো রোজ হাশরের প্রতিবাদী ওকালতি,
সে গান বোঝালো মানুষের চেয়ে বড়ো যে মুসলমান।

যে বোঝে বুঝুক তেজষ্ক্রিয়তা মৃত আগ্নেয়গিরি।
তবুও বুকের কাঁপন থামে না, জাগে ভয়াবহ স্মৃতি।
বিসুভিয়সের ধ্বংসলীলায় আজো সভ্যতা কাঁপে,
হোক নিদ্রিত তবু সে মহান স্মৃতির বিসুভিয়স।

www.pathagar.com

ভয়াবহতার ইতিহাসে আজ বিসুভিয়স এক নাম,—
শাসক শাসিত সবার মনের মণিকোঠা উজ্জ্বল।
যুগের শিয়রে প্রতিবাদী এক কণ্ঠ চিরঞ্জয়ী,—
এই শতকের বিপ্লবী নাম ঃ মওলানা ভাসানীর।

হাসান আবদুল কাইয়ুম

একজন মানুষ ছিলেন

এখানে এই আমাদের কালে
একজন মানুষ ছিলেন
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
'খামুশ' চাবুকে যিনি জাগাতেন
ঘুমের ঘোর থেকে জাতিকে
যিনি শোনাতেন দুঃখের কথা
সাম্যের কথা
এবং অধিকার আদায়ের কথা
যিনি উজ্জীবিত করতেন মিছিলের গতিবেগ
কৃষক শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষের চেতনা
অংগুলী হেলনে কাঁপিয়ে দিতেন
জালিমের সুখের প্রাসাদ

আমাদের কালের সেই মানুষটা ছিলেন
সংগ্রামের প্রতীক
বিপ্লবের প্রতীক
বিদ্রোহের প্রতীক
স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক

সাম্রাজ্যবাদ পারে নি তাঁকে রুখতে
সম্প্রসারণবাদ পারে নি তাঁকে রুখতে
শোষণহীন সমাজ গড়ার সংগ্রামে
যিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন

www.pathagar.com

অক্লান্ত সৈনিক এক মহা বিদ্রোহী
আমাদের কালের মানুষ তিনি
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

যে নামে এখনও উজ্জীবিত
যে নামে এখনও সমুজ্জ্বল

ঋজুতার সংকল্প
যে নামে মিছিল জাগে
বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে

মুশাররাফ করিম

ভাসানী

তিনি ছিলেন বিরাট বিশাল দারুণ পুরুষ ;
রকেট-রোবট আর কম্পিউটারের মাপাজোকা সভ্যতায়
দৃঢ় ঋজু একটি অর্জুন গাছ।
খরা প্লাবন ঘূর্ণি সন্ত্রাস জেনোসাইড যুদ্ধ-বিগ্রহে কাতর
মানুষের মধ্যে

হৃদয়ের খোলামেলা একটি কপাট।
তাঁর পদচিহ্ন পেয়েছি এশিয়ার বন্ধুর পথে ;
আফ্রিকার কালো মানুষের বিষম কান্নায়—
ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিরোধ যুদ্ধে।
মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের পাশে
তিনি অনড় অটল চীনের মহাপ্রাচীর।
নামিবিয়ার মুক্তিকামী তরুণের হাতে
রাইফেলের গর্জন।
পানশির উপত্যকায় পাগড়িবাঁধা মুজাহিদ,
কাম্পুচিয়ার জঙ্গলে আত্মনিবেদিত সাহসী গেরিলা আর
ফিলিস্তিনী তরুণ তুর্কি।

www.pathagar.com

যেখানে অন্যায় সেখানেই তিনি ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ
আর সবখানে দয়াপরবশ মাটির মানুষ।
তিনি ইথিওপিয়ার খরাপীড়িত অঞ্চলে গমের দানা;
সাবরা-শাতিলার সন্তানহারা জননীর
বুকের গভীর ক্ষত।

উত্তরবঙ্গের শীতার্ত রাত্রে দুঃখী মানুষের শতচ্ছিন্ন কাঁথা
অনাহারক্লিষ্ট যুবকের ফুসফুসে বিশুদ্ধ বাতাস।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ধর্মপাশা থেকে শিবপুর
ঘিওর থেকে সন্তোষ
অযুত নিযুত গ্রামের সহস্র কৃষকের তিনি হাসি-কান্নার সমান ভাগী।
বহুবার মুছে দিয়েছেন মেহনতি মজদুরের ঘামসিক্ত পিঠের নুন।
সফেদ পাঞ্জাবী দিয়ে ঢেকে রেখেছেন জলোচ্ছ্বাসে মৃত
পচাগলা নগ্ন যুবতীর আব্রু।

ভলগার টলটলে পানিতে ভাসে নি তার ডিঙ্গি নাও;
স্বর্ণ ঈগলের ঠোঁট থেকে তুলেন নি ডলারের ফুল—
জীবনেও দেখিনি তাঁকে নতজানু হয়ে লিখে দিতে দাসখত।
তাঁর 'খামোশ' কন্ঠস্বরে ফারাক্কা কাঁপছে থর্থর্।

তাঁর জন্যে কোথাও ছিলো না সাত মহলার ঘর
সন্তোষের উদাস প্রান্তরে খড়ে ছাওয়া পর্ণ কুটির
তার মধ্যে জায়নামাযে নিমগ্ন দয়াপরবশ
এক মাটির মানুষ

মওলানা ভাসানী তাঁর নাম।

www.pathagar.com

মুহম্মদ রূহল আমীন খান

কোথায় ভাসানী

মাটি নাই। জল্লাদ পানি
দিগন্ত বিথারি শুধু।

ভাসিয়ে মৃতের লাশ কলার ভেলায়
দীর্ঘশ্বাস ফেলে খোঁজে

ভয়ার্ত শোকার্ত ক্ষুব্ধ দুর্গত জনতা,
খুঁজে ফেরে, বিদেহী আত্মারা
দশ কোটি বাংলাদেশী
অস্তিত্বের শংকা নিয়ে খোঁজে
কোথায় লা-ছানী
মওলানা ভাসানী।

দশ কোটি মানুষের
দৃপ্ত ক্রুব্ধ উচ্চারণ
নিজ কণ্ঠে নিয়ে
মিছিলের পুরোভাগে দুরন্ত সাইমুম বেগে
আগাবে যে বাঁধাবিঘ্নে দলে
ফারাক্কা ভেংগে দাও
ভেংগে দাও বলে।

এখানে বগির হানা
আজদাহার অশনি গর্জন
এখানে কবন্ধ দৈত্য ভয়াল দর্শন
উঁকি মারে।
ভেংগে গেছে প্রভুত্ব পিণ্ডির
তবুও জড়ায় নিত্য দিল্লীর জিঞ্জির।
কৈ সে মানুষ
যাদুকাঠি অংগুলির তির্যক ইশারা হেনে
বজ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করবে যে
খামুশ—খামুশ।

www.pathagar.com

লোল জিহ্বা চামুণ্ডার দল
স্ফীত মেদ রাক্ষুসেরা
ক্রমেই স্ফীত হয়। চলে লুট, হানা
বাংলা-ভাগাড়ে শুধু ছেয়ে আছে শকুনের ডানা।
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় ক্রমে
কংকালের সারি

বংশ বাড়িয়ে চলে রাঘব বোয়াল।
জালিমের যমদূত
কণ্ঠে যার আবুযর গিফারীর
বৈপ্লবিক বাণী
এ সময়ে কে সে ভাসানী ?

রশীদ খান গজনবী
শতাব্দীর ছুটন্ত অশ্বারোহী

কি আশ্চর্য আলৌকিক
রূপকথার নায়ক যেন এক
শতাব্দীর ঘুম ভাঙানো
ছুটন্ত অশ্বারোহী
শোষিত, নির্যাতিত জনতার
দিকসন্ধানী জাতির
অনন্য কালের ঘড়ি
এ ঘড়ি বাজে না আর বজ্র নির্ঘোষে
জাতির ক্রান্তিকালে দুর্যোগে, সংগ্রামে
কি বিপুল শূন্যতা।

এমনটি দেখিনি আর
কখনো শুনিনি
সংগ্রামী জনতার
আফ্রো-এশিয়ার পরম প্রিয় নাম
মৌলানা ভাসানী।

www.pathagar.com

ফজলুল কাদির

যেমন দেখছি তাঁকে

ভাসানীর সভায় আপনি গেছেন কি কোনোবার ?
যান নি ? তাহলে বলবো আমি সত্যিই দুর্ভাগ্য আপনার।

তাঁর ডাকে
সভার মাঠটাই যেন যুদ্ধের ময়দান মনে হতো!
জনতার উত্তাল ঢেউ ফুলে ফুঁসে ওঠে অবিরত—
শাসকের দর্পচূড়া একেবারে চূর্ণ করে দিতে
দারুণ আক্রোশে যেন গর্জে ওঠে দুর্জয় শপথে।
হাজারো সোচ্চার কণ্ঠ হতো যেন তীক্ষ্ণ তরবার।

ক্ষমতার সিংহাসন কত তুচ্ছ মনে হতো তাঁর!

কখনও হয়েছেন কি ভাসানীর মিছিলে শামিল ?
হন নি ? তাহলে বলতেই হবে মিথ্যের সাথে অমিল
সত্যের, দেখেন নি এমন। তাঁর সে মিছিল যেন
হতে পারে মুহূর্তে ভুজঙ্গ! ইঙ্গিতে এহেন
মিথ্যের প্রাসাদগুলো গ্রাস করে নিতে পারে
নিমেষেই। ন্যায়ের শাসন পিষ্ট—গোটা দেশ অন্তিম ভাগাড়ে;
আপন বিবেক ক্ষুব্ধ দুর্বিনীত দুর্মর আবেগে।

শুধু প্রশ্ন জাগে—
কোথায় এমন নেতা ? তাহলেই পড়তো চোখে
হোক না ফারাক্কা কিংবা ভুখার মিছিল
ভাসানী আছেন পুরোভাগে---
স্বাধিকার—সেই সাথে কেড়ে নিতে হবে ইনসাফ।

উথাল পাথাল হতো তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ।

www.pathagar.com

কাছে থেকে দেখবার ভাগ্য কি হয়েছে আপনার
তাঁকে? তাহলে দেখতেন
কী আশ্চর্য তারুণ্য চোখে মুখে খেলা করে তাঁর।
বিশ্বাসের অকম্পিত উচ্চারণ তাঁর দুটো ঠোঁটে—

শাণিত বিবেক সে যে
আপনারই কথা কয়ে ওঠে।

মসউদ-উশ-শহীদ
প্রথম পারাবত

তোমার গ্রামে যাই নি কভু আমি
তোমার সাথে হয় নি আমার দেখা
তবু যেন তুমি আমার কতোই
আপন জন—
তোমার ভেতর পাই যে খুঁজে
আমার ভালবাসা
তোমার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে
ধানের শীষে শীষে
তোমার স্মৃতি গড়ে আজো
বনের নিবিড়তা

চাষী মজুর তোমার নামে
বাঁধতো বুকে বল
স্বাধীনতার নামেই ছিলো
তোমার শপথনামা
তুমিই ছিলে স্বাধীনতার
প্রথম পারাবত
তুমি আজো মিশে আছো
সবুজ মাঠে মাঠে
তোমার স্মৃতি প্রদীপ জ্বালে
হাওয়া এবং মনে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ন্যাপ গঠনকালীন মওলানা ভাসানীর ভাষণ

[১৯৫৭ খৃস্টাব্দের ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার তদানীন্তন পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বারো শতাধিক প্রতিনিধির এক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতির যে ভাষণ দান করেন তার পূর্ণ বিবরণ ২৬ জুলাই শুক্রবার 'দৈনিক সংবাদ'-এ ছাপা হয়। কিন্তু ভাষণটি দীর্ঘ হওয়ায় উক্ত দিন তা অসমাপ্ত থাকে। আমাদের হাতে ঐ দিনকার কাগজটি থাকায় আমরা কেবল সেইটুকুই এখানে পত্রস্থ করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলনেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। —সম্পাদক]

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ !

আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন। সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপনারা সকল প্রকার অসুবিধা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের সকলের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বন্ধুগণ !

দশ বছর পূর্বে আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি। সংগ্রামের দিনগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নে ও কল্পনায় ভরপুর। আমরা পাকিস্তানে এক সোনার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম, সুখী-সমৃদ্ধ একটি দেশ। আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ত্যাগ ও সাধনার ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত একটি জাগ্রত জাতি। সে জাতি বিশ্বে অধিকার করিবে এক গৌরবময় আসন।

কিন্তু দশ বছরের স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর কল্পনার সৌধ আজ বিধ্বস্ত। অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও দিকভ্রান্ত জাতি আজ পথের সন্ধান চায়, সন্ধান চায় মুক্তির।

সে পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্ব আজ আপনাদের সকলের উপর। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া চট্টগ্রামের কক্সবাজার পর্যন্ত আমাদের দেশের সকল মানুষ আপনাদের উপর সে মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। দেশের আহ্বানে আপনারা

www.pathagar.com

সাড়া দিয়াছেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে অক্ষুণ্ণ রখিবার জন্য আপনারা যে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য আবার আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বন্ধুগণ!

স্বাধীনতার মর্মকথা সকল দেশে ও সকল কালে প্রায় এক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, আর্থিক দুর্গতির নিরসন এবং মানুষের সংস্কৃতি ও মননশীলতার উন্নতি ও ব্যাপ্তিই স্বাধীনতার প্রাণকথা। মানুষের জীবন হইতে এই বস্তু দুইটিকে বাদ দিলে মানুষে-পশুতে ব্যবধান থাকে না। তাই মানুষ তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় যুগে যুগে আত্মাহুতি দিয়াছে; নিজের জানমাল কোরবানী করিয়াছে। এমন একটি গুণে গুণান্বিত বলিয়াই বিশ্বস্রষ্টা পরম করুণাময় আল্লাহতা'আলা মানুষকে বলিয়াছেন—'আশরাফুল মখলুকাত'—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ সকল যুগেই নিজেদের ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে গোলাম বানাইয়া স্রষ্টার 'আশরাফ'কে আতরাফে পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক বিভেদ মানুষ কোনকালে মানিয়া লয় নাই। এ জন্যেই যুগে যুগে মানুষ করিয়াছে বিদ্রোহ। দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান সেই বিদ্রোহেরই অপর নাম।

নিপীড়িত মানুষের ইজ্জত ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তো সেদিন আমার রসুল আরব মরুভূমির বুকে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রাম ছিল জালেম কোরেশদের বিরুদ্ধে। আরবের মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া কোরেশরা জাজিরাতুল আরবে নির্যাতন, নিপীড়ন ও দুর্নীতির এক বিভীষিকা কায়েম করে। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আবির্ভাব না ঘটিলে সেখানকার ইতিহাস হয়তো মানব ইতিহাসে এক কলংকময় অধ্যায় হইয়া থাকিত।

আরবের নিপীড়িত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা আজিও সম্ভবপর হয় নাই, সত্য কথা, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (স.) প্রদর্শিত মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও তাদের থামে নাই। দেশী ও বিদেশী জালেমদের সম্মিলিত শক্তি'র বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরবের মজলুম জন-সাধারণ সংগ্রাম করিতেছে। তাদের পশ্চাতে আছে সারা পৃথিবীর মজলুম জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও নৈতিক সমর্থন।

বন্ধুগণ!

পাক-ভারতের আজাদী সংগ্রামের ইতিহাস অন্য দেশের সংগ্রামের ইতিহাস হইতে ভিন্ন নয়। যেদিন হইতে বিদেশী শক্তি ভারতে তাদের রাজত্ব কায়েম করে সেদিন হইতেই সেই বিদেশী শক্তি'র নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিল ভারতের মুসলমান। প্রাণ দিল ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে সমানভাবে। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের এক ঐতিহাসিক জাগৃতি, এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

www.pathagar.com

দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বার্মায় নির্বাসিত হইলেন। আর তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন ঝাঁসির রাণী, অযোধ্যার বেগম, টাঁতিয়াটোপি, নানা সাহেব, মওলানা আহমদুল্লাহ্ এবং আরও লক্ষ লক্ষ নাম না জানা মুসলমান ও হিন্দু।

পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সংগে জীবন দান করেন মীরমদন, মোহন লাল। সেদিন বাংলার স্বাধীনতাকামীদের প্রথম এবং মহান পরীক্ষা। কিন্তু কতিপয় দেশ-দ্রোহীর চক্রান্তে আমাদের স্বাধীনতার রবি অস্তমিত হইল। যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা দেশদ্রোহী তাহাদের কোন ধর্মীয় পরিচয় নাই। তাই অতীতের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদেশী শক্তির চাক্রান্তে যোগ দেয় মুসলমান মরীজাফর, আগাইয়া আসে হিন্দু উমিচাঁদ, রাজবল্লভ। স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিয়া একদিকে অগ্রসর হইলেন সিরাজ, মোহন লাল ও মীর মদন, অপর দিকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের জন্য এক দল দেশের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতকতাই সেদিন জয়লাভ করিল। বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশদ্রোহীরাই প্রমাণিত হইল অধিকতর শক্তিশালী।

সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমাদের দেশে আবারও কি ঘটিবে? বন্ধুগণ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ সরকার একটি নূতন দেশীয় শোষক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই শোষকের দলে মুসলমান ছিল নগণ্য, কারণ মেকিয়াভেলিয় নীতি অনুসারে ইংরেজ প্রতাপান্বিত মুসলমান সমাজের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী লোকদিগকে পাইকারী-ভাবে হত্যা করিয়াছিল। মোট কথা ইংরেজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিরাচরিত পথ অবলম্বন করিল।

কিন্তু বিরোধের মধ্যেও ঐক্যের সুর ছিল। সে ঐক্য ধ্বনি শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ। সে ঐক্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে খেলা-ফত আন্দোলন। বিদেশী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফর, উমিচাঁদের ন্যায় ভারতের গণদুশমন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আতংকিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন থামিয়া যায় নাই। স্বাধীনতার প্রেরণা ও আদর্শ নিয়াই আমরা আমাদের স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ি। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব মজলুম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিতে রাজী হয় নাই। তাই আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সে সংগ্রামের মূল কথা ছিল সর্বপ্রকার অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন করা। স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদর্শেই সেদিন ভারতের কোটি কোটি মুসল-মান উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

বন্ধুগণ!

স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। আমাদের স্বাধীন বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুনিয়ার কাছে সে স্বাধীনতার স্বীকৃতিও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরেও দেশবাসীর জীবনে কি সে স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ ঘটিয়াছে? আপনারা শুনিয়া লজ্জিত হইবেন যে, আজ পর্যন্ত গ্রামে এমন কথাও শোনা যায় যে, দেশের অবস্থা প্রাক-

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আমলেই নাকি অধিকতর ভাল ছিল। পল্লী পরিভ্রমণে সে সত্য নির্মমভাবে চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পাকিস্তান একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তার অর্থনীতির মূল ভিত্তি নিহিত কৃষকের জীবন আর কৃষকের জমিতে। বর্তমানে পৃথিবীর কৃষিপ্রধান কোন দেশের অগ্রগতিই সম্ভবপর নহে, যদি না দেশের কৃষি ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অতিশয় পশ্চাদপদ। সেই মান্ধাতা আমলের ভাঙ্গা লাঙ্গল আর আধমরা গরু আজিও পাকিস্তানের কৃষকের একমাত্র পুঁজি। অনাহারে, অর্ধাহারে সে আজ জীবন্মৃত। সরকারী হিসাব মতেই পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের ভিতর শতকরা ৩৬ জন হইল ভূমিহীন এবং শতকরা ৪০ জন হইল গরীব কৃষক। এই হিসাব ১৯৪৮ সনের হিসাব। তারপর গত ৯ বৎসর উপর্যুপরি সংকটে আরো কত কৃষক যে জমিহারা হইয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। আমাদের এই প্রদেশের চাষিগণ দুনিয়ার সেরা পাট পয়দা করে, কিন্তু গত ৯ বৎসরের ভিতর তাহার ন্যায্য মূল্য তাহারা পায় নাই। উত্তর বঙ্গের পটল, তামাক, দক্ষিণবঙ্গের মাদুর, পূর্ব বঙ্গের বেত ও চাটাই শিল্প আজ মরণোন্মুখ। ইহা ছাড়া কৃষকের ট্যাক্স ও খাজনার বোঝা বাড়িয়াছে। অনাহার ও দুঃস্থতাই হইয়াছে আমাদের কৃষকদের নিত্যসঙ্গী।

দুঃস্থতার ফলে কৃষি উৎপাদন দিন দিন কমিয়া চলিয়াছে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীব্র খাদ্য সংকট আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুজলা সুফলা পূর্ব পাকিস্তান এবং শস্য ভাণ্ডার বলিয়া বিখ্যাত পশ্চিম পাকিস্তান আজ বিদেশের খাদ্য সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীতে আজ আমাদের বৈদেশিক তহবিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে। দেশের শিল্পোন্নয়নে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে এবং ভিক্ষার ঝুলি হস্তে আমরা বিদেশের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সরকার কৃষকদের এই দুরবস্থার প্রতিকার করে নাই। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার পর কৃষকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সরকার প্রথম দিকে কয়েকটি প্রশংসনীয় কাজ—যথা, গত তীব্র খাদ্য সংকটের সময় লঙ্গরখানা খোলা, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করেন। সম্প্রতি এই সরকার সার্টিফিকেট প্রথা রদ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু কৃষকদিগের মৌলিক সমস্যা—যথা ভূমি সমস্যা, খাজনা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বেকার কৃষকের নিয়োগ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা দেখাইয়াছেন। সময় মত বিদেশ ও দেশের অভ্যন্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ, প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পূর্ণ রেশনিং, গ্রাম্য ঘাটতি এলাকায় সংশোধিত রেশনিং, মওজুদ উদ্ধার প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রদেশে এখনও তীব্র খাদ্য সংকট বিরাজ করিতেছে এবং গরীব কৃষক জনসাধারণের ঘরে অর্ধাহার ও অনাহার চলিতেছে। মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক

www.pathagar.com

রচিত ভূমি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের যথাবিহিত সংস্কার না করিয়া এই সরকার ঐ আইন চালু করিতেছেন। ইহার ফলে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হইয়াছে দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের অকথ্য জুলুম ও দুর্নীতির রাজত্ব। বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের সার্বজনীন দাবী সত্ত্বেও এই সরকার কৃষকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া জমিদারগণকে খেসারত দানের ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছেন। এছাড়া ২১ দফা মোতাবেক খাজনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে।

আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক ভাইদের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের চাইতে উন্নত তো নয়ই, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে তাহাদের দুরবস্থা আরো বেশী।...
রিপাবলিকান সরকার কৃষকদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই প্রাক্তন সিন্ধুর বিশ লক্ষ হারী (ভূমিহীন কৃষক) আজও জায়গীরদার ও জমিদারদের অধীনে গোলামের জীবন যাপন করিতেছে এবং প্রাক্তন পাঞ্জাবের লাখ লাখ মজলুম কৃষক বর্বর বাটাই ও বেগারী প্রথার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় তিউওয়ামা, মালিক, খিজির, মিয়া, নুন প্রভৃতি জমিদার জায়গীরদার পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ জমি দখল করিয়া ভোগবিলাস করিতেছে।

মোট কথা, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে স্বাধীন পাকিস্তান কায়েম হইলেও পাকিস্তানের জনসাধারণের যারা শতকরা ৮৫ জন, সেই কৃষক সমাজ স্বাধীনতার কোন আস্বাদন পায় নাই। তাহারা আজও ভুখা। অনাহারে কৃষকের পেট আর পিঠ এক হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ!

পাকিস্তানে মধ্যবিত্তের অবস্থা কৃষকের চেয়ে বেশী ভাল নয়। খাদ্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং দেশের এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। সরকার এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহারা এমন একটি অর্থনীতি অনুসরণ করিলেন, যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হইয়া এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। অবস্থা আজ আয়ত্তের বাহিরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে দেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এইরূপ পরিস্থিতি ঠেকাইয়া কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নাই। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনে আজ বিরাটকায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

শিক্ষা সংকট

বন্ধুগণ! পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা জীবনে মুসলিম লীগ সরকার এক ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। তাদের শাসন কালের সাত বছরে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যায়তনগুলি হ্রাস পাইয়া অর্ধেকে দাঁড়ায়। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষানীতি আতংকের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রামে বহু স্কুল পাঠশালা

www.pathagar.com

গরুর খোয়াড় ও ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন বকেয়ার খাতায় পড়িয়া থাকে। এইরূপ কয়েক হাজার শিক্ষকের প্রায় এগারো মাসের বেতন বকেয়া রাখিয়া তদানীন্তন অর্থসচিব জনাব গোলাম মোহাম্মদ দেশবাসীর সামনে পেশ করেন এক তথাকথিত উদ্‌বৃত্ত বাজেট। আশ্চর্যের বিষয় দেশব্যাপী আন্দোলন এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার শিক্ষা জীবনে তাদের ধ্বংসাত্মক নীতি চালাইয়া গেলেন।

লীগ যুক্তফ্রন্ট সরকার সে নীতির কোন পরিবর্তন করে নাই এবং আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারও সেই নীতির অনুসরণ করিতেছেন। সোহরাওয়ার্দী সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানিলেন। ৭৭১৭টি প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিবার পরিকল্পনা করিয়া আমাদের মুখ্য মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মজিবর রহমান প্লানিং কমিশনের সভ্য হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও দেশবাসীকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিবার পরিকল্পনাকে ধ্বংসাত্মক কার্য ছাড়া আর কি বলা যায়!

শিল্পোন্নয়ন

বন্ধুগণ! সদ্য আযাদীপ্রাপ্ত একটি দেশের বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের মত একটি অনুন্নত দেশে অর্থনীতির উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠায়। খোদাতা'আলা আমাদিগকে প্রচুর সম্পদ দিয়াছেন। কাজেই সরকার পক্ষের যদি যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকিত, তাহা হইলে গত দশ বৎসরে আমাদের এই দেশ বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিতে পারিত। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে পূর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। সূতিবস্ত্র, সিমেন্ট, পাট, কাগজ, চিনি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পের যে অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাতে এখনও দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হইতেছে না—বিদেশে রফতানী তো দূরের কথা। অবশ্য আমাদের শিল্পজাত কিছু কিছু মাল বিদেশে রফতানী হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশ শিল্পে প্রভূত অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশে বস্ত্র পায় না। অথচ সামান্য কিছু কাপড় বিদেশে পাঠাইয়া সরকার প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন হইয়া গিয়াছে।

দেশে শিল্পের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের দেশের শিল্পের এই অবস্থার জন্য দায়ী সরকার। আমাদের পাট, তুলা প্রভৃতির বিনিময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর যে সুবিধা ছিল, মুসলিম লীগ সরকার বা লীগ যুক্তফ্রন্ট সরকার সে সুযোগ কাজে লাগান নাই। আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে নূতন কিছু করেন নাই। শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ভর করিতেছেন যাহাদের উপর, তাহাদের নিকট হইতে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। অথচ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও সরকার নারাজ। ফলে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির পথে আজ নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। এবং যাহারা শিল্প গড়িতে চান, তাহারা পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাইতেছেন না। তাই স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর কাটিয়া গেলেও আমাদের দেশের পশ্চাদপদতা কাটে নাই।

www.pathagar.com

আমরা বার বার দাবী করিয়া আসিতেছি, পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা হউক; কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার ও যুক্তফ্রন্ট—লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী বিবেচনা করা তো দূরের কথা, ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া প্রচার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইগণকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাইগণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্টির সরকার গঠিত হওয়ার পরেও দেশকে শিল্পায়িত করার প্রহসনে পূর্বকার নীতি অনুসরণ হইতেছে। এই সরকার ২১ দফা ওয়াদা অনুসারে দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সে ওয়াদা তাঁহারা পালন করেন নাই। তাঁহারা দেশকে শিল্পায়িত করার কোনরূপ সুষ্ঠু নীতি এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন নাই।

শ্রমিক সমস্যা

বন্ধুগণ, মাত্র যে কয়টি শিল্প কারখানা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সরকারী অব্যবস্থার দরুন তাহারা কয়েকটি বছরের অনেক সময়ই কাঁচা মালের অভাবে অসুবিধা ভোগ করে, বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলগুলির কথা বলিতেছি।

শ্রমিক শোষণ ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কতকটা নীতিগত ব্যাপার। কাজেই শ্রমিক-মালিক তিক্ততা সেসব দেশের নিত্যনৈমিত্তিক কথা। কিন্তু আমাদের দেশের মত একটি অনগ্রসর দেশে যাহাতে শ্রমিক-মালিকের তিক্ততা বৃদ্ধি না পায়, দেশকে শিল্পায়িত করার শর্ত হিসাবে সরকারের সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি কোন বিষয়েই কিছু করেন নাই। ন্যায্য দাবীর জন্য শ্রমিক বৈধ আন্দোলন করিলে সরকার শ্রমিকদের উপর শুধুমাত্র দমন নীতি চালাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকগণ বর্তমানে যে মজুরী পাইয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়া জীবন ধারণ করাই কঠিন। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক এমন সব বস্তিতে বাস করিতে বাধ্য হয়, যাহা মানুষের বাসোপযোগী নয়। বহুক্ষেত্রেই শ্রমিক আইন ভঙ্গ করিয়া শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত খাটাইয়া লওয়া হয়। পাকিস্তানের শ্রমিকদের অবস্থা সত্যই অবর্ণনীয়।

বর্তমানে নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অবস্থায় ২১ দফা ওয়াদা মোতাবেক শ্রমিকদের বেতন ও মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি করা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই বরং বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া শ্রমিকদের বৈধ ধর্মঘট অধিকার হরণ করিয়াছে। কৃষকদের অবস্থা বর্ণনার সময় আমি যে কথা বলিয়াছি এবং শ্রমিক ব্যাপারে পুনর্বার আমি সেই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের আযাদী লাভের দশ বৎসর অতীত হইয়াও গেলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শ্রমিকদের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগে নাই। কঠোর পরিশ্রম, মালিকদের জুলুম ও স্ত্রী-পুত্রসহ কায়ক্লেশে জীবন ধারণ—ইহাই পাকিস্তানী শ্রমিকদের নসিব।

www.pathagar.com

দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা

এরপর আসে দুর্নীতির কথা।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও দেশে দুর্নীতি ছিল। কিন্তু উহা অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ বৈদেশিক সরকার বহু প্রকারের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তাহাদের শাসন কায়েম রাখার জন্য চাই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ। তাদের শোষণ কায়েম রাখিতে হইলেও প্রয়োজন দুর্নীতির। কাজেই শাসন ক্ষমতা হাতে রাখার এক বিরাট হাতিয়ার তাদের দুর্নীতি।

উদাহরণস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই 'মহান ব্যক্তিরা' যে দেশেই গিয়াছেন, সেখানেই দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে। তাদের আগমনও দুর্নীতি-মূলক এবং তাদের অবস্থানও দুর্নীতিমূলক। আমেরিকার প্রিয়পাত্র চিয়াং কাইশেকের চীন একদা দুর্নীতিবাজদের আড্ডাখানা হইয়া দাঁড়ায়। বৃটিশের অধীনে থাকা কালে ভারতেও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। বৃটিশ, আমেরিকা ও ফরাসীর...অভিযানে গোটা মধ্যপ্রাচ্য দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর জাপান ও তুরস্কও আমেরিকার কল্যাণে দুর্নীতিবাজির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের শাসকগণও বৃটিশের নিকট হইতে দুর্নীতির পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানে দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুক্তফ্রন্ট-লীগ-কোয়ালিশন সরকারের আমলে উহা আরো প্রসার লাভ করে।

আওয়ামী-কোয়ালিশন সরকার বহু ঢাক-ঢোল পিটাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্নীতির মূলোৎপাটন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু অবস্থা বর্তমানে এমন এক স্তরে আসিয়াছে যে, দুর্নীতি আজ প্রায় সমগ্র সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

দুর্নীতি দমন করা যায় না—আমি একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। সমাজ জীবন হইতে দুর্নীতি দূর করিতে না পারিলে পাকিস্তানের কোন উন্নতি হইতে পারে না। তাই সমাজ জীবন হইতে দুর্নীতি উৎখাত করিবার জন্য আমি সমস্ত পাকিস্তানবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

আমি বিশ্বাস করি যে, সরকার যদি উদ্যোগী হইতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অব-লম্বন করিতেন তাহা হইলে এদেশের সমাজ জীবন ও শাসনতন্ত্রকে তাহারা দুর্নীতিমুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টারই অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাই দুর্নীতি রোধ সম্পর্কিত সরকারের কথাবার্তা আজ অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।...

- মুসলিম লীগ সরকার, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম আমাদের দেশের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রথমদিকে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নিরাপত্তা আইন বাতিল করিয়া দিয়া হৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। তজ্জন্য দেশবাসী তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সরকার অর্ডিন্যান্স দ্বারা কেন্দ্রীয় কালাকানুন পুনরায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পাকিস্তানের নাগরিকদের পাসপোর্ট ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আটক করিয়া মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এ কারণে

www.pathagar.com

গণতন্ত্রকামীদের দায়িত্ব শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ তাদের কায়েম রাখিতে হইবে। এজন্য যে কোন মূল্য দিতে হইলেও তাকে কায়েম করিতে হইবে।

এবার আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে চাই। পাকিস্তানের যে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান হেতু আমরা ২১ দফা কর্মসূচীতে এই প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছিলাম, এই দাবী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ দাবী। আমাদের এই দাবী আজও পূরণ হয় নাই। আজও শিল্প, বাণিজ্য, আবগারী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব প্রদেশের নিকট দেওয়া হয় নাই। অথচ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিতেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে না কি শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫ সনে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন নিয়া দেশে বিতর্কের সময় জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ হাতে লিখিয়া দিয়াছেন যে, মন্ত্রিত্বে থাকাকালে তিনি ২১ দফা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রচেষ্টা করিবেন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিয়া শহীদ সাহেব কি তাঁহার নিজ হাতে লিখিত সেই দায়িত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ?

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের এক ইউনিট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসের অধিবেশনের এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে জবরদস্তিমূলকভাবে এক ইউনিট গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয় এবং ঘোষণা করা হয় ঃ

"যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায় এবং যখনই যাইবে, তখনই ইহা সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত সংগ্রহ করিয়া এবং জনসাধারণের মতামতের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া এক ইউনিট আইনটি পুনর্বিবেচনা করিবেন।" এই প্রস্তাব এখনো বলবৎ আছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসিয়াছে আজ দশ মাস। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। হওয়ার কোন লক্ষণও নাই।

আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম চূড়ান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। সেজন্য দেশবাসী তাহাদিগকে ক্ষমা করে নাই। আমাদের সেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারও আজ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। দেশবাসী উহা বরদাশত করিবেন কি ?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীর অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিলিত শক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হউক।

বৈদেশিক নীতি

বন্ধুগণ! গভীর উদ্বেগের সহিত আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার মুসলিম লীগ সরকার অনুসৃত সামরিক চুক্তিগুলিকে সমর্থন করিয়া আমাদের পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্বের সামনে এক বিপদ উপস্থিত করিয়াছে।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ সরকার আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতির সাথে যে সব সামরিক চুক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন সে সব চুক্তি যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি সে কথা বলিতেছি না। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ...আরব জাহানে বৃটিশ শাসকবর্গের কার্যকলাপ হইল একমাত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার কার্যকলাপ। পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে শুরু করিয়া সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমাদের প্রতি বৃটিশ শাসকবর্গ যে সব ব্যবহার করিয়াছে, তাহা হইল শুধু বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময়েও কি বৃটিশ শাসকবর্গের ছলচাতুরীর জন্যই "পাকিস্তান বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট" রাষ্ট্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নাই ? আরব জাহানের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বৃটিশ ও আমেরিকার শাসকবর্গই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তন করেন নাই ?

বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমেরিকার ডলার সাহায্য প্রয়োজন। শর্তহীন বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বরং সেইরূপ সাহায্য আমরা চাই। শর্তহীন সাহায্য বন্ধুত্বকে গাঢ় করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার শর্তাধীন ডলার সাহায্যে কোন দেশ উন্নতি করিয়াছে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন কি? পক্ষান্তরে আমরা দেখিয়াছি যে, শত শত কোটি ডলার সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং শাসিত চীনের আর্থিক অবস্থা অবনতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তুরস্ক, ইরাক প্রভৃতি দেশ বহুদিন হইতে ডলার সাহায্য পাইতেছে। অথচ আমেরিকার শাসকবর্গের মুখ হইতেই শোনা যায় যে, ঐ সব দেশের আর্থিক সংকট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। আমরাও ডলার সাহায্য পাইতেছি ১৯৫৪ সন হইতে কিন্তু তবুও আমাদের দেশের আর্থিক সংকট দিন দিন গভীর হইতেছে এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজও অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

ডলার সাহায্য দ্বারা কোন দেশের আর্থিক উন্নতি না হওয়ার প্রধান কারণ হইল, যে সব চুক্তি মারফত আমেরিকা ঐ সব সাহায্য দান করে সে সব চুক্তিতে এমন সব শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয়, যাহাতে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এর প্রমাণস্বরূপ আমি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির শর্তাবলীর কিছু উপস্থিত করিতেছি।

১৯৫৪ সনের প্রথম ভাগে ঐ সামরিক চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আমার তারবার্তার জওয়াবে এ চুক্তির কতকগুলি শর্ত জানাইয়াছিলেন। সেগুলি তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সে শর্তাবলীরই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ঐ চুক্তির শর্তাবলীর চতুর্থ পরিচ্ছেদর প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে ঃ

"পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যে সব কর্মচারী পাইবেন, তাহারা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করার

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ পাইবেন। এই চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীরূপে পাকিস্তানে আগত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ পাকিস্তান সরকারের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং কূটনৈতিক মিশনের ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সরকার উচ্চপদস্থ মার্কিনী বিমান বাহিনীর অফিসারদিগকে কূটনৈতিক মর্যাদা দান করিবেন।"

এই শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানে আগত আমেরিকার অফিসারগণ আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার যে "কর্তৃত্ব ও অবাধ সুযোগ" লাভ করিল উহার ফলে স্বভাবতঃই আমাদের সেনাবাহিনীর উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার হইতেছে। আমাদের দেশে ঐ বিদেশী অফিসাররা হইলেন 'স্বাধীন' কারণ তাহারা আমাদের দেশে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন, "কূটনৈতিক মর্যাদা" ভোগ করিবেন এবং তাহাদের উপর আমাদের দেশের সরকারের কোন এক্তিয়ার থাকিবে না। এমন কি তাহারা সাধারণ অপরাধ করিলেও আমাদের কোর্ট তাহাদের বিচার করিতে পারিবে না। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তির ঐ শর্তের ফলে যে প্রভাব বিস্তার হইতেছে, তাহাতে কি আমাদের সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না? ইহাই কি আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার নমুনা? আর আমাদের সেনাবাহিনীর সার্বভৌমত্বই যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব থাকিবে কি?

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার ডলার সাহায্য ও অন্যান্য বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আমেরিকার সহিত আর্থিক সাহায্যের যতগুলি চুক্তি আমাদের সরকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতেই শর্ত আছে যে, ঐ ডলার সাহায্যের ব্যবহার, তদারক প্রভৃতির জন্য আমেরিকার যে সব অফিসার আমাদের দেশে আসিবেন তাহারা সবাই 'যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কূটনৈতিক মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করিবেন। তাহাদের উপর আমাদের সরকারের এক্তিয়ার খাটিবে না।'

অর্থাৎ আমেরিকার ডলার সাহায্যের সাথে সাথে আমাদের দেশে যে শত শত আমেরিকান অফিসার আসিতেছেন, তাঁহাদের সমবায়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে একটি স্বাধীন সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে, যে সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট দায়ী। ইহার দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য একটি রাষ্ট্রের কি সৃষ্টি হইতেছে না? ইহার পরিণাম দেশবাসীই বিচার করিবেন।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির আরও একটি শর্ত (পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২ (ক) অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে ঃ "পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুসারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচামাল বা আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করিবেন যাহা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব।"

www.pathagar.com

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, চুক্তির এই শর্ত দ্বারা কি আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে না এবং আমাদের অর্থনীতির উপর আমেরিকার অধিপত্য বিস্তার হইতেছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে আমি কেন্দ্রীয় অর্থসচিব জনাব আমজাদ আলীকে সাক্ষ্য হিসাবেও উপস্থিত করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে (গত মে মাসের শেষ ভাগে) পেশোয়ারে ও করাচীতে দুইটি বক্তৃতায় জনাব আমজাদ আলী বলিয়াছেন, "আমাদের অর্থনীতি দ্রুত আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে এবং তজ্জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।" অর্থ-সচিবের এই মন্তব্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য কি?

১৯৫৪ সনের প্রথমভাগে পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুষ্ঠানের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নব নির্বাচিত ১৬৭ জন সদস্য এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঐ চুক্তি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ

"আমরা মনে করি যে, এই চুক্তির বলে আমাদের দেশও বিশ্বযুদ্ধ চক্রান্তে জড়াইয়া পড়িবে, আমাদের দেশের ধন-সম্পদ ও জনবল আমেরিকার যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হইবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হইবে।"

এই বিবৃতিতে বহু আওয়ামী লীগ নেতা—যথা পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মুখ্য মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, কেন্দ্রের বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর প্রমুখ নিজ হাতে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন।

যাহা হোক, আমি ইহাই বলিতেছি যে, বৃটেন ও আমেরিকার শাসকবর্গের নীতি ও কার্যকলাপ বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ডলার সাহায্যের ফলাফল এবং সামরিক চুক্তিগুলির শর্তাবলী বিচার বিবেচনা করিয়াই আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিল যে, ঐ চুক্তিগুলি "দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতার পরিপন্থী" এবং আওয়ামী লীগ "সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে।"

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমস্ত জানিয়া শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী হওয়ার কিছুকাল পর হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করিতে থাকেন। এই কাজ দ্বারা তিনি যেমন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আদর্শগত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকেও ভুলিয়া গিয়াছেন।

আমি এবং আওয়ামী লীগের বহু কর্মী প্রথম হইতে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঐ কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। সেজন্য তাঁহাকে আমরা সময়ও দিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন।

www.pathagar.com

কাশ্মীর ও খালের পানি

মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলি সমর্থনে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি প্রধান যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের কাশ্মীর লাভ করার পক্ষে সহায়তা হইতেছে। কাশ্মীরে অবাধ গণভোট অনুষ্ঠিত হউক এবং কাশ্মীর পাকিস্তানে আসুক ইহা আমাদের সকলের অকুণ্ঠ দাবী। ভারত সরকারের বাধা এবং একগুয়েমিপূর্ণ নীতি সত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও আমাদের ঐ দাবী হাসিল করার জন্য যথাযোগ্য পথও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে, মুসলিম লীগ সরকার প্রথমাবধি বৃটেন ও আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া ও পরে সামরিক চুক্তিগুলিতে যোগ দিয়া কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা সুদীর্ঘকাল যাবত চালাইয়া আসিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী আরও দক্ষতার সহিত গত দশ মাস যাবত সেই নীতি ও সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পর্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে। কাশ্মীর যে স্থানেই ছিল, সেই স্থানেই আছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১লা জুন করাচীতে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন : 'খালের পানি বিরোধ ও কাশ্মীর সমস্যা আমাদের উপর সাঁড়াশি অভিযানের দুইটি দিক। কিন্তু আমরা কিছুই করিতে পারি না। ভারত এতই শক্তিশালী যে, আমেরিকাসহ প্রত্যেকেই তাহার বন্ধুত্ব কামনা করে।"

এই খেদোক্তির ভিতর দিয়া জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ নীতির ব্যর্থতা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কিসের মোহে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই বন্ধ্যা নীতি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

আমাদের প্রধান মন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফর করি-তেছেন। সেখানে গিয়া তিনি প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি কোন স্পষ্টোক্তি করেন নাই। অথচ জাতিসংঘ নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ দ্বারা কাশ্মীর সমস্যা সমর্থনের কথা বলিয়াছেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী মার্কিন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকার 'শাসকবর্গের অনুরোধে' আমাদের প্রধান মন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী নাকি তাঁহার বক্তৃতা হইতে কাশ্মীর ও খালের পানি বিষয়ক কতিপয় বিষয় শেষ পর্যন্ত বাদ দিয়া দেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের বক্তৃতায় জনাব সোহরাওয়ার্দী কাশ্মীর ও খালের পানি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই।

[অসমাপ্ত]

www.pathagar.com

বাংলার কৃষক ! তোমরা প্রস্তুত হও

[১৯৭২ সালের ২৯শে এপ্রিলে ঢাকার শিবপুরে কৃষক সমিতির প্রতিনিধি ও কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণী]

বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ, দুনিয়ার মজলুম মানুষ, দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষকে তোমরা মুক্ত করো—আমরা মুক্ত করবোই করবো।

শুধু বাংলাদেশের কৃষকের জন্য আমরা কৃষক সমিতি গঠন করি নাই, শুধু বাংলাদেশের কৃষকের মুক্তির জন্য কৃষক সমিতি গঠিত হয় নাই, দুনিয়ার কৃষক, দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির জন্যে বাংলার কৃষক সমিতি গঠন করা হইয়াছে। (বিপুল করতালি ও স্লোগান)।

ভারতের কৃষকের দুঃখ, ইরানের কৃষকের দুঃখ, বার্মার কৃষকের দুঃখ, নেপালের কৃষকের দুঃখ, ভুটানের কৃষকের দুঃখ, কাবুলের কৃষকের দুঃখ, বাংলাদেশের কৃষকের দুঃখ—এক দুঃখ। এক মানুষ, এক আত্মা, এক দেহ্। মনেপ্রাণে তোমরা কৃষক সমিতির কাজ করে যাবে। ভাষার দৃষ্টিকোণে আমরা বাঙালী, তবে বাংলাদেশের কৃষক সমিতি বাংলার ভৌগোলিক রেখার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে না। আমাদের আন্দোলন, আমাদের সংগ্রাম সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, কৃষক মজুরের মুক্তির জন্য। (বিপুল করতালি—মজলুম জননেতা—মওলানা ভাসানী, বাংলার বীর সেনানী প্রভৃতি ধ্বনি)।

আজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের জাল সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত, দুনিয়ার বুক হইতে সাম্রাজ্যবাদকে খতম না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে, চলবে, চলবে। (বিপুল করতালি, ভাসানী তোমায় লাল সালাম প্রভৃতি ধ্বনি) দুনিয়ার পুঁজিবাদকে খতম না করা পর্যন্ত বাংলার কৃষক সমিতির সংগ্রাম চলবে, চলবে, চলবে।

আমি আশা করি, কৃষক কর্মী ভাইয়েরা শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি না করে ৬২ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুন। আমার মা-বোনেরা, আমার ভগ্নি-ভাইয়েরা সত্যিকার কাজ করুন। বিলাসিতা বর্জন করুন। আর সব পদাঘাত করে কৃষক সমিতির সংগ্রামে নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।

আজ আমাদের কাজ কৃষকদের বাড়ীতে, কৃষকদের ঘরে, কৃষকদের হাঁড়ির তরকারী খেয়ে, কৃষকদের কুঁড়ে ঘরে বাস করে, কৃষকদের ধানের ক্ষেতে, কৃষকদের পাটের ক্ষেতে। কৃষক সমিতির কাজ শহরের রেস্টুরেন্টে নয়, বড় বড় হোটেলে নয়, আলীশান বাঙলোতে নয়।

কৃষক কর্মী ভায়েরা, প্রতিনিধি ভায়েরা, গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ুন, চলে যান। যতদিন আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদ—যে সমাজতন্ত্র সর্বরোগের মহৌষধ মকরধ্বজরূপে কাজ করবে—

www.pathagar.com

সে সমাজতন্ত্রবাদ যতদিন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত শহরে ফিরবেন না। বাড়ী নাই—ঘর নাই—আত্মীয় নাই—স্বজন নাই—ভোগ নাই—বিলাস নাই—আমাদের কাজ দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির কাজ। তাই আপনারা কালবিলম্ব না করে সকল ইউনিয়নে কৃষক সমিতি গঠন করুন। কৃষক সমিতির রসিদের বই ঢাকায় পাবেন, যদি আমাদের পক্ষে রসিদ দেয়া সম্ভব হয়। কারণ কৃষক সমিতির হাতে টাকা নাই। আমরা ধনিক-বণিকের সাহায্য চাব না, পুঁজিপতিরা সাহায্য আমাদের দেবে না, কৃষক আন্দোলনে তারা কেউ সহানুভূতি দেখাবে না। কারণ, তাদের মতে দুনিয়ায় গরীব রবে না, তা হতে পারে না! ধনী কখনো গরীবের বন্ধু নয়, জালেম কখনো মজলুমের বন্ধু নয়, শোষক কখনো শোষিত মানুষের বন্ধু নয়, তারা চিরশত্রু। জাত-শত্রুকে উচ্ছেদ করতে হলে আপনাদের নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড় করুন। গ্রামে গ্রামে যান, মুষ্টি চা'ল তুলুন। বোরো ধান, ডাল, সরিষা এক মুঠো করে ভিক্ষা করুন। কৃষক সমিতিকে গড়ে তুলুন। কৃষক সমিতির কাজ প্রত্যেক থানায় নিয়ে যান, প্রত্যেক ইউনিয়নে নিয়ে যান, ৬২ হাজার গ্রামে নিয়ে যান। শুধু সভা বক্তৃতা বিবৃতির দ্বারা দেশে দেশে কৃষক সমিতি হবে না।

আশা করি আমার কৃষক কর্মী ভায়েরা—যারা দূর দূরান্তর হতে বহু ত্যাগ কষ্ট সহ্য করে, বহু অর্থ ব্যয় করে, আজ বৃষ্টির মধ্যে এখানে এসেছেন, তাদের উচিত গ্রামে ছড়িয়ে যাওয়া।

আমাদের আর বেশী সময় নাই। মুক্তি আমাদের আসন্ন। জয় আমাদের অবধারিত। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌র করুণায় সারা বিশ্বের কৃষক আমরা এক হবো, আল্লাহ্‌র রহমতে সারা দুনিয়ার মজলুম এক সারিতে দাঁড়িয়ে যাবো, সারা দুনিয়ার মজলুম আমরা এক হবো। দুনিয়ার কোন শক্তি নাই, দুনিয়ার কোন তাকত নাই, কৃষক সমিতির সঙ্গে মোকাবেলা করে কৃষককে বাধা দেয়। (বিপুল করতালি)।

কৃষক আজ কষ্ট করে। বাংলার শতকরা পঁচাশি জন কৃষক। বাংলার শতকরা পঁচানব্বই জন কৃষক-মজুর। আমরা আওয়ামী লীগ সরকারকে জানিয়ে দিই—আমরা গদীর জন্য লালায়িত নই, মন্ত্রিত্বকে পদাঘাত করি, প্রেসিডেন্টশীপকে পদাঘাত করি (বিপুল করতালি)। আমরা তোমাদের গদীর জন্য সংগ্রাম করি না, পার্লামেন্টারী ভোটে জয়ী হবার জন্য সংগ্রাম করি না। আমরা পারমিটের জন্য, রিলিফের টাকা লুটপাট করার জন্য, রিলিফের কম্বল দু'খণ্ড করে এক খণ্ড চুরি করার জন্য আমরা রাজনীতি করি না। যারা রিলিফের মাল চুরি করে, আত্মসাৎ করে, তাদের উৎখাতের জন্য আমরা রাজনীতি করি। শুধু বাংলাদেশে নয়, দুনিয়ার চোরাকারবারীকে খতম করার জন্য, দুনিয়ার ঘুষখোরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য, দুনিয়ার জালিমকে ধ্বংস করার জন্য, দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার জন্য আমরা রাজনীতি করি।

গভর্নমেন্ট, কঠোর হস্তে দমন করো না। আজ আমার কৃষক সমিতির কর্মীদিগকে, শ্রমিকদিগের উপর নির্যাতন করা চলবে না। এদেশ শ্রমিকের দেশ, এদেশ গরীবের দেশ, এদেশ কৃষকের দেশ। সাবধান! গরীবের উপর জুলুম করো না। হুঁশিয়ার, যদি গরীবের ভাতে হাত দাও, গরীবের প্রতি নির্যাতন কর, তাহলে মুসলিম লীগের মত, পাঞ্জাবী বর্বরদের মত, পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকদের মত খান খান করে দেব। (তুমুল করতালি ও শ্লোগান)।

www.pathagar.com

দেশে আজ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নাই। চোর-ডাকাত, লুচ্ছা, গুণ্ডায় এদেশ ভরে গেছে। মানুষের জীবনের কোন গ্যারান্টি নাই। গভর্নমেন্ট, কৃষক সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন না করে চোরকে, লুটপাট সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন কর। (বিপুল করতালি ও স্লোগান)।

কৃষক সমিতির কর্মীরা চুরি করে না, গুপ্তহত্যা করে না, আল্লাহ্‌র বান্দা মানুষকে হত্যা করে না, মানুষকে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দেয়, কৃষক সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন করা চলবে না। (বিপুল স্লোগান)।

মস্কোপন্থী সাবধান। মস্কো আমাদিগকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেছে, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমরা লুটপাট সমিতিতে সামিল হয়েছ, গভর্নমেন্টের সক্রিয় দালাল হয়েছ (বিপুল করতালি ও স্লোগান)। আমরা দেশের opposition বিরোধী দল। সরকার ভাল কাজ করুন, আমরা সমর্থন করবো। যদি সরকার নির্যাতন চালায়, দমননীতি চালায়, অন্যায় করে, আমরা সরকারের বিরোধিতা করবো। সরকার যদি জনগণের দাবীকে প্রশ্রয় দেয়, লুটপাট সমিতিকে দমন করে—আমরা সরকারকে সাহায্য করবো। আমরা সরকারের গোলাম নই, সরকারের দাস নই, লেজুড় নই।

মস্কোপন্থী, তোমরা কম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্টদের একটা অতীত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস ত্যাগের ইতিহাস, কোরবানীর ইতিহাস, দুঃখ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ইত্যাদির ইতিহাস। তোমাদের অফিসে কার্পেট বিছানো থাকে ; তোমরা অবাঙ্গালীদের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করো। মস্কোপন্থী, সাবধান হও, সাবধান (জনগণের বিপুল সমর্থনসূচক ধ্বনি)।

বাঙালী হউক, অবাঙ্গালী হউক, যে কোন দলের যে কোন মতের যে কোন গ্রুপের যে কোন বক্তিকে বিনা বিচারে শাস্তি দেয়া চলবে না, বিনা বিচারে কারো বাড়ী দখল করা যাবে না। সাবধান, যদি দখল করো। আওয়ামী লীগ সরকার! মানুষের গাড়ী, বাড়ী, ফ্যাক্টরী দখল করে, যারা গাড়ী, বাড়ী দখল করে, গুণ্ডামী করে, তাদের বিচার নাই। গভর্নমেন্ট সমস্ত বাড়ী সমস্ত জমি জাতীয়করণ কর, সমস্ত কারখানা জাতীয়করণ কর, সমস্ত বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ কর। বিনা বিচারে যারা জেলে আটক আছে, তাদের বিচার কর। বিচার করে ফাঁসী দাও। তাতে কারো কোনও আপত্তি নাই। বিনা বিচারে কাকেও আটক করা করা যাবে না। আমাদের বাংলাদেশে বিনা বিচারে কাকেও শাস্তি দেওয়া যাবে না।

আমাদের দাবী—কৃষকের প্রতিনিধিগণকে শাসনতন্ত্রে স্থান দিতে হবে। আগামী শাসনতন্ত্রে যদি কৃষকের দাবী মঞ্জুর না হয়, সে শাসনতন্ত্র যদি কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতীদের কল্যাণের জন্য না হয়, মুক্তির জন্য না হয়—তাহলে আমরা সে শাসনতন্ত্র মানব না। দাবীর অধিকার যদি শাসনতন্ত্রে পূর্ণভাবে বিধিবদ্ধ না হয়, তাহলে সে শাসনতন্ত্র আমরা মানব না। আশা করি, সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ করবে। আওয়ামী লীগ সরকার স্থিতিশীল হউক, আমাদের কোন আপত্তি নাই, শেখ মুজিবর রহমান ১২ বৎসর প্রাইম মিনিস্টার থাকুক কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কৃষকের প্রাণের দাবী, শ্রমিকের প্রাণের দাবী, পিয়নের প্রাণের দাবী, খানসামার প্রাণের দাবী সমাজতন্ত্র বাদ দিলে চলবে না।

www.pathagar.com

সমস্ত বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, যে কোন বিদেশী পুঁজি ভারত হোক, জাপান হোক, চীন হোক, রাশিয়া হোক, আমেরিকা হোক, তোমার সকল বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে সরকারের অধীনে সকল ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয় স্বার্থে গড়ে তুলতে হবে।

বেকার সমস্যা—আজ দেশের ৮০ লাখ লোক বেকার। শিক্ষিত বেকার, অশিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বেকার, জেলে বেকার, লোহার অভাবে কামার কাজ করতে পারে না, সুতার অভাবে তাঁতী কাজ করতে পারে না, কাঠের অভাবে সূত্রধর কাজ করতে পারে না। আজ অভাব এক নয়, দুই নয়, হাজার হাজার। আজ কেরোসিনের দাম তিন টাকা হতে ১২ টাকা, চাউলের দাম ৮২ টাকা, চিনির দাম ৬ টাকা, তিন টাকার লুঙ্গি কাপড় দশ টাকা, মেয়েদের তাঁতের কাপড় আজ ১৫।২০ টাকা। সমস্ত দিন কৃষক, ক্ষেত মজুর মাটি কাটে—দেড় টাকা পাওনা। গভর্নমেন্ট শুধু সি. এস. পি.র চাকরির ব্যবস্থা করলে হবে না, শুধু এম. সি.এ.-দেরকে বেশী টাকা দিয়ে ভরণপোষণ করলে চলবে না, সমানভাবে কৃষককে দাও, মজুরকে দাও। আজ বৃষ্টির দিনে মজুররা—তিন কোটি মানুষের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে বর্বর সৈন্যরা—আজ পর্যন্ত মুক্ত আকাশের নীচে তারা বাস করে। এক কোটি হিন্দু শরণার্থী, মুসলমান শরণার্থী—যারা হিন্দুস্তানে গিয়েছিল—তারা ফিরে আসলে গভর্নমেন্ট পুনর্বাসনের জন্য টাকা দিয়েছে ত্রিশ কোটি। ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা, Maximum এক শত টাকা—ও টাকা দিয়ে একখানা বেড়াও হয় না। গভর্নমেন্ট ঠাট্টা মস্কারী বাদ দাও। বর্ষা আসার আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কর। না হলে মুজিবর, তুমি বৃষ্টির মধ্যে ময়দানে থাকো, ভাসানী থাকবে, কৃষক থাকবে, মুজিব থাকবে, সব্বাই থাকবে। (বিপুল করতালি ও শ্লোগান)। বেগুন খিচুড়ি রেঁধে মুজিবর তুমি খাও, মোস্তাক খাও, তাজুদ্দিন খাও, ভাসানী খায়, কৃষক কর্মীরা খায়। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, সকল দলের, সকল মতের মানুষ যদি খিচুড়ি খায়, ডাল সিদ্ধ করে খায়, কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। (বিপুল করতালি ও ধ্বনি)। কেউ পোলাও খাবে, কেউ কচুরিপানা খাবে, তা হবে না, তা হবে না (জনগণ উন্মত্তের মত এ শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি করে)। বাংলার মানুষ স্বাধিকার পেয়েছে। বড় লোকের মেয়েরা কেরোলিনের শাড়ী পড়বে আর কৃষকের মেয়েরা ছেঁড়া তাঁত পড়ে থাকবে; তা হবে না, তা হবে না, তা হবে না।

সকলে শোষিত মানুষ, সকলে নিপীড়িত মানুষ, শুধু মুখে প্রচার করলে চলবে না, শুধু ঈদের জামাতে কোলাকুলি করলে চলবে না, খোদার ঘরে গিয়ে গণতন্ত্র পালন করলে চলবে না। সব মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে শোষণের স্থান নাই। মানুষের দাবী পূরণ করো। আল্লাহ্ সহায় হবে, ভগবান সহায় হবে, ঈশ্বর সহায় হবে।

গভর্নমেন্ট এইভাবে রাজ্য চালালে চলবে না। আজ স্বাধীনতা লাভ হয়েছে সকল স্তরের, সকল দলের, সকল গ্রুপের, সকল মতের, সকল ধর্মের মানুষের জন্য।

আজ—যারা মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, পাঞ্জাবী সৈন্যদের নিয়ে বর্বর অত্যাচার করেছে, প্রাণ হাত নিয়ে যারা কামান ধরে নাই—তারাই আজ দেশের কর্তা, হর্তা, বিধাতা। আর যারা পালিয়ে হিন্দুস্থানে যায় নাই, যারা মুক্তিবাহিনীকে দু'বেলা খাবার দিয়েছেন, গোয়ালঘরে স্থান দিয়েছেন, ঘরের কোণায় স্থান দিয়েছেন—পাঞ্জাবী সৈন্যরা বলতো, দেখো

www.pathagar.com

তোমরা যদি মুক্তিকে ঘরে স্থান দাও, বাড়ী জ্বালিয়ে দেব, তোমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করব—এদেশের কৃষক স্বাধীনতাকে এতই ভালবাসে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করে যে মুক্তিবাহিনীকে ঘরের কোণায় লুকিয়ে রেখে বলেছে,—"নাই, নাই, নাই।" গোয়াল ঘরে লুকিয়ে রেখে বলেছে, "নাই, নাই, নাই।" নিজেরা না খেয়ে, ছেলেমেয়েদের উপবাস রেখে মুক্তিবাহিনীকে খাবার দিয়েছে। যে মুক্তিরা শরীরের রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই মুক্তিদের আজ মিলিশিয়া চাকুরি হয় না।—আর বর্বর সৈন্যদের ব্যভিচারে, গুনাহগারীতে আজ আমার দুই লক্ষ মা-বোন গর্ভবতী হয়েছে। এই গর্ভবতী মাদের কি অবস্থা হবে? হে পুঁজিপতি, তোমরা যদি মানুষের প্রতি মনুষ্যত্ব দেখাইতে চাও, এসব গর্ভবতী মেয়েদেরকে সসম্মানে গ্রহণ কর।

কথায় বার্তায়—কথা বলে ফেরেশতার মতো। কাজ করে শয়তানের মতো! আর সমাজ-তন্ত্রের কথা কয়!! আজো চার মাস হয় নাই; তিনতলা, পাঁচতলা দালান কি করে হয়েছে? তোমরা কি জানো না, সমাজতন্ত্র হলে কারো নিজস্ব বাড়ী থাকবে না? পকেটও থাকবে না। পকেটমারও থাকবে না। পকেট যদি থাকে, পকেটে ঘড়ি থাকে, পকেটে ফাউন্টেন পেন থাকে, পকেটে মাল থাকে, পকেটে টাকা থাকে। আর যদি আইন করে দেওয়া যায়—এদেশের মানুষ হিন্দু হও, মুসলমান হও, শিক্ষিত হও, অশিক্ষিত হও, কৃষক-মজুর বর্গাদার হও, ক্ষেতমজুর হও, পকেট রাখতে পারবে না। তাহলে পকেটমার থাকবে না। পকেট—ব্যক্তিগত মালিকানা যত দিন থাকবে, চুরি থাকবে, ডাকাতি থাকবে, গুণ্ডামী থাকবে, লুচ্ছামী থাকবে। শোষণ থাকবে। চোরাকারবারী থাকবে। যেদিন থেকে দুনিয়ার বুক হতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হবে সেদিন হতে মানুষ ব্যক্তিগত চিন্তা করবে না, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করবে। সবার চিন্তা করবে, সারা বিশ্বের জন্য চিন্তা করবে।

আমি তাই বলি, বাংলার জনতা কালবিলম্ব না করে জুন মাসের মধ্যে কষক সমিতি গড়ে শেষ করে নাও। জুন মাসের শেষের দিকে আমরা কাউন্সিল সভা বসাবো। এই সভায় নির্বাচিত হবে—ইউনিয়ন নির্বাচন করে প্রতিনিধি পাঠাবে থানায়; থানায় নির্বাচন করে পাঠাবে মহকুমায়, জেলায়। কিন্তু আজ আমাদের ৬২ হাজার গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে তোলার দরকার। কৃষক সমিতি গড়ে তুলুন প্রতিটি ইউনিয়নে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি থানায়। আমার ভাই-বোনেরা কাজে নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।

আমি বেশী বলতে পারি না—আমার বয়স ৯০ বৎসর। আপনাদের মত জোয়ান না। দাঁত নাই। কথা ভুল হয়ে যায়—বুঝা যায় না। যাই হোক আমি শেষ বলি ঃ আমরা আগামী-কাল কৃষক জনসভা করব—ঝড় হোক, বাদল হোক। আমরা সংগ্রামে নেমেছি—তুফানের সাথে সংগ্রাম করব, বৃষ্টির সাথে সংগ্রাম করব, জালেমের সাথে সংগ্রাম করব। শোষকের সাথে সংগ্রাম করব। আর ২৮শে মে ২৯মে কৃষক শ্রমিক সম্মেলন হবে। কৃষক শ্রমিক এক না হলে, এক অঙ্গ এক সহোদর না হলে, এক হয়ে যদি না লড়ি, আমাদের মুক্তি আসবে না। আগামী ২৮, ২৯শে মে টঙ্গীতে বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক মৈত্রী সম্মেলন হবে। এটা হবে কৃষক এবং শ্রমিকের মিলিতভাবে। কৃষক শ্রমিক ভায়েরা যে যেখানে থাক প্রচার কর, বলতে থাক, "চলো চলো—টঙ্গী চলো।"

www.pathagar.com

আমাদের টাকা নাই, পয়সা নাই, প্রচার করার কিছুই নাই। খবরের কাগজ পুঁজিপতিদের, সাংবাদিকেরা কিছু লিখলে চাকরি যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই আমাদের নিজের কাজ নিজে করতে হবে। যদি আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হতে না পারি তাহলে সংগ্রাম সফল করতে পারব না। গ্রামে গ্রামে, পথে ঘাটে সবখানে গিয়ে প্রচার করুন—"টঙ্গীতে চলো, নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করার জন্য। রাস্তা পাবার জন্য, পথ আবিষ্কার করার জন্য, দুনিয়ার জালেমকে ধ্বংস করার জন্য।"

আজ ভিয়েতনামের কৃষক সমিতির কর্মকর্তারা যে 'তার' দিয়েছে, সহানুভূতি দেখিয়েছে, তার জন্য জানাই আমি তাঁদের প্রতি অভিনন্দন, মোবারকবাদ।

আর হিন্দুস্থান গভর্নমেন্ট, গণতান্ত্রিক সরকার। মোজাফ্ফর আহমদের মত দরদী, নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ, বীর সেনাপতি শুধু পাক-ভারতে বা বাংলাদেশে নেই বললে সত্যের অপলাপ হবে, তাঁর মত পুরুষ আফ্রো-এশিয়াতে নাই। এহেন বীরকে ইন্দিরা সরকার পাসপোর্ট না দিয়ে, পারমিট না দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি পদাঘাত করেছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আবদুল্লা রসুলসহ অন্যান্যকে না আসতে দিয়ে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। অন্যান্য প্রগতিশীল কর্মিগণকে না আসতে দিয়ে হিন্দুস্থান সরকার গণতন্ত্রের মাথায় পদাঘাত করেছে। আমরা কৃষকদের কোন ভৌগোলিক সীমা নাই। সারা বিশ্বের মজুর এক হও এই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ খতম করার জন্য।

আমার কৃষক শ্রমিক ভায়েরা, আমার মা-বোনেরা কষ্ট স্বীকার করে দলে দলে এই সভায় যোগদান করেছে। এই অঞ্চলের কৃষকেরা এই সম্মেলনে সর্বতোভাবে আন্তরিক সাহায্য করেছে, আমি তাদের মোবারকবাদ জানাই। আমি স্বেচ্ছাসেবকগণকে মোবারকবাদ জানাই। এই অঞ্চলের যুবকেরা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে, প্রচার চালিয়েছে, আমি জানাই তাদেরকে মোবারকবাদ। একবার জোরদার স্বরে বলুন—আজাদ বাংলাদেশ (জনতা) জিন্দাবাদ। স্বাধীন বাংলাদেশ (জনতা) জিন্দাবাদ। কৃষক সমিতি (জনতা) জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা

[১৯৭৪ সালের ৭ এপ্রিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সন্তোষে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রদত্ত ভাষণ।]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচনার আগে ইসলামী শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষা ব্যবস্থাই কোন না কোন জীবন ব্যবস্থা তথা জীবন-দর্শনের অনুসারী। শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন জীবন-দর্শনের স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটে, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমনি জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে জীবন-ব্যবস্থার নির্মাণে ও বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।

পৃথিবীতে যে সব জীবন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার কোন কোনটিতে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃত অথবা উপেক্ষিত; আবার কোন কোনটি গড়ে উঠেছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসজাত জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল সূত্র হচ্ছে স্রষ্টার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। স্রষ্টার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস এ বিশ্বাস জীবনের কোন একটি দিককে একান্ত, চরম ও পরম গণ্য করে না; আত্মিক এবং বৈষয়িক অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ, বিকাশ ও পরিপূর্ণতাই এর লক্ষ্য। আধুনিক কালের কোন কোন মতবাদ বৈষয়িক উন্নতিকেই চরম ও পরম গণ্য করেছে এবং এরূপ মতবাদের কল্যাণ প্রচেষ্টা বৈষয়িক ক্ষেত্রে বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু বৈষয়িক সাফল্যই কি মানুষের জীবনের সবটুকু? বৈষয়িক দিক সমগ্র মানব সত্তার একটি দিকমাত্র। যাঁরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশাসী তাঁরা মনে করেন—মানুষের নৈতিক ও আত্মিক জীবন তার বৈষয়িক জীবনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনের এ দুটি দিক বাদ দিয়ে আমরা যে বৈষয়িক মানুষকে পাই সে মানুষ গোটা মানুষ নয়! ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি ছাড়া বৈষয়িক উন্নতি মানুষকে অন্ধ করে তোলে; আবার বৈষয়িক উন্নতিকে বাদ দিয়ে আত্মিক উন্নতি মানুষের জীবনকে করে তোলে অবাস্তব ও অসামাজিক। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও পরিপূর্ণতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপই যেহেতু ইসলাম তাই ইসলামই খাঁটি অর্থে বিজ্ঞানসম্মত জীবন-ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্য পূর্ণ মানুষের বিকাশ, আংশিক মানুষের নয়; দেহ, মন আত্মার সম্মিলনে যে গোটা মানুষ, যার বিচরণ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বিশাল পরিবেশে এবং মনোলোক ও অধ্যাত্মলোকের রহস্যময় অঙ্গনে, সেই মানুষের সকল সম্ভাবনার বাস্তবায়নই এ জীবন ব্যবস্থার অভীষ্ট, ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাই।

অজ্ঞতার কারণে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, ভাষাগত, বর্ণগত বিভেদের যে সব প্রাচীর সৃষ্ট হয়ে আছে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস তার মূলে কুঠারাঘাত করে; কারণ স্রষ্টার

www.pathagar.com

একত্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় মানব জাতির একত্ব। স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসের মতই মানব জাতির একত্বে বিশ্বাসও যেহেতু ইসলামের একটি মূল সূত্র—তাই বাস্তব জীবনে এ বিশ্বাসের তাৎপর্য ও উপলব্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন তার অনুপ্রেরণাও উপরোক্ত বিশ্বাস থেকে মিলে। এভাবে উদার অণ্বেষার মাধ্যমে সংস্কার ও অজ্ঞতার বেড়াজাল ছিন্ন করে, বিভেদের সব প্রাচীর গুঁড়িয়ে দিয়েই স্থাপিত হতে পারে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ; আর তাতে করেই বিশ্বের "সকল মানুষ মিলে একটি মাত্র জাতি"—আল-কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবতায় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে আমাদের জীবনে। বস্তুত এই জিজ্ঞাসা ও অণ্বেষাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম মৌল প্রেরণা।

অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী শিক্ষায় কেবল মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরই অধিকার রয়েছে। ইসলাম একটি সার্বজনীন ও সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাজা, বাদশা, সুলতান ও ধনিকদের কল্যাণে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ইসলাম আজ সালাত সিয়ামসর্বস্ব এক পারলৌকিক মতবাদে পরিণত হয়েছে বলেই ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা অনেকের ভিতর বিদ্যমান। বস্তুত এই আনুষ্ঠানিক ইসলাম আমাদের মনগড়া ইসলাম, আল্লাহ্‌র মনোনীত মানব-প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলামের আল্লাহ্‌ রাব্বুল-আলা-মীন—সমগ্র বিশ্বের লালন-পালন ও বিবর্তনকর্তা, ইসলামের নবী রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন—বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ও রহমত এবং ইসলামী জীবন আদর্শ মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত স্বাভাবিক জীবন-বিধান। কাজের শুরুতেই আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, ইসলামী শিক্ষার অর্থ অধুনা প্রচলিত মনগড়া ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা নয়, বরং ইসলামী জীবন-দর্শনের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার অনুশীলনই ইসলামী শিক্ষা, ইসলাম বিষয়ক শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ শিক্ষা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয় ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত। ইসলাম যেহেতু জীবনকে ধর্মীয় ও ধর্ম-বহির্ভূত— এ দু'ভাগে ভাগ করে না সে কারণে মানুষের সকল চিন্তা, কর্ম ও উপলব্ধিই ইসলামের আওতার মধ্যে পড়ে। সুতরাং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখা-প্রশাখাই ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত নয় ; জীবনের সাথে সম্পর্কিত কোন বৃত্তি বা পেশাও ইসলাম-বহির্ভূত নয়। এক কথায়, মানুষ আত্মা ও বুদ্ধি, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ গোটা মানব জীবনই ইসলামের পরিমণ্ডলভুক্ত। বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তার প্রত্যেকটি সৃষ্টির সূচনা বিকাশ ও লালন-পালনের জন্যে বিধান প্রণয়ন করেছেন ; সেইসব বিধান অনুযায়ী জড়জগত, জীবজগত ও মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিশ্ব-রূপ পাঠশালায় এ সব নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তার আলোকে নিজেদের জীবন-দৃষ্টি এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবন গড়ে তোলার প্রাচেষ্টা ও সাধনাই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি তথা দেহ ও আত্মার বিকাশের অনুকূল মানব কল্যাণমুখী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টাই ইসলামী শিক্ষার বিষয়বস্তু। রসূলে করীম (স.) যখন বলেন, "সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন কর", তখন তিনি কোন বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেন না। নিষ্ঠার সাথে জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে স্রষ্টার অনন্ত মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায় ; এ হলো জ্ঞান অর্জনের তাত্ত্বিক দিক। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের

www.pathagar.com

বিকাশ সাধন ও জীবনের সকল সমস্যার মোকাবিলার জন্য যোগ্যতা এবং দক্ষতার সৃষ্টি। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার দেহ ও আত্মার উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু মানুষ যেহেতু বৃহত্তর মানব সমাজের একটি অঙ্গ—তাই শুধু নিজের আত্মার ও দেহের উন্নতির মধ্যে সামগ্রিক উন্নতি ও পরিপূর্ণ শান্তি সুদূর পরাহত; তাই সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ উন্নতির জন্য নিজের উন্নতির সাথে সমাজের অন্যান্য সবার উন্নতির পথ প্রশস্ত করাও অপরিহার্য অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের অর্থ হবে নিজের এবং অপরের সামগ্রিক কল্যাণ। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিকে নিষ্প্রভ না করে সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দিবে।

ইসলাম মনে করে মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মখ্‌লুকাত বা সৃষ্টির অভিজাত। সে জন্মগ্রহণ করে অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে; এই সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব সম্ভাবনার বাস্তবায়নে সাহায্য করা, প্রতিটি মানুষের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করা। এসব সুপ্ত সম্ভাবনার বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিই হবে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তির প্রতিভা যাতে তার জীবন ধারণের সহায়ক হয়, এজন্য তার আত্মিক ও মানসিক গুণাবলী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব প্রতিভা অনুযায়ী উৎপাদনমূলক কাজে শৈশব থেকে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন। এভাবে ব্যক্তির দেহ-মন-আত্মা এক সঙ্গে বিকশিত হলে সে সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রকৃত মানুষ সৃষ্টিই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আল-কুরআনের মতে—মানুষ পৃথিবীতে রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের মাঝে সুপ্ত রয়েছে ঐশী গুণাবলী। মানুষ যাতে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এসব গুণকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় তার যথাযথ আয়োজন থাকবে।

ইসলামী শিক্ষা কোন গোষ্ঠী-বিশেষের জন্য নয়। উপরে বিবৃত আদর্শের আলোকে নির্দ্বিধায় এ দাবী করা যেতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষা অসাম্প্রদয়িক এবং সার্বজনীন, জাতি-ধর্ম-দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত। ইসলামী জীবন-দর্শনের একটি মৌলিক প্রত্যয় এই যে, আলো-হাওয়ার মতই জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র অকৃপণ দান, তাঁর খাস রহমত। এতে সকলেরই রয়েছে জন্মগত অধিকার; ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জাতি বা ভাষাগত কোন ভেদাভেদের প্রশ্ন তুলে কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলাম দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করে, 'লা ইক্‌রাহা ফী-দ্দীন'—ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, "লাকুম দীনুকুম ওলিয়া দীন"—তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য। কাজেই পরমতসহিষ্ণুতা এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই ইসলামী জীবন-দৃষ্টির অন্যতম মৌল প্রত্যয় সাম্প্রদায়িকতার কোন অবকাশ এতে নেই।

সৌন্দর্য তথা সংস্কৃতি ও পরিমার্জনাকে ইসলাম অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর অর্থাৎ সংস্কৃতিবান মানুষ সৃষ্টি করা। আচারে, ব্যবহারে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কলুষ ও কুসংস্কার পরিহার করে চলে সেই হল সুন্দর মানুষ। আমাদের উদ্দিষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই মানুষকে সুন্দর ও সংস্কৃতিবান করে তুলবার ব্যবস্থা থাকবে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিগত জীবনে হবে কলুষমুক্ত, সামাজিক জীবনে হবে ত্যাগী ও সেবাপরায়ণ। জীবনকে তারা উপভোগ করবে কিন্তু ভোগকে করবে পরিহার। তত্ত্বজ্ঞানে শিক্ষিত করে সমাজ থেকে আলাদা একটি পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শ্রেণীটি কোন কিছু উৎপাদন না করেই ভোগ করে নির্লজ্জভাবে। ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা এ ধরনের কোন পরগাছা সৃষ্টি হতে দেবে না। এই শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর নিবিড় সম্পর্ক থাকবে দেশের মাটির সাথে; কোন শ্রমকেই তারা হেয় বা ঘৃণ্য মনে করবে না। বস্তুত শ্রমের বিনিময়েই পাবে তারা উৎপাদিত সম্পদে নিজেদের যথোপযুক্ত অধিকার। মহানবী (স.) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শ্রমের যে মর্যাদা দিয়েছেন সে দৃষ্টান্তকেই তারা সামনে রাখবে আদর্শ হিসেবে। কায়িক শ্রমকে শিক্ষার্থীরা যাতে নিন্দনীয় মনে না করে এবং নিজেদের যাতে তারা শিক্ষাজীবন থেকে সর্ব প্রকার কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত করে নিতে পারে তার জন্য প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৈহিক শ্রমের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হবে। যে সব শিক্ষায় দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন, যথাঃ তাঁত বুনা, কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি—এর যে কোন একটি বিষয়কে ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, ছাত্রছাত্রীরা কাজ করবে সব্জির বাগানে, নিজেরা রান্না করবে এবং নিজেরাই পরিবেশন করবে। এক কথায়, ক্ষেতে খামারে কাজ করে, বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত থেকে, মৎস্য চাষ করে এবং আরও নানাবিধ উৎপাদনমূলক কাজের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আহার্যের সংস্থান করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। জীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে ছাত্রছাত্রীদের এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছাত্রছাত্রীরা আর পরমুখাপেক্ষী হবে না।

নিয়ম-শৃংখলার ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোভাব হবে অনমনীয়। তবে নিয়ম-শৃংখলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য কর্মচারী সবাই যাতে সানন্দে গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন নিয়মকে কারও উপর চাপিয়ে দিয়ে নিয়মকে কার্যকর করা যায় না, নিয়ম যদি হয় সুন্দর এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যদি নিষ্ঠার সাথে এরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলেন তাহলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টান্ত থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা সমীচীন হবে। অন্যায় বা অসত্যের সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কেউ কখনও আপোষ করবে না, তারা হবে সত্যের পূজারী। সত্য এবং ন্যায়ের জন্যে প্রাণপাত করতে তারা দ্বিধা করবে না। তারা হবে সত্যের নির্ভীক সৈনিক। যে কোন অনাচার, অত্যাচার বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা যাতে সব সময়ই রুখে দাঁড়াতে পারে সে মনোবল ও চরিত্রবল সৃষ্টি করা হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ইসলাম এসেছে নির্যাতিত মানুষের সার্বিক কল্যাণ কামনায়। নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মহান মন্ত্র তাই ছাত্রছাত্রীরা ইসলাম থেকেই আহরণ করবে। অত্যাচারী বা শোষককে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করেন না। দ্ব্যর্থহীনভাবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এ সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে আল-কুরআনে। আল-কুরআনের মন্ত্রে দীক্ষিত ইসলামী বিশ্ববদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাই জালেমের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাবে আপোষহীন সংগ্রাম।

www.pathagar.com

সুস্থ দেহ ব্যতিরেকে সুস্থ মন গড়ে উঠতে পারে না। তাই দৈহিক প্রশিক্ষণ হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি অবশ্য পাঠ্য। তা ছাড়াও দেশীয় নানা রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হবে। বেসামরিক প্রতিরক্ষাতেও তারা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলবে। মল্ল-যুদ্ধ, অসি চালনা, কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থাও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের জনগণের জীবন ব্যবস্থার তথা জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিত উদ্ভাবিত নয়—এ শিক্ষা পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত হয়েছিল পুঁজিবাদের ধারক-বাহক, উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। গোলামী মানসিকতা সৃষ্টির জন্য উদ্ভাবিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন, উদার, উন্নত এবং চরিত্রবলসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। এদেশের মূল জীবন প্রবাহের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবর্জিত বলেই এ শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্বাবলম্বী মানুষ সৃষ্টি করতে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এ শিক্ষা ব্যবস্থা আজ স্বাভাবিকভাবেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিজের পথ হারিয়ে বসেছে। দেশ কাল ও জীবনের সাথে সঙ্গতিহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সমাজের সর্বস্তরে আজ যে শোষণ, জুলুম ও দুর্নীতি চলছে তার জন্য মূলত দায়ী। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবর্জিত এই শিক্ষা মানুষের ভিতর যে সীমাহীন লোভের আগুন প্রজ্বলিত করেছে সে আগুনে আজ ভস্মীভূত হতে চলেছে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ও উৎকর্ষের মহান অঙ্গীকার। এ লোভের আগুনই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, একের প্রতি অন্যের দরদ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চিন্তায়, আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে অন্ধ পরানুকরণের মধ্যে বর্তমানের শিক্ষিত সমাজ তার সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের সন্ধান করছে; হীনমন্যতা পৌঁছেছে চরমে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম এবং প্রাচ্যের অবদানকে এমন বিকৃতভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে তারা শুধু নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীনই হয়ে পড়ে না, যে কোন সুযোগে তার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে আনন্দও লাভ করে।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং এই উদ্দেশ্যেই আমরা প্রস্তাবনায় বিবৃত আদর্শের ভিত্তিতে সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই উদ্যম সফল হলে শুধু যে বাংলাদেশেই মনুষ্যত্বের নতুন অনুশীলন শুরু হবে তা নয়, মুসলিম জাহান তথা গোটা বিশ্বের জন্যও তা হবে আদর্শস্থানীয়।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানীর সর্বশেষ লিখিত ভাষণ

[১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর শনিবার শেষবারের মতো মওলানা ভাসানী সন্তোষে আসেন। স্মৃতিময় সন্তোষে এসেছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে। সন্তোষে তিনি এদিন 'খোদায়ী খিদমতগার'-এর এক অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন। এটাই তাঁর শেষ ভাষণ। ঐ দিনই তিনি হাসপাতালে চলে যান এবং ১৭ নভেম্বর বুধবার রাত সাড়ে আটটায় তিনি ওফাত লাভ করেন।]

আমার জীবনে শতাব্দী পূর্তির আর অধিক বাকী নাই। বার্ধক্য ও দীর্ঘ অসুস্থতা মাথায় লইয়া হয়ত বা শেষবারের মত খানায়ে কা'বার তওয়াফ ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাজার শরীফ জিয়ারতের নিয়ত করিয়াছি। আপনাদের সকলের দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ আমার এই এরাদা পূরণ করিবেন—এই উমেদ রাখি। যাইবার প্রাক্কালে সকলের নিকট হইতে দোয়া ও মা'ফি চাহিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে আপনাদিগকে দাওয়াত করিয়াছি। কারণ এই বৃদ্ধ বয়সে সকলের বাড়ী যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কোন পাওনা-দেনা থাকিলে চাহিয়া নিবেন অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করিয়া দিবেন। কাহাকেও কোন কষ্ট দিয়া থাকিলে মনে রাখিবেন না।

অন্যায়ের প্রতি অনীহা আমাকে সারা জীবন বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতায় প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই স্বভাবজাত প্রবণতার সহিত যোগ হইয়াছে আসামের জলেশ্বরের সূফী সাধক হযরত শাহ নাসিরুদ্দীন বোগদাদীর অধ্যাত্ম শিক্ষা। আরো যোগ হইয়াছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধাপে ধাপে খেলাফত আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান যুগে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্ত-শাসন হইতে স্বাধিকার, স্বাধিকার হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন—এই সবই আমি ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু হইতে অবলোকন করিয়াছি।

বাংলাদেশ যুগে আমার মর্মভেদী অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কেমন করিয়া রক্তের সাগর সাঁতরাইয়া এবং আগুনের পাহাড় ডিংগাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া একটি জাতি ক্ষমতালিপ্সু দুর্নীতি-পরায়ণ নেতৃত্বের দোষে মাত্র তিন বছরের মধ্যে দুঃখ ও দুর্দশার অতলে তলাইয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা আমার চিন্তা ও চেতনায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি, আদর্শবোধবর্জিত শ্লোগানধর্মী ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে না। গভীর আদর্শ-বোধসম্পন্ন দৃঢ় চরিত্রবান এবং আপোষহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ সুগম করিতে পারেন। চরিত্র গড়িয়া উঠে আদর্শ-

www.pathagar.com

চেতনা ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে। একমাত্র আদর্শভিত্তিক সংগঠন ও কর্মসূচীর মাধ্যমেই চরিত্রবান নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি হইতে পারে। মুহূর্তের উত্তেজনায় মানুষ চরম আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে হয়ত, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, ধনদৌলত হাতের মুঠায় পাইয়া তাহারাই শুধু ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার পথে অটল থাকিতে পারিবে: যাহারা সঠিক আদর্শবোধ ও উহার দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারিয়াছে।

আমার বিগত ৭৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার হাতবদল কখনো বা অতি নিকট হইতে, কখনো বা কিঞ্চিৎ দূর হইতে অবলোকন করিয়াছি। এই পর্যায়ক্রমিক পট পরিবর্তনের ধারায় আমি নিজেও সাধ্যমত সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছি। কিন্তু যে কৃষক-মজুর-কামার-কুমার-জেলে-তাঁতী-মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আবাল্য দেখিয়া ও সেজন্য সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা আজও সুদূরপরাহত রহিয়া গিয়াছে। তাই আমার সংগ্রামের শেষ নাই। এই সংগ্রাম আজীবন চলিবে। আমার মৃত্যুর পর এই সংগ্রামের উত্তরাধিকার তাহাদের উপর বর্তাইবে যাহারা এক আল্লাহকে প্রভু জানিয়া এবং একমাত্র তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে খেদমতে-খালক অর্থাৎ মানব জাতি তথা সমগ্র সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। জীবনসায়াহ্নে উপনীত হইয়া খোদায়ী খিদমতগার সংগঠন গড়িয়া তোলার পটভূমিকা ইহাই। খোদায়ী খিদমতগাররা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে। মদিনার নবীর আসহাবে সুফ্ফার জীবনই হইবে তাহাদের আদর্শ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং জাগতিক দেনা-পাওনাকে তাহারা এড়াইয়া চলিবে ঘৃণাভরে। মানুষের শাসনবাদকে উৎখাত করিয়া আল্লাহ্‌র শাসনবাদ কায়েম করাই হইবে খোদায়ী খিদমতগারদের লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতি তাহারা সর্বাবস্থায় পরিহার করিয়া চলিবে। সেবা ও সংগ্রামের পথই খোদায়ী খিদমতগারদের পথ। হক্কুল-এবাদ আদায় করাই হইবে তাহাদের সকল কর্মপ্রয়াসের মূলমন্ত্র এবং ইহাই আমার রাজনীতিসহ সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তিমূল।

বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তেমন আশাব্যঞ্জক নয়, সারা দুনিয়া আজ কতিপয় পরস্পরবিরোধী জোটে বিভক্ত। ফলে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতা-গর্বিত মানুষ পরস্পর নিধনের মতলবে বিরামহীন মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ইহারই পরিণতিতে সমগ্র পৃথিবী একটি মারাত্মক অস্ত্রাগারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ছোট-বড়, গরীব-ধনী সকল রাষ্ট্রই এই আত্মঘাতী মাতলামীতে নিমগ্ন। অথচ আজও বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ নিদারুণ দারিদ্র্য কবলিত। এবং এই বিশ্বগ্রাসী সমস্যা ও সংকটের উৎসমূল হইল সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতা জোরদার করিয়া সকলে সার্বজনীন কল্যাণ প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলে অভাবিতরূপ অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বুক হইতে দুঃখ দারিদ্র্য মুছিয়া ফেলা যাইবে। কিন্তু এই আশা ততদিন পর্যন্ত দুরাশাই থাকিয়া যাইবে, যতদিন না মানব জাতি এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব এবং দুনিয়ার সম্পদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার স্বীকার করিয়া লইবে। পারস্পরিক পালনবাদী সম্পর্কই হইবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি। ইহারই নাম

www.pathagar.com

রব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদ। এই দিক হইতে নবজাগ্রত মুসলিম বিশ্বেরও সবিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা সুদৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে তৃতীয় বিশ্বের অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকেই হইতে হইবে রব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারক ও বাহক। আন্তর্জাতিক পরিসরে এই আদর্শের প্রচার ও প্রসার সাধন করাই খোদায়ী খিদমতগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বাংলাদেশ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে। এদেশের মানুষ ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ, শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিসর্বস্ব, ভাওতাবাজ রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা কোন অবস্থাতেই বল্গাহীন দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার এবং সর্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতার রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। সাদা-কাপড়ী দালানবাসী মানুষের রাজ মেহনতি জনতার জন্য শুধুমাত্র দুঃখ ও দৈন্যই বহিয়া আনে। মাঠের মানুষ, কলের মানুষ, খাল-বিল আর নদী-নালার মানুষের রাজ কায়েম করিতে হইবে। ইহারাই এই দেশের শতকরা ৮৫ জন। উৎপাদনশীল গঠনমূলক কর্ম-প্রয়াসের মাধ্যমে ইহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সংগ্রামী ও পালনবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাইতে হইবে। শ্রমজীবী মানুষের হাতে নেতৃত্ব না আসা পর্যন্ত হঠকারী ও শোষণের রাজনীতির অবলুপ্তি ঘটিবে না। বর্তমান মুহূর্তে গণদুশমনেরা ক্ষমতাচ্যুত। কল্যাণমুখী জাতিগঠনমূলক কর্মপ্রয়াসের প্রবণতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে দেশ-বিদেশী শোষক-জালেমেরা অস্থির হইয়া শতবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সকলের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের তাহজীব-তমদ্দুনবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। খোদায়ী খিদমতগারেরা এই লক্ষ্যে নিরলস সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে চার বৎসর যাবত ক্ষমতাসীন দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও অরাজকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে। দেশের উচ্চতম বিদ্যা-পীঠ, বিচারালয় ও প্রশাসন যন্ত্র হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম ধাপ পর্যন্ত দুর্নীতি কলংকজনক-ভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে। ফলে নিদারুণ নৈতিক অবক্ষয় সমগ্র সমাজকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। দুর্নীতির রাজত্বে দারিদ্র্য, দুঃখ-হানাহানি বাড়িবে বৈ কমিবে না। তাই সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার সংগ্রামে খোদায়ী খিদমতগাররা সর্বশক্তিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

উৎপাদনশীল কর্মপ্রয়াস শুধুমাত্র সরকারী তত্ত্বাবধানে চলিতে থাকিলে জনগণের ভাগ্যো-ন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নাই। জনগণকেই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কার্যকলাপে জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। স্বেচ্ছাশ্রম এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিবে। জনগণকে এই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ এবং সংগঠিত ও সক্রিয় করিয়া তোলা খোদায়ী খিদমতগারদের অন্যতম কর্তব্য।

অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার শোষণ জুলুমের সহায়ক। অজ্ঞতাই বিভেদ মানসিকতার জন্ম দেয়। জ্ঞানের অভাবই মানুষে মানুষে বৈরিতা ও হিংসার উৎস। দিকে দিকে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। চিন্তা ও কর্মের উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। সেবাই পরম ধর্ম। এই নীতিবাক্য অনুশীলন করিয়া দেখাইতে হইবে। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পালনবাদী মনোবিপ্লব। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে পালনবাদী জীবনদর্শনের

www.pathagar.com

প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সুশিক্ষিত চরিত্রবান ও জেহাদী চেতনাসম্পন্ন কর্মী তৈয়ার করার লক্ষ্যেই আমি এই ইতিহাসবিশ্রুত খোশনদপুরে (সন্তোষ) হযরত পীর শাহ জামান কাশ্মীরীর (র.) মিশনের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়াছি।

তাই জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা খোদার ওয়াস্তে খোদার বান্দা তথা সমগ্র সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। রব্বানী জীবনবিধান কায়েমের সংগ্রামে আগাইয়া আসুন। রবুবিয়াতের পথই অর্থাৎ সার্বজনীন মানবাধিকার ও সামগ্রিক কল্যাণের পথই সাফল্য ও শান্তির পথ। আল্লাহ্‌র শত্রু অর্থাৎ শোষক, জালিম, মুনাফাখোর, চোরাকারবারী, দুর্নীতিবাজ ও দুস্কৃতকারী-দের দুশমন জানুন। আল্লাহ্‌র দোস্ত অর্থাৎ যাহারা সৎভাবে জীবন যাপন করে,—হালাল রোজগার করে, হক-কথা বলে, শোষিত বঞ্চিতের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করে, আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মানিয়া চলে, তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের দুশমন। তাহা হইলে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী জানিবেন।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

১. অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ ঃ বিশিষ্ট দার্শনিক। শিক্ষাবিদ। লেখক, সাংবাদিক। বাংলাদেশ দর্শন সমিতির চেয়ারম্যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক।

২. অধ্যাপক আবদুল গফুর ঃ বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ। বর্তমানে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা পরিচালক এবং দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার এডিটর।

৩. অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব ঃ বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

৪. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মসউদ খান ঃ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। মওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ।

৫. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান ঃ সাবেক ছাত্র নেতা। বর্তমানে ছাগলনাইয়া কলেজের অধ্যক্ষ।

৬. অধ্যক্ষা মাজেদা আলী ঃ প্রবন্ধকার। খুলনার একটি কলেজের অধ্যক্ষা।

৭. আখতার-উল আলম ঃ সাংবাদিক। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক।

৮. আজাদ সুলতান ঃ লেখক ও মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর। বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

৯. আলাউদ্দিন আহমদ ঃ প্রবীণ কৃষক নেতা। বর্তমানে জাতীয় কৃষক পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা।

১০. আলহাজ্জ বজলুস ছাত্তার ঃ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। মওলানা ভাসানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর।

১১. আলহাজ্জ শামস-উল হুদা ঃ মর্নি নিউজ-এর প্রাক্তন সম্পাদক ও দৈনিক জনতার প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

১২. আবদুল খালেক সিদ্দিকী ঃ অধ্যাপনা করেন। মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর।

১৩. আবদুল মতিন ঃ '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বর্তমানে কৃষক নেতা।

১৪. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ঃ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক। এককালে মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলনের নেতা। বর্তমানে গণভবন মসজিদের ইমাম।

www.pathagar.com

১৫. আবদুস শহীদ ঃ এককালে বামপন্থী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যস্ত।

১৬. আবদুর রহমান ঃ সাংবাদিক। এক সময় প্রাচ্যবার্তায় কাজ করতেন।

১৭. আবদুস সাত্তার ঃ কবি। শতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা। বর্তমানে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত।

১৮. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঃ প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, পরে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক। ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

১৯. আবুল খায়ের আহমদ আলী ঃ শিশুসাহিত্যিক। বর্তমানে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগের উপ-পরিচালক।

২০. আবু নছরত রহমতউল্লাহ ঃ সাংবাদিক, সাহিত্যিক। বর্তমানে দৈনিক আজাদের শিশুপাতা মুকুলের মাহফিলের বাগবান ভাই।

২১. আবু সালেহ ঃ বিশিষ্ট ছড়াকার ও সাংবাদিক। মওলানা ভাসানীর বিশিষ্ট সহচর। 'পল্টনের ছড়া' তাঁর বিখ্যাত ছড়া গ্রন্থ। দৈনিক দেশ-এর প্রাক্তন স্টাফ রিপোর্টার। বর্তমানে দৈনিক খবর-এর সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার।

২২. আফিয়া আক্তার ঃ নবীন লেখিকা।

২৩. আহমদউল্লাহ ঃ নবীন ছড়াকার।

২৪. ইরফানুল বারী ঃ সাংবাদিক, লেখক। মওলানা ভাসানীর একান্ত সহচর। 'হক কথা'র সম্পাদক ছিলেন।

২৫. উলফত রানা ঃ সাংবাদিক, লেখক ও নাট্যকার। মহাসচিব, মাতৃভাষা পরিষদ। সভাপতি, জাতীয় হোমিও মেডিক্যাল পরিষদ।

২৬. এডভোকেট মুজিবর রহমান ঃ শিশু সংগঠক, আইনজীবী ও শ্রমিক নেতা। মুকুলের মাহফিলের সঙ্গে জড়িত।

২৭. এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঃ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। বহু ইসলামী গ্রন্থের রচয়িতা। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।

২৮. এম. এন. সালামতউল্লাহ ঃ নবীন লেখক।

২৯. এস. মুজিবউল্লাহ ঃ প্রবন্ধকার। চিন্তাবিদ। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।

৩০. এস. এম. আবদুল জব্বার ঃ প্রবন্ধকার। খুলনার বিশিষ্ট আইনজীবী। সম্প্রতি ইনতিকাল করেছেন।

৩১. এস. এম. শাহজাহান তালুকদার ঃ সাংবাদিক, লেখক। বর্তমানে সাপ্তাহিক অগ্রপথিক-এ কর্মরত।

৩২. কামাল লোহানী ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক। দৈনিক বঙ্গবার্তা'র প্রাক্তন নিউজ এডিটর। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তা'র প্রাক্তন সম্পাদক।

www.pathagar.com

৩৩. কাজী আনোয়ারুল ইসলাম ঃ সাংবাদিক ও লেখক। বর্তমানে দৈনিক দেশ-এর চীফ সাব এডিটর।

৩৪. খালেদুর রহমান টিটো ঃ মওলানা ভাসানীর অনুসারী। যশোরের বিশিষ্ট রাজনীতিক। যশোর পৌরসভার চেয়ারম্যান। সাবেক জাতীয় সংসদের সদস্য।

৩৫. খোন্দকার আবদুল হামিদ ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক। দৈনিক ইত্তেফাক-এর 'স্পষ্টভাষী' তিনিই ছিলেন। সাবেক যুব উন্নয়ন মন্ত্রী। ১৯৮৩ সালে ইন্তিকাল করেন।

৩৬. গাজীউল হক ঃ '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। আইনজীবী।

৩৭. গোলাম সাকলায়েন ঃ ডকটর গোলাম সাকলায়েন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বহুগ্রন্থের রচয়িতা। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন।

৩৮. জহিরুল হক ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক। বর্তমানে দৈনিক বাংলার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার।

৩৯. ডকটর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঃ বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক।

৪০. ড. সাইফুদ্ দাহার ঃ বিশিষ্ট বামপন্থী চিন্তাবিদ। বর্তমানে কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি।

৪১. ডা. নুরুল ইসলাম ঃ বিশিষ্ট চিকিৎসক। জাতীয় অধ্যাপক। পি. জি. হাসপাতালের সাবেক পরিচালক।

৪২. ডা. (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত ঃ আর্মি মেডিক্যাল কোর-এ ৭ বছর চাকরি করার পর অবসর গ্রহণ। চিকিৎসক হিসেবে সৌদি আরবে ৮ বছর চাকরি করেন। মওলানা ভাসানীর কাগমারী মোহাম্মদ আলী কলেজের প্রাক্তন সেক্রেটারী। প্রবন্ধকার।

৪৩. নজরুল হক ঃ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কলামিস্ট। দৈনিক গণকণ্ঠের প্রাক্তন নির্বাহী সম্পাদক। বর্তমানে দৈনিক জনতার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক।

৪৪. নুরুল আলম রইসী ঃ কবি। প্রবন্ধকার। স্কুল টেকস্টবুক বোর্ডে কর্মরত।

৪৫. নুরুল ইসলাম উয়ায়সী ঃ আইনজীবী, সংস্কৃতিসেবী। বর্তমানে টাংগাইলে আইন ব্যবসা করেন।

৪৬. ফজল-এ খোদা ঃ বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি। রেডিও বাংলাদেশ-এ কর্মরত।

৪৭. ফজলুর রহমান খাঁ ঃ মওলানা ভাসানীর সহচর। বর্তমানে ক্রিসেন্ট সোসাইটির আহ-বায়ক।

৪৮. ফয়েজ আহমদ ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও ছড়াকার। বর্তমানে চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ-এর ঢাকা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত।

৪৯. ফকীর আলমগীর ঃ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠির প্রধান। 'গণ মানুষের ভাসানী' শীর্ষক লং প্লে রেকর্ড তাঁর বিশেষ কীর্তি।

৫০. ফিরোজ আল মুজাহিদ ঃ আইনজীবী। বিশিষ্ট নাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। 'মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন' গ্রন্থের লেখক। মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর।

www.pathagar.com

৫১. বদিউজ্জামান ঃ ক্রীড়া সাংবাদিক। বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাক-এ কর্মরত।

৫২. বেদুঈন সামাদ ঃ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী। পুলিশ বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। খুলনায় থাকেন।

৫৩. মশিয়ুর রহমান ঃ রাজনীতিবিদ। যাদু মিয়া নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। সাবেক সিনিয়র প্রধানমন্ত্রী। ইন্তিকাল করেছেন।

৫৪. মওলানা আবদুল মতিন ঃ বহু ইসলামী গ্রন্থের প্রণেতা। রাজনীতিবিদ। বর্তমানে বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান।

৫৫. মওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ ঃ মওলানা ভাসানীর একনিষ্ঠ রাজনৈতিক অনুসারী।

৫৬. মাহফুজউল্লাহ ঃ প্রাক্তন ছাত্রনেতা। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক। বর্তমানে মাসিক লোকজন-এর সম্পাদক।

৫৭. মাহবুব আলমগীর ঃ সাংবাদিক। সাপ্তাহিক প্রাচ্যবার্তার বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

৫৮. মাহমুদ আলী ঃ রাজনীতিবিদ। সাংবাদিক। বৃটিশ আমলে আসাম মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট। এককালে সিলেট থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' ও 'নওবেলাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাদাতা। পি. ডি. পি-এর সহ-সভাপতি, যুক্তফ্রন্ট আমলে মন্ত্রী। বর্তমানে পাকিস্তানের নাগরিক।

৫৯. মুকুল চৌধুরী ঃ কবি। সাংবাদিক। বর্তমানে সাপ্তাহিক অগ্রপথিক-এর প্রতিবেদক।

৬০. মুফতী সৈয়দ মোস্তফা কামাল এশিয়া ঃ মওলানা ভাসানীর আদর্শের অনুসারী। বর্তমানে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খেদমতে নিয়োজিত।

৬১. মুহম্মদ আয়েশ ইউসুফ ঃ ছড়াকার ও লেখক।

৬২. মুহাম্মদ মোসলেমউদ্দিন জোয়ার্দার ঃ প্রবন্ধকার। সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন।

৬৩. মুহম্মদ আবদুল খালেক ঃ প্রবন্ধকার। শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদের সভাপতি।

৬৪. মুহম্মদ কোরবান আলী ঃ এককালে মওলানা ভাসানীর সহচর ছিলেন।

৬৫. মেসবাহ কামাল ঃ বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।

৬৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঃ সাংবাদিক। গবেষক ও প্রবন্ধকার। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা।

৬৭. মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ঃ রাজনীতিবিদ। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। দীর্ঘদিন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। কয়েক বছর আগে তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

৬৮. মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান ঃ অধুনালুপ্ত স্পোকসম্যান ও মুখপত্র পত্রিকার সম্পাদক। বর্তমানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।

www.pathagar.com

৬৯. মোহাম্মদ হোসেন খান ঃ মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বালক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

৭০. রফিকুল ইসলাম ঃ প্রবন্ধকার, সাংবাদিক।

৭১. রাজিয়া মজিদ ঃ কথাশিল্পী। ঔপন্যাসিক। সরকারী কলেজের শিক্ষিকা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্তা।

৭২. রাশেদ খান মেনন ঃ প্রাক্তন ছাত্রনেতা। বিশিষ্ট রাজনীতিক ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

৭৩. লুৎফর রহমান জুলফিকার ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। এক সময় যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

৭৪. শরফউদ্দিন আহমদ ঃ

৭৫. শরীফুল ইসলাম আলমাজী ঃ তরুণ ছড়াকার।

৭৬. শাহেদ আলী ঃ বিশিষ্ট কথাশিল্পী, চিন্তাবিদ। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সাবেক পরিচালক। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন।

৭৭. শাহরিয়ার কবির ঃ বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক। বর্তমানে সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র নির্বাহী সম্পাদক।

৭৮. শেখ আবদুল মতিন ঃ প্রবন্ধকার। ব্যাংকে কর্মরত।

৭৯. শেখ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ঃ সাংবাদিক। সহকারী সম্পাদক দৈনিক দেশ।

৮০. সানাউল্লাহ্ নূরী ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক। বর্তমানে দৈনিক জনতা'র সম্পাদক।

৮১. সৈয়দ জাফর ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক। বর্তমানে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল এবং দৈনিক দেশ-এর চীফ রিপোর্টার। ৬০-এর দশকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির দফতর সম্পাদক ছিলেন।

৮২. হাজী মোহাম্মদ দানেশ ঃ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তেভাগা আন্দোলনের বিশিষ্ট কৃষক নেতা। গণমুক্তি পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন। সম্প্রতি ইন্তিকাল করেছেন।

৮৩. হাজী মোহাম্মদ রশিদুল আলম ঃ প্রবন্ধকার। মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর। সরকারী চাকুরে।

৮৪. হাফিজা বেগম ঃ বিশিষ্ট লেখিকা। তেজগাঁ কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা।

ই.ফা.বা./৮৭-৮৮/প্র-৪৩৭৯/৫২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাসান হাফিজ

মৃত্তিকার ঋণ

প্রচণ্ড কতো যে ঝড়ঝাপটা ও বিপদ
প্রতিকূলতার হিংস্র ভয়ঙ্কর দাঁত
তোমার শেকড় মূল অস্তিত্ব এবং
ক্রমাগত সাফল্য ও দূরদর্শিতার চাষ
উপড়ে ফেলতে বারবার উদ্যত হয়েছে
আশ্চর্য পারেনি। উল্টো দেখতে পাই
মৃত্তিকা তোমার স্থিতি তোমার গৌরব
অহংকারে বুক আগলে ধারণ করেছে,
হাওয়া পানি রৌদ্র মেঘ সুষম প্রকৃতি
যুগিয়েছে খাদ্য পুষ্টি, হয়েছো সতেজ
শতাব্দী প্রাচীন এক দরকারি মহীরুহ
পোড়া দেশে একমাত্র তুমিই ভাসানী।

নিগ্রহের কালো মেঘ ঝঞ্চা বারবার
তোমার অনিন্দ্য জ্যোতি বারবার নেভাতে চেয়েছে
কিন্তু তুমি নুয়ে পড়তে শেখো নি মোটেও
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কাদামাখা পায়ে বারবার
কুর্নিশ করেছে, তুমি ফিরেও দ্যাখো নি!
স্বাধীনতা, যা ছিলো স্বপ্নেরও দূর
তুমিই প্রথম তাকে পাবার দুর্জয়
সাহসের বীজমন্ত্র বুনে দিয়েছিলে
কোটি কোটি মূঢ় মূক মানুষের বুকে
তোমার স্বপ্নের ঋণ
আমরা তোমার কাছে ঋণী থাকতে
ভালোবাসি, হে মজলুম জননেতা,
মাটির সন্তান, প্রিয় মওলানা ভাসানী।

www.pathagar.com

শাহাদাত বুলবুল

মওলানা ভাসানী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিগণ

যে কোনো উপত্যকায় যাও, তুমি দেখবে
একজন লোক নব্য স্বাধীনতার মতো
শুয়ে আছে
আর তার চতুর্দিকে শুনবে
অসংখ্য জীবজন্তুর অর্থবহ হৈ-হুল্লোড়।
লোকটির তবু ভয় নেই;
লোকটি নির্ভয়ে শুয়ে আছে
লোকটি কি স্বাধীনতা?

লোকটি তার বুকের তিনশো বিরাশি মণ
গোল হৃদপিণ্ড জুড়ে ধারণ করে আছে
পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল লম্বা
এক টুকরো মাটি।
এবং লোকটির বুকের ঠিক মধ্যিখানে আরেক জন
পুরুষ ঘুমোয়; তার বুকেও আরেক জন যুবক
সভ্যতাকে অসম্ভব নাড়াচ্ছে দু'হাতে।

লোকটি কি সভ্যতা? জীবনের বিশ্বাসী রক্ষক?
দুঃস্থের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক? কিংবা লোকটি কি
আল্লার মনোনীত মুজাদ্দিদ?

যে কোনো উপত্যকায় যাও, তুমি শুনবে
প্রথম লোকটি হাসতে হাসতে দ্বিতীয় লোকটিকে
জিজ্ঞেস করবে—
'তুমি কি মানুষ? কিংবা বিশ্বাসের
প্রতীকী পুরুষ কেউ?'
দ্বিতীয় লোকটি বলবে, 'না, আমি অর্থহীন।'
তৃতীয় লোকটি চীৎকার করে বলবে,
'বেটা ভীরু, কাপুরুষ, মানুষের অমঙগল;

www.pathagar.com

আমিই বিশ্বাসের একমাত্র প্রতীকী পুরুষ,
সভ্যতার নতুন বিন্যাস
অতএব,
হে প্রথম পুরুষ, তুমি আমাকেই বিশ্বাস করো,
আমিই স্বা...ধী ... ... ন ... ... তা।'

উপত্যকায় তিনজন পুরুষ কারা?
এরা কি সভ্যতার ধারক ও বাহক?
এরাই কি রক্তাক্ত গোলাপের অর্থময় বিশ্বাস?

বুলবুল খান মাহবুব

চর ভাসানের মওলানা নেই

কবে কোন ঝড়ে ভেঙে গেছে কিষাণের পড়ো পড়ো ঘর
মহামারী বন্যায় প্রাণ দিল ক'হাজার দেহাতী মানুষ
কোন শস্যক্ষেতে কবে পঙ্গপাল নিয়ে আসে ভয়াল প্রত্যুষ
যুগ যুগ আমরা তো রাখি নি খবর।
ব্যস্ত জনপদে যারা রাজনীতি, কবিতা ও কফির ধোঁয়ায়
নির্বাচন নিয়ে মাতি, তর্ক জমে মিছিলের সার্থকতা দূর সাহারার
অকস্মাৎ শুনি এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর
কোথায় মড়ক লাগে, পদ্মায় পানি নেই, মুমূর্ষ বাংলার খবর
অজানার অন্ধকার গর্ভ থেকে জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে
উঠে আসে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে
একটি কণ্ঠ হতে লাঞ্ছিত মানুষের সহস্র সংবাদ।
নতজানু স্বদেশের কানে
কি মন্ত্র দিলেন তিনি সৌম্য যোগী বৃদ্ধ ভাসানী
পল্টনে, রমনায়, টোবাটেক সিং-এ
যৌবনের স্পর্ধায় কি অসীম দুঃসাহস নিয়ে
শতাব্দীর গ্লানি ভুলে দাঁড়ালো স্বদেশ
জীবনের জয়গানে মুখরিত বাংলা আমার।

www.pathagar.com

মিছিল এগিয়ে চলে
দৃঢ় হাতে লাল ফেস্টুন
মিছিল এগিয়ে যায়
শ্লোগানে আগুন
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে পুড়ে ছাই শতাব্দীর সনাতন গ্লানি
এ মিছিলে আগুয়ান
খেটে খাওয়া মানুষের বন্ধু ভাসানী।
ইতল বেতল ফুলের বনে, স্তব্ধ অশত্থ-বটের ছায়ায়, দৃষ্টি
উদাস আকাশ তলে
শব্দবিহীন ভালোবাসায় আজকে তিনি গেলেন চলে।
ফসল ভরা মাঠের ধারে নিঃস্ব চাষীর ঘর পেরিয়ে
নরম কাদা বিলের পাশে পায়ে চলার পথ ছাড়িয়ে
এই তিনি গেলেন চলে
অস্তপারের সে পথ ভেজা শেষ বিদায়ের অশ্রুতে।
কালো পোশাক আচ্ছাদিত নির্মম ট্রাফিক পুলিশ
হাত উঠাতেই থেমে গেল ব্যস্ত স্বদেশ
শুধু একটি মানুষ হেঁটে চললেন ভালবাসার ফুল কুড়াতে কুড়াতে
শ্রদ্ধায় নতজানু পৃথিবীর অশ্রু ভেজানো পা
শুধু তিনি হেঁটে চললেন অন্তহীন আলোর পথ ধরে
বললেন, তোমরা ভালো থেকো।
শতাব্দীর ফেলে আসা গাঢ়তম অন্ধকার থেকে
প্রতিধ্বনি ফিরে এলো ভালো থেকো
হে আমার আত্মজেরা, হায়েনার মুখোমুখি, শ্বাপদের উদ্যত
থাবায়
জীবনের দৃঢ় আশ্বাসে
চিরদিন ভালো থেকো মানুষের অধিকার নিয়ে।

ভাসানীর চরে হু হু হাওয়া আজ ফেরারী বাউল
কত দূর হতে বাংলায় আনে অশ্রুমেঘ
সূর্যসঙ্গ হারিয়ে পৃথিবী মৌন ম্লান
জানে রাত শেষে ফুটবে না আর একটি ফুল।

www.pathagar.com

ব্যস্ত কিষাণ শুনেছ কি চর ভাসানের মওলানা নেই
ক্লান্ত মজুর শুনেছ কি তোমার নেতা হারিয়ে গেছে
গুমরে ওঠা বুকের ব্যথা বলবে না কেউ আর কোনদিন
বিদ্রোহী সেই কণ্ঠ যে হায় স্তব্ধ হল আজকে নিজেই।

শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ
একজন ভাসানী

রাত আসে
দিন যায়
বাতাসে বাতাসে ওড়ে বৃষ্টির কণা।
উত্থান পতনের এই ঝড়
বারবার ভেঙে যায় সাধের আবাস;
আবার কখন যে গড়ে ওঠে নতুন পৃথিবীতে
নতুন ঘর।
অথচ জ্বলে না সেখানে প্রদীপ
সুরের মূর্ছনায়।
আমি তো দেখেছি
শূন্য ঘরে ক্রন্দন অবিরত
অকস্মাৎ
হাতলভাঙা চেয়ারটাতে এখন কেউ তো বসে না
"খামোশ" চাবুকে ওঠে না এখন উত্তাল জনতা
মিছিলগুলো নীরবে কাঁদে, নেই তিনি
নেই
এই সোনার বাংলায়
যাঁর কণ্ঠ হতে বেরুত শুধু নির্যাতিতের কথা।
তালের আঁশের টুপি মাথায় দিয়ে
হাঁটে না এখন কেউ নগ্ন পায়ে বস্তিতে
বস্তিতে
কোথায় গেলেন তিনি?

www.pathagar.com

যার শুভ্র শ্মশ্রুর কোণে লুকিয়েছিলো
রাশি রাশি হাসি
বুকের ভেতর ছিলো এত ভালবাসা বাসি।
পারবে তোমরা কেউ
পারবে জন্ম দিতে
একজন ভাসানী।

কাজী সালাহউদ্দীন
বিনম্র শ্রদ্ধায় সেই নাম

(যদি কেউ প্রশ্ন করেন
আপনার প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কে?
আমি নির্দ্বিধায় বলবো
তিনি আর কেউ নন মৌলানা ভাসানী।)

আজো স্পষ্ট কানে বাজে
সেই স্বর
শুধু স্বর নয় যেনো বজ্রের নিনাদ
একদা যে নিনাদে কেঁপেছিল ফারাক্কার বাঁধ
শুধু তাই বলি কেনো
যে নিনাদে রাজ সিংহাসন
একদা কেঁপেছে আর জনতার কাঁধে হাত রেখে
মিছিলে ভেসেছে দেশ।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে
সেই স্বরে
নগরে বন্দরে
বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে
আমাদের সবার অন্তরে
বিনম্র শ্রদ্ধায় সেই নাম ঃ মৌলানা ভাসানী।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ
অতিক্রম

যদিও চাঁদের স্নিগ্ধতা দেখি
ভেতরে অন্য রকম,
জলের ভাঁজেই স্বপ্নের কথা
বাণীর মতো ধ্বনি।

জুলুম প্রতিরোধের কথা ভাবি
তোমার আদল ভাসে,
সফেদ পাঞ্জাবীর ভাঁজে ভাঁজে
শরীর ঝরানো ঘাম।

তোমাকে অনুসরণ করে করে
এগুই দীর্ঘ পথ,
আন্দোলন আর সংগ্রামের ইতিহাস
তোমার সমগ্র জীবন।

আলোক উজ্জ্বল দৃঢ় মুখ
নজর ছড়ানো তাই,
শতাব্দীর এক মহামানব দাঁড়িয়েছে
বুঝিবা সীমানাবিহীন।

মুকুল চৌধুরী
এক. 'ওরা কেউ আসেনি'

'ওরা কেউ আসেনি' বলে বাম হাতটি তাঁর
ক্রমশ দক্ষিণে প্রসারিত হতেই আমার মনে হয়েছিলো
ফণা তোলা হাতের ওই মুদ্রাই বিপ্লবের নিশান
পর্বতের ঢালের মতো প্রশস্ত পাঁজর হবে স্বাধীন স্বদেশ।

ক্রমাগত বাতাসে ফুঁ দিলেন মজলুম মওলানা
শব্দ সব তুমুল মাতম তুলে বৈশাখী ঝড়ের

www.pathagar.com

ট্রাফিক আঙুল গলে অনায়াসে চলে যায় বলিষ্ঠ আওয়াজ
চোখের তারারা দেখে অগণিত মানুষের ঢল।

এই যেনো ধসে যাবে শাসকের লাল ইট খিলান
ঘরহীন—নির্বাসিত চরের মানুষ পাবে ঈসা খাঁর সাহস
তামাম মুল্লুক পাবে গতি পথে এক নদী নীলের ভরসা
যেমন বছর কয়েক সহস্র আগে পেয়েছিলো মূসার উম্মত।

এখনো গভীর তন্দ্রায় শুনি 'ওয়ালায়কুম আস্ সালাম'
ধ্বনি নয় যেনো কোনো ঐশ্বরিক টেলিগ্রাম পড়ি।
ঘুম থেকে ঘুমে গভীর স্বপ্নের ভেতরে শুনি 'খামোশ'
শব্দ নয়, কদর্য দুষ্কৃতির কান কম্পিত করে তেমন এক বজ্রের গমক।

এই সব মোহময় ধ্বনির কাছে যতোবার যাই
ততোবার পাই আমি ঘ্রাণের বিস্তার
এই সব স্বপ্নময় শব্দের কাছে যতোবার যাই
ততোবার ছুঁই আমি মানুষের রাজার মুকুট।

যখন নিদ্রা ভেঙে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে আসি স্বপ্নের পালক
চোখ মেলে চেয়ে দেখি আকাশের ঘন নীল বর্ণের পাশে
অসীম মণ্ডলব্যাপী রাতের বিমান হয়ে উড়ছে যেনো
প্রাচীন এক অশ্বত্থের বাহু
বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দের চেয়ে বেশী বেগে পাহারা দিচ্ছে
এই আকাশ সীমানা।

দুই. মওলানা ভাসানীর সাথে সারারাত

কাল রাতে হাঁ, কাল গভীর রাতে আকাশ আচ্ছন্ন ছিল ঝড়ে
আমাদের পিতৃপুরুষের এই নগরী আক্রান্ত হয়েছিলো সামুদ্রিক
টাইফুনে
দিগন্তে ঢলে পড়া চাঁদ মেঘের আড়ালে ছিলো,
নির্বাক-নিষ্প্রদীপ ছিলো অসীমের নক্ষত্রমণ্ডল।
আমাদের তিন পুরুষের এই নগরীর স্বপ্নগ্রস্ত খামখেয়ালীর বিপক্ষে
যেনো কেউ দাঁড়িয়েছে কয়েক শ' খৃস্টপূর্ব বছর আগের
দুঃসাহসী জুলকারনাইনের পৌরাণিক বীরত্বের সাহসী ব্যঞ্জনায়।

www.pathagar.com

কাল রাতে হাঁ, কাল গভীর রাতে প্রকৃতির নিয়মের তরঙ্গ দোলায়
কাঠগড়ার আসামীর মতো ইমারতগুলো কাঁপছিলো,
বস্তির ঝুপড়িগুলো সূর্য জেগে ওঠার আগেই জেগে উঠেছিলো
মাটির জাজিম বিছানো ঘুম সকালের রোদে চাঙ্গা না হতেই
গা ঝাড়া দিয়েছিলো।

কাল রাতে হাঁ, কাল গভীর রাতে অশ্বারোহী এই বাতাসের
মোকাবেলায়
সশব্দে দাঁড়িয়েছিলো নব্য এক শাদ্দাদী বেহেশ্‌তের সব ক'টি কামান
নীড়হারা পাখিরাও তুলেছিলো প্রচ্ছন্ন সুরে এক আত্মভোলা গান।

কাল রাতে হাঁ, কাল গভীর রাতে বয়ে যাওয়া উর্ধ্বমুখী ঝড়ের
এই কোলাহলে
আমি এক তর্জনীর শাসানো ভঙ্গি দেখেছি
বুকের ডানার মতো শুভ্র-সফেদ এই অবয়ব
লালবাগ কেল্লাকেও গাম্ভীর্যে হার মানিয়েছিলো।

রেজাউদ্দীন স্টালিন

কে সেই মানুষ

কার বজ্রকণ্ঠ আজো বাজে
কে সেই মানুষ
সাহসের তরবারী হাতে নিয়ে ছুটতেন
দিগন্তের দিকে
ক্ষমাহীন ঘৃণার আগুনে
শত্রুর ছাউনিগুলো পুড়িয়ে দিতেন
নিজের বিবেক আর বিশ্বাসের কাছে
বারবার ফিরে আসতেন
পবিত্র স্বপ্নের মতো সদা সর্বদাই গায়ে পরতেন
জনতার প্রতীক পাঞ্জাবী

www.pathagar.com

কে সেই মানুষ
মরণের মধ্য থেকে জীবনকে টেনে তুলতেন
সন্দ্বীপের মাঝিদের কাছে শুনতেন ইলিশের আশ্চর্য খবর
ভোলা ও নেত্রকোনো নয়নের নিকটে রাখতেন
রেসকোর্সের মাঠে যে দাঁড়ালে সবচেয়ে সুন্দর মানাতো
যশোর ডুমুরিয়া কিংবা নাচোল আত্রাই উৎকলিত যার কণ্ঠস্বরে
খামোশ—শব্দটি যার উত্তরাধিকার

তিনি কি রাজার পুত্র কিংবা কোনো সামন্ত প্রভুর সন্তান
নাকি নগণ্য চাষীর ছেলে, চরভাসানের কোনো রুদ্র লাঠিয়াল
পিতা যার শস্যের শ্লোক ছাড়া জানতেন না কিছুই
নগরের লোহার হাঙরগুলো কামড়ে দেবে বলে
যেতেন না নগর তোরণে
তারই পুত্র প্রমিথিউস হলো, স্পার্টাকাস
হাতের হার্পুন ছুঁড়ে হত্যা করলো লক্ষ হাঙর
এবং আদর্শের অশ্বে চড়ে প্রদক্ষিণ করলো পৃথিবী।

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন
ভাসানীর জন্যে এক গুচ্ছ ছড়া

১. রান্নাঘরে শূন্যি হাড়ি জ্বাল নেইকো চুলোয়,
ভাত না পেয়ে খোকন মনি রইছে পড়ে ধূলোয়।
বাবার মুখে ক্ষুধার আগুন মায়ের মুখটি বাসি,
কে কেড়েছে খুকুর মুখের মিষ্টি-লাজুক হাসি?
হাসি কেড়েছে ধনিক-বর
তাদের তুমি ভাংছো ঘর।

২. ভোট চেয়েছেন, ভোট দিয়েছি
যেই পেয়েছেন চেয়ার—
সর্বহারার প্রতি হুজুর
দেননি মোটে কেয়ার॥

www.pathagar.com

আপনি খেলেন চবি পেটে
আমরা সবাই মরছি খেটে
আপন ঘরের আপন দলের
যেই করেছেন পেয়ার—

মজলুমানের মহান নেতা
কৃষক-শ্রমিক সবার কথা
বলেন তিনি ঃ দিতেই হবে
গরীব-দুখীর শেয়ার ॥

৩. হুজুর তিনি হুজুর—
লক্ষ মুরিদ সংগে রেখে
নতুন দিনের আলোক মেখে
আঁধার ঘরের ভূত তাড়ালেন
ভয়-ভীতি আর জুজুর।

৪. মওলানা ভাসানী—
মানে নাই শোষকের
জেল-জুলুম-শাসানী।

গাজী রফিক

প্রেমের মুয়ায্যিন

বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রেমের গান
বাউল সুরে আপনভোলার মতো
বাজিয়ে গেলেন আবদুল হামিদ খান
হায়রে মানুষ সংগ্রামে উদ্যত

তার বাঁশীতে উঠলো এ কি ঝড়!
চোখের ভিতর অধিকারের স্বেদ,

যেমন করে প্রেমের মুয়ায্যিন
মিনার থেকে সাঙ্গ করে হাঁক
সুর থামিয়ে হঠাৎ হলো লীন
সেই সুরে আর কেউ কি দেবে ডাক!

www.pathagar.com

লুৎফর রহমান রিটন

বয়েসী তরুণ

পরনে লুঙ্গি সাদা পাঞ্জাবী
মুখ ভরা শাদা দাড়ি,
যেখানে জুলুম সেখানে কণ্ঠ
গর্জে উঠেছে তারই।

লাঞ্ছিত আর নিপীড়িত যত
দুখী মানুষের পাশে,
বয়েসী তরুণ দু'বাহু বাড়িয়ে
বারবার ফিরে আসে।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বৃদ্ধ
সোচ্চার প্রতিবাদে,
দুখী মানুষের দুঃখে কষ্টে
হু হু করে প্রাণ কাঁদে।

বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েনি সে
দৃঢ় তার অংগুলি,
তার এক ডাকে হাতে হাত রাখে
মজদুর মুটে কুলি।

মিছিলে মিছিলে ব্যারিকেড ভেঙে
এগিয়ে চলেছে সে যে,
পরনে লুঙ্গি শাদা পাঞ্জাবী
সিংহের মত তেজে।

বটবৃক্ষের মতই বুড়োটা
ছায়া দেয় দুর্যোগে,
পাশাপাশি থাকে হৃদয়ের ডাকে
মহামারী, শোকে, রোগে।

www.pathagar.com

দোলায়িত হয় জনসমুদ্র
তার তেজী হুংকারে,
শোষকের প্রাণ সেই সাথে যদি
কেঁপে ওঠে বারে বারে।

বয়েসী তরুণ টগবগে জেদী
এগিয়ে চলেছে সে যে
পরনে লুঙ্গি শাদা পাঞ্জাবী
সিংহের মত তেজে।

তাহ্‌মীদুল ইসলাম

সূর্যোদয় যখন আযান

জীবনের অন্য এক নাম যদি আন্দোলন হয়
আর আন্দোলন যদি জীবনকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফ্যালে
মানুষের সত্তাও সমুদ্রের ঢেউ হয়ে সময় মাতায়
আলিফের মত সেই তর্জনী কি এখনও ডাক দিয়ে যায়?

সবুজ সবুজ পাতা একে অপরের কাছাকাছি স্থির শান্ত থাকে
কিন্তু কখন কাঁপে?
বাতাসের দোলা পেয়ে আন্দোলিত ফুলগুলো ছড়ায় সুবাস
রৌদ্র বৃষ্টিতে পুষ্ট হয় শস্যের দানা
আকাশের বুকও টানে সমুদ্রের পানি
কখন বা বিদ্যুতের অসি ঝলকায়
অন্ধকারে দুলে উঠে সুন্দরবন
আর বৃষ্টির আনন্দে উজ্জীবিত মন ও ক্ষণ।

কর্মক্লান্ত শরীর ঘাম শুষে নেয়
পাখিরাও নীড়ে ফিরে আসে
পরবর্তী সূর্যোদয়ে যখন আযান হয়
সকলের ঘুম ভাঙে
কাজে কামে পৃথিবীকে আবার জড়ায়

শুধু বিন্দু বিন্দু শিশির স্পর্শের জন্য সম্ভবত আসে
সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানীর কবরের ঘাসে।

www.pathagar.com

শামসুল হক দিশারী

ভাসানীকে নিবেদিত এক গুচ্ছ ছড়া

১. ফুলের পদ্যি আর লেখো না ফুল ফোটে না বাংলায়,
ভিক্ষে আসে বিদেশ থেকে চাঁটগাতে আর মংলায়।
ভিক্ষে কারো প্রাসাদ গড়ে বাংলাদেশের শহরে
ভুঁড়ি ওদের বাড়ছে আরো বাড়ছে ওরা বহরে।
খিদের দেশে ফুল পাখিদের গল্প হলো কালচে,
অমন দেশে রাঙা হাতে পদ্যি আসুক লালচে।

২. কেউবা বোঝে দিন এসেছে কেউবা বোঝে রাত
কেউবা বলে যে যা আনুক আমরা খুঁজি ভাত।

৩. কেউবা লোভী একটু যশের
কেউবা লোভী পদ-পদবীর টাকার।
কেউবা লোভী ইতিহাসের
কেউবা লোভী মহাকালের
নামগুলো সব ঢাকার।

৪. ওদের কারো হুকুমদারী আর হবে না মানতে
ওদের কাছে আর যেয়ো না কোন খবর জানতে।
হুকুম হুকুম মহাহুকুম সর্বহারা সুর-দে,
আমরা এখন হুকুম দেবো সব হুকুমের ঊর্ধ্বে।

৫. দেশে তখন নষ্ট মানুষ কালো হাতে লুট করে,
হচ্ছে দেখি কালোরাতে মোটা পশু লুট করে।
তোরা কেন থাকবি বসে ঠাণ্ডা মাথায় চুপ করে,
লম্ফ দিয়ে ঘাড়মোটাদের ঘাড় চেপে ধর ধুপ করে।

www.pathagar.com

ফারুক নওয়াজ

বীর ভাসানী

আমার বোনের, আমার মায়ের
আমার বাবার, আমার ভায়ের
তালপট্টি বাংলাদেশের
ওখান থেকে ভাগো;
বীর জনতা জাগো।

বলো বলো কার সেই
সাবধান বাণী
আমাদের মওলানা
বীর ভাসানী।

ফারাক্কাতে কে দেয় বাধা
কোন্ বেনীয়া নবাবজাদা।
ফারাক্কাকে উপড়ে ফেলে
গঙ্গা জলে ফেলাও।
করবো না এ এলাও।

কার এই হুঁশিয়ারি!
জানি, জানি, জানি
আমাদের মওলানা
বীর ভাসানী।

মোস্তফা কামাল

মওলানার জন্যে

মওলানা তোমার জন্যে সমবেত মানুষ অপেক্ষা করে
তোমার একটি নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করে।
ওরা মিছিলের সামনে একটা মানুষ খোঁজে
চাতক পাখীর মতো চঞ্চুতে ধারণ করতে চায় প্রবল বৃষ্টির কণা।

www.pathagar.com

একজন বৃদ্ধ গনগনে যৌবনধারী হতে পারে
হতে পারে গ্রীক ভাস্কর্যের উপমা—
পেশল চোয়াল জমাট ঘামের লবণ,
কৃষ্ণাভ ঠোঁট,
খাঁজ-কাটা শরীর।

যার আরক্তিম চেতনার সুর
সফেদ পাঞ্জাবীর মতো পত্ পত্ করে উড়তে পারে বাতাসে
আগ্নেয় লাভার মতো গ্রাস করে নিতে পারে অহল্যাভূমি
লং মার্চে হতে পারে সাহসী সাঁওতাল যুবক।

তাঁতে বোনা লুঙ্গি পরে যে মানুষ
বন্যার্ত জীবনের কাছে যেতে পারে একান্ত স্বজনের মতো
কে মেনে নেয় তখন সাগরের অবৈধ দখল
সুকৌশল আগ্রাসন।

যে মুখে একটা শব্দ উচ্চারিত হলে ইথারে ইথারে ভেসে যেতো
অনেক দূর
শত্রুর কাছে যেনো বিপজ্জনক ক্ষেপণাস্ত্র,
যার একটা বাহু উদ্ধত হলে অহমিকায়—
যার দু'টি চোখে ঘৃণার আগুন রক্তজবার মতো জ্বলে উঠলে
উত্তাপে গলে গলে শেষ হয়ে যেতো শকুনের কঠিন প্রপেলার।

মওলানা, তোমার জন্যে সমবেত মানুষ অপেক্ষা করে
চোখে মুখে হীরন্ময় দ্যুতি—সাহসের কারুময় ব্যাপ্তি
ওরা তোমার তর্জনীর একটি নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করে—
ওরা স্বাধীনতা চায়
স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব চায়।

www.pathagar.com

জহীর হায়দার

ভাসানীর কণ্ঠস্বর

প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে নেমে এলেন জনতার মাঝখানে
শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক কণ্ঠস্বর—
ধূর্ত রাজনীতির দুর্গম বলয় পেরিয়ে

ভিখিরির জীর্ণ কুঁড়ের আস্ত প্রতীক তার মাথায়,
আজীবন রাজনৈতিক বলয়ের বাসিন্দা ঃ
বয়সের সাথে বৃদ্ধ হয়েছে সংগ্রাম
স্বদেশবাসীর বিষণ্ণ মুখ আলোকিত দেখেন নি কখনো,
বিক্ষুব্ধ মওলানা—
বলিষ্ঠ দেহ জুড়ে মৃত্তিকার মমত্ববোধ নিয়ে
তুখোড় সংগ্রাম আর কণ্ঠে তেজী সমুদ্রের গর্জন নিয়ে
অনন্তকাল হেঁটে চলেছেন স্বদেশের পাঁজর ভাঙা পথে।

সৈয়দ আজিজুল হক

মওলানা ভাসানী

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী—
যাকে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা যেত
যার তুলনা হত শুক্ল পক্ষের চাঁদের সাথে—
যার উপমা ছড়িয়ে আছে বিশ্ব মানবতার কণ্ঠ ধ্বনিতে
শুধু ঃ একটিমাত্র নিরপেক্ষ নাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
পৃথিবীতে যে কয়জন বিদ্রোহী নেতা ছিলেন
তাদের মধ্যে এমন বিপ্লবী মওলানা শুধু একজন ঃ
যার মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে—
দুপুরের ঝাঁঝালো রৌদ্রের মত মনে হত।
মনে হত এই বুঝি জ্বালাময়ী সূর্যটা বিশ্বটাকে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

www.pathagar.com

তালের আঁশের টুপি মাথায় দিতেন মওলানা সাহেব
গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবী, পরনে লুংগী, গলে তসবী
চোখে শুধু অগ্রপথিকের ছায়া
দু'হাতে মশাল আর পোস্টার ছিল যাঁর ...
তিনি হলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী।
একাত্তরের গণআন্দোলনে মওলানা সাহেব পল্টন ময়দানে
বজ্র কণ্ঠে হুকুম করলেন ঃ জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও ...।

তখন সমগ্র জনতার বুকের আগুন যেন—
ধীরে ধীরে-আকাশের দিকে ছুটতে লাগলো।
সমগ্র জাতির একই অংগীকার যেন জাগ্রত কণ্ঠে ধ্বনিত হল ঃ
স্বাধীনতা চাই স্বাধীনতা ঃ
কেমন করে যাদুমন্ত্রের মত হয়ে গেল সব।
শত জেল জুলুমকে উপেক্ষা করে মওলানা সাহেব
অতি সাধারণ মানুষের কাতারে আজীবন সদস্য ছিলেন।
গোপনে দল গঠন করে—আসামের জংগলে অসাধারণ সংগ্রাম করেছিলেন...।

সেখানে যে চেতনার বাণী মানুষকে শুনিয়েছিলেন
তা আজও মানুষকে বিমুগ্ধ করে—শিহরণ আনে
পাকিস্তান গড়ার আন্দোলন ও পরে ভাষা আন্দোলন
তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আন্দোলন করে
মওলানা সাহেব তাঁর জীবনের সবটুকু অবদান রেখে গেছেন আমাদের জন্য ঃ
তিনি ইসলামের পথে থেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ
জাতির জন্য এমন এক মহান নেতা আবার প্রয়োজন
আবার মাঠে ঘাটে কৃষাণ মজুরের জন্য কে দেবে হাঁক ডাক
কে আবার উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠবে ফারাক্কা ঠেকাও
আবার কে উচ্চারণ করবে ভুখা মিছিলের জন্য—
কে আবার স্বপ্নের বাণী নিয়ে ফিরে আসবে এই গ্রাম বাংলায় ... ।

দানবের খড়গ ভেঙে মানবের সিংহাসন দখল করলেন যিনি—
তিনি হলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

www.pathagar.com

আহামদ জসীম উদ্দীন

মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের সজল প্রতিকৃতি
তাঁর বেতের টুপি শোষিতের সান্ত্বনা
বঞ্চিতের আরাধনা, ফারাক্কার হাতিয়ার,
পানির জোয়ার কেড়ে আনার সংগ্রাম।

মওলানা ভাসানী, শতাব্দীর অগ্নিপুরুষ
জাতীয় চেতনার বিমূর্ত প্রতীক।
মওলানা ভাসানী মানে মাথা নত না করা
অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠা এক বীর
যেন রয়েল বেঙ্গলের হুংকার।

'মওলানা' আমাদের অহংকার।
যদি আসে আদর্শের সংঘাত
যদি এদেশের ভাগ্যাকাশে উদিত হয় ঝড়
তোমার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে
আমরা করব এর জয়।
কালিগঙ্গা পদ্মা মেঘনার জোয়ারের মত
যত বাধা বিঘ্ন যাবে ভেসে—
তুমি চিরআম্লান রবে
আমাদের চেতনার আকাশে।

ইয়াসির ইয়ামীন

হে মহান মওলানা—তুমিহীন

তারপর কেটে গেছে বহুদিন অন্ধকারময়
হে মহান মওলানা, তুমিহীন।

সমগ্র দেশব্যাপী আজ বেশুমার
চলছে জোঁকের চাষ।

www.pathagar.com

জীবদ্দশায় কখনো তুমি
বরদাশ্‌ত করো নি এসব।

জরা, ব্যাধি মৃত্যুর কাছে
একটি করুণ, বিনম্র, ম্লান আলো
জন্মান্ধ কবরে শুয়ে আছো।

উর্ধ্বমুখী দু'বাহু উদ্যত
শোষকের বুর্জোয়া নীতির
প্রতি হুঁশিয়ারি।
মিটিং মিছিলে এই নগর,
কচি ঘাস, দারুণ অত্যাচারিত!
শুধু পল্টনের ঐ ঘাসবন
আজো বুক উঁচিয়ে আছে।

হে মহান মওলানা—
শহরের দীর্ণ কোলাহল
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস
নূহের প্লাবন, এ্যাম্বুলেন্স
তীব্র হুইসেল
পাখিদের বিমূর্ত রোদন
মেঘের বজ্রনিনাদ
এটমের গগনবিদারী আওয়াজ

ফুটো বেলুনের মতো
চুপসে গেছে ইথারের বুকে।

কেবল একটি শব্দের
মুহুর্মুহু ঝনৎকার
জন থেকে জনে
মুখ থেকে মুখে
কান থেকে কানে
কোটি কোটি প্রাণে
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার

www.pathagar.com

কেবল দশ কোটি মানুষের
হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থেমে গেছে
স্থির-অবিচল-অপলক
হে মহান মওলানা, তুমিহীন।

হে মওলানা ভাসানী মহান
এক লোলচর্মসার অশীতিপর
বৃদ্ধের কথা আমি জানি--
যার স্বপ্নে ও মননে তুমি
উপমাবিহীন উপমা হয়ে আছো।

মওলানা—
সেই অশীতিপর বৃদ্ধের সাথে
কথা বলেছি কাল সারারাত।
বুকের পাঁজরে ধুকিবুকি নিয়ে
কী অবলীলায় আজো
সাক্ষী হয়ে আছে যুগের।

হে মহান মওলানা ভাসানী
আমি সেই বৃদ্ধের কথা বলছি—
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে
সামান্যতম ব্যথা পেয়েছিলো
ঐ ভূখণ্ডের মানুষের জন্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখে যার
রক্তের গতি থেমে গিয়েছিলো
সেই অশীতিপর বৃদ্ধ, দেখো
কেমন নির্বাক হয়ে গেছে
তোমার অন্তর্ধানে।

তবু বারবার মনে হয়
আমার—কি এভাবেই
বঞ্চিত হবো—
যুগ যুগ ধরে অন্ধকারেই
থেকে যাবো—
হে মহান মওলানা—তুমিহীন।

www.pathagar.com

সাকিল কালাম

মুখোমুখি

জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে
বুভুক্ষ মানুষের কথা বলে
আমাকে যদি ফেরারী
হতে হয়, আমি তাই হবো।

শোষকের দেয়া বালাখানা
আর খাসমহলের লোভে
ঘৃণার থুথু দিয়ে
আমার পূর্বপুরুষ
পাবলো পিকাশো, নেরুদা
নাজিম হিকমতরা
আজও বেঁচে আছে।
তাদের উত্তরসুরি আমি।

তাদের চিহ্নিত পথে
যাত্রার প্রতীক্ষায়
উজ্জীবিত হৃদয় এখন আমার।
আজও আমি তোমাদের মুখোমুখি।

আহমেদ ফারুক হাসান

শুভ্র আস্তিনের দোলা

তোমাকে ফিরিয়ে দেবো সে সাহস মরে গেছে কবে,
এক জীবনের দায় মেটাবার আজীবন রণে
ক্লান্ত হয়েছে শরীর, তবু শুভ্র আস্তিনের দোলা
তোমার মিছিলে টেনে নেয় আজো আমাদের চেতনার বান।

www.pathagar.com

আমরা ন্যায্য হিস্‌সার এক কণা ছেড়ে দিই যদি
তোমার পূত জবান আমাদের অভিশাপ দিক।
আমরা মৃত্তিকা থেকে নির্বাসিত হই
পালাতে পালাতে যেন অন্ধকূপে বন্দী হয়ে যাই।

স্মরণের মিছে ছলে কোলাহল ভরা এই দেশে
তোমাকে স্মরণে আনা আমাদের বেয়াদবী বটে;
তবু মানুষের দেহমন জুড়ে জাগে এই বোধ—
তোমার সফেদ জামা হৃদয়ের রঙ মেখে আজ
জাতির প্রিয় পতাকা হোক।

ফজল মোবারক

সচিত্র সংগ্রাম

খদ্দরের পাঞ্জাবী তাঁতের লুঙ্গি
তালের আঁশের টুপি
কাঁশফুল দাঁড়িঃ
চিরায়ত চিত্ররূপ গ্রাম-বাংলারঃ
সুখ-দুঃখের কুঁড়েঘর
ছনে ছাওয়া বাড়ি।

উত্থিত তর্জনী এক শাণিত তরবারিঃ
উদ্যত সঙ্গীনের সুতীব্র হুঁশিয়ারি।

স্বৈরাচারীর হৃৎপিণ্ডে কাঁপন জাগায়ঃ
ক্লান্তি নামে দানবের দর্পিত থাবায়।

ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত বট-পাকুড়ের মত
বিভীষণ দুঃশাসন হয় সন্নত।

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরঃ আপোষহীন দৃষ্টির দ্রাঘিমাঃ
ভেঙে দেয় ‘লাইন প্রথা’ অত্যাচারের সীমা।

www.pathagar.com

চর ভাসানে আসে বীর মোজাহিদ ঃ
চিরন্তন উৎপীড়নের কেঁপে ওঠে ভিত।

শিখা অনির্বাণ ঃ
অন্ধ গলিতে আনে সূর্যের ঘ্রাণ।

কৃষক বিদ্রোহ ঃ
ভেঙে দেয় সামন্তবাদের বিশাল বিগ্রহ।

অশান্ত সন্তোষে ঃ
কৃষি পল্লী দগ্ধিভূত জমিদার রোষে ঃ
আন্দোলন জন্ম নেয় সমগ্র অঞ্চলে ঃ
নিজের জ্বালানো যজ্ঞে জমিদার জ্বলে।

সিরাজগঞ্জ-রংপুর কৃষক সম্মেলন ঃ
মওলানার অগ্নিমন্ত্রে পায় উজ্জীবন।

বায়ান্ন-চুয়ান্ন-উনসত্তরে
ভাসানীর ঊর্ধ্ববাহু রাজপথ ধরে।

কাগমারীর জনসভা ভাষণ উচ্চগ্রাম ঃ
'আজ হতে পশ্চিমীদের জানাও সালাম'।

বজ্রকণ্ঠে গর্জে উচ্চারণ ঃ
'আজ হতে এ ভূখণ্ড আমরাই করবো শাসন'।

নির্যাতিত জাতির অভিভাবক ঃ
রেখে গেল নেতৃত্বের কালান্তর শোক।

শ্রেণীহীন সমাজ আর তৌহিদের জয় ঃ
জীবন দর্শন তাঁর শাশ্বত প্রত্যয়।

সন্তোষে হল যে সংগ্রামের সূচনা ঃ
"খোদাই খেদ্‌মত্‌গার" গায় সে বন্দনা।

www.pathagar.com

নেছারউদ্দীন আহমদ

নাম হলো তাঁর ভাসানী

গরীব দুখীর কথা বলে
জেল খেটেছেন কোন্ সে জন,
দীন মজুরের কষ্ট দেখে
কোন্ দয়ালুর কাঁদতো মন?

কোন্ সে নেতার ছেঁড়া জামা
বেতের টুপি মস্তকে,
ন্যায়ের পথে করতে লড়াই
কে বাড়াতেন হস্তকে?

তিনি হলেন সবার চেনা
নাম হলো তাঁর ভাসানী,
ভয় পেতেন না জালিম রাজার
রক্তচক্ষু শাসানী।

তাঁর কথাটি আজকে আমার
পড়ছে মনে বারংবার,
ভাবছি, 'জাতি দিচ্ছে না কেন
উপযুক্ত মূল্য তাঁর?'

গোলাম সারওয়ার

ভাসানী

ভাসানী মানে ক্ষেপে ওঠা কোন চাষাড়ে যুবক—
তাঁর চোখে শুধু অবিনাশী ক্রোধের লবণ
সে যেনো কোন এক খেটে খাওয়া কৃষকের শান দেওয়া
ঝলসানো অস্ত্র।
ভাসানী মানে ক্ষুব্ধ কোন বিকেল বেলা
আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের মতো

www.pathagar.com

পেশল কাধে বয়ে নিয়ে যায় অভাগীর লাশ
ঘৃণার মেঘ দিয়ে আড়াল করে সে শকুনের
লালায়িত চোখ।
ভাসানী একটা নাম অরূপ চিত্রকলা
বাউলের সুর,
সে যেনো এক চকচকে লাঙলের ফলা।

পাবলো সাহী

মওলানার খোঁজে

মওলানা, আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে আছি
তোমার শিরদাঁড়া সোজা হয়ে দাঁড়াবার কাছে
তোমার অব্যর্থ কণ্ঠ নির্ভীকতার কাছে
আমি ঋণী হয়ে আছি তোমার সফেদ
পাঞ্জাবীর কাছে।

মওলানা, তুমি আবার যখন পল্টন ময়দানে আসবে
সাধারণ মানুষের আবারও ভিড় হবে মিছিলে।
তুমি আবার যখন
গ্রামে, গ্রামে, নির্দেশ ছড়িয়ে দেবে
নারী, পাখি, ফুল আর কৃষকেরা
যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।
তুমি আবার যখন
সংগ্রাম, অধিকার
ভাষা আন্দোলনের কথা বলবে
দেখবে প্রতিটি মানুষের হাতে
তুখোড় ভালবাসা আর আন্দোলনের—
রাঙা পোস্টার।

www.pathagar.com

মওলানা দেখ, এখানে সবাই নির্ভীক
কি ফুল, কি পাখি, কি মানুষ
সবাই এক মুঠো শান্তি খোঁজে,
প্রেম, ভালবাসা, সুখ খোঁজে,
সফেদ পাঞ্জাবী এবং শক্ত মানুষ খোঁজে,
তোমার শাহাদৎ আঙুলের নির্দেশ খোঁজে
মুক্তি, স্বাধীনতা, আর
তোমাকে খোঁজে।

সবিতা নূর বেলী

একটি নাম

বিনিদ্র রাত জেগে পাহারা দাও তুমি
রক্তজবা চোখ নিয়ে আগলে রাখো বিস্তীর্ণ সীমান্ত,
কে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে এক ফোঁটা জমিন ?

অধিকারের কথা বলতে বলতে তুমি একটা বিশাল
বিটপী হয়ে যাও,

শাখা দুলিয়ে বিতাড়িত করো দুর্ভিক্ষ,
কে কেড়ে নেবে তোমার মোহময় ছায়া ?

জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় যখন মানুষের বসত
শকুনের দৃষ্টি পড়ে লেসার রশ্মির মতো
তখন তোমার দু'টি হাত বিপদাকীর্ণ মানুষের পাশে
দাঁড়ায় সাহসী ভঙ্গিমায় ।

কঠিন শিলাতে লেখা একটি নাম—মওলানা ভাসানী
মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার বর্ণমালা সে
সেতো বাউলের একতারার রুদ্রময় সিম্ফনি।

www.pathagar.com

এনায়েত রসুল

মওলানা ভাসানী

মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখরতা দেখেছি, মেঘমুক্ত আকাশের রং
দেখেছি বোশেখের রুদ্র প্রলয় অথবা—
জোছনার স্নিগ্ধ প্রলেপ, বাঁধভাঙা নদীর উচ্ছ্বাস
তুমি, মওলানা ভাসানী!

দেশখেকো শকুনের প্রতি ক্ষমাহীন, অতন্দ্রপ্রহরী
দুরন্ত যুবকের অস্থিরতা আর দুর্ধর্ষ সৈনিকের সাহসিকতায়
আমৃত্যু সংক্রামিত এক জননেতা তুমি—
তুমি, মওলানা ভাসানী!

পদ্মা মেঘনা যমুনা পেরিয়ে ফারাক্কার বদ্ধ দুয়ারে
শুনেছি সিংহ গর্জন, প্রচণ্ড পদাঘাত, সোচ্চার কণ্ঠস্বর
তাই—
অনুপ্রাণিত আমি এবং স্বদেশ-স্বজন, অথচ—
একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দিশেহারা অস্তিত্ব আমার
স্বদেশপ্রেম কি অনন্য সুখ অথবা যন্ত্রণার অপর নাম!
হয়তো এই একটি জিজ্ঞাসা কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে তোমাকেও
করেছে বিচলিত, করেছে বিক্ষুব্ধ অনেকটা আমারই মতো
অথচ তবুও সংগ্রামে অদ্বিতীয় তুমি, অনবদ্য দৃষ্টান্ত এক দেশপ্রেমিক
মওলানা ভাসানী, তুমি।

খৈয়াম ওমর

সাক্ষী সারা বাংলাদেশ

সিরাজগঞ্জ থেকে ছিটকে পড়েছিল একদিন একটি উল্কা
আসামের ভাসানের চরে,
জেগে উঠেছিল সেখানে কৃষক আন্দোলন—
সেই আন্দোলনের ঢেউ ভাসিয়ে দিয়েছিল
সন্তোষ, কাগমারী, সারা বাংলাদেশ।
সেটা আজও গল্প কথা।

www.pathagar.com

সাতচল্লিশের দেশ ভাগ
বায়ান্ন'র বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ—
জনতার সাথে রাজপথে নামলেন মৌলানা,
চুয়ান্ন'য় জনতার বিজয় ঘোষিত হলো।
আবার চক্রান্ত
আটান্ন থেকে বাষট্টি
ক্ষমতা পরিবর্তনের খেলা
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
মৌলানাকে আবার পেলাম রাজপথে
মিছিলের পুরোভাগে।

উনসত্তরের গণআন্দোলন
শাসকের গুলীতে জোহা, আসাদ হত্যা, কার্ফু
কার্ফু তুচ্ছ করে—
মৌলানা যাচ্ছেন জানাজায়
সাথে তার জনতার ঢল
যেন সামনে নিয়ে চলেছেন পিতা
তাঁর পুত্রের লাশ—
যেন একজন কমরেড, একজন সেনাপতির
নির্দেশে প্রতিরোধ ভেঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে
সাড়ে সাত কোটি মানুষ!
মৌলানার হুঙ্কার 'খামোশ'
রূপান্তরিত হয়েছে জনতার রুদ্র-রোষে
শঙ্কিত করে তুলেছে সেদিন
ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকের বুক।

সত্তরের জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাংলার
লাখো মানুষের মৃত্যু—
ছুটে গেছেন মৌলানা।
একাত্তরের গণহত্যার নীলনক্শা
শুভ্রকেশ মৌলানা অনুভব করেছেন

www.pathagar.com

তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে--
বিদ্যুতের আগুন ঝলসে উঠেছে তাঁর চোখে।
দেখেছেন বাংলার মানুষের পিঠ ঠেকেছে দেয়ালে
তাই স্বাধীনতার বীজ তিনিই বুনে দিলেন প্রথম
পল্টনের ময়দান থেকে
চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউণ্ডে।
লাখো জনতার মাঝে এদেশের
স্বাধীনতার অঙ্গীকার।

পল্টনের সভায়
উত্তুরে হাওয়ায় মওলানার সফেদ দাড়ি উড়ছে
ঘর্মাক্ত পাঞ্জাবী
আজানুলম্বিত হাত
ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে সেদিন
তর্জনী ছুঁয়েছে আকাশ।
এদেশের মানুষ শুনেছে যেন স্বপ্নালোকের কথা
বাংলার স্বাধীনতা।
পশ্চিমা পুঁজিপতিদের প্রতিবেদকরা গল্প ফেঁদেছেন
মৌলানা যেন 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স'।
আর্তমানবতার সেবায়
অত্যাচারিতদের সামনে দুর্জয় সাহসে
তিনি ছিলেন সত্যি এ যুগের এক সাহসী সেনাপতি
যেন খেলাফতে রাশেদার প্রতিনিধি।

আজও কান পেতে শুনি
বাংলার মাটিতে একটি নাম—
প্রতিবাদী মিছিলে একটি নাম—
প্রতিরোধ লড়াইয়ে একটি নাম—
মজলুম জনতার সারিতে একটি নাম—
সেই নাম
মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

www.pathagar.com

শাহজাহান তালুকদার

এক জ্বলন্ত ইতিহাস

রাজপথের শেষ মাথায় যেখানে দাঁড়িয়ে যায় বিপ্লব-মিছিল
থেমে যায় বিশ্বাসের জোয়ার, সীমিত অন্বেষার হয় সমাপ্তি
কিংবা অভাবের তীরবিদ্ধ যন্ত্রণায় অস্থির দাপাদাপি ক্রমশ বাড়ে
নিজস্ববলয় নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে পথ কেউ কেউ
বিচ্ছিন্ন মানুষেরা ঘর বাঁধার দুরন্ত আকাঙক্ষায় উন্মুখ
শুধু বিপ্লব-মরিচীকার পেছনে ছোটে বারম্বার শুধু ছোটে
আর ক্লান্ত শীর্ণ মুখে ফিরে আসে দেউলিয়া-ঘরে প্রতিদিন
পৃথিবীর মাটি ভাগাভাগির শিকারে ক্ষতবিক্ষত হয় যুগে যুগে।
ঠিক এখানেই, এই আকণ্ঠ পরাজয় আর খণ্ডিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে
এক বলিষ্ঠ সাগর ফুঁসে ওঠে সময়ের প্রয়োজনে দারুণভাবে
এক সাগর মিছিলের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি ছুটে আসে বিপুল বিশ্বাসে—
ভেঙে দিয়ে খণ্ড বিশ্বাস অখণ্ড সত্তার বিকাশে।
ধারালো যুক্তিতে একজন নকীব সামনের কাতারে পথ চলে নির্ভীক।
আমাদের চিরন্তন সত্যের আলোক দেখায়, আলোর মশাল
নাম তাঁর যুগে যুগে উচ্চারিত হয়—হবে ভাসানচরে বাংলায়—
সাত মহলার ঘরে ঘরে—বেলায় অবেলায়—
এক ইতিহাস এক চেতনাসমর্পিত আত্মা বিশ্বসত্তায় অন্তর্লীন
তিনি এক জ্বলন্ত ইতিহাস এক অনবদ্য শক্তির প্লাবন।

মোশাররফ হোসেন খান

দৃশ্যান্তরের ইতিহাস

একটি লোককে হেঁটে যেতে দেখতাম
এই সাগর উপকূলের উঠোন মাড়িয়ে।
তাঁর পায়ের শব্দে জেগে উঠতো নীল, সবুজ
আর ধূসর ফসিল প্রতিবেশী।

www.pathagar.com

মানুষকে ডেকে ডেকে শোনাতেন তিনি
একটি সাগরের গল্প
একটি নদীর কাহিনী
একটি মানচিত্রের ইতিহাস।
কখনো বা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়তো
উচ্ছল যুবকেরা লোকটির সাথে। তাদেরকেও
তিনি শোনাতেন—
প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী, জীবন এবং
যুদ্ধের ইতিহাস।
কেউবা বুঝেও বোঝেনি তাঁর সে ত্যেজসোক্তি
হৃদয়ের মর্মরতা কিংবা বুঝেও ফোটেনি মুখ
সরল সাহসে। এভাবে হেঁটে হেঁটে নিশ্চুপ
অবশেষে ফিরে গেছে সবাই শংকিত বাসভূমে
পায়ে মেখে উত্তপ্ত ধূলো।

একটি সূর্য গভীর অরণ্য ছাড়িয়ে, সাগর মাড়িয়ে,
পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তীর্যকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
যেন এক সৈনিক সীমান্তপ্রহরী।
তেজষ্ক্রীয় গণগনে সূর্যের সাথে লোকটির ছিল
বেশ রকমের সখ্যতা এবং কী যেন এক
আত্মিক সাদৃশ্য।

সূর্য এখনও ওঠে এবং ডোবে
পাহাড় এখনও আছে অটুট, হিমাচল
সাগরেও জাগে উন্মত্ত ঢেউ এবং তুফান
কিন্তু হাজার ঢুড়েও খুঁজে পাওয়া গেল না সেই লোকটিকে—
এখানে, সেখানে কিংবা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে।
যিনি শোনাতেন মিহি সুরে—
একটি সাগরের গল্প
একটি নদীর কাহিনী
এবং একটি মানচিত্রের ইতিহাস।

www.pathagar.com

ফকীর আলমগীরের গান

কথা ঃ নূরুজ্জামান শেখ
সুর ঃ সেলিম আশরাফ

॥ ১ ॥

তুমি ছিলে
তুমি ছিলে, তুমি আছো
চিরদিন থাকবে তুমি ॥
আমাদের হৃদয়ের এ্যালবামে
গ্রামমুখী জীবনের সংগ্রামে ॥

তুমি আছো
টিয়া রং ফসলের সুন্দরে
জাগ্রত জনতার অন্তরে অন্তরে
বাঁশী হয়ে বাজো তুমি
রাখালের হাতে
মেঠো সুর বাউলের একতারাতে
গান হও এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের
বিনোদন বিশ্রামে ।

তুমি আছো আমাদের বিজয়ের গৌরবে
বিপ্লবী চেতনার সৌরভে সৌরভে
হাসি হয়ে ফুটো তুমি
কিষাণীর মুখে,
কিষাণের নয়নের স্বপ্ন সুখে
আছো তুমি এদেশের
তাঁতী জেলে শ্রমিকের
কর্মের উদ্যোগে ।

www.pathagar.com

॥ ২ ॥

কথা ঃ আবদুল লতিফ

সুর ও শিল্পী ঃ ফকির আলমগীর

আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সংগ্রামের একটি নাম
বাংলাদেশের সব মানুষের লও সালাম ॥

ভাসানচরের অগ্নিগিরি
যুগান্তরের আঁধার চিরি
আসলে তুমি অন্ধকারে
আলোর দিশা তাই পেলাম ॥

নির্ভয়ে হক কথা বলার
বুক ফুলিয়ে পথ চলার
তোমার অভয় মন্ত্র পেয়ে
সংগ্রামের শপথ নিলাম ॥

হে দধিচি সংগ্রামী বীর
বিপ্লবী হে উন্নত শির
তোমার নামে বিপ্লবে আজ
সংগ্রামের শপথ নিলাম,
বাংলাদেশের সব মানুষের
লও সালাম ।

www.pathagar.com

॥ ৩ ॥

কথা ঃ সৈয়দ শামসুল হুদা
সুর ও শিল্পী ঃ ফকীর আলমগীর

আবদুল হামিদ খান ভাসানী
মওলানা মহান
জনগণ জ্বলছে,
জনগণ জ্বলবে নামটি তোমার অনির্বাণ।

এই দেশ এই মাটি
তোমার কথা বলছে বলছে বলবেই চিরদিন
আঁধার আলোর পথ সন্ধান মিলবেই চিরদিন
বঞ্চিতদের বন্ধু তুমি চিরত্যাগী মহাপ্রাণ।

তোমার চেতনা শত বৈশাখী
ঝড়ের পক্ষ মেলি
জোগাবে সাহস সামনে চলার
শত ভয় অবহেলি।

সাম্যের সংগ্রাম তোমার ও পথে
অবিরাম যাত্রা চলবেই চলবেই
মানুষের সম অধিকার দাবী
তুলবে মানুষ তুলবেই
মুকুটবিহীন সম্রাট ওগো
শতাব্দীর সেরা সন্তান।
সালাম তোমায় সালাম ॥

www.pathagar.com